আহ্কামুল হাদীস

[সিহাহ সিত্তার আলোকে মাযহাবভিত্তিক শরীয়তের বিধান পর্যালোচনা]

লেখক

মাওলানা মোঃ কামরুল হাসান

পি.এইচ.ডি. (গবেষক)

বি.এ. অনার্স (ইসলামিক স্টাডিজ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এম.এ. (ইসলামিক স্টাডিজ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তাকমীল ১ম শ্রেণীতে ১ম

ডিপ্লোমা ইন এ্যারাবিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কর্মকর্তা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সম্পাদক

ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা

আহ্‌কামুল হাদীস

প্রকাশনায়ঃ
রিয়াদ প্রকাশনী
৩৪ নর্থব্রুকহল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোনঃ ০১৯১৪৭৫৮১০৩, ০১৯১৬৭৪৭৮৯৮,
০১৯১৪১৬১৫২৬

প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারী, ২০০৬
তৃতীয় সংস্করণঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৩

কম্পোজঃ
মুহাম্মাদ খালিদ সাইফুল্লাহ (রিয়াদ)

প্রচ্ছদঃ
মোঃ সারোয়ার জাহান

মুদ্রণেঃ
হেরা প্রিন্টার্স
৩০/২ হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা

বাঁধাইঃ
কোয়ালিটি বাইন্ডিং হাউস
৩১/২ শিরিস দাস লেন, ঢাকা

মূল্যঃ ৩৫০.০০ টাকা

"Ahkamul Hadith" compiled by MD. Kamrul Hasan, edited by Dr. M. Fazlur Rahman and published by Riyad Prakashani, 34 North Brookhall Road, Banglabazar, Dhaka in September 2013 (3rd edition).

US$ 15.00

বাংলা ভাষাভাষী
হাদীস ও ফিক্‌হ অধ্যয়নকারীদের জন্য
নিবেদিত

মুখবন্ধ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার। যিনি মানব জাতির হেদায়েতের জন্য আসমানী কিতাব পবিত্র কুরআন নাযিল করেছেন। দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর, যিনি ছিলেন এই পবিত্র কুরআনের উত্তম ব্যাখ্যাদানকারী। দুআ ও মাগফেরাত কামনা করি ঐ সকল অভিজ্ঞ মহামনীষী মুজতাহিদগণের উপর, যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে কুরআন-হাদীসের উপর গবেষণা করে শরীয়তের বিভিন্ন হুকুম-আহ্কাম ও মাসআলা-মাসায়েল রচনা করে আমাদেরকে ইসলামী শরীয়তের উপর চলার পথ সহজ করে দিয়েছেন।

হাদীস ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস। কুরআনের পরেই এর স্থান। একজন মুসলিম শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই আল-কুরআনের পাশাপাশি হাদীস চর্চায়ও মনোযোগী হয়ে থাকেন। আর এই অধ্যয়ন ও চর্চার মাধ্যম যদি হয় মাতৃভাষা, তাহলে তা খুব সহজেই হৃদয়াঙ্গম করা যায়। তাই আরবী, উর্দূ, ফার্সী, ইংরেজী, ফরাসী সহ বর্তমানে পৃথিবীতে এমন কোন উল্লেখযোগ্য ভাষা নেই, যে ভাষায় কুরআন-হাদীসের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি।

কিছুকাল পূর্বেও বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের কুরআন চর্চার প্রধান মাধ্যম ছিল আরবী, উর্দূ ও ফার্সী ভাষা। এর অন্যতম কারণ হল ভৌগোলিক অবস্থান। কেননা এতদঞ্চলে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসার ঘটেছে মূলত সৌদি আরব, ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ভারতবর্ষের মহামনীষীদের মাধ্যমে। আর তাঁদের কারো না কারো মাতৃভাষা ছিল আরবী, ফার্সী অথবা উর্দূ এবং তাঁদের রচিত সকল কিতাবও ছিল মাতৃভাষা আরবী, উর্দূ অথবা ফার্সী ভাষায়।

আলহামদুলিল্লাহ, ইদানিং ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পবিত্র কুরআনের তরজমাসহ বিভিন্ন তাফসীরও বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে, অনূদিত হয়েছে সিহাহ সিত্তাহ বা হাদীসের বিশুদ্ধ ছয়খানি কিতাবসহ অনেক হাদীসগ্রন্থ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এতদঞ্চলে আজও বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার জন্য তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ নেই বললেই চলে। আর যা আছে তাও যৎসামান্য। অথচ কুরআন-হাদীসের শব্দার্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে মতভেদ, মাসআলার উত্তর প্রদানকারী সাহাবায়ে কিরামের কুরআন-হাদীস সংক্রান্ত জ্ঞানের তারতম্যের কারণে ও মাসআলা রচনায় নীতিগত পার্থক্যসহ বিভিন্ন কারণে হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যে ব্যাপক এখতেলাফ রয়েছে, এর সঠিক ব্যাখ্যা না জেনে সরাসরি হাদীস অধ্যয়ন করলে সাধারণ শিক্ষিত এবং অনভিজ্ঞ আলিমও নিশ্চিত বিভ্রান্তিতে নিপতিত হবেন। শুধু হাদীসের তরজমা পড়ে অনেকে তো রীতিমত গবেষক মুহাদ্দিস হয়ে গেছেন, মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করেছেন, জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন, আবার অনেকেরই হিতে বিপরীত হতেও দেখা গেছে। এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য প্রয়োজন পরিপক্ক হাদীস বিশারদগণ কর্তৃক বাংলা ভাষায় হাদীসের ব্যাপক খেদমত। আর এই খেদমতের জন্য কাউকে না কাউকে তো এগিয়ে আসতেই হবে।

দাওরায়ে হাদীস পড়ার সময় দুটি বিষয় গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম। প্রথমত, আমাদের দেশে মাদ্রাসায় তাকলীমের বর্ষে সিহাহ সিত্তাহর কিতাবসমূহ যে পদ্ধতিতে পড়ানো হয়, এতে অধিকাংশ কিতাবের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের বছরের সিংহ ভাগই চলে যায় পবিত্রতা ও নামায অধ্যায়ের আলোচনায়। অতঃপর বছরের শেষে সময় ও সুযোগ না পাওয়ার কারণে যাকাত, হজ্জ, বিবাহ, তালাক ও রোযা অধ্যায়সহ আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলোর আলোচনা করা সম্ভব হয় না। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক ইলমই অজ্ঞাত থেকে যায়।

দ্বিতীয়ত, আজকাল অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন কারণে আরবী ও উর্দূর ক্ষেত্রে পারদর্শী ও পূর্ণ মনোযোগী না হওয়ার কারণে হাদীসের কিতাবসমূহের সঠিক মর্মার্থ উদ্‌ঘাটন করতে অক্ষম। কেননা, হাদীসের অধিকাংশ অমূল্য ব্যাখ্যাগ্রন্থই আরবী ও উর্দূতে রচিত। তাই পরীক্ষার সময় বাজার থেকে সাল ভিত্তিক কিছু গাইড কিনে দায়সারাভাবে পরীক্ষা দিয়ে কোন মতে পাশ করার চিন্তায় মগ্ন থাকে। এতে পরীক্ষায় ফলাফলের ক্ষেত্রে সফলতা অর্জিত হলেও এর দ্বারা হাদীস অধ্যয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না। এছাড়া আরো বিভিন্ন কারণে তখনই ভেবেছিলাম, সহজ-সরল বাংলায় সিহাহ সিত্তাহর আলোকে রচিত মাযহাবভিত্তিক কোন গ্রন্থ থাকলে ছাত্র-শিক্ষক ও সাধারণ জনগণের জন্য খুবই উপকার হত।

আর এ ধরনের গ্রন্থ বাজারে আছে কিনা, তা দীর্ঘদিন খুঁজেও না পেয়ে আশাহত হয়েছি। তখনই ভাবলাম, এ ধরনের একটি গ্রন্থ রচনায় হাত দিলে কেমন হয়। কিন্তু পরক্ষণেই মনের মাঝে প্রশ্ন জাগে, আমি কে? আমার ইলমের দৌড়ই বা কত দূর? এ ধরনের কিতাব রচনার স্বপ্ন তো তাঁরাই দেখতে পারেন, যাঁরা ইলমী ও আমলী যোগ্যতায় শীর্ষে বিচরণ করছেন।

আমি আগেই বলেছি, কোন কাজ শুরু করার জন্য কাউকে না কাউকে তো এগিয়ে আসতেই হবে। তাই নিজের শত অযোগ্যতা জানা সত্ত্বেও ভবিষ্যতের জন্য এই প্রয়াস খানিকটা ফলদায়ক হতে পারে ভেবে "আহ্‌কামুল হাদীস" নামে হাদীসের একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনায় হাত দেই আজ থেকে প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অনার্সে অধ্যয়নরত অবস্থায় ক্লাশ ও পরীক্ষা ছাড়া বাকি সবটুকু সময় নিজেকে এই খেদমতে জড়িত রাখার চেষ্টা করেছি।

সিহাহ সিত্তাহর উপর মাযহাব ভিত্তিক ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করা সহজ ব্যাপার নয়। এটি যেমন অনেক বড় হওয়ার কথা, তেমনি তথ্যবহুল হওয়াও উচিত। কিন্তু বিভিন্ন দিক চিন্তা করে এবং কিতাবটির কলেবর সীমিত রাখতে গিয়ে আপাতত আলোচিত অধ্যায়সমূহে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু অনুচ্ছেদ শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের চাহিদা ও পরামর্শের ভিত্তিতে সংযোজনের সদিচ্ছা রইল।

অত্র কিতাবটিতে পবিত্রতা, নামায, যাকাত, হজ্জ, বিবাহ, তালাক ও রোযা মোট সাতটি অধ্যায় ধারাবহিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সুনান হিসেবে আবু দাউদ প্রথম খণ্ডকে ভিত্তি করে গ্রন্থটি বিন্যস্ত হয়েছে। আর প্রতিটি অনুচ্ছেদের শুরুতে আবু দাউদের মূল কিতাব অনুসারে পৃষ্ঠা নম্বর দেয়া হয়েছে। তাছাড়া পাঠকদের, বিশেষত গবেষকদের

সুবিধার্থে প্রতিটি হাদীসের শেষে সাধ্যানুযায়ী সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থের (ভারতীয় সংস্করণ অনুযায়ী) অনুচ্ছেদ, খণ্ড ও পৃষ্ঠার বরাতও দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট হাদীসটি উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে হুবহু অথবা শাব্দিক বা রাবীর পার্থক্য সহকারে, সংক্ষেপে, দীর্ঘ-আকারে অথবা আংশিকভাবে সংকলিত হয়েছে। অতঃপর উল্লিখিত হাদীসের আলোকে প্রাপ্ত মাসআলার ব্যাপারে বিভিন্ন মাযহাবের মতামত সূত্র ও দলীল সহকারে স্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আর অধিকাংশ হাদীসের বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. আ. ফ. ম. আবুবকর সিদ্দীক কর্তৃক অনূদিত এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত আবু দাউদ হাদীস গ্রন্থের সহায়তা নেয়া হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান, আরবী-বাংলা অভিধান রচনার জগতের সমুজ্জ্বল নক্ষত্র, বহুগ্রন্থের প্রণেতা, আরবী ভাষার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, ইসলামী চিন্তাবিদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষ ও সীরাত বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাপনা ও গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে অমূল্য সময় ব্যয় করে পূর্ণ কিতাবটির সম্পাদনা করে গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছেন। ইসলামের আরো অধিক খেদমতের জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁকে বরকতময় হায়াত দান করুন। তাঁরই ছোট ছেলে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার ও প্রোগ্রামার রেদওয়ান ভাই কম্পোজের উপযোগী করে আরবী ও বাংলা সফটওয়্যার চমৎকারভাবে পুনর্বিন্যাস করে দিয়েছেন এবং বড় ছেলে রিয়াদ ভাই নিরলস পরিশ্রম করে সম্পূর্ণ কিতাবটি কম্পোজ করে গ্রন্থটিকে সূর্যের মুখ দেখানোর সুযোগ করে দিয়েছেন। মূলত তাঁদের অকৃত্রিম প্রত্যক্ষ সহায়তা ছাড়া কিতাবটিকে এই পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভব হতো না। আমি তাঁদের কাছে চিরঋণী। এছাড়া আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু জামিআ ইসলামিয়া লালমাটিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক প্রথিতযশা মুফতী মুহাম্মদ শরীফুল ইসলাম (সোহাইল) সহ অসংখ্য ছাত্র ভাই ও গুণগ্রাহী এই কিতাবটি প্রণয়নে বিভিন্নভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সহায়তা প্রদান করেছেন। আল্লাহ তাআলা সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন!

সহৃদয় পাঠকের কাছে আমার বিনীত আবেদন, মুদ্রণ প্রমাদসহ এই কিতাবের কোন ভুলত্রুটি ধরা পড়লে বা আমার ইলমী অযোগ্যতার কারণে কোথাও কোন অসঙ্গতি দৃষ্টিগোচর হলে মেহেরবানী করে কেউ তা আমাকে জানালে তাঁর কাছে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তী সংস্করণে সে সব ভুল-ত্রুটি ও অসঙ্গতি দূর করার চেষ্টা করব।

বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষক-শিক্ষার্থী, সাধারণ পাঠক ও গবেষকদের হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে এই কিতাবটি সামান্যতম উপকারে এলেই দীর্ঘদিনের এই পরিশ্রম সার্থক হবে।

মাওলানা মোঃ কামরুল হাসান
০১/০১/২০০৬ ইং

সূচীপত্র

ইলমে হাদীসের কয়েকটি পরিভাষা

সাহাবীঃ যিনি ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং ঈমানের উপর ইন্তিকাল করেছেন, তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবী বলা হয়।

তাবেঈঃ যিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কোন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং মুসলমান হিসাবে ওফাত লাভ করেছেন, তাঁকে তাবেঈ বলা হয়।

মুহাদ্দিসঃ যিনি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে মুহাদ্দিস বলে।

শায়খাইনঃ সাহাবীগণের মধ্যে আবু বকর ও উমর (রাঃ)-কে একত্রে 'শায়খাইন' বলা হয়; কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-কে এবং ফিক্‌হের পরিভাষায় ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ (রহ.)-কে একত্রে 'শায়খাইন' বলা হয়।

রাবীঃ হাদীস বর্ণনাকারীকে রাবী বলে।

রেওয়ায়েতঃ হাদীস বর্ণনা করাকে রেওয়ায়েত বলে। কখনো কখনো মূল হাদীসকেও রেওয়ায়েত বলা হয়।

সনদঃ হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে সনদ বলে। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সুসজ্জিত থাকে।

মতনঃ হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দসমষ্টিকে মতন বলে।

মারফূঃ যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝখান থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে মারফূ হাদীস বলে।

মাওকূফঃ যে হাদীসের বর্ণনা-সূত্র উর্ধ্বদিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদ সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাওকূফ হাদীস বলে। এর অপর নাম আছার।

মাকতূঃ যে হাদীসের সনদ তাবেঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মাকতূ হাদীস বলে।

মুদাল্লাসঃ যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত ওস্তাদের নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয়, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের নিকট তা শুনেছেন অথচ তিনি তার নিকট সে হাদীস শুনেননি, এমন হাদীসকে মুদাল্লাস বলে। এরূপ করাকে তাদলীস বলে। আর যিনি এরূপ করেন তাকে মুদাল্লিস বলে। এক কথায় বলা যায়, যে হাদীসের সনদে দোষ লুকানো হয়েছে কিন্তু বাহ্যিক দিক সুন্দর করে তোলা হয়েছে, তাকে মুদাল্লাস বলে।

মুযতারিবঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে গরমিল করে বর্ণনা করেছেন সে হাদীসকে হাদীসে মুযতারিব বলা হয়। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয় বা প্রাধান্য দেয়া না যায়, সে পর্যন্ত এই হাদীসের ব্যাপারে তাওয়াক্কুফ (অপেক্ষা) করতে হবে। এ ধরনের রেওয়ায়েত প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে না।

মুত্তাসিলঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মুত্তাসিল হাদীস বলে।

মুনকাতিঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানের কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতি হাদীস বলে। আর এই বাদ পড়াকে বলে ইনকিতা।

মুরসালঃ যে হাদীসের সনদের ইনকিতা বা বিচ্ছিন্নতা শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবেঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাকে মুরসাল হাদীস বলে।

মারূফ ও মুনকারঃ কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিপরীত হলে অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর হাদীসকে মারূফ বলে এবং অপর রাবীর হাদীসটিকে মুনকার বলে। মুনকার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহঃ যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদে উল্লিখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাব্ত (স্মৃতিশক্তি) গুণ সম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষত্রুটি মুক্ত, তাকে সহীহ হাদীস বলে।

হাসানঃ যে হাদীসের কোন রাবীর স্মৃতিশক্তি গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে তাকে হাসান হাদীস বলে। ফিক্হবিদগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করেন।

যঈফঃ যে হাদীসের রাবী কোন হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন তাকে যঈফ হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসটিকে দুর্বল (যঈফ) বলা হয়, অন্যথায় মহানবী (সাঃ)-এর কোন বাণীই যঈফ নয়।

মাওযূঃ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে তার বর্ণিত হাদীসটিকে মাওযূ হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরূকঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয়, বরং সাধারণ কাজেকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরূক হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিত্যাজ্য।

মুবহামঃ যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি, যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে, এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুবহাম হাদীস বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতিরঃ যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে এত অধিক সংখ্যক লোক রেওয়ায়েত করেছেন যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব, তাকে মুতাওয়াতির হাদীস বলে। এ ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়।

খবরে ওয়াহিদঃ প্রত্যেক যুগে এক, দুই অথবা তিন জন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে খবরে ওয়াহেদ বা আখবারুল আহাদ বলে। এই হাদীস তিন প্রকারঃ-

মাশহূরঃ যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে মাশহূর হাদীস বলে।

আযীযঃ যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে আযীয বলে।

গারীবঃ যে সহীহ হাদীস কোন যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গারীব হাদীস বলে।

হাদীসে কুদসীঃ যে হাদীসের মূলকথা সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে। যেমন আল্লাহ নবী করীম (সাঃ)-কে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন, আর নবী করীম (সাঃ) তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন, তাকে হাদীসে কুদসী বা হাদীসে ইলাহী বা হাদীসে রব্বানী বলা হয়।

আহ্‌কামুল হাদীস প্রণয়নে সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বুখারী
২। মুসলিম
৩। তিরমিযী
৪। আবু দাউদ
৫। নাসায়ী
৬। ইবন মাজাহ
৭। দরসে তিরমিযী (উর্দূ)
৮। দরসে মিশকাত
৯। তানযীমুল আশতাত
১০। আল বাহরুর রায়িক
১১। ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়্যাহ
১২। ফয়যুল বারী
১৩। বজলুল মাজহুদ
১৪। আল উরফুশ্ শাযী
১৫। মুসতাদরাকে হাকীম
১৬। আছারুস্ সুনান
১৭। মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ
১৮। ফাতহুল মুলহিম
১৯। লামআতুত তানকীহ
২০। উমদাতুল কারী
২১। মাআরিফুস সুনান
২২। নাসবুর রায়াহ
২৩। দারা কুতনী
২৪। মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক
২৫। শরহে মাআনীল আছার/তাহাবী
২৬। বায়হাকী
২৭। মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ
২৮। ইলাউস্ সুনান
২৯। তালীকুস সাবীহ
৩০। আহ্‌কামুল কুরআন
৩১। মুসান্নাফে ইবন আবী শায়বা
৩২। শরহে মুসলিম
৩৩। ফাতহুল কাদীর
৩৪। আশ শরহুল মুযাহ্‌হাব
৩৫। আল ইনাইয়াহ
৩৬। উকূদুল জাওয়াহির
৩৭। আল মুগনী
৩৮। তালখীসুল হাবীর
৩৯। সহীহ ইবন খুযাইমা
৪০। ফাতহুল বারী
৪১। মাআরিফুল কুরআন
৪২। হেদায়া
৪৩। বাদায়িউস্ সানাই
৪৪। ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া
৪৫। মুয়াত্তা ইমাম মালিক
৪৬। কিতাবুল কেরাআতি
৪৭। রুহুল মাআনী
৪৮। কানযুল উম্মাল
৪৯। আল কাওকাবুদ দুররিয়্যি
৫০। আল মুতালিবুল আলিয়াহ
৫১। বিদায়াতুল মুজতাহিদ
৫২। রাকাআতুত্ তারাবীহ
৫৩। মুআলাম লিল খাত্তাবী
৫৪। নূরুল আনওয়ার
৫৫। তাফসীরে কুরতুবী
৫৬। তাফসীরে মাযহারী
৫৭। শরহে বেকায়াহ
৫৮। কানযুদ দাকায়েক
৫৯। মুসনাদে আহমদ
৬০। মাবসূত
৬১। লিসানুল আরব
৬২। সীরাতে ইবন হিশাম
৬৩। তাবাকাতে ইবন সাদ
৬৪। আত তাফসীরুল কাবীর লির রাযী
৬৫। মীযানুল ইতিদাল
৬৬। তাহযীবুল কামাল
৬৭। আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ
৬৮। নায়লুল আওতার
৬৯। ফাতাওয়ায়ে শামী
৭০। আল জামিউস সগীর

৭১। আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু
৭২। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী
৭৩। ফাতাওয়ায়ে রশীদীয়াহ
৭৪। তাজুল উরূস
৭৫। ফিকহুস সুন্নাহ
৭৬। আল মুহাল্লা
৭৭। তাফসীরে মাদারিক
৭৮। ফাতাওয়ায়ে আযীযিয়াহ
৭৯। জামিউল উসূল
৮০। মিরকাত
৮১। কাওয়ায়েদুল ফিক্হ
৮২। আল মুজামুল ওয়াসীত
৮৩। শরহুন নিকায়াহ
৮৪। কিতাবুল হুজ্জাতি আলা আহলিল মদীনাতে
৮৫। আওনুল মাবুদ
৮৬। আহসানুল ফাতাওয়া
৮৭। ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা
৮৮। শারায়িউল ইসলাম
৮৯। যাদুল মাআদ
৯০। আল মুজামুল ওয়াফী
৯১। আল কামুসুল ওয়াজীয
৯২। আল মুনজিদ আল আবজাদী
৯৩। আল ফিকহু আলা মাযাহিবিল আরবাআহ
৯৪। কামুসুল কুরআন
৯৫। আল লুবাব
৯৬। রুইয়াতুল হিলাল
৯৭। আল আছারুল বাকিয়াহ
৯৮। কিতাবুল উম্ম
৯৯। আত তাবয়ীনুল হাকায়েক
১০০। আহকামে ইতিকাফ
১০১। আওজাযুল মাসালিক
১০২। দুররুল মুখতার

بَابُ كَرَاهِيَةِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ ص٣

কিবলার দিকে মুখ করে পেশাব-পায়খানা করা মাকরূহ

... عَنْ اَبِي اَيُّوْبَ رِوَايَةً قَالَ اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوْا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلاَ بَوْلٍ وَّلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا الخ (بخاري ج١ ص٢٦ باب لا تستقبل القبلة بغائط الخ، ترمذي ج١ ص٨ باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط او بول، نسائي ج١ ص١٠ باب النهي عن استقبال واستدبار القبلة عند الحاجة، ابن ماجة ص٢٧)

অনুবাদঃ ... আবু আইউব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ যখন তোমরা পায়খানায় আসবে, তখন তোমরা কিবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করবে না। বরং তোমরা পূর্ব বা পশ্চিমমুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করবে।

বিশ্লেষণঃ কিবলার দিকে মুখ করে বা কিবলাকে পিছনে ফেলে মল-মূত্র ত্যাগ করা জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে ফকীহগণের মাঝে মতানৈক্য (اِخْتِلَاف) রয়েছে। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে সাতটি মত বর্ণনা করা হলঃ

১. দাউদ যাহেরির মতে, ময়দানে হোক কিংবা আবাদী জমিতে হোক সর্বাবস্থায় কিবলার দিকে মুখ করে কিংবা পিঠ দিয়ে ইস্তিঞ্জা (মল-মূত্র ত্যাগ) করা জায়েয।

দলীলঃ ... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَهٰى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ اَنْ يُّقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا– (ابو داود ج١ ص٣ باب الرخصة في ذٰلك، ترمذي ج١ ص٨ باب الرخصة في ذٰلك، ابن ماجة ص٢٨)

অর্থাৎ, ... জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) কিবলার দিকে মুখ করে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তিকালের এক বছর পূর্বে আমি তাঁকে কিবলার দিকে মুখ করে পেশাব করতে দেখেছি।

অতএব, উক্ত হাদীসে যেখানে কিবলার দিকেই মুখ করে পেশাব করার প্রমাণ রয়েছে। সেক্ষেত্রে কিবলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে ইস্তিঞ্জা করার অবকাশ তো অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

২. ইমাম মালিক, শাফেঈ, ইসহাক ইবন রাহওয়াই (রহ.)-এর মতে এবং ইমাম আহমদ (রহ.)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী- ইস্তিঞ্জার সময় কিবলার দিকে মুখ করা ও পিঠ ফিরানো উভয়ই লোকালয়ে জায়েয, আর ময়দানে নাজায়েয।

দলীলঃ একদা ইবন উমর (রাঃ)-কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তিনি বলেন-

... يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هٰذَا قَالَ بَلٰى اِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذٰلِكَ فِيْ الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْئٌ يَّسْتُرُكَ فَلاَ بَأْسَ– (ابو داود ج١ ص٣)

অর্থাৎ, ... হে আবু আব্দুর রহমান! কিবলার দিকে মুখ করে পেশাব করাতে কি নিষেধ করা হয়নি? তিনি বলেন, হাঁ, তবে এই নিষেধাজ্ঞা খোলা মাঠের ব্যাপারে প্রযোজ্য। যদি তোমার এবং কিবলার মধ্যে এমন কোন বস্তু থাকে যা তোমাকে আড়াল করে রাখে, তাহলে কোন অন্যায় হবে না।

৩. ইমাম আহমদ (রহ.)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইস্তিঞ্জার সময় কিবলার দিকে মুখ করা সর্বাবস্থায় নাজায়েয। আর পিঠ ফিরানো সর্বাবস্থায় জায়েয। কোন কোন আহলে যাহের এবং আবু হানিফা (রহ.)-এর একটি অভিমতও অনুরূপ।

(بذل المجهود ج١ ص٤)

দলীলঃ **... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلٰى ظَهْرِ الْبَيْتِ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ–** (ابو داود ج١ ص٣، بخاري ج١ ص٢٦ باب التبرز في البيوت، ترمذي ج١ ص٩، نسائي ج١ ص١٠–١١ الرخصة في ذلك في البيوت، ابن ماجة ص٢٨)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমি ঘরের ছাদে উঠে দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দু'টি কাঁচা ইটের উপর বসে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিচ্ছেন।

উল্লেখ্য যে, মদীনায় বসে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করলে বায়তুল্লাহ স্বাভাবিকভাবেই পিছনে পড়বে।

৪. ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে, কিবলার দিকে মুখ করা সর্বাবস্থায় নাজায়েয। আর কিবলার দিকে পিঠ ফিরানো লোকালয়ে জায়েয কিন্তু খোলা ময়দানে নাজায়েয।

দলীলঃ উপরোল্লিখিত ইবন উমর (রাঃ)-এর হাদীস। তিনি ইজতিহাদ (গবেষণা) করে বলেন যে, উক্ত হাদীসে কিবলার দিকে যে পিঠ ফিরানোর কথা এসেছে, তা ছিল লোকালয়ে। সুতরাং ময়দানে তা জায়েয নয়।

৫. মুহাম্মদ ইবন সীরীন (রহ.)-এর মতে, কিবলার দিকে মুখ দেয়া বা পিঠ ফিরানো সর্বাবস্থায় হারাম, এমনকি বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকেও।

দলীলঃ ... عَنْ مُّعْقَلِ بْنِ اَبِيْ مَعْقَلِ الْاَسَدِيِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَّسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ اَوْغَائِطٍ– (ابو داود ج۱ ص۳، بخاري ج۱ ص۲٦ باب من تبرز على لبينتين، ابن ماجة ص۲۷)

অর্থাৎ, ... মাকাল ইবন আবী মাকাল আল-আসাদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) উভয় কিবলার (বায়তুল্লাহ ও বায়তুল মুকাদ্দাস) দিকে মুখ করে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন।
উল্লিখিত হাদীসে যেহেতু উভয় কিবলার উল্লেখ রয়েছে, তাই উভয় ক্ষেত্রেই হারাম।

৬. হাফিয আবু আওয়ানা (রহ.)-এর মতে, কিবলার দিকে মুখ করা ও পিঠ ফিরানো উভয়টির নিষিদ্ধতা কেবল মদীনাবাসীদের জন্য খাস (বিশেষিত)। অন্যদের জন্য নয়।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে উল্লিখিত হাদীসের শেষাংশ – وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا-

এই সম্বোধন সাধারণভাবে সবার জন্য নয়। শুধুই মদীনাবাসীদের জন্য। কেননা, মদীনাবাসীদের কিবলা ছিল দক্ষিণ দিকে। সেজন্য পেশাব-পায়খানার সময় তাদের পূর্ব-পশ্চিমমুখী হয়ে বসতে হবে।

৭. ইমাম আবু হানিফা, মুজাহিদ, ইবরাহীম নাখঈ, সুফিয়ান সাওরী ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, মল-মূত্র ত্যাগকালে কিবলার দিকে মুখ করা এবং পিঠ ফিরানো উভয়টি সাধারণভাবে নাজায়েয। খোলা ময়দানে হোক কিংবা লোকালয়ে। ইমাম আহমদ (রহ.)-এরও একটি অভিমত অনুরূপ। আর হানাফীদের ফাতওয়া ইহার উপরই।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে কিবলাকে সামনে রেখে যখন মল-মূত্র ত্যাগ করা নিষেধ প্রতীয়মান হল, তাহলে কিবলাকে পিছনে রাখা তো সামনে রাখার চেয়ে আরো অধিক গর্হিত কাজ।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ اُعَلِّمُكُمْ فَاِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا– (ابو داود ج۱ ص۳، نسائي ج۱ ص۱٦ اللهي عن الإستطابة بالروث، ابن ماجة ص۲۷)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের পিতৃতুল্য। আমি তোমাদেরকে দীনের বিষয়সমূহ শিক্ষা দিয়ে থাকি। অতএব, তোমাদের কারো যখন পায়খানায় যাওয়ার প্রয়োজন হয়, সে যেন কিবলাকে সম্মুখে ও পিছনে রেখে না বসে।

অত্র হাদীসে সুস্পষ্টভাবে কিবলাকে মল-মূত্র ত্যাগের সময় সামনে ও পিছনে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। (درس ترمذي ج١ ص١٨٥-١٨٧)

জবাবঃ আহনাফদের পক্ষ থেকে অন্যান্য মাযহাবের দলীলের জবাবঃ

দাউদ যাহেরীর দলীলের জবাবঃ উক্ত হাদীসের সনদে মুহাম্মদ ইবন ইসহাক নামক একজন রাবী রয়েছেন, যিনি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন। আর হানাফীদের পক্ষে প্রদত্ত আবু আইউব আনসারীর হাদীসটি এর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। কেউ কেউ মুহাম্মদ ইবন ইসহাককে মিথ্যুক এবং দাজ্জাল বলতেও কার্পণ্য করেননি। অতএব, যার সম্বন্ধে এমন মন্তব্য করা হয়েছে, তা মারফূ হাদীসের মুকাবিলায় গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া, ইবন হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, এটা হয়ত ঘটনাচক্রে কোন এক সময় সংঘটিত হয়েও থাকতে পারে। কিন্তু এটা নবী করীম (সাঃ)-এর সাধারণ আমল ছিল না। সুতরাং ইহা দ্বারা অকাট্য বিধান (حكم قطعي) মানসূখ হতে পারে না। তাই তা গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম মালিক ও শাফেঈদের দলীলের জবাবঃ হযরত ইবন উমর (রাঃ)-এর হাদীস সম্পর্কে বলা যায় যে, এটা ছিল তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদভিত্তিক আমল। যা মারফূ হাদীসের মুকাবিলায় গ্রহণযোগ্য নয়।

তাছাড়া ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকেও তাঁর ইজতিহাদ প্রাধান্য লাভের উপযোগী বলে মনে হয় না। কারণ, মল-মূত্র ত্যাগকারী ও কিবলার মাঝখানে আড়ালস্বরূপ কিছু থাকা, কেবল তখনই সম্ভব, যখন হারাম শরীফে বসে সরাসরি কাবা শরীফের দিকে মুখ করে ইস্তিঞ্জা করা হয়। (নাউযুবিল্লাহ) তাছাড়া অন্য কোথাও বসে এরূপ করা সম্ভব নয়। কেননা, কোন না কোন ঘরবাড়ি বা পাহাড় তো মাঝখানে প্রতিবন্ধক হবে। এমতাবস্থায় নিষেধাজ্ঞা আরোপের কোন প্রয়োজনই হতো না। সুতরাং লোকালয়ে জায়েয আর ময়দানে জায়েয নয়, এমনটি বলা ঠিক নয়।

ইমাম আহমদের দলীলের জবাবঃ (১) ইবন উমর (রাঃ) ছাদ থেকে নবীজী (সাঃ)-কে দেখা, এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এটা কোন দলীল হতে পারে না। কারণ এটি নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে সম্পৃক্ত। কেননা, নবী করীম (সাঃ)-এর মল-মূত্র ছিল পবিত্র। অতএব, নবী করীম (সাঃ) এ হুকুম থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত হওয়াও বিচিত্র নয়। (২) তাছাড়া ইবন উমর (রাঃ)-এর দৃষ্টিপাত ঘটনাচক্রে হয়েছিল এবং তাৎক্ষণিক তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। বিশেষ করে নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি এমন অনাকাংক্ষিত দৃষ্টির দরুণ তাঁর প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হওয়া ছিল তাঁর পক্ষে দুষ্কর।

(৩) অথবা, নবী করীম (সাঃ)-এর চেহারা মুবারক ঠিকই কিবলার দিকে ছিল, কিন্তু লজ্জাস্থান ছিল অন্য দিকে ফিরানো। যা অল্পক্ষণের মধ্যে ইবন উমর (রাঃ) আন্দাজ করতে পারেননি। আর ফকীহগণ বর্ণনা করেন যে, মল-মূত্র ত্যাগের ক্ষেত্রে কাবার দিকে মুখ বা পিঠ না ফিরানোর সম্পর্ক হল লজ্জাস্থানের সাথে, চেহারার সাথে নয়।

আবু ইউসুফ (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দলীলের বিপক্ষে প্রদত্ত জবাবই যথেষ্ট।

মুহাম্মদ ইবন সীরীন (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ

(১) মাকাল ইবন মাকালের হাদীসে আবু যায়েদ নামক একজন রাবী রয়েছেন, যার ব্যাপারে হাফিজ বলেন, তিনি অজ্ঞাত (**مجهول**)।

(২) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে মল-মূত্র ত্যাগ করার হুকুম মাকরূহ তানযিহী, বায়তুল্লাহ্‌র মত হারাম নয়।

(৩) এ হুকুম তখন দেয়া হয়েছিল, যখন বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের কিবলা ছিল। অতঃপর কিবলার হুকুম মানসূখ (রহিত) হয়ে গেলে নিষেধের হুকুমও রহিত (মানসূখ) হয়ে যায়।

(৪) তাছাড়া, বায়তুল মুকাদ্দাস উত্তর দিকে এবং কাবা শরীফ দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। অতএব, যদি মদীনা শরীফেও বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করা বা পিঠ ফিরানোর অনুমতি দেয়া হত, তাহলে কাবা শরীফের দিকে মুখ করা বা পিঠ ফিরানো আবশ্যক হত। আর আসল উদ্দেশ্য এটাই।

আবু আওয়ানার দলীলের জবাবঃ যেহেতু উক্ত সম্বোধন সরাসরি মদীনাবাসীদেরকে করেছিলেন, তাই তিনি وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا অর্থাৎ, বরং তোমরা পূর্ব বা পশ্চিমমুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করবে, নতুবা শরীয়তের হুকুম তো বিশ্ববাসীর জন্য। কারণ তিনি ছিলেন বিশ্বনবী, সমস্ত উম্মতের নবী।

তাছাড়া এর উদ্দেশ্য যেহেতু কাবা শরীফকে সম্মান দেখানো। সুতরাং ইহা মদীনাবাসীসহ বিশ্বের প্রত্যেকটি মুসলমানের জন্য নৈতিক দায়িত্ব। চাই সে চার দেয়ালের ভিতরে হোক বা খোলা ময়দানে হোক, চাই সে এশিয়া মহাদেশে থাকুক অথবা আফ্রিকায় থাকুক। (درس مشكٰوة ج١ ص١٤٩-١٥٠)

হানাফীদের অভিমত প্রাধান্যের আরো কতিপয় কারণঃ

(ক) আবু আইউব আনসারী (রাঃ)-এর হাদীসটি এক্ষেত্রে সমস্ত মুহাদ্দিসীনের সর্বসম্মতিক্রমে সনদগত দিক থেকে বিশুদ্ধতম। তাই ইমাম তিরমিযী (রহ.) শাফেঈ

মাযহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও উক্ত হাদীসটি স্বীয় কিতাবে বর্ণনা করার পর লিখেন-

حَدِيْثُ اَبِيْ اَيُّوْبَ اَحْسَنُ شَيْئٍ فِيْ هٰذَا الْبَابِ وَاَصَحُّ– (ترمذي ج١ ص٨)

অর্থাৎ, এক্ষেত্রে আবু আইউব (রাঃ)-এর হাদীসটি সর্বোত্তম ও বিশুদ্ধতম।

(খ) হযরত আবু আইউব (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতটি একটি মৌলিক আইনের মর্যাদা রাখে। এর মুকাবিলায় অন্যসব রেওয়ায়েত শাখাগত ঘটনা মাত্র।

(গ) আবু আইউব (রাঃ)-এর হাদীসটি বাচনিক (قَوْلِيْ) আর বিরোধী রেওয়ায়েত কর্মগত (فِعْلِيْ)। নিয়ম হল, বিরোধের সময় সর্বসম্মতিক্রমে বাচনিক (কাওলী) হাদীসই প্রাধান্য পাবে।

(ঘ) আবু আইউব (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতটি নিষেধসূচক (مُحَرِّم)। আর বিরোধী রেওয়ায়েতগুলো বৈধতাসূচক (مبيح)। এটিও একটি মূলনীতি যে, পরস্পর বিরোধের সময় বৈধতাসূচক হাদীসের উপর নিষেধসূচক হাদীস প্রাধান্য পায়।

(ঙ) আবু আইউব আনসারী (রাঃ)-এর হাদীসটি কুরআনের সাথেও অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন, ইরশাদ হচ্ছে- وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ অর্থাৎ, যে আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তা তার আন্তরিকতার পরিচায়ক। (হজ্জঃ ৩২) আর কাবা শরীফ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার একটি অন্যতম নিদর্শন।

(تنظيم الاشتات ج١ ص١٣٨–١٤١، درس ترمذي ج١ ص١٨٩–١٩٥)

بَابُ فِيْ الرَّجُلِ يَرُدُّ السَّلَامَ وَهُوَ يَبُوْلُ ص٣

পেশাবরত অবস্থায় সালামের জবাব দেয়া

... عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ قَالَ اِنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ حَتّٰى تَوَضَّأَ ثُمَّ اِعْتَذَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ اِنِّيْ كَرِهْتُ اَنْ اَذْكُرَ اللهَ تَعَالٰى ذِكْرُهُ اِلاَّ عَلٰى طُهْرٍ اَوْ قَالَ عَلٰى طَهَارَةٍ– (ابو داود ج١ ص٤، ترمذي ج١ ص٢٧ باب كراهية رد السلام غير متوضئ، نسائي ج١ ص١٦، رد السلام بعد الوضوء، ابن ماجة ص٢٩)

অনুবাদঃ ... আল-মুহাজির ইবন কুনফুয (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, একদা তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে এমন অবস্থায় পৌঁছলেন, যখন তিনি (সাঃ) পেশাবরত ছিলেন। তিনি তাঁকে সালাম দেন। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) অযু না করা পর্যন্ত তার সালামের জবাব থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর তিনি তার নিকট

ওযর পেশ করে বলেন, আমি পবিত্র হওয়া বা পবিত্রতা অর্জন করা ব্যতীত আল্লাহ তাআলার নাম স্মরণ করা অপছন্দ করি।

بَابُ فِيْ الرَّجُلِ يَذْكُرُ اللهَ تَعَالٰى عَلٰى غَيْرِ طُهْرٍ ص٤

অপবিত্র অবস্থায় আল্লাহ তাআলার যিকির

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى كُلِّ اَحْيَانِهِ— (بخاري ج١ ص٤٤ باب تقضى الحائض المناسك، مسلم ج١ ص١٦٢ باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة الخ، ابن ماجة ص٢٦)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার যিকিরে মশগুল থাকতেন।

বিশ্লেষণঃ উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে অসামঞ্জস্য (تعارض) পরিলক্ষিত হয়। কেননা, প্রথম হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) অপবিত্রাবস্থায় যিকির করতে অপছন্দ করতেন। (উল্লেখ্য যে, সালাম দেয়া-নেয়া একপ্রকার যিকির) আর আয়িশার হাদীসে সর্বাবস্থায় যিকিরের কথা উল্লেখ রয়েছে। তাই মুহাদ্দিসীনে কিরাম উভয় হাদীসে সামঞ্জস্য স্থাপন করে বলেন-

(ক) যে হাদীসে অপছন্দের কথা বলা হয়েছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, অনুত্তম বর্ণনা করা। আর আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হল জায়েয পদ্ধতি বর্ণনা করা।

(খ) আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হল, অন্তরের যিকির। আর আল-মুহাজির (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হল মৌখিক যিকির।

(গ) আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত عَلٰى كُلِّ اَحْيَانِهِ বা সর্বাবস্থায় দ্বারা উদ্দেশ্য হল, পবিত্র থাকা অবস্থায় তিনি সর্বক্ষণ যিকির করতেন। সুতরাং অপবিত্র অবস্থায় যিকির করতেন না।

(ঘ) احيانه শব্দে ব্যবহৃত ه সর্বনাম (ضمير) দ্বারা নবী করীম (সাঃ)-কে বুঝানো হয়নি; বরং যিকির করা বুঝানো হয়েছে। তখন বাক্যাংশের অর্থ হবে, তিনি সবসময় স্থান-কাল-পাত্র ভেদে প্রত্যেক যিকির আদায় করতেন। যেমন, টয়লেটে যাওয়ার সময় যে যিকির (দোয়া) তা তিনি সর্বাবস্থায় আদায় করতেন, আবার বাজারে যাওয়ার সময় যে যিকির রয়েছে, তিনি (সাঃ) তা আদায় করতেন।

(درس مشكوٰة ج١ ص١٧٦، تنظيم الاشتات ج١ ص١٧١)

بَابُ الْاِسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ ص٤ ঃ পেশাব হতে পবিত্রতা অর্জন

... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى قَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ اَمَّا هٰذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا هٰذَا فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ دَعَا بِعَسِيْبٍ رَّطَبٍ فَشَقَّهُ بِاِثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَيْهِ هٰذَا وَاحِدًا وَعَلٰى هٰذَا وَاحِدًا وَّقَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبِسَا– (بخاري ج١ ص٣٤–٣٥ باب من الكبائر الخ، مسلم ج١ ص١٤١ باب وجوب الاستبراء منه، ترمذي ج١ ص٢١ باب التشديد في البول، نسائي ج١ ص١٢–١٣ التنزه عن البول، ابن ماجة ص٢٩)

অনুবাদঃ ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সাঃ) দুইটি কবরের পাশ দিয়ে গমনকালে বললেনঃ এই দুই ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এদের এই শাস্তি কোন বড় ধরনের অন্যায়ের জন্য নয়। অতঃপর তিনি (সাঃ) একটি কবরের প্রতি ইশারা করে বলেন, এই ব্যক্তিকে পেশাব হতে সঠিকভাবে পবিত্রতা অর্জন না করার কারণে এবং (দ্বিতীয় কবরের প্রতি ইশারা করে বললেন) এই ব্যক্তিকে পরনিন্দা করে বেড়ানো হেতু আযাব দেয়া হচ্ছে। অতঃপর তিনি একটি কাঁচা খেজুরের ডাল সংগ্রহ করে দুই ভাগে বিভক্ত করলেন এবং দুইটি কবরের উপর স্থাপন করে বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না এই দুইটি ডালের অংশ শুকাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এদের আযাব কম হবে।

প্রথম আলোচনাঃ উপরোল্লিখিত হাদীসের বাহ্যিক অর্থে বুঝা যায় যে, যে দুটি কারণে দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল, তা কবীরা গুনাহের কারণে নয়। যেমন, হাদীসে বর্ণিত আছে- وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ অথচ পেশাব থেকে পবিত্র না হওয়া এবং পরনিন্দা করা নিঃসন্দেহে এ দুটি কবীরা (বড়) গুনাহ। অতএব, হাদীসটি ব্যাখ্যার দাবী রাখেঃ

(ক) كَبِيْر বলা হয় فِعْلٌ يَشُقُّ تَرْكُهُ তথা এমন কাজ যা পরিত্যাগ করা খুবই কষ্টকর। তখন বাক্যাংশটির অর্থ হবে, তাদের দুজনকে এমন কোন কাজের উপর শাস্তি দেয়া হচ্ছে না, যা পরিত্যাগ করা খুবই কষ্টকর ছিল। বরং এমন কাজের দরুন শাস্তি দেয়া হচ্ছে, যা পরিত্যাগ করা ছিল খুবই সহজ।

(খ) বাক্যাংশটির দ্বারা উদ্দেশ্য হল- لَيْسَ كَبِيْرًا فِيْ الصُّوْرَةِ وَهُوَ كَبِيْر فِيْ الذَّنْبِ

অর্থাৎ, প্রস্রাব থেকে পবিত্র থাকা এটাতো আকৃতি বা গঠনগত কবীরা নয়, কিন্তু গুনাহের দিক দিয়ে তা কবীরা।

(গ) একথার উদ্দেশ্য হল- لَيْسَ كَبِيْرًا فِيْ اِعْتِقَادِهِمَا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ كَبِيْرٌ

অর্থাৎ, তাদের ধারণা অনুযায়ী ইহা কবীরা নয়, কিন্তু আল্লাহর নিকট ইহা কবীরা।

(ঘ) বাহ্যিকভাবে ইহা (পেশাব থেকে সতর্ক না থাকা) কবীরা গুনাহ নয়। কিন্তু ইহা যেহেতু নামায ভঙ্গের কারণ, তাই তা কবীরা।

(ঙ) উভয় বিষয় সত্ত্বাগত দিক থেকে কবীরা নয়, কিন্তু বারবার করার দ্বারা এবং অভ্যাসে পরিণত করার দ্বারা তা কবীরায় পরিণত হয়ে যায়। কেননা, যেকোন সগীরা (ছোট) গুনাহ বারবার করার দ্বারা তা কবীরায় পরিণত হয়ে যায়।

(تنظيم الاشتات ج١ ص١٤٢)

(চ) সহীহ বুখারীতে সুস্পষ্টভাবে ثُمَّ قَالَ بَلٰى (অতঃপর তিনি বললেন, হাঁ) শব্দ উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং প্রথমে নবী করীম (সাঃ) এ দুটি বিষয়ে কবীরা হওয়ার ব্যাপারে ইলম না থাকার কারণে তিনি না বলেছিলেন। অতঃপর তৎক্ষণাৎ ওহী আসল যে, ইহা কবীরা। তখন তিনি (সাঃ) بَلٰى (হাঁ, ইহা কবীরা) উচ্চারণ করে কবীরা সাব্যস্ত করলেন। অতএব, আর কোন অসামঞ্জস্য নেই। (بخاري ج١ ص٣٥)

দ্বিতীয় আলোচনাঃ উক্ত হাদীস অধ্যয়নে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কবরের আযাব উল্লিখিত দুই গুনাহের সাথে কি যোগসূত্র (مناسبت) রয়েছে? এর সঠিক জবাব হল, হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আল্লাহর হকসমূহের মধ্যে নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। আর পবিত্রতা হচ্ছে নামাযের প্রথম ধাপ। অতএব, যে ব্যক্তি প্রস্রাবের ব্যাপারে অসতর্ক, তার পবিত্রতার অভাবে নামাযই শুদ্ধ হবে না। পক্ষান্তরে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার হকসমূহের মধ্যে অন্যায়ভাবে হত্যার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। আর এ হত্যার প্রথম ধাপ হচ্ছে চোগলখুরী বা পরনিন্দা। আর আখিরাতের স্তরসমূহের প্রথম স্তর হচ্ছে কবর। সুতরাং আখিরাতের এই প্রথম স্তর তথা কবরে আযাব হবে এটাই স্বাভাবিক।

(البحر الرائق ج١ ص١١٤، درس مشكوة ج١ ص١٥٣)

তৃতীয় আলোচনাঃ কবরের উপর ফুল দেয়া বা ডাল গাড়ার হুকুমঃ

অনুচ্ছেদের হাদীসের শেষাংশে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাঃ) তাদের কবরের আযাব লঘু হওয়ার প্রত্যাশায় একটি কাঁচা খেজুরের ডাল দু' ভাগ করে তাদের উভয়ের কবরে স্থাপন করে দেন। অতএব, প্রশ্ন জাগে যে, এর দ্বারা যে কোন কোন বিদআতী কবরের উপর ফুল দেয়ার বৈধতার প্রমাণ পেশ করে থাকে, তা কতটুকু

নির্ভরযোগ্য? এর জবাব হল, প্রমাণটি সম্পূর্ণ বাতিল। কারণ, এ হাদীসে ফুল দেয়ার উপর কোন আলোচনা নেই। (درس ترمذي ج١ ص٢٨٥)

এ ব্যাপারে ফাতাওয়ায়ে রহমানিয়া (১ম খণ্ড, পৃ. ১৬০) আরো উল্লেখ আছে যে, মৃত ব্যক্তিকে ফুলের মালা বা তোড়ার মাধ্যমে যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়, শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। কোন নবী-রাসূল, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন বা কোন বুজুর্গের লাশকে এমনভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার কোন প্রমাণ নেই। এতে যদি মৃত ব্যক্তির কোন উপকার হত, তাহলে অবশ্যই নবী-রাসূল ও বুজুর্গানে দীন এর উপর আমল করতেন। যেহেতু শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই, অতএব ইহা সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। (فتاوي رحيمية ج٥ ص٩٨، فيض الباري ج١ ص٣١١)

উল্লেখ্য যে, কবরে ডাল গাড়ার হুকুম নিয়ে উলামায়ে কিরামের মতানৈক্য রয়েছেঃ একদল মনে করেন, এটা নবী করীম (সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য ছিল। অতএব, এটা অন্য কারো জন্য করা জায়েয নয়। আল্লামা ইবন বাত্তাল ও আল্লামা জাযরী (রহ.) এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, নবী করীম (সাঃ)-কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, তাদের কবরে আযাব হচ্ছে এবং এর সাথে এটাও জানানো হয়েছে যে, ডাল গেড়ে দেয়ার কারণে তাদের এই শাস্তি লাঘব হতে পারে। কিন্তু অন্য কোন ব্যক্তি না কবরবাসীর আযাব হওয়ার জ্ঞান লাভ করতে পারে, না শাস্তি লঘু হওয়ার। এ কারণে অন্যদের জন্য ডাল পুঁতে রাখাও দুরস্ত নয়।

তবে, খলীল আহমদ সাহারানপুরী ও মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) সহ অনেক আলিমের মতে, কবরে ডাল পুঁতে রাখার ব্যাপারটি কোন কোন হাদীস দ্বারা যেহেতু প্রমাণিত, তাই ইহা সরাসরি নিষেধ করা ঠিক নয়। তবে এক্ষেত্রে যাতে সীমালঙ্ঘন না হয়, সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। (بذل المجهود ج١ ص١٥)

بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا ص٤ ঃ দাঁড়িয়ে পেশাব করা

... عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ اَتَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ– (بخاري ج١ ص٣٥ باب البول قائما وقاعدا، ترمذي ج١ ص٩ باب الرخصة في ذلك، نسائي ج١ ص١١ الرخصة في البول في الصحراء قائما، ابن ماجة ص٢٦)

অনুবাদঃ ... হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ময়লা-আবর্জনা ফেলার স্থানের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করেন। অতঃপর তিনি পানি চেয়ে নেন এবং (চামড়ার) মোজার উপর মাসেহ করেন।

বিশ্লেষণঃ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার হুকুম কি, এ নিয়ে ফুকাহায়ে কিরামের সামান্য মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম আহমদ, সাঈদ ইবন মুসায়্যিব, উরওয়া, মুহাম্মদ ইবন সীরীন, ইবরাহীম নাখঈ ও শাবী (রহ.)-এর মতে, দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা শর্তহীনভাবে জায়েয।

(تنظيم الاشتات ج١ ص١٤٥)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

* কোন কোন আহলে যাহির এর বিপরীতে বলেন, দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা হারাম।
* ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, প্রস্রাবের ছিঁটা উড়ে আসার আশংকা না থাকলে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা জায়েয, অন্যথায় মাকরূহ। (درس ترمذي ج١ ص١٩٨)
* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও জমহুরের মতে, ওযর ছাড়া দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা মাকরূহ তানযীহী, হারাম নয়। (بذل المجهود ج١ ص١٧)

দলীল (১)ঃ عَنْ عُمَرَ قَالَ رَاٰنِيْ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبُوْلُ قَائِمًا فَقَالَ يَا عُمَرُ لاَ تَبُلْ قَائِمًا– (ترمذي ج١ ص٩ باب النهى عن البول قائما)

অর্থাৎ, উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) আমাকে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে দেখে বললেন, হে উমর! তুমি দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করো না।

দলীল (২)ঃ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُوْلُ قَائِمًا فَلاَ تُصَدِّقُوْهُ مَا كَانَ يَبُوْلُ اِلاَّ قَاعِدًا– (ترمذي ج١ ص٩، نسائي ج١ ص١١، ابن ماجة ص٢٦)

অর্থাৎ, আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে তোমাদের নিকট বর্ণনা করবে যে, নবী করীম (সাঃ) দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতেন, তোমরা তার কথা বিশ্বাস করো না। তিনি কেবল বসেই প্রস্রাব করতেন।

উল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা হারাম বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা যেহেতু নবী করীম (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে দাঁড়িয়ে প্রস্রাবের প্রমাণ মিলে, তাই উভয় হাদীস একত্র করলে মাকরূহ তানযীহী সাব্যস্ত হয়।

জবাবঃ আহনাফদের পক্ষ থেকে ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীসটি আমরাও স্বীকার করি যে, নবী করীম (সাঃ) জীবনে একবার দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন, তবে তা ছিল ওযরবশত। (যার বর্ণনা পরে আসছে) সুতরাং এর দ্বারা ওযর ছাড়া ঢালাওভাবে জায়েয সাব্যস্ত করা ঠিক নয়।

যদি ব্যাপক আকারে জায়েযই হত, তাহলে তিনি (সাঃ) উমর (রাঃ)-কে সরাসরি নিষেধ করতেন না যে, হে উমর! তুমি দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করো না।

আহলে যাহিরের অভিমতের জবাবঃ তাঁরা শুধু নেতিবাচক হাদীসগুলোর উপর ভিত্তি করে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অথচ নবী করীম (সাঃ) থেকে তো দাঁড়িয়ে প্রস্রাবেরও দলীল পাওয়া যায়। সুতরাং যদি ব্যাপক আকারে হারাম হত, তাহলে নবী করীম (সাঃ) এমনটি কোনক্রমেই করতেন না।

ইমাম মালিকের অভিমতের জবাবঃ আসলে প্রস্রাবের ছিঁটা উড়ে আসার সাথে দাঁড়িয়ে প্রস্রাবের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা শক্ত জায়গায় বসে প্রস্রাব করলেও ছিঁটা উড়ে আসা সম্ভবনা থাকে। ছিঁটা উড়ে আসার মাসআলা ও দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার মাসআলা এক নয়, বরং ভিন্ন।
দাঁড়িয়ে প্রসাব প্রসঙ্গে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.)-এর সুচিন্তিত অভিমত হল, বর্তমানে যেহেতু দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা অমুসলিম ও কাফের-মুশরিকদের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, এজন্য এর খারাপ দিকটি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। আর যে মাকরূহ তানযীহী কাফিরদের বৈশিষ্ট্য হয়ে যায়, ইহার মন্দত্ব বেড়ে যায়। কারণ, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন-

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ– (ابو داود ج٢ ص٥٥٩ كتاب اللباس)

অর্থাৎ, যে যে জাতির সামঞ্জস্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।
সুতরাং বর্তমানে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা জায়েয নয়। আর এর উপরই ফাতওয়া।

<u>নবী করীম (সাঃ) নিজের অভ্যাসের বিপরীত কেন দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছিলেন, এর জবাবে মুহাদ্দিসীনে কিরাম একাধিক জবাব দিয়েছেনঃ</u>
(ক) নবী করীম (সাঃ) দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন জায়েয বর্ণনা করার জন্য। আর এটা উম্মতকে জানিয়ে দেয়া ছিল তাঁর দায়িত্ব। যাতে উম্মত বুঝে নেয় যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে পেশাব করা দূষণীয় নয়।
(খ) অথবা, নবী করীম (সাঃ)-এর হাঁটুতে ব্যথা ছিল। যার ফলে তিনি বসতে পারছিলেন না। (বায়হাকী)
(গ) ঐ স্থানে নাপাকী ছিল। বসলে হয়ত নাপাকী লেগে যাওয়ার আশংকা ছিল।
(ঘ) ইবন খুযাইমা বলেন, প্রথমদিকে দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েয ছিল, পরে তা রহিত (মানসূখ) হয়ে যায়। (درس مشكوة ج١ ص١٠٦)

হাদীসদ্বয়ে দ্বন্দ্বের (تعارض) নিরসনঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হযরত হুযায়ফা (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, নবী করীম (সাঃ) একদা দাঁড়িয়ে প্রস্রাব

করেছেন, পক্ষান্তরে হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসে এর বিপরীত বর্ণিত আছে। অতএব, হাদীসদ্বয়ে দ্বন্দ্বের নিরসনকল্পে মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেন-

(ক) হযরত আয়িশা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর সাধারণ অভ্যাসের বিবরণ দিয়েছেন। আর হুযায়ফা (রাঃ) একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন।

(খ) আয়িশা (রাঃ) নিজের ইলম অনুযায়ী বলেছেন। যা ছিল নবী (সাঃ)-এর বাড়িতে অবস্থানকালীন আমল। কিন্তু সফর অবস্থা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল না। কেননা, তিনি তো সবসময় নবী করীম (সাঃ)-এর সফরসঙ্গী হতেন না। আর হুযায়ফা (রাঃ)-এর হাদীসটি ছিল নবী (সাঃ)-এর সফরের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। অতএব, কোন দ্বন্দ্ব নেই। (عرف الشذى ج٤٥)

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ ص٥

টয়লেট হতে বের হওয়ার দোয়া

... عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ غُفْرَانَكَ– (ترمذي ج١ ص٧ باب اذا خرج من الخلاء، ابن ماجة ص٢٦)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) টয়লেট হতে বের হয়ে 'গুফরানাকা' বলতেন। (অর্থাৎ, ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।)

বিশ্লেষণঃ মানুষ সাধারণত গুনাহ্ করার পর ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। কিন্তু প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে টয়লেটে যাওয়া তথা পায়খানা করা তো কোন গুনাহের কাজ নয়। এরপরেও কেন নবী করীম (সাঃ) ক্ষমা প্রার্থনা বা গুফরানাকা পড়তেন- মুহাদ্দিসীনে কিরাম এ ব্যাপারে অনেক জবাব দিয়েছেনঃ

ক. রাসূলে করীম (সাঃ) সর্বদা যিকির করতেন। কিন্তু শৌচাগারে যবানী যিকিরের ধারা বন্ধ থাকত। এই মৌখিক যিকির বন্ধ থাকার কারণে তিনি ইস্তিগফার পড়তেন। (درس ترمذي ج١ ص١٧٩)

খ. হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন, প্রস্রাব-পায়খানার সময় মানুষ স্বীয় মল-মূত্র তথা নাপাকগুলো প্রত্যক্ষ করে। এসব জাহিরী নাপাক দেখে মানুষ স্বীয় বাতিনী নাপাকগুলোর কথা স্মরণ করে। প্রকাশ থাকে যে, মনে মনে এই স্মরণ করাটাই ইস্তিগফারের কারণ হবে। এজন্য غفرانك বলার তালীম দিয়েছেন।

গ. হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) বলেন, পেশাব-পায়খানা, মল-মূত্র মানুষের দেহ থেকে বেরিয়ে যাওয়া তার সুস্থতা ও জীবনের জন্য আল্লাহ

তাআলার অনেক বড় নেয়ামত। আর এই ইস্তিগফারের বিধান এজন্য যে, মানুষ এই নেয়ামতের শুকরিয়া পুরোপুরি আদায় করতে পারে না।

(درس مشكوة ج١ ص١٥٥–١٥٦، تنظيم الاشتات ج١ ص١٤٥)

ঘ. আল্লামা মাগরিবী (রহ.) বলেন, দুনিয়াতে হযরত আদম (আঃ)-এর সর্বপ্রথম মল-মূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হয়েছিল। তখন এর দুর্গন্ধতে তিনি নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার কুফল এবং স্বীয় ত্রুটির কথা স্মরণ করেছিলেন। অতঃপর এই ধারা তাঁর সন্তানদের মধ্যেও অব্যাহত থাকে। (بذل المجهود ج١ ص٢٠)

ঙ. সর্বোত্তম ব্যাখ্যা দিয়েছেন আল্লামা বিন্নৌরী (রহ.)। তিনি বলেন, এখানে **غفرانك** শব্দটি মূলতঃ শুকরিয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সিবওয়াইহ স্বীয় গ্রন্থে লিখেছেন যে, আরবদের নিকট **غفرانك لا كفرانك** বাগধারাটি প্রসিদ্ধ। এতে **غفرانك** শব্দটি কৃতজ্ঞতার অর্থে এসেছে, যা **كفرانك**-এর বিপরীতে ব্যবহার করার দ্বারা বোঝা গেছে। এই উত্তরটির সমর্থন হাদীসেও পাওয়া যায়-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّيْ الْاَذٰى وَعَافَانِيْ (ابن ماجة ص٢٦ باب ما يقول اذا خرج من الخلاء)

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক অপবিত্র বস্তু বের করে দিয়েছেন এবং আমাকে সুস্থতা দান করেছেন।

بَابُ مَا يُنْهٰى اَنْ يُّسْتَنْجٰى بِهٖ ص٦

যে সমস্ত জিনিস দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ

... عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ انْهَ اُمَّتَكَ اَنْ يَّسْتَنْجُوْا بِعَظْمٍ اَوْ رَوْثَةٍ اَوْ حُمَمَةٍ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لَنَا فِيْهَا رِزْقًا قَالَ فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ– (ترمذي ج١ ص١١ باب كراهية ما يستنجى به)

অনুবাদঃ ... আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জিনদের একটি প্রতিনিধি দল নবী করীম (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনি আপনার উম্মতকে হাড়, গোবর ও কয়লা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করুন। কেননা, মহান আল্লাহ এগুলোর মধ্যে আমাদের জীবিকার ব্যবস্থা রেখেছেন। রাবী বলেন, অতঃপর নবী করীম (সাঃ) এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।

বিশ্লেষণঃ উল্লিখিত হাদীসে হাড়, গোবর ও কয়লা এই তিনটি জিনিস দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করা হয়েছে। শুধু কি এই তিনটি জিনিস দ্বারাই ইস্তিঞ্জা করা মাকরূহ? এর জবাবে বলা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে শুধু উল্লিখিত তিনটি বস্তু দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা মাকরূহ নয়; বরং আরো এমন অনেক বস্তু আছে যার দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা মাকরূহ। যার সঠিক হিসেব দেয়া বেশ কঠিন। তবে সংক্ষিপ্তাকারে বলা যায় যে, ফকীহগণ এর দ্বারা গবেষণা করে নিষেধ বা মাকরূহ হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করেছেন। যে সমস্ত বস্তুতে নিম্নলিখিত কারণসমূহের কোন একটি কারণ পাওয়া যাবে, এর দ্বারাই ইস্তিঞ্জা করা মাকরূহ।

ক. সম্মানের বস্তু দ্বারা। যেমন- টুপি, কাগজ ইত্যাদি।
খ. খাদ্যদ্রব্য দ্বারা। যথা- শুকনা রুটি।
গ. নাপাক বস্তু দ্বারা। যেমন- শুকনা গোবর।
ঘ. ক্ষতিকর বস্তু দ্বারা। যেমন- হাড়।

* আলোচ্য হাদীস দ্বারা একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, গোবর ও হাড় জিনদের খাদ্য হওয়ার অর্থ কি? এর অনেক জবাব রয়েছেঃ

ক. কেউ কেউ বলেছেন, গোবর জিনদের সারের কাজ দেয়। এভাবে এটি তাদের খাদ্যের উপকরণ হয়।

খ. কেউ কেউ বলেছেন, গোবর জিনদের পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অতএব, তাদের পশুদের খাবার মানে জিনদেরই খাবার। যেমন, ইবন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত- وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ– (مسلم ج١ ص١٨٤ كتاب الصلوة باب الجهر بالقراءة الخ)

অর্থাৎ, প্রতিটি শুষ্ক গোবার তোমাদের জন্তুগুলোর খাবার।

গ. কারো কারো মতে, গোবর মূলত জিনদের খোরাক এবং তাদের জন্য এটা থেকে নাপাকী তুলে নেয়া হয়। তাদের জন্য গোবরকে আসল অবস্থায় ফিরিয়ে শস্যে পরিণত করা হয়। যেমন, হাদীসে বর্ণিত আছে-

فَسَأَلُوْنِي الزَّادَ فَدَعَوْتُ اللهَ لَهُمْ اَنْ لاَّ يَمُرُّ بِعَظْمٍ وَّلاَ بِرَوْثَةٍ اِلاَّ وَجَدُوْا عَلَيْهَا طَعَامًا– (بخاري ج١ ص٥٤٤ كتاب المناقب باب ذكر الجن الخ)

অর্থাৎ, অতঃপর তারা (জিন) আমার নিকট খাদ্যের আবেদন করল। তখন আমি তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করলাম যে, তারা যদি কোন হাড় বা শুষ্ক গোবরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে তার মধ্যে যেন তাদের খাবার পায়।

ঘ. হাড় জিনদের খাদ্য হওয়ার অর্থ হল, এই হাড়গুলো জিনদের জন্য গোশতে পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়। যেমন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِيْ اَيْدِيْكُمْ اَوْفَرُ مَا يَكُوْنَ لَحْمًا– (مسلم ج١ ص١٨٤ باب لجهر بالقراءة الخ)

অর্থাৎ, যে সব হাড়ের উপর আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়, যা তোমাদের (জিন) হাতে পড়ে সেগুলো সবচেয়ে বেশি মাংসল হয়ে যায়।

তিরমিযীতে বর্ণিত আছে- كُلُّ عَظْمٍ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِيْ اَيْدِيْكُمْ اَوْفَرُ مَا كَانَ لَحْمًا– (ترمذي ج٢ ص١٦١ ابواب التفسير)

অর্থাৎ, যে সব হাড়ের উপর আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় না, সেগুলো তোমাদের (জিন) হাতে পড়ে সর্বাধিক মাংসল হয়ে যায়।

যদিও বাহ্যিক অর্থে হাদীসদ্বয়ে আল্লাহর নাম স্মরণের ক্ষেত্রে বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর সমাধানে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, হাদীসদ্বয়ের মূল উদ্দেশ্য হল, (যবেহ বা খাওয়ার সময়) হাড়ের উপর আল্লাহর নাম স্মরণ করা হোক বা না হোক, উভয় অবস্থাতেই ইহা জিনদের খোরাকে পরিণত হয়।

কেউ কেউ বলেন, কুকুর যেমন হাড় থেকে খাবার কাজ সারতে পারে, এমনিভাবে জিনরাও। (تنظيم الاشتات ج١ ص١٤٤، درس مشكوة ج١ ص١٥٤، درس ترمذي ج١ ص٢١٥)

আবার কেউ কেউ বলেন, জিনরা হাড়গুলো পাকিয়ে তাদের খাদ্যের উপযোগী করে তুলে। যেমন, তিরমিযীতে ইবন মাসউদের হাদীসে সরাসরি বর্ণিত হয়েছে-

فَاِنَّهُ زَادُ اِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ– (ترمذي ج١ ص١١)

অর্থাৎ, কারণ এগুলো (হাড়) তোমাদের ভাই জিনদের খাদ্য।

بَابُ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالاَحْجَارِ ص٦

পাথর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ يَّسْتَطِيْبُ بِهِنَّ فَاِنَّهَا تُجْزِءُ عَنْهُ– (نسائي ج١ ص١٨ الاجتزاء في الاستطابة الخ)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় গমন করে, তখন সে যেন তার সাথে তিনটি পাথর (কুলুখ) নিয়ে যায়, যা দ্বারা সে পবিত্রতা অর্জন করবে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট।

বিশ্লেষণঃ ইস্তিঞ্জার জন্য পাথর বা ঢিলা ব্যবহারে নির্ধারিত কোন সংখ্যা সুন্নত কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ, ইসহাক, আবু সাওর ও আহলে যাহেরের মতে এবং ইমাম মালিক (রহ.)-এর একটি মত অনুযায়য়ী, ইস্তিঞ্জাতে পরিচ্ছন্নতা ও পাথর বা ঢিলার ক্ষেত্রে তিন সংখ্যা ওয়াজিব এবং বেজোড় সংখ্যা ব্যবহার করাও ওয়াজিব।

(تنظيم الاشتات ج١ ص١٤١)

দলীল (১)ঃ عَنْ سَلْمَانَ ... اَنْ لاَّ يَسْتَنْجِيَ اَحَدُنَا بِاَقَلَّ مِنْ ثَلٰثَةِ اَحْجَارٍ الخ

(ابو داود ج١ ص٣ باب كراهية استقبال القبلة الخ، مسلم ج١ ص١٢٤ باب الايتار في الاستنثار والاستجمار، ترمذي ج١ ص١٠ باب الاستجمار بالحجارة، نسائي ج١ ص١٦ النهي عن الاكتفاء الخ)

অর্থাৎ, ... সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ... আমাদের কেউ যেন তিনটি প্রস্তরের (ঢিলা-কুলুখের) কমে ইস্তিঞ্জা (পবিত্রতা অর্জন) না করে।

দলীল (২)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে পাথর বেজোড় হওয়া এবং তিনটি হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। আর উভয় হাদীসে নির্দেশমূলক শব্দ (صيغة امر) ব্যবহৃত হয়েছে। আর আমর (নির্দেশ) ওয়াজিবের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় (اَلاَمْرُ لِلْوُجُوْبِ)

* ইমাম আবু হানিফা ও সাহাবাইন (আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.)-এর মতে এবং ইমাম মালিক (রহ.)-এর সুপ্রসিদ্ধ মতে, শুধু মলদ্বার পরিষ্কার করা ওয়াজিব। আর পাথর বা ঢিলার সংখ্যা তিনটি হওয়া সুন্নত এবং বেজোড় সংখ্যা হওয়া মুস্তাহাব।

দলীল (১)ঃ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ... مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لاَّ فَلاَ حَرَجَ الخ (ابو داود ج١ ص٦ باب الاستتار في الخلاء، ابن ماجة ص٢٩)

অর্থাৎ, আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, ... যে ব্যক্তি ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করে সে যেন বেজোড় সংখ্যা ব্যবহার করে। যে এরূপ করে, সে উত্তম কাজ করে এবং যে ব্যক্তি এরূপ করে না, এতে কোন ক্ষতি নেই।

উক্ত হাদীসে বেজোড় হওয়াকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, বেজোড় না হলে কোন ক্ষতি নেই। সুতরাং ইহা কোনক্রমেই ওয়াজিব হতে পারে না।

দলীল (২)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে পাথর (ঢিলা)-এর সংখ্যা তিনটিকেই যথেষ্ট বলা হয়েছে।

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ فَقَالَ الْتَمِسْ لِيْ ثَلٰثَةَ اَحْجَارٍ قَالَ فَاَتَيْتُه بِحَجْرَيْنِ وَرَوْثَةٍ فَاَخَذَ بِحَجْرَيْنِ وَاَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ اِنَّهَا الرِّجْسُ– (بخاري ج١ ص٢٧ باب لا يستنجى بروث، ترمذي ج١ ص١٠ باب الاستنجاء بالحجرين، نسائي ج١ ص١٧ الرخصة في الاستطابة بحجرين، ابن ماجة ص٢٧)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য বের হলেন। অতঃপর আমাকে বললেন, তুমি আমার জন্য তিনটি পাথর বা ঢিলা তালাশ করে নিয়ে আস। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি তাঁর নিকট দুটি পাথর এবং গোবরের একটি শুষ্ক টুকরা নিয়ে এলাম। তিনি পাথর বা ঢিলা দুটি গ্রহণ করে শুষ্ক গোবর টুকরাটি ফেলে দিলেন এবং বললেন এটি নাপাক।

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি তিন সংখ্যা ওয়াজিব হত, তাহলে তিনি (সাঃ) আরো একটি পাথর আনার নির্দেশ দিতেন।

যুক্তিভিত্তিক দলীলঃ যদি পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা হয়, আর মলদ্বার এক-দু'বার ধৌত করার দ্বারা যদি নাপাক ও দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়, তাহলে তিন বার ধৌত করা কারো মতেই ওয়াজিব নয়। সুতরাং পাথর বা ঢিলার ক্ষেত্রেও একই হুকুম হওয়া উচিত। কারণ উভয়টির উদ্দেশ্য এক। (درس مشكوة ج١ ص١٥١)

আহনাফদের পক্ষ হতে শাফেঈ ও হাম্বলীদের প্রদত্ত দলীলসমূহের জবাবঃ

(১) যত রেওয়ায়েতে তিনটি পাথরের কথা উল্লেখ রয়েছে তা স্বভাব বা রীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কেননা, সাধারণত তিনটি পাথর বা ঢিলার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যথেষ্ট হয়ে যায়। (২) তিনটি পাথরের দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মুস্তাহাব বুঝানো। ওয়াজিব বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। (৩) হাদীসে যে তিনটি পাথরের সংখ্যা উল্লেখ রয়েছে তা শর্ত হিসেবে নয়, বরং সতর্কতার জন্য। (৪) তিনটি পাথর বা ঢিলা হতেই হবে (ওয়াজিব) এই হাদীসটির বাহ্যিক অর্থের উপর তো শাফেঈগণও আমল করে না। কেননা, কেউ যদি একটি বড় পাথরের তিন কোণার দ্বারা তিন বার মাসেহ করে নেয়, তাহলে তাঁদের (শাফেঈ) নিকটও পবিত্রতা অর্জিত হবে। সুতরাং এতে বুঝা গেল যে, আসল উদ্দেশ্য তাঁদেরও তিন পাথর নয়, বরং তিন বার মাসেহ করা। উল্লেখ্য যে, পাথর বা ঢিলা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা তখনই যথেষ্ট হবে, যখন নাপাকী বের হওয়ার স্থান থেকে এক দিরহামের অধিক ছড়িয়ে না পড়ে। অন্যথায় পানি দ্বারা শৌচকর্ম করা আবশ্যক হবে। (درس ترمذي ج١ ص٢١٠)

নবী করীম (সাঃ)-এর যুগে যেহেতু শুকনা জাতীয় খাবার খাওয়া হত, তখন তাঁদের মলও ছিল শুকনা, ফলে পায়খানা এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ত না। যেমন, ছাগল বা ঘোড়ার মল। কিন্তু বর্তমানে মানুষ যেহেতু তৈলাক্ত খাবারে অভ্যস্ত এবং পায়খানা শুকনা না হওয়ার কারণে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে পবিত্রতা অর্জনের জন্য সীমিত সংখ্যক পাথর বা কুলুখ যথেষ্ট নাও হতে পারে। তাই পানি ব্যবহার করাটাই সমীচীন। (درس مشكٰوة ج١ ص١٠٧)

بَابُ السِّوَاكِ ص٧ ঃ মিসওয়াক করা

... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهٗ قَالَ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ لاَمَرْتُهُمْ بِتَاْخِيْرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ– (بخاري ج١ ص١٢٢ السواك يوم الجمعة، مسلم ج١ ص١٢٨ باب السواك، ترمذي ج١ ص١٢ باب في السواك، نسائي ج١ ص٦ الرخصة في السواك الخ، ابن ماجة ص٢٥)

অনুবাদঃ ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যদি আমি মুমিনদের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তবে তাদেরকে এশার নামায বিলম্বে (রাত্রির এক-তৃতীয়াংশের পর) পড়তে ও প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করতে নির্দেশ দিতাম।

বিশ্লেষণঃ উক্ত অনুচ্ছেদে দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হবেঃ
(ক) মিসওয়াকের শরঈ মর্যাদা।
(খ) মিসওয়াক কি নামাযের সুন্নত নাকি অযুর সুন্নত?

প্রথম আলোচনাঃ মিসওয়াকের শরঈ মর্যাদা সম্পর্কে সামান্য মতবিরোধ রয়েছে।
* ইমাম ইসহাক ও দাউদ যাহেরী (রহ.) থেকে দুটি মত বর্ণিত আছে। একটি হল, মিসওয়াক করা সুন্নত। অপরটি হল ওয়াজিব।
দলীলঃ "আল জামিউস্ সগীর" গ্রন্থে রাফে ইবন খাদীজ (রাঃ)-এর একটি রেওয়ায়েত- اَلسِّوَاكُ وَاجِبٌ وَغُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ অর্থাৎ, মিসওয়াক করা এবং জুমুআর গোসল করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব ।

* জমহুরের মতে, মিসওয়াক করা সুন্নত; ওয়াজিব নয়। আল্লামা নববী (রহ.) মিসওয়াক সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা (ঐকমত্য) রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে নবী করীম (সাঃ) প্রত্যেক নামাযে মিসওয়াক করতে নির্দেশ দেয়ার কেবল ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা বাস্তবে নির্দেশ দেননি।

জবাবঃ (১) উল্লিখিত ইমামদ্বয়েরও প্রসিদ্ধ মত হল, মিসওয়াক সুন্নত।
(২) ইজমার পরিপন্থী মাত্র দুই মনীষীর মিসওয়াক ওয়াজিব হওয়ার উক্তিতে তেমন কিছু আসে যায় না। (درس ترمذي ج١ ص٢٢٢-٢٢٣)
(৩) হাফিজ ইবন হাজার আসকালানী (রহ.) "তালখীসুল হাবীর" গ্রন্থে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করার পর লিখেন- إِسْنَادُ وَاهٍ অর্থাৎ এ হাদীসটির সনদ দুর্বল। অতএব, এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা ঠিক নয়।

দ্বিতীয় আলোচনাঃ মিসওয়াক নামাযের সুন্নত নাকি অযুর সুন্নত, এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ
* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, মিসওয়াক নামাযের সুন্নত, অযুর সুন্নত নয়।
দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ বলে প্রত্যেক নামাযের কথা বলা হয়েছে, প্রত্যেক অযুর কথা বলা হয়নি।

* আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, মিসওয়াক অযুর সুন্নত, নামাযের সুন্নত নয়।
বস্তুত উল্লিখিত মতানৈক্যের তাৎপর্য এই যে, যদি কোন ব্যক্তি অযু এবং মিসওয়াক করে এক ওয়াক্তের নামায আদায় করে, অতঃপর ঐ অযু দ্বারা অন্য নামায পড়তে চায় তাহলে ইমাম শাফেঈ রহ.-এর মতে, নতুনভাবে মিসওয়াক করা মাসনূন হবে। আর ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে, যেহেতু ইহা অযুর সুন্নত, এজন্য দ্বিতীয়বার মিসওয়াক করার প্রয়োজন হবে না।

দলীল (১)ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-
لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ مَعَ الْوُضُوْءِ (مستدرك حاكم ج١ ص١٤٦)
অর্থাৎ, আমি যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে তাদের উপর অযুর সাথে মিসওয়াক করাকে আবশ্যক করে দিতাম।

দলীল (২)ঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-
لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوْءِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ- (اثار السنن ص٢٩)
অর্থাৎ, আমি যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে প্রতিটি নামাযের ক্ষেত্রে অযুর সময় তাদের মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

দলীল (৩)ঃ হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত মারফূ হাদীস-

لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وَضُوْءٍ (مجمع الزوايد ج١ ص٢٢١)

দলীল (৪)ঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وَضُوْءٍ (ابن ماجة)

উপরোল্লিখিত হাদীস সমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, মিসওয়াক অযুর সুন্নত, নামাযের সুন্নত নয়।

আকলী (বুদ্ধিভিত্তিক) দলীলঃ মিসওয়াক পবিত্রতা অর্জনের একটি মাধ্যম, এর সম্পর্ক পবিত্রতার (অযু) সাথে, নামাযের সাথে নয়। যেমন হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর সনদে বর্ণিত আছে- اَلسِّوَاكُ مُطَهِّرَةٌ لِّلْفَمِ وَمَرْضَاتٌ لِّلرَّبِّ– (نسائي ج١ ص٥ باب

الترغيب في السواك، بخاري ج١ ص٢٥٩ باب السواك الرطب الخ)

অর্থাৎ, মিসওয়াক মুখ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করার উপকরণ এবং প্রভুর সন্তুষ্টির কারণ। আর তাই দেখা যায়, মিসওয়াকের অনুচ্ছেদটি পবিত্রতার অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, নামাযের অধ্যায়ে নয়।

জবাবঃ শাফেঈদের প্রদত্ত দলীলের জবাবে আহনাফগণ বলেন-

(১) এখানে একটি مُضَاف (সম্বন্ধকৃত বিশেষ্য) উহ্য আছে। আর তা হল وضوء অর্থাৎ মূল বাক্যটি হবে এরূপ- عند وضوء كل صلٰوة অর্থাৎ প্রত্যেক নামাযের অযুর সময় মিসওয়াক করা সুন্নত। যা হানাফীদের দলীলসমূহ দ্বারা সুস্পষ্ট।

(২) নামাযযুক্ত রেওয়ায়েতগুলোতে প্রত্যেকটি স্থানে عند (নিকটে, কাছে) শব্দ এসেছে, যা প্রকৃত মিলন বুঝায় না, বরং মিসওয়াক এবং সালাতের মাঝে যদি কিছু দেরিও হয়, তবুও তার ক্ষেত্রে عند كل صلٰوة প্রয়োগ হতে পারে, এর পরিপন্থী হানাফীদের রেওয়ায়েতগুলোতে কোন কোন স্থানে مع (সঙ্গে, সাথে) শব্দ বর্ণিত হয়েছে। যা প্রকৃত মিলন বুঝায়। আর এটি অযুর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

(৩) রেওয়ায়েতগুলো দ্বারা কোথাও প্রমাণিত হয় না যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে দাঁড়ানোর পূর্বক্ষণে মিসওয়াক করতেন।

(৪) যদি নামাযের সময় মিসওয়াক সুন্নত হয়, তবে কোন কোন সময় কারো দাঁত থেকে রক্ত বের হওযার সম্ভাবনা রয়েছে। যা হানাফীদের মতে অযু ভঙ্গের কারণ। শাফেঈদের মতেও অপছন্দনীয়। যা নামাযের একাগ্রতা বিনষ্টকারী। সুতরাং এসব কারণে মিসওয়কের যথার্থ স্থান অযুই মনে হয়। (درس ترمذي ج١ ص٢٢٣–٢٢٤)

بَابُ فَرْضِ الْوُضُوْءِ ص٩ ঃ অযু ফরয হওয়া

... عَنْ اَبِي الْمَلِيْحِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِّنْ غُلُوْلٍ وَلاَ صَلٰوةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ– (بخاري ج١ ص٢٥ باب لا تقبل صلٰوة بغير طهور، مسلم ج١ ص١١٩ باب وجوب الطهارة للصلٰوة، ترمذي ج١ ص٣ لا تقبل صلٰوة بغير طهور، نسائي ج١ ص٣٣ باب فرض الوضوء، ابن ماجة ص٢٤)

অনুবাদঃ ... আবুল মালীহ্ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা অসদুপায়ে অর্জিত ধন-সম্পদে সদকা করলে কবুল করেন না এবং পবিত্রতা (অযু) ব্যতীত কোন নামায কবুল করেন না।

বিশ্লেষণঃ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে অযু ব্যতীত নামায কবুল হবে না। একথা তো সর্বজনবিদিত যে, কোন নামাযই অযু ব্যতীত শুদ্ধ হবে না। কিন্তু জানাযার নামায এবং সিজদায়ে তিলাওয়াত অযু ব্যতীত শুদ্ধ হবে কিনা- এ নিয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম শাবী, মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী এবং ইবন উলাইয়্যার মতে, জানাযার নামায অযু ব্যতীত পড়া জায়েয আছে। এমনিভাবে উল্লিখিত ইমামগণসহ ইমাম বুখারীর মতে, সিজদায়ে তিলাওয়াতও অযুবিহীন জায়েয আছে। (تنظيم ج١ ص١١٨)

দলীল (১)ঃ হাদীসে সাধারণভাবে (مطلقا) নামাযের কথা বলা হয়েছে। নামায সাধারণ হওয়ার বিষয়টি কেবলমাত্র পূর্ণাঙ্গ নামাযের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। আর জানাযার নামায ও সিজদায়ে তিলাওয়াত হল অপূর্ণাঙ্গ। কেননা, জানাযাতে রুকু-সিজদা নেই এবং সিজদায়ে তিলাওয়াতেও রুকু নেই।

দলীল (২)ঃ তাছাড়া বুখারীতে ইবন উমর (রাঃ)-এর আমল বর্ণিত আছে-
كَانَ يَسْجُدُ عَلٰى غَيْرِ وُضُوْءٍ– অর্থাৎ, তিনি অযুবিহীন সিজদা (তিলাওয়াত) করতেন।

* চার ইমাম (ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেঈ, আহমদ), সাহাবা, তাবেঈন ও জমহুরের মতে, নামায চাই ফরয হোক কিংবা নফল, জানাযার নামায হোক বা সিজদায়ে তিলাওয়াত হোক, অযু ছাড়া জায়েয নয়। (تنظيم ج١ ص١١٨)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ উক্ত হাদীসে صلوة (যেকোন নামায) শব্দটি نكرة (অনির্দিষ্ট) যা نفي (না-সূচক অব্যয়)-এর পরে ব্যবহৃত হয়েছে। আর আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী অনির্দিষ্ট কোন শব্দ যখন না-সূচক অব্যয়ের পরে ব্যবহৃত হয়, তখন তা সামগ্রিকতা (عموم)-এর অর্থ জ্ঞাপন করে। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসে বর্ণিত সালাতের অর্থ হবে যেকোন নামায, হোক জানাযার নামায কিংবা সিজদায়ে তিলাওয়াত। কারণ সিজদায়ে তিলাওয়াতও এক ধরনের নামায। যেমন পবিত্র কুরআনে সিজদা বলে পূর্ণ নামায বুঝানো হয়েছে- وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيْلاً অর্থাৎ, আপনি রাতে সিজদা করুন ও দীর্ঘ রাত পর্যন্ত আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (দাহরঃ ২৬)

আর জানাযাও যে এক প্রকার নামায, তার সমর্থন পাওয়া যায় নবী করীম (সাঃ)-এর বাণীতে- صَلُّوْا عَلٰى اَخِيْكُمُ النَّجَاشِيِّ

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের ভাই নাজ্জাশীর (জানাযার) নামায পড়।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ প্রকৃতপক্ষে বুখারী শরীফে বর্ণিত বাক্যাংশটি বিতর্কের উCaŸ নয়। কেননা, উসাইলীর কপিতে এর বিপরীত উল্লেখ আছে- كَانَ يَسْجُدُ عَلٰى وُضُوْءٍ আর নিয়ম হল, যখন একই রেওয়ায়েত পরস্পর অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখন উভয়টি পরিত্যক্ত হিসেবে গণ্য হবে (اذا تعارضا تساقطا)।

(درس مشكوة ج١ ص١٣٢، درس ترمذي ج١ ص١٥٥–١٥٦)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ فَاقِدُ الطَّهُوْرَيْنِ অর্থাৎ যার নিকট অযুর জন্য পানি কিংবা তায়াম্মুমের জন্য মাটি কোনটিই নেই, এমন ব্যক্তি কি করবে, এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে বেশ মতানৈক্য রয়েছেঃ

*ইমাম মালিক (রহ.)-এর অভিমত হল, এরূপ ব্যক্তি থেকে নামায রহিত (سَاقِط) হবে। অর্থাৎ তার জন্য তখন নামায পড়া জরুরী নয় এবং পরে কাযাও করতে হবে না।

* আল্লামা মুযানী, ইবনুল মুনযির ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর সুপ্রসিদ্ধ অভিমত হল, এমতাবস্থায় নামায আদায় করে নেয়া ওয়াজিব, পরবর্তীতে কাযা করা ওয়াজিব নয়।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর বিশুদ্ধতম মত হল, এমতাবস্থায় নামায আদায় করা ওয়াজিব এবং পরে কাযা করাও ওয়াজিব। এছাড়াও তাঁর থেকে আরো তিনটি মত পাওয়া যায়ঃ

(ক) ইমাম আহমদ (রহ.)-এর অনুরূপ, (খ) তখন নামায পড়া হারাম। পরবর্তীতে কাযা করা ওয়াজিব। আওযাঈ এবং সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর অভিমতও তাই। (গ) এমতাবস্থায় মুস্তাহাব হিসেবে নামায পড়ে নিবে এবং পরবর্তীতে কাযা করা ওয়াজিব।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, ঠিক ঐ সময়ে নামায পড়বে না; বরং নামাযের শেষ সময় পর্যন্ত পানি বা মাটির জন্য অপেক্ষা করবে। এরপরও যদি পানি বা মাটি না পায়, তাহলে সে নামায পড়বে না, বরং পরবর্তীতে তা কাযা করা ওয়াজিব। (بذل المجهود ج١ ص٣٨)

* সাহেবাইন (আবু ইউসূফ ও মুহাম্মদ রহ.)-এর মতে, এমন ব্যক্তি শুধুমাত্র নামাযের ভান করবে, কিন্তু কোন কিছু পাঠ করবে না। তবে পরবর্তীতে তার উপর কাযা আবশ্যক। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এরও এই মতের দিকে প্রত্যাবর্তন প্রমাণিত আছে। আর হানাফীদের এর উপরই ফাতওয়া। এ উক্তিটি ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে অধিক যুক্তিসঙ্গত এবং শরীয়তে এর নযীরও পাওয়া যায়। যেমন কোন শিশু যদি রমযানের দিনে বালেগ হয় অথবা কোন কাফির মুসলমান হয় অথবা কোন ঋতুবতী মহিলা পবিত্রতা লাভ করে, তবে তাদেরকে রোযাদারদের অনুকরণে অবশিষ্ট দিন খানা-পিনা, সহবাস থেকে বিরত থাকবে এবং পরবর্তীতে কাযা করে নিবে। (فتح الملهم ج٢ ص٢٨٧)

দলীলঃ ... عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ عَمِّهٖ اَنَّ اَسْلَمَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هٰذَا قَالُوْا لاَ قَالَ فَاَتِمُّوْا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوْهُ– (ابو داود ج١ ص٣٣٢ باب في فضل صومه)

অর্থাৎ, ... আব্দুর রহমান ইবন মাসলামা তাঁর চাচা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা আসলাম গোত্রের লোকেরা নবী করীম (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হলে, তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি এ দিন রোযা রেখেছ? তারা বলেন, না। তিনি বলেন, তোমরা বাকি দিন আর কিছু না খেয়ে রোযা কর এবং পরে এ দিনের রোযার কাযা আদায় করবে।

উক্ত হাদীসটিতে অনুকরণের হুকুম দেয়া হয়েছে।

بَابُ مَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ ص٩ ঃ যা দ্বারা পানি অপবিত্র হয়

... عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ

الْخَبَثَ– (ترمذي ج١ ص٢١ باب ان الماء لا ينجسه شيئ، نسائي ج١ ص٦٣ باب التوقيت في الماء، ابن ماجة ص٤٠)

অনুবাদঃ ... উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, যে পানিতে চতুষ্পদ জন্তু ও হিংস্র প্রাণী পানি পান করার জন্য পুনঃপুনঃ আগমন করে এবং তা যথেচ্ছা ব্যবহার করে। সে পানির হুকুম কি? তিনি বলেন, যখন উক্ত পানি, দুই কুল্লা (মটকা) পরিমাণ হয়, তখন নাপাক হয় না।

বিশ্লেষণঃ পানির পবিত্রতা ও অপবিত্রতা সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ
* ইমাম মালিক, দাউদ যাহেরী ও হাসান বসরী (রহ.)-এর মতে, যতক্ষণ পর্যন্ত পানির তিনটি গুণ (রং, গন্ধ, স্বাদ) থেকে কোন একটি গুণ পরিবর্তিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে নাপাক পতিত হলেও অপবিত্র হবে না। পানির পরিমাণ কম হোক অথবা বেশি হোক।

দলীলঃ ... عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِيْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِيْرٌ يُطْرَحُ فِيْهَا الْحِيَضُ وَلَحْمُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَاءُ طَهُوْر لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْئٌ– (ابو داود ج١ ص٩ باب في بير بضاعة، ترمذي ج١ ص٢١، نسائي ج١ ص٦٢ باب ذكر بير بضاعة)

অর্থাৎ, ... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, আমরা কি বুদাআ কূপের পানি দ্বারা অযু করতে পারি? কূপটি এমন ছিল যেখানে স্ত্রীলোকদের হায়েযের নেকড়া, কুকুরের গোশত এবং দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ করা হয়। জবাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, পানি পবিত্র, তাকে কোন কিছু অপবিত্র করতে পারে না।
উক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একটি ছোট্ট কূপে এতকিছু নাপাক জিনিস নিক্ষেপের পরেও নবী করীম (সাঃ) শর্তহীনভাবে পানিকে পাক বলেছেন। অতএব, পানির পরিমাণ কম হোক অথবা বেশি হোক, তাতে কিছু আসে যায় না।

* আবু হানিফা, শাফেঈ, আহমদ, ইসহাক, মুজাহিদ (রহ.) ও ইবন উমর (রাঃ)-এর মতে, যদি পানির পরিমাণ কম হয়, তাহলে নাপাক পতিত হলে তা অপবিত্র হয়ে যাবে। যদিও এর একটি গুণও পরিবর্তিত না হয়। আর যদি পানি বেশি হয়, তবে নাপাক হবে না, যতক্ষণ না এর অধিকাংশ গুণ পরিবর্তিত হয়। মোটকথা,

হানাফী ও শাফেঈদের মতে, পানি পাক ও নাপাক হওয়া পানি কম ও বেশি হওয়ার উপর নির্ভর করবে। (بذل المجهود ج١ ص٤٣)

উল্লেখ্য যে, তাঁদের মতে, কম পানি ও বেশি পানির পরিমাণ কতটুকু, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, পানি যদি দু' কুল্লা (মটকা) বা এর চেয়ে বেশি হয়, তাহলে তাকে বেশি পানি বলা হবে, আর এর চেয়ে কম হলে একে কম পানি বলা হবে।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, কম ও বেশি পানির সুনির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই। তাঁর মতে, এ বিষয়টি অভিজ্ঞ বা যাচাইকারী ব্যক্তির মতের উপর ছেড়ে দিতে হবে। তিনি যদি পানি দেখে বলেন, ইহা কম তাহলে কম এবং বেশি বললে বেশি পানি হিসেবে মেনে নিতে হবে।

তবে, কেউ কেউ বেশি পানির পরিমাণ বুঝাতে গিয়ে বলেন-

* ইমাম কুদূরী (রহ.)-এর মতে, পানির এক পার্শ্ব নাড়া দিলে যদি অন্য পার্শ্ব না নড়ে, তাহলে বুঝতে হবে ইহা বেশি পানি।

* ইমাম আবু ইউসূফ (রহ.) বলেন, যে পানিতে নাপাকীর ছাপ অন্যদিকে না পৌঁছে, তাই বেশি পানি।

* আবার কেউ কেউ বলেন, পানিতে রং দিলে, তা যদি সমস্ত পানিতে বিস্তার লাভ না করে, তবে তা বেশি পানি।

* পরবর্তীতে কোন কোন ফুকাহায়ে কিরাম সাধারণ মানুষের সুবিধার দিকে লক্ষ্য করে আবু সুলাইমান (রহ.) কর্তৃক (ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মসজিদের উপর কিয়াস করে) প্রদত্ত হিসেব গ্রহণ করে বলেন, যে জলাশয় দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে দশ হাত দশ হাত (১০x১০= ১০০ বর্গহাত), তাই অধিক পানি। (لمعات التنقيح ج٢ ص١٣٧)

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দলীলসমূহঃ

১. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِيْ الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ– (ابو داود ج١ ص١٠ باب البول في الماء الراكد، بخاري ج١ ص٣٧ باب البول في الماء الدائم، مسلم ج١ ص١٣٨ باب النهي عن البول في الماء الراكد، ترمذي ج١ ص٢١ باب كراهية البول في الماء الراكد، نسائي ج١ ص٢١ باب الماء الدائم)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (সাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ যেন এমন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে, যার দ্বারা সে গোসল করবে।

দলীল (২)ঃ হযরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত-

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُهُوْرُ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ اِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ اَنْ يُّغْسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ اُوْلٰهُنَّ بِالتُّرَابِ– (ابو داود ج۱ ص۱۰ باب الوضوء بسور الكلب، بخاري ج۱ ص۲۹ اذا شرب الكلب في الانآء، مسلم ج۱ ص۱۳۷ باب حكم ولوغ الكلب، ترمذي ج۱ ص۲۷ باب سور الكلب، نسائي ج۱ ص۲۲ سور الكلب، ابن ماجة ص۳۰)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, কুকুর যদি তোমাদের কারো পাত্রে লেহন করে (খায় বা পান করে), তবে তা পাক করার নিয়ম হল, তা সাতবার পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে, প্রথমবার মাটি দ্বারা ঘর্ষণ করতে হবে।

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْاِنَاءِ حَتّٰى يُفْرِغُ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلٰثًا فَاِنَّه لاَ يَدْرِيْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ– (ترمذي ج۱ ص۱۳ باب اذا استيقظ احدكم الخ، بخاري ج۱ ص۲۸ باب الاستجمار وترا، مسلم ج۱ ص۱۳٦ باب كراهية غسل المتوضى الخ، نسائي ج۱ ص٤)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন রাত্রে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়, তখন যেন সে হাত দু'বার অথবা তিনবার না ধুয়ে পানির পাত্রে প্রবিষ্ট না করে। কারণ রাত্রে তার হাত কোথায় ছিল, সে তা জানে না।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহে পানির তিনটি গুণের মধ্যে কোন একটির পরিবর্তন হওয়ার শর্ত উল্লেখ নেই কিংবা দুই কুল্লার (মটকা) শর্তারোপও করা হয়নি।

জবাবঃ ইমাম মালিক (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ (১) এ হাদীসের নিঃশর্ততা ও ব্যাপকতার উপর স্বয়ং ইমাম মালিক (রহ.)ও আমল করেন না। কারণ, এ হাদীসের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা বুঝা যায়, যদি পানির গুণাবলী পরিবর্তিত হয়ে যায় তবুও পবিত্র থাকবে, নাপাক হবে না। অথচ ইমাম মালিক (রহ.) এর প্রবক্তা নন। বরং তাঁর নিকট পানির পবিত্রতার জন্য তার তিনটি গুণই অপরিবর্তিত থাকা বাঞ্ছনীয়।

(২) বুদাআ কূপের বর্ণনায় ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন-

ثُمَّ ذَرَعْتُهُ فَاِذَا عَرْضُهَا سِتَّةُ اَذْرُعٍ– (ابو داود ج۱ ص۹)

অর্থাৎ, অতঃপর আমি কূপটি মেপে দেখি যে, এর প্রস্থ ছয় হাত পরিমাণ।

উক্ত হাদীসে আরো বর্ণিত আছে যে, তাতে পানি সর্বনিম্ন হাঁটু আর সর্বোচ্চ নাভি পর্যন্ত থাকত। অতঃপর এটা কিভাবে সম্ভব যে, তাতে হায়েযের কাপড় এবং মৃত

কুকুরের গোশত নিক্ষেপ করা হবে, অথচ এ পানির তিনটি গুণ অপরিবর্তিত থাকবে? অতএব, যদি হাদীসের বাহ্যিক অর্থের উপর আমল করতে হয়, তাহলে পানির গুণ পরিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও পবিত্র বলা উচিত। অথচ স্বয়ং ইমাম মালিকও এর প্রবক্তা নন।

(৩) আবু নছর বাগদাদী (রহ.) বলেন, বুদাআ কূপ থেকে প্রচুর পরিমাণ পানি উঠানো হত। ফলে সকল নাপাকী তা থেকে দূর হয়ে যেত। সাহাবাগণের সেখান থেকে নাপাকী উত্তোলনের পরও সংশয় হলে নবী করীম (সাঃ) উক্তিটি করেছিলেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই নয় যে, পানিতে নাপাকী পড়লেও তা নাপাক হবে না।

(تنظيم الاشتات ج١ ص١٧٧)

(৪) ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, বুদাআ কূপের পানি ছিল প্রবহমান। কেননা, কোন কোন রেওয়ায়েতে এসেছে যে, এর পানি দ্বারা বাগানগুলোতে সেচ দেয়া হত।

(تلخيص الحبير ج١ ص١٤)

(৫) আল্লামা ইবন হুমাম (রহ.) বলেন, اَلْمَاءُ শব্দটিতে ব্যবহৃত الف لام টি عهد خارجي বা সুনির্দিষ্ট বস্তু বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা বিশেষভাবে উদ্দেশ্য বুদাআ কূপের পানি। আর لَا يُنَجِّسُهُ شَيْئٌ-এর অর্থ হল, তোমাদের সন্দেহ-সংশয় কোন কিছু এটাকে নাপাক করে না। কেননা, জাহেলী যুগে এতে বিভিন্ন রকমের নাপাক ময়লা ফেললেও ইসলামের পর এই ধারা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু এরপরও সন্দেহ হচ্ছিল যে, ইহা আসলে পাক কিনা। ফলে নবী করীম (সাঃ) উক্তিটি করেছিলেন।

(৬) কেউ কেউ বলেন, হাদীসটির সনদে ইযতিরাব (গরমিল) রয়েছে।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.) কর্তৃক প্রদত্ত কুল্লাতাইন (দুই মটকা) হাদীসের জবাবঃ (১) 'হিদায়া' গ্রন্থকার আল্লামা বুরহানুদ্দীন (রহ.) এর জবাবে বলেন, হাদীসে বর্ণিত لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ-এর অর্থ শাফেঈগণ যা গ্রহণ করেছে তা নয়; বরং এর অর্থ হল- দুই কুল্লা পানি ইহা নাপাকীকে ধারণ করতে অক্ষম অর্থাৎ অপবিত্র হয়ে যায়। (২) এই হাদীসটি দুর্বল (যঈফ)। কেননা, এ হাদীসের সনদ মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের উপর নির্ভর। আর তিনি হলেন যঈফ (দুর্বল) রাবী। সুতরাং ইহা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

(৩) হাদীসটির সনদ, মতন, অর্থ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ গরমিল ও অসঙ্গতি (اضطراب) রয়েছে।

সনদের গরমিলঃ কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে-

عن محمد بن جعفر بن الزبير عن الزهري عن سالم عن ابن عمر কোন রেওয়ায়েতে-

আবার কোন রেওয়ায়েতে- عن محمد بن عباد بن جعفر ইত্যাদি অবস্থায় বর্ণিত আছে। তাছাড়া আবু দাউদ (রহ.)-এর মতে হাদীসটি মাওকূফ এবং তিরমিযী (রহ.)-এর মতে হাদীসটি মারফূ।

মতনের (মূল পাঠ) গরমিলঃ এক রেওয়ায়েতে এসেছে اذا كان الماء قلتين আবার কোনটিতে قلتين او ثلاثا আবারো কোন সূত্রে اربعين قلة। বর্ণিত হয়েছে।

অর্থের গরমিলঃ কামূস গ্রন্থকারের মতে, কুল্লার বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। যেমন- পাহাড়ের চূড়া, মানুষের কাঠামো, মটকা ইত্যাদি।

উদ্দেশ্য বা বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে গরমিলঃ আল্লামা ইবন নুজাইম (রহ.) বলেন, যদি কুল্লাহর অর্থ মটকা মেনে নেয়া হয়, যা ইমাম শাফেঈ (রহ.) গণ্য করেছেন; তবুও প্রশ্ন জাগে যে, মটকা কত বড় হবে? যেহেতু হাদীসে এটি সুনির্দিষ্ট করা হয়নি।
অনেকে অবশ্য এসব গরমিলের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানেরও প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তথাপি হাদীসে ব্যবহৃত কুল্লার সঠিক ও সুনির্দিষ্ট পরিমাণ কি, তা অভিধান, কোন বর্ণনা বা অন্য কোনভাবেই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কাজেই এমন একটি অস্পষ্ট অর্থবোধক শব্দের হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা অসম্ভব এবং ইজমার পরিপন্থী। (لمعات التنقيح ج٢ ص١٣٧)

بَابُ الْوُضُوْءِ بِسُوْرِ الْكَلْبِ ص١٠

কুকুরের লেহনকৃত পাত্র ধৌত করা

... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طُهُوْرُ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ اِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ اَنْ يَّغْسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ اُوْلٰهُنَّ بِالتُّرَابِ– (بخاري ج١ ص٢٩ اذا شرب الكلب في الاناء، مسلم ج١ ص١٣٧ باب حكم ولوغ الكلب، ترمذي ج١ ص٢٧ باب سور الكلب، نسائي ج١ ص٢٢ سور الكلب، ابن ماجة ص٣٠)

অনুবাদঃ ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, কুকুর যদি তোমাদের কারো পাত্রে লেহন করে (খায় বা পান করে), তবে তা পাক করার নিয়ম এই যে, তা সাতবার পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে, প্রথমবার মাটি দ্বারা ঘর্ষণ করবে।

বিশ্লেষণঃ এই অনুচ্ছেদে দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হবে-
(১) কুকুরের ঝুটা পাক বা নাপাক হওয়া সম্পর্কে।
(২) কুকুরের ঝুটা পবিত্র করার পদ্ধতি সম্পর্কে।

প্রথম আলোচনাঃ কুকুরের ঝুটা পবিত্র না অপবিত্র, এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ
* ইমাম মালিক ও বুখারী (রহ.)-এর মতে, কুকুরের গোশত পাক। সুতরাং এর ঝুটাও পাক।
দলীল (১)ঃ আল্লামা তাআলার বাণী-

اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْدَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهُ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا–

অর্থাৎ, কিন্তু মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের মাংস- এটা অপবিত্র অথবা অবৈধ। (আনআমঃ ১৪৫, বাকারাঃ ১৭৩, মায়েদাঃ ৩, নাহলঃ ১১৫)
উক্ত আয়াতে হারাম বস্তুর তালিকার মধ্যে কুকুরের উল্লেখ নেই। এতে বুঝা যায় যে, এর ঝুটা পাক।

দলীল (২)ঃ فَكُلُوْا مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ, যে শিকারী জন্তু শিকারকে তোমাদের জন্যে ধরে রাখে, তোমরা তা ভক্ষণ কর। (মায়েদাঃ ৪)
উক্ত আয়াতেও আল্লাহ তাআলা শিকারী কুকুরের শিকারকৃত পশু খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। অথচ দাঁত দিয়ে শিকার করার কারণে গোশতে অবশ্যই লালা লেগেছে। এতেও প্রমাণিত হয় যে, কুকুরের ঝুটা পাক।

দলীল (৩)ঃ ইবন উমর (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, মসজিদে নববীর ভিতর দিয়ে কুকুর আসা-যাওয়া করত, কিন্তু তাতে পানি ঢালা হত না। অথচ কুকুরের স্বভাব হল যেদিকেই যাবে লালা পড়তে থাকে। এতেও প্রমাণিত হয় যে, কুকুরের ঝুটা পাক। (بخاري ج١ ص٢٩)

* ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, কুকুরের গোশত নাপাক এবং এর ঝুটাও নাপাক। (شرح مسلم ج١ ص١٣٧)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰئِثَ

অর্থাৎ, তাদের জন্য তিনি যাবতীয় খবীছ (অপবিত্র) বস্তু হারাম করেন। (আরাফঃ ১৫৭)
আর কুকুরও খবীছ বা অপবিত্র। অতএব, এর ঝুটা নাপাক এবং এর গোশতও নাপাক।

দলীল (২)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে সাত বার পানি দিয়ে ধোয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে পবিত্র করার জন্য। আর পবিত্র করতে হয় নাপাক জিনিসকে। এতে প্রমাণিত হয় যে, কুকুরের ঝুটা নিঃসন্দেহে নাপাক।

দলীল (৩)ঃ এছাড়া মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, কুকুরের লেহনকৃত খাদ্য যেন ফেলে দেয়া হয়। অথচ কোন বস্তু অযথা নষ্ট করা হারাম। সুতরাং যদি নাপাকই না হত তাহলে ফেলে দেয়ার হুকুম দেয়া হত না। (مسلم ج١ ص١٣٧)

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ পবিত্র কুরআনে কুকুর বা অন্য কোন জন্তু ও বস্তু উল্লেখ না থাকা ইহা হালার হওয়ার দলীল হতে পারে না। কেননা, এমন অনেক জিনিস রয়েছে যা হাদীসের দ্বারা হারাম করা হয়েছে, কিন্তু পবিত্র কুরআনে উল্লেখ নেই। এমন অনেক পশু-পাখি রয়েছে যেগুলোকে স্বয়ং ইমাম মালিক (রহ.)ও হারাম বলে থাকেন, যা কুরআনে উল্লেখ নেই।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ আয়াতটির উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, শিকারী কুকুরের শিকারকৃত পশুকে (কিছু শর্তসাপেক্ষে) যবেহ করা ব্যতীত তা ভক্ষণ করা হালাল। কিন্তু তা কোন্ পদ্ধতিতে খাবে, তা তো অন্যান্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত।

তৃতীয় দলীলের জবাবঃ একথা সর্বজনবিদিত যে, ধোয়া ব্যতীতও কোন কোন জিনিস পাক করা সম্ভব। যেমন, বীর্য যদি খুব গাঢ় হয় এবং তা যদি কাপড়ে লেগে শুকিয়ে যায়, এমতাবস্থায় খুঁটিয়ে উঠানোর দ্বারা কাপড় পাক হয়ে যাবে। ধোয়ার প্রয়োজন নেই। এমনিভাবে মাটিতে কোন নাপাক লাগলে তা শুকিয়ে গেলে এবং চুষে নিলে পাক হয়ে যায়। (درس مشكوة ج١ ص١٨٩-١٩٠)

দ্বিতীয় আলোচনাঃ কুকুরের ঝুটা পবিত্র করার পদ্ধতি সম্পর্কে। কুকুরের ঝুটা পবিত্র করার জন্য পাত্র কয়বার ধোয়া ওয়াজিব, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ
* ইমাম শাফেঈ, আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, সাতবার ধোয়া ওয়াজিব। তবে আহমদ (রহ.) অষ্টমবার মাটি দিয়ে ধোয়ার জন্য জোর তাগিদ প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, কুকুরের ঝুটা যেহেতু অপবিত্র নয়, সুতরাং তিনিও সওয়াবের জন্য (امر تعبدي) এবং চিকিৎসা হিসেবে সাতবার ধোয়ার প্রবক্তা। (تنظيم ج١ ص١٨٨)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে সাতবার ধোয়ার কথা বলা হয়েছে।

* ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইন (রহ.)-এর মতে, কুকুরের ঝুটা অন্যান্য নাপাকের ন্যায় তিনবার ধোয়া ওয়াজিব। (بذل المجهود ج١ ص٤٦، شرح مسلم ج١ ص١٣٧)

দলীল (১)ঃ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وَلَغَ ...

الْكَلْبُ فِيْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ– (عمدة القاري ج١ ص٨٧٤، معارف السنن ج١ ص٢٢٥، نصب الراية ج١ ص١٣١، دار قطني ج١ ص٢٤)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দেয়, তখন যেন সে তা ফেলে দেয় এবং এই পাত্র অবশ্যই তিনবার ধৌত করে।

দলীল (২)ঃ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَمْ يُغْسَلُ الْاَنَاءُ الَّذِيْ يَلَغُ فِيْهِ الْكَلْبُ؟ قَالَ كُلُّ ذٰلِكَ سَمِعْتُ سَبْعًا وَّخَمْسًا وَّثَلَاثَ مَرَّاتٍ– (مصنف عبد الرزاق ج١ ص٩٨، دار قطني ج١ ص٢٤)

অর্থাৎ, ইবন জুরায়জ বলেন, আমি আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, যে পাত্রে কুকুর মুখ দিয়েছে ইহা কয়বার ধুতে হবে? উত্তরে তিনি বলেন, সাতবার, পাঁচবার এবং তিনবার সবকটিই আমি শুনেছি।

প্রকাশ থাকে যে, হযরত আতা (রহ.) সাতবারের হাদীসেরও রাবী। যদি সাতবারের হুকুম ওয়াজিবের জন্য হত তাহলে তিনি কখনো এর বিপরীত অনুমতি দিতেন না।

আকলী দলীলঃ যেখানে কুকুরের কিংবা শুকরের পায়খানা-প্রশ্রাবের দ্বারা নাপাক হলে সেই নাপাকী তিনবার ধোয়ার দ্বারা পাক হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কুকুরের লালা তো নিঃসন্দেহে তার কিংবা শূকরের মল-মূত্র থেকে অনেকখানি হালকা। সুতরাং ঝুটার ক্ষেত্রে তিনবার ধোয়ার দ্বারা পাক হয়ে যাবে, এটাই যুক্তিযুক্ত।

জবাবঃ (১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) সাতবার ধোয়ার হাদীস বর্ণনাকারী হওয়া সত্ত্বেও তার থেকে তিনবার ধোয়ার হাদীস বর্ণিত হওয়ার দ্বারা প্রমাণ মিলে যে, সাতবারের হুকুম ওয়াজিব বুঝানোর জন্য নয়। (২) তিনবার ধৌত করার হাদীস ওয়াজিব, আর সাতবার ধৌত করার হাদীস মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য করা হবে। অতএব, উভয়ের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। (৩) ইবন রুশদ বলেন, সাতবার ধৌত করার হুকুম চিকিৎসা হিসেবে দেয়া হয়েছে, নাপাকীর কারণে নয়। কেননা কুকুরের লালায় এক প্রকার বিষ থাকে, যা কেবল সাতবার ধৌত করা এবং মাটি দ্বারা ঘর্ষণের ফলেই দূরীভূত হয়। (৪) ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাতবারের হুকুম ছিল, অতঃপর তিনবার ওয়াজিব করা হয়। আর সাতবার ধোয়া মুস্তাহাব থেকে যাবে। (৫) সাতবারের হাদীসগুলোতে অনেক গরমিল রয়েছে। যেমন, অনুচ্ছেদের শুরুর হাদীসে বর্ণিত আছে, প্রথমবার মাটি দ্বারা ঘষবে। ইবন মুগাফ্‌ফাল (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে- وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوْهُ بِالتُّرَابِ– (ابو داود ج١ ص١٠) অর্থাৎ, অষ্টমবার মাটি দ্বারা ঘর্ষণ কর।

কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে- أُوْلٰهُنَّ وَاُخْرٰهُنَّ بِالتُّرَابِ– (ترمذي ج١ ص٢٧)

অর্থাৎ, প্রথমবার ও শেষ বার মাটি দ্বারা ঘর্ষণ কর।

আর কোন রেওয়ায়েতে আছে- اَلسَّابِعَةَ بِالتُّرَابِ– (دار قطني ج١ ص٢٤) তথা সপ্তমবার মাটি দিয়ে মাজ। অতএব, সাতবার ধৌত করা যদি ওয়াজিব ধরা হয়, তাহলে অসঙ্গতিপূর্ণ রেওয়ায়েতগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধান অসম্ভব। কিন্তু সাতবার ধৌত করা যদি মুস্তাহাব ধরে নেয়া হয়, তাহলে কোন অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হবে না; বরং প্রতিটি পদ্ধতির মাঝে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব।

(درس مشكٰوة ج١ ص١٩٠–١٩١، تنظيم ج١ ص١٨٨–١٩٠، درس ترمذي ج١ ص٣٢٢–٣٢٦)

بَابُ سُؤْرِ الْهِرَّةِ ص١٠ ঃ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট

عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَّكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوْءً فَجَائَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَ مِنْهُ فَاَصْغٰى لَهَا الْاِنَاءَ حَتّٰى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَاٰنِيْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ اَتَعْجَبِيْنَ يَا بِنْتَ اَخِيْ فَقُلْتُ نَعَمْ– فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ– (ترمذي ج١ ص٢٧ باب سؤر الهرة، نسائي ج١ ص٢٣ سور الهرة، ابن ماجة ص٣١)

অনুবাদঃ কাবশা বিনত কাব ইবন মালিক হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আবু কাতাদা (রাঃ)-এর পুত্রবধু ছিলেন। একদা হযরত আবু কাতাদা রাঃ (গৃহে) আগমন করলে আমি (কাবশা) তাঁকে অযুর পানি দিলাম। এমতাবস্থায় একটি বিড়াল এসে উক্ত পানি পান করল। (বিড়ালের পানি পান করার সুবিধার্থে) হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) পাত্রটি কাত করে ধরলেন। বিড়ালটি তৃপ্তি সহকারে পানি পান করল। হযরত কাবশা (রাঃ) বলেন, তিনি আমাকে এর প্রতি তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী! তুমি কি অবাক হচ্ছ? জবাবে আমি (কাবশা) বললাম, হাঁ। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই বিড়াল অপবিত্র (প্রাণী) নয়। নিশ্চয়ই এরা তোমাদের আশেপাশে ঘুরাফেরাকারী ও তোমাদের সংশ্রবে আশ্রিত প্রাণী।

বিশ্লেষণঃ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট বা ঝুটার হুকুম কি, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* তিন ইমাম (মালিক, শাফেঈ ও আহমদ), ইসহাক ও আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে, বিড়ালের ঝুটা বিনা মাকরূহ পবিত্র।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত-

... فَقَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ اِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ– وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا–

(ابو داود ج۱ ص۱۱)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, বিড়াল অপবিত্র (প্রাণী) নয়, এরা তোমাদের আশেপাশেই ঘুরাফেরা করে। অতঃপর আয়িশা (রাঃ) আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা অযু করতে দেখেছি। উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট নিঃসন্দেহে মাকরূহ ছাড়াই পাক। যেহেতু নবী এখানে মাকরূহ বা অপছন্দের কথা উল্লেখ করেননি।

* ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, বিড়ালের ঝুটা পবিত্র, তবে মাকরূহ। অতঃপর ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, ইহা মাকরূহ তাহরীমী। আর ইমাম কারখী (রহ.)-এর মতে, মাকরূহ তানযীহী। অধিকাংশ হানাফী কারখী (রহ.)-এর মতকে প্রাধান্য দিয়ে মাকরূহ তানযীহীর উপর ফাতওয়া দিয়েছেন।

(درس ترمذي ج۱ ص۳۲٦، درس مشكوة ج۱ ص۱۸۷)

দলীল (১)ঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত-

... وَاِذَا وَلَغَ الْهِرُّ غُسِلَ مَرَّةً– (ابو داود ج۱ ص۱۰، ترمذي ج۱ ص۲۷ باب سؤر الكلب)

অর্থাৎ, ... যদি বিড়াল কোন পাত্র লেহন করে তবে তা একবার ধৌত করতে হবে।

দলীল (২)ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত-

يُغْسَلُ الاِنَاءُ مِنَ الْهِرِّ كَمَا يُغْسَلُ مِنَ الْكَلْبِ– (طحاوي ج۱ ص۱۱)

অর্থাৎ, বিড়াল মুখ দিলে পাত্র এরূপভাবেই ধুতে হবে, যেরূপভাবে ধুতে হয় কুকুর মুখ দিলে।

উল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি অন্তত মাকরূহও না হত, তাহলে ধোয়ার হুকুম দিতেন না।

দলীল (৩)ঃ এরূপভাবে তাহাবী (রহ.) স্বীয় কিতাবে ইবন উমর (রাঃ)-এর আছারও বর্ণনা করেছেন-

حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لاَ تَوَضَّئُوْا مِنْ سُؤْرِ الْحِمَارِ وَلاَ الْكَلْبِ وَلاَ السِّنَّوْرَ–
(شرح معاني الاثار ج١ ص١١)

অর্থাৎ, ইবন উমর (রাঃ) আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তোমরা গাধা, কুকুর ও বিড়ালের উচ্ছিষ্ট দ্বারা অযু কর না।
উক্ত হাদীসটিও অন্তত মাকরূহ হওয়ার দাবী রাখে।

জবাবঃ (১) তিন ইমামের দলীল হিসেবে প্রদত্ত উভয় হাদীসে লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হয় যে, বিড়ালের ঝুটা মাকরূহ ছাড়াই যদি পবিত্র হত, তাহলে নবী করীম (সাঃ) পরিষ্কার ভাষায় ইরশাদ করতেন **اِنَّهَا طَاهِرَة** তথা বিড়ালের ঝুটা পবিত্র। এমনভাবে পেঁচিয়ে কথা বলার দরকার ছিল না- **اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَس** এতে বুঝা যায় যে, বিড়ালের ঝুটা সত্তাগতভাবে তো নাপাকই, কিন্তু ইহা গৃহে অধিক বিচরণকারী বিধায় এর অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে ইহা পরিপূর্ণ পাকও নয়। এই কারণটি মাকরূহ তানযীহী হওয়ার প্রমাণ। যার প্রবক্তা হানাফীগণ।
(২) মাকরূহ তানযীহীও বৈধতার একটি অংশ। অতএব, তিন ইমামের দলীল বৈধতা বা জায়েয বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর হানাফীদের রেওয়ায়েত মাকরূহ তানযীহীর উপর প্রযোজ্য। (بذل المجهود ج١ ص٤٩، تنظيم ج١ ص١٨٦)

بَابُ الْوُضُوْءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ ص١١ ঃ সাগরের পানি দ্বারা অযু করা

... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَأَلَ رَجُلٌ رَّسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمَلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا اَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُوْرُ مَائُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ– (ترمذي ج١ ص٢١ باب ماء البحر انه طهور، نسائي ج١ ص٢١ باب ماء البحر، ابن ماجة ص٣٢/٢٤١)

অনুবাদঃ ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সাগরে সফর করে থাকি এবং আমাদের সাথে (পান করার) সামান্য (মিঠা) পানি রাখি। যদি আমরা তা দ্বারা অযু করি তবে পিপাসার্ত থাকব। এমতাবস্থায় আমরা সাগরের (লবণাক্ত) পানি দ্বারা অযু করতে পারি কি? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ সাগরের পানি পবিত্র এবং এর মৃত প্রাণী হালাল।

বিশ্লেষণঃ উক্ত অনুচ্ছেদে মূলতঃ তিনটি বিষয়ে আলোচনা করা হবে-
(১) সামুদ্রিক কোন্ কোন্ প্রাণী খাওয়া হারাম, আর কোন্ কোন্‌টি হালাল। (২) পানিতে মরে ভেসে উঠা মাছের হুকুম। (৩) চিংড়ি মাছ হালাল না হারাম?

তবে, এগুলো আলোচনার পূর্বে মূল হাদীসে দুটি বিষয় লক্ষণীয় যে, (ক) সাগর হল বিশাল জলাধার। এতদসত্ত্বেও সাহাবায়ে কিরাম কেন এমন প্রশ্ন করলেন যে, আমরা কি সাগরের পানি দ্বারা অযু করতে পারব? যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে অহেতুক মনে হচ্ছে। (খ) পক্ষান্তরে নবী করীম (সাঃ) এর উত্তরে প্রশ্নের চাহিদানুযায়ী শুধু এতটুকু বাণীই তো যথেষ্ট ছিল যে, ‘‘সাগরের পানি পবিত্র’’। কিন্তু তিনি একধাপ এগিয়ে কেন বললেন, ‘‘এর মৃত প্রাণী খাওয়া হালাল।’’
(ক) মুহাদ্দিসগণ এ প্রশ্নের একাধিক উত্তর দিয়েছেন-
(১) সাধারণত পানির রয়েছে তিনটি গুণ- রং, গন্ধ ও স্বাদ। তাঁরা যখন সাগরের পানিতে সাধারণ মিঠা পানির বিপরীত রং ও স্বাদে পরিবর্তন দেখলেন, তখন তাঁদের সন্দেহ হল, এর দ্বারা অযু জায়েয কিনা। ফলে এমন প্রশ্ন করলেন।
(২) সমুদ্র হল অসংখ্য প্রাণীর আবাসস্থল। আর সেখানে প্রতিনিয়ত হাজার হাজার প্রাণী মারা যাচ্ছে। তাই তাঁদের মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উত্থাপিত হল যে, এই মৃত প্রাণীর দ্বারা সাগরের পানি নাপাক হবে কিনা।
(৩) চতুর্দিক থেকে সাগরের পানিতে সর্বদাই নাপাক পতিত হচ্ছে, তাই তাঁরা ভাবলেন, হয়ত সাগরের পানি পবিত্র নয়।
(৪) অথবা, সন্দেহের কারণ এই ছিল যে, নবী করীম (সাঃ) একদা ইরশাদ করেছিলেন, إِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا– (ابو داود، باب في ركوب البحر والغزو ج١ ص٣٣٧)
অর্থাৎ সমুদ্রের নিচে রয়েছে অগ্নি। যা জাহান্নামের আলামত। তাই সাহাবাগণ এমন প্রশ্ন করেছিলেন।

(খ) (১) সাহাবাগণের সাগরে যেমন পানির প্রয়োজন হবে, তেমনিভাবে খাবারেরও প্রয়োজন দেখা দেবে। তাই রাহমাতুল্লীল আলামীন (সাঃ) উম্মতের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে একধাপ এগিয়ে বললেন, সাগরের মৃত প্রাণী খাওয়াও হালাল।
(২) মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, যে সাহাবাগণ সাগরের পানি দিয়ে অযু করার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলতে পারেন, তাঁরা তো এটা ভেবেই নিয়েছিলেন যে, সাগরের মৃত মাছ হয়ত হালাল হবে না। যেহেতু কুরআনে উল্লেখ রয়েছে- إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ
অর্থাৎ তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত প্রাণী। (বাকারাঃ ১৭৩)
তাই তাঁদের এই ভুল থেকে পরিত্রাণের জন্য তিনি অতিরিক্ত উক্তিটি করেছিলেন।

(৩) সাহাবাগণ যাতে আবার ইহা না বুঝে বসেন যে, পানি হয়ত জরুরতবশত পাক, কিন্তু এর মৃত প্রাণী হয়ত নাপাক।
(৪) এই অতিরিক্ত বাক্যটি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য হল, তাঁদের প্রশ্নের মূল কারণের অবসান ঘটানো। অর্থাৎ, যেখানে মৃত প্রাণী খাওয়া হালাল, সেখানে তো সাগরের পানি দিয়ে অযু করা নিঃসন্দেহে জায়েয। (تنظيم ج١ ص١٨٠، درس مشكوة ج١ ص١٨٣-١٨٤)

প্রথম আলোচনাঃ সামদ্রিক কোন্ কোন্ প্রাণী খাওয়া হালাল, আর কোন্‌টি হারাম- এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ
* ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, সামুদ্রিক শূকর ব্যতীত জলজ সকল প্রাণী খাওয়া হালাল।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.) থেকে এ সম্পর্কে ৪টি মত পাওয়া যায়-
(ক) হানাফীদের মত (যা সামনে আসছে)
(খ) যেসব প্রাণী স্থলে হালাল, অনুরূপ জলভাগে বসবাসরত প্রাণীও হালাল। যেমন সামুদ্রিক গরু হালাল। আর যেসব প্রাণী স্থলে হারাম, অনুরূপ জলে বসবাসরত প্রাণীও ভক্ষণ করা হারাম। যেমন, সামুদ্রিক কুকুর, শূকর হারাম। আর যেসব প্রাণী জলে বাস করে, কিন্তু স্থলে এর নযীর নেই সেগুলোও হালাল।
(গ) ব্যাঙ, কুমির, কচ্ছপ, সামুদ্রিক কুকুর ও শূকর এই পাঁচ প্রকার প্রাণী ব্যতীত অন্যসব প্রাণী খাওয়া হালাল। ইমাম আহমদ (রহ.)-এর অভিমতও তাই।
(ঘ) ব্যাঙ ছাড়া অন্য সব সামুদ্রিক প্রাণী হালাল।

আল্লামা নববী (রহ.) বলেন, এই সর্বশেষ উক্তিটির উপরই শাফেঈদের ফতওয়া।

(بذل المجهود ج١ ص٥٤)

তিন ইমামের দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী–أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ অর্থাৎ, তোমাদের জন্য সমুদ্রে প্রাপ্ত শিকার ও খাদ্য হালাল করা হয়েছে। (মায়েদাহঃ ৯৬)
উক্ত আয়াতে صيد (শিকার) শব্দটি مصيّد (শিকারকৃত প্রাণী) অর্থে مفعول (কর্মপদ) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর اضافت (সম্বন্ধপদ) ব্যাপকতার জন্য ব্যবহৃত হয়। অতএব, আয়াতের মর্মার্থ হল- সমুদ্রের সকল শিকারলব্ধ প্রাণী ভক্ষণ করা জায়েয। এখানে আমভাবে বলা হয়েছে। কোন কিছুকে খাস (নির্দিষ্ট) করা হয়নি।

দলীল (২)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসেও আমভাবে (ব্যাপকভাবে) সমস্ত মৃত প্রাণী খাওয়ার বৈধতার প্রমাণ মিলে। কেননা, হাদীসে কোন কিছুকে খাস করা হয়নি।

দলীল (৩)ঃ হাদীসে হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে-

... فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَاكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ– (بخاري ج٢ ص٦٢٥–٦٢٦ باب عزوة سيف البحر)

অর্থাৎ, অতঃপর সমুদ্র আমাদের জন্য একটি প্রাণী নিক্ষেপ করল। যাকে আম্বর বলা হয়। আমরা এটি থেকে অর্ধ মাস ভক্ষণ করেছি।

এই রেওয়ায়েতে دَابَّة শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর মাছের জন্য কখনো دابة শব্দ ব্যবহৃত হয় না। এতে বুঝা যায় যে, আম্বর কোন মাছ ছিল না। অতএব মাছ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীও ভক্ষণ করা হালাল।

ইমাম মালিক (রহ.) নিম্নলিখিত আয়াতটি দলীল হিসেবে পেশ করেন-

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ–

অর্থাৎ, তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত ও শূকরের গোশত। (বাকারাঃ ১৭৩)

উল্লিখিত আয়াতে لحم الخنزير (শূকরের গোশত)-এর ব্যাপকতার কারণে সামুদ্রিক শূকরকেও খাওয়া হারাম সাব্যস্ত করেছেন। আর ইমাম শাফেঈ (রহ.) ব্যাঙ মারার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীসগুলোর কারণে ব্যাঙকে হালাল থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত করেন। (درس ترمذي ج١ ص٢٨٠)

* ইমাম আবু হানিফা, ইসহাক ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে, পানিতে বসবাসরত প্রাণীদের মধ্যে মাছ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী খাওয়া জায়েয নেই।

(بذل المجهود ج١ ص٥٤، تنظيم ج١ ص١٨١)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰئِثَ

অর্থাৎ, তাদের জন্য তিনি যাবতীয় অপবিত্র বস্তু হারাম করেন। (আরাফঃ ১৫৭)

আল্লামা আইনী (রহ.) কুরআনের এই আয়াতের ভিত্তিতে বলেন, الخبائث। শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য সেসব মাখলূক যেগুলোকে মানুষ স্বভাবতঃ ঘৃণা করে। মাছ ছাড়া সামুদ্রিক প্রাণী এরূপ, যেগুলোকে স্বভাবতঃ মানুষ ঘৃণা করে। অতএব, মাছ ছাড়া সামুদ্রিক অন্যান্য প্রাণী الخبائث-এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

দলীল (২)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ– (البقرة الآية ١٧٣)

এতে বুঝা যায় যে, প্রতিটি মৃত জন্তু হারাম। স্থলের হোক কিংবা জলের হোক। তবে শরঈ দলীল দ্বারা প্রমাণিত যেসব মৃত প্রাণী (মাছ) ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে সেগুলো আলাদা।

দলীল (৩)ঃ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَاَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوْتُ وَالْجَرَادُ وَاَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ-

(ابن ماجة ص٢٤٦ باب الكبد والطحال)

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, আমাদের জন্য দুটি মৃত বস্তু এবং দুটি রক্তপিণ্ড হালাল করা হয়েছে। মৃত প্রাণী দুটি হল- মাছ ও পঙ্গপাল। আর দুটি রক্তপিণ্ড হল- কলিজা ও প্লীহা।

দলীল (৪)ঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলীল হল, নবী করীম (সাঃ)-এর সারা জীবনে তিনি এবং তৎপরবর্তী সাহাবায়ে কিরাম থেকে মাছ ছাড়া অন্য কোন সামুদ্রিক প্রাণী ভক্ষণ প্রমাণিত নয়। যদি এ প্রাণীগুলো হালাল হত তবে তিনি কোন না কোন সময় বৈধতার বিবরণের জন্য হলেও অবশ্যই তা খেতেন। যেহেতু তা করেননি, তাই সেগুলো হালাল হবে না। (درس ترمذي ج١ ص٢٨٠)

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ **صيد** শব্দটিকে **مفعول**-এর অর্থে ব্যবহার করা রূপক (مَجَازًا)। আর প্রয়োজন ব্যতীত রূপকের শরণাপন্ন হওয়ার কোন অবকাশ নেই। তাই হানাফীগণ বলেন যে, এখানে **صيد** (শিকার) শব্দটি প্রকৃত (**حقيقي**) অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। **مصيد** (শিকারলব্ধ প্রাণী) অর্থে নয়।

মোট কথা হল, হানাফীদের মতে, আয়াতটির অর্থ হবে, তোমাদের (মুহরিমের) জন্য সমুদ্রের প্রাণী শিকার করা হালাল। আর ইমামত্রয় আয়াতটির অর্থ করেন, তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকারলব্ধ প্রাণী (যেকোন প্রকার) ভক্ষণ করা হারাম। অথচ আয়াতটির পূর্বাপর বর্ণনা প্রসঙ্গ লক্ষ্য করলে হানাফীদের প্রদত্ত অর্থই মেনে নিতে হয়। কেননা, আলোচনা চলছে মুহরিম ব্যক্তির জন্য কোন্ কোন্ কাজ করা বৈধ আর কোন্ কোন্‌টি বৈধ নয়। সুতরাং উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হল শুধু একথা বলা যে, মুহরিম ব্যক্তির জন্য সমুদ্রে শিকার করা হালাল তথা জায়েয। এর দ্বারা যেকোন প্রকার প্রাণী খাওয়া যে হালাল তা প্রমাণ করে না।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ (১) আলোচ্য হাদীসে ميتته (সমুদ্রের মৃত্যু)-এর মধ্যে যে সম্বন্ধ (اضافت) রয়েছে এর দ্বারা সব মৃত বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং সুনির্দিষ্ট (عهد خارجي) মৃত জন্তু হালাল বুঝানো উদ্দেশ্য। আর সেই সুনির্দিষ্ট প্রাণীটি হচ্ছে মাছ। অন্য কিছু নয়।

(২) যদি ميتته দ্বারা ব্যাপকও বুঝানো হয়, কিন্তু পরবর্তীতে নবী করীম (সাঃ) اُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ اَلسَّمَكُ وَالْجَرَادُ– (অর্থাৎ, আমাদের জন্য দুইটি মৃত বস্তু হালাল। একটি হল মাছ, অপরটি পঙ্গপাল) বলে দুটিকে খাস করে দিয়েছেন।

(৩) আল্লামা শাইখুল হিন্দ (রহ.) বলেন, যদি সম্বন্ধ পদটি (اضافت) সমস্ত সংখ্যা (استغراق) বুঝানোর জন্য মেনে নেয়া হয়, তাহলে الحل শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য বৈধতা নয়; বরং পবিত্রতা। আর বাক্যের ধারা পবিত্রতা সংক্রান্তই চলে আসছে। সুতরাং নবী করীম (সাঃ)-এর বাণী اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ-এর অর্থ হবে, "সমুদ্রের মৃত প্রাণীগুলো পবিত্র থাকে।"

তৃতীয় দলীলের জবাবঃ সহীহ বুখারীতেই আম্বর সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে- (بخاري ج٢ ص٦٢٥–٦٢٦) –فَاَلْقَى الْبَحْرُ حُوْتًا مَيْتًا অর্থাৎ, অতঃপর সমুদ্র একটি মৃত মাছ নিক্ষেপ করল। যার দ্বারা বোঝা যায় যে, অন্য রেওয়ায়েতে دابة শব্দ দ্বারাও উদ্দেশ্য মাছ। (درس مشكوة ج١ ص١٨٤–١٨٥، درس ترمذي ج١ ص٢٨١–٢٨٢)

দ্বিতীয় আলোচনাঃ প্রথমে জানা থাকা দরকার যে, ভাসমান মাছ বা سماك طافي বলতে সেই মাছকে বলা হয়, যা পানিতে কোন বহির্গত কারণ ব্যতীত স্বাভাবিকভাবে মরে পেট উল্টে ভেসে থাকে। সুতরাং পানিতে মরে ভেসে উঠা মাছ খাওয়া জায়েয কিনা- এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, এরূপ মাছ খাওয়া হালাল।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে الحل ميتته উল্লেখ রয়েছে, যার দ্বারা জবাইবিহীন মৃত উদ্দেশ্য। হাদীসে এর বৈধতার হুকুম দেয়া হয়েছে।

দলীল (২)ঃ আম্বর সংক্রান্ত হাদীস। সাহাবায়ে কিরাম এটি পেয়েছিলেন মৃত অবস্থায়। তা সত্ত্বেও তাঁরা এটাকে অর্ধমাস পর্যন্ত খেতে থাকেন।

দলীল (৩)ঃ হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর একটি আছার। যেটি সুনানে বায়হাকী ও দারা কুতনীতে হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এই আছারে মরে ভেসে ওঠা মাছকে হালাল সাব্যস্ত করা হয়েছে। (معارف السنن ج١ ص٢٥٧)

* ইমাম আবু হানিফা, ইবরাহীম নাখঈ, শাবী, তাউস, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ.) ও হযরত আলী, ইবন আব্বাস এবং জাবির (রাঃ)-এর মতে, এরূপ মাছ খাওয়া হালাল নয়।

দলীলঃ হযরত জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوْهُ وَمَا مَاتَ فِيْهِ وَطَفَا فَلاَ تَأْكُلُوْهُ– (ابو داود ج٢ ص٥٣٤ باب في اكل الطافي من السمك، ابن ماجة ص٢٤١ باب الطافي من صيد البحر)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, সমুদ্র যে প্রাণী নিক্ষেপ করেছে অথবা সমুদ্রে ভাটা লাগার কারণে চরে আটকে পড়েছে, তোমরা সেটি ভক্ষণ কর। আর যেটি পানিতে মরে ভেসে উঠে তা ভক্ষণ করো না।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ الحل ميتته দ্বারা জবাইবিহীন জন্তু বুঝানো হয়নি; বরং এমন জন্তু বুঝানো হয়েছে, যার রক্ত প্রবাহিত হয়নি।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ আম্বর সংক্রান্ত হাদীসের উত্তর হল, এটা মরে ভেসে ওঠা মাছ বলে সুস্পষ্ট বিবরণ নেই। طافي শুধু সে মাছকে বলে, যেটি কোন বাহ্যিক কারণ ব্যতীত নিজে নিজে পানিতে মরে ভেসে উঠে। পক্ষান্তরে যদি কোন মাছ কোন বাহ্যিক কারণে যেমন প্রচণ্ড গরম ও শৈত্য প্রবাহে বা ঢেউ-তরঙ্গের কারণে অথবা তীরে উঠার পর পানি সরে যাওয়ার কারণে মরে যায়, তবে সেটি طافي নয়। এটা খাওয়া হালাল। আম্বর সংক্রান্ত হাদীসেও সংশ্লিষ্ট মাছটি পানি থেকে তীরে উঠে আসার কারণে মরে গিয়েছিল বলে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়। অতএব, এ মাছটি হালাল হওয়া সম্পর্কে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই।

তৃতীয় দলীলের জবাবঃ আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর আছারের উত্তরে বলা যায়, প্রথমতঃ তো এতে প্রচণ্ড ইযতিরাব রয়েছে। দ্বিতীয়ত, যদি এটাকে সূত্রগতভাবে সহীহও মেনে নেয়া হয় তবুও এটি একজন সাহাবীর ইজতিহাদ হতে পারে, যা মারফূ হাদীসের বিপরীতে প্রমাণ হিসেবে গণ্য হতে পারে না। তৃতীয়ত, এটাও হতে পারে যে, এখানে মৃত মাছ দ্বারা এমন মাছ বুঝানো হয়েছে, যেটি বাহ্যিক কারণে মারা গেছে।

তৃতীয় আলোচনাঃ চিংড়ি মাছ হালাল না হারাম?

শাফেঈ এবং মালিকীদের মতে তো এর হালাল হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। তবে হানাফীদের মতে এটা মাছ কিনা, বিষয়টি তার উপর নির্ভর করবে। কিন্তু এ বিষয়টি নিয়ে বিশেষতঃ ভারতীয় উলামায়ে কিরামের মাঝে বিতর্ক রয়েছে। আল্লামা দমীরী (রহ.) 'হায়াতুল হায়াওয়ান' নামক গ্রন্থে এটাকে এক প্রকার মাছ সাব্যস্ত করেছেন। এ কারণে ভারতীয় কোন কোন আলিম এর হালাল হওয়ার প্রবক্তা। তাঁদের মধ্যে হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.)ও আছেন। তিনি 'ইমদাদুল ফতওয়া'তে এটা খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু 'ফাতওয়া হাম্মাদিয়া' গ্রন্থকার ও অন্যান্য কোন কোন ফকীহ এটাকে মৎস বলতে অস্বীকার করেছেন। কেননা প্রাণীবিদ্যা বিশেষজ্ঞদের নিকট এ সম্পর্কে তাহকীক করা হলে, তাদের সবাই চিংড়ি মাছ নয় বলে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তাঁদের মতে, মাছ হল এরূপ মেরুদণ্ড বিশিষ্ট প্রাণী যেটি পানি ছাড়া জীবিত থাকতে পারে না এবং এটি চোয়াল দিয়ে শ্বাস নেয়। এতে চিংড়ি প্রথম শর্ত দ্বারাই বাদ পড়ে যায়। কেননা চিংড়ির কোন মেরুদণ্ড নেই। কোন কোন প্রাণী বিশেষজ্ঞ তো একে পোকার অন্তর্ভুক্ত প্রাণী বলে সাব্যস্ত করেছেন। আর পোকা ভক্ষণ করা জায়েয নেই। অতএব, যে বিষয়ে হালাল-হারামের প্রমাণাদি বিপরীতমুখী সেখানে হারামেরই প্রাধান্য হবে। এজন্য এটা খাওয়া থেকে পরহেয করাই উচিত।

স্মর্তব্য যে, আল্লামা তাকী উসমানী অনেক গবেষণার পর সর্বশেষে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেন যে, চিংড়ি না খাওয়াই উত্তম। যেহেতু শরীয়তে উরফ বা প্রচলিত প্রথা ধর্তব্য, আর আমাদের দেশেও যেহেতু সবাই এটাকে মাছ হিসেবেই গণ্য করে, তাই চিংড়ি খাওয়া হালাল। এতদঞ্চলের সব আলিমই তিন ইমামের সাথে একমত পোষণ করে থাকেন। (فتح الملهم ج٣ ص١٣٥–٥١٤)

بَابُ فِيْ اِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ ص١٣ ঃ অযুর পরিপূর্ণতা

... عَنْ عَبْدِ اللهِ عَمْرِو اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأى قَوْمًا وَّ اَعْقَابُهُمْ تَلُوْحُ فَقَالَ وَيْلٌ لِّلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ اَسْبِغُوْا الْوُضُوْءَ– (بخاري ج١ ص٢٨ باب غسل الاعقاب، مسلم ج١ ص١٢٤ باب وجوب غسل الرجلين، ترمذي ج١ ص١٦ باب ويل للاعقاب من النار، نسائي ج١ ص٣٠ باب ايجاب غسل الرجلين، ابن ماجة ص٣٦)

অনুবাদঃ ... আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এমন এক সম্প্রদায়কে দেখলেন, যাদের পায়ের গোড়ালি (পানি ভালভাবে না পৌঁছার কারণে)

ঝকঝক করছে। তিনি বলেনঃ এরূপ পায়ের গোড়ালি ওয়ালাদের জন্য দোযখের শাস্তি রয়েছে। তোমরা পরিপূর্ণভাবে অযু কর।

বিশ্লেষণঃ অযুর সময় উভয় পা ধৌত করা জরুরী নাকি মাসেহ করতে হবে, এ নিয়ে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছেঃ
* শিয়া সম্প্রদায়ের রাফেযীদের মধ্য হতে ফিরকায়ে ইমামিয়ার মতে, অযুর সময় উভয় পা না ধুয়ে বরং মাসেহ করা ফরয।

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ–

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হও, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুইসহ ধৌত কর ও তোমাদের মাথা মাসেহ কর এবং উভয় পা টাখনুসহ। (মায়েদাহঃ ৬)

উক্ত আয়াতে তারা اَرْجُلِكُمْ শব্দটি لام হরফে যের দিয়ে পড়ে। তাদের যুক্তি হল, এই শব্দটি পূর্বের শব্দ بِرُءُوْسِكُمْ-এর উপর عَطْف (সংযোজন) হয়েছে। অতএব, মাথা যেমন মাসেহ করা ফরয, অনুরূপ হুকুম পদদ্বয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

দলীল (২)ঃ আবু নুআইম উবাদা ইবন তামীম সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন-

قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى لِحْيَتِهٖ وَرِجْلَيْهِ–

(مجمع الزوائد ج١ ص٢٣٤، كنز العمال ج٥ ص١٠٢)

অর্থাৎ, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেখেছি তিনি অযু করেছেন এবং তাঁর দাড়ি ও উভয় পা মাসেহ করেছেন।

* আবু আলী জুব্বায়ী (মুতাযিলা) ও ইমাম ইবন জারীর তাবারী (শিয়া)-এর মতে পদদ্বয় ধৌত করা কিংবা মাসেহ করা উভয়টি জায়েয আছে।

দলীলঃ আয়াতে বর্ণিত اَرْجُلَكُمْ শব্দটি যেহেতু যবর কিংবা যের উভয় কিরাআতে পড়া জায়েয আছে। সুতরাং বুঝা যায় অযুকারী যেকোন একটির উপর আমল করলেই হবে।

* আহলে যাহিরের মতে, মাসেহ করা এবং ধোয়া উভয়টি করতে হবে।

দলীলঃ যেহেতু أَرْجُلَكُمْ শব্দটিতে যবরযোগে এবং যেরযোগে উভয় কিরাআতে পড়া সুপ্রসিদ্ধভাবে বর্ণিত আছে। সুতরাং ধৌত ও মাসেহ উভয়টি করলে কোন মতানৈক্য থাকবে না।

* চার ইমামসহ জমহুর সাহাবা ও তাবেঈনের মতে, মোজা না থাকাবস্থায় অযুর সময় উভয় পা ধৌত করা ফরয।

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত আয়াতে أَرْجُلَكُمْ যবরযোগে পড়তে হবে। কেননা, এটি আতফ (সংযোজন) হয়েছে وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ-এর উপর। মুখ এবং উভয় হাত ধৌত করা যেমন ফরয, তেমনিভাবে পদদ্বয় ধৌত করাও ফরয।

দলীল (২)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (৩)ঃ নবী করীম (সাঃ) পুরো নবুওয়াত জীবনে মোজাবিহীন অবস্থায় পদদ্বয় না ধুয়ে মাসেহ করেছেন, এমনটি একবারও প্রমাণিত নেই। অতএব, পদদ্বয় মাসেহ করা যদি ফরযই হত অথবা মাকরূহের সাথেও যদি জায়েয হত, তাহলে তিনি কমপক্ষে একবার হলেও ইহার উপর আমল করে দেখিয়ে দিতেন। যেমন তিনি অনেক মাকরূহ বিষয়ও বৈধতা বর্ণনার জন্য আমল করে দেখিয়ে দিয়েছেন। এতে বুঝা যায়, পদদ্বয় মাসেহ করা ফরয তো দূরের কথা, মাকরূহের সাথেও জায়েয নয়।

দলীল (৪)ঃ আব্দুর রহমান ইবন আবু লায়লা বলেন, এ ব্যাপারে সাহাবাদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, অযুতে মোজাবিহীন অবস্থায় পদদ্বয় ধৌত করা ফরয।

(درس مشكوة ج۱ ص۱۶۳-۱٦٤)

জবাবঃ ফিরকারে ইমামিয়া ও অন্যান্যদের প্রদত্ত দলীলের জবাবঃ

(১) উক্ত আয়াতে اَرْجُلِكُمْ-এর মধ্যে যের দেয়া হয়েছে কাছাকাছি শব্দে (بِرُؤُسِكُمْ) যের হওয়ার কারণে। অন্যথায় اَرْجُلَكُمْ-এর আত্‌ফ হয়েছে اَيْدِيَكُمْ-এর উপর।

(২) যেরের কিরাআতটি মোজা পরিহিত অবস্থায় প্রযোজ্য, আর যবরের কিরাআতটি প্রযোজ্য সাধারণ অবস্থায়।

(৩) প্রকৃতপক্ষে اَرْجُلَكُمْ শব্দটি উহ্য ক্রিয়ার (فعل محذوف) কর্ম (مفعول) হিসেবে যবর হয়েছে। আসল বাক্যটি ছিল- وَامْسَحُوْا بِرُؤُسِكُمْ وَاغْسِلُوْا اَرْجُلَكُمْ

কিন্তু পাশাপাশি দুটি عامل-এর পৃথক পৃথক مَعْمُوْل থাকলে একটি আমেল উহ্য (حذف) রেখে এর مَعْمُوْل কে প্রথম মামূলের উপর আতফ করে তাধ্র ইরাব দেয়া যায়। আর এর ভিত্তিতেই ارجلكم-কে برؤوسكم-এর উপর আত্‌ফ করে اَرْجُلِكُمْ পড়া জায়েয আছে।

(৪) আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, কুরআনের বিবরণ বুঝার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পথ হল, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমল। আর তাঁর থেকে মোজাবিহীন অবস্থায় পদদ্বয় মাসেহ করেছেন এমন একটি রেওয়ায়েতও খুঁজে পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ (১) হয়ত নবী করীম (সাঃ) তখন মোজা পরিহিত ছিলেন। তাই তিনি মাসেহ করেছেন। (২) ইজমা ও মুতাওয়াতির হাদীসের বিরোধিতার কারণে এই হাদীসটি ব্যাখ্যার দাবী রাখে। আর তা হল, এখানে মাসেহ শব্দটি হালকা ধোয়ার সাথে সাথে ঘষা বা ডলা অর্থে প্রযোজ্য। যার প্রমাণ হল, দাড়ি সম্পর্কেও মাসেহ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ ইহাও ধোয়ার অঙ্গ।
(৩) যে সমস্ত হাদীসে পা মাসেহ করার কথা উল্লেখ রয়েছে, ঐ সমস্ত হাদীস রহিত (মানসূখ) হয়ে গেছে।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অযুতে পা ধোয়াই যদি আল্লাহ তাআলার কাম্য হয়, তাহলে উল্লিখিত আয়াতে বাকরীতিতে এমন অস্পষ্টতা রাখা হল কেন? পাগুলোকে স্পষ্টভাবে ধোয়ার আওতায় কেন উল্লেখ করা হল না, যাতে কোনরকম বিভ্রান্তির অবকাশ না থাকে।
এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে কয়েকটি ফায়দা ও হিকমত নিম্নে প্রদত্ত হল-
(১) একথা বুঝানো যে, কোন কোন সময় পায়ের উপরেও মাসেহ করার বিধান রয়েছে। যেমন, মোজা পরা অবস্থায়। যদি এই শব্দে যেরযোগে কিরাআত পড়ার অবকাশ না থাকত, তাহলে আয়াত দ্বারা সর্বাবস্থায় ধোয়াই সাব্যস্ত হত এবং মোজার উপর মাসেহের রেওয়ায়েতগুলো এ আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক হত। এ কিরাআতের কারণে এই বৈপরীত্যের অবসান ঘটেছে।
(২) মাথা মাসেহের এবং পা ধোয়ার বিষয়টি কোন কোন হুকুমে যৌথ। যেমন, তায়াম্মুমে উভয়টি বাদ পড়ে যায়।
(৩) ارجل শব্দটিকে رؤوس-এর পরে উল্লেখ করে মাসনূন তারতীবের দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথচ, এর উল্টো তারতীবে এ ফায়দা অর্জিত হত না।
(৪) মাথা মাসেহ এবং পা ধোয়া এ দুটি বিষয়ের মাঝে সামঞ্জস্য হল, উভয়টি শরীয়ত প্রবর্তকের বিধি প্রবর্তনের কারণে জানা গেছে। অথচ চেহারা ও হাত ধোয়ার বিধান অযুর পূর্বেও আরবদের নিকট ছিল। এ হিসেবেও এ দুটি বিষয়কে এক সাথে উল্লেখ করা সঙ্গত ছিল।
তাছাড়া আরো অনেক অজ্ঞাত হিকমত থাকতে পারে।

(درس ترمذي ج١ ص٢٥١–٢٥٧، درس مشكوة ج١ ص١٦٤–١٦٥)

بَاب فِيْ التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوْءِ ص١٣

অযুর পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ করা

... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لاَّ وُضُوْءَ لَهُ وَلاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَّمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ– (ابو داود ج١ ص١٤، بخاري ج١ ص٢٥ باب لا تقبل صلٰوة بغير طهور، ترمذي ج١ ص١٣ باب التسمية عند الوضوء، نسائي ج١ ص٢٥ باب التسمية عند الوضوء، ابن ماجة ص٣٢)

অনুবাদঃ ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, ঐ ব্যক্তির নামায আদায় হয় না যে সঠিকভাবে অযু করে না এবং ঐ ব্যক্তির অযু হয় না যে আল্লাহর নাম স্মরণ করে না (বিসমিল্লাহ বলে না)।

বিশ্লেষণঃ অযুর পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা সুন্নত না ওয়াজিব, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছেঃ

* আহলে যাহির, ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে, অযুর পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব। তবে, ইমাম আহমদ ও ইসহাক (রহ.) বলেন, যদি কেউ জেনে বুঝে ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেয়, তাহলে পুনরায় অযু করা ওয়াজিব। আর যদি ভুলে ছেড়ে দেয় তাহলে অযু দোহরানো ওয়াজিব নয়।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

* আবু হানিফা, মালিক, শাফেঈ (রহ.) ও জমহুরের মতে এবং ইমাম আহমদ (রহ.)-এর এক উক্তি অনুযায়ী, অযুর পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা সুন্নত, ওয়াজিব নয়।

(العيني ج١ ص٦٩٥)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ–

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নামাযে দাঁড়াও, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুইসহ ধৌত কর এবং তোমরা তোমাদের মাথা মাসেহ কর। এবং তোমাদের পদদ্বয় টাখনুসহ ধৌত কর। (মায়েদাহঃ ৬)

উক্ত আয়াতে অযুর ফরয হিসেবে শুধু চারটি অঙ্গের কথা উল্লেখ রয়েছে। বিসমিল্লাহর কথা উল্লেখ নেই।

দলীল (২)ঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে মারফূ হাদীস বর্ণিত-

مَنْ تَوَضَّأَ فَذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلٰى وُضُوْئِهِ كَانَ طُهُوْرًا لِجَسَدِهِ قَالَ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ طُهُوْرًا لِاَعْضَائِهِ– (دار قطني ج١ ص٧٤–٧٥، بيهقي ج١ ص٤٥)

অর্থাৎ, যে অযুর সময় আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে অযু করবে, ইহা তার গোটা দেহের পবিত্রতার কারণ হবে। বর্ণণাকারী বলেন, আর যে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ না করে অযু করবে, ইহা তার অযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পবিত্রতার কারণ হবে।

উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, বিসমিল্লাহ ছাড়াও অযু শুদ্ধ হবে। যদিও বিসমিল্লাহ বলা সুন্নত।

দলীল (৩)ঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে আরো একটি মারফূ হাদীস-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاِنَّ حَفَظَتَكَ لَا تَبْرَحُ تَكْتُبُ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتّٰى تَحْدِثَ مِنْ ذٰلِكَ الْوُضُوْءِ– (اثار السنن ص٣٠، مجمع الزوائد ج١ ص٢٢٠)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, হে আবু হুরায়রা! তুমি যখন অযু কর, তখন বল বিসমিল্লাহ, ওয়ালহামদুলিল্লাহ। কারণ তোমার রক্ষক ফেরেশতারা তোমার জন্য এই অযু থেকে (পুনরায়) অপবিত্র হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নেকী লিখতেই থাকবে।

এ হাদীসটি বিসমিল্লাহ সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট। কেননা, এতে আলহামদুলিল্লাহ বলারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যা কারো মতে ওয়াজিব নয়।

দলীল (৪)ঃ অনেক সাহাবী নবী করীম (সাঃ)-এর অযুর বিবরণ সবিস্তারে দিয়েছেন। তাতে কোথাও বিসমিল্লাহ্‌র আলোচনা পাওয়া যায় না। যদি বিসমিল্লাহ পড়া ওয়াজিব হত, তবে সেসব হাদীসে অবশ্যই এর আলোচনা করা হত।

জবাবঃ (১) বিসমিল্লাহ প্রমাণিত হয়েছে খবরে ওয়াহিদ দ্বারা। সুতরাং বিসমিল্লাহকে যদি ওয়াজিব মানা হয়, তাহলে ইহা কুরআনের উপর বৃদ্ধি করা হবে। যা জায়েয নয়। কেননা, কুরআনে শুধু চারটি অঙ্গের কথাই উল্লেখ রয়েছে।

(২) উক্ত হাদীসে নফী (না) দ্বারা নফী কামিল (অপূর্ণাঙ্গতা) উদ্দেশ্য। এর দ্বারা অবৈধতা উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং হাদীসের মূল উদ্দেশ্য হল-

لَا الْوُضُوْءَ الْكَامِلَ لِمَنْ لَّمْ يَذْكُرِسْمَ اللهِ عَلَيْهِ– অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তির অযু পরিপূর্ণ নয়, যে অযুতে বিসমিল্লাহ বলে না। যেমন অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে-

لَا صَلٰوةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ اِلَّا فِيْ الْمَسْجِدِ– (دار قطني ج١ ص٤٢٠)

অর্থাৎ, মসজিদের প্রতিবেশীর নামায মসজিদ ছাড়া হয় না। এখানেও নফী (না) দ্বারা নফী কামিল উদ্দেশ্য।

(৩) বিসমিল্লাহ ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি কোন শক্তিশালী রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত নয়। স্বয়ং ইমাম তিরমিযী (রহ.) ইমাম আহমদ (রহ.)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে-

لاَ اَعْلَمُ فِيْ هٰذَا الْبَابِ حَدِيْثًا لَهُ اِسْنَاد جَيِّد– (ترمذي ج١ ص١٣)

অর্থাৎ, এই অনুচ্ছেদে উত্তম সনদ বিশিষ্ট কোন হাসীস সম্পর্কে আমার জানা নেই।

بَابُ صِفَةِ وُضُوْءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ص١٤

নবী করীম (সাঃ)-এর অযুর বর্ণনা

... عَنْ حُمْرَانَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ ثَلاَثًا فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ وَغسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْمَرَافِقِ ثَلاَثًا ثُمَّ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنٰى ثَلاَثًا ثُمَّ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ– ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوْئِيْ هٰذَا الخ

(بخاري ج١ ص٢٧–٢٨ باب الوضوء ثلاثا ثلاثا/ ج١ ص٢٢ باب مسح الرأس مرة، مسلم ج١ ص١١٩ باب صفة الوضوء وكماله، نسائي ج١ ص٣١ باب حد الغسل)

অনুবাদঃ ... হুমরান হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি উসমান ইবন আফ্‌ফান (রাঃ)-কে অযু করতে দেখেছি। তিনি (প্রথমে) তাঁর দুই হাতের উপর তিনবার করে পানি ঢেলে ধৌত করেন। অতঃপর কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। তারপর তিনবার (সমস্ত) মুখমণ্ডল ধৌত করেন। পরে তিনি তাঁর ডান হাত কনুই সমেত তিনবার ধৌত করেন এবং বাম হাতও অনুরূপভাবে ধৌত করেন। অতঃপর তিনি মাথা মাসেহ করেন। পরে তিনি স্বীয় ডান পা তিনবার ধৌত করেন এবং একইরূপে বাম পা ধৌত করেন। অবশেষে তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আমার এই অযুর ন্যায় অযু করতে দেখেছি।

বিশ্লেষণঃ অযুর সময় মাথা তিনবার মাসেহ করা সুন্নত নাকি একবার, এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, অযুর সময় তিনবার মাথা মাসেহ করা সুন্নত। ইমাম আহমদ (রহ.) থেকেও অনুরূপ একটি উক্তি বর্ণিত আছে।

দলীলঃ ... عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا

ثَلاثًا وَمَسَحَ رَأْسَه ثَلاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هٰذَا–

(ابو داود ج١ ص١٥)

অর্থাৎ, ... শাকীক ইবন সালামা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবন আফ্‌ফান (রাঃ)-কে অযুর মধ্যে দুই হাতের কনুই সমেত তিনবার করে ধৌত করতে এবং তিনবার মাথা মাসেহ করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এরূপ করতে দেখেছি।
উক্ত হাদীসে তিনবার মাথা মাসেহ করা উল্লেখ রয়েছে। অতএব, ইহা সুন্নত।

কিয়াসী দলীলঃ অযুর অন্যান্য অঙ্গসমূহ তিনবার ধৌত করা সুন্নত। আর মাথাও অযুর অঙ্গসমূহের একটি অঙ্গ। সুতরাং ইহাও তিনবার মাসেহ করা সুন্নত।

(درس مشكوة ج١ ص١٦٣)

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, ইসহাক, সুফিয়ান সাওরী ও আহমদ (রহ.)-এর এক উক্তি অনুযায়ী, মাথা শুধু একবার মাসেহ করা সুন্নত।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে নবী করীম (সাঃ)-এর অযুর পদ্ধতি খুলে খুলে বর্ণিত হয়েছে এবং প্রত্যেকটি অঙ্গ তিনবার ধৌত করার কথাও উল্লেখ রয়েছে, যা সুন্নত। কিন্তু মাথা মাসেহের ক্ষেত্রে তিনবারের কথা উল্লেখ নেই। এতে প্রমাণিত হয় যে, মাথা একবার মাসেহ করাই সুন্নত, তিনবার নয়।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا وَّغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا وَّمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– (ابو داود ج١ ص١٦)

অর্থাৎ, ... আব্দুর রহমান ইবন আবু লায়লা হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমি হযরত আলী (রাঃ)-কে অযু করতে দেখি। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করেন এবং দুই হাতের কনুই সমেত তিনবার ধৌত করেন। অতঃপর তিনি একবার মাথা মাসেহ করেন। অবশেষে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এইরূপে অযু করতেন। (পূর্ববর্তী সূত্রসমূহ দ্রষ্টব্য।)

দলীল (৩)ঃ ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَاٰى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ كُلُّهُ ثَلاثًا ثَلاثًا قَالَ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاُذُنَيْهِ مَسْحَةً وَّاحِدَةً– (ابو داود ج١ ص١٨، ترمذي ج١ ص١٦ باب ان مسح الرأس مرة، نسائي ج١ ص٢٨ باب صفة الوضوء، ابن ماجة ص٣٥)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অযু করতে দেখেন। তিনি (সাঃ) অযুর সময় প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করেন এবং মাথা ও কর্ণদ্বয় একবার মাসেহ করেন।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাথা একবার মাসেহ করা সুন্নত।

কিয়াসী দলীলঃ মোজা ও পট্টির উপর একবার মাসেহ করলে তা যথেষ্ট হবে। সুতরাং মাথা মাসেহও একবারই হওয়া উচিত।

জবাবঃ (১) শাফেঈদের পক্ষে বর্ণিত হাদীসটি শায (বিরল)। কারণ শুধু দু'একটি হাদীস ছাড়া উসমান (রাঃ)-এর সকল রেওয়ায়েত শুধু একবার মাসেহ করার প্রমাণ রয়েছে। তাই স্বয়ং ইমাম আবু দাউদ (রহ.) শাফেঈ মতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তিনবার মাসেহ বিশিষ্ট রেওয়ায়েতটিকে এই বলে রদ করে দিয়েছেন যে-

اَحَادِيْثُ عُثْمَانَ الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلٰى مَسْحِ الرَّأْسِ اَنَّهُ مَرَّةً فَاِنَّهُمْ ذَكَرُوْا الْوُضُوْءَ ثَلَاثًا وَقَالُوْا فِيْهَا وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَلَمْ يَذْكُرُوْا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوْا فِيْ غَيْرِهِ – (ابو داود ج١ ص١٥)

অর্থাৎ, হযরত উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত সহীহ্ হাদীসসমূহে প্রমাণিত হয় যে, অযুর মধ্যে মাথা মাসেহ শুধু একবার করতে হবে। প্রত্যেক বর্ণনাকারী অযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি তিনবার করে ধৌত করার কথা উল্লেখ করেছেন এবং প্রত্যেকের বর্ণনায় কেবলমাত্র وَمَسَحَ رَأْسَه তথা 'মাথা মাসেহ করেছেন' উল্লিখিত আছে, কিন্তু সংখ্যার কোন উল্লেখ নেই। অথচ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার ব্যাপারে তিন-তিনবারের কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

(২) 'হিদায়া' গ্রন্থকার বলেন, নতুন পানি দিয়ে যদি তিনবার মাসেহ করা হয়, তাহলে ইহা আর মাসেহ রইল না; বরং অন্যান্য অঙ্গের মতই গোসল বা ধৌত হয়ে যাবে।

(৩) যদি মেনে নেয়া হয়, তিনবার মাসেহ সংক্রান্ত হাদীসটিও বিশুদ্ধ, তবে তা বৈধতার (জায়েয) জন্য প্রযোজ্য, সুন্নত হিসেবে নয়।

(৪) আসলে হাদীসে তিনবার মাথা মাসেহ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং এটি ছিল পূর্ণ মাথা মাসেহের একটি পদ্ধতি। অর্থাৎ, মাথার সামনের অংশ, পিছনের অংশ এবং উভয় পার্শ্ব- এই তিন অবস্থা নবী করীম (সাঃ) হয়ত শিক্ষা দেয়ার জন্য আলাদা আলাদা ভাবে মাসেহ করেছেন। আর এটাকেই রাবী তিনবার বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

কিয়াসী দলীলের জবাবঃ শাফেঈদের কিয়াসী দলীলটি সহীহ্ নয়। কেননা ধোয়ার উপর মাসেহ-এর কিয়াস করা শুদ্ধ নয়।

তাছাড়া, অন্যান্য অঙ্গ ধোয়ার ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য হল, পূর্ণ অঙ্গটি ধৌত করা- যা ফরয। কিন্তু একবারে পূর্ণ অঙ্গটি ধৌত করা অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব বিধায় তিনবার ধুতে হয়, যা সুন্নত। পক্ষান্তরে, মাথা মাসেহের ক্ষেত্রে পূর্ণ মাথা মাসেহ করা ফরয নয় এবং প্রত্যেকটি চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছানোও ফরয নয়। এজন্য তিনবারেরও প্রয়োজন নেই। ফলে ইহা সুন্নতও নয়। (درس مشكوة ج١ ص١٦٣)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ মাথা মাসেহ করার জন্য নতুন পানি শর্ত কিনা- এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ (রহ.) সহ জমহুরের মতে, মাথা মাসেহ করার জন্য নতুন পানি নেয়া শর্ত। অতএব, কেউ যদি হাতের অবশিষ্ট পানি দ্বারা মাসেহ করে, তবে তার অযু শুদ্ধ হবে না।

দলীলঃ ... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ اَنَّهٗ رَاٰى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ وُضُوْءَهٗ قَالَ وَمَسَحَ رَأْسَهٗ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتّٰى اَنْقَاهُمَا– (ابو داود ج١ ص١٦، مسلم ج١ ص١٢٣ باب آخر في صفة الوضوء، ترمذي ج١ ص١٦ باب يأخذ لراسه ماء جديدا)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ ইবন আসিম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অযু করতে দেখেছেন। অতঃপর তিনি অযুর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, তিনি নতুন পানি দ্বারা মাথা মাসেহ করেন এবং পদযুগল পরিষ্কার করে ধৌত করেন।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, মাথা মাসেহের জন্য নতুন পানি নেয়া সুন্নত, তবে অযু বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়।

দলীলঃ ...عَنِ الرُّبَيِّعِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهٖ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِيْ يَدِهٖ– (ابو داود ج١ ص١٧)

অর্থাৎ, ... রুবাই (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) তাঁর হাতের অতিরিক্ত পানি দ্বারা মাথা মাসেহ করেন।

জবাবঃ মূলত জমহুরের প্রদত্ত দলীল হানাফীদের পরিপন্থী নয়। কারণ, উক্ত হাদীস দ্বারা সুন্নত প্রমাণিত হবে, ওয়াজিব নয়। আর হানাফীগণও তো একে সুন্নত বলে থাকেন। অতএব, কোন বৈপরীত্য নেই।

উল্লেখ্য যে, এই মতবিরোধের মূল ভিত্তি হল, 'ব্যবহৃত পানি' (ماء مستعمل) সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে। কেননা, ব্যবহৃত পানি দ্বারা অন্য অঙ্গ ধৌত বা মাসেহ করা

জায়েয নয়। শাফেঈ ও অন্যদের নিকট, কোন পানি অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পূর্বেই তা 'ব্যবহৃত পানি' হিসেবে সাব্যস্ত হবে। আর হানাফীদের মতে, পানি ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যবহৃত সাব্যস্ত হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়।

(درس ترمذي ج١ ص٢٤٦)

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ ص١٩ ঃ পাগড়ীর উপর মাসেহ করা

... عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَاَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ اَنْ يَّمْسَحُوْا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِيْنَ–

অনুবাদঃ ... সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাঃ (শত্রুদের সাথে মুকাবিলার জন্য) একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তারা ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হন। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট ফিরে এলে তিনি (সাঃ) তাদেরকে পাগড়ী ও মোজার উপর মাসে করার আদেশ (অনুমতি) দেন।

বিশ্লেষণঃ অযুর ক্ষেত্রে মাথা মাসেহ না করে কেবল পাগড়ীর উপর মাসেহ করা জায়েয কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছেঃ

* ইমাম আহমদ, আওযাঈ, দাউদ যাহেরী ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, শুধু পাগড়ীর উপর মাসেহ করা জায়েয। আর এতেই অযু শুদ্ধ হয়ে যাবে।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ– (بخاري ج١ ص٣٣ باب المسح على الخفين، ترمذي ج١ ص٢٩ باب المسح على الجوربين والعمامة، ابن ماجة ج٤٢)

অর্থাৎ, ... আল মুগীরা ইবন শুবা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) অযু করেছেন এবং চামড়ার মোজা ও পাগড়ীর উপর মাসেহ করেন।

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ بِلَالٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ– (ترمذي ج١ ص٢٩، نسائي ج١ ص٢٩ باب المسح على العمامة، ابن ماجة ص٤٢)

অর্থাৎ, ... বিলাল (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সাঃ) মোজাদ্বয় এবং পাগড়ীর উপর মাসেহ করেছেন।

কিয়াসী দলীলঃ পায়ে মোজা পরিধানের ফলে মোজার উপর মাসেহ করা যেমন জায়েয, তেমনিভাবে মাথার উপর পাগড়ী থাকলে এর উপরও মাসেহ করা জায়েয।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেঈ, ইবন মুবারক, সুফিয়ান সাওরী, শাবী ও ইবরাহীম (রহ.)-এর মতে, পাগড়ীর উপর মাসেহ করা জায়েয নয়।

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- وَامْسَحُوْا بِرُؤُ سِكُمْ

অর্থাৎ, তোমরা (অযুতে) তোমাদের মাথা মাসেহ কর। (মায়েদাঃ ৬)
উক্ত আয়াতে মাথা মাসেহ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। পাগড়ী মাসেহ করার হুকুম দেয়া হয়নি।

দলীল (২)ঃ মাথা মাসেহ করার হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির এবং অসংখ্য।

কিয়াসী দলীলঃ পবিত্র কুরআনে যে তায়াম্মুমের জন্য মুখ ও হাত মাসেহ করার হুকুম দেয়া হয়েছে, এক্ষেত্রে যদি মুখ ও হাতের উপর কোন প্রকার কাপড় থাকে, তাহলে এই মাসেহ আদায় হবে না। এর মূল কারণ হল মাঝখানে কাপড়ের প্রতিবন্ধকতা। আর এক্ষেত্রেও পাগড়ী হল মাথার জন্য প্রতিবন্ধকতা। অতএব, পাগড়ীর উপর মাসেহ করলে, তা শুদ্ধ হবে না।

জবাবঃ (১) পাগড়ীর উপর মাসেহ করার হাদীসগুলো খবরে ওয়াহিদ এবং সংখ্যায় খুবই কম। যা দ্বারা কিতাবুল্লাহ ও মাথা মাসেহ সংক্রান্ত অসংখ্য মুতাওয়াতির হাদীসের বিধান খর্ব করা যায় না।

(২) আল্লামা হাফিয যায়লাঈ (রহ.) বলেন, যেসব রেওয়ায়েতে পাগড়ীর উপর মাসেহ করার আলোচনা রয়েছে, সেগুলো সংক্ষিপ্ত। যা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। যেমন মূলে ছিল –مَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ– অর্থাৎ, তিনি তাঁর মাথার সম্মুখ ভাগ ও তাঁর পাগড়ী মাসেহ করেছেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে-

... عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ فَاَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَح مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةِ– (ابو داود ج١ ص١٩)

অর্থাৎ, ... আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একটি কিতরী পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় অযু করতে দেখেছি। এ সময় তিনি তাঁর হাত পাগড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে মাথার সম্মুখ ভাগ মাসেহ করেন, কিন্তু পাগড়ী খুলেননি।

এতে বুঝা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) প্রথমে ফরয পরিমাণ মাথা মাসেহ করার পর পাগড়ীর উপর মাসেহ করেন। আর এটা তো সবার নিকটই জায়েয।

(৩) আল্লামা সারাখসী (রহ.) অনুচ্ছেদের শুরুতে হযরত সাওবান (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের অন্য একটি জবাবে বলেন, পাগড়ীর উপর মাসেহ করার হুকুমটি ছিল ঐ সেনাদলের জন্য খাস। যা ওযরের ভিত্তিতে দিয়েছিলেন। (تنظيم الاشتات ج١ ص١٥٩)

কিয়াসী দলীলের জবাবঃ (১) মোজার উপর মাসেহ করার হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির, কিন্তু পাগড়ীর উপর মাসেহের ক্ষেত্রে এমনটি নয়। সুতরাং কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। সর্বোপরি বলা যায়, ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন-

بَلَغَنَا اَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ كَانَ فَتَرَكَ– (موطا محمد ص٧١)

অর্থাৎ, আমরা জানতে পেরেছি যে, পাগড়ীর উপর মাসেহের আমল প্রথমে ছিল, পরবর্তীতে তা পরিহার করা হয়েছে।
আব্দুল হাই লাখনভী (রহ.) লিখেছেন, ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর উক্তিটি দ্বারা পাগড়ীর উপর মাসেহের বিষয়টির এইভাবে চূড়ান্ত সমাধান হয়ে যায় যে, এ বিধানটি রহিত হয়ে গেছে। (درس ترمذي ج١ ص٣٣٦–٣٣٨، اعلاء السنن ج١ ص٨–٣٧)

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ص٢٠ ঃ মোজার উপর মাসেহ করা

... عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَ نَسِيْتَ قَالَ بَلْ اَنْتَ نَسِيْتَ بِهٰذَا اَمَرَنِي رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ– (ابو داود ج١ ص٢١)

অনুবাদঃ ... মুগীরা ইবন শোবা (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মোজার উপর মাসেহ করেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি ভুলে গেছেন? তিনি বলেন, বরং তুমিই ভুলে গেছ। আমাকে আমার প্রভু এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

বিশ্লেষণঃ মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ কিনা, এ ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছেঃ
* খারেজী ও রাফেজীদের মতে, মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয নয়।
দলীলঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ–

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নামাযের জন্য দাঁড়াও, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হাতসমূহ কনুইসহ ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মাসেহ কর ও পদযুগল টাখনু সহ ধৌত কর। (মায়েদাঃ ৬)

উক্ত আয়াতে যেহেতু পদযুগলকে ধৌত করার হুকুম দেয়া হয়েছে। সুতরাং মাসেহ করা জায়েয নয়।

* চার ইমামসহ সকল ফকীহর মতে, (চামড়ার) মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয আছে।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল(২)ঃ ... عَنْ اَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ اَنَّ جَرِيْرًا بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَالَ مَا يَمْنَعُنِي اَنْ اَمْسَحَ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ قَالُوْا اِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ قَبْلَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ قَالَ مَا اَسْلَمْتُ اِلاَّ بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ– (ابو داود ج١ ص٢١، بخاري ج١ ص٣٣ باب المسح على الخفين/ ج١ ص٥٠ باب التيمم ضربة، مسلم ج١ ص١٣٢ باب المسح على الخفين، ترمذي ج١ ص٢٧ باب المسح على الخفين، ابن ماجة ص٤١)

অর্থাৎ, ... আবু যুরআ ইবন আমর ইবন জারীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা হযরত জারীর (রাঃ) পেশাবের পর অযু করার সময় মোজা মাসেহ করেন এবং বলেন, (মোজার উপর) আমাকে মাসেহ করতে নিষেধ করা হয়নি। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বচক্ষে এভাবে মাসেহ করতে দেখেছি। উপস্থিত লোকেরা বলেন, এটা সূরা মায়েদাহ নাযিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা। জবাবে তিনি বলেন, আমি সূরা মায়েদাহ নাযিল হওয়ার পরই ইসলামে দীক্ষিত হই।

ইজমাঃ মোজার উপর যে মাসেহ করা জায়েয, এর উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন হাসান বসরী (রহ.) বলেন-

حَدَّثَنِي سَبْعُوْنَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ– (معارف السنن ج١ ص٣٣١)

অর্থাৎ, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ৭০ জন সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সাঃ) মোজার উপর মাসেহ করতেন।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন-

مَا قُلْتُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ حَتّٰى جَائَنِيْ مِثْلُ ضَوْءِ النَّهَارِ– (تنظيم ج١ ص١٩٨)

অর্থাৎ, আমার নিকট দিবালোকের মত স্পষ্ট না হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মোজার উপর মাসেহের প্রবক্তা হইনি।
আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, ৮০ জনের অধিক সাহাবী মোজার উপর মাসেহর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।

* আবুল হাসান কারখী (রহ.) বলেন-

اَخَافُ الْكُفْرَ عَلَى مَنْ لاَّ يَرَى الْمَسْحَ– (البحر الرائق ج١ ص١٦٥)

অর্থাৎ যে মোজার উপর মাসেহ করার ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করে, আমি তার কুফরীর আশংকা করি।

জবাবঃ (১) আবু বকর জাস্‌সাস (রহ.) বলেন, পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আয়াতে বর্ণিত "اَرْجُلَكُمْ" (তোমাদের পদযুগল)-কে "رُءُوْسِكُمْ" (তোমাদের মাথা)-এর উপর আতফ (সংযোজন) করে যের দ্বারা পড়াও জায়েয আছে। আর তখন এর অর্থ হবে, যদি মোজা পরিহিত অবস্থায় হয়, তখন মাসেহ করা জায়েয আছে। (احكام القرآن)
(২) জমহুরের প্রদত্ত দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মোজার উপর মাসেহ করার হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির। আর মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা কুরআনের আয়াতও রহিত (মানসূখ) করা জায়েয হবে। আর তাই জমহুরের দ্বিতীয় দলীলে দেখা যায় যে, সূরা মায়েদার আয়াতটি নাযিল হওয়ার পরেও হযরত জারীর (রাঃ) মোজার উপর মাসেহ করেন এবং নবী করীম (সাঃ)-এর আমলও যে এরূপ ছিল তা বর্ণনা করেন। (فتح الملهم ج١ ص٤٣١، العيني ج١ ص٨٥١)

بَابُ التَّوْقِيْتِ فِيْ الْمَسْحِ ص٢١

মোজার উপর মাসেহ্ করার সময়সীমা

... عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَّلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَّلَيْلَةً– وَفِيْ رِوَايَةٍ وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا– (ترمذي ج١ ص٢٧ باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، ابن ماجة ص٤١)

অনুবাদঃ ... খুযাইমা ইবন সাবিত (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, মুসাফিরের জন্য মোজার উপর মাসেহ করার নির্ধারিত সময়সীমা হল তিন দিন এবং মুকীমের (নিজ বাড়িতে অবস্থানকারী) জন্য একদিন একরাত।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আমরা যদি তাঁর নিকট অধিক সময়সীমা চাইতাম, তবে তিনি আমাদের জন্য সময় আরো বাড়িয়ে দিতেন।

বিশ্লেষণঃ চামড়ার মোজার উপর মাসেহের সময়সীমা কয়দিন, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, হাসান বসরী ও লাইছ ইবন সাদ (রহ.)-এর মতে, মাসেহের কোন সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নেই; বরং যতক্ষণ পর্যন্ত মোজা পরিহিত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এর উপর মাসেহ করতে পারবে। মুসাফির হোক কিংবা মুকীম। (تعليق الصبيح ج١ ص٢٤٤)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। হাদীসটির শেষাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, তিন দিনের বেশি মাসেহ করা জায়েয আছে। অর্থাৎ, একই মাসেহ দ্বারা তিন দিনেরও অধিককাল নামায পড়া জায়েয।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ اُبَيٍّ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ يَحْيَ بْنُ اَيُّوْبَ وَكَانَ قَدْ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَتَيْنِ اِنَّهٗ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَ اَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَوْمًا قَالَ يَوْمًا قَالَ وَيَوْمَيْنِ قَالَ وَيَوْمَيْنِ قَالَ وَثَلَاثَةً قَالَ نَعَمْ وَمَا شِئْتَ ... قَالَ فِيْهِ حَتّٰى بَلَغَ سَبْعًا– قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ مَا بَدَالَكَ– (ابو داود ج١ ص٢١، ابن ماجة ص٤٢)

অর্থাৎ, ... উবাই ইবন উমারা (রাঃ) হতে বর্ণিত। ইয়াহইয়া ইবন আইউব বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে উভয় কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়েছিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি মোজার উপর মাসেহ করব? তিনি বলেন, হ্যাঁ। রাবী তাঁকে এক, দুই ও তিন দিন পর্যন্ত মাসেহ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে, তিনি তাঁকে ইহার অনুমতি দিয়ে বলেন, তুমি যতদিনের জন্য ইচ্ছা কর। ... অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি প্রশ্ন করতে করতে সাতদিন পর্যন্ত পৌঁছান। জবাবে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, হ্যাঁ; যতদিন তুমি প্রয়োজন বোধ কর।
উক্ত রেওয়ায়েতে সময় অনির্দিষ্ট থাকার ব্যাপারটি সুস্পষ্ট।

কিয়াসী দলীলঃ মাথা মাসেহের ক্ষেত্রে যেহেতু কোন সময়সীমা নেই; তাই মোজা মাসেহের ক্ষেত্রেও সময়সীমা না থাকা উচিত।

* ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী, ইবন মুবারক, সাহেবাইন, আওযাঈ, দাউদ যাহেরী ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, মুকীম একদিন একরাত মাসেহ করবে, আর মুসাফির করবে তিন দিন তিন রাত।

দলীল (১)ঃ ... عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ اَتَيْتُ عَائِشَةَ اَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ عَلَيْكَ بِابْنِ اَبِيْ طَالِبٍ فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهِنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ– (مسلم ج١ ص١٣٥ باب التوقيت في المسح على الخفين، نسائي ج١ ص٣٢ باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم)

অর্থাৎ, ... শুরাইহ ইবন হানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রাঃ)-এর কাছে এলাম মোযার উপর মাসেহ করার মাসআলা জিজ্ঞেস করতে। তিনি বললেন, আবূ তালিবের পুত্র (আলী রাঃ)-এর কাছে গিয়ে এ মাসআলা জিজ্ঞেস কর। কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সফর করতেন। অতঃপর আমরা তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত।

দলীল (২)ঃ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا اِذَا كُنَّا سَفْرًا اَنْ لاَّ تَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ اِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ– (ترمذي ج١ ص٢٧، نسائي ج١ ص٣٢، ابن ماجة ص٤١–٤٢)

অর্থাৎ, সাফওয়ান ইবন আস্সাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন, আমরা যখন মুসাফির হতাম তখন যেন গোসল ফরয হওয়া ব্যতীত আমাদের মোজাগুলো তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত না খুলি।

দলীল (৩)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ (১) وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا হাদীসে বর্ণিত (আমরা যদি তাঁর নিকট অধিক সময়সীমা চাইতাম, তবে তিনি আমাদের জন্য সময় আরো বাড়িয়ে দিতেন) এই অতিরিক্ত অংশটুকু সহীহ নয়। আল্লামা যায়লাঈ ও আল্লামা ইবন দাকীকুল ঈদ (রহ.) এটাকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন।

(২) কেউ কেউ বলেন, এটা হযরত খুযাইমা (রাঃ)-এর নিজস্ব ধারণা, যা শরঈ মতে প্রমাণ নয়।

(৩) কতিপয় আলিম বলেন, এটি প্রথম দিকের ঘটনা। পরবর্তীতে সময় নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। (درس ترمذي ج١ ص٣٣٠)

(৪) যদি এই অতিরিক্ত অংশটি প্রমাণিতও হয়, তবুও এ বাক্য দ্বারা সময়ের অনির্দিষ্টতা প্রমাণিত হবে না। কেননা, বাক্যাংশটিতে বলা হয়েছে, যদি আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট সময় আরো বেশি চাইতাম তাহলে তিনি আরো সময়

বাড়িয়ে দিতেন; যেহেতু আরও অধিক সময় চাওয়া হয়নি, এজন্য সময় বৃদ্ধিও করা হয়নি। (نيل الاوطار ج١ ص١٧٩)

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ (১) উক্ত হাদীসটি সনদগতভাবে দুর্বল। স্বয়ং আবু দাউদ (রহ.) হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন-

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيْ اِسْنَادِهِ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِى– (ابو داود ج١ ص٢١)

অর্থাৎ, এর সনদে মতানৈক্য রয়েছে। এটি শক্তিশালী নয়।

অতএব, এমন একটি দুর্বল হাদীস দ্বারা মুতাওয়াতির হাদীস বর্জন করা উচিত নয়।

(২) অথবা, নবী করীম (সাঃ)-এর বাণী- نَعَمْ وَمَا شِئْتَ، نَعَمْ مَا بَدَالَكَ (হাঁ, তুমি যতদিনের জন্য ইচ্ছা কর। হাঁ, যতদিন তুমি প্রয়োজন বোধ কর)-এর দ্বারা মূল উদ্দেশ্য হল, সফর অবস্থায় তিন দিন তিনদিন করে এবং মুকীম অবস্থায় একদিন একদিন করে যতদিন ইচ্ছা শরঈ নিয়মানুযায়ী মাসেহ কর।

(৩) অথবা, প্রথম দিকে মাসেহের ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্দিষ্ট ছিল না। পরবর্তীতে সময় নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে।

কিয়াসী দলীলের জবাবঃ (১) কোন বিষয়ে কিয়াস তো তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন এ ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে কোন বর্ণনা না পাওয়া যায়। কিন্তু মোজা মাসেহের ক্ষেত্রে তো একাধিক সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে। সুতরাং সহীহ হাদীসসমূহের মুকাবিলায় কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়।

(২) তাছাড়া কিয়াসটি শুদ্ধ হয়নি। কেননা, মাথা মাসেহ করা এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ফরয, যার বিকল্প অন্য কোন ব্যবস্থা নেই। আর মোজার উপর মাসেহ করা এটি পা ধৌত করার পরিবর্তে একটি বিকল্প পদ্ধতি। সুতরাং উভয়টির হুকুমও ভিন্ন হবে, এটিই যুক্তিসঙ্গত।

بَاب كَيْفَ الْمَسْحِ ص٢٢ : মাসেহ করার পদ্ধতি

... عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ اَسْفَلُ الْخُفِّ اَوْلٰى بِالْمَسْحِ مِنْ اَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلٰى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ–

অনুবাদঃ ... হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দ্বীনের মাপকাঠি যদি রায়ের (যুক্তির) উপর নির্ভরশীল হত, তবে মোজার উপরের অংশে মাসেহ না করে নিম্নাংশে মাসেহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হত। রাবী হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মোজার উপরের অংশে মাসেহ করতে দেখেছি।

বিশ্লেষণঃ মোজার উপরিভাগ মাসেহ করতে হবে, নাকি নিম্নভাগ- এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, ইসহাক, যুহরী ও ইবন মুবারক (রহ.)-এর মতে, মোজাদ্বয়ের উপর ও নিচে উভয়দিকে মাসেহ করতে হবে। অতঃপর ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, উভয়দিকে মাসেহ করা ওয়াজিব। আর ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, উপরের অংশে মাসেহ করা ওয়াজিব, আর নিচের অংশে মাসেহ করা সুন্নত বা মুস্তাহাব।

দলীলঃ ... عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَمَسَحَ اَعْلَى الْخُفَّيْنِ وَاَسْفَلَهُمَا- (ابو داود ج١ ص٢٢، ترمذي ج١ ص٢٨ باب في المسلح على الخفين اعلاه واسفله، ابن ماجة ص٤٢)

অর্থাৎ, ... মুগীরা ইবন শোবা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাবুকের যুদ্ধে নবী করীম (সাঃ)-কে অযু করিয়েছি। তখন তিনি মোজার উপরের ও নিচের অংশ (উভয়ই) মাসেহ করেন।

* ইমাম আবু হানিফা, আহমদ ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে, মোজার শুধু উপরের অংশ মাসেহ করা আবশ্যক। নিচের অংশ মাসেহ করা বিধানসম্মত নয়।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ ... عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا- (ترمذي ج١ ص٢٨)

অর্থাৎ, ... মুগীরা ইবন শোবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-কে দেখেছি, তিনি মোজার উপরের দিকে মাসেহ করেছেন।

জবাবঃ (১) উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করার পর স্বয়ং আবু দাউদ (রহ.) হাদীসটি দুর্বল (যঈফ) সাব্যস্ত করতে গিয়ে বলেন-

بَلَغَنِيْ اَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ثَوْرٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ رَّجَاءٍ- অর্থাৎ, আমার নিকট (এ কথা) পৌঁছেছে যে, সাওর এই হাদীসটি রাজা (নামক ব্যক্তি) থেকে শোনেননি।

(২) ইমাম তিরমিযী (রহ.) হাদীসটিকে ত্রুটিযুক্ত (মালূল) বলেছেন।

(৩) হাদীসের সনদে রাবী ওলীদ মুদাল্লিস।

অতএব যঈফ, মালূল ও মুদাল্লিস রাবী বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রদত্ত দলীল গ্রহণযোগ্য নয়।

(৪) সর্বোপরি বলা যায়, যদি এটাকে প্রমাণযোগ্য মেনেও নেয়া হয়, তখন এর উত্তর হল, হয়ত নবী করীম (সাঃ) মোজার নিচের অংশ ধরে শুধু উপরের অংশে মাসেহ করেছেন। আর নিচের অংশে ধরাকে রাবী মাসেহ মনে করেছেন।

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ الْقُبْلَةِ ص٢٤ ঃ (স্ত্রীকে) চুম্বনের পর অযু করা

... عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِّنْ نِّسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ عُرْوَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَنْ هِيَ اِلاَّ اَنْتِ فَضَحِكَتْ– (ترمذي ج١ ص٢٥ باب ترك الوضوء من القبلة، نسائي ج١ ص٣٩ باب ترك الوضوء من القبلة، ابن ماجة ص٣٨–٣٩)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) তাঁর কোন এক স্ত্রীকে চুম্বন করে অযু করা ব্যতিরেকে নামায পড়তে যান। উরওয়া (রহ.) বলেন, আমি তাঁকে (আয়িশাকে) জিজ্ঞাসা করলাম, তিনিই কি আপনি নন? এতদশ্রবণে তিনি মুচকি হাসি দেন।

বিশ্লেষণঃ মহিলাকে স্পর্শ করা বা চুমু খাওয়া অযু ভঙ্গের (ناقض وضوء) কারণ কিনা- এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ
* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, মহিলাকে স্পর্শ করা বা চুমু খাওয়া অযু ভঙ্গের কারণ। তবে ইমামগণ এতে কিছুটা শর্তারোপ করেছেন। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, তিনটি শর্তের সাথে তা অযু ভঙ্গের কারণ-
(১) মহিলা বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্কা হতে হবে।
(২) গায়রে মাহ্রাম (যাদেরকে বিয়ে করা হারাম নয় এমন) মহিলা হতে হবে।
(৩) শাহওয়াত বা কামনার সাথে স্পর্শ করতে হবে।

শাফেঈদের নিকট শুধু একটি শর্ত, তা হচ্ছে স্পর্শ আবরণহীনভাবে হলে। অতএব আবরণহীনভাবে কোন ছোট কিংবা বড় মেয়ে, মাহরাম কিংবা গায়রে মাহরাম, কামনার সাথে কিংবা কামনা ছাড়া হোক, স্পর্শ করলেই তা অযু ভঙ্গের কারণ হবে। এমন কি কোন কোন শাফেঈ মতাবলম্বী বলেন, যদি কেউ মহিলাকে চড়-থাপ্পড় দেয় অথবা তার জখমের চিকিৎসা করে, তবেও তার অযু ভেঙ্গে যাবে। (بذل المجهود ج١ ص١٠٧)

দলীলঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- ... اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا
অর্থাৎ, ... অথবা তোমরা যদি নারী স্পর্শ (গমন) করে থাক, কিন্তু পরে পানি না পাও, তবে পাক-পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও। (নিসাঃ ৪৩)
উক্ত আয়াতে لمس শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ- হাত দ্বারা স্পর্শ করা। আর আয়াতে নারী স্পর্শ করার পর পানি না পেলে মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করার কথা বলা হয়েছে। অতএব, বুঝা যায় যে, নারী স্পর্শ বা চুমু অযু ভঙ্গের কারণ।

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, সুফিয়ান সাওরী ও যুফার (রহ.)-এর মতে, মহিলা স্পর্শ করা বা চুমু খাওয়া সাধারণভাবে অযু ভঙ্গের কারণ নয়।

(احكام القرآن ج٢ ص٤٥٠، تنظيم الاشتات ج١ ص١٣٤)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত-

... لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ وَاَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِيْ فَضَمَمْتُهَا اِلَيَّ ثُمَّ يَسْجُدُ– (ابو داود ج١ ص١٠٣ باب من قال المرأة لا تقطع الصلٰوة، بخاري ج١ ص١٦١ باب ما يجوز من العمل في الصلٰوة، مسلم ج١ ص١٩٨ باب سترة المصلى الخ، نسائي ج١ ص٣٨ باب ترك الوضوء من مس الرجل الخ)

অর্থাৎ, ... আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এরূপ অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছি যে, আমি তাঁর সম্মুখে শুয়ে থাকতাম। যখন তিনি সিজদা করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি আমার পায়ে খোঁচা দিলে আমি পা টেনে নিতাম এবং তিনি সিজদায় যেতেন।

দলীল (৩)ঃ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِّنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِيْ عَلٰى بَطْنِ قَدَمِه وَهُوَ فِيْ الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ– (مسلم ج١ ص١٩٢ باب ما يقال في الركوع والسجود، نسائي ج١ ص٣٨ ترك الوضوء من مس الرجل الخ)

অর্থাৎ, আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি আমার বিছানা থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে হারিয়ে ফেললাম। অতঃপর আমি তাঁকে তালাশ করতে গিয়ে আমার হাত তাঁর পায়ের তালুতে পড়ল। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। তাঁর পদদ্বয় ছিল খাড়া। তখন তিনি (নিম্নোক্ত) দোয়া পড়ছিলেন- "হে আল্লাহ! আমি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সন্তোষের আশ্রয় গ্রহণ করছি।"

উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, মহিলা স্পর্শ অযু ভঙ্গের কারণ নয়। যদি স্পর্শ অযু ভঙ্গের কারণ হত, তাহলে আয়িশা (রাঃ)-এর স্পর্শের কারণে নবী করীম (সাঃ) নামায ছেড়ে দিতেন।

জবাবঃ (১) মুফাস্‌সিরকুল শিরোমনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) উক্ত আয়াতে বর্ণিত اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ কে সহবাস দ্বারা তাফসীর করেছেন। আর হযরত আলী, আবু মূসা আশআরী (রাঃ), আতা, তাউস, হাসান বসরী, শাবী ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.) প্রমুখের অভিমতও অনুরূপ। যদিও শাফেঈ ও মালিকীগণ হযরত ইবন মাসউদ ও ইবন উমর (রাঃ)-এর তাফসীরকে গ্রহণ করে বলেন যে, এর দ্বারা

উদ্দেশ্য হল স্পর্শ করা, সহবাস নয়। কিন্তু একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, তাফসীরের ক্ষেত্রে ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর তাফসীর অধিক নির্ভরযোগ্য। যা হানাফীগণ গ্রহণ করেছেন।

(২) যখন مس، لمس (স্পর্শ, ছোঁয়া, পরশ, সংস্পর্শ)-এর نسبت মহিলার দিকে করা হয়, তখন এর অর্থ হবে সহবাস। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী- وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ অর্থাৎ, যদি তোমরা তাদেরকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দাও। ... (বাকারাঃ ২৩৭)

উক্ত আয়াতে সর্বসম্মতিক্রমে مس দ্বারা সহবাস উদ্দেশ্য, হাতে স্পর্শ করা উদ্দেশ্য নয়। (تنظيم ج١ ص١٣٥)

(৩) তাছাড়া, কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রদত্ত দলীলে لَمَسْتُمْ শব্দটি بَاب مُفَاعَلَة থেকে এসেছে, যা ক্রিয়ার (فعل) ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ থেকে অংশীদারিত্ব বুঝায়। আর এই অংশীদারিত্ব সহবাস ও স্ত্রী মিলনেই হতে পারে।

(درس مشكٰوة ج١ ص١٤٤، درس ترمذي ج١ ص٣١١)

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ ص٢٤

পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার কারণে অযু

... عَنْ عُرْوَةَ يَقُوْلُ دَخَلْتُ عَلٰى مَرْوَانَ ابْنِ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَا يَكُوْنُ مِنْهُ الْوُضُوْءُ فَقَالَ مَرْوَانُ وَمِنْ مَّسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ عُرْوَةُ مَا عَلِمْتُ ذٰلِكَ فَقَالَ مَرْوَانُ اَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ– (ترمذي ج١ ص٢٥ باب الوضوء من مس الذكر، نسائي ج١ ص٣٨ باب الوضوء من مس الذكر، ابن ماجة ص٣٧)

অনুবাদঃ ... উরওয়া (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মারওয়ান ইবনুল হাকামের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি কারণে অযু করার প্রয়োজন হয়? জবাবে মারওয়ান বললেন, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে। তখন উরওয়া জিজ্ঞাসা করেন, আপনি তা কিরূপে জানলেন? মারওয়ান বলেন, বুসরা বিনত

সাফওয়ান (রাঃ) আমাকে জানিয়েছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি নিজ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে, সে যেন অবশ্যই অযু করে নেয়।

বিশ্লেষণঃ পুরুষাঙ্গ বা নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করা অযু ভঙ্গের কারণ কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে এখতেলাফ রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ ও আহমদ ইবন হাম্বলের মতে এবং মালিক (রহ.)-এর সুপ্রসিদ্ধ অভিমত অনুসারে, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে অযু ভেঙ্গে যাবে। ইসহাক, আওযাঈ, যুহরী ও মুজাহিদ (রহ.)-এর অভিমতও অনুরূপ। তবে এ ব্যাপারে তিন ইমামের মাঝে কিছুটা এখতেলাফ রয়েছে। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, পুরুষাঙ্গ স্পর্শে অযুভঙ্গের তিনটি শর্ত রয়েছে-

(ক) হাতের তালু দ্বারা স্পর্শ করা, (খ) কোন পর্দা ছাড়া সরাসরি স্পর্শ করা, (গ) স্বাদ বা উপভোগের উদ্দেশ্যে স্পর্শ করা।

ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ নিঃশর্তে অযু ভঙ্গকারী।

ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, যদি খোলা হাতের তালুতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করে তবে তা অযু ভঙ্গকারী হবে। তাঁর মতে, মহিলাদের লজ্জাস্থান স্পর্শ করার হুকুমও তাই। ইমাম শাফেঈ (রহ.) 'কিতাবুল উম্ম'-এ স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যে, পায়ুপথ স্পর্শ করাও অযু ভঙ্গের কারণ।

তিন ইমামের দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, ইবন মুবারক, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখঈ ও হাসান বসরী (রহ.)-এর মতে, পুরুষাঙ্গ, মহিলার লজ্জাস্থান ও পায়ুপথ স্পর্শ করা অযু ভঙ্গকারী নয়। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম মালিক (রহ.)-এর অভিমতও তাই।

দলীলঃ ... عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَدِمْنَا عَلٰى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُل كَأَنَّه بَدَوِيٌّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ مَا تَرٰى فِيْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ هُوَ اِلاَّ مُضْغَةٌ مِّنْهُ اَوْ بَضْعَةٌ مِّنْهُ– (ابو داود ج١ ص٢٤ باب الرخصة في ذلك، ترمذي ج١ ص٢٥ باب ترك الوضوء من مس الذكر، نسائي ج١ ص٣٨، ابن ماجة ص٣٧).

অর্থাৎ, ... কায়েস ইবন তালক্ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। একদা আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট গমন করি। এমন সময় সেখানে একজন গ্রাম্য লোক আগমন করে মহানবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করে, হে আল্লাহর নবী! অযু করার পর যদি কোন ব্যক্তি নিজের পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে তবে এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, পুরুষাঙ্গ তো তার দেহের গোশতের একটি টুকরা বা খণ্ড ব্যতীত কিছু নয়।
উক্ত হাদীসে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, অন্যান্য অঙ্গ স্পর্শ করার কারণে যেমন অযু নষ্ট হয় না, অনুরূপ পুরুষাঙ্গও শরীরের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় একটি অঙ্গ মাত্র। তাই এটিকেও স্পর্শ করলে অযু ভঙ্গ হবে না।

দলীল (২)ঃ হযরত ইবন আব্বাস, ইবন মাসউদ, হুযায়ফা ও আলী (রাঃ)-এর আছার। তাঁরা প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে বলেন-

مَا اُبَالِيْ ذَكَرِيْ مَسَسْتُ فِيْ الصَّلٰوةِ اَوْ اُذُنِيْ اَوْ اَنْفِيْ– (طحاوي ج١ ص٤٧)

অর্থাৎ, আমি নামাযে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলাম, নাকি আমার কান বা নাক স্পর্শ করলাম, তা নিয়ে আমার কোন ভাবনা নেই।

দলীল (৩)ঃ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ اَوْ اُنْثَيَيْهِ اَوْ رُفْغَيْهِ (اَيْ اُصُوْلَ فَخِذَيْهِ) فَلْيَتَوَضَّأْ لِلصَّلٰوةِ–
(مجمع الزوائد ج١ ص٢٤٥)

অর্থাৎ, বুসরা বিনত সাফওয়ান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে তার পুরুষাঙ্গ বা অণ্ডকোষ অথবা উরুর মূল অংশ স্পর্শ করবে, সে যেন নামাযের অযুর ন্যায় অযু করে।
উক্ত হাদীসে পুরুষাঙ্গের সাথে অণ্ডকোষ ও উরুর মূল অংশ স্পর্শ করার কারণে অযু করার হুকুম দেয়া হয়েছে। অথচ অণ্ডকোষ ও উরুদ্বয়ের মূল অংশ স্পর্শ করার কারণে কেউই অযু ভঙ্গের কথা বলেন না।

জবাবঃ (১) আহনাফদের হাদীস বর্ণনাকারী হযরত তাল্‌ক (রাঃ) হলেন একজন পুরুষ। পক্ষান্তরে তিন ইমামের হাদীসের রাবী বুসরা বিনত সাফওয়ান হলেন একজন মহিলা। আর এক্ষেত্রে মহিলার চেয়ে পুরুষের বর্ণিত হাদীস অধিক শক্তিশালী। কেননা, একথা তো সর্বজনবিদিত যে, একজন পুরুষের সাক্ষ্য দু'জন মহিলার সাক্ষ্যের সমান। অতএব, তাল্‌কের হাদীস অধিক গ্রহণযোগ্য। (درس مشكوة ج١ ص١٤٢)
(২) বুসরার হাদীসে মারওয়ান নামক এক রাবী রয়েছেন। যিনি খলীফা হওয়ার পূর্বে নির্ভরযোগ্য ছিলেন। কিন্তু খলীফা হওয়ার পর বিভিন্ন কারণে তিনি অনির্ভরযোগ্য হয়ে যান। তাছাড়া, তিনি বুসরার নিকট এক পুলিশ পাঠিয়ে উক্ত হাদীস জেনে নেন। আর সে পুলিশ অজ্ঞাত (مجهول)। সুতরাং তা দলীলযোগ্য নয়। (طحاوي ج١ ص٤٣)
(৩) তাল্‌কের হাদীস বর্ণনা করার পর ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন-

هٰذَا الْحَدِيْثُ اَحْسَنُ– (ترمذي ج۱ ص۲۵) অর্থাৎ, এ হাদীসটি সর্বোত্তম।

(৪) এ হাদীসের দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রস্রাব করা উদ্দেশ্য।

(৫) এর দ্বারা আভিধানিক অযু বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ শুধু হাত ধৌত করা। যেমন হাদীসে এসেছে- اَلْوُضُوْءُ قَبْلَ الطَّعَامِ– (ترمذي ج۲ ص٦، تنظيم ج۱ ص۱۳۳) -
অর্থাৎ, খাবার পূর্বে অযু কর।

(৬) যদি এর দ্বারা প্রকৃত অযুই ধরে নেয়া হয়, তখন এর অর্থ হবে, এটা মুস্তাহাব। অতএব, আর কোন অসামঞ্জস্য থাকে না।

(৭) হাদীসগুলোর মাঝে পারস্পরিক বিরোধের সময় কিয়াসের শরণাপন্ন হতে হয়। কিয়াস দ্বারাও হানাফীদের মাযহাবের সহায়তা হয়। কারণ, মল-মূত্র ইত্যাদি যেগুলো সরাসরি নাপাক, সেগুলো স্পর্শ করলে যেহেতু কারো মতেই অযু ভঙ্গ হয় না; তাই সুনির্দিষ্টভাবে যেসব অঙ্গের পবিত্রতা সর্বসম্মত, সেগুলো স্পর্শ করলে তো অযু ভঙ্গ না হওয়ারই কথা। (درس ترمذي ج۱ ص۳۰۹)

بَابُ فِيْ تَرْكِ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ص۲۵

আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর অযু না করা

... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ– (مسلم ج۱ ص۱۵۷ باب الوضوء مما مست النار، ابن ماجة ص۳۸)

অনুবাদঃ ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বকরীর রান খাওয়ার পর অযু না করেই নামায আদায় করেন।

বিশ্লেষণঃ আগুনে পাকানো জিনিস খেলে অযু ভেঙ্গে যাবে কিনা তথা অযু করা ওয়াজিব কিনা, এ ব্যাপারে প্রথম দিকে সাহাবায়ে কিরামের মাঝে মতানৈক্য ছিল।

* হযরত আবু হুরায়রা, আব্দুল্লাহ ইবন উমর ও যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ)-এর মতে, আগুনে পাকানো কোন বস্তু খেলে অযু ভেঙ্গে যাবে। তাই নামায আদায়ের জন্য নতুন করে অযু করা ওয়াজিব।

দলীল (১)ঃ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوُضُوْءُ مِمَّا اَنْضَجَتِ النَّارُ (ابو داود ج۱ ص۲٦ باب التشد يد في ذلك، مسلم ج۱ ص۱۵۷، ترمذي ج۱ ص۲٤ باب الوضوء مما غيرت النار، نسائي ج۱ ص۳۹ باب الوضوء مما غيرت النار، ابن ماجة ص۳۸)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, রন্ধনকৃত দ্রব্যাদি আহার করলে অযু করতে হবে।

দলীল (২)ঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন- تَوَضَّؤُا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ অর্থাৎ, আগুনে রান্না করা খাদ্য আহারের পর তোমরা অযু কর। (সূত্রঃ ঐ)

উল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় যে, এক্ষেত্রে অযু করা ওয়াজিব।

* খোলাফায়ে রাশেদা, ইবন মাসউদ, ইবন আব্বাস, জাবির, আনাস (রাঃ) ও চার ইমামসহ জমহুর সাহাবা-তাবেঈনের মতে, আগুনে পাকানো বস্তু খেলে অযু ভাঙ্গবে না।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْتَهَسَ مِنْ كَتِفٍ ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ– (ابو داود ج١ ص٢٥)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) তাঁর সামনের দাঁত দিয়ে (বকরীর) ঘাড়ের গোশত খান। অতঃপর তিনি অযু না করেই নামায পড়েন।

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ اٰخِرُ الْاَمْرَيْنِ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكَ الْوُضُوْءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ– (ابو داود ج١ ص٢٥)

অর্থাৎ, ..জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দু'টি কাজের সর্বশেষ কাজ এই ছিল যে, তিনি রান্না করা খাদ্য আহারের পর অযু করেননি।
উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা এবং আরো অন্যান্য অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এক্ষেত্রে অযু ভাঙ্গবে না। তাই অযু করা ওয়াজিব নয়।

জবাবঃ (১) আগুনে পাকানো জিনিস খেলে অযু করতে হবে, এর হুকুম যদি থেকেও থাকে, তবে তা রহিত হয়ে গেছে। এর দলীল হল, উপরে বর্ণিত হযরত জাবির (রাঃ)-এর হাদীস।
(২) হাদীসে বর্ণিত অযু দ্বারা শরঈ বা পারিভাষিক অযু উদ্দেশ্য নয়, আভিধানিক অযু উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, খাওয়ার পর হাত-মুখ ধৌত করা। যেমন ইকরাশ ইবন যুয়াইব (রাঃ)-এর দাওয়াত সংক্রান্ত এক হাদীসে বর্ণিত আছে-

... ثُمَّ اَتَيْنَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِبَلَلِ كَفَّيْهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَقَالَ يَا عِكْرَاشُ! هٰذَا الْوُضُوْءُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ– (ترمذي ج٢ ص٧ باب التسمية على الطعام، مجمع الزوائد ج١ ص١٥١)

অর্থাৎ, ... অতঃপর আমাদের কাছে পানি আনা হল, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর হস্তদ্বয় ধৌত করলেন। আর পানিতে ভেজা হাতের তালুর দ্বারা তাঁর চেহারা, দু'হাত ও মাথা মাসেহ করলেন। আর বলেন, হে ইকরাশ! এই অযু আগুনের রান্নাকৃত খাদ্য ভক্ষণের কারণে।

(৩) ইমাম নববী (রহ.) বলেন, এ বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, আগুনে পাকানো দ্রব্য খেলে অযু করা ওয়াজিব নয়।

(৪) অথবা, হাদীসে বর্ণিত অযু হুকুম মুস্তাহাবরূপে পরিগণিত, ওয়াজিব হিসেবে নয়। এর প্রমাণ নবী করীম (সাঃ) থেকে অযু করা ও না করা উভয়টি প্রমাণিত। এটা মুস্তাহাব হওয়ার জন্যই।

(৫) হাফেয ইবন কায়্যিম (রহ.) বলেন, যেহেতু আগুনে পাকানোর ফলে বস্তুতে আগুনের একটি প্রভাব থেকে যায়। আর আগুন হল শয়তান সৃষ্টির মূল উপাদান। আর আগুন পানি দ্বারা নিভে যায়। এ হিকমতের জন্যই অযুর হুকুম দেয়া হয়েছে। যেমন রাগান্বিত অবস্থায় অযুর হুকুম দেয়া হয়ে থাকে- যা মুস্তাহাব।

(৬) ইমাম মুহাল্লিব (রহ.) বলেন, যেহেতু সাহাবাগণ জাহেলী যুগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে কম অভ্যস্ত ছিলেন, তাই ইসলামের প্রাথমিক যুগে পরিচ্ছন্নতার উপর অধিক গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে এমন হুকুম দেয়া হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, নবী করীম (সাঃ)-এর হায়াত মুবারকের শেষের দিকে মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়টিও রহিত করে দেয়া হয়েছে। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ مصنف ابن ابي شيبة ج١ ص٤٧، مجمع الزوائد ج١ ص٢٥١، اعلاء السنن ج١ ص١٧٥)

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ الدَّمِ ص٢٦ ঃ রক্ত বের হলে অযু করা

... عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِيْ فِيْ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَأَصَابَ رَجُلٌ اِمْرَأَةَ رَجُلٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَحَلَفَ اَنْ لَّا اَنْتَهِيَ حَتّٰى اُهْرِيْقَ دَمًا فِيْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فَخَرَجَ يَتْبَعُ اَثَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلاً فَقَالَ مَنْ رَّجُلٌ يَّكْلَؤُنَا فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِّنَ

الْمُهَاجِرِيْنَ وَرَجُلٌ مِّنَ الاَنْصَارِ فَقَالَ كُوْنَا بِفَمِ الشِّعْبِ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلاَنِ اِلٰى فَمِ الشِّعْبِ اضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ وَقَامَ الاَنْصَارِيُّ يُصَلِّيْ وَاَتَى الرَّجُلُ فَلَمَّا رَاٰى شَخْصَهٗ عَرَفَ اَنَّهٗ رَبِيْئَةٌ لِّلْقَوْمِ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيْهِ فَنَزَعَهُ حَتّٰى رَمَاهُ بِثَلٰثَةِ اَسْهُمٍ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ اَنْبَهَ صَاحِبَهُ فَلَمَّا عَرَفَ اَنَّهُمْ قَدْ نَذِرُوْا بِهٖ هَرَبَ فَلَمَّا رَاٰيَ الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْاَنْصَارِيِّ مِنَ الدِّمَاءِ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ اَلاَّ اَنْبَهْتَنِيْ اَوَّلَ مَا رَمٰى قَالَ اِنْ كُنْتُ فِيْ سُوْرَةٍ اَقْرَؤُهَا فَلَمْ اُحِبَّ اَنْ اَقْطَعَهَا– (بخاري ج١ ص٢٩ باب من لم يرى الوضوء الخ)

অনুবাদঃ ... জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে যাতুর রিকা নামক যুদ্ধে গমন করি। মুসলিম বাহিনীর এক ব্যক্তি মুশরিকদের এক স্ত্রীকে বন্দী অথবা হত্যা করে। তখন সে ব্যক্তি এরূপ শপথ করে যে, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষান্ত হব না, যতক্ষণ না মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কোন একজন সাহাবীর রক্ত প্রবাহিত করি। তখন সে নবী করীম (সাঃ)-এর অনুসরণ করতে লাগল। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) রাতে বিশ্রামের জন্য এক স্থানে অবতরণ করেন এবং বলেন, কে আছে যে আমাদের পাহারা দিবে? তখন মুহাজিরদের মধ্য হতে একজন এবং আনসারদের মধ্য হতে একজন সাড়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তোমরা দুইজন গিরিপথের চূড়ায় পাহারা দিবে। অতঃপর উক্ত ব্যক্তিদ্বয় সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর মুহাজির সাহাবী বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়েন এবং আনসারী সাহাবী নামাযে রত হন। তখন শত্রু পক্ষের ঐ ব্যক্তি (স্ত্রীলোকটির স্বামী) সেখানে আগমন করে এবং মুসলিম বাহিনীর একজন গোয়েন্দা মনে করে তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করে এবং তা আনসার সাহাবীর শরীরে বিদ্ধ হয়। তিনি তা দেহ থেকে বের করে ফেলেন। মুশরিক ব্যক্তি এভাবে পরপর তিনটি তীর নিক্ষেপ করে। অতঃপর তিনি রুকু-সিজদা করে (নামায শেষে) তাঁর সাথীকে জাগ্রত করেন। অতঃপর সে ব্যক্তি সেখানে অনেক লোক আছে এবং তারা সতর্ক হয়ে গেছে মনে করে পালিয়ে যায়। পরে মুহাজির সাহাবী আনসারী সাহাবীর রক্তাক্ত অবস্থা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেন, সুবহানাল্লাহ! শত্রু পক্ষের প্রথম তীর নিক্ষেপের সময় কেন আপনি আমাকে সতর্ক করেননি? জবাবে তিনি বলেন, আমি নামাযের মধ্যে (তন্ময়তার সাথে) এমন একটি সূরা পাঠ করছিলাম যা শেষ না করে নামায ছেড়ে দেয়া পছন্দ করিনি।

বিশ্লেষণঃ শরীর থেকে রক্ত বের হওয়া অযু ভঙ্গের কারণ কিনা- এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, রবীআ ও মাকহুল (রহ.)-এর মতে, পেশাব-পায়খানার রাস্তা ছাড়া অন্য কোন স্থান থেকে রক্ত বা পুঁজ বের হলে অযু ভাঙ্গবে না।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসের শেষের দিকে বর্ণিত আছে যে, আনসারী সাহাবী (আব্বাদ ইবন বিশর রা.)-কে পরপর তিনটি তীর দ্বারা রক্তাক্ত করার পরেও তিনি রুকু-সিজদা করেছেন। আর রক্ত বের হওয়াতে যদি অযু ভেঙ্গেই যেত, তাহলে তো তিনি অযুবিহীন অবস্থায় নামায পড়তেন না।

দলীল (২)ঃ দারা কুতনীতে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস-

اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِحْتَجَمَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ– (تنظيم الاشتات ج١ ص١٣٧)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) শিঙ্গা লাগানোর পর অযু না করে নামায পড়েছেন।

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, আহমদ, আওযাঈ, সুফিয়ান সাওরী, কাতাদা, ইবরাহীম নাখঈ ও যুহরী (রহ.)-এর মতে, শরীরের যেকোন অংশ থেকে রক্ত বা পুঁজ বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে অযু ভেঙ্গে যাবে।

দলীল (১)ঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত মারফূ হাদীস-

... قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَصَابَهُ قَيْئٌ اَوْ رُعَافٌ اَوْ قَلَسٌ اَوْ مَذِيٌّ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلٰوتِهِ وَهُوَ فِيْ ذٰلِكَ وَهُوَ فِيْ ذٰلِكَ لاَ يَتَكَلَّمْ– (ابن ماجة ص٨٥ باب في البناء على الصلٰوة)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যার বমি হয়েছে অথবা নাক দিয়ে রক্ত ঝরেছে অথবা পেট থেকে মুখে পানি এসেছে কিংবা মযী (বীর্যপাতের পূর্বে নিঃসৃত অপেক্ষাকৃত তরল শুক্ররস) বেরিয়েছে, সে যেন ফিরে গিয়ে অযু করে। অতঃপর সে ইতোমধ্যে যদি কথা না বলে থাকে, তাহলে স্বীয় নামাযের উপর বিনা করে অর্থাৎ পূর্বে যেখান থেকে নামায ভঙ্গ হয়েছে সেখান থেকে পূর্ণ করে।

দলীল (২)ঃ নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণিত একটি বাচনিক (قولي) মারফূ হাদীস-

اَلْوُضُوْءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ– (نصب الراية ج١ ص١٢١) অর্থাৎ, প্রতিটি প্রবাহিত রক্তের কারণে অযু করতে হবে।

দলীল (৩)ঃ **... عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ اَبِيْ حُبَيْشٍ قَالَتْ اِنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَاِنَّهُ دَمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ فَاِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَاَمْسِكِيْ عَنِ الصَّلٰوةِ فَاِذَا كَانَ الْاٰخَرُ فَتَوَضَّئِيْ وَصَلِّيْ فَاِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ**– (ابو

داود ج١ ص٣٩ باب اذا قبلت الحيضة تدع الصلٰوة، بخاري ج١ ص٤٦ باب اقبال المحيض وادباره، مسلم ج١ ص١٥١ باب استحاضة وغسلها وصلٰوتها، ترمذي ج١ ص٣٢ باب المستحاضة، نسائي ج١ ص٤٥ باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة)

অর্থাৎ, ... ফাতিমা বিনত আবু হুবায়েশ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি ইস্তেহাযাগ্রস্ত (রক্তপ্রদর) হওয়ায় নবী করীম (সাঃ) তাঁকে বলেন, হায়েযের রক্ত হল কালো রংয়ের। কাজেই যখন রক্তপ্রবাহের সময় কালো রং দেখা দিবে তখন নামায ত্যাগ করবে এবং যখন কালো ছাড়া অন্য রং দেখা দিবে, তখন থেকে অযু করে নামায আদায় করবে। কেননা, এটা বিশেষ শিরা হতে নির্গত রক্ত।
উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রক্ত বের হওয়া অযু ভঙ্গের কারণ।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ (১) উক্ত হাদীসে মুহাম্মদ ইবন ইসহাক নামক একজন রাবী রয়েছেন। তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ অনেক সমালোচনা করেছেন। যেমন, কেউ কেউ তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবার কেউ তাকে দাজ্জাল বলতেও কৃপণতা করেননি। তাছাড়া হাদীসে 'আকীল' নামক যে রাবী রয়েছেন তিনি অজ্ঞাত। অতএব, এ হাদীসটি দলীলযোগ্য নয়।
(২) ইহা ছিল এক সাহাবীর ব্যক্তিগত ইজতিহাদ। যা বাচনিক (কাওলী) হাদীসের মুকাবিলায় দলীলযোগ্য নয়।
(৩) এমনও হতে পারে যে, রক্ত বের হওয়া যে অযু ভঙ্গের কারণ, এই ইলম (জ্ঞান) তখন পর্যন্ত ঐ সাহাবীর জানা ছিল না।
(৪) অথবা, রক্ত বের হওয়া যে অযু ভঙ্গের কারণ তখনো এ বিধান ছিল না, পরবর্তীতে এই বিধান নির্ধারিত হয়েছে।
(৫) সাহাবী হযরত আব্বাদ (রাঃ) নামায ও কুরআন তিলাওয়াতের স্বাদ উপভোগে এতটা বিভোর ছিলেন যে, হয়তো তাঁর রক্ত বের হওয়ার খবরই ছিল না। অথবা খবর ছিল কিন্তু তিলাওয়াতের স্বাদ উপভোগের প্রাবল্যের কারণে নামায ভঙ্গ করতে পারেননি। যেমন হাদীসটির শেষে বলা হয়েছে-

اِنْ كُنْتُ فِيْ سُوْرَةٍ اَقْرَؤُهَا فَلَمْ اُحِبَّ اَنْ اَقْطَعَهَا– (অর্থ পূর্বে দেয়া হয়েছে)

সুতরাং এটা ছিল অবস্থার প্রাবল্য। যার দ্বারা কোন ফিকহী মাসআলা উৎসারণ করা যায় না। কারণ এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা।
দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ (১) উক্ত হাদীসে সালেহ বিন মুতাকিল এবং সালমান ইবন দাউদ উভয়েই দুর্বল রাবী। সুতরাং উক্ত হাদীস দলীলযোগ্য নয়।
(২) অথবা, হাদীসে বর্ণিত অযু না করার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তিনি তাৎক্ষণিক অযু করেননি। আর তাৎক্ষণিক অযু না করার দ্বারা তিনি যে একেবারেই অযু করেননি, এমনটি বলা ঠিক নয়। (تنظيم الاشتات ج١ ص١٣٨)

بَابُ فِيْ الْمَذِيِّ ص٢٧ ঃ মযী (বীর্যরস) সম্পর্কে

... عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَجَعَلْتُ اَغْتَسِلُ حَتّٰى تَشَقَّقَ ظَهْرِيْ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ ذُكِرَ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَفْعَلْ اِذَا رَأَيْتَ الْمَذِيَّ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلٰوةِ وَاِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ– (بخاري ج١ ص٤١ باب الغسل المذي والوضوء منه، مسلم ج١ ص١٤٣ باب المذي، نسائي ج١ ص٣٦ باب ما ينقض الوضوء الخ)

অনুবাদঃ ... হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার প্রায়ই মযী* নির্গত হত এবং আমি গোসল করতাম। এমনকি এ কারণে (অধিক গোসলের ফলে ঠাণ্ডাবশতঃ) আমি আমার পৃষ্ঠদেশে ব্যথা অনুভব করতাম। অতঃপর আমি বিষয়টি নবী করীম (সাঃ)-এর খিদমতে উল্লেখ করি অথবা (রাবী বলেন) অন্য কারো দ্বারা পেশ করি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তুমি এরূপ করবে না। বরং যখনই তুমি তোমার লিঙ্গাগ্রে মযী দেখবে, তখনই তা ধৌত করবে এবং নামায আদায়ের জন্য অযু করবে। অবশ্য যদি কোন সময় উত্তেজনাবশতঃ বীর্য নির্গত হয় তবে গোসল করবে।

বিশ্লেষণঃ উক্ত অনুচ্ছেদে দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হবে-
(ক) কাপড়ে মযী লাগলে পাক করার পদ্ধতি কি হবে?
(খ) মযী নির্গত হলে লিঙ্গ ধোয়ার বিধান সম্পর্কে।

প্রথম আলোচনাঃ কাপড়ে মযী লাগলে তা পাক করার পদ্ধতি কি হবে- এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম আহমদ ও আহলে যাহিরের মতে, কাপড় ধৌত করার কোন প্রয়োজন নেই; বরং সংশ্লিষ্ট স্থানে শুধু পানির ছিটিয়ে দিলেই কাপড় পাক হয়ে যাবে।

দলীলঃ ... عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنْتُ اَلْقٰى مِنَ الْمَذِيِّ شِدَّةً وَّكُنْتُ اُكْثِرُ مِنْهُ الْاِغْتِسَالَ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّمَا يُجْزِيْكَ عَنْ ذٰلِكَ الْوُضُوْءُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيْبُ ثَوْبِيْ مِنْهُ قَالَ يَكْفِيْكَ بِاَنْ

---

* সামান্য কামোত্তেজনার ফলে যে পাতলা আঠাল পানি পুরুষাঙ্গ হতে নির্গত হয় তাকে মযী বলে। তা বের হলে শুধু অযু ভঙ্গ হয়।

تَأْخُذَ كَفًّا مِّنْ مَّاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تُرٰى اَنَّهٗ اَصَابَه– (ابو داود ج١ ص٢٨، ترمذي ج١ ص٣١ باب المذي يصيب الثوب، ابن ماجة ص٣٩)

অর্থাৎ, ... সাহল ইবন হুনাইফ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার অত্যধিক মযী নির্গত হত। তাই আমি অধিক গোসল করতাম। অতঃপর আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, মযী বের হওয়ার পর অযু করাই যথেষ্ট। তখন আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাপড়ে মযী লাগলে কি করব? তিনি বলেন, তোমার জন্য যথেষ্ট হবে, কাপড়ের যে অংশে মযী লেগেছে তাতে এক আজলা পানি দেবে। যাতে তা দূরীভূত হয়।

উক্ত হাদীসে نضح শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ হল, পানি ছিটিয়ে দেয়া। সুতরাং ধোয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, কাপড়ে যদি মযী লাগে তাহলে তা ধৌত করা ওয়াজিব, যেরূপ পেশাব লাগার কারণে ধৌত করা ওয়াজিব। শুধু পানি ছিটানোর দ্বারা কাপড় পাক হবে না।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে নবী করীম (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে নির্দেশ দেন যে- اغسل ذكرك (তোমার পুরুষাঙ্গ ধৌত কর)। পুরুষাঙ্গ ধৌত করার হুকুমের কারণ হল, মযী লাগা। অতএব, কাপড়ের হুকুমও তাই হবে।

আকলী দলীলঃ মযী এটা তো নাপাক। সুতরাং নাপাক প্রস্রাব কাপড়ে লাগার কারণে যদি কাপড় ধৌত করা জরুরী হয়, তাহলে মযী কাপড়ে লাগলেও তা পবিত্র করার জন্য ধৌত করা জরুরী।

জবাবঃ যে সমস্ত হাদীসে نضح শব্দ এসেছে এর দ্বারা পানি ছিটানো উদ্দেশ্য নয়; বরং এর অর্থ হল হালকাভাবে ধুয়ে নেয়া। যার ইঙ্গিত হযরত আলী (রাঃ)-এর হাদীসেও প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া আরবী ভাষাভাষীরাও نضح দ্বারা গোসল বা ধৌত করা বুঝিয়ে থাকে।

দ্বিতীয় আলোচনাঃ মযী নির্গত হলে লিঙ্গ ধৌত করার বিধান কি- এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, মযী নির্গত হওয়ার পর পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষ উভয়টি ধৌত করা ওয়াজিব। মযী লাগুক কিংবা না লাগুক।

দলীল (১)ঃ ... عَنْ عُرْوَةَ ... قَالَ فَسَأَلَهُ الْمِقْدَادُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ— (ابو داود ج١ ص٢٨ ، نسائي ج١ ص٣٧)

অর্থাৎ, ... উরওয়া (রহ.) হতে বর্ণিত। ... রাবী বলেন, মিকদাদ (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-কে এতদসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ঐ ব্যক্তির স্বীয় লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ ধৌত করা উচিত।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ الاَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُوْجِبُ الْغُسْلَ وَعَنِ الْمَآءِ يَكُوْنُ بَعْدَ الْمَآءِ فَقَالَ ذَاكَ الْمَذِيُّ وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْذِيْ فَتَغْسِلُ مِنْ ذٰلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوْئَكَ لِلصَّلٰوةِ— (ابو داود ج١ ص٢٨)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ ইবন সাদ আল-আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে গোসল ফরয হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করি এবং পেশাবের পর মযী নির্গত হওয়ার ব্যাপারেও জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, এটা হল মযী এবং পুরুষাঙ্গ থেকে যখন মযী নির্গত হয়, তখন তুমি তোমার লজ্জাস্থান ও অণ্ডকোষদ্বয় ধৌত করবে। অতঃপর নামায আদায়ের জন্য অযু করবে।
উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে লিঙ্গ ও অণ্ডকোষদ্বয় ধৌত করার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, শুধু ঐ জায়গাটুকু ধৌত করা ওয়াজিব, যেখানে মযী লেগেছে। পুরো লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ ধৌত করা ওয়াজিব নয়।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে নবী করীম (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে শুধু লিঙ্গ ধৌত করার হুকুম দিয়েছেন অণ্ডকোষ ধৌত করার হুকুম দেননি।

আকলী দলীলঃ কোন জায়গা তখনই ধৌত করা ওয়াজিব, যখন তাতে নাপাক লাগে। সুতরাং অণ্ডকোষ বা পুরো লিঙ্গে মযী (নাপাক) না লাগলে তা ধৌত করা কোনক্রমেই ওয়াজিব হতে পারে না।

জবাবঃ (১) যে সকল হাদীসে পুরো লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ ধৌত করার কথা বলা হয়েছে, এর দ্বারা ওয়াজিব উদ্দেশ্য নয়; বরং মুস্তাহাব উদ্দেশ্য।
(২) ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, অণ্ডকোষদ্বয় ধোয়ার হুকুম শরঈ নয়; বরং চিকিৎসার্থে। কারণ ঠাণ্ডা পানি যেরূপভাবে পেশাব ও দুধ বন্ধ করে দেয়, এরূপভাবে মযীও বন্ধ করে। কারণ অণ্ডকোষের সাথেই মযীর সম্পর্ক।

بَابٌ فِيْ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ وَمُوَاكَلَتِهَا ص٢٨

ঋতুবতী স্ত্রীলোকের সাথে মেলামেশা ও খাওয়া-দাওয়া

عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ لِيْ مِنِ امْرَأَتِيْ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ لَكَ مَا فَوْقَ الْاِزَارِ وَذَكَرَ مُوَاكَلَةَ الْحَائِضِ اَيْضًا–

অনুবাদঃ ... হারাম ইবন হাকীম থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (চাচা) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আমার স্ত্রী যখন ঋতুবতী হয়, তখন সে আমার জন্য কতটুকু হালাল? তিনি (সাঃ) বলেন, তুমি কাপড়ের উপর দিয়ে যা কিছু করতে পার এবং ঋতুবতী স্ত্রীলোকের সাথে খানাপিনার বৈধতা সম্পর্কেও আলোচনা করলেন।

বিশ্লেষণঃ مُبَاشَرَة بِالْحَائِضِ বা ঋতুবতী স্ত্রীলোকের সাথে মেলামেশার অবস্থা তিনটি।

(ক) اِسْتِمْتَاعُ بِالْجِمَاعِ বা সঙ্গমের মাধ্যমে ফায়দা নেয়া।

(খ) اَلْمُبَاشَرَةُ فِيْمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ বা নাভির উপরে ও হাঁটুর নিচে মেলামেশার দ্বারা ফায়দা নেয়া।

(গ) اَلْمُبَاشَرَةُ فِيْمَا بَيْنَ السُّرَّةِ اِلَى الرُّكْبَةِ فِيْ غَيْرِ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ– অর্থাৎ, নাভির নিচ থেকে নিয়ে হাঁটুর উপর পর্যন্ত যৌনাঙ্গ এবং গুহ্যদ্বার ব্যতীত মেলামেশা করা।

প্রথম প্রকার সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِيْ الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ–

অর্থাৎ, আর তারা তোমার কাছে হায়েয (ঋতু) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এটা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। (বাকারাঃ ২২২)

অধিকাংশ আলিমের অভিমত হল, ইহাকে হালাল মনে করা কুফরী।

আর দ্বিতীয় প্রকার সর্বসম্মতিক্রমে হালাল। এই মেলামেশা চাই পুরুষাঙ্গ দ্বারা হোক কিংবা চুমুর দ্বারা হোক অথবা স্পর্শ-আলিঙ্গনের দ্বারা হোক এবং চাই কাপড়ের উপর দিয়ে হোক কিংবা কাপড় ছাড়া হোক, সর্বাবস্থায় জায়েয আছে।

তবে তৃতীয় প্রকারটি হালাল কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, ইসহাক, আওযাঈ, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখঈ, শাবী ও মুজাহিদ (রহ.)-এর মতে, কোন প্রকার কাপড় ছাড়াই নাভির নিচ থেকে

নিয়ে হাঁটুর উপর পর্যন্ত যৌনাঙ্গ ও গুহ্যদ্বার ব্যতীত ফায়দা নেয়া জায়েয আছে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) থেকেও অনুরূপ একটি অভিমত বর্ণিত আছে।

দলীল (১)ঃ ... عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِنَّ الْيَهُوْدَ كَانَتْ اِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ الْمَرْأَةُ اَخْرَجُوْهَا مِنَ الْبَيْتِ ... فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَامِعُوْهُنَّ فِيْ الْبُيُوْتِ وَاصْنَعُوْا كُلَّ شَيْئٍ غَيْرَ النِّكَاحِ الخ– (ابو داود ج١ ص٣٤ باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها، مسلم ج١ ص١٤٣ باب جواز غسل الحائض الخ، نسائي ج١ ص٥٥ باب تاويل قول الله الخ، ابن ماجة ص٤٧)

অর্থাৎ, ... আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদীদের অবস্থা এই যে, তারা ঋতুবতী স্ত্রীদের ঋতুর সময় ঘর হতে বের করে দেয়। ... অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে ঋতুকালীন একত্রে এক ঘরে বসবাস কর এবং সঙ্গম ছাড়া সব কিছুই করতে পার।

উক্ত হাদীসে আমভাবে বলা হয়েছে যে, শুধু সঙ্গম ছাড়া সবকিছুই জায়েয। সুতরাং কাপড় দ্বারা অন্তরাল থাকতে হবে এমন কোন শর্তারোপ করা হয়নি। অতএব, কাপড় না থাকা অবস্থায়ও রান থেকে ফায়দা নেয়া জায়েয হবে।

দলীল (২)ঃ উমারা ইবন গুরাব-এর ফুফু হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর নিকট হায়েয অবস্থায় স্বামীর সাথে সহাবস্থানের সঠিক পদ্ধতি কি, তা জানতে চাইলে তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

... دَخَلَ لَيْلاً وَاَنَا حَائِض فَمَضٰى اِلٰى مَسْجِدِه تَعْنِيْ مَسْجِدَ بَيْتِه فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتّٰى غَلَبَتْنِيْ عَيْنِيْ وَ اَوْجَعَهُ الْبَرْدُ فَقَالَ اُدْنِيْ مِنِّيْ فَقُلْتُ اِنِّيْ حَائِض فَقَالَ وَاَنِ اكْشَفِيْ عَنْ فَخِذَيْكِ فَكَشَفْتُ فَخِذَيَّ وَوَضَعَ خَدَّهٗ وَصَدْرَه عَلٰى فَخِذَيَّ وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتّٰى دَفِيَ وَنَامَ– (ابو داود ج١ ص٣٦ باب في الرجل يصيب منها الخ)

অর্থাৎ, ... একদা রাতে নবী করীম (সাঃ) আমার ঘরে প্রবেশ করেন। তখন আমি ঋতুবতী ছিলাম। তিনি মসজিদে নববীতে যান। অতঃপর আমি ঘুমিয়ে যাওয়ার পর তিনি শীতে কাতর অবস্থায় ফিরে আসেন। তিনি আমাকে বলেন, আমার নিকটে এসো (আমার শরীরের সাথে মিশে যাও)। আমি বললাম, আমি তো ঋতুবতী। নবী করীম (সাঃ) বলেন, তুমি তোমার উরুদেশ উন্মুক্ত কর। তখন আমার উরুদেশ উন্মুক্ত করি। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ও বক্ষস্থল (গরম হওয়ার জন্য) আমার উরুদেশে স্থাপন করেন এবং আমিও তার প্রতি ঝুঁকে পড়ি। অতঃপর তিনি শীতের তীব্রতা হতে মুক্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন।

উক্ত হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, নবী করীম (সাঃ) নাভি ও হাঁটুর মাঝখানে কাপড়ের অন্তরাল ছাড়াই উন্মুক্ত অবস্থায় ফায়দা নিয়েছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তা জায়েয আছে।

দলীল (৩)ঃ পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে যে হুকুম এসেছে, তাতেও শুধুমাত্র যৌনাঙ্গ উপভোগ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেঈ, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, তাউস, আতা ও কাতাদা (রহ.) প্রমুখের মতে, কোন প্রকার কাপড়ের অন্তরাল ছাড়া নাভির নিচ থেকে নিয়ে হাঁটুর উপর পর্যন্ত কোন স্থান থেকেই কোন প্রকার ফায়দা নেয়া জায়েয নয়। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর একটি অভিমতও অনুরূপ।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কাপড়ের নিচ দিয়ে ফায়দা নেয়া জায়েয নয়।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذٰلِكَ اَفْضَلُ– (ابو داود ج١ ص٢٨)

অর্থাৎ, ... মুআয ইবন জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, ঋতুবতী অবস্থায় স্ত্রীলোক পুরুষের জন্য কতটুকু হালাল? তিনি বলেন, কাপড়ের উপর যতটুকু সম্ভব। তবে এটা থেকেও বেঁচে থাকা উত্তম।

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ اِحْدٰنَا اِذَا كَانَتْ حَائِضًا اَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُهَا وَقَالَتْ مَرَّةً يُبَاشِرُهَا– (ابو داود ج١ ص٣٥، بخاري ج١ ص٤٤ باب مباشرة الحائض، مسلم ج١ ص١٤١ باب مباشرة الحائض فوق الازار، ترمذي ج١ ص٣٢ باب مباشرة الحائض، نسائي ج١ ص٥٤ باب مباشرة الحائض)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের কেউ ঋতুবতী হলে তাকে পাজামা পরিধানের নির্দেশ দিতেন। অতঃপর তিনি তাঁর সাথে একত্রে শয়ন করতেন। অন্য এক বর্ণনায় হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, তিনি (সাঃ) কখনো কখনো তাঁর সাথে রাত যাপন করতেন।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ সহ আরো এমন অনেক হাদীস রয়েছে, যেখানে পাজামা পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং পাজামার উপর দিয়ে ফায়দা উঠানোর অনুমতি দিয়েছেন। যদি পাজামার নিচ দিয়ে ফায়দা উঠানো জায়েয হত, তাহলে কাপড়

বাঁধার নির্দেশ দিতেন না। এতে বুঝা যায় যে, পাজাপমার নিচ দিয়ে ফায়দা উঠানো জায়েয নয়।

জবাবঃ হানাফীদের পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষের দলীলের একটি সার্বিক জবাবঃ প্রতিপক্ষের দলীসমূহ হালাল বা জায়েয সংক্রান্ত, আর আমাদের দলীলসমূহ হারাম সংক্রান্ত। আর ফিকহের একটি মূলনীতি হল, যখন একই বিষয়ে হালাল ও হারাম নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তখন হারাম সংক্রান্ত দলীলসমূহ প্রাধান্য পাবে।

প্রথম দলীলের জবাবঃ হযরত আনাস (রাঃ)-এর হাদীসে যে **نكاح** শব্দটি বর্ণিত হয়েছে, এর দ্বারা শুধু সহবাস উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা সহবাস ও সহবাসের দিকে আকৃষ্টকারী বিষয়ও (دواعي وطي) উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে যে জিনিস হারাম, তার আনুষঙ্গিক বিষয়ও হারাম।
(২) নবী করীম (সাঃ) 'নিকাহ' বলে ইঙ্গিতে পাজামার নিচের কার্যাদিকে বুঝিয়েছেন।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ (১) উক্ত হাদীসে আব্দুর রহমান ইবন যিয়াদ নামক একজন রাবী রয়েছেন, যাকে ইয়াহইয়া ইবন মুঈন, ইমাম আহমদ, আবু যুরআ ও ইমাম তিরমিযী (রহ.) সহ অনেকেই যঈফ বলেছেন। সুতরাং তার বর্ণিত হাদীস দলীলযোগ্য হতে পারে না। (بذل المجهود ج١ ص١٦١)
(২) অথবা, এটি ছিল নবী করীম (সাঃ)-এর জন্য খাস। যা অন্যের জন্য জায়েয নয়। কারণ নবী করীম (সাঃ)-এর স্বীয় নফস পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে ছিল। যা অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। হযরত আয়িশা (রাঃ) নিজেই বলেন-

... وَاَيُّكُمْ يَمْلِكُ اِرْبَه كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ اِرْبَهُ– (ابو داود ج١ ص٣٦، مسلم ج١ ص١٤١)

অর্থাৎ, ... তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির কামোন্মাদনা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আছে কি, যেরূপ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ছিল?

তৃতীয় দলীলের জবাবঃ উক্ত আয়াতে فَاعْتَزِلُوْا বলে সঙ্গমের নিষেধ করা হয়েছে। আর وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ (তাদের নিকটবর্তী হয়ো না) বলে পাজামার নিচে যে সহবাসের কামোদ্দীপক উপকরণ রয়েছে, তা থেকে পরহেয করতে বলা হয়েছে।

(تنظيم الاشتات ج١ ص٢١٢–٢١٣)

بَابُ فِيْ الْاِكْسَالِ ص٢٨ ঃ স্ত্রী সহবাসে বীর্যপাত না হলে

... عَنْ اُبَيٍّ بْنِ كَعَبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا جَعَلَ ذٰلِكَ رُخْصَةً لِّلنَّاسِ فِيْ اَوَّلِ الْاِسْلَامِ لِقِلَّةِ الثِّيَابِ ثُمَّ اَمَرَ بِالْغُسْلِ وَ نَهٰى عَنْ ذٰلِكَ– (بخاري ج١ ص٤٣ باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، مسلم ج١ ص١٥٥ باب بيان ان الجماع كان الخ، ترمذي ج١ ص٣١ باب ان الماء من الماء)

অনুবাদঃ ... উবাই ইবন কাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের কাপড়-চোপড়ের স্বল্পতা হেতু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) লোকদের স্ত্রী-সহবাসে বীর্যপাত না ঘটলে গোসল করার ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করেন। অতঃপর তিনি গোসলের নির্দেশ দেন এবং পূর্বোক্ত অনুমতি রহিত করেন।

বিশ্লেষণঃ পুরুষের যৌনাঙ্গের অগ্রভাগ নারীর যৌনাঙ্গের অগ্রভাগে প্রবেশ করার ফলে গোসল ওয়াজিব হবে কিনা, এ নিয়ে ফকীহদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ
* ইমাম দাউদ যাহেরীর মতে, শুধু পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ মহিলার যৌনাঙ্গের অগ্রভাগে ঢোকার দ্বারা গোসল ওয়াজিব হবে না; বরং গোসল ওয়াজিব হওয়ার জন্য বীর্যপাত শর্ত। প্রথম দিকে হযরত উসমান, আলী, যুবাইর, তালহা ও উবাই ইবন কাব (রাঃ)-এরও অভিমত তাই ছিল। (العيني ج١ ص٨٠٥)

দলীলঃ ... عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَآءُ مِنَ الْمَآءِ– وَكَانَ اَبُوْ سَلَمَةَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ– (ابو داود ج١ ص٢٩، مسلم ج١ ص١٥٥، ابن ماجة ص٤٥)

অর্থাৎ, ... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ পানির (বীর্যপাতের) কারণেই পানি (গোসল) অপরিহার্য হয়। আবু সালামা (রহ.) এরূপ ফাতওয়া দিতেন।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেঈ, আহমদ, ইসহাক, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখঈ (রহ.) ও জমহুর সাহাবাদের মতে, পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ মহিলার যোনীর অগ্রভাগে প্রবেশ করলেই গোসল ওয়াজিব হবে। বীর্য বের হওয়া জরুরী নয়। (بذل المجهود ج١ ص١٣٤، تعليق الصبيح ج١ ص٢١٧)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ وَاَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ– (ابو داود ج١ ص٢٨، بخاري ج١ ص٤٣ باب اذا التقلى الختانان، مسلم ج١ ص١٥٦، نسائي ج١ ص٤١ باب وجوب الغسل اذا التقى الختانان، ابن ماجة ص٤٥)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি তার কামস্পৃহা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে স্ত্রীর উপর উপগত হবে এবং পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রীর যোনীর অগ্রভাগে প্রবেশ করাবে- তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে।

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُه اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا– (ترمذي ج١ ص٣٠ باب اذا لتقي الختانان وجب الغسل، ابن ماجة ص٤٥)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ রমণীর যৌনাঙ্গের অগ্রভাগ অতিক্রম করে তখন গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। আমি ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অনুরূপ করে আমরা গোসল করেছি।

ইজমাঃ ইমাম নববী (রহ.) বলেন, প্রথম দিকে সাহাবায়ে কিরামের মাঝে যদিও কিছুটা ইখতিলাফ ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে হযরত উমর (রাঃ)-এর যুগে এ বিষয়ে নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র স্ত্রীগণের শরণাপন্ন হওয়ার পর সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, উভয়ের যৌনাঙ্গের অগ্রভাগ মিলিত হলেই গোসল ওয়াজিব হবে, বীর্য বের হওয়া জরুরী নয়। (شرح مسلم ج١ ص١٥٥)

জবাবঃ (১) আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)-এর হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। যার প্রমাণ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীসটি। (২) অথবা, হাদীসে "اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ"-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল বীর্যের ব্যাপারে সতর্ক করা। অর্থাৎ, মযী দ্বারা তো গোসল ওয়াজিব নয়, কেবল বীর্যের দ্বারাই গোসল ওয়াজিব হয়।

(৩) অথবা, এই হাদীসটি স্বপ্নদোষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ, স্বপ্নে যা কিছুই দেখুক না কেন, বীর্য স্খলন না হলে গোসল ওয়াজিব হবে না। (طحاوي ج١ ص٣١)

بَابُ فِيْ الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ ص٣٠

অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ

... عَنْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوْهُ بُيُوْتِ اَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِيْ الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَجِّهُوْا هٰذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ اَنْ تُنَزَّلَ فِيْهِمْ رُخْصَةٌ فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ وَجِّهُوْا هٰذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَاِنِّيْ لاَ اُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَّلاَ جُنُبٍ-

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে নববীতে এসে দেখতে পান যে, তাঁর সাহাবীদের ঘরের দরজা মসজিদমুখী (অর্থাৎ তাঁদের ঘরে যাতায়াতের পথ ছিল মসজিদের ভিতর দিয়ে)। তখন তিনি বলেন, তোমাদের ঘরের দরজা মসজিদের দিক থেকে ফিরিয়ে নাও। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেন। সাহাবাগণ এই আশায় ঘরের দরজা পরিবর্তন করেননি যে, হয়ত এ ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ হতে রুখছত (অবকাশ) সূচক কোন নির্দেশ নাযিল হতে পারে। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) বের হয়ে পুনরায় নির্দেশ দেন, তোমাদের গৃহের দরজা মসজিদের দিক হতে অন্যদিকে ফিরাও। কেননা ঋতুবতী স্ত্রীলোক ও অপবিত্র ব্যক্তিদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা আমি হালাল (বৈধ) মনে করি না।

বিশ্লেষণঃ এই অনুচ্ছেদে আলোচ্য বিষয় দুটিঃ

(ক) অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয কিনা।

(খ) নাপাকী অবস্থায় মসজিদের ভিতর দিয়ে চলাচল করা জায়েয কিনা।

প্রথম আলোচনাঃ ইবনুল মুনযিরের মতে, গোসল ফরয বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ঋতুবতী মহিলা নিঃশর্তে মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে।

দলীলঃ ... عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَه فَاَهْوٰى اِلَيْهِ فَقَالَ اِنِّيْ جُنُبٌ فَقَالَ اِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ (ابو داود ج١ ص٣٠ باب في الجنب يصافح، مسلم ج١ ص١٦٢ ان المسلم لا ينجس، ابن ماجة ص٤١)

অর্থাৎ, ... হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি (সাঃ) তাঁর সাথে মুসাফাহা করার উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে

দেন। তখন হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি অপবিত্র। নবী করীম (সাঃ) বলেন, মুসলিম ব্যক্তি কখনো অপবিত্র হয় না।

* ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, অপবিত্র ব্যক্তি যদি অযু করে মসজিদে প্রবেশ করে, তবে জায়েয আছে।

দলীলঃ رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ اَنَّهُمْ يَجْلِسُوْنَ فِيْ الْمَسْجِدِ وَهُمْ مُجْنِبُوْنَ اِذَا تَوَضَّئُوْا وُضُوْءَ الصَّلٰوةِ– (تنظيم الاشتات ج١ ص١٧٢)

অর্থাৎ, সাহাবাদের সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা নাপাক অবস্থায় সত্ত্বেও (গোসল না করে) নামাযের অযুর মত অযু করে মসজিদে বসতেন।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেঈ (রহ.) ও জমহুর উম্মতের মতে, অপবিত্র ব্যক্তির মসজিদে প্রবেশ ও অবস্থান করা জায়েয নয়। (معارف السنن ج١ ص٤٥٤–٤٥٥)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

জবাবঃ প্রতিপক্ষের দলীল সমূহের বিপক্ষে একটি সামগ্রিক জবাব হলঃ প্রতিপক্ষের দলীলসমূহ হালাল সংক্রান্ত আর তিন ইমাম ও জমহুরের দলীলটি হারাম সংক্রান্ত। অতএব উসূল মোতাবিক হারামটি প্রাধান্য পাবে।

আহলে যাহিরের দলীলের জবাবঃ আসলে উক্ত বাণী মুসাফাহার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, অর্থাৎ, মুসলমান কখনো এমন অপবিত্র হয় না, যার ফলে তার সাথে মুসাফাহা করা যায় না। নতুবা যদি হাদীসটির বাহ্যিক অর্থ নেয়া হয়, তাহলে তো একথাও বলা সহীহ হবে যে, বীর্যপাত বা রক্তস্রাবের ফলেও একজন মুসলমান নাপাক হবে না।

* ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ মারফূ হাদীসের মুকাবিলায় সাহাবাগণের আমল দলীলযোগ্য নয়। (بذل المجهود ج١ ص١٤٠)

দ্বিতীয় আলোচনাঃ নাপাক অবস্থায় মসজিদের ভিতর দিয়ে চলাচল করা জায়েয কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়ঃ

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, অপবিত্র অবস্থায় মসজিদের ভিতর দিয়ে গমন করা জায়েয আছে, তবে মসজিদে অবস্থান করা জায়েয নয়।

দলীলঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكْرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلاَ جُنُبًا اِلاَّ عَابِرِيْ سَبِيْلٍ ...

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাযের ধারে কাছেও যেও না, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ। আর (নামাযের কাছে যেও না) অপবিত্র অবস্থায়। কিন্তু পথ অতিক্রমকারীর কথা ভিন্ন। (নিসাঃ ৪৩)
ইমাম শাফেঈ (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর তাফসীর গ্রহণ করে বলেন, উক্ত আয়াতে বর্ণিত صلوة-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল موضع صلوة তথা মসজিদ আর عابري سبيل-এর অর্থ হচ্ছে, মসজিদের ভিতর দিয়ে গমনকারী। সুতরাং আয়াতাংশের অর্থ হবে, নাপাক ব্যক্তি মসজিদের ভিতর দিয়ে গমন করতে পারবে।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক (রহ.) ও জমহুর ফকীহগণের অভিমত হল, অপবিত্র অবস্থায় মসজিদের ভিতর দিয়ে গমন করা এবং অবস্থান করা কোনটিই জায়েয নয়।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। নবী করীম (সাঃ) মসজিদমুখী ঘরের দরজাকে তো এজন্যই বন্ধ করতে বলেছিলেন, যাতে অপবিত্র অবস্থায় মসজিদের ভিতর দিয়ে চলাচল করার কোন সুযোগ না থাকে। যদি নাপাক অবস্থায় চলাচল করা জায়েযই হত, তাহলে মসজিদমুখী ঘরের দরজা বন্ধের জন্য নির্দেশ দিতেন না।

জবাবঃ (১) তাফসীরের ক্ষেত্রে অধিক গ্রহণযোগ্য হল হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর তাফসীর। আর তিনি আয়াতটির তাফসীরে বলেন- صلوة দ্বারা নামায উদ্দেশ্য, মসজিদ উদ্দেশ্য নয় এবং عابري سبيل দ্বারা উদ্দেশ্য হল মুসাফির। তখন আয়াতাংশের অর্থ হবে, তোমরা অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়ো না। কিন্তু যদি মুসাফির হও, তাহলে ভিন্ন কথা অর্থাৎ এমতাবস্থায় পানি না পেলে তায়াম্মুম করে নামায আদায় কর।
(২) صلوة দ্বারা موضع صلوة তথা মসজিদ অর্থ নেয়া হলে এটি হবে রূপক (مجازي)।
আর নিয়ম হল যতক্ষণ পর্যন্ত কোন শব্দের প্রকৃত (حقيقي) অর্থ নেয়া সম্ভব, ততক্ষণ পর্যন্ত রূপক অর্থ নেয়া জায়েয নয়। আর উক্ত আয়াতে প্রকৃত অর্থ নেয়া অনায়াসে সম্ভব, যা ইবন আব্বাসের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।
(৩) নামাযে কিরাআত পড়া শর্ত। আর আয়াতটিতেও গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, "حتى تعلموا ما تقولون" উল্লেখ করার দ্বারা এই শর্তের সামঞ্জস্যতা রয়েছে। সুতরাং সালাত দ্বারা যদি মসজিদ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এই শর্তারোপের কোন মূল্য থাকে না। তাছাড়া আয়াতটির শানে নুযূলের দিকে দৃষ্টিপাত করলেও প্রতীয়মান হয় যে, আয়াতটি নামায সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে, মসজিদ বুঝানোর উদ্দেশ্যে নাযিল হয়নি। (تنظيم ج١ ص١٧٣، احكام القرآن)

بَابُ مَا رُوِيَ اَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ ص٤٠

ইস্তেহাযাগ্রস্ত (রক্তপ্রদর) মহিলাদের প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ

... عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ خَتَنَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ دصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلٰكِنْ هٰذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِيْ وَصَلِّيْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِيْ مِرْكَنٍ فِيْ حُجْرَةِ اُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتّٰى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ– (بخاري ج١ ص٤٧ باب عرق الاستحاضة، مسلم ج١ ص١٥١ باب المستحاضة وغسلها وصلوتها، نسائي ج١ ص٤٣ ذكر الاغتسال من الحائض، ابن ماجة ص٤٦)

অনুবাদঃ ... নবী করীম (সাঃ)-এর স্ত্রী হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হাবিবা বিনত জাহ্‌শ (রাঃ) যিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শ্যালিকা ছিলেন এবং আব্দুর রহমান ইবন আওফ (রাঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন, একাধারে সাত বছর ইস্তেহাযাগ্রস্ত ছিলেন। তিনি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, এটা হায়েযের রক্ত নয়, বরং একটি বিশেষ শিরা হতে প্রবাহিত রক্ত। অতএব তুমি গোসলান্তে নামায আদায় করবে। আয়িশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর তিনি (উম্মে হাবীবা) তাঁর বোন যয়নব বিনত জাহ্‌শের হুজরাতে একটি বড় পাত্রে গোসল করতেন এবং পানিতে রক্তের লাল রং-এর প্রাধান্য হত।

বিশ্লেষণঃ ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলার গোসল সম্পর্কে বেশ এখতেলাফ রয়েছেঃ

* ইবন উমর, ইবন যুবাইর ও আতা ইবন আবী রাবাহ (রাঃ)-এর মতে, ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলার জন্য প্রত্যেক নামাযে গোসল করা ওয়াজিব।

দলীলঃ ... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيْضَتْ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلٰوةٍ الخ (ابو داود ج١ ص٤٠، مسلم ج١ ص١٥١)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হাবীবা বিনত জাহ্শ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে ইস্তেহাযাগ্রস্ত হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে প্রত্যেক নামাযের সময় গোসলের নির্দেশ দেন।
অতএব, উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করা ওয়াজিব।

* হযরত আলী (রাঃ) ও ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, দুই নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে একবার গোসল করবে। অর্থাৎ, যোহর ও আসরের নামাযের জন্য একবার গোসল করে যোহরের নামাযকে শেষ সময়ে এবং আসরের নামাযকে একটু অগ্রসর করে আউয়াল ওয়াক্তে পড়বে। কিন্তু প্রত্যেক নামায ওয়াক্তের মধ্যে হতে হবে। অতঃপর মাগরিব ও এশার নামাযের জন্য একবার গোসল করে মাগরিবের নামাযকে শেষ সময়ে এবং এশার নামাযকে প্রথম সময়ে আদায় করে নেবে। তবে প্রত্যেক নামায ওয়াক্তের মধ্যে হতে হবে। অতঃপর ফযরের নামাযের সময় আরেকবার গোসল করবে। অতএব, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য মোট তিনবার গোসল করবে। তাঁদের মতে, প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করার হুকুম মানসূখ হয়ে গেছে।

দলীলঃ ... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ اسْتُحِيْضَتْ فَاَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ فَلَمَّا جَهَدَهَا ذٰلِكَ اَمَرَهَا اَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَّالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَّتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ– (ابو داود ج۱ ص٤۱ باب من قال تجمع بين الصلاتين الخ، نسائي ج۱ ص٤٥ ذكر اغتسال المستحاضة)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহ্লা বিনত সুহায়েল (রাঃ) ইস্তেহাযাগ্রস্ত হয়ে নবী করীম (সাঃ)-এর খিদমতে আগমন করলে তিনি তাঁকে প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসলের নির্দেশ দেন। তাঁর জন্য এটা কষ্টদায়ক হওয়ায় নবী করীম (সাঃ) তাঁকে যুহর ও আসরের জন্য একবার, মাগরিব ও এশার জন্য একবার এবং ফজরের নামাযের জন্য একবার গোসলের নির্দেশ দেন।

* সাঈদ ইবন মুসায়্যিব ও হাসান বসরী (রহ.) প্রমুখের মতে, ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলা প্রত্যেক দিন যুহরের সময় মাত্র একবার গোসল করবে।

দলীলঃ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ... اَنَّ الْقَعْقَاعَ وَزَيْدَ بْنَ اَسْلَمَ اَرْسَلَاهُ اِلٰى سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَقَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ اِلٰى ظُهْرٍ وَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ الخ (ابو داود ج۱ ص٤۲ باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر الى ظهر)

অর্থাৎ, আল কানাবী ... আল-কাকা এবং যায়েদ ইবন আসলাম (রহ.) উভয়ই সুমাইয়াকে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের নিকট ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের গোসলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে প্রেরণ করেন। জবাবে তিনি বলেন, তাকে দৈনিক এক যুহর থেকে পরবর্তী যুহর পর্যন্ত একবার গোসল করতে হবে। (অর্থাৎ প্রত্যহ দুপুরের সময়) তাকে প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু করতে হবে।

* চার ইমাম ও জমহুরের মতে, ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলার হায়েযের সময়সীমা যখন চলে যায়, তখন হায়েয বন্ধের সময় শুধু একবার গোসল করে নেয়াই যথেষ্ট। প্রত্যেক দিন প্রত্যেক নামাযের জন্য অথবা দুই নামাযের মাঝখানে গোসল করার কোন প্রয়োজন নেই। ইবন মাসউদ, আয়িশা, উরওয়া ইবন যুবাইর, আবু সালামা (রাঃ) প্রমুখের অভিমতও তাই। (تعليق الصبيح ج١ ص٢٥٧، بذل المجهود ج١ ص١١٣)

দলীল (১)ঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) উম্মে হাবীবা বিনত জাহ্‌শ (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন-

اِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِيْ الصَّلٰوةَ فَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِيْ وَصَلِّيْ– (ابو داود ج١ ص٣٨

باب اذا اقبلت الحيضة الخ، بخاري ج١ ص٤٧ باب اذا رأت المستحاضة الطهر، مسلم ج١ ص١٥١)

অর্থাৎ, যখন তোমার হায়েযের জন্য নির্ধারিত সময় উপস্থিত হবে তখন নামায হতে বিরত থাকবে এবং উক্ত সময় অতিবাহিত হলে গোসল করে নামায আদায় করবে।

উক্ত হাদীসে শুধুমাত্র হায়েয বন্ধের পর গোসলের হুকুম দেয়া হয়েছে। বারবার গোসল করার কথা বলা হয়নি।

দলীল (২)ঃ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ فِيْ الْمُسْتَحَاضَةِ تَدَعُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلاً وَّاحِدًا وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ– (طحاوي ج١ ص٦٣)

অর্থাৎ, হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি ইস্তেহাযাগ্রস্ত (রক্তপ্রদর) মহিলার ব্যাপারে বলেন- সে হায়েযের দিনসমূহে নামায ছেড়ে দিবে। অতঃপর একবার গোসল করবে এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু করবে।

হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর ফাতওয়া সম্পূর্ণভাবে জমহুরের সাথে মিলে যায়।

দলীল (৩)ঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। ফাতিমা বিনত আবু হুবায়েশ নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট ইস্তেহাযা সংক্রান্ত ঘটনা বিবৃত করলে নবী করীম (সাঃ) বলেন-

اِغْتَسِلِيْ ثُمَّ تَوَضَّئِيْ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَّصَلِّيْ (ابو داود ج١ ص٤١ باب تغتسل من طهر الى طهر)

অর্থাৎ, পবিত্রতার জন্য একবার গোসল কর, পরে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে অযু করে নামায আদায় কর।

দলীল (৪)ঃ عَنْ عَائِشَةَ فِيْ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ تَعْنِيْ مَرَّةً وَّاحِدَةً ثُمَّ تَوَضَّأُ اِلٰى اَيَّامِ اَقْرَائِهَا

অর্থাৎ, আয়িশা (রাঃ) হতে ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের গোসল সম্পর্কে বর্ণিত আছে। অর্থাৎ হায়েযের পর পবিত্রতা অর্জনের জন্য একবার মাত্র গোসল করা ওয়াজিব। অতঃপর পুনঃ হায়েযকালীন নির্ধারিত সময় আগমনের পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের পূর্বে অযু করবে। (সূত্রঃ ঐ)

জবাবঃ (১) প্রতিপক্ষদের থেকে বর্ণিত "প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করা" এবং "দুই নামাযের মাঝখানে একবার গোসল করা" উভয় হাদীসের রাবী হলেন হযরত আয়িশা (রাঃ)। অতঃপর হযরত আয়িশা (রাঃ)-ই উল্লিখিত হাদীস দুটির বিপরীত হায়েয বন্ধ হওয়ার পর শুধু একবার গোসল করার ফাতওয়া দেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পূর্বে বর্ণিত হাদীসসমূহ রহিত হয়ে গেছে। **(طحاوي ج١ ص٦٣)**

(২) যখন একই বিষয়ে হাদীসের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়, তখন সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদীসটি প্রাধান্য লাভ করে। জমহুরের দলীল সহীহ বুখারী ও মুসলিমে উল্লেখ রয়েছে, যা সনদের দিকে দিয়েও শক্তিশালী। অতএব জমহুরের হাদীসই প্রাধান্য পাবে।

(৩) যে ঋতুবতী মেয়ের হায়েযের অভ্যাস জানা থাকে, হায়েয ও ইস্তেহাযার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে, এমন মহিলার জন্য হায়েয বন্ধ হওয়ার পর শুধু একবার গোসল করতে হবে। যদি কোন মহিলা হায়েয এবং ইস্তেহাযার মধ্যে পার্থক্য করতে না পারে এবং পূর্বে স্বভাবত হায়েযের সময়কাল কতদিন হত তা জানা না থাকে, এমন মহিলার জন্য প্রত্যেক নামাযে গোসল করার হুকুম প্রযোজ্য হবে। এবং যে মহিলার নিজের অভ্যাস জানা নেই, কিংবা যে রক্তের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারে; বরং কখনো রক্ত আসে এবং কখনো রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, এমতাবস্থায় ঐ মহিলার জন্য হুকুম হল দুই নামাযের জন্য একবার গোসল করবে।

(৪) যে হাদীসে দুই নামাযের মাঝখানে একবার গোসল করার হুকুম রয়েছে, এটা মুস্তাহাব, যা চিকিৎসা হিসেবে বলা হয়েছে। যাতে ঠাণ্ডার দরুণ রক্ত কম বের হয়। নতুবা আসল হুকুম তো হল, হায়েয বন্ধ হওয়ার পর একবার গোসল করা। আর এই হুকুম হচ্ছে ওয়াজিব হিসেবে। **(تنظيم الاشتات ج١ ص٢١٦)**

بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ اِلٰى طُهْرٍ ص٤١

দুই তুহ্‌রের মধ্যবর্তী সময় গোসল

... عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ الْمُسْتَحَاضَةِ تَدَعُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَآئِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيْ وَالْوُضُوْءُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ–

অনুবাদঃ ... আদী ইবন সাবেত (রহ.) তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে এবং তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট থেকে ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন যে, তারা হায়েযের জন্য নির্ধারিত দিনসমূহে নামায ত্যাগ করবে, অতঃপর পবিত্রতার জন্য গোসল করে নামায আদায় করবে। এরপর প্রত্যেক নামাযের জন্য কেবলমাত্র অযু করতে হবে।

বিশ্লেষণঃ ইস্তেহাযা ও সমস্ত মাযুর, যারা ধারাবাহিকভাবে নাপাকীর শিকার অর্থাৎ যাদের অযু থাকে না এবং চার রাকাআত নামাযও অযু ভঙ্গ ছাড়া পড়তে পারে না, তাদের ক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম কি, এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

* রবীআতুর রায় ও দাউদ যাহেরীর মতে, ইস্তেহাযার রক্ত অযুভঙ্গকারী নয়। এজন্য তাদের মতে ইস্তেহাযা বিশিষ্ট মহিলার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নামাযের জন্য অযুর হুকুম মুস্তাহাবরূপে প্রযোজ্য। ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতেও ইস্তেহাযা অযুভঙ্গের কারণ নয়। কেননা, এটা সরাসরি জরায়ু থেকে বের হয় না; বরং দেহ থেকে অস্বাভাবিকভাবে একটি বিশেষ শিরা থেকে নির্গত হয়।

* সুফিয়ান সাওরী ও আবু সাওরের মতে, এমন ব্যক্তি এক অযু দ্বারা শুধু ফরয পড়বে। সুন্নত ও নফলের জন্য আলাদা অযুর প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ প্রতিটি স্বতন্ত্র নামাযের জন্য অযু জরুরী।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। তাঁরা উক্ত হাদীসে বর্ণিত اَلْوُضُوْءُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ-এর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে বলেন, এর আবেদন হল, প্রতিটি নামাযের জন্য স্বতন্ত্র অযু করা।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, এমন ব্যক্তি এক অযু দ্বারা ফরয এবং এর অধীনস্থ সুন্নত ও নফলগুলো আদায় করতে পারবে। কিন্তু এগুলো আদায়ের পর উক্ত অযু ভেঙ্গে যাবে এবং এরপর যদি কুরআন তিলাওয়াত বা কোন নফল নামায পড়তে চায়, তাহলে আলাদা অযু করতে হবে।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। তাঁদের মতে, "প্রতিটি নামাযের জন্য অযু"-এর অর্থ হল, "ফরযসহ একসময়ে আদায়কৃত নামাযসমূহ।"

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, যুফার ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত এই অযু থাকে এবং এর দ্বারা ফরয নামায ও অন্যান্য নফল এবং কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয আছে।
অবশ্য ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সাথে সাথে এই অযু ভেঙ্গে যাবে।

দলীলঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ফাতেমা বিনতে জাহ্শ (রাঃ)-কে ইস্তেহাযার ব্যাপারে নির্দেশ দেন যে-

تَوَضَّئِيْ لِوَقْتِ كُلِّ صَلٰوةٍ– (كتاب الاثار ج١ ص٩١)

অর্থাৎ, তুমি প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তের জন্য অযু কর।

কিয়াসী দলীলঃ ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, মোজার উপর মাসেহকারীর ক্ষেত্রেও সময় শেষ হয়ে যাওয়া অযু ভঙ্গের কারণ। নামায থেকে বের হয়ে আসা কোনক্রমেই অযু ভঙ্গের কারণ নয়। অনুরূপভাবে এখানেও অযু ভঙ্গের কারণ ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া, নামায নয়। (طحاوي ج١ ص٦٤)

জবাবঃ রবীআতুর রায়, দাউদ যাহেরী ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতের জবাবঃ
(১) ইতিপূর্বে হানাফীদের পক্ষ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, শরীর থেকে নির্গত প্রবাহিত রক্ত অযু ভঙ্গের কারণ।
(২) বহু সংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী করীম (সাঃ) ইস্তেহাযার ফলে অযুর নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, যা বহুসংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, এর উপর কিয়াস করার কোন অবকাশ নেই।

সুফিয়ান সাওরী ও আবু সাওরের দলীলের জবাবঃ لكل صلوة-এর দ্বারা বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা আদৌ ঠিক নয়। বরং এর দ্বারা পুরো নামায বুঝানো হয়েছে।

ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ যে সকল হাদীসে "الوضوء عند كل صلوة" বা "تتوضأ لكل صلوة" শব্দ এসেছে, এর দ্বারা খোদ নামায ও নামাযের সময় উভয়টির সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, عند শব্দ প্রায়ই ওয়াক্তের অর্থে প্রযোজ্য হয়। আর لام হরফটিও সময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন, নবী করীম (সাঃ) বলেন, "إِنَّ لِلصَّلٰوةِ أَوَّلاً وَآخِرًا" উক্ত হাদীসে لام হরফটি সময়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব, এর অর্থ হবে, নিশ্চয় নামাযের প্রথম ও শেষ ওয়াক্ত রয়েছে। (تنظيم الاشتات ج١ ص٢٠٩)

হায়েয, ইস্তেহাযা ও নেফাস সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত আলোচনাঃ
হায়েয, ইস্তেহাযা ও নিফাসের বিষয়গুলো ফিকহ ও হাদীসের জটিলতম মাসায়িলের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এগুলোর সাথে দীনের অনেক আহকাম সম্পৃক্ত। যেমন, নামায, রোযা, তওয়াফ, মসজিদে প্রবেশ, সহবাস, তালাক, ইদ্দত, খুলআ, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি। আর এজন্যই সর্বযুগে উলামায়ে কিরাম এগুলোর সমাধানের সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এ বিষয়গুলোর উপর দুইশত পৃষ্ঠার,

ইমাম তাহাবী (রহ.) ৫০০ পৃষ্ঠাব্যাপী স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাছাড়া বাহরুর রায়িক ও শরহুল মুহাযযিব কিতাবেও এ ব্যাপারে সুদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। এখানে অতি সংক্ষেপে মৌলিক বিষয়াবলী আলোচনা করা হল।

হায়েযঃ হায়েয (حيض) শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থ হল- প্রবাহ, নিঃসরণ, ঋতুস্রাব, মাসিক, রজঃস্রাব ইত্যাদি। পরিভাষায় হায়েয বলা হয়-

هُوَ دَم يَرْخِيْهِ رِحْمُ الْمَرْأَةِ بَعْدَ بُلُوْغِهَا فِيْ اَوْقَاتِ مُعْتَادَّةٍ مِنْ قَعْرِ الرَّحْمِ لاَ بِوَلاَدَةٍ– (العيني ص٢٧٨، فتح القدير ص١١١)

অর্থাৎ, হায়েয হল এমন রক্ত, যা প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার জরায়ু থেকে রীতিসিদ্ধ সময়ে বের হয়, সন্তান প্রসবের কারণে নয়।

হায়েযের হুকুমঃ সঙ্গম নিষিদ্ধঃ ঋতু অবস্থায় সহবাসে লিপ্ত হওয়া হারাম। পবিত্র কুরআনে এমন মহিলার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা করেছে। (পূর্বে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে) এই নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে যদি কেউ সঙ্গম করে তাহলে সাঈদ ইবন যুবাইর, হাসান বসরী, আওযাঈ, আহমদ ইবন হাম্বল ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, এর কাফফারা স্বরূপ এক বা অর্ধ দিনার সদকা করা ওয়াজিব। আর তিন ইমামের মতে, সদকা আদায় করা ওয়াজিব নয়; বরং এই কবীরা গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে খাঁটি মনে তওবা ও ইস্তেগফার পড়তে হবে।

নামায-রোযা নিষিদ্ধঃ হায়েয অবস্থায় নামায আদায় করা ও রোযা রাখা নিষেধ। আল্লামা নববী (রহ.) বলেছেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, ঋতুবতী মহিলার জন্য নামায কাযা করার প্রয়োজন নেই, তবে রোযা কাযা করতে হবে। এ ব্যাপারে শুধু খারেজীদের মতবিরোধ রয়েছে। তারা হাদীস অস্বীকার করে বলে, রোযার ন্যায় নামাযও কাযা করা জরুরী। (المغنى ج١ ص٣١٩)

নামায কাযা মওকুফ হওয়ার সম্পর্কে বলা যায়, এই হুকুমটি কিয়াস দ্বারা অনুধাবনযোগ্য নয়। এটি শরীয়ত প্রবর্তকের নির্দেশ। তবে ইমাম নববী (রহ.) বলেন, হায়েযকালে নামাযের পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে যায়। যা আদায় করা কষ্টসাধ্য। আর এরূপ কষ্ট শরীয়তে থাকার কথা নয়। কিন্তু রোযা এর পরিপন্থী। কেননা, রোযার সংখ্যা খুব বেশি হয় না।

কুরআন তিলাওয়াত নিষিদ্ধঃ ইমাম মালিক ও দাউদ যাহেরীর মতে, গোসল ফরযবিশিষ্ট ব্যক্তি ও ঋতুবতী মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে তিলাওয়াত সাধারণত জায়েয।

* ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক ও ইবন মুবারক (রহ.) প্রমুখের মতে, ঋতুবতী ও গোসল ফরয হয়েছে এমন ব্যক্তি শুধুমাত্র

আয়াতের একটি অংশ বা হরফ কিংবা অনুরূপ খণ্ড খণ্ড করে পড়তে পারবে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে না। তবে গোসল ফরয হয়েছে এমন ব্যক্তি ও ঋতুবতীর জন্য তাসবীহ-তাহলীলের অনুমতি রয়েছে। হানাফীগণ আর একটু অগ্রসর হয়ে বলেন, দোয়া বিশিষ্ট আয়াতগুলো কেবল মাত্র বরকত ও দোয়ার উদ্দেশ্যে পড়া জায়েয। কিন্তু সূরা ফাতিহা দোয়া হিসেবেও পড়া যাবে না।

(شرح المهذب ج٢ ص١٥٨)

হায়েযের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সময়সীমাঃ ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, হায়েযের সর্বনিম্ন কোনসময় সুনির্দিষ্ট নেই; বরং এক ফোঁটা বা একবার রক্ত প্রবাহও মাসিক হিসেবে গণ্য হবে। তাঁর মতে, হায়েযের সর্বোচ্চ কাল হল সতের দিন। ইমাম শাফেঈ ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, এর সর্বনিম্ন সময় হল একদিন একরাত। আর আবু ইউসূফ (রহ.)-এর মতে, দুদিন ও তৃতীয় দিনের অধিকাংশ। তবে ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, এর সর্বোচ্চ কাল হল পনের দিন। আর ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, হায়েযের সর্বনিম্ন সময় হল তিন দিন তিন রাত। আর সর্বোচ্চ মেয়াদ হল দশ দিন দশ রাত। ইমাম আহমদ (রহ.)-এর পক্ষ থেকে এর সর্বোচ্চ সময় নির্ধারণের ব্যাপারে উল্লিখিত তিনটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। আর পবিত্রতার সর্বনিম্নকাল নিয়েও মতবিরোধ রয়েছে। তবে ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ (রহ.)-এর মতে এবং ইমাম আহমদ ও মালিকের এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী পবিত্রতার সর্বনিম্ন কাল হল ১৫ দিন। (تنظيم الاشتات ج١ ص٢٠٨-٢٠٩)

আল্লামা ইবন রুশদ, ইবন কুদামা এবং আল্লামা নববী (রহ.) লিখেছেন যে, ঋতু ও পবিত্রতার সময় সম্পর্কে এই ব্যাপক মতবিরোধের কারণ হল, রেওয়ায়েতগুলোতে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন বিবরণ নেই। তাই ফুকাহায়ে কিরাম স্ব-স্ব পরিবেশের অভিজ্ঞতা, চাক্ষুস দর্শন এবং প্রচলিত প্রথার দিকে লক্ষ্য করে সময় নির্ধারণ করেছেন। আল্লামা যায়লাঈ (রহ.) বলেছেন, ঋতু এবং পবিত্রতা সম্পর্কে হানাফীদের প্রমাণ হযরত আয়িশা, মুআয ইবন জাবাল, আনাস, ওয়াসিলা ইবন আসকা ও আবু উমামা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত। এই রেওয়ায়েতগুলো যদিও কিছুটা দুর্বল, কিন্তু সূত্রাধিক্যের কারণে হাসানের স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

(نصب الراية ج١ ص١٢١-١٥٠)

ইস্তেহাযাঃ استحاضة (ইস্তেহাযা) শব্দটি حيض থেকে উদ্ভূত। বাবে ইস্তিফআলের মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হল- রক্তপ্রদর।

পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ বাহরুর রায়িক গ্রন্থকার বলেন-

هُوَ دَم يَسِيْلُ مِنَ الْعَاذِلِ مِنْ الْمَرْأَةِ لِدَاءٍ بِهَا–

অর্থাৎ, নারীর রোগের কারণে জরায়ুর বাইরের মুখের নিকট অবস্থিত একটি শিরা থেকে যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাই ইস্তেহাযা।

* ড. আ.ফ.ম. আবুবকর সিদ্দীক বলেন, হায়েয অথবা নিফাসের জন্য নির্ধারিত সময়ের পরেও যেসব স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব হয়ে থাকে তাকে ইস্তেহাযা (রক্তপ্রদর) বলে।

ইস্তেহাযা ও মাসিকের রক্তের রঙঃ ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, শুধু লাল এবং কাল রঙের রক্ত হায়েয। এছাড়া অন্যান্য রঙ ইস্তেহাযার রক্ত। হাম্বলীদের মাযহাবও এটাই। ইমাম মালিক (রহ.) হলুদ এবং মলিন রঙকেও হায়েয সাব্যস্ত করেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, মাসিকের সময়ে যে রঙের রক্তই বের হোক না কেন তা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে। তবে পরিষ্কার সাদা স্রাব বের হলে সেটা হায়েয নয়। উল্লেখ্য যে, হানাফী মতাবলম্বী হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন, হায়েযের রক্ত ছয় প্রকার। যথা- কাল, লাল, হলুদ, মলিন, সবুজ ও মেটে। (درس ترمذي ج١ ص٣٦١)

ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলার হুকুমঃ এরূপ মহিলার জন্য শরীয়তের হুকুম এই যে, তারা তাদের হায়েয ও নিফাসকালীন পূর্ব নির্ধারিত স্বাভাবিক সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর গোসল করে নিয়মিতভাবে নামায আদায় করবে এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য তাদেরকে অযু করতে হবে। অপরপক্ষে যে সমস্ত মহিলার ঋতুবতী হওয়ার প্রথম হতেই 'ইস্তেহাযা' দেখা দিবে তারা শরীয়তের নির্ধারিত সময় (হানাফী মতে, হায়েযের জন্য ১০ দিন এবং নিফাসের জন্য ৪০ দিন সর্বোচ্চ) অতিবাহিত হওয়ার পর গোসল করে নামায আদায় করবে। ইস্তেহাযার সময় স্ত্রী সহবাস বৈধ এবং তাকে রমযানের রোযাও রাখতে হবে।

নেফাসঃ نفاس (নেফাস) শব্দটি আরবী। এটি نَفِسَ يَنْفَسُ থেকে সিফাতের সীগা। যার অর্থ হল নেফাসবিশিষ্ট মহিলা। এর আরো আভিধানিক অর্থ হল, প্রসূতি-অবস্থা, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

পরিভাষায় নেফাস বলা হয়, সন্তান প্রসবের পর মহিলার যৌনাঙ্গ থেকে যে রক্ত বের হয়। (العناية ج١ ص١٢١)

সময়সীমা ও হুকুমঃ এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, নিফাসের সর্বনিম্ন কোন সময়সীমা নির্ধারিত নেই। এমনকি কোন মহিলার নেফাস নাও হতে পারে। কাজেই যখনই নেফাস থেকে পবিত্রতা অর্জিত হবে (দু'একদিন বা দু'এক ঘন্টা হোক না কেন) তখনই গোসলান্তে নিয়মিতভাবে নামায আদায় করতে হবে এবং স্বামী-স্ত্রী সুলভ ব্যবহারও করতে পারবে। তবে নেফাসকালীন অবস্থায় যেসব নামায ছেড়ে দিয়েছে এর কাযা আদায় করতে হবে না, কিন্তু রোযার কাযা করতে হবে।

নেফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালিক, শাফেঈ, শাবী ও আতা (রহ.)-এর মতে, নেফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ হল ৬০ দিন। তবে ইমাম মালিক ও হাসান বসরী (রহ.) থেকে ৫০ দিনের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী, ইবন মুবারক, আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, নেফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ হল ৪০ দিন। ইমাম মালিক (রহ.)-এর এক রেওয়ায়েতও তাই। ইমাম তিরমিযীর (রহ.) উক্তি মুতাবিক ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মাযহাব এটাই। (ترمذي ج١ ص٣٦ باب كم تمكث النفساء)

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূলতঃ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন মারফূ হাদীস নেই। তাই ফুকাহায়ে কিরাম স্ব স্ব অভিজ্ঞতার আলোকে এসব সময় নির্ধারিত করেছেন। অবশ্য হানাফীগণ এক্ষেত্রে কিয়াসের পরিবর্তে হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটির উপর আমল করেছেন-

... عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتِ النُّفَسَآءُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً وَكُنَّا نَطْلِيْ عَلٰى وُجُوْهِنَا الْوَرْسَ تَعْنِيْ مِنَ الْكَلَفِ– (ابو داود ج١ ص٤٣ باب في وقت النفساء، ترمذي ج١ ص٣٦، ابن ماجة ص٤٧)

অর্থাৎ, ... উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সময় নেফাসগ্রস্ত হওয়ার পর মহিলার ৪০ দিন অথবা ৪০ রাত অপেক্ষা করতেন। রাবী বলেন, আমরা আমাদের চেহারার কাল দাগ উঠাবার জন্য এক ধরনের 'ওয়ারস' নামীয় সুগন্ধ ঘাস ব্যবহার করতাম।

بَابُ التَّيَمُّمِ ص٤٥ ঃ তায়াম্মুম

... عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَاَمَرَنِيْ بِضَرْبَةٍ وَّاحِدَةٍ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ– (ابو داود ج١ ص٤٧، بخاري ج١ ص٥٠ باب التيمم ضربة، مسلم ج١ ص١٦١ باب التيمم، ترمذي ج١ ص٣٧ باب في التيمم)

অনুবাদঃ ... আম্মার ইবন ইয়াসির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট তায়াম্মুমের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তিনি আমাকে নির্দেশ দেন যে, মাটিতে একবার হাতের তালু লাগিয়ে উভয় হাত ও মুখমণ্ডল মাসেহ করবে।

বিশ্লেষণঃ উক্ত অনুচ্ছেদে দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

(ক) তায়াম্মুমে মাটিতে কয়বার হাত লাগাতে হবে।

(খ) উভয় হাত কতটুকু পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে।

প্রথম আলোচনাঃ তায়াম্মুমে মাটিতে কয়বার হাত লাগাতে হবে, এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছেঃ

* ইমাম আহমদ, ইসহাক, আতা, মাকহুল ও আওযাঈ (রহ.)-এর মতে, মুখ এবং উভয় হাতের জন্য শুধু একবারই মাটিতে হাত লাগানো যথেষ্ট। দুইবার প্রয়োজন নেই।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ হযরত আম্মার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) আম্মার (রাঃ)-কে বলেন-

... اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ اِلَى الاَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيْهِمَا وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَه وَكَفَّيْهِ الخ– (ابو داود ج١ ص٤٦، بخاري ج١ ص٤٨ باب هل ينفخ في يديه الخ، ابن ماجة ص٤٣)

অর্থাৎ, ... তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল। এই বলে তিনি নিজের মাটিতে হাত লাগান। অতঃপর হাতে ফুঁ দিয়ে মুখমণ্ডল এবং দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করেন।

উক্ত হাদীসেও দেখা যাচ্ছে, নবী করীম (সাঃ) মাটিতে একবার হাত লাগিয়ে মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মাসেহ করেছেন।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেঈ, সুফিয়ান সাওরী, ইবন মুবারক, ইবরাহীম নাখঈ ও হাসান বসরী (রহ.)-এর মতে, মুখ ও উভয় হাত মাসেহ করার জন্য একবার মাটিতে হাত লাগানো যথেষ্ট নয়; বরং একেকটির জন্য আলাদাভাবে হাত লাগাতে হবে। অর্থাৎ, মোট দুইবার হাত লাগাতে হবে।

দলীল (১)ঃ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِّلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ– (دار قطني ج١ ص١٨١)

অর্থাৎ, জাবির (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তায়াম্মুম একবার চেহারার জন্য হাত লাগাবে এবং আরেকবার কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয়ের জন্য হাত লাগাতে হবে।

দলীল (২)ঃ আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত-

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِّلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِّلْيَدَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ– (مستدرك حاكم ج١ ص١٧٩، دار قطني ج١ ص١٨٠)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, তায়াম্মুম হল দুবার মাটিতে হাত লাগানো। একবার চেহারার জন্য, আর একবার কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয়ের জন্য।

দলীল (৩)ঃ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ تَيَمُّمُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرْبَتَيْنِ ضَرْبَةً لِّلْوَجْهِ وَضَرْبَةً لِّلْيَدَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ– (عقود الجواهر النيفة للزبيدي ص٤٠)

অর্থাৎ, ইবন উমর (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তায়াম্মুম ছিল দুইবার হাত লগানো। একবার চেহারার জন্য, আর একবার কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয়ের জন্য।

দলীল (৪)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

... فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ–

অর্থাৎ, ... তবে পাক-পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও। (এর পদ্ধতি হল) তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়কে মাসেহ কর। (নিসাঃ ৪৪)

উক্ত আয়াতে মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়কে আলাদাভাবে মাসেহ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। আর অযুতে যেহেতু একই পানি দিয়ে উভয় অঙ্গকে ধৌত করা জায়েয নয়, তেমনিভাবে তায়াম্মুমের ক্ষেত্রেও একই মাটি দ্বারা উভয় অঙ্গ মাসেহ করা জায়েয নয়। কেননা, তায়াম্মুম হল অযুর স্থলাভিষিক্ত। (تنظيم الاشتات ج١ ص٢٠٤)

জবাবঃ দলীল হিসেবে বর্ণিত হযরত আম্মার (রাঃ)-এর হাদীসদ্বয় সংক্ষিপ্ত। এর বিস্তারিত বিবরণ আমরা হাদীসের কিতাবসমূহে হযরত আম্মার (রাঃ)-এর বাণী দ্বারাই জানতে পারি-

... قَالَ عَمَّارُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَمَا تَذْكُرُ اِذْ كُنْتُ اَنَا وَ اَنْتَ فِيْ الاِبِلِ فَاَصَابَتْنَا جَنَابَةً فَاَمَّا اَنَا فَتَمَعَّكْتُ الخ– (ابو داود ج١ ص٤٦، بخاري ج١ ص٤٨، مسلم ج١ ص١٦١، ابن ماجة ص٤٣)

অর্থাৎ, ... আম্মার (রাঃ) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার কি ঐ ঘটনার কথা স্মরণ নেই, যখন আমি এবং আপনি উটের চারণভূমিতে ছিলাম, তখন আমরা উভয়েই অপবিত্র হই। এ সময় (পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম দ্বারা) পবিত্রতা হাসিলের উদ্দেশ্যে মাটির মধ্যে গড়াগড়ি দেই।

আর এই সংবাদ যখন নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট বললেন, তখন নবী করীম (সাঃ) সংক্ষেপে উক্ত বাণী ইরশাদ করেন, যা প্রতিপক্ষ দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। এর দ্বারা তায়াম্মুমের পূর্ণ পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং তায়াম্মুমের প্রসিদ্ধ পদ্ধতির দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য ছিল। আর তাহল এই যে, গোসল ফরয অবস্থায় পানি না পেলে তায়াম্মুমের জন্য এভাবে জমির উপর

গড়াগড়ি খাওয়ার প্রয়োজন নেই। যদি একবারই হাত লাগানো যথেষ্ট হত, তাহলে হযরত আম্মার (রাঃ) থেকেই দুইবার হাত মারার অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হত না। এমনই একটি উদাহরণ অন্য একটি হাদীসে পাওয়া যায়-

... عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّهُمْ ذَكَرُوْا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا اَنَا فَاُفِيْضُ عَلٰى رَأْسِي ثَلَاثًا وَاَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا- (ابو داود ج١ ص٣٢ باب في الغسل من الجنابة، بخاري ج١ ص٣٩ باب من افاض على رأسه ثلاثا، ابن ماجة ص٤٤)

অর্থাৎ, ... যুবায়ের ইবন মুতঈম (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট অপবিত্রতার গোসলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। (কেননা তাঁরা ফরয গোসলে ভীষণ কঠোরতা অবলম্বন করতেন)। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আমি তো আমার মাথার উপর তিনবার পানি ঢেলে থাকি। এই বলে তিনি নিজের দুই হাতের দিকে ইশারা করেন।

প্রকাশ থাকে যে, এর অর্থ এই নয় যে, ফরয গোসলেও শুধু মাথা ধোয়া যথেষ্ট, অবশিষ্ট শরীর ধোয়া জরুরী নয়। এরূপভাবে হযরত আম্মার (রাঃ)-এর হাদীসেও এই উদ্দেশ্য নয় যে, একবার হাত মারা অথবা দুই হাতের তালু মাসেহ করা যথেষ্ট; বরং এর দ্বারা প্রসিদ্ধ পদ্ধতির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (درس ترمذي ج١ ص٣٨٨)

দ্বিতীয় আলোচনাঃ তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে উভয় হাত কতটুকু মাসেহ করতে হবে, এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইবন শিহাব যুহরীর মতে, উভয় হাত বগল পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে।

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

... فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ- (النساء الآية ٤٤)

উল্লেখ্য যে, অযুর আয়াতে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধোয়ার কথা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অত্র আয়াতে মাসেহের ক্ষেত্রে শুধু হস্তদ্বয়ের কথাই উল্লেখ রয়েছে; কনুই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা হয়নি। অতএব, পূর্ণ হাত মাসেহ করতে হবে।

দলীল (২)ঃ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ... فَمَسَحُوْا بِاَيْدِيْهِمْ كُلِّهَا اِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْاٰبَاطِ- (ابو داود ج١ ص٤٥)

অর্থাৎ, আম্মার ইবন ইয়াসির (রাঃ) হতে বর্ণিত। ... অতঃপর তারা তাদের উভয় হাতের বগল পর্যন্ত মাসেহ করেন।

* ইমাম আহমদ, ইসহাক, আতা, আওযাঈ ও ইবন মুনযির (রহ.)-এর মতে, উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে।

দলীলঃ প্রথম আলোচনায় তাঁদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত দ্বিতীয় দলীল দ্রষ্টব্য। উক্ত হাদীসে দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করার কথা উল্লেখ রয়েছে।

কিয়াসী দলীলঃ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা চুরির শাস্তির বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- –اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا অর্থাৎ, পুরুষ চোর ও মহিলা চোর, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও। (মায়েদাহঃ ৩৮)

চোরের শাস্তি হিসেবে হাত কাটার কথা বলা হয়েছে, আর এর পরিমাণ হল দুই কব্জি। তদ্রূপ মাসেহের ক্ষেত্রেও শুধু হাত মাসেহের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এর পরিমাণও হবে দুই কব্জি পর্যন্ত।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেঈ, সুফিয়ান সাওরী, হাসান, শাবী (রহ.) প্রমুখের মতে, তায়াম্মুমের ক্ষেত্র হল উভয় হাতের কনুইয়ের উপরিভাগ পর্যন্ত মাসেহ করা।

দলীল (১)ঃ প্রথম আলোচনায় তাঁদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত দলীলসমূহ।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ– (ابو داود ج١ ص٤٧)

অর্থাৎ, ... আম্মার ইবন ইয়াসির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, দুই হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে।

জবাবঃ ইবন শিহাব যুহরী দলীল হিসেবে যে আয়াত পেশ করেছেন, এর জবাব হল, আল্লাহ তাআলা অযুর ক্ষেত্রে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধোয়ার বিধান বর্ণনা করে তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে فامسحوا بوجوهكم وايديكم উল্লেখ করেছেন। আর ইহা তো সুস্পষ্ট যে, তায়াম্মুম হল অযুর স্থলাভিষিক্ত। যেহেতু অযুর ক্ষেত্রে হাত ধোয়ার পরিমাণ "কনুই পর্যন্ত" উল্লেখ রয়েছে, সুতরাং তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ উক্ত হাদীসটি সাহাবাগণের আমল। যেখানে পাঁচটিরও অধিক মারফূ হাদীস দ্বারা কনুই পর্যন্ত মাসেহ করার প্রমাণ রয়েছে, সেক্ষেত্রে সাহাবাগণের আমল দলীলযোগ্য নয়। তাছাড়া আম্মার ইবন ইয়াসার (রাঃ) থেকেও কনুই পর্যন্ত মাসেহের হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ এর জবাব প্রথম আলোচনায় বিস্তারিতভাবে দেয়া হয়েছে।

কিয়াসী দলীলের জবাবঃ ইমাম আহমদ ও অন্যান্য ইমামগণ যে কিয়াস করেছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, তাঁরা শব্দের উপর শব্দকে কিয়াস করেছেন। আর তিন ইমাম তায়াম্মুমকে অযুর উপর কিয়াস করেছেন। আর এটা হল অর্থের উপর অর্থের কিয়াস। এই কিয়াসটি এজন্য প্রাধান্যপ্রাপ্ত যে, তায়াম্মুম হল অযুর স্থলাভিষিক্ত। তাছাড়া তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে কনুইয়ের সীমা হল অধিক সতর্কতামূলক।

(درس ترمذي ج١ ص٣٨٩)

بَابُ الْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ بَعْدَ مَا يُصَلِّيْ فِيْ الْوَقْتِ ص٤٩

তায়াম্মুম করে নামায আদায়ের পর ওয়াক্ত থাকতেই পানি পাওয়া গেলে

... عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلَانِ فِيْ سَفَرٍ وَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِيْ الْوَقْتِ فَاَعَادَ اَحَدُهُمَا الصَّلٰوةَ وَالْوُضُوْءَ وَلَمْ يُعِدِ الْاٰخَرُ ثُمَّ اَتَيَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذٰلِكَ فَقَالَ لِلَّذِيْ لَمْ يَعِدْ اَصَبْتَ السُّنَّةَ وَاَجْزَأَتْكَ صَلٰوتُكَ وَقَالَ لِلَّذِيْ تَوَضَّأَ وَاَعَادَ لَكَ الْاَجْرُ مَرَّتَيْنِ– (نسائي ج١ ص٧٥ باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلوة)

অনুবাদঃ ... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দুই ব্যক্তি সফরে বের হয়। পথিমধ্যে নামাযের সময় উপনীত হওয়ায় তারা পানি না পাওয়ায় তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে। অতঃপর উক্ত নামাযের সময়ের মধ্যে পানি প্রাপ্ত হওয়ায় তাদের একজন অযু করে পুনরায় নামায আদায় করল এবং অপর ব্যক্তি নামায আদায় করা হতে বিরত থাকে। অতঃপর উভয়েই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করল। তিনি (সাঃ) বলেন, তোমাদের যে ব্যক্তি নামায পুনরায় আদায় করেনি সে সুন্নত মোতাবেক কাজ করেছে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি অযু করে নামায আদায় করেছে তার সম্পর্কে বলেন, তুমি দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হয়েছ।

বিশ্লেষণঃ প্রথম আলোচনাঃ তায়াম্মুম করে নামায শুরু করার পর যদি নামাযে থাকতেই পানি পাওয়া যায় (যেমন কেউ পানি নিয়ে আসল) তবে দাউদ যাহেরীর

মতে, নামায ছাড়বে না; বরং এমতাবস্থায়ই নামায শেষ করবে। তাঁর মতে এমতাবস্থায় নামায ভেঙ্গে দেয়া হারাম।

দলীলঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- لَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের আমলকে বাতিল (বিনষ্ট) করো না। (মুহাম্মদঃ ৩৩) অতএব এমতাবস্থায় নামায ভঙ্গ করা আমলকে বাতিল করার শামিল। ফলে ইহা হারাম।

* চার ইমামের মতে, এমতাবস্থায় নামায ভেঙ্গে দিয়ে পুনরায় নামায আদায়ের জন্য অযু করা ওয়াজিব।

দলীলঃ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পানি থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাআলার আদেশ হল-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ الخ

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নামাযে দাঁড়াও তখন মুখ ধৌত কর ... (মায়েদাহঃ ৬) সুতরাং এর উপর অবশ্যই আমল করতে হবে।

জবাবঃ দাউদ যাহেরী যে আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, এর উত্তর হল, এমতাবস্থায় নামায ছেড়ে দেয়া বাহ্যিকভাবে যদিও আমল বাতিল (বিনষ্ট) হওয়া বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটাই আমলের পরিপূর্ণ রূপ।

দ্বিতীয় আলোচনাঃ কোন ব্যক্তি নামায আদায়ের নিমিত্তে তায়াম্মুম সম্পন্ন করেছে, এমন সময় পানি পাওয়া গেল, তখন এর হুকুম কি, এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে-

* দাউদ যাহেরীর মতে, অযু করা ওয়াজিব নয়। কেননা, এতে তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে। দলীল হিসেবে তিনি বলেন, এটা আল্লাহ তাআলার বাণী- لَاتُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ-এর পরিপন্থী। কেননা, তায়াম্মুমও তো এক প্রকার আমল।

* চার ইমাম সহ জমহুরের মতে, এমতাবস্থায়ও আল্লাহ তাআলার হুকুম "فاغسلوا" আদায়ের নিমিত্তে অযু করা ওয়াজিব। দলীলঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ الخ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নামাযে দাঁড়াও তখন মুখ ধৌত কর ... (মায়েদাহঃ ৬)

জবাবঃ এখানেও প্রত্যক্ষ ও বাহ্যিকভাবে যদিও আমল বাতিল করা হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমলকেই পরিপূর্ণ করা হচ্ছে।

তৃতীয় আলোচনাঃ তায়াম্মুম করে নামায আদায়ের পর যদি পানি পাওয়া যায় এবং নামাযের সময়ও যদি অবশিষ্ট থাকে, তখন এর হুকুম কি, এ নিয়েও মতানৈক্য রয়েছেঃ

* তাউস, আতা, ইবন সীরীন ও যুহরী (রহ.) প্রমুখের মতে, নামায পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব। কেননা, এখনো যেহেতু সময় বাকি আছে, অতএব নামায আদায়কারী ব্যক্তি এখনো আল্লাহ তাআলার বাণী "فاغسلوا"-এর সম্বোধনের আওতায় রয়েছে। আর উক্ত শব্দটি আদেশসূচক। যা পালন করা ওয়াজিব।

* জমহুর ইমামগণের মতে, এমতাবস্থায় পুনরায় নামায আদায় করা ওয়াজিব নয়।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে দেখা যায়, যে ব্যক্তি পানি পাওয়া সত্ত্বেও নামায আদায় করেনি, তাকে পুনরায় নামায পড়ার হুকুম দেয়া হয়নি। বরং তাঁর সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলেন, "তোমাদের যে ব্যক্তি নামায পুনরায় আদায় করেনি, সে সুন্নত মোতাবেক কাজ করেছে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট।"

জবাবঃ উক্ত আয়াতে তো বলা হয়েছে, যখন নামাযের জন্য দাঁড়াবে, তখন হাত-মুখ ইত্যাদি ধৌত করবে। অতএব, যেহেতু নামায পড়ে ফেলেছে, তখন আর এই অবকাশ নেই।

بَابُ فِيْ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ ص٤٩ ঃ জুমআর দিনের গোসল

... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ عُمَرُ اَتَحْتَبِسُوْنَ عَنِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ قَالَ عُمَرُ الْوُضُوْءُ اَيْضًا اَوَ لَمْ تَسْمَعُوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ– (بخاري ج١ ص١٢٠ باب فضل الغسل يوم الجمعة، مسلم ج١ ص٢٨٠ كتاب الجمعة، ترمذي ج١ ص١١١ باب من آتى الجمعة فليغتسل، نسائي ج١ ص٢٠٤ باب الامر بالغسل يوم الجمعة)

অনুবাদঃ ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি তাকে (আবু সালামাকে) বলেন যে, একদিন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) জুমআর খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় সেখানে এক ব্যক্তি প্রবেশ করলে উমর (রাঃ) তাঁকে বলেন, তোমরা কি নামাযে আসতে দেরি কর? তখন আগন্তুক ব্যক্তি (হযরত উসমান রাঃ) বললেন, আমি তো আযান শুনেই অযু করলাম। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, শুধুই কি অযু? আর কিছু? তুমি কি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুননি, যখন তোমাদের কেউ জুমুআর নামায আদায়ের ইরাদা করে, সে যেন গোসল করে।

বিশ্লেষণঃ জুমআর নামাযের জন্য গোসল করা ওয়াজিব নাকি সুন্নত, এ নিয়ে ফকীহদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়ঃ

* দাউদ যাহেরীর মতে, জুমআর দিন গোসল করা ওয়াজিব।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে উল্লেখ আছে-

اِذَا اَتَى اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

দলীল (২)ঃ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِب عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ– (ابو داود ج١ ص٤٩، بخاري ج١ ص١٢١، مسلم ج١ ص١٨٠، نسائي ج١ ص٢٠٤)

অর্থাৎ, ... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির জন্য জুমুআর দিন গোসল করা ওয়াজিব।

উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, জুমুআর দিন গোসল করা ওয়াজিব।

* চার ইমাম ও জমহুরগণের মতে, জুমুআর দিনে গোসল করা ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নত।

দলীল (১)ঃ ... عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ نَاسًا مِّنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ جَاءُوْا فَقَالُوْا يَا اِبْنَ عَبَّاسٍ اَتَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا قَالَ لاَ وَلٰكِنَّه اَطْهَرُ وَخَيْر لِّمَنِ اغْتَسَلَ وَمَنْ لَّمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ وَسَاُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدَءَ الْغُسْلُ كَانَ النَّاسُ مَجْهُوْدِيْنَ يَلْبَسُوْنَ الصُّوْفَ وَيَعْمَلُوْنَ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا مُقَارِبَ السَّقْفَ اِنَّمَ هُوَ عَرِيْش فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ يَوْمٍ حَارٍ وَعَرِقَ النَّاسُ فِيْ ذٰلِكَ الصُّوْفِ حَتّٰى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاح اٰذٰى بِذٰلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمَّا وَجَدَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الرِّيْحَ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِذَا كَانَ هٰذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُوْا وَلْيَمَسَّ اَحَدُكُمْ اَفْضَلُ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِه وَطِيْبِه–

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ جَآءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ذِكْرُه بِالْخَيْرِ وَلَبِسُوْا غَيْرَ الصُّوْفِ وَكُفُوْا الْعَمَلَ وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِيْ كَانَ يُؤْذِيْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِّنَ الْعَرَقِ– (ابو داود ج١ ص٥١ باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة)

অর্থাৎ, ... ইকরামা (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইরাকের একটি প্রতিনিধি দল এসে ইবন আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন, হে ইবন আব্বাস! আপনার মতে কি জুমুআর দিন গোসল করা ওয়াজিব? উত্তরে তিনি বলেন, না। কিন্তু গোসল করা খুবই উত্তম ও পবিত্রতম কাজ- যে ব্যক্তি তা করে। এবং যে ব্যক্তি তা করে না, তার জন্য এটা ওয়াজিব নয়। আমি তোমাদেরকে গোসলের ইতিবৃত্ত বলব। অতঃপর তিনি বলেন, ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানরা মোটা (চামড়া ও পশমের) কাপড় পরিধান করে দৈহিক পরিশ্রম এমনকি বোঝা বহনের কাজও করত। তাদের মসজিদ ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং নীচু ছাদ বিশিষ্ট। একদা গরমের সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে গিয়ে দেখতে পান যে, অত্যধিক গরমের ফলে মুসল্লীদের শরীরের ঘাম কাপড়ে লেগে তা হতে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এবং এ কারণে সকলেই কষ্ট অনুভব করছে। নবী করীম (সাঃ) নিজেও এই দুর্গন্ধ অনুভব করে বললেন, "হে লোকসকল! যখন আজকের দিন (জুমুআর দিন) আসবে, তোমরা গোসল করে সাধ্যানুযায়ী তৈল ও সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করবে।" অতঃপর ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, পরবর্তীকালে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন মুসলমানদের ভাগ্য পরিবর্তন করে দেন, তখন তারা মোটা কাপড় পরিধান ত্যাগ করে উত্তম পোশাক পরিধান করতে থাকে, নিজেদের কাজ অন্যদের দ্বারা করাতে থাকে এবং তাদের মসজিদও প্রশস্ত হয়। এর ফলশ্রুতিতে তারা ঘর্মাক্ত হওয়ায় যে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হত তা দূরীভূত হয়।

এই হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, জুমুআর দিন গোসল ওয়াজিব নয়।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعِمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ اَفْضَلُ– (ابو داود ج١ ص٥١، ترمذي ج١ ص١١١ باب الوضوء يوم الجمعة، نسائي ج١ ص٢٠٥ باب الرخصة في ترك الغسل الخ)

অর্থাৎ, ... সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন অযু করবে, সে যেন সুন্নাতের উপর আমল এবং উত্তম কাজ করল। কাজেই যে ব্যক্তি গোসল করবে, তা তার জন্য সর্বোত্তম হবে।

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ مُهَّانَ اَنْفُسِهِمْ فَيَرُوْحُوْنَ اِلَى الْجُمُعَةِ بِهَيْئَاتِهِمْ فَقِيْلَ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ– (ابو داود ج١ ص٥١)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা নিজেদের কাজ নিজেরা করত এবং ঐ সমস্ত পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করেই মসজিদে যেত। তাদেরকে বলা হল (নবী করীম সাঃ বলেন), যদি তোমরা গোসল করে মসজিদে আসতে (তবে উত্তম হত)।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, জুমুআর দিনে গোসল করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ (১) যদি জুমুআর গোসল ওয়াজিব হত, তাহলে হযরত উসমান (রাঃ) কখনো গোসল পরিহার করতেন না এবং হযরত উমর (রাঃ)ও তাঁকে ফিরে গিয়ে গোসল করে আসার নির্দেশ দিতেন। যেহেতু তা করেননি, অতএব বুঝা যায়, গোসল ওয়াজিব নয়।

(২) অথবা, **فليغسل** বলে এখানে মুস্তাহাব হিসেবে হুকুম দেয়া হয়েছে, ওয়াজিবের জন্য নয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ এমনও হতে পারে, হুকুমটি ওয়াজিবের জন্যই ছিল, কিন্তু পরে মানসূখ হয়ে গেছে। যার প্রমাণ পাওয়া যায় জমহুরের পক্ষে বর্ণিত প্রথম দলীল দ্বারা।

بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ ص٥٣ : কাপড়ে বীর্য লাগলে

... عَنِ الْاَسْوَدِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّيْ فِيْهِ– (مسلم ج١ ص١٤٠ باب حكم المني، ترمذي ج١ ص٣١ باب المني يصيب الثوب، نسائي ج١ ص٥٦ باب فرك المني من الثوب، ابن ماجة ص٤١)

অনুবাদঃ ... আসওয়াদ (রহ.) হতে বর্ণিত। আয়িশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাপড় হতে মনী (বীর্য) ঘষে উঠিয়ে ফেলতাম। অতঃপর তিনি ঐ কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করতেন।

বিশ্লেষণঃ বীর্য পবিত্র না অপবিত্র, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে-

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, বীর্য (মনী) অপবিত্র নয়।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَاحْتَلَمَ فَاَبْصَرَتْهُ جَارِيَةٌ لِّعَائِشَةَ وَهُوَ يَغْسِلُ اَثَرَ الْجَنَابَةِ مِنْ ثَوْبِهِ اَوْ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَاَخْبَرَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ وَاَنَا اَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– (ابو داود ج١ ص٥٣، مسلم ج١ ص١٤٠)

অর্থাৎ, ... হাম্মাম ইবন হারেস থেকে বর্ণিত। তিনি আয়িশা (রাঃ)-এর মেহমান ছিলেন। তাঁর স্বপ্নদোষ হওয়ার পর তিনি কাপড় হতে বীর্য ধৌত করছিলেন। তা আয়িশা (রাঃ)-এর বাঁদী দেখে তাঁকে (আয়িশাকে) অবহিত করেন। তখন আয়িশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাপড় হতে তা খুঁটে তুলে ফেলে দিতাম।
উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে বীর্য খুঁটিয়ে বা ঘষে তোলার বিবরণ রয়েছে। অতএব, বীর্য যদি নাপাকই হত, তাহলে খুঁটিয়ে তোলা বা ঘষে তোলা যথেষ্ট হত না; বরং রক্তের ন্যায় ধোয়া জরুরী হত।

দলীল (৩)ঃ ✓ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ قَالَ اِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ الخ (مجمع الزوائد ج١ ص٢٧٩، ترمذي ج١ ص٣٢)

অর্থাৎ, ইবন আব্বাস (রাঃ) সূত্রে মারফূ আকারে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, বীর্য (যদি) কাপড়ে লেগে যায় (তাহলে কি করবে?) উত্তরে তিনি বললেন, এটা তো শ্লেষ্মার মত।
ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, উক্ত হাদীসে বীর্যকে নাকের শ্লেষ্মার ন্যায় বলে পবিত্র সাব্যস্ত করেছেন। অতএব, তা অপবিত্র নয়।

আকলী দলীলঃ ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, অসংখ্য আম্বিয়া কিরামের জন্মের মূল উৎস হল বীর্য। অতএব, পবিত্র এই মানুষগুলোর মূল উৎস বীর্যকে কিভাবে নাপাক বলতে পারি? (كتاب الام)

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, সুফিয়ান সাওরী ও আওযাঈ (রহ.)-এর মতে, বীর্য নাপাক। (شرح مسلم ج١ ص١٤٠)

দলীল (১)ঃ ... عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ اَنَّهُ سَاَلَ اُخْتَهُ اُمَّ حَبِيْبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ فِيْ الثَّوْبِ الَّذِيْ يُجَامِعُهَا فِيْهِ فَقَالَتْ نَعَمْ اِذَا لَمْ يَرَ فِيْهِ اَذًى– (ابو داود ج١ ص٥٣ باب الصلوة في

الثوب الخ، نسائي ج١ ص٥٦ باب المني يصيب الثوب، ابن ماجة ص٤١)

অর্থাৎ, ... মুআবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তিনি তাঁর বোন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পত্নী উম্মে হাবীবা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, স্ত্রী সঙ্গমকালে পরিহিত বস্ত্রে নবী করীম (সাঃ) কি নামায পড়তেন? তিনি বলেন, হাঁ পড়তেন, যদি তাতে নাপাক কিছু না দেখতেন।
উক্ত হাদীসে বীর্যকে নাপাক বলা হয়েছে।

দলীল (২)ঃ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ اِنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُرَاهُ فِيْهِ بُقْعَةً اَوْ بُقَعًا– (ابو داود ج١ ص٥٣، بخاري ج١ ص٣٦ باب اذا غسل الجنابة، مسلم ج١ ص١٤٠، نسائي ج١ ص٥٦، ابن ماجة ص٤١)

অর্থাৎ, ... সুলায়মান ইবন ইয়াসার-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি (আয়িশা) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাপড় হতে মনী (বীর্য) ধৌত করতেন। তারপরও বস্ত্রের উপর ভিজা দাগ পরিলক্ষিত হত।
অতএব, মনী যদি পবিত্রই হত, তাহলে ধোয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না।

দলীল (৩)ঃ হানাফীদের প্রমাণ সেসব রেওয়ায়েতও যাতে বীর্য খুঁটিয়ে, ঘষে বা ডলে তোলা কিংবা ধুয়ে তা পরিষ্কার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই সমস্ত রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে, বীর্য কাপড়ে রেখে দেয়া তিনি বরদাশত করতেন না। যদি এটা নাপাক না হত, তাহলে তো কোথাও না কোথাও বৈধতার বিবরণের জন্য এটা প্রমাণিত হত যে, বীর্য কাপড় বা দেহে রেখে দেয়া হয়েছে অথবা তা নিয়ে নামায পড়েছেন। এবং ন্যূনতম পক্ষে বৈধতা বিবরণের জন্য এটাকে বাচনিক বা ক্রিয়াগতভাবে পবিত্র সাব্যস্ত করা হত। অথচ গোটা হাদীস ভাণ্ডারে কোথাও এর নযীর নেই। অতএব, বীর্য পবিত্র নয়।

দলীল (৪)ঃ পবিত্র কুরআনে বীর্যকে "তুচ্ছ পানি" বলা হয়েছে। এটাও অপবিত্র হওয়ার সহায়ক।

আকলী দলীলঃ পেশাব, মযী, ওয়াদী সবই সর্বসম্মতিক্রমে নাপাক। অথচ এগুলো বের হওয়ার ক্ষেত্রে অযু ওয়াজিব। অতএব, বীর্য আরো অধিক নিশ্চিতরূপে নাপাক হওয়া উচিত। কেননা, এর ফলে গোসল ওয়াজিব হয়। (درس ترمذي ج١ ص٣٤٩)

জবাবঃ প্রথম ও দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ নাপাক জিনিসের পাক করার পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। কখনো পাক করার জন্য ধৌত করা আবশ্যক, আবার কখনো

ধৌত করার প্রয়োজন নেই। যেমন- মাটি বা জমি শুষ্ক হওয়ার সাথে সাথেই পাক হয়ে যায়। ধৌত করার কোন প্রয়োজন নেই। এমনিভাবে তুলা পাক করার পদ্ধতি হল, সেটাকে ধুনে ফেলা। আর বীর্য মিশ্রিত কাপড় বা স্থান পাক করার একটি পন্থা হল, বীর্যকে খুঁটে বা ঘষে তুলে ফেলানো। কিন্তু শর্ত হল বীর্য শুষ্ক ও ঘন হতে হবে। যদি ভিজা এবং পাতলা হয়, তাহলে অবশ্যই ধুতে হবে। যা আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত-

قَالَتْ كُنْتُ اَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ يَابِسًا وَاَغْسِلُهُ اِذَا كَانَ رَابِطًا– (اثار السنن ج١ ص١٥، المغني ج١ ص١٢٥)

অর্থাৎ, আয়িশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাপড় থেকে বীর্য ঘষে তুলে ফেলতাম, যখন সেটি শুষ্ক থাকত। আর ধুয়ে ফেলতাম, যখন ভিজা হত।

সুতরাং শাফেঈদের পক্ষে প্রদত্ত প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীসে যে বীর্য ঘষে তোলা হয়েছে, এটি ছিল পাক করার একটি পদ্ধতি। যা এইমাত্র বর্ণিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশসহ বর্তমানে সারা বিশ্বের মানুষের বীর্য যেহেতু পাতলা, সেমতে কাপড়ে বা শরীরে লাগলে তা ধৌত করা বৈ পাক করার অন্য কোন পন্থা নেই।

তৃতীয় দলীলের জবাবঃ হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকেই বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে-

قَالَ اِذَا اَجْنَبَ الرَّجُلُ فِيْ ثَوْبِهِ فَرَاٰى فِيْهِ اَثَرًا فَلْيَغْسِلْهُ وَاِنْ لَمْ يَرٰى اَثَرًا فَلْيَنْضَحْهُ– (مصنف ابن ابي شيبة ج١ ص٨٢)

অর্থাৎ, ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যখন কেউ কাপড় পড়ে অপবিত্র হয়, অতঃপর তাতে এর নিদর্শন দেখে, তবে সে যেন অবশ্যই তা ধৌত করে। আর যদি তাতে নিদর্শন না দেখে তাহলে যেন হালকাভাবে ধৌত করে।

এর দ্বারা বোঝা যায় যে, তাঁর নিকটও বীর্য নাপাক। অতএব, এই বৈপরীত্য অবসানের জন্য "المني بمنزلة المخاط" বাক্যটি অবশ্যই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে। যথা-

(ক) কেউ কেউ এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের উদ্দেশ্য বীর্যের পবিত্রতা বর্ণনা করা নয়; বরং উপমার কারণ হল, বীর্য শ্লেষ্মার মত আঁঠালো বা পিচ্ছিল হওয়া।

(খ) আবার কেউ কেউ বলেছেন, তুলনা দেয়ার উদ্দেশ্য হল, নাকের শ্লেষ্মা যেমন সুস্থ তবিয়তে ঘৃণা জন্মায়, তেমনিভাবে বীর্যতেও ঘৃণার উদ্রেক করে।

(গ) কেউ কেউ বলেন, নাকের শ্লেষ্মা ঘন ও শুষ্ক হলে যেমন ঘষে বা খুঁটিয়ে দূর করা যায়, তেমনিভাবে ঘন ও শুষ্ক বীর্যকেও ঘষে বা খুঁটিয়ে দূর করা সম্ভব।

আকলী দলীলের জবাবঃ ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর কিয়াসটি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বীর্য দ্বারা যেরূপভাবে আম্বিয়ায়ে কিরাম সৃজিত হয়েছেন, অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র অনেক দুশমন যেমন ফেরাউন, হামান, নমরূদ, আবু জাহল প্রমুখ বড় বড় জঘন্য কাফির-মুশরিকও সৃজিত হয়েছে। অতএব, এমন খোঁড়া যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

তাছাড়া একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় হল, অনেক সময় মূল বস্তু (**حقيقة**) পরিবর্তন হয়ে নাপাক জিনিসও পাক হয়ে যায়। অতএব, বীর্য যখন গোশতে রূপান্তরিত হয়ে গর্ভজাত শিশু হয়ে যায় তখন মূল (বীর্য) পরিবর্তিত হওয়ার কারণে তা আর নাপাক থাকে না। তাই ইমাম নববী (রহ.) এই কিয়াসটি দ্বারা বীর্য পাক প্রমাণ করাকে একেবারেই অবৈধ মনে করেন এবং কঠোর সমালোচনা করেছেন। (**شرح المهذب ج٢ ص٥٥٤**)

بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ ص٥٣

শিশুদের পেশাব কাপড়ে লাগলে

... عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَّهَا صَغِيْرٍ لَّمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَه رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِه فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَآءٍ فَنَضَحَه وَلَمْ يَغْسِلْهُ– (بخاري ج١ ص٣٥ باب بول الصبيان، مسلم ج١ ص١٣٩ باب حكم بول الطفل الخ، ترمذي ج١ ص٢١ باب نضح بول الغلام الخ، نسائي ج١ ص٥٦ باب بول الصبي الخ، ابن ماجة ص٤٠)

অনুবাদঃ ... উম্মে কায়েস বিনত মিহ্‌সান (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শিশুটিকে কোলে নেয়ার পর সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দেয়। অতঃপর তিনি পানি আনিয়ে কাপড়ের উক্ত স্থানে ছিটিয়ে দেন। কিন্তু তিনি তা ধৌত করেননি।

বিশ্লেষণঃ দাউদ যাহেরীর মতে, দুগ্ধপোষ্য ছেলে শিশুর পেশাব পাক। কিন্তু অন্য সকলের মতে দুগ্ধপোষ্য ছেলে শিশুর পেশাবও নাপাক। তবে ছেলে শিশু এবং মেয়ে শিশুর পেশাব পবিত্র করার পদ্ধতি নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল, ইসহাক, হাসান বসরী ও আতা (রহ.)-এর মতে, ছেলে শিশুর পেশাব ধোয়ার পরিবর্তে এর উপর পানি ছিটিয়ে দেয়াই যথেষ্ট। তবে দুগ্ধপোষ্য কন্যা শিশুর প্রস্রাব ধৌত করা জরুরী।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِيْ حِجْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ الْبَسْ ثَوْبًا وَّاَعْطِنِيْ اِزَارَكَ حَتّٰى اَغْسِلَهُ قَالَ اِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْاُنْثٰى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ ذَكَرٍ– (ابو داود ج١ ص٥٤، ابن ماجة ص٤٠)

অর্থাৎ, ... লুবাবা বিনত হারিস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুসায়েন ইবন আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কোলে ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি তাঁর (সাঃ) কোলে পেশাব করেন। তখন আমি তাঁকে বলি, আপনি অন্য একটি কাপড় পরিধান করুন এবং এই কাপড় দুটি আমাকে ধৌত করতে দিন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, মেয়ে শিশুর পেশাব কাপড়ে লাগলে তা ধৌত করতে হয় এবং ছেলে শিশুর পেশাব কাপড়ে লাগলে তাতে পানি ছিটালেই চলে।

উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে দুগ্ধপোষ্য ছেলে শিশুর পেশাব থেকে কাপড় পাক করার জন্য হাদীসে نضح শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ ছিটানো।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, ইবরাহীম নাখঈ ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে, কন্যা শিশুর পেশাবের ন্যায় ছেলে শিশুর পেশাবও ধৌত করা জরুরী। শুধু পানি ছিটালেই পাক হবে না। অবশ্য দুগ্ধপোষ্য ছেলে শিশুর প্রস্রাব অধিক ধোয়া জরুরী নয়; বরং সামান্য ধোয়াই যথেষ্ট। (عيني ج١ ص٨٨٩)

দলীল (১)ঃ নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ– (مستدرك حاكم ج١ ص١٨٣، معارف السنن ج١ ص٢٧٥)

অর্থাৎ, তোমরা পেশাব থেকে সতর্ক থাক। কেননা, কবরের অধিকাংশ আযাব এ কারণে হয়ে থাকে।

দলীল (২)ঃ হযরত আম্মার (রাঃ)-এর প্রসিদ্ধ হাদীস। এতে উল্লেখ রয়েছে-

اِنَّمَا تَغْسِلُ ثَوْبَكَ مِنَ الْبَوْلِ– (تنظيم الاشتات ج١ ص١٩٣، درس مشكوة ج١ ص١٩٤)

অর্থাৎ, পেশাব লাগলে তোমার কাপড় ধৌত করবে।

উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে সাধারণভাবে প্রস্রাবের কথা উল্লেখ রয়েছে। ছেলে শিশুর পেশাব হোক বা কন্যা শিশুর পেশাব হোক, মানুষের পেশাব হোক বা অন্যান্য জীবজন্তুর

পেশাব হোক, বালেগের পেশাব হোক বা নাবালেগের পেশাব হোক, আমভাবে বলা হয়েছে। নির্দিষ্ট করা হয়নি। অতএব, হাদীসের এই ব্যাপকতার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, ছেলে শিশুর পেশাব এবং কন্যা শিশুর পেশাবের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যাবে না, বরং উভয়ের পেশাবই ধৌত করা জরুরী।

দলীল (৩)ঃ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِيْ بِالصِّبْيَانِ فَأَتَى بِصَبِيٍّ مَرَّةً فَبَالَ عَلَيْهِ فَقَالَ صُبُّوْا عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبًّا– (اعلاء السنن ج١ ص٤٧٣، اثار السنن ج١ ص١٧، بخاري ج١ ص٣٥)

অর্থাৎ, আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট শিশুদের আনা হত। একবার এক শিশুকে আনার পর তাঁর গায়ে পেশাব করে দেয়। ফলে তিনি বলেন, এর উপর ভাল করে পানি ঢেলে দাও।

জবাবঃ نضح ও رشى শব্দটি শুধুমাত্র ছিটানোর অর্থেই ব্যবহৃত হয় না; বরং গোসল করা বা ধৌত করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অতএব, نضح-এর অর্থ হবে হালকাভাবে ধৌত করা। আর لم يغسل এর অর্থ হল لم يغسله غسلا مبالغا অর্থাৎ খুব ভালভাবে ধৌত করেননি। আর হানাফীগণ তো একথা স্বীকার করে যে, ছেলে শিশুর পেশাব হালকাভাবে ধুলেই পাক হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, نضح শব্দটি যে ধৌত করার অর্থে ব্যবহৃত হয়, এর উদাহরণ হাদীসেই পাওয়া যায়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন-

أَرْسَلْنَا الْمِقْدَادَ بْنَ الْاَسْوَدِ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذِيِّ يَخْرُجُ مِنَ الْاِنْسَانِ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ– (مسلم ج١ ص١٤٣ باب المذي)

অর্থাৎ, আমরা মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ)-কে নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট প্রেরণ করলাম। তিনি নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, মানুষের মযী বের হলে কি করবে? জবাবে নবী করীম (সাঃ) বললেন, তুমি অযু কর এবং তোমার লজ্জাস্থান ধৌত কর।

উক্ত হাদীসে মযী বের হলে লজ্জাস্থান ধৌত করার কথা বলা হয়েছে। এবং শাফেঈ মাযহাবের অভিমতও এই যে, মযী বের হলে লজ্জাস্থান ধৌত করতে হবে, শুধু পানি ছিটানো যথেষ্ট নয়। অথচ স্বয়ং শাফেঈ (রহ.) উক্ত হাদীসে نضح শব্দটির অর্থ করেছেন ধৌত করা, ছিটানোর অর্থ গ্রহণ করেননি।

كِتَابُ الصَّلٰوةِ ঃ নামায অধ্যায়

بَابُ الْمَوَاقِيْتِ ঃ নামাযের ওয়াক্তসমূহ ص ٥٦

... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّنِي جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلّٰى بِيْ الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَصَلّٰى بِي الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلّٰى بِيْ يَعْنِي الْمَغْرِبَ حِيْنَ اَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلّٰى بِي الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلّٰى بِي الْفَجْرَ حِيْنَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلّٰى بِي الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلّٰى بِيْ الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ وَصَلّٰى بِيْ الْمَغْرِبَ حِيْنَ اَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلّٰى بِيَ الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلّٰى بِيَ الْفَجْرَ فَاَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَيَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هٰذَا وَقْتُ الاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ– (ترمذي ج١ ص٣٨ باب مواقيت الصلٰوة صلعم)

অনুবাদঃ ... হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ জিবরাঈল (আঃ) বায়তুল্লাহ শরীফের নিকটে দুইবার আমার নামাযে ইমামতি করেছেন। প্রথমবার তিনি আমাকে নিয়ে যুহরের নামায আদায় করেন, যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে সামান্য ঢলে পড়েছিল এবং জুতার এক ফিতা পরিমাণ সামান্য ছায়া বায়তুল্লাহর পূর্ব দিকে দেখা গিয়েছিল। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে আসরের নামায আদায় করেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়। পরে তিনি আমাকে নিয়ে মাগরিবের নামায আদায় করেন- যখন রোযাদার ইফতার করে। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে ঐ সময় এশার নামায আদায় করেন, যখন পশ্চিমাকাশের লাল শুভ্র রং লোপ পায়। পরে তিনি আমাকে নিয়ে এ সময় ফজরের নামায আদায় করেন, যখন রোযাদার ব্যক্তির জন্য পানাহার হারাম হয়। পরের দিন তিনি আমাকে নিয়ে যুহরের নামায ঐ সময় আদায় করেন, যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে ঐ সময় আসরের নামায আদায় করেন, যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হয়। পরে তিনি আমাকে নিয়ে ঐ সময় মাগরিবের নামায আদায় করেন যখন রোযাদার ইফতার করে। পরে তিনি আমাকে নিয়ে রাতের এক-তৃতীয়াংশে এশার নামায আদায় করেন। পরে তিনি আমাকে নিয়ে ফজরের নামায ঐ সময় আদায় করেন, যখন দিগন্ত উজ্জ্বল হয়ে যায়। অতঃপর তিনি (হযরত জিবরাঈল আঃ) আমাকে লক্ষ্য করে

বলেনঃ হে মুহাম্মাদ! আপনার পূর্ববর্তী আম্বিয়াদের জন্য এটাই নামাযের নির্ধারিত সময় এবং এই দুই সময়ের মাঝখানেই নামাযের সময়।

বিশ্লেষণঃ উপরোল্লিখিত হাদীসের আলোকে প্রশ্ন উত্থাপন হয় যে, নিঃসন্দেহে হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর তুলনায় নবী করীম (সাঃ) আফজল বা উত্তম। এমতাবস্থায় হযরত জিবরাঈল (আঃ) কিভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে উত্তম না হয়ে ইমামতি করান? সংক্ষেপে এর জবাব হল-

(১) হাদীসে أَمَّنِيْ শব্দ উল্লেখ আছে, যার অর্থ হল, হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমাকে ইমাম বানিয়েছেন এবং হযরত জিবরাঈল (আঃ) মুক্তাদি হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নামাযের তালিম দিয়েছেন।

(২) অথবা, যদিও নবী করীম (সাঃ) উত্তম, কিন্তু এ সময় জিবরাঈল (আঃ) একটি অংশ বিশেষে অধিক জ্ঞানী ছিলেন।

(৩) অথবা, তিনি নামাযের সময় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে এসেছিলেন বলে তিনি ইমামতি করেছিলেন। এতে নবী করীম (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বের কোন হানি হয় না।

(৪) সাধারণত তুলনামূলক কম মর্যাদাশীল ব্যক্তির ইমামতি করা দূষণীয় নয়। আর এখানে নবী করীম (সাঃ) যদিও জিবরাঈল (আঃ)-এর তুলনায় উত্তম ছিলেন, তাতে প্রশ্ন তোলার কোন অবকাশ নেই। কেননা, নবী করীম (সাঃ) অন্তিমকালে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর পিছনে নামায আদায় করেছেন। এমনিভাবে হুজুর (সাঃ) আবদুর রহমান ইবন আউফ (রাঃ)-এর পিছনেও নামায আদায় করেছেন।

(ابو داود ج۱ ص۲۰ باب المسح على الخفين)

যুহরের নামাযের শেষ সময় ও আসরের নামাযের প্রথম সময়ঃ যুহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত যে, সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার সাথে সাথে যুহরের নামাযের সময় শুরু হয়ে যায়। কিন্তু যুহরের শেষ এবং আসরের নামায শুরু হওয়ার সময় নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল ও সাহেবাইন (রহ.)-এর মতে, এক মিসল তথা যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া সে বস্তুর ছায়া হতে এক গুণ বৃদ্ধি পাবে তখন যুহরের সময় শেষ এবং আসরের নামাযের সময় শুরু হবে। (فتح الملهم ج۱ ص۱۹۱)

দলীল (১)ঃ ... عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُوْلِه مَا لَمْ يُحْضُرِ الْعَصْرُ– (مسلم ج۱ ص۲۲۳ باب اوقات الصلوٰة الخمس)

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, যুহরের সময় শুরু হয় যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ছায়া তার সমান দৈর্ঘ্য পরিমাণ পর্যন্ত বাকি থাকে, যতক্ষণ না আসর উপস্থিত হয়।

* ইমাম হানিফা (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ অভিমত হলো- দুই মিসল পর্যন্ত যুহরের নামাযের সময় থাকে অর্থাৎ, ছায়া আছলী ব্যতীত দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত যুহরের শেষ সময় থাকে এবং এর পরেই শুরু হয় আসর নামাযের ওয়াক্ত।

(تنظيم الاشتات ج١ ص٢٢١، درس ترمذي ج١ ص٣٩٥)

দলীল (১)ঃ আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন-

... كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارَادَ الْمُؤَذِّنُ اَنْ يُّؤَذِّنَ الظُّهْرَ فَقَالَ اَبْرِدْ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُّؤَذِّنَ فَقَالَ اَبْرِدْ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا حَتّٰى رَاَيْنَا فَيْءَ التُّلُوْلِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا بِالصَّلٰوةِ– (ابو داود ج١ ص٥٨ باب وقت صلٰوة الظهر، بخاري ج١ ص٨٧–٨٨ باب الاذان للمسافر الخ، ترمذي ج١ ص٤١ باب في تاخير الظهر في شدة الحر)

অর্থাৎ, ... আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম। মুআয্‌যিন যুহরের নামাযের আযান দিতে প্রস্তুত হলে তিনি (সাঃ) বলেন, ঠাণ্ডা হতে দাও (অর্থাৎ রোদের প্রখরতা একটু নিস্তেজ হোক)। কিছুক্ষণ পর মুআয্‌যিন পুনরায় আযান দিতে চাইলে তিনি আবার বলেন, ঠাণ্ডা হতে দাও। রাবী বলেন, নবী করীম (সাঃ) একথা দুই অথবা তিনবার বলেন। এমতাবস্থায় যুহরের নামাযের সময় প্রায় শেষ বলে প্রতীয়মান হল। তখন নবী করীম (সাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই প্রচণ্ড গরম জাহান্নামের প্রচণ্ড তাপের অংশ বিশেষ। অতএব যখন অত্যধিক গরম পড়বে তখন যুহরের নামায বিলম্বে আদায় করবে।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلٰوةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ– (ابو داود ج١ ص٥٨، بخاري ج١ ص٧٦ باب الابراد بالظهر في شدة الحر، مسلم ج١ ص٢٢٤ باب استحباب الابراد بالظهر الخ، ترمذي ج١ ص٤٠ باب تاخير الظهر في شدة الحر، نسائي ج١ ص٨٧ الابراد بالظهر الخ، ابن ماجة ص٤٩)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ নামায বিলম্বে আদায় করবে। কেননা নিশ্চয়ই অত্যধিক গরম জাহান্নামের প্রচণ্ড তাপের অংশ বিশেষ।

উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে গরমের সময় যুহরের নামাযকে দেরি করে পড়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। আর হিজায অঞ্চলে شدة الحر বা অধিক গরম এক মিসল পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয় না। তাছাড়া বুখারীতে বর্ণিত আছে, حتى ساوى الظل التلول অর্থাৎ তিনি এমন সময় যুহরের নামায পড়েছেন, যখন টিলাগুলোর ছায়া এক মিসল হয়ে গেছে। আরবের টিলাগুলো সাধারণত চ্যাপ্টা ধরনের হয়। এজন্য এগুলোর ছায়া এক মিসল অপেক্ষা অনেক দেরিতে প্রকাশ পায়। (تنظيم ج١ ص٢٢٢)

জবাবঃ (১) আল্লামা উসমানী (রহ.) বলেন, হাদীসে বর্ণিত **و كان ظل الرجل كطوله** অংশটি পূর্বোক্ত **اذا زالت الشمس**-এর উপর **عطف** (সংযোজন) হয়েছে। তাই এ হাদীসে যুহরের প্রথম সময়ের কথা বলা হয়েছে। শেষ সময়ের কথা বলা হয়নি।

(২) অথবা, উক্ত হাদীস নামাযের সময়ের ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত হাদীসটি দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে।

(৩) অথবা, উক্ত হাদীসে উত্তম ও সতর্কতামূলক সময় বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। তবে দুই মিসল পর্যন্ত নামায পড়া জায়েয। (درس مشكوة ج٢ ص١٢)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ উল্লেখ্য যে, ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার পর যদি কোন বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়, তাহলে আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যাবে। এবং তখন যুহরের নামাযের সময়ও বাকি থাকবে। সুতরাং তাঁর মতে, এই এক মিসলের সময়টা হচ্ছে যৌথ সময় (وقت مشترك) অর্থাৎ এই সময় যুহর ও আসরের চার চার রাকাত নামায আদায় করা যাবে।

দলীলঃ হাদীসে জিবরাঈল (আঃ)-

... صلى بي العصر (في اليوم الاول) حين كان ظله مثله وصلى بي الظهر (في اليوم الثاني) حين كان ظله مثله–

(অনুচ্ছেদের শুরুতে পূর্ণ হাদীসটির অর্থ দেয়া হয়েছে।)

উক্ত হাদীসের আলোকে ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, নবী করীম (সাঃ) একই মিসলে যুহর ও আসর উভয় ওয়াক্তের নামায আদায় করেছেন।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সহ জমহুর ইমামগণের মতে, যুহর ও আসরের ওয়াক্তের মধ্যে কোন যৌথ সময় নেই। বরং যুহরের সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে আসরের সময় শুরু হয়ে যাবে। (درس مشكوة ج٢ ص١٠)

দলীল (১)ঃ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُوْلِه مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ– (مسلم ج١ ص٢٢٣)

(ইতিপূর্বে হাদীসটির অর্থ দেয়া হয়েছে।)

দলীল (২)ঃ ... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلصَّلٰوةِ اَوَّلاً وَاٰخِرًا وَاِنَّ اَوَّلَ وَقْتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ وَاٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ ... (ترمذي ج١ ص٣٩ باب منه)

অর্থাৎ, .. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, নিশ্চয় নামাযের শুরু ও শেষ সময় আছে। যুহরের নামাযের প্রথম সময় হল, যখন সূর্য পশ্চিম দিকে হেলতে শুরু করে। আর শেষ ওয়াক্ত হল, যখন আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়।

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ فَوْرُ الشَّفَقِ وَ وَقْتُ الْعِشَآءِ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ– (ابو داود ج١ ص٥٨ باب المواقيت، مسلم ج١ ص٢٢٣ باب اوقات الصلوات الخمس، نسائي ج١ ص٩٠–٩١ آخر وقت الغرب)

অর্থাৎ, ... হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেন, আসরের নামাযের সময় আরম্ভের পূর্ব পর্যন্ত যুহরের নামাযের সময় অবশিষ্ট থাকে এবং সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার পূর্ব পর্যন্ত আসরের নামাযের সময় থাকে। মাগরিবের নামাযের সময়সীমা হল পশ্চিম আকাশের শাফাক অস্তমিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। এশার নামাযের ওয়াক্ত রাতের অর্ধেক সময় পর্যন্ত এবং সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত হল ফজরের নামাযের সময়।

সুতরাং উপরোল্লিখিত হাদীসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যৌথ সময় বলতে কোন ওয়াক্ত নেই।

জবাবঃ হাদীসে জিবরাঈলের জবাবঃ (১) জমহুরের পক্ষে দলীল হিসেবে বর্ণিত তৃতীয় হাদীস দ্বারা তা মানসূখ হয়ে গেছে। কেননা উক্ত হাদীসে প্রত্যেক নামাযের সময় বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

(২) প্রথম দিন আসরের নামায আরম্ভ করেছিলেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ ছিল এবং পরের দিন যুহরের নামায শেষ করেছিলেন এক মিস্‌ল হওয়ার সাথে সাথেই। যদিও বাহ্যিকভাবে উভয়টিই একই ওয়াক্ত হয়েছিল বলে মনে হয়, কিন্তু উভয়টির ওয়াক্ত ছিল ভিন্ন ভিন্ন।

* يَا مُحَمَّدُ هٰذَا وَقْتُ الاَنْبِيَآءِ مِنْ قَبْلِكَ (হে মুহাম্মাদ! আপনার পূর্ববর্তী আম্বিয়াদের জন্য এটাই নামাযের নির্ধারিত সময়) বাক্যের ব্যাখ্যা-

উল্লিখিত বাক্যে একটি প্রশ্ন জাগে যে, এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায কি তাহলে সকল নবীদের সময়েও ছিল? অথচ আমরা জানি যে, তা কখনো ছিল না। বরং হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে পাই, হযরত আদম (আঃ)-এর বেহেশত থেকে নির্বাসনের পর ফযরের সময় তাঁর তওবা কবুল হলে তৎক্ষণাৎ তিনি দুই রাকাত নামায আদায় করেন। সেখান থেকেই ফজরের নামাযের সূচনা। আর যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে যুহরের সময় কুরবানী করতে পারেননি; বরং বেহেশতী দুম্বা কুরবানী হলে তখন তিনি শুকরিয়াস্বরূপ চার রাকাত নামায আদায় করেন। তখন থেকেই যুহরের চার রাকাত নামায শুরু হয়। হযরত উযাইর (আঃ) একশত বছর মৃত থাকার পর যখন আল্লাহ তাআলা আসরের সময় জীবিত করলেন, তখন তিনি শুকরিয়া জ্ঞাপন পূর্বক চার রাকাত নামায আদায় করেন, তখন থেকেই আসরের চার রাকাত নামাযের প্রচলন হয়। মাগরিবের সময় হযরত দাউদ (আঃ)-কে ক্ষমা করা হলে তিনিও শুকরিয়া স্বরূপ চার রাকাতের নিয়ত করে তিন রাকাত আদায়ের পর কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। বাকি এক রাকাত আর আদায় করতে পারেননি। সেখান থেকেই মাগরিবের নামায তিন রাকাত হিসেবে পড়া হয়। (طحاوي ج١ ص٨٥-٨٦)

আর আমাদের নবী করীম (সাঃ) সর্বপ্রথম এশার নামায আদায় করেন। যেমন হাদীসে এসেছে-

... عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل ... فَقَالَ اَعْتِمُوْا بِهٰذِهِ الصَّلٰوةِ فَاِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلٰى سَائِرِ الْاُمَمِ وَلَمْ تُصَلِّهَا اُمَّةٌ قَبْلَكُمْ— (ابو داود ج١ ص٦١ باب وقت العشاء الاخرة)

অর্থাৎ, ... মুআয ইবন জাবাল (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। ... নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, তোমরা এই (এশার) নামায বিলম্বে আদায় করবে। কেননা, এই নামাযের কারণেই অন্যান্য উম্মতগণের উপরে তোমাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত। ইতিপূর্বে কোন নবীর উম্মত এই নামায আদায় করেনি।

উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী নবীগণের সময় এশার নামায ছিল না, কিন্তু এ হাদীস দ্বারা সকল নামাযকেই বুঝানো হয়েছে। এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ইবন হাজার

আসকালানী (রহ.) বলেন, হাদীসে যে وَقْتُ الْاَنْبِيَاء বলা হয়েছে তা বহুবচনের জন্য- পৃথকীকরণ বুঝানোর জন্য নয়।

* আল্লামা বায়যাভী (রহ.) বলেন, এশার নামায পূর্ববর্তী নবীগণের উপর ফরয ছিল না। কিন্তু নবীগণ তা নফল হিসেবে আদায় করতেন। এ জন্যই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উল্লেখ করেন। অথবা হাদীসের এ উক্তি দ্বারা নামাযের দিকে ইঙ্গিত করা হয়নি; বরং পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের ওয়াক্তের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (درس ترمذي ج ١ ص٤٠٠)

* উপরিউক্ত হাদীসের আলোকে আরো একটি প্রশ্ন উঠে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) তো নামাযের জন্য আদিষ্ট নন। সুতরাং তাঁর উপর নামায বড়জোর নফল হিসেবে গণ্য হতে পারে। কিন্তু নবী করীম (সাঃ)-এর উপর তো নামায ফরয। সুতরাং এক্ষেত্রে নফল নামায আদায়কারীর পিছনে ফরয নামায আদায়কারীর ইক্তিদা হচ্ছে- যা হানাফী মাযহাব মতে জায়েয নয়। এর উত্তর হল-

(১) কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের আকৃতি ও পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয়নি ততক্ষণ পর্যন্ত নবী করীম (সাঃ)-এর উপরও নামায ফরয ছিল না, বরং নফলই ছিল। আর নফল নামায আদায়কারীর পিছনে নফল আদায়কারীর ইক্তিদা নিঃসন্দেহে জায়েয।
(২) অথবা, এটা তো ইসলামের একেবারে প্রাথমিক যুগের ঘটনা। সুতরাং ইসলামের প্রাথমিক যুগে হয়তো নফল নামায আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইক্তিদা জায়েয ছিল। যেমন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে নামাযে চলাফেরা করা বা কথাবার্তা বলা জায়েয ছিল। অতঃপর এগুলো রহিত হয়ে যায়।
(৩) আবু বকর ইবনুল আরাবী (রহ.) বলেন, নামায শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল (আঃ)-কে আদেশ করার ফলে তার উপরও নামায আদায় ফরয হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং জিবরাঈল (আঃ)ও ফরয আদায়কারী ছিলেন। (تنظيم ج ١ ص٢٢٦)

بَابُ وَقْتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ ص٥٨ ঃ যুহরের নামাযের ওয়াক্ত

... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاٰخُذُ قَبْضَةً مِّنَ الْحَصٰى لِتَبْرُدَ فِيْ كَفِّيْ اَضَعُهَا لِجِبْهَتِيْ اَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الْحَرِّ-

অনুবাদঃ ... হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে যুহরের নামায আদায় করতাম। তিনি এক মুষ্টি পাথরের নুড়ি ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য আমার হাতে দেন, যেন আমি অত্যধিক গরমের কারণে তা আমার সিজদার স্থানে রেখে তার উপর সিজদা করতে পারি।

বিশ্লেষণঃ যুহরের নামায তাড়াতাড়ি আদায় করা উত্তম, নাকি বিলম্বে পড়া উত্তম- এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়ঃ
* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর এক উক্তি অনুযায়ী, যুহরের নামায তাড়াতাড়ি আদায় করা উত্তম। তবে গ্রীষ্মকালে উষ্ণ দেশে এবং দূর দূরান্ত থেকে লোকজনের জামাআতে শরীক হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে যুহরের নামায বিলম্ব করে পড়া উত্তম। (فتح الملهم ج۲ ص۱۹۷)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। নবী করীম (সাঃ) যদি বিলম্বেই নামায আদায় করতেন, তাহলে তো অত্যধিক গরম থেকে বাঁচার নিমিত্তে সিজদার স্থানে রাখার জন্য পাথরের নুড়ি জাবিরের হাতে দেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি (সাঃ) যুহরের নামায বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি আদায় করতেন।

দলীল (২)ঃ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اَلْوَقْتُ الْاَوَّلُ مِنَ الصَّلٰوةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ وَالْوَقْتُ الْآخِرُ عَفْوُ اللّٰهِ– (ترمذي ج۱ ص٤۳ باب في الوقت الاول من الفضل، دار قطني ج۱ ص۹۳)

অর্থাৎ, হযরত ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, নামাযের প্রথম ওয়াক্ত হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। আর শেষ ওয়াক্ত হল আল্লাহর পক্ষ হতে মার্জনা।

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ يَا عَلِيُّ ثَلٰث لَا تُؤَخِّرْهَا الصَّلٰوةُ اِذَا اٰنَتْ الخ (ترمذي ج۱ ص٤۳)

অর্থাৎ, আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, হে আলী! তিনটি বিষয়ে তুমি কখনো দেরী করবে না। নামায- যখন ওয়াক্ত এসে যায়।
উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যুহরের নামাযও তাড়াতাড়ি আদায় করাই উত্তম।

* ইমাম আবু হানিফা, ইসহাক, ইবন মুবারক ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর এক মতানুযায়ী, গ্রীষ্মকালে যুহরের নামায বিলম্ব করে পড়া এবং শীতকালে যুহরের নামায তাড়াতাড়ি আদায় করা উত্তম। (شرح مسلم ج۱ ص۲۲٤)

দলীল (১)ঃ হযরত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-
... حَتّٰى رَأَيْنَا فَيْئَ التُّلُوْلِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا بِالصَّلٰوةِ– (ابو داود ج١ ص٥٨ باب وقت صلوة الظهر)

(ইতিপূর্বে পূর্ণ হাদীসটির অর্থ ও সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে।)

দলীল (২)ঃ ... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلٰوةِ الخ (ابو داود ج١ ص٥٨)

(ইতিপূর্বে পূর্ণ হাদীসটির অর্থ ও সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে।)

দলীল (৩)ঃ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلٰوةِ وَاِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلٰوةِ– (بخاري ج١ ص١٢٤ كتاب الجمعة باب اذا اشتد الحر الخ)

অর্থাৎ, ... আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) প্রচণ্ড শীতের সময় নামায আগে পড়তেন এবং প্রচণ্ড গরমের সময় নামায পড়তেন ঠাণ্ডার সময়ে।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, গ্রীষ্মকাল এবং শীতকালের নামায আদায়ের সময়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এবং এর হুকুমও ভিন্ন অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে নামায বিলম্বে পড়া মুস্তাহাব এবং শীতকালে নামায তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, যে সমস্ত হাদীস দ্বারা তাড়াতাড়ি প্রমাণিত হয়, তা حديث ابراد তথা শীতকালীন হাদীস দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলীলের জবাবঃ উক্ত হাদীসদ্বয়ে প্রথম ওয়াক্ত দ্বারা উত্তম ওয়াক্তের প্রথম সময়কে বুঝানো হয়েছে, সাধারণ ওয়াক্তের প্রথম সময়কে বুঝানো হয়নি। সুতরাং তাড়াতাড়ি নামায পড়ার যে হাদীস তা শীতকালের জন্য উত্তম ওয়াক্ত হিসেবে গণ্য হবে এবং দেরিতে নামায পড়ার যে হাদীস তা গ্রীষ্মকালের জন্য উত্তম ওয়াক্ত হিসেবে প্রযোজ্য হবে। আর হযরত আনাস (রাঃ)-এর উল্লিখিত হাদীসটি স্পষ্টভাবে এদিকেই ইঙ্গিত বহন করে। অতএব কোন মতানৈক্যের অবকাশ নেই।

(تنظيم الاشتات ج١ ص٢٢٩)

بَابُ وَقْتِ الْعَصْرِ ص٥٧ ঃ আসরের নামাযের ওয়াক্ত

... عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ وَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ— (بخاري ج١ ص٧٨ باب وقت العصر، مسلم ج١ ص٢٢٥ باب استحباب تقديم الظهر الخ، نسائي ج١ ص٨٨ تعجيل العصر، ابن ماجة ص٤٩)

অনুবাদঃ ... হযরত আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আসরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যখন সূর্য উপরে উজ্জ্বল অবস্থায় থাকত এবং কোন ব্যক্তি নামায শেষে 'আওয়ালীয়ে মদীনা'* বা মদীনার উচ্চ শহরতলীতে যাওয়ার পরেও সূর্য উপরে দেখতে পেত।

বিশ্লেষণঃ ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল এবং ইসহাক (রহ.) প্রমুখের মতে, আসরের নামায তাড়াতাড়ি আদায় করা মুস্তাহাব। উল্লেখ্য যে, শাফেঈ (রহ.) বলেন, সূর্য হলুদ বর্ণ হলেই আসরের নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়।

দলীল (১)ঃ ... قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِيْ حُجْرَتِهَا قَبْلَ اَنْ تُظْهَرَ— (ابو داود ج١ ص٥٩، بخاري ج١ ص٧٨، مسلم ج١ ص٢٢٢ باب اوقات الصلوات الخمس، ترمذي ج١ ص٤١ باب تعجيل العصر، نسائي ج١ ص٨٨، ابن ماجة ص٤٩)

অর্থাৎ, ... উরওয়া বলেন, আয়িশা (রাঃ) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এমন সময় আসরের নামায আদায় করতেন যখন সূর্যের রশ্মি তাঁর ঘরের মধ্যে থাকত এবং তা দেয়ালে উঠার পূর্বে।

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, আসরের নামায তাড়াতাড়ি পড়া হত। কেননা, সূর্য উপরে থাকলেই তো হুজরার ভিতরে রশ্মি পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

দলীল (২)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (৩)ঃ রাফি ইবন খাদীজ (রাঃ) বলেন-

---

* আওয়ালী হল মদীনার পার্শ্ববর্তী শহরতলীতে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম। মদীনা হতে এর নিকটতম দূরত্ব হল দুই মাইল এবং শেষ প্রান্তের দূরত্ব হল আট মাইল।

... كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُوْرُ فَتُقْسَمُ عَشَرَ قِسَمًا ثُمَّ تُطْبَخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيْجًا قَبْلَ مَغِيْبِ الشَّمْسِ– (مسلم ج١ ص٢٢٥ باب استحباب التبكير بالعصر)

অর্থাৎ, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে আসরের নামায আদায় করতাম। অতঃপর উট জবাই করা হত এবং তা দশ ভাগে বিভক্ত করা হত। অতঃপর তা রান্না করা হত। এবং সূর্যাস্তের পূর্বেই আমরা ভোনা গোশত খেতাম।

সুতরাং, আসরের পর এত কাজ তখনই সম্ভব, যখন আসরের নামায তাড়াতাড়ি পড়া হবে।

সুতরাং উপরোল্লিখিত হাদীসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আসরের নামায তাড়াতাড়ি পড়াই উত্তম।

* আর আসরের নামাযের শেষ ওয়াক্তের দলীল- আওযাঈ (রহ.) বলেন-

... وَذٰلِكَ اَنْ تُرٰى مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الشَّمْسِ صَفْرَاءَ– (ابو داود ج١ ص٦٠ باب التشديد الخ)

অর্থাৎ, ... আসরের নামাযের সর্বশেষ সময় হল যখন সূর্যের হলুদ রঙ ভূমিতে প্রতিভাত হতে দেখা যায়।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, আসরের নামায সূর্যালোক ফ্যাকাশে হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দেরি করা উত্তম। উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)- সহ জমহুরগণ বলেন, আসরের নামাযের শেষ সময় হল সূর্যাস্ত পর্যন্ত। (যদিও মাকরূহ)

(درس ترمذي ج١ ص٤٠٩)

দলীল (১)ঃ ... عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَادَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً (ابو داود ج١ ص٥٩)

অর্থাৎ, ... আলী ইবন শায়বান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট মদীনাতে আগমন করি। এ সময় তিনি আসরের নামায সূর্যের রং উজ্জ্বল থাকাবস্থায় (সূর্যের রং পরিবর্তিত হওয়ার পূর্বে) আদায় করেন।

দলীল (২)ঃ হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত-

... قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَدَّ تَعْجِيْلاً لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ وَاَنْتُمْ اَشَدُّ تَعْجِيْلاً لِلْعَصْرِ مِنْهُ– (ترمذي ج١ ص٤٢ باب في تاخير صلوة العصر)

অর্থাৎ, ... তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যুহরের নামায তোমাদের চেয়ে অনেক আগে পড়তেন। আর তোমরা তাঁর চেয়েও অনেক আগে আসর পড়।
উক্ত হাদীসে আসরের নামায তাড়াতাড়ি না পড়ার জন্য পরোক্ষভাবে আদেশ করা হয়েছে। অতএব বিলম্বে আদায় করাই উত্তম।

দলীল (৩)ঃ রাফি ইবন খাদীজ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত-

اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِتَأْخِيْرِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ– (مجمع الزوائد ج١ ص٣٠٤، مصنف ابن ابي شيبة ج١ ص٣٢٧)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) আসরের নামায দেরি করে পড়ার নির্দেশ দিতেন।
উক্ত হাদীস দ্বারাও আসরের নামায দেরি করে পড়া মুস্তাহাব বুঝা যায়।

দলীল (৪)ঃ সূর্যাস্ত পর্যন্ত আসরের নামাযের ওয়াক্ত থাকার দলীল-

... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَدْرَكَ الْعَصْرَ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الخ (ابو داود ج١ ص٥٩ باب من ادرك ركعة الخ، بخاري ج١ ص٨٢ باب من ادرك من الفجر ركعة، ترمذي ج١ ص٤٥، نسائي ج١ ص٩٠، ابن ماجة ص٥١)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামাযের এক রাকাত আদায় করতে সক্ষম হয়েছে, সে যেন পুরো নামায (ওয়াক্তের মধ্যে) আদায় করল (এবং তা কাযা গণ্য হবে না)।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাব (১)ঃ হাফিজ ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এখানে হুজরা দ্বারা উদ্দেশ্য হল আয়িশা (রাঃ)-এর কক্ষ। যদি ধরে নেয়া হয় হুজরাটি ছিল ছাদবিশিষ্ট, এমতাবস্থায় সূর্যের আলো ঘরে প্রবেশ করার পথ শুধু দরজাই হতে পারে। আর আয়িশা (রাঃ)-এর কক্ষের দরজা ছিল পশ্চিম দিকে। কিন্তু ছাদ যেহেতু ছিল নীচু এবং দরজাটিও ছিল ছোট, এজন্য তাতে সূর্যের আলো তখনই ভিতরে আসা সম্ভব, যখন সূর্য পশ্চিম দিকে অনেকটুকু নীচে চলে যায়। সুতরাং উক্ত হাদীসটি হানাফীদের মাযহাব মুতাবিক আসর দেরিতে পড়ার প্রমাণ মিলে, আগে পড়ার নয়।

(২) ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর হুজরাটি ছিল ছাদবিহীন। এমতাবস্থায় সূর্যের আলো কক্ষে প্রবেশ করার পথ হবে ছাদের দিকে তথা উপর দিক। কিন্তু যেহেতু দেয়ালগুলো ছিল ছোট এজন্য সূর্য অনেকক্ষণ পর্যন্ত হুজরার উপরে থাকত, আর সূর্যের আলো দেয়ালের উপর পড়ত একেবারে শেষ সময়ে। দেয়াল যে ছোট ছিল এর দলীল হল- কতক সময় নবী করীম (সাঃ) হুজরার

ভিতরে থেকে ইমামতি করতেন আর সাহাবাগণ বাইরে থেকে ইকতিদা করতেন। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন দেয়াল ছোট হয় এবং মুকতাদি ইমামের অবস্থা দেখতে পায়। সুতরাং উক্ত হাদীসটি দ্বারা আসরের নামায তাড়াতাড়ি পড়ার দলীল পেশ করা যায় না।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ (১) 'আওয়ালী মদীনা' যাওয়ার ঘটনাটি এমন লোকের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, যারা খুবই দ্রুতগতিতে চলতে পারতেন অথবা ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে তারা সেখানে দ্রুত যেতেন। অতএব, এর দ্বারা তাড়াতাড়ি প্রমাণিত হয় না।
(২) গ্রীষ্মের সময় আসরের নামাযের পরেও অনেক সময় বাকি থাকে। হয়ত ইহা ঐ সময়ের ঘটনা।

তৃতীয় দলীলের জবাবঃ (১) কসাই এবং বাবুর্চি যদি সুদক্ষ হয়, তবে আসরের পর স্বল্প সময়ের মধ্যেই এগুলো আনজাম দেয়া কোন ব্যাপারই নয়। বিশেষ করে আরব জাতির জন্য। কেননা, তারা এখনো অর্ধসিদ্ধ গোশত খেতে পছন্দ করে। আর এজন্য খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না। এক-দেড় ঘন্টাই যথেষ্ট। আর যদি তাড়াতাড়ি আসরের নামায পড়া হয়, তাহলে তো তিন ঘন্টার উপরে সময় থাকে। আর এ সময়ে তো সবাই এই কাজ করতে পারবে। বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং এর দ্বারা দেরি বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য।
(২) আসরের পর উটের গোশত রান্না করে খাওয়া, এগুলো ঘটনাচক্রে হয়েছিল, ইহা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল না। সুতরাং এগুলো দ্বারা আসরের নামায তাড়াতাড়ি আদায় করার দলীল দেয়া যায় না। কারণ, ব্যতিক্রম কখনো উদাহরণ হয় না।

(فتح الملهم ج٢ ص٢٠١، درس ترمذي ج١ ص٤٠٩، تنظيم ج١ ص٢٣٠–٢٣١، درس مشكوة ج٢ ص١٩–٢٠)

সর্বোপরি বলা যায় যে, আসর (عَصْر) শব্দের অর্থই হল নিংড়ানো, যা কোন বস্তুর শেষ অংশকে বুঝানো হয়ে থাকে। সুতরাং আসর দিনের শেষ অংশ মাগরিবের এক-দেড় ঘন্টা পূর্ব মুহূর্তটি হওয়াই যথোপযুক্ত সময়।

* আসরের নামাযের শেষ ওয়াক্তের দলীলের জন্য ইমাম শাফেঈ (রহ.) যে দলীল পেশ করেছেন, এর জবাব হল- (১) উক্ত হাদীসে মুস্তাহাব সময়ের শেষ ওয়াক্তের কথা বলা হয়েছে, মুতলাক বা নিরঙ্কুশ ওয়াক্তের কথা বলা হয়নি।

(২) অথবা, সূর্য হলুদ হওয়ার পর وَقْت كَامِل (পূর্ণ ওয়াক্ত) থাকে না, সেকথা বলা হয়েছে। তবে وَقْت نَاقِص (অপূর্ণ ওয়াক্ত) সূর্যাস্ত পর্যন্ত মাকরূহের সাথে বিদ্যমান থাকে।

بَابُ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلٰوةِ فَقَدْ اَدْرَكَهَا ص٥٩

যে ব্যক্তি এক রাকাত নামায পেল, সে যেন পুরো নামায পেল

... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَدْرَكَ الْعَصْرَ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ وَمَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ– (بخاري ج١ ص٨٢ باب من ادرك من الفجر ركعة، مسلم ج١ ص٢٢١، ترمذي ج١ ص٤٥ باب من ادرك ركعة، نسائي ج١ ص٩٠، ابن ماجة ص٥١)

অনুবাদঃ ... হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামাযের এক রাকাত আদায় করতে সক্ষম হয়েছে, সে যেন পুরো নামায (ওয়াক্তের মধ্যে) আদায় করল (এবং তা কাযা গণ্য হবে না)। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাকাত আদায় করতে পারল সে যেন পুরা নামাযই (ওয়াক্ত থাকতেই) আদায় করল।

বিশ্লেষণঃ উপরিউক্ত হাদীসটির শাব্দিক অর্থ দ্বারা বুঝা যায় যে, সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে মাত্র এক রাকাত নামায পেলেই একথা বলা যাবে যে, সে পূর্ণ নামাযই পেয়ে গেছে, অবশিষ্ট নামায আদায় বা পূর্ণ করার কোন প্রয়োজন নেই। অথচ সকল উলামাদের অভিমত হল এই যে, বাকী নামায আদায় করা অবশ্যই জরুরী। অতএব নিঃসন্দেহে এই হাদীসে বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে। যথাঃ

১। مَنْ اَدْرَكَ الْعَصْرَ رَكْعَةً فَقَدْ اَدْرَكَ الْوَقْتَ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আসরের এক রাকাত নামায পড়ার সময় পেল, সে ব্যক্তি আসরের নামাযের সময় পেল। এমনিভাবে-

مَنْ اَدْرَكَ الْفَجْرَ رَكْعَةً فِيْ الْوَقْتِ فَقَدْ اَدْرَكَ الْوَقْتَ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ফজরের এক রাকাত নামায পড়ার সময় পেল, সে ব্যক্তি ফজরের নামাযের সময় পেল। সুতরাং ঐ নামায কাযা করতে হবে।

২। অথবা, এই হাদীস মাসবুক (যে পরে এসে ইমামের পিছনে নিয়ত করল) ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য।

مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مَعَ الاِمَامِ فَقَدْ اَدْرَكَ فَضِيْلَةَ الْجَمَاعَةِ وَاَيْضًا فِيْ الْفَجْرِ–

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে আসরের এক রাকাত নামায পড়ার সুযোগ পেল সে যেন পুরো জামাতের সওয়াব পেল। এমনিভাবে ফজরের নামাজের ক্ষেত্রেও।

৩। অথবা, مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ فَقَدْ اَدْرَكَ وُجُوْبَ الصَّلٰوةِ الصُّبْحِ

وَكَذٰلِكَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَقَدْ اَدْرَكَ وُجُوْبَ الصَّلٰوةِ الْعَصْرِ–

অর্থাৎ, যে সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাকাতের সময় পেল, সে ফজরের নামাযের উজুব বা আবশ্যকতা পেয়ে গেল। আর যে সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাকাতের সময় পেল, সে আসরের নামাযের আবশ্যকতা পেল।

৪। অথবা, ইহা নেফাস ও ঋতুবতী মহিলাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, এমন মহিলা যদি সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের পূর্বে পবিত্র হয়ে এক রাকাত নামায পড়ার সুযোগ পায়, তাহলে সে এই নামাযকে কাযা করবে।

৫। অথবা, এমতাবস্থায় যদি কোন কাফের মুসলমান হয় বা কোন শিশু বালেগ হয় যে, সে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের পূর্বে মাত্র এক রাকাত নামায পড়ার সময় পেল, তাহলে ঐ নামায তার উপর ওয়াজিব হবে। এবং কাযা আদায় করে নিবে।

৬। অথবা, উক্ত উক্তির অর্থ হবে- فَقَدْ اَدْرَكَ حُكْمَ الصَّلٰوةِ যেমন- কোন ব্যক্তি মান্নত করল যে, ঢাকা যাওয়ার পর যদি আমি আজকের আসর অথবা ফজরের নামায পাই, তাহলে আমার গোলাম আযাদ। আর ঐ ব্যক্তি ঢাকা ঐ সময় পৌঁছল যে, সে এক রাকাত নামায পড়ার মত সময় পেল। তাহলে ঐ ব্যক্তির উপর নামায পাওয়ার বিধান ধার্য হবে। এমতাবস্থায় তার গোলাম আযাদ হয়ে যাবে।

৭। অথবা, فَقَدْ اَدْرَكَ ثَوَابَ كُلِّ الثَّوَابِ بِاِعْتِبَارِ نِيَّةٍ لاَ بِاِعْتِبَارِ عَمَلٍ– অর্থাৎ, নিয়তের কারণে নামাযী ব্যক্তি পুরোপুরি সওয়াব পেয়ে যাবে, আমলের কারণে নয়।

(درس ترمذي ج١ ص٤٣٤، فتح الملهم ج٢ ص١٨٦)

بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ ص٦٠ ঃ মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত

... عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَرْمِيْ فَيَرٰى اَحَدُنَا مَوْضِعَ نَبْلِهِ– (بخاري ج١ ص٧٩ باب وقت المغرب، مسلم ج١ ص٢٢٨ باب اول وقت المغرب، نسائي ج١ ص٩٠ تعجيل المغرب، ابن ماجة ص٥٠)

অনুবাদঃ ... হযরত আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে মাগরিবের নামায পড়তাম। অতঃপর আমরা তীর নিক্ষেপ করতাম। তা পতিত হওয়ার স্থান আমাদের যে কেউ দেখতে পেত।

বিশ্লেষণঃ মাগরিব নামাযের প্রথম ওয়াক্ত নিয়ে জমহুর ইমামগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। ইহা সূর্যাস্তের সাথে সাথেই শুরু হয়ে যায়। তবে এর শেষ সময় নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ এবং আওযাঈ (রহ.)-এর মতে, সূর্যাস্তের পর আযান ও ইকামত সম্পন্ন করে পাঁচ রাকাত নামায আদায় করতে যে সময়টুকু লাগে, ঠিক ততটুকু সময় পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে। এরপর থেকেই এশার নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়।

দলীলঃ হাদীসে জিবরাঈল। জিবরাঈল (আঃ) পরপর দু'দিন একই সময়ে মাগরিবের নামায আদায় করেছেন। হাদীসটিতে উল্লেখ আছে-

... وَصَلّٰى بِيَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ اَفْطَرَ الصَّائِمُ الخ

(পূর্ণ হাদীসটি নামায অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে)

যদি মাগরিবের সময়সীমার ক্ষেত্রে প্রশস্ততার অবকাশ থাকত তবে তিনি উভয় দিন একই সময়ে নামায পড়তেন না। অথচ অন্যান্য ওয়াক্তের নামায তিনি দু'দিন দু'সময়ে আদায় করেছেন।

* ইমাম আবু হানিফা, আহমদ ও সাহেবাইন (রহ.)-এর মতে, "শাফাক"* অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত থাকে। এর পর থেকে এশার নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়।

দলীলঃ ... عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ فَوْرُ الشَّفَقِ الخ (ابو داود ج١ ص٥٨ باب المواقيت، مسلم ج١ ص٢٢٣ باب اوقات الصلوات الخمس، نسائي ج١ ص٥١ آخر وقت المغرب)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেন, ... মাগরিবের নামাযের সময়সীমা হল পশ্চিম আকাশের "শাফাক" স্তিমিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। সুতরাং মাগরিবের নামাযের সময়ের ব্যাপারে যত বাচনিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সবখানেই "শাফাকের" কথা উল্লেখ রয়েছে। অতএব, মাগরিবের নামাযের শেষ সময় হল "শাফাক"-এর সমাপ্তিকাল।

---

* ইমাম শাফেঈ ও অধিকাংশ আলেমের মতে, সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে যে লাল আভা দেখা দেয় তাকে "শাফাক" বলে। ইমাম আবু হানিফার প্রসিদ্ধ মতে, লাল আভা দূরীভূত হওয়ার পর যে শুভ্রতা উদিত হয় তাকে "শাফাক" বলে।

জবাবঃ (১) হাদীসে জিবরাঈল উক্ত হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কেননা উক্ত হাদীসে প্রত্যেকটি নামাযের সময় বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

(২) অথবা, মাগরিবের নামায যে সর্বদা প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা মুস্তাহাব, একথা বুঝানোর জন্য জিবরাঈল (আঃ) উভয় দিন প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করেছেন। তবে একথা সত্য যে, মাগরিবের নামায বিলম্ব করা সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহ। কিন্তু একথা বলা আদৌ সমীচীন নয় যে, পাঁচ রাকাতের পরে আর মাগরিবের ওয়াক্তই বাকি থাকে না। (درس مشكوة ج٢ ص١٣)

بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ص٦٠ ঃ এশার নামাযের শেষ ওয়াক্ত

... عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ اَنَا اَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْهَا لِسَقُوْطِ الْقَمَرِ الثَّالِثَةِ– (ترمذي ج١ ص٤٢ باب وقت الصلوة العشاء الآخرة، نسائي ج١ ص٩٢ تعجيل العشاء)

অনুবাদঃ হযরত নোমান ইব্‌ন বশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এশার নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় অধিক অবগত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই নামায তৃতীয়ার চাঁদ অস্তমিত হওয়া পরিমাণ সময়ের পর আদায় করতেন।

বিশ্লেষণঃ এই অনুচ্ছেদে দু'টি বিষয়ে আলোচনা করা হবে। যথা-
(ক) এশার নামায তাড়াতাড়ি আদায় করা উত্তম নাকি রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরি করা উত্তম। (খ) এশার নামাযের শেষ সময় কখন?

প্রথম আলোচনাঃ ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, এশার নামায শাফাক বিলীন হওয়ার পর তাড়াতাড়ি আদায় করা উত্তম।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। আর তৃতীয়ার চাঁদ তো শাফাকের একটু পরেই অস্তমিত হয়ে যায়। সুতরাং এর দ্বারা এশার নামায তাড়াতাড়ি আদায় করা উত্তম প্রমাণিত হয়।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, আহমদ (রহ.) প্রমুখের মতে, এশার নামায রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরি করা মুস্তাহাব।

দলীল (১)ঃ ... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَّنْتَظِرُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلٰوةِ الْعِشَاءِ فَخَرَجَ اِلَيْنَا حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ اَوْ بَعْدَهُ فَلاَ

نَدْرِيْ اَشَيْئٌ شَغَلَهُ اَمْ غَيْرُ ذٰلِكَ فَقَالَ حِيْنَ خَرَجَ تَنْتَظِرُوْنَ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ لَوْلَا اَنْ تَثْقُلَ عَلٰى اُمَّتِيْ لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هٰذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ اَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ– (ابو داود ج١ ص٦٠، بخاري ج١ ص٨١ باب النوم قبل العشاء الخ، مسلم ج١ ص٢٢٩ باب وقت العشاء، ترمذي ج١ ص٤٢ باب تأخير العشاء الآخرة، نسائي ج١ ص٩٣ ما يستحب من تأخير العشاء)

অর্থাৎ, ... হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা এশার নামায আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আগমনের অপেক্ষায় ছিলাম। তিনি রাতের এক-তৃতীয়াংশ অথবা আরো কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আগমন করেন। তিনি কি কারণে বিলম্ব করেন তা আমরা অবগত ছিলাম না। তিনি এসে বলেন, তোমরা কি এই নামাযের প্রতীক্ষায় ছিলে? যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টদায়ক না হত তবে আমি প্রত্যহ এশার নামায এই সময়ে আদায় করতাম। অতঃপর তিনি মুআয্‌যিনকে ইকামত দেয়ার নির্দেশ দেন এবং তিনি সকলকে নিয়ে নামায আদায় করেন।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْعَتَمَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتّٰى مَضٰى نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَقَالَ خُذُوْا مَقَاعِدَكُمْ فَاَخَذْنَا مَقَاعِدَنَا فَقَالَ اِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَاَخَذُوْا مَضَاجِعَهُمْ وَاِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوْا فِيْ صَلٰوةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلٰوةَ وَلَوْلَا ضُعْفُ الضَّعِيْفِ وَسُقْمُ السَّقِيْمِ لَاَخَّرْتُ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ– (ابو داود ج١ ص٦١، نسائي ج١ ص٩٣، ابن ماجة ٥٠)

অর্থাৎ, ... হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে এশার নামায আদায় করি। সেদিন তিনি আনুমানিক অর্ধ রাত অতিবাহিত হওয়ার পর এশার নামায আদায় করতে আসেন। অতঃপর বলেন, তোমরা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান কর। অতঃপর আমরা নিজেদের স্থানে বসে থাকি। অতঃপর বলেন, অনেকেই এশার নামায আদায় করে শুয়ে পড়েছে। তোমরা যতক্ষণ এ নামাযের জন্য অপেক্ষা করেছ, ততক্ষণ তোমরা নামায আদায়কারী হিসেবে পরিগণিত হয়েছ। যদি দুর্বলের দুর্বলতা ও রোগীর রোগগ্রস্ততার আশংকা না থাকত, তবে আমি এই নামায আদায়ের জন্য অর্ধ-রজনী পর্যন্ত বিলম্ব করতাম।

সুতরাং উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এশার নামায রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরি করা উত্তম।

জবাবঃ ইমাম শাফেঈ (রহ.) নোমান ইবন বশীর (রাঃ)-এর যে হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, এর জবাবে জমহুর আলিমগণ বলেন যে, (১) যদিও দ্বিতীয় তারিখের চাঁদ শাফাক বিলুপ্ত হওয়ার পরপরই অস্তমিত হয়ে থাকে, কিন্তু তৃতীয়ার চাঁদ বেশ দেরিতে অস্তমিত হয়। কেননা, জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ বলেছেন যে, চাঁদ প্রতি রাত্রে প্রথম রাত্রের তুলনায় প্রায় ৪৮ মিনিট আকাশে বেশি থাকে। এরূপভাবে তৃতীয় তারিখে চাঁদের অস্ত সূর্যাস্তের প্রায় আড়াই বা পৌনে তিন ঘন্টা পরে হয়ে থাকে। ফলে তৃতীয়ার চাঁদ রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে। অতএব, এ হাদীসটি শাফেঈর দলীল নয়; বরং জমহুরের দলীল। (درس ترمذي ج١ ص٤١٢)

(২) নোমান বিন বশীর (রাঃ)-এর হাদীসটি ক্রিয়াবাচক আর জমহুরের প্রদত্ত দলীল বাচনিক। সুতরাং বাচনিক দলীলই প্রাধান্য পাবে। (تنظيم الاشتات ج١ ص٢٣٠)

দ্বিতীয় আলোচনাঃ সুফিয়ান সাওরী, ইবন মুবারক এবং ইসহাক (রহ.)-এর মতে, এশার নামাযের আখেরী ওয়াক্ত হল অর্ধ রাত্র পর্যন্ত। এরপর থেকে ফজর উদয় পর্যন্ত সময়টি হল মুহমাল (উপেক্ষিত)। ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর একটি মত অনুরূপ।

দলীলঃ ... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ ... وَقْتُ الْعِشَاءِ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ ... (ابو داود ج١ ص٥٨، بخاري ج١ ص٨١ باب وقت العشاء الٰى نصف الليل، مسلم ج١ ص٢٢٣، نسائي ج١ ص٩١)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, ... এশার নামাযের ওয়াক্ত রাতের অর্ধেক সময় পর্যন্ত।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সহ জমহুরের মতে, এশার নামাযের আখেরী ওয়াক্ত হল সুবেহ সাদিক পর্যন্ত। (যদিও মাকরূহ)

দলীলঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত-

اَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِيْنَ يُغِيْبُ الشَّفَقُ وَاٰخِرُهُ حِيْنَ يَطْلَعُ الْفَجْرُ– (طحاوي)

অর্থাৎ, এশার প্রথম ওয়াক্ত হল যখন শাফাক অস্তমিত হয় এবং এর শেষ ওয়াক্ত হল যখন ফজর উদিত হয়।

জবাবঃ সুফিয়ান সাওরী (রহ.) ও অন্যান্যরা যে হাদীস পেশ করেছেন, এর জবাব হল, এর দ্বারা নির্বাচিত সময় বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। যা সকলেই বলে থাকেন।

* আল্লামা ইবন হুমাম ও তাহাবী (রহ.) বলেন, এশার শেষ সময় নিয়ে যে এখতেলাফ রয়েছে, এর সমাধান হল এই, রাত্রের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত মুস্তাহাব। রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধরাত্র পর্যন্ত মাকরূহ ব্যতীত জায়েয এবং অর্ধরাত্র থেকে নিয়ে ফজর উদয় পর্যন্তও জায়েয তবে মাকরূহসহ। আহনাফগণের মাযহাবও তাই। (درس مشكوٰة ج٢ ص١٤–١٥)

بَابُ وَقْتِ الصُّبْحِ ص٦١ ঃ ফজরের নামাযের ওয়াক্ত

... عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّيْ الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ– (بخاري ج١ ص٨٢ باب وقت الفجر، مسلم ج١ ص٢٣٠ باب استحباب التكبير بالصبح الخ، ترمذي ج١ ص٤٠ باب التغليس، نسائي ج١ ص٩٤ التغليس في الحضر، ابن ماجة ص٤٩)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এমন সময় ফজরের নামায পড়তেন যে, মহিলারা চাদর গায়ে দিয়ে প্রত্যাবর্তন করত এবং অন্ধকারের কারণে তাদের চেনা যেত না।

বিশ্লেষণঃ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, ফজর শুরু হয় সুবেহ সাদিক থেকে এবং ইহা শেষ হয় সূর্য উদয় পর্যন্ত। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে যেকোন সময় ফজরের নামায পড়লে তা আদায় হয়ে যাবে। এতে কোন মতানৈক্য নেই। তবে মতানৈক্য হল ফজরের মুস্তাহাব বা উত্তম সময় নিয়েঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল এবং ইসহাক (রহ.) প্রমুখের মতে, ফজরের নামাযের শুরু ও শেষ অন্ধকার থাকতেই হওয়া উত্তম। (درس ترمذي ج١ ص٤٠٢)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। এতে বুঝা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) ফজরের নামায অন্ধকারে শুরু করে অন্ধকারেই শেষ করতেন। নতুবা তাদেরকে না চেনার কোন কারণ নেই।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ اُمِّ فَرْوَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلٰوةُ فِيْ اَوَّلِ وَقْتِهَا– (ابو داود ج١ ص٦١ باب المحافظة على الصلواة، ترمذي ج١ ص٤٢ باب في الوقت الاول من الفجر)

অর্থাৎ, ... উম্মে ফারওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে উত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ওয়াক্তের প্রথম ভাগে নামায আদায় করা সর্বোত্তম আমল।

দলীল (৩)ঃ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اَلْوَقْتُ الْاَوَّلُ مِنَ الصَّلٰوةِ رِضْوَانُ اللهِ وَالْوَقْتُ الْاٰخِرُ عَفْوُ اللهِ– (ترمذي ج١ ص٤٣، دار قطني ج١ ص٩٣)

অর্থাৎ, হযরত ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন, নামাজের প্রথম ওয়াক্ত হল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, আর শেষ ওয়াক্ত হল আল্লাহর পক্ষ হতে মার্জনা।

উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফজরের নামায প্রথম ওয়াক্ত তথা অন্ধকারে পড়াই উত্তম।

দলীল (৪)ঃ ... عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ ... صَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً اُخْرٰى فَاَسْفَرَبِهَا ثُمَّ كَانَتْ صَلٰوتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ التَّغْلِيْسُ حَتّٰى مَاتَ وَلَمْ يَعُدْ اِلٰى اَنْ يُسْفِرَ– (ابو داود ج١ ص٥٧ باب المواقيت)

অর্থাৎ, ... উসামা ইবন যায়েদ আল-লায়ছী হতে বর্ণিত। ... নবী করীম (সাঃ) একবার ফজরের নামায অন্ধকার থাকতেই আদায় করেন এবং পরেরবার দিগন্ত উজ্জ্বল হওয়ার পর সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণে আদায় করেন। তিনি তাঁর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত ফজরের নামায অন্ধকার থাকতেই আদায় করতেন। উক্ত দিনের পর আর কখনো সূর্যোদয়ের পূর্বে পূর্বাকাশে লাল রং প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেননি।

দলীল (৫)ঃ হযরত আবু বকর ও উমর (রাঃ) অন্ধকারে নামায পড়তেন।

* ইমাম তাহাবী ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, ফজরের নামায অন্ধকারে শুরু করে ফর্সা অবস্থায় শেষ করা উত্তম।

* ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে, ফজরের নামায শুরু ও শেষ করা ফর্সা অবস্থায় উত্তম। তবে এতটুকু সময় হাতে রেখে নামায পড়া উচিত, যাতে নামায ভুল হয়ে গেলে সুন্নত কিরাত দ্বারা পুনরায় আদায় করা যায়। (تنظيم ج١ ص٢٣٢)

দলীল (১)ঃ ... عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصْبِحُوْا بِالصُّبْحِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ لِاُجُوْرِكُمْ اَوْ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ– (ابو داود ج١ ص٦١ باب وقت الصبح، ترمذي ج١ ص٤٠ باب الاسفار بالفجر، نسائي ج١ ص٩٤ باب الاسفار، ابن ماجة ص٤٩)

অর্থাৎ, ... রাফে ইবন খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা পূর্ব দিগন্ত পরিষ্কার হওয়ার পর ফজরের নামায আদায় করবে; কেননা এর মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম বিনিময় রয়েছে।

দলীল (২)ঃ হযরত আবু বারযাহ আসলামী (রাঃ) হতে একটি সুদীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত আছে-

... وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهُ (بخاري ج١ ص٧٨ باب وقت العصر)

অর্থাৎ, ... তিনি ফজর নামায থেকে তখন প্রত্যাবর্তন করতেন, যখন একজন ব্যক্তি তার পাশে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে চিনতে পারত।

প্রকাশ থাকে যে, মসজিদে নববীর দেয়ালগুলো ছোট ছিল এবং ছাদ ছিল নীচু। অতএব, মসজিদের ভিতরে পাশের লোকজনকে তখনই চেনা সম্ভব, যখন বাইরে পূর্ণ ফর্সা হয়ে যায়।

দলীল (৩)ঃ ... عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى صَلٰوةً اِلاَّ لِوَقْتِهَا اِلاَّ بِجَمْعٍ فَاِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلّٰى صَلٰوةَ الصُّبْحِ مِنَ الْغَدِ قَبْلَ وَقْتِهَا (ابو داود ج١ ص٢٦٧ كتاب المناسك باب الصلوة بجمع)

অর্থাৎ, ... ইবন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ওয়াক্ত ছাড়া অন্য কোন সময়ে নামায আদায় করতে দেখিনি। কিন্তু তিনি মুযদালিফাতে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করেন। আর পরবর্তী দিন ফজরের নামায আদায় করেছেন ওয়াক্তের পূর্বে।

উক্ত হাদীসে قَبْلَ وَقْتِهَا দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে উদ্দেশ্য হল, ঐ দিন তিনি স্বাভাবিক সময়ের পূর্বে তথা অন্ধকারে ফজরের নামায আদায় করেছিলেন, তবে সুবেহ সাদিকের আগে নয়। এতে প্রমাণিত হয়, নবী করীম (সাঃ)-এর সাধারণ রীতি ছিল ফর্সা হলে নামায পড়া। (درس ترمذي ج١ ص٤٠٦)

দলীল (৪)ঃ হযরত রাফি (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস-

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ نَوِّرُوْا بِالصُّبْحِ بِقَدْرِمَا يَبْصُرُ الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ– (مجمع الزوائد ج١ ص٣١٦، تلخيص الحبير ج١ ص١٨٣)

অর্থাৎ, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ইরশাদ করতে শুনেছি, তোমরা ফজরের নামায এতটুকু ফর্সা হওয়ার পর আদায় কর যখন কওমের লোকজন তাদের তীর নিক্ষেপের স্থল দেখতে পায়।

জবাবঃ সামষ্টিক জবাবঃ (১) অন্ধকারে নামায পড়ার যে রেওয়ায়েত তা মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে। কেননা, অন্ধকারে নামায পড়ার যে রেওয়ায়েত এটা ঐ সময়ের উপর ভিত্তি করে পড়া হত, যখন মহিলারাও ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে উপস্থিত হত। অতঃপর যখন মহিলাদেরকে ঘরে নামায পড়ার হুকুম দেয়া হল, তখন এই অন্ধকারের হুকুমও মানসুখ হয়ে গেছে।

(২) অন্ধকারে নামায পড়ার যে হাদীস তা ক্রিয়াবাচক (فعلي) এবং আলোকিত অবস্থায় নামায পড়ার যে হাদীস তা ক্রিয়াবাচক এবং বাচনিকও (قولي)। অতএব, দ্বন্দ্বের সময় উসূল মোতাবেক বাচনিক হাদীস প্রাধান্য পাবে।
(৩) ইমাম তাহাবী (রহ.) অন্ধকারে নামায পড়ার যে সকল রেওয়ায়েত রয়েছে সেগুলোকে নামায শুরু করা হিসেবে এবং আলোকিত অবস্থায় নামায পড়ার যে রেওয়ায়েত রয়েছে সেগুলোকে নামায শেষ করার হিসেবে গণ্য করেছেন।
অথবা, হুজুর (সাঃ) সফরে কোন ওযর থাকার কারণে অন্ধকারে নামায পড়েছেন এবং যে সময় ওযর ছিল না তখন আলোকিত অবস্থায় নামায পড়েছেন।

স্বতন্ত্র জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ (১) হাদীসের বাণী- مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ (অন্ধকারের কারণে তাদের চেনা যেত না)। এখানে غلس বা অন্ধকার দ্বারা উদ্দেশ্য হল মসজিদের আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে বুঝানো, মসজিদের বাইরের অবস্থা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। অতএব যদি মসজিদের ভিতরের অবস্থা বুঝানো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে মসজিদের ছাদ যেহেতু নিচু ছিল এ কারণে মসজিদের ভিতর ছিল অন্ধকার। ফলে তাদেরকে চেনা যেত না। কিন্তু বাহির তো ফর্সাই ছিল। সুতরাং কোন দ্বন্দ্ব নেই। আর যদি غلس দ্বারা মসজিদের বাহির অবস্থাকে বুঝানো হয়ে থাকে, তাহলে এই চেনার দ্বারা হয়ত কোন জাতি বা শ্রেণী (معرفت جنس) চেনা উদ্দেশ্য হবে, অর্থাৎ পুরুষ না মহিলা। অথবা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে (معرفت شخص) চেনা উদ্দেশ্য হবে। সুতরাং হাদীসে বর্ণিত "তাদেরকে চেনা যেত না"- এর দ্বারা যদি জাতি বা শ্রেণী বুঝানো উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এটা হবে অযৌক্তিক কথা। কেননা এ সময় মহিলা অথবা পুরুষ চেনা কোন দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। আর এর দ্বারা যদি নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে বুঝানো উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এটা অন্ধকারের কারণে নয়, বরং কাপড়ের দ্বারা সারা শরীর ঢেকে থাকার কারণে চেনা যেত না।

(২) অথবা, من الغلس শব্দটি হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর নয়; বরং তাঁর উক্তি ما يعرفن পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে এবং তাঁর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, মহিলারা যেহেতু চাদর গায়ে দিয়ে আসত এজন্য তাদেরকে চেনা যেত না। কোন রাবী মনে করেছেন, এই চেনা না যাওয়ার কারণ হয়ত অন্ধকার। এজন্য من الغلس শব্দটি রাবী নিজের পক্ষ থেকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। (ابن ماجة ص٤٩)

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলীলের জবাবঃ হাদীসে প্রথম ওয়াক্ত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মুস্তাহাব সময়ের প্রথম ওয়াক্ত। আর ফজরের মুস্তাহাব সময়ই হল ফর্সা হওয়া।

চতুর্থ দলীলের জবাবঃ স্বয়ং আবু দাউদ (রহ.) নামাযের উল্লিখিত এ অংশটিকে ত্রুটিপূর্ণ (মালূল) সাব্যস্ত করেছেন। কেননা উসামা বিন যায়েদ ব্যতীত আর কেউই নামাযের ওয়াক্ত সংক্রান্ত এ অংশটুকু বর্ণনা করেননি।

(فتح الباري ج٢ ص٥، صحيح ابن خزيمة ج١ ص١٨١)

পঞ্চম দলীলের জবাবঃ তাদের এ প্রমাণ তখনই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে, যখন প্রমাণিত হবে যে, তাঁরা অন্ধকারে নামায শুরু করে অন্ধকারেই শেষ করতেন। অথচ এ বিষয়টি প্রমাণিত নয়; বরং এর বিপরীত প্রমাণিত। বর্ণিত আছে-

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ قَرَأَ فِيْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ بِالْبَقَرَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ حِيْنَ فَرَغَ كَرَبَتِ الشَّمْسُ اَنْ تَطْلَعَ قَالَ لَوْ طَلَعَتْ لَمْ تَجِدْنَا غَافِلِيْنَ (مصنف ابن ابي شيبة ج١ ص٣٥٣)

অর্থাৎ, আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আবু বকর (রাঃ) ফজরের নামাযে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করলেন। তখন উমর (রাঃ) তাঁকে নামায থেকে অবসর হওয়ার পর বললেন, সূর্য তো উদিত হওয়ার নিকটবর্তী হয়ে গেছে। উত্তরে আবু বকর (রাঃ) বললেন, যদি সূর্য উদিত হয়ে যায় তবে তুমি আমাদের উদাসীন পাবে না।

بَابُ بَدْءِ الْاَذَانِ ص٧١ ঃ আযানের সূচনা

... عَنْ اَبِيْ عُمَيْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عُمُوْمَةٍ لَّهُ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ اهْتَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلٰوةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا فَقِيْلَ لَهُ انْصِبْ رَايَةً عِنْدَ حُضُوْرِ الصَّلٰوةِ فَاِذَا رَاَوْهَا اٰذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذٰلِكَ- قَالَ فَذَكَرَ لَهُ الْقُنْعَ يَعْنِي الشَّبُّوْرَ وَقَالَ زِيَادٌ شَبُّوْرَ الْيَهُوْدِ فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذٰلِكَ وَقَالَ هُوَ مِنْ اَمْرِ الْيَهُوْدِ قَالَ فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوْسُ فَقَالَ هُوَ مِنْ اَمْرِ النَّصَارٰى فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ وَّهُوَ مُهْتَمٌّ لِّهَمِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وَفِيْ رِوَايَةٍ اُخْرَةٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ وَاَنَا نَائِمٌ رَّجُلٌ يَّحْمِلُ نَاقُوْسًا فِيْ يَدِهٖ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَتَبِيْعُ النَّاقُوْسَ فَقَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهٖ فَقُلْتُ نَدْعُوْ بِهٖ اِلَى الصَّلٰوةِ قَالَ اَفَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لَهُ بَلٰى قَالَ فَقَالَ تَقُوْلُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ ... فَلَمَّا اَصْبَحْتُ اَتَيْتُ رَسُوْلَ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ اِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ اِنْ شَاءَ اللهُ فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَالْقِ عَلَيْهِ بِمَا رَأَيْتَ فَلْتُؤَذِّنْ بِهِ فَاِنَّهُ اَنْدٰى صَوْتًا مِّنْكَ فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ اُلْقِيْهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ– قَالَ فَسَمِعَ ذٰلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ فِيْ بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ يَقُوْلُ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا اُرِيَ– فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ– (مسلم ج۱ ص۱٦٤ باب بدأ الاذان، ترمذي ج۱ ص٤۸ باب في بدأ الاذان)

অনুবাদঃ ... আবু উমায়ের ইবন আনাস থেকে কোন একজন আনসার সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) এজন্য চিন্তিত ও অস্থির হয়ে পড়েন যে, লোকদেরকে নামাযের জন্য কিরূপে একত্রিত করা যায়। কেউ কেউ পরামর্শ দেন যে, নামাযের সময় হলে ঝাণ্ডা উড়িয়ে দেওয়া হোক। যখন লোকেরা তা দেখবে তখন একে অন্যকে নামাযের জন্য ডেকে আনবে। কিন্তু তা নবী করীম (সাঃ)-এর মনোপুত হয়নি। অতঃপর কেউ এরূপ প্রস্তাব করে যে, শিংগা ফুঁকা হোক। যিয়াদ বলেন, শিংগা ছিল ইহুদীদের ধর্মীয় প্রতীক। কাজেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তা অপছন্দ করেন। রাবী বলেন, অতঃপর একজন ঘন্টা ব্যবহারের পরামর্শ দেন। রাবী বলেন, উপাসনার সময় ঘন্টাধ্বনি করা ছিল নাসারাদের রীতি। এজন্য নবী করীম (সাঃ) তাও অপছন্দ করেন। অতঃপর কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই সেদিনের বৈঠক শেষ হয় এবং সকলে নিজ নিজ আবাসে ফিরে যায়। আবদুল্লাহ ইবন যায়েদ (রাঃ)-ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) চিন্তিত থাকার কারণে ব্যথিত হৃদয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। ... অন্য রেওয়ায়েতে আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ (রাঃ) বলেন, একদা আমি স্বপ্নে দেখি যে, এক ব্যক্তি শিংগা হাতে নিয়ে যাচ্ছে। আমি তাকে বলি, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কি শিংগা বিক্রয় করবে? সে বলে, তুমি শিংগা দিয়ে কি করবে? আমি বলি, আমি তার সাহায্যে নামাযের জামাআতে লোকদের ডাকব। সে বলল, আমি কি এর চেয়ে উত্তম কোন জিনিসের সন্ধান তোমাকে দেব না? আমি বলি, হাঁ। রাবী বলেন, তখন সে বলল, তুমি এইরূপ শব্দ উচ্চারণ করবে- "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ... " অতঃপর ভোরবেলা আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হয়ে তাঁর নিকট আমার স্বপ্নের বর্ণনা করি। নবী করীম (সাঃ) বলেন, এটা অবশ্যই সত্য স্বপ্ন। অতঃপর তিনি বলেন, তুমি বিলালকে ডেকে তোমার সাথে নাও এবং তুমি যেরূপ স্বপ্ন দেখেছ, তদ্রূপ তাকে শিক্ষা দাও- যাতে সে (বিলাল) ঐরূপে আযান দিতে পারে। কেননা, তাঁর কণ্ঠস্বর তোমার স্বরের চাইতে উচ্চ। অতঃপর আমি বিলাল (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়াই এবং তাঁকে এই আযানের শব্দগুলি শিক্ষা দিতে থাকি এবং তিনি উচ্চারণপূর্বক আযান দিতে থাকেন। বিলালের এই আযান-ধ্বনি উমর

ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) নিজ আবাসে বসে শুনতে পান। তা শুনে উমর (রাঃ) এত দ্রুত পদে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে আগমন করেন যে, তাঁর গায়ের চাদর মাটিতে হেঁচড়িয়ে যাচ্ছিল। তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর শপথ! যে মহান সত্তা আপনাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আমিও ঐরূপ স্বপ্ন দেখেছি যেরূপ অন্যরা দেখেছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

আযানের আভিধানিক অর্থঃ اَلاَذَان শব্দটি বাবে تَفعِيْل এর মাসদার। অভিধানে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

১. اَلاِعْلاَن বা ঘোষণা দেয়া ২. اَلاِعْلاَم বা জানিয়ে দেয়া (تنظيم ج١ ص٢٤٣)

৩. اَلنِّدَاء বা আহবান করা, ডাকা ৪. اَلنِّدَاءُ لِلصَّلٰوة বা সালাতের জন্যে ডাকা।

পবিত্র কুরআনে শব্দটির উল্লেখ রয়েছে-

وَاَذَان مِّنَ اللهِ وَرَسُوْله اِلٰى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الاَكْبَرِ–

অর্থাৎ, আর মহান হজ্জের দিন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে লোকদেরকে জানিয়ে দিন। (তওবাঃ ৩)

আযানের পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

هُوَ الاِعْلاَمُ بِوَقْتِ الصَّلٰوة بِاَلْفَاظٍ مَّخْصُوْصَةٍ– (تنظيم ج١ ص٢٤٣)

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট শব্দমালার সাহায্যে নামাযের সময়ের কথা জানিয়ে দেয়াই হল আযান।

هُوَ الاِعْلاَمُ بِدُخُوْل وَقْتِ الصَّلٰوة بِاَلْفَاظٍ بِطَرِيْقَةٍ مَخْصُوْصَةٍ–

বিশেষ শব্দমালার সাহায্যে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সালাতের সময় হওয়ার কথা জানিয়ে দেয়া।

هُوَ الصَّوْتُ الرَّفِيْعُ لِلْمُؤَذِّن عِنْدَ كُلِّ الصَّلٰوة– অর্থাৎ, প্রতি সালাতের ওয়াক্তে একজন আহবায়কের উচ্চকণ্ঠে সালাতের কথা জানিয়ে দেয়া।

মোটকথা, আযান হল শরীয়ত নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট অর্থপূর্ণ এমন কিছু বাক্য যার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে প্রত্যেক সালাতের সময় হওয়ার কথা জানানো হয়।

ইকামতের আভিধানিক অর্থঃ اَلاِقَامَة শব্দটি বাবে اِفْعَال-এর মাসদার। অভিধানে এর অর্থ লিখা হয়েছে, প্রতিষ্ঠা, স্থাপন, উত্তোলন, অবস্থান, বসবাস, দাঁড়াতে আহবান করা, কাতারবন্দী হওয়া ইত্যাদি। (المعجم الوافي ص١٠٩)

ইকামতের পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ –اَلْاِقَامَةُ هِيَ نِدَاءُ الْمُصَلِّي اِلَى الْجَمَاعَةِ

অর্থাৎ, ইকামত হল নামাযীদেরকে জামাআতের প্রতি আহবান জানানো।

–هِيَ دَعْوَةُ الْمُسْلِمِيْنَ لِلْجَمَاعَةِ بَعْدَ الاَذَانِ অর্থাৎ, আযানের পর মুসলমানদের জামাআতের জন্য আহবান জানানোর প্রক্রিয়াই হল ইকামত।

প্রকৃতপক্ষে ফরয সালাত শুরুর পূর্বে ইমাম ব্যতীত মুসল্লীদের মধ্য থেকে কোন একজন (সাধারণত মুআযযিন) আযানের মত বাক্য দিয়ে লোকদেরকে জামাআত শুরুর সংবাদ দেয়ার জন্যে একটু উচ্চকণ্ঠে যে বাক্য উচ্চারণ করে, তাকে ইকামত বলে।

আযান প্রচলনের সময়কালঃ ইসলামে আযান কখন এবং কোথায় প্রবর্তিত হয়েছে, এ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের চারটি মত পাওয়া যায়। যথা-

(১) উলামাদের একদল মনে করেন, হিজরতের আগে মক্কায় আযান প্রবর্তিত হয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে-

اَنَّ جِبْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَمَرَ النَّبِيَّ صلعم بِالاَذَانِ حِيْنَ فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ–

অর্থাৎ, যখন নামায ফরয হয়, তখন জিবরাঈল (আঃ) নবী করীম (সাঃ)-কে আযানের আদেশ দেন।

আর সালাত যে মক্কায় ফরয হয়েছে, এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। সুতরাং আযানও মক্কাতেই প্রবর্তিত হয়েছে। (فتح الباري ج٢ ص٦٢)

(২) অন্য একদল মুহাদ্দিস মনে করেন, মিরাজের রাতে রাসূল (সাঃ)-কে সালাতের সাথে সাথে আযানও শিক্ষা দেয়া হয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে, যখন সালাত ফরজ হয় তখন জিবরাঈল (আঃ) মহানবী (সাঃ)-কে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। আর সালাত তো মিরাজের রজনীতেই ফরজ হয়েছিল।

(৩) জমহুর মুহাদ্দিসীন ও ইতিহাসবিদদের মতে, আযান ১ম হিজরীতে মদীনাতে প্রবর্তিত হয়েছে। যেমন, এক বর্ণনায় এসেছে, ইবন মানজুর বলেন, রাসূল (সাঃ) মক্কায় সালাত ফরজ হওয়ার পরও আযান ছাড়াই সালাত আদায় করতেন। মদীনায় হিজরতের পর আযানের বিধান চালু হয়।

(৪) ইবন হাজার আসকালানী (রহ.)-এর মতে, দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধের কিছুদিন আগে মদীনাতেই আযানের বিধান প্রবর্তিত হয়। এরশাদ হচ্ছে-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللهِ–

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! জুমআর দিন যখন তোমাদেরকে সালাতের জন্য ডাকা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ত্বরা কর। (জুমআঃ ৯)

যেহেতু আয়াতটি বদর যুদ্ধের কিছুদিন আগে নাযিল হয়েছে, সুতরাং তখন থেকেই আযান প্রচলিত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

بَابُ كَيْفَ الْاَذَانُ ص٧١ ঃ আযানের নিয়ম

... عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ اَبِي مَحْذُوْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلِّمْنِي سُنَّةَ الْاَذَانِ قَالَ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِي قَالَ تَقُوْلُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ فَاِنْ كَانَ صَلٰوةُ الصُّبْحِ قُلْتَ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ (ابو داود ج١ ص٧٢، ترمذي ج١ ص٤٨ باب الترجيع في الاذان، ابن ماجة ص٥٢)

অনুবাদঃ ... মুহাম্মদ ইবন আবদুল মালিক ইবন আবু মাহযুরা থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাবী বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলি, আমাকে আযানের নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা দিন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আমার মাথার সম্মুখভাগে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, তুমি বলবে- আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, তা উচ্চস্বরে বলবে। অতঃপর আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ- বলার সময় গলার স্বর নীচু করবে। অতঃপর উচ্চকণ্ঠে বলবেঃ আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। অতঃপর বলবেঃ হাইয়া আলাস-সালাহ, হাইয়া আলাস-সালাহ; হাইয়া আলাল-ফালাহ, হাইয়া আলাল-ফালাহ। অতঃপর ফজরের নামাযের আযানের সময় বলবেঃ আস-সালাতু খাইরুম মিনান্ নাওম, আস-সালাতু খাইরুম মিনান্ নাওম। অতঃপর বলবেঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ''।

اَلتَّرْجِيْعُ (তারজী)-এর সংজ্ঞা এবং আযানে এর হুকুমঃ اَلتَّرْجِيْعُ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل-এর মাসদার। এর মূল ধাতু ر - ج - ع ; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে اَلْاِعَادَةُ বা পুনরায় করা, প্রত্যাবর্তন করা। পরিভাষায় তারজী হল-

هُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِكَلِمَتَيْ الشَّهَادَةِ بَعْدَ الْخَفَضِ بِهِمَا–

অর্থাৎ, আযানের মধ্যে শাহাদাতাইন বা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বাক্যদ্বয়ের প্রথমে নিম্নস্বরে দুইবার করে উচ্চারণ করে পুনরায় দুইবার করে উচ্চস্বরে পড়াকে তারজী বলে।

আযানে তারজী করার হুকুমঃ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, তারজী করা বা না করা উভয় অবস্থায়ই আযান শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে আযানের মধ্যে তারজী করা উত্তম কিনা, এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক ও শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, আযানে তারজী করা সুন্নত।

* ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে,

اَلتَّرْجِيْعُ وَعَدَمَهُ كِلاَهُمَا جَائِزَانِ وَلٰكِنْ تَرْكَهُ اَحَبُّ– (تنظيم ج١ ص٢٤٥)

অর্থাৎ, আযানে তারজী করা বা না করা উভয়ই জায়েয, তবে না করাই আমার পছন্দ।

* ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে, আযানে তারজী করা সুন্নত নয়, বরং মাকরূহ। (فتح الملهم ج٢ ص٥)

* আযানের বাক্য সংখ্যাঃ আযানের বাক্য সংখ্যা কয়টি, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে-

* ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, আযানে যেহেতু তারজী উত্তম, তাই তাঁর নিকট আযানের বাক্য ১৭টি। যেমন-

আল্লাহু আকবার - ২ বার
শাহাদাতাইন - ৮ বার
হায়্যালাতাইন - ৪ বার
আল্লাহু আকবার - ২ বার
লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ - ১ বার
মোট ১৭ বার

দলীল (১)ঃ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُمِرَ بِلاَلٌ اَنْ يَّشْفَعَ الاَذَانَ وَيُوْتِرَ الاِقَامَةَ– (ابو داود ج١ ص٧٥ باب في الاقامة، بخاري ج١ ص٨٥ باب الآذان مثنى مثنى، مسلم ج١ ص١٦٤ باب الامر بشفع الآذان الخ، ترمذي ج١ ص٤٨ باب افراد الاقامة، نسائي ج١ ص١٠٣ تثنية الآذان، ابن ماجة ص٥٣)

অর্থাৎ, ... আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রাঃ)-কে আযান জোড় শব্দে এবং ইকামত বেজোড় শব্দে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كَانَ اَذَانُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِيْ الاَذَانِ وَالاِقَامَةِ– (ترمذي ج١ ص٤٨ باب ان الاقامة مثنى مثنى)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আযান ও ইকামতের শব্দগুলো ছিল জোড়া জোড়া।

সুতরাং হাদীসদ্বয়ে আযানে شفع (জোড়া) শব্দের উল্লেখ রয়েছে। আর شفع শব্দের অর্থ হল, একটি বাক্যকে দু'বার বলা। সুতরাং তাকবীরও (আল্লাহু আকবার) দু'বার হবে। চারবার হবে না।

তারজী উত্তম হওয়ার দলীলঃ

(১) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হযরত আবু মাহযুরা (রাঃ)-এর হাদীস।

(২) ... عَنْ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الاَذَانَ تِسْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً وَّالاِقَامَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً ... (ابو داود ج١ ص٧٣، ترمذي ج١ ص٤٨ باب الترجيع فِي الآذان، نسائي ج١ ص١٠٣ كم الآذان من كلمة، ابن ماجة ص٥٢)

অর্থাৎ, ... আবু মাহযূরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে ঊনিশ শব্দে আযান এবং সতের শব্দে ইকামত শিক্ষা দিয়েছেন।
আযানে ঊনিশটি শব্দ তখনই হওয়া সম্ভব, যখন তারজী করা হবে।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)ও তারজী উত্তম হওয়ার প্রবক্তা। এজন্যে তাঁর মতে আযানের বাক্য ১৯টি। যথা-

আল্লাহু আকবার - ৪ বার
শাহাদাতাইন - ৮ বার
হায়্যালাতাইন - ৪ বার
আল্লাহু আকবার - ২ বার
লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ - ১ বার
মোট ১৯ বার

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الاَذَانَ تِسْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً وَّالاِقَامَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً ... (ابو داود ج١ ص٧٣)

উল্লেখ্য যে, এগুলো তারজী উত্তম হওয়ারও দলীল।

* ইমাম আবু হানিফা ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, আযানের বাক্য সংখ্যা ১৫টি। কেননা তাঁদের মতে, আযানে তারজী সুন্নত নয়।

আল্লাহু আকবার - ৪ বার
শাহাদাতাইন - ৪ বার
হায়্যালাতাইন - ৪ বার
আল্লাহু আকবার - ২ বার
লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ - ১ বার
মোট ১৫ বার

দলীল (১)ঃ ... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ لَمَّا اَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوْسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ النَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلٰوةِ طَافَ بِيْ وَاَنَا نَائِمٌ رَّجُلٌ يَّحْمِلُ نَاقُوْسًا فِيْ يَدِهِ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللهِ اَتَبِيْعُ النَّاقُوْسَ فَقَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهٖ فَقُلْتُ نَدْعُوْ بِهٖ اِلَى الصَّلٰوةِ قَالَ اَفَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ مِّنْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لَهُ بَلٰى قَالَ فَقَالَ تَقُوْلُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الخ (ابو داود ج۱ ص۷۱-۷۲)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শিংগা ধ্বনি করে লোকদের নামাযের জন্য একত্র করার নির্দেশ প্রদান করেন। তখন একদা আমি স্বপ্নে দেখি যে, এক ব্যক্তি শিংগা হাতে নিয়ে যাচ্ছে। আমি তাকে বলি, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কি শিংগা বিক্রয় করবে? সে বলে, তুমি শিংগা দিয়ে কি করবে? আমি বলি, আমি এর সাহায্যে নামাযের জামাআতে লোকদের ডাকব। সে বলল, আমি কি এর চেয়ে উত্তম কোন জিনিসের সন্ধান তোমাকে দেব না? আমি বলি, হাঁ। রাবী বলেন, তখন সে বলল, তুমি এইরূপ শব্দ উচ্চারণ করবে- "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়া আলাস-সালাহ, হাইয়া আলাস-সালাহ, হাইয়া আলাল-ফালাহ, হাইয়া আলাল-ফালাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।"

উক্ত হাদীসে দেখা যায় যে, যাকে (আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ) স্বপ্নযোগে আযান শেখানো হয়েছিল, তাতে তারজী ছিল না।

দলীল (২)ঃ হযরত বিলাল (রাঃ) আজীবন তারজী ছাড়া আযান দিতেন। হযরত সুয়াইদ ইবন গাফালা (রাঃ) বলেন-

سَمِعْتُ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ مَثْنٰى وَيُقِيْمُ مَثْنٰى – (شرح معاني الاثار)

অর্থাৎ, আমি বিলালকে জোড়াশব্দে আযান ও ইকামত দিতে শুনেছি।

দলীল (৩)ঃ আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত-

قَالَ كَانَ اَذَانُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِيْ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ –

(ترمذي ج١ ص٤٨ باب ان الاقامة مثنى مثنى)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আযান ও ইকামতের শব্দগুলো ছিল জোড়া জোড়া।

দলীল (৪)ঃ **... عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّمَا كَانَ الاَذَانُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ** ... (ابو داود ج١ ص٧٦ باب في الاقامة)

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সময়ে আযানের শব্দ দু'বার করে বলা হত।

সুতরাং উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, যখন আযানের শব্দসমূহ দু'বার করে বলার প্রমাণ মিলে, তখন তো আর তারজীর প্রমাণ মিলে না। কেননা, তারজীর সময় তো প্রত্যেক শাহাদাতাইনকে চারবার করে বলতে হয়।

* তাছাড়া হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর যামানায় মুআযযিন তারজী ছাড়া আযান দিত। এর দ্বারা সাহাবাগণের পক্ষ থেকে তারজী না হওয়ার ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (تنظيم ج١ ص٢٤٥)

জবাবঃ ইমাম মালিক (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ হযরত আবু মাহযূরা, বিলাল, আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ (রাঃ) প্রমুখের আযান যেসব রেওয়ায়েতে স্পষ্টভাবে চারবার তাকবীরের কথা বর্ণিত হয়েছে। তাতে شفع اذان-এর অর্থ হল, দুই শাহাদাত এবং দুই হায়্যা আলা দুইবার পড়া।

অথবা, এটাও হতে পারে, যেহেতু আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার দুইবার এক শ্বাসে আদায় করা হয়, এজন্য দুটি করে চার তাকবীরকে **شفع** বা জোড় বলা হয়েছে। (درس ترمذي ج١ ص٤٥٣–٤٥٤)

ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর দলীলসমূহের (তারজী রদ সহ) জবাবঃ

১. আল্লামা উসমানী 'ফাতহুল মুলহিম' গ্রন্থে বলেন, হুনায়নের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মহানবী (সাঃ) আযান দিয়ে সালাত আদায় করলে কাফিরদের বালক-বালিকারা এ সময়ে বিদ্রূপ করে আযানের বাক্যগুলো পুনরাবৃত্তি করতে লাগলো। এদের মধ্যে আবূ মাহযুরাও ছিলেন। রাসূল (সাঃ) তাঁকে ডেকে বললেন, আযান দাও। তখন অভ্যাসগত কারণে আবু মাহযুরা শাহাদাতাইন নিম্নস্বরে পড়েছেন। ফলশ্রুতিতে রাসূল (সাঃ) তাকে বললেন, "আস্তে বলছ কেন? উচ্চ কণ্ঠে বলো।" তখন আবু মাহযুরা দ্বিতীয়বার শাহাদাতাইন উচ্চকণ্ঠে বললেন। এতে তারজী প্রমাণ হয় না।

২. কিংবা বলা যায়, তারজী তখন কেবল মক্কার জন্য খাস ছিল। কেননা, এর আগে এখানে শাহাদাতাইন ছিল জীবনের জন্য হুমকি স্বরূপ। তাই শুকরিয়া স্বরূপ মক্কায় সীমিত সময়ের জন্য তারজীর প্রচলন করা হয়েছিল।

(تنظيم ج١ ص٢٤٥-٢٤٦ ، فتح الباري ج٢ ص٦٣-٦٤، معارف السنن ج٢ ص١٨١)

৩. অথবা, তারজীর বিষয়টি আবু মাহযুরার জন্য খাছ ছিল। কেননা এটি ছিল তাঁর ইসলাম কবুলের কারণ; তাই তিনি এটাকে বরকতময় মনে করে উচ্চারণ করতেন। এ হুকুম সার্বজনীন হবে না। যেমন, হাদীসে বর্ণিত আছে-

... قَالَ فَكَانَ اَبُوْ مَحْذُوْرَةَ لاَ يَجُزُّ نَاصِيَتَهُ وَلاَ يَفْرِقُهَا لاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهَا- (ابو داود ج١ ص٧٣)

অর্থাৎ, ... রাবী বলেন, আবু মাহযূরা (রাঃ) কখনও তাঁর মাথার সম্মুখ ভাগের চুল (বরকতের জন্য) কাটতেনও না এবং পৃথকও করতেন না। কেননা, নবী করীম (সাঃ) তাঁর এই চুলের উপর হাত বুলিয়েছিলেন।

بَابُ مَنْ اَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ ص٧٦

যে আযান দিয়েছে, সেই ইকামত দিবে

... عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ لَمَّا كَانَ اَوَّلُ اَذَانِ الصُّبْحِ اَمَرَنِي يَعْنِيْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَذَّنْتُ فَجَعَلْتُ اَقُوْلُ اُقِيْمُ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ اِلٰى نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ اِلَى الْفَجْرِ فَيَقُوْلُ لاَ حَتّٰى اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَزَلَ فَبَرَزَ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَيَّ وَقَدْ تَلاَحَقَ اَصْحَابُهُ يَعْنِيْ فَتَوَضَّأَ فَاَرَادَ بِلاَلٌ اَنْ يُّقِيْمَ فَقَالَ لَهُ نَبِيُّ

اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَخَا صُدَاءٍ هُوَ اَذَّنَ وَمَنْ اَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ قَالَ فَاَقَمْتُ–

(ترمذي ج١ ص٥٠ باب من اذن فهو يقيم، ابن ماجة ص٥٣)

অনুবাদঃ ... যিয়াদ ইবনুল হারিছ আস-সুদাঈ (রাঃ) বলেন, যখন আযানের প্রথম সময় উপনীত হয়, তখন নবী করীম (সাঃ) আযান দেয়ার নির্দেশ দিলে আমি আযান দেই। অতঃপর আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইকামত দিব কি? তখন নবী করীম (সাঃ) পূর্ব দিগন্তের দিকে লক্ষ্য করে বলেন, না। অতঃপর পূর্বাকাশ পরিষ্কার হওয়ার পর তিনি তার বাহন হতে অবতরণ করেন। অতঃপর তিনি ইস্তিঞ্জা করে আমার নিকট আসেন, তখন সাহাবায়ে কিরাম তাঁর চারপাশে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তিনি অযু করেন। এ সময় হযরত বিলাল (রাঃ) ইকামত দিতে চাইলে নবী করীম (সাঃ) তাঁকে নিষেধ করে বলেন, (তোমার) ভাই যিয়াদ আস-সুদাই আযান দিয়েছে এবং (নিয়ম এই যে), যে ব্যক্তি আযান দিবে, সেই ইকামত দেওয়ার অধিকারী। রাবী বলেন, আমি ইকামত দেই।

বিশ্লেষণঃ যে ব্যক্তি আযান দেয়, তাকেই ইকামত দিতে হবে কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ)-এর মতে, যে আযান দিবে, সে-ই ইকামত দেবে। মুআযযিন ব্যতীত অন্য কারো ইকামত দেয়া মাকরূহ। অন্যজন ইকামত দিলে মুআযযিনের মনে কষ্ট হোক বা না হোক এবং মুআযযিন অন্যকে অনুমতি দিক বা না দিক। (تنظيم ج١ ص٢٤٩)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও আবু সাওর (রহ.)-এর মতে, মুআযযিন ব্যতীত অন্য ব্যক্তির ইকামত দেয়া জায়েয আছে। তবে শর্ত হল, এক্ষেত্রে মুআযযিনের সম্মতি থাকতে হবে। অন্যথায় মাকরূহ হবে। (درس مشكوة ج٢ ص٣٨)

দলীল (১)ঃ ... عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ زَيْدٍ قَالَ اَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ الْاَذَانِ اَشْيَاءَ لَمْ يَصْنَعْ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ فَاُرِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الْاَذَانَ فِيْ الْمَنَامِ فَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ اَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ فَاَلْقَاهُ عَلَيْهِ فَاَذَّنَ بِلَالٌ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ اَنَا رَأَيْتُهُ وَاَنَا كُنْتُ اُرِيْدُهُ قَالَ فَاَقِمْ اَنْتَ–

(ابو داود ج١ ص٧٦ باب الرجل يؤذن ويقيم اخر)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ থেকে তাঁর চাচা আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিভিন্ন জিনিসের মাধ্যমে আযান প্রথা চালু করা সম্পর্কে চিন্তা করছিলেন। কিন্তু বিশেষ কারণে এর কোনটি গৃহীত হয়নি। হযরত

আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ (রাঃ)-কে স্বপ্নযোগে আযানের শব্দ জ্ঞাত করা হয়। অতঃপর তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে স্বপ্নের বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, তুমি তা বিলালকে শিক্ষা দাও। অতঃপর তিনি তা বিলালকে শিখানোর পর তিনি (বিলাল) আযান দেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ (রাঃ) বলেন, যেহেতু আযান সম্পর্কিত স্বপ্নটি আমিই দেখেছি, কাজেই আমি স্বয়ং আযান দিতে ইরাদা করেছিলাম। নবী করীম (সাঃ) তাঁকে বলেন, তুমি ইকামত দাও।
উপরোল্লিখিত হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, হযরত বিলাল (রাঃ) আযান দিলেও ইকামত দিয়েছেন আব্দুল্লাহ (রাঃ)। এতে প্রমাণিত হয় যে, মুআযযিন ব্যতীত ইকামত দেয়া জায়েয আছে।

দলীল (২)ঃ কোন কোন সময় হযরত বিলাল (রাঃ) আযান দিতেন এবং ইবন উম্মে মাকতুম (রাঃ) ইকামত দিতেন। কোন কোন সময় এর বিপরীতও হত।

(ابو داود حاشية ج١ ص٧٦)

জবাবঃ (১) যায়েদ ইবন হারিছের (রাঃ)-এর যে ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে- মূলতঃ তিনি ছিলেন নও মুসলিম। অন্য কেউ ইকামত দিলে হয়ত তিনি এতে ব্যথিত হতে পারেন। এদিকে চিন্তা করেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিলাল (রাঃ)-কে ইকামত দিতে নিষেধ করলেন।
(২) অথবা, এর দ্বারা নবী করীম (সাঃ)-এর এ বিষয়টিই বুঝানো উদ্দেশ্য ছিল যে, মুআযযিনের ইকামত দেয়াই মুস্তাহাব, যার প্রবক্তা হানাফীগণও। (درس ترمذي ج١ ص٤٦٤)

بَابُ اَخْذِ الْاَجْرِ عَلَى التَّأْذِيْنِ ص٧٩

আযানের পরিবর্তে বিনিময় গ্রহণ

... عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِي الْعَاصِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اجْعَلْنِيْ اِمَامَ قَوْمِيْ قَالَ اَنْتَ اِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِاَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لاَ يَأْخُذُ عَلَى اَذَانِهِ اَجْرًا– (ترمذي ج١ ص٥١

باب كراهية ان يأخذ المؤذن الخ، نسائي ج١ ص١٠٩ اتخاذ المؤذن الخ، ابن ماجة ص٥٢)

অনুবাদঃ ... উসমান ইবন আবুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট বললাম, আমাকে আমার গোত্রের ইমাম নিযুক্ত করুন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তোমাকে তাদের ইমাম নিযুক্ত করা হল। তুমি দুর্বল ব্যক্তিদের প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবে এবং এমন এক ব্যক্তিকে মুআযযিন নিযুক্ত করবে, যে আযানের কোনরূপ বিনিময় গ্রহণ করবে না।

বিশ্লেষণঃ আযান, ইমামতি, কুরআন তালীম ইত্যাদি ইবাদতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয কিনা- এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে এখতেলাফ রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক ও শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, আযান কিংবা অন্যান্য ধর্মীয় কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ। (بذل المجهود ج١ ص٣٠٣)

দলীল (১)ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীস- কোন এক সফরে তিনি এক গোত্রের সর্প দংশিত নেতাকে সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিয়েছেন এবং এর বিনিময় স্বরূপ এক পাল বকরী গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীতে মদীনায় এসে এ বিষয়টি নবী করীম (সাঃ)-কে জানালে তিনি তা অনুমোদন করে বলেছেন-

... قَدْ اَصَبْتُمْ اقْسُمُوْا وَاضْرِبُوْا لِيْ مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– (بخاري ج١ ص٣٠٤ باب ما يعطى في الرقية الخ، ابو داود ج٢ ص٥٤٤، ترمذي ج٢ ص٢٦ باب اخذ الاجر على التعويذ)

অর্থাৎ, তোমরা ঠিক করেছ। এগুলো বন্টন করে দাও। তোমাদের সাথে আমাকেও একটি অংশ বন্টন করে দাও। অতঃপর তিনি (সাঃ) হেসে দিলেন।

দলীল (২)ঃ عَنْ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ اَنَّهُ قَالَ فَاَلْقٰى عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَذَانَ فَاَذَّنْتُ ثُمَّ اَعْطَانِيْ حِيْنَ قَضَيْتُ التَّأْذِيْنَ صُرَّةً فِيْهَا شَيْئٌ مِّنْ فِضَّةٍ– (تنظيم ج١ ص٢٥٣)

অর্থাৎ, হযরত আবু মাহযুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সাঃ) আমাকে আযান শিক্ষা দিলেন, অতঃপর আমি আযান দিলাম। আমার আযান দেয়া শেষ হওয়ার পরে তিনি আমাকে একটি রৌপ্য খন্ড উপহার দিলেন।

* পূর্ববর্তী আহনাফ ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর অনুসারীদের মতে, আযান ও অন্যান্য ধর্মীয় কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ নয়।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।
দলীল (২)ঃ হযরত উবাই ইবন কাব (রাঃ) বলেন-

عَلَّمْتُ رَجُلاً اَلْقُرْاٰنَ فَاَهْدٰى اِلَيَّ قَوْسًا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنْ اَخَذْتَهَا اَخَذْتَ قَوْسًا مِّنْ نَّارٍ فَرَدَدْتُّهَا– (ابن ماجة ص١٥٧ باب الاجر على تعليم القراٰن)

অর্থাৎ, আমি এক ব্যক্তিকে কুরআন শিখালাম। সে আমাকে একটি তীরের ধনুক হাদিয়া দিল। এ বিষয়ে আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট আলোচনা করলে তিনি

বললেন, যদি তুমি তা গ্রহণ করে থাক, তাহলে জাহান্নামের একটি তীর-ধনুক গ্রহণ করলে। অতঃপর আমি তা ফেরত দিয়ে দেই।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিয়ে যে সর্প দংশনের ব্যথা ভাল করেছিলেন, তা কোন ধর্মীয় বিষয় ছিল না, বরং ইহা ছিল চিকিৎসা। আর চিকিৎসার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয়া বৈধ। সুতরাং এ হাদীসটি দলীল হতে পারে না।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ আবু মাহ্যুরাকে মহানবী (সাঃ) যে রৌপ্য খণ্ডটি দিয়েছিলেন, তা ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা। আর উসমান ইবন আবুল আস (রাঃ) তাঁর পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। সুতরাং উসমান ইবন আবুল আসের হাদীস দ্বারা ঐ হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে।

পরবর্তী আহনাফদের অভিমতঃ দীনকে প্রচার-প্রসার করার নিমিত্তে প্রয়োজনের তাগিদে আযান ও অন্যান্য ধর্মীয় কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

দলীলঃ ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে মুআযযিন, ইমাম, মুফতি ও মুআল্লিমগণের জন্য ভাতার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু বর্তমানে ইসলামী হুকুমাত না থাকার কারণে ইহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে। অতএব, এখন যদি তাদেরকে কোন পারিশ্রমিক না দেয়া হয়, তাহলে এক সময় দেখা যাবে মসজিদে আযান ও নামায ঠিকমত হচ্ছে না। এবং সমস্ত দীনী নিদর্শনগুলোতে বিশৃংখলা ও aŸংসের মারাত্মক আশংকা দেখা দেবে। তাই শুধুমাত্র দীনকে প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে ইমাম, মুআযযিন ও মুআল্লিমদেরকে বেতন বা পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয বলে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

* একটি মাসআলা জানা থাকা আবশ্যক যে, কুরআন মাজীদ ও সহীহ্ বুখারী খতম দিয়ে পারিশ্রমিক নেয়া তখনই বৈধ হবে, যদি তা কোন পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য পড়া হয়। কিন্তু যদি ইছালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে পড়া হয়, তাহলে পারিশ্রমিক নেয়া বিলকুল নাজায়েয হবে। আর এজন্যই মসজিদের ভিতরে বসে কুরআন মাজীদ ও সহীহ্ বুখারীর খতম দেয়া বা তাবিজ লিখে ও অন্যান্য খতম পড়ে এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয নয়। কেননা, মসজিদে দুনিয়াবী কাজ করা হালাল নয়। আর এগুলো হল দুনিয়াবী কাজ।

(درس ترمذي ج١ ص٤٧٧، تنظيم ج١ ص٢٥٤، معارف القرآن سورة البقرة الآية ٤١)

بَابُ فِيْ الْاَذَانِ قَبْلَ دُخُوْلِ الْوَقْتِ ص٧٩
ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া

... عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ بِلاَلاً اَذَّنَ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَاَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّرْجِعَ فَيُنَادِيَ اَلاَ اِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ زَادَ مُوْسٰى فَرَجَعَ فَنَادٰى اَلاَ اِنَّ العَبْدَ قَدْ نَامَ– (ترمذي ج١ ص٥٠ باب الاذان بالليل)

অনুবাদঃ ... হযরত ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রাঃ) ফজরের নামাযের আযান সুবেহ সাদিকের পূর্বেই দিলেন। নবী করীম (সাঃ) তাঁকে পুনর্বার আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি তা পুনরায় দিলেন। প্রকাশ থাকে যে, বিলাল (রাঃ) ঘুমের কারণে যথা সময়ে আযান দিতে সক্ষম হতেন না।
রাবী মুসার বর্ণনায় আরো আছে, অতঃপর বিলাল (রাঃ) পুনর্বার আযান দিলেন। জেনে রাখ! মানুষেরা এ সময় ঘুমে বিভোর থাকে।

বিশ্লেষণঃ যুহর, আসর, মাগরিব এবং এশার আযান দেয়া ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে জায়েয না হওয়ার ব্যাপারে সকল ইমাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। শুধুমাত্র ফজরের আযানের ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমাদ ইবন হাম্বল, ইসহাক ও আবু ইউসূফ (রহ.)-এর মতে, ফজরের আযান ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে দেয়াও জায়েয আছে। এমতাবস্থায় এর পুনরাবৃত্তি ওয়াজিব নয়।

দলীলঃ ... عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى تَسْمَعُوْا تَاْذِيْنَ اِبْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ– (مسلم ج١ ص٣٤٩ باب ان الدخول في الصوم الخ، ترمذي ج١ ص٥٠، بخاري ج١ ص٨٧ باب الآذان قبل الفجر)

অর্থাৎ, ... সালিমের পিতা আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, বিলাল রাতে আযান দেয়। অতএব, ইবন উম্মে মাকতুমের আযান শোনা পর্যন্ত তোমরা (সাহরী) খাও এবং পান কর।
উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফজরের আযান ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে দেয়াও জায়েয আছে।

* ইমাম আবু হানিফা, মুহাম্মদ ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে, ফজরের আযান ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে দেয়া জায়েয নয়। যদি দেয়া হয়, তাহলে তা পুনরায় দেয়া ওয়াজিব। (فتح الباري ج٢ ص٨٥)

দলীল (১)ঃ ... عَنْ بِلَالٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَا تُؤَذِّنْ حَتّٰى يَسْتَبِيْنَ لَكَ الْفَجْرُ هٰكَذَا وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضًا– (ابو داود ج١ ص٧٩)

অর্থাৎ, ... হযরত বিলাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বলেন, পূর্ব দিগন্তে ফজরের আলো স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তুমি আযান দিবে না- এই বলে তিনি স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রসারিত করেন।

দলীল (২)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ مُؤَذِّنٍ لِّعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوْحٌ اَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ فَاَمَرَهُ عُمَرُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ– (ابو داود ج١ ص٧٩)

অর্থাৎ, ... হযরত উমর (রাঃ)-এর মুআযযিন মাসরূহ হতে বর্ণিত। তিনি সুবেহ সাদিকের পূর্বে আযান দিলে উমর (রাঃ) তাকে পুনরায় আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুবেহ সাদিকের পূর্বে আযান দেয়া জায়েয নেই। যদি জায়েয থাকত, তাহলে পুনরায় আযান দেওয়ার নির্দেশ দিতেন না।

আকলী দলীলঃ আযানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে ঘোষণা দেয়া। সুতরাং রাতে আযান দিলে ঘোষণা হয় না, বরং বিভ্রান্ত করা হয়।

(درس ترمذي ج١ ص٤٧٠)

জবাবঃ (১) হযরত বিলাল (রাঃ)-এর আযানের উপর কখনো নির্ভর করা হতো না, বরং ওয়াক্তের পরে পুনরায় আযান দেয়া হত। যদি হযরত বিলাল (রাঃ)-এর আযানই যথেষ্ট হত, তাহলে অন্তত একবার হলেও তাঁর আযানের উপর নির্ভর করা হত। কিন্তু এমনটি কোন সময়ই করা হয়নি। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সময়ের পূর্বে আযান দেয়া জায়েয নেই।

(২) অথবা, হযরত বিলাল (রাঃ)-এর আযান ছিল রমযানের সেহেরী খাওয়ার জন্য এলান স্বরূপ বা তাহাজ্জুদের নামাজের জন্য। (اثار السنن ص٥٧)

যেমন হাদীসে এসেছে-

... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّ اَحَدَكُمْ اَذَانُ بِلَالٍ مِّنْ سَحُوْرِهٖ فَاِنَّهُ يُؤَذِّنُ اَوْ قَالَ يُنَادِيْ لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ الخ (ابو داود ج١ ص٣٢٠ باب وقت السحور، بخاري ج١ ص٨٧، مسلم ج١ ص٣٥٠ باب ان الدخول في الصوم الخ، نسائي ج١ ص١٠٥ الآذان في غير وقت الصلوٰة)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ বিলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে সাহরী খাওয়া হতে বিরাত না রাখে। কেননা সে আযান দেয় অথবা (রাবীর সন্দেহ) আহবান করে তাদের, যারা তাহাজ্জুদ নামাযরত থাকে, তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য এবং তোমাদের মধ্যে যারা নিদ্রিত থাকে তাদের জাগ্রত করার জন্য।

بَابُ التَّشْدِيْدِ فِيْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ ص٨٠

জামাআত পরিত্যাগের কঠোর পরিণতি

... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِالصَّلٰوةِ فَتُقَامُ ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ انْطَلِقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَّعَهُمْ حُزَمٌ مِّنْ حَطَبٍ اِلٰى قَوْمٍ لاَّ يَشْهَدُوْنَ الصَّلٰوةَ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ (بخاري ج١ ص٨٩ باب وجوب صلٰوة الجمعة، مسلم ج١ ص٢٣٢ باب فضل صلٰوة الجماعة الخ، ترمذي ج١ ص٥٢ باب من سمع النداء فلا يجيب، نسائي ج١ ص١٣٥ التشديد في لاتخلف عن الجماعة، ابن ماجة ص٥٨)

অনুবাদঃ ... হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, লোকদেরকে জামাআতের সাথে নামায আদায়ের নির্দেশ দেই এবং তাদের জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করি। অতঃপর আমি কাষ্ঠ বহনকারী একটি দল আমার সাথে নিয়ে ঐ লোকদের নিকট যাই যারা জামাআতে শরীক হয়নি। অতঃপর তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেই।

বিশ্লেষণঃ জামাআতে নামায আদায়ের হুকুম কি, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছেঃ

* ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, ইবন খুযাইমা, ইবনুল মুনযির, আতা, আওযাঈ এবং আবু সাওর (রহ.)-এর মতে, জামাআতে নামায পড়া ফরযে আইন। এবং ইমাম আহমদ থেকে একটি রেওয়ায়েত এমনও আছে যে, বিনা ওজরে একাকী নামায আদায়কারীর নামায ফাসেদ।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে যারা জামাআতে শরীক না হয় তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এতে বুঝা যায় যে, জামাআতে নামায পড়া ফরযে আইন। নতুবা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এমন কঠিন বাক্য উচ্চারণ করতেন না।

দলীল (২)ঃ ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ قَالُوْا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ اَوْ مَرَضٌ لَّمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلٰوةُ الَّتِيْ صَلّٰى– (ابو داود ج١ ص٨١، ابن ماجة ص٥٨)

অর্থাৎ, ... হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুআযযিনের আযান শুনে বিনা কারণে মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামাআতে নামায আদায় করবে না, তার অন্যত্র আদায়কৃত নামায আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না।

সাহাবীগণ ওযর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যদি কেউ ভয়ভীতি ও অসুস্থতার কারণে জামাআতে হাজির হতে অক্ষম হয় তবে তার জন্য বাড়ীতে নামায পড়া দূষণীয় নয়।

উক্ত হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, জামাআতে নামায পড়া ফরজে আইন।

দলীল (৩)ঃ ... عَنِ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ اَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ رَجُلٌ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ وَلِيْ قَائِدٌ لاَّ يُلاَوِمُنِيْ فَهَلْ لِّيْ رُخْصَةٌ اَنْ اُصَلِّيَ فِيْ بَيْتِيْ قَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لاَ اَجِدُ لَكَ رُخْصَةً

(ابو داود ج١ ص٨١، مسلم ج١ ص٢٣٢، نسائي ج١ ص١٣٦ المحافظة على الصلٰوات، ابن ماجة ص٥٨)

অর্থাৎ, ... ইবন উম্মে মাকতুম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অন্ধ, তদুপরি মসজিদও আমার ঘর হতে অনেক দূরে। কিন্তু আমাকে মসজিদে আনা-নেওয়ার জন্য লোক আছে। এমতাবস্থায় আমি কি ঘরে (ফরয) নামায আদায় করতে পারি? নবী করীম (সাঃ) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি আযান শুনতে পাও? আমি বলি, হাঁ। নবী করীম (সাঃ) বলেন, আমি তোমার জন্য (জামাআত থেকে) অব্যাহতির কোন কারণ পাচ্ছি না।

অতএব, উক্ত হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, জামাআতে নামায পড়া ফরযে আইন।

* কতক আহলে যাহিরের মতে, জামাআতে নামায আদায় করা ওয়াজিব এবং নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য জামাআত শর্ত।

* ইমাম শাফেঈ, তাহাবী ও কারখী (রহ.)-এর মতে, জামাআতের সাথে নামায আদায় করা ফরযে কিফায়া।

দলীলঃ ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দলীলসমূহ।

* ইমাম আবু হানিফা ও মালিক (রহ.)-এর মতে, জামাআতের সাথে নামায পড়া সুন্নতে মুআক্কাদাহ। (فتح الملهم ج٢ ص٢١٨)

দলীল (১)ঃ ঐ সকল হাদীসসমূহ, যাতে জামাআতের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে-

... عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ صَلٰوةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ اَزْكٰى مِنْ صَلٰوتِهِ وَحْدَهُ وَصَلٰوتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ اَزْكٰى مِنْ صَلٰوتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ اَحَبُّ اِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ– (ابو داود ج١ ص٨٢ باب في فضل صلٰوة الجماعة، نسائي ج١ ص١٣٥ الجماعة اذا كانوا اثنين)

অর্থাৎ, ... উবাই ইবন কাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেন, ... একাকী নামায হতে দুইজনের একত্রে নামায আদায় করা অধিক উত্তম এবং দুইজনের একত্রে নামায অপেক্ষা তিনজনের একত্রে নামায আদায় করা আরও অধিক উত্তম। এর অধিক জামাআতে যতই লোক বেশী হবে, ততই তা মহান আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَّمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِيْ جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ– (ابو داود ج١ ص٨٢، مسلم ج١ ص٢٣٢، ترمذي ج١ ص٥٣باب فضل العشاء الخ)

অর্থাৎ, ... হযরত উসমান ইবন আফফান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এশার নামায জামাআতের সাথে আদায় করল, সে যেন অর্ধ রাত দাঁড়িয়ে ইবাদত করল। আর যে ব্যক্তি ফজর ও এশার নামায জামাআতে আদায় করল, সে যেন সারা রাত ইবাদতে মশগুল থাকল।

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِيْ جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلٰى صَلٰوتِهِ فِيْ بَيْتِهِ وَصَلٰوتِهِ فِيْ سُوْقِهِ خَمْسًا وَ عِشْرِيْنَ دَرَجَةً– (ابو داود ج١ ص٨٢ باب في فضل المشي الى الصلوة، بخاري ج١ ص٨٩–٩٠، مسلم ج١ ص٢٣١، ترمذي ج١ ص٥٢ باب فضل الجمعة، نسائي ج١ ص١٣٤، ابن ماجة ص٥٧)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তি জামাআতের সাথে নামায আদায় করলে, বাড়িতে এবং বাজারে একাকী নামায আদায় করা অপেক্ষা তা পঁচিশগুণ শ্রেয়।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জামাআতে নামায আদায় করা খুবই সওয়াবের কাজ এবং খুব বড় ওযর ব্যতীত জামাআত ত্যাগ করাও একজন মুমিনের জন্য আদৌ সমীচীন নয়। তাই বলে জামাআতে নামায না পড়লে নামাই শুদ্ধ হবে না বা কয়েকজন আদায় করলেই ফরযে কিফায়া হিসেবে আদায় হয়ে যাবে এমনটি বলা ঠিক নয়। বরং বলা যায়, জামাআতে নামায পড়া বলিষ্ঠভাবে সুন্নতে মুআক্কাদাহ।

জবাবঃ (১) প্রতিপক্ষগণ যে ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার হাদীস উল্লেখ করেছেন, তা দ্বারা ধমক ও হুঁশিয়ারী এবং জামাআতের গুরুত্ব বুঝানো উদ্দেশ্য। প্রকৃত অর্থ বুঝানো উদ্দেশ্য নয়।
(২) কাযী আয়াজ (রহ.) বলেন, নবী করীম (সাঃ) পুড়িয়ে বা জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য কেবলমাত্র ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তা বাস্তবে জ্বালিয়ে দেননি। গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, আসলে তা ফরয নয়, নতুবা তিনি তা অবশ্যই পুড়িয়ে দিতেন। কেননা রাসূল (সাঃ)-এর সামনে কোন ফরয তরক হবে, আর তিনি তা শুধু মুখেই প্রকাশ করে নিবৃত্ত হবেন, এমন ধারণা করা উচিত নয়।
(৩) অথবা, এমন হুঁশিয়ারী ঐ কওমের প্রতি প্রদান করেছেন, যারা খোদ নামাযকেই ছেড়ে দেয়, শুধু জামাআতকে নয়।
(৪) ইবনে বাযীযাহ বলেন, অনেকে উক্ত হাদীস দ্বারাই জামাআত ফরয না হওয়ার দলীল পেশ করে থাকেন। কেননা, জামাআত যদি ফরযই হত, তাহলে নামাযের জামাআত অনুষ্ঠিত হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে জামাআত ত্যাগকারীদের শাস্তি দেয়ার জন্য স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) জামাআত ত্যাগ করে তাদের দিকে অভিমুখী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন না। (تنظيم الاشتات ج١ ص٣٧٤-٣٧٥)

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ নামায কবুল না হওয়ার অর্থ হল নামায পূর্ণাঙ্গ না হওয়া। কিন্তু একেবারে না হওয়া উদ্দেশ্য নয়। যেমন, হাদীসে এসেছে- لَا صَلٰوةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ اِلاَّ فِيْ الْمَسْجِدِ- (دار قطني ج١ ص٤٢٠) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, নামায তো কবুল হয়ে যাবে, কিন্তু এতে পূর্ণ সওয়াব পাবে না।

তৃতীয় দলীলের জবাবঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাকতুম (রাঃ)-কে জামাআতে হাজির হওয়ার ব্যাপারে যে হুকুম দেয়া হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা জামাআত ফরয হওয়ার উপর ভিত্তি করে নয়, বরং জামাআতের ফযীলত ও গুরুত্বের উপর ভিত্তি করে এই হুকুম দেয়া হয়েছিল।

* অথবা, ইসলামের প্রাথমিক যুগে জামাআতে নামায পড়া ফরয ছিল। পরে তা রহিত হয়ে গেছে। নতুবা জামাআতে নামায যদি ফরযে আইন হত, তাহলে একথা

বলার কোন অবকাশ থাকে না যে, জামাআতে নামায পড়লে পঁচিশ গুণ সওয়াব বেশি। কেননা, একাকী নামায পড়লে যেখানে নামাযই কবুল হবে না, (ইমাম আহমদের মতে), সেখানে পঁচিশ গুণ সওয়াবের কি মূল্য রাখে?

(التعليق ج٢ ص٣٧، فتح الملهم ج٢ ص٢١٨)

بَابُ مَا جَآءَ فِيْ خُرُوْجِ النِّسَاءِ اِلَى الْمَسْجِدِ ص٨٤

মহিলাদের মসজিদে যাতায়াত

... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَمْنَعُوْا اِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلٰكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاَتٌ– (بخاري ج١ ص١٢٠ باب استيذان المرأة زوجها بالخروج الى المسجد، مسلم ج١ ص١٨٣ باب خروج النساء الى المساجدالخ)

অনুবাদঃ ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা আল্লাহর বাঁদীদের (মহিলাদের) আল্লাহর মসজিদসমূহে যাতায়াতে নিষেধ করো না। কিন্তু খোশবু ব্যবহার না করে তারা মসজিদে যাবে।

বিশ্লেষণঃ মহিলাদের নামাযে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মসজিদ ও ঈদগাহে যাওয়া কতটুকু বৈধ, এ নিয়ে ফকীহগণের মাঝে মতভেদ রয়েছেঃ

পূর্ববর্তীগণের মাঝে মতবিরোধঃ

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, নামাযের জামাআতের উদ্দেশ্যে মহিলাদের বের হওয়া মুবাহ (অনুমোদিত)। এবং বৃদ্ধাদের জন্য ঈদগাহে উপস্থিত হওয়া মুস্তাহাব। হযরত আবু বকর, আলী ও ইবন উমর (রাঃ)-এর অভিমতও অনুরূপ।

(معارف السنن ج٤ ص٤٤٥)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ হযরত উম্মে আতিয়্যা (রাঃ)-এর হাদীস-

... عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نُخْرِجَ ذَوَاتِ الْخُدُوْرِ يَوْمَ الْعِيْدِ الخ (ابو داود ج١ ص١٦١ باب خروج النساء في العيد)

অর্থাৎ, ... উম্মে আতিয়্যা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ঈদের নামাযে যাওয়ার জন্য আমাদের (মহিলাদের) নির্দেশ দেন। ...

* ইমাম মালিক, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, বৃদ্ধাদের জন্য দুই ঈদে ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামাআতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে।

দলীলঃ ইমাম মালিক (রহ.) ইমাম শাফেঈ (রহ.) কর্তৃক প্রদত্ত উভয় দলীলকে বৃদ্ধাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করেন। আর সাহেবাইন বলেন, যেহেতু বৃদ্ধা হওয়ার কারণে তাদের প্রতি কারো আকর্ষণ জাগবে না, ফলে ফিতনারও কোন আশংকা নেই। (تنظيم ج١ ص٣٧٨)

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, সাধারণ নামাযগুলোতে ফযর, মাগরিব এবং এশায় বৃদ্ধাদের উপস্থিতিতে কোন দোষ নেই। (هداية ج١ ص١٢٦)

দলীলঃ যেহেতু সাধারণত এই সময়গুলোতে ফিতনা-ফাসাদের আশংকা কম এবং বৃদ্ধাদের ক্ষেত্রে যুবতীদের তুলনায় ফিতনা অনেকটা কম, তাই তাদের জন্য বৈধ।

পরবর্তীদের ইজমাঃ পরবর্তীতে হক্কানী সকল ফকীহ্ ও আলেম এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে, রিসালত যুগে প্রথমতঃ ফিতনার সম্ভাবনা ছিল কম, দ্বিতীয়তঃ মহিলারা সাজসজ্জাবিহীন বাইরে বের হতেন। এজন্য নামাযের জামাআতে তাদের উপস্থিত হওয়ার অনুমতি ছিল। কিন্তু নবী করীম (সাঃ)-এর পর তারা সাজসজ্জায় নব নব পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। তাছাড়া ফিতনার সুযোগও বেড়ে গেছে বহুগুণে। অতএব, এখন তাদের কোন প্রকার জামাআতেই উপস্থিত না হওয়া উচিত। যদি নবী করীম (সাঃ) জীবিত থাকতেন, তাহলে তিনিও এ যুগে মহিলাদেরকে নামাযের জন্য বের হওয়ার অনুমতি দিতেন না বলেই মনে হয়। এ কারণে পরবর্তী যুগে উলামায়ে কিরামের ফাতওয়া হল, বর্তমান যুগে (যুবতী হোক অথবা বৃদ্ধা হোক) কোন মহিলাই ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদের দিকে যাওয়া সমীচীন নয়।

দলীল (১)ঃ ... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَوْ اَدْرَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَحْدَثَ النِّسَاءَ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَآءُ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ— (ابو داود ج١ ص٨٤ باب التشديد في ذلك، بخاري ج١ ص١٢٠ باب خروج النساء الى المساجد الخ، مسلم ج١ ص١٨٣، مؤطاء امام مالك ص١٨٤)

অর্থাৎ, ... হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বর্তমান মহিলাদের আচার-আচরণ যদি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বচক্ষে দেখতে পেতেন তবে অবশ্যই তিনি তাদের মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন, যেরূপ বনী ইসরাঈলের স্ত্রীলোকদের মসজিদে যাওয়া নিষেধ করা হয়েছিল।

দলীল (২)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى

অর্থাৎ, তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে, মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। (আহযাবঃ ৩৩)

দলীল (৩)ঃ মহিলাদের মসজিদে গিয়ে নামায পড়ার মূল লক্ষ্য হচ্ছে অধিক সওয়াব অর্জন করা। অথচ বহু হাদীসে এর বিপরীত বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

(ক) ... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلٰوةُ الْمَرْأَةِ فِيْ بَيْتِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِيْ حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِيْ مُخْدَعِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِيْ بَيْتِهَا– (ابو داود ج١ ص٨٤)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেন, মহিলাদের ঘরে নামায আদায় করা বৈঠকখানায় নামায আদায় করার চাইতে উত্তম এবং মহিলাদের সাধারণ থাকার ঘরে নামায আদায় করার চেয়ে গোপন প্রকোষ্ঠে নামায আদায় করা অধিক উত্তম।

(খ) ইবন মাসউদ (রাঃ) থেকে মাওকূফরূপে বর্ণিত আছে-

مَا صَلَّتْ اِمْرَئَةٌ مِّنْ صَلَاةٍ اَحَبَّ اِلَى اللهِ مِنْ اَشَدِّ مَكَانٍ فِيْ بَيْتِهَا ظُلْمَةً– (مجمع الزوائد ج٢ ص٣٥)

অর্থাৎ, একজন মহিলার নিজ ঘরে সাধারণ জায়গার তুলনায় অধিকতর অন্ধকার স্থানে নামায পড়া আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়।

(গ) আবু আমর শায়বানী থেকে বর্ণিত আছে-

اَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ يُخْرِجُ النِّسَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقُوْلُ اُخْرُجْنَ اِلٰى بُيُوْتِكُنَّ خَيْرٌ لَّكُنَّ– (مجمع الزوائد ج٢ ص٣٥)

অর্থাৎ, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ)-কে দেখেছেন, তিনি মসজিদ থেকে জুমআর দিন মহিলাদেরকে বের করে দিচ্ছেন এবং তিনি বলছেন, তোমরা বেরিয়ে তোমাদের ঘরের দিকে চলে যাও। এটা তোমাদের জন্য উত্তম।

(ঘ) হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত আছে-

خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوْتِهِنَّ– (مجمع الزوائد ج٢ ص٣٣)

অর্থাৎ, মহিলাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মসজিদ হল তাদের ঘরের একদম অন্তপুর।

সুতরাং উপরোল্লিখিত দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদের নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়ার চেয়ে ঘরে নামায পড়াই শ্রেয়।

* অনেকেই হয়ত অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার দলীল পেশ করতে পারেন। কিন্তু বিষয়টি গভীরভাবে লক্ষণীয়- নবী করীম (সাঃ)-এর বরকতময় ও তাকওয়া-পরহেযগারীর যামানায়ও শর্ত ছিল যে, "তবে তারা যেন অবশ্যই সুগন্ধি ব্যবহার না করে বের হয়।" তাহলে আমাদের ফিতনাপূর্ণ

যামানায় কি হুকুম হবে? বিষয়টি ভেবে দেখা আবশ্যক। আর তাই আমরা সাহাবী যুগেই দেখতে পাই যে, আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ)-এর পুত্র বিলাল এ ব্যাপারে বলেন-

... وَاللهِ لاَ نَأْذَنُ لَهُنَّ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلاً وَاللهِ لاَ نَأْذَنُ لَهُنَّ الخ (ابو داود ج١ ص٨٤، مسلم ج١ ص١٨٣، ترمذي ج١ ص١٢٧ باب خروج النساء الى المساجد)

অর্থাৎ, ... আল্লাহর শপথ! আমি তাদের রাতের বেলায় মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেব না। কেননা এতে তারা ফিতনা-ফাসাদে লিপ্ত হতে পারে। আল্লাহর শপথ! আমি তাদেরকে কিছুতেই অনুমতি দেব না।

بَابُ فِيْ الْجَمْعِ فِيْ الْمَسْجِدِ مَرَّتَيْنِ ص٨٥

একই নামায দুইবার একই মসজিদে জামাআতে আদায় করা

... عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْصَرَ رَجُلاً يُصَلِّيْ وَحْدَهُ فَقَالَ اَلاَ رَجُل يَّتَصَدَّقُ عَلٰى هٰذَا فَيُصَلِّيْ مَعَهُ– (ترمذي ج١ ص٥٣ باب الجماعة في مسجد الخ)

অনুবাদঃ ... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে (জামাআতের পর) একাকী নামায আদায় করতে দেখে বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি নেই, যে এ ব্যক্তিকে সদকা দেয়, যাতে সে তাকে সঙ্গে নিয়ে নামায পড়তে পারে?

বিশ্লেষণঃ যদি কোন মসজিদে নির্দিষ্ট ইমাম না থাকে অথবা যদি পথের মসজিদ হয় বা বাজারের মসজিদ হয়, তবে তাতে পুনরায় জামাআত জায়েয আছে। এমনিভাবে যদি মহল্লাহর মসজিদ হয় যেখানে ইমাম-মুআযযিন সুনির্দিষ্ট সেখানে যদি মহল্লাবাসী ছাড়া অন্যরা এসে জামাআত করে, তাহলে মহল্লাবাসীদের দ্বিতীয়বার জামাআত করার অধিকার রয়েছে। (درس مشكوة ج٢ ص١٠٨)

কিন্তু প্রশ্ন হল, যদি মহল্লার মসজিদে ইমাম-মুআযযিন নির্দিষ্ট থাকে এবং তাতে মহল্লাবাসী একবার জামাআত পড়ে থাকে, সেই মসজিদে অন্যদের জন্য দ্বিতীয় জামাআত জায়েয কিনা- এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আহলে যাহির এবং ইসহাক (রহ.)-এর মতে, মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত আদায় করা জায়েয আছে।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ হযরত আনাস (রাঃ)-এর সেই ঘটনা, যা ইমাম বুখারী (রহ.) প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করেছেন-

... وَجَاءَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اِلٰى مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيْهِ فَاَذَّنَ وَاَقَامَ وَصَلّٰى جَمَاعَةً–

(بخاري ج١ ص٨٩ باب فضل صلوة الجماعة)

অর্থাৎ, আনাস (রাঃ) এক মসজিদে এলেন, যেখানে নামায পড়া হয়ে গেছে। তিনি এসে আযান-ইকামত দিয়ে জামাআতে নামায আদায় করলেন।
উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দ্বিতীয় জামাআত জায়েয আছে।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও শাফেঈ (রহ.) সহ জমহুরের মাযহাব হল, যে মসজিদে ইমাম-মুআযযিন নির্ধারিত এবং তাতে এলাকাবাসী একবার জামাআতে নামায পড়ে ফেলেছে, সেখানে দ্বিতীয়বার জামাআত করা মাকরূহ তাহরীমী।
কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর একটি রেওয়াতে আছে, যদি স্থান পরিবর্তন করে অর্থাৎ মিহরাব থেকে সরে আযান, ইকামত ও আহবান ব্যতীত দ্বিতীয় জামাআত করে, তাহলে জায়েয আছে। (কিন্তু ফাতওয়া হল, এভাবেও দ্বিতীয় জামাআত করা জায়েয নেই।)

জমহুরদের দলীল (১)ঃ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْبَلَ مِنْ نَوَاحِيْ الْمَدِيْنَةِ يُرِيْدُ الصَّلٰوةَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا فَمَالَ اِلٰى مَنْزِلِهِ فَجَمَعَ اَهْلَهُ فَصَلّٰى بِهِمْ– (اثار السنن ص١٣٥، مجمع الزوائد ج٢ ص٤٥)

অর্থাৎ, হযরত আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনার আশপাশ থেকে এসে নামায পড়তে চাইলেন। দেখলেন লোকজন নামায পড়ে ফেলেছে। অতঃপর তিনি ঘরে যেয়ে পরিবারের লোকজনকে একত্রিত করে তাদের নিয়ে জামাআতে নামায আদায় করলেন।
অতএব, উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যদি একই মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত আদায় করা জায়েয হত, তাহলে তিনি মসজিদে নববীর ফযীলত ছেড়ে বাসস্থানের দিকে রওয়ানা হতেন না। সুতরাং মসজিদে পুনরায় জামাআত করা যে মাকরূহ, এর দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ মিলে।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِالصَّلٰوةِ فَتُقَامُ ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ اَنْطَلِقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَّعَهُمْ حُزَمٌ مِّنْ حَطَبٍ اِلٰى قَوْمٍ لاَّ يَشْهَدُوْنَ الصَّلٰوةَ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ–

(ابو داود ج۱ ص۸۰ باب التشديد في ترك الجماعة، بخاري ج۱ ص۸۹ باب وجوب صلٰوة الجماعة، مسلم ج۱ ص۲۳۲ باب فضل صلٰوة الجماعة الخ، ترمذي ج۱ ص۵۲ باب من سمع النداء فلا يجيب، نسائي ج۱ ص۱۳۵ التشديد في تخلف عن الجماعة، ابن ماجة ص۵۸)

অনুবাদঃ ... হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, লোকদেরকে জামাআতের সাথে নামায আদায়ের নির্দেশ দেই এবং তাদের জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করি। অতঃপর আমি কাষ্ঠ বহনকারী একটি দল আমার সাথে নিয়ে ঐ লোকদের নিকট যাই যারা জামাআতে শরীক হয়নি। অতঃপর তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেই।

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রথম জামাআতেই উপস্থিত হওয়া জরুরী। কেননা, যদি পুনরায় জামাআত জায়েযই হতো, তাহলে যারা প্রথম জামাআতে যাবে না, পেছনে থেকে যাবে, তাদের জন্য এই ওযর ছিল যে, আমরা দ্বিতীয় জামাআতে যাওয়ার ইচ্ছা করি। (درس ترمذي ج۱ ص٤٨٤)

আকলী দলীলঃ জামাআতের মূল উদ্দেশ্যই হল, বেশি সংখ্যক মানুষ একত্র হয়ে নামায আদায় করা এবং মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ মহব্বত ও হৃদ্যতা সৃষ্টি হওয়া এবং ইসলামের শান প্রকাশ করা। যদি দ্বিতীয় জামাআতের অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে মসজিদের জামাআতের উদ্দেশ্য ও গাম্ভীর্য অবশিষ্ট থাকবে না। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যেখানে পুনরায় জামাআতের প্রচলন রয়েছে, সেখানে লোকজন প্রথম জামাআতে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে খুবই অলসতা করে। (درس مشكٰوة ج۲ ص۱۰۸)

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ (১) আলোচ্য হাদীসটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া গোটা হাদীস ভাণ্ডারে এরূপ কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না, যাতে মসজিদে নববীতে দ্বিতীয় জামাআত করার প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং ইহা দলীলযোগ্য নয়।

(২) এই জামাআতটি ছিল সর্বমোট দুইজনের এবং আহবান ব্যতীত। আর আমাদের (জমহুর) মতে আহবান ছাড়া কখনো কখনো পুনরায় জামাআত জায়েয আছে। বস্তুত আহবানের সীমা কোন কোন ফকীহ এই নির্ধারণ করেছেন যে, ইমাম ছাড়া চারজন হবে।

(৩) আলোচ্য হাদীসে ঐ ব্যক্তির সাথে যে নামায পড়েছিলেন তিনি হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ), যিনি ছিলেন নফল আদায়কারী। আর আলোচ্য মাসআলা হল, ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে হবে ফরয আদায়কারী।

(৪) সর্বোপরি বলা যায় যে, বৈধ ও মাকরূহের বিরোধের সময় মাকরূহের প্রাধান্য হয়।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ (১) ইহা ছিল বনু সালাবার মসজিদ, যা পথে অবস্থিত ছিল। সুতরাং এটি সাধারণভাবে দলীলযোগ্য নয়। (فتح الباري ج۲ ص۱۰۹)

(২) স্বয়ং হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

اِنَّ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوْا اِذَا فَاتَتْهُمُ الْجَمَاعَةُ صَلَّوْا فِيْ الْمَسْجِدِ فُرَادَى– (بدائع ج١ ص١٥٣، معارف السنن ج٢ ص٢٨٨)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবীগণের যখন জামাআত ছুটে যেত, তখন তারা মসজিদে একাকী নামায আদায় করতেন।
এটা দ্বিতীয় জামাআত না হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট দলীল।

بَابُ مَنْ اَحَقُّ بِالْاِمَامَةِ ص٨٦

ইমামতির জন্য যোগ্য ব্যক্তি কে?

... عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدِ الْبَدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَؤُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ وَاَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَاِنْ كَانُوْا فِيْ الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمُّهُمْ اَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَاِنْ كَانُوْا فِيْ الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمُّهُمْ اَكْبَرُهُمْ سِنًّا– وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِيْ بَيْتِهِ وَلَا فِيْ سُلْطَانِهِ وَلَا يَجْلِسُ عَلٰى تَكْرِمَتِهِ اِلَّا بِاِذْنِهِ– (مسلم ج١ ص٢٣٦ باب من احق بالامامة، ترمذي ج١ ص٥٥، نسائي ج١ ص١٢٦، ابن ماجة ص٧٠)

অনুবাদঃ ... হযরত আবু মাসউদ আল-বদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, উপস্থিত লোকদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব (ও তার কেরাত) সম্পর্কে সর্বাধিক অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাদের ইমামতি করবে। যদি এ বিষয়ে একাধিক ব্যক্তি সমান যোগ্যতার অধিকারী হয়, তবে যিনি প্রথম হিজরতকারী ব্যক্তি তিনি ইমাম হবেন। যদি তাতেও কয়েকজন সমান হয়, তবে যিনি অধিক বয়স্ক হবেন, তিনিই ইমামতি করবেন। কোন ব্যক্তি যেন অন্য কোন স্থানে অথবা অন্যের আধিপত্যের স্থানে ইমামতি না করে। কারো জন্য নির্ধারিত আসনে তার অনুমতি ব্যতিরেকে যেন আসন গ্রহণ না করে।

বিশ্লেষণঃ নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলীতে মুসল্লীদের মধ্যে অধিক যোগ্য ব্যক্তিকে ইমাম নিয়োগ করা যায়। যথা-
(১) দীন সম্পর্কে যিনি বেশি ইলম ও জ্ঞান রাখেন। বিশেষ করে নামাযের মাসআলা-মাসায়িল সম্পর্কে যিনি বেশি জ্ঞানী।
(২) প্রয়োজনীয় কিরাত বিশুদ্ধ থাকার পর যার কুরআন তেলাওয়াত বেশি সহীহ ও ভাল।

(৩) যিনি বেশি মুত্তাকী ও পরহেযগার।
(৪) যার চরিত্র তুলনামূলকভাবে বেশি ভাল।
(৫) যার বংশ উত্তম এবং কণ্ঠস্বর ভাল।
(৬) যিনি বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকেন।
(৭) যার বয়স বেশি। (ফাতওয়ায়ে রাহমানিয়া ১ঃ২৫৮, بدائع ج١ ص١٠٧)

* ইমামতির ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ ক্বারী (اَقْرَءُ-যিনি তাজভীদ ও কেরাতে অভিজ্ঞতর এবং যার কুরআন বেশি মুখস্থ আছে) অধিক হকদার, নাকি শ্রেষ্ঠ আলিম (اعلم/افقه), এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছেঃ
* ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, ইসহাক, আবু ইউসুফ ও ইবন সীরীন (রহ.)-এর মতে, ইমামতির ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আলিমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ক্বারী অধিক হকদার। ইমাম মালিক ও শাফেঈ (রহ.)-এর একটি রেওয়ায়েতও অনুরূপ। (درس مشكوة ج٢ ص١٠٤)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসের আলোকে প্রমাণ মিলে যে, ইমামতির ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ক্বারী অগ্রগণ্য হবে।

* ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, ইমামতির ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আলিম ও ফকীহকে শ্রেষ্ঠ ক্বারীর উপর প্রাধান্য দিতে হবে। মালিকী ও শাফেঈদেরও দ্বিতীয় রেওয়ায়েত অনুরূপ। (فتح الملهم ج٢ ص٢٣٠)

দলীলঃ আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) মৃত্যুশয্যার সময় ইরশাদ করেন- مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّيْ بِالنَّاسِ– (بخاري ج١ ص٩٣ اهل العلم والفضل احق بالامامة)
অর্থাৎ, তোমরা আবু বকরকে বল, তিনি যেন নামাযে ইমামতি করেন।

সুতরাং, এমতাবস্থায় হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর ইমামতি অধিক জ্ঞানী হওয়ার ভিত্তিতে ছিল। এর দলীল হল, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন-
وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ هُوَ اَعْلَمُنَا– (بخاري ج١ ص٥١٦ كتاب المناقب)
অর্থাৎ, আবু বকর ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলিম।
এতে প্রমাণিত হয় যে, শ্রেষ্ঠ আলিম শ্রেষ্ঠ ক্বারীর উপর প্রাধান্য পাবে। কেননা, যদি শ্রেষ্ঠ ক্বারীকেই প্রাধান্য দেওয়া হতো, তাহলে তো নবী করীম (সাঃ) উবাই ইবন কাব (রাঃ)-কে ইমাম বানাতেন। যেমন হাদীসে হযরত আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত- وَاَقْرَاُهُمْ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ অর্থাৎ, শ্রেষ্ঠ ক্বারী উবাই ইবন কাব।

জবাবঃ সাহাবায়ে কিরামের সময়ে যেহেতু শ্রেষ্ঠ আলিম ও শ্রেষ্ঠ ক্বারীর মধ্যে কোন তফাৎ ছিল না; বরং যে শ্রেষ্ঠ আলিম ছিল, সে শ্রেষ্ঠ ক্বারীও ছিল। তাই উক্ত হাদীসে কিতাবুল্লায় শ্রেষ্ঠ ক্বারী দ্বারা কিতাবুল্লায় অধিক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই বুঝানো উদ্দেশ্য। কিন্তু অনেকেই বলেন, এ জবাব সঠিক নয়। কেননা শ্রেষ্ঠ ক্বারী দ্বারা যদি শ্রেষ্ঠ আলিম বুঝানো উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তো ক্বারী উবাই ইবন কাব (রাঃ) সাহাবাগণের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলিম মেনে নেয়া হয়। অথচ তা ইজমার পরিপন্থী। তাছাড়া আরেকটি অভিযোগ হল, কোন কোন হাদীসে তো কিতাবুল্লাহর শ্রেষ্ঠ ক্বারীর পরে সুন্নতের সবচেয়ে বড় আলিমের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

... عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِنْ كَانُوْا فِيْ الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ... (ابو داود ج١ ص٨٦، مسلم ج١ ص٢٣٦، ترمذي ج١ ص٥٥)

অর্থাৎ, ... হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, যদি সকলে কেরাতের মধ্যে সমান হয়, তবে যে ব্যক্তি সুন্নাহ সম্পর্কে বেশি অভিজ্ঞ (আলিম), সে-ই ইমামতি করবে।

অতএব, اقرأ দ্বারা যদি اعلم। বুঝানোই উদ্দেশ্য হত, তাহলে হাদীসে اقرأ-এর পরে اعلم। শব্দকে কেন উল্লেখ করা হল? এতে তো পুনরাবৃত্তি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সুতরাং সঠিক জবাব হল এই যে, উল্লিখিত হাদীসে শ্রেষ্ঠ ক্বারীকে ইমামতির জন্য প্রাধান্য দেয়া ইহা ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা। এ সময়ে কুরআনের আয়াত মুখস্থকারী খুবই বিরল ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তির এতটুকু পরিমাণ আয়াত পর্যন্ত মুখস্থ ছিল না, যদ্দারা মাসনুন কিরাতের হক আদায় হয়। তখন হিফয ও কেরাতের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য ইমামতিতে শ্রেষ্ঠ ক্বারীকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে যখন কুরআন ভালরূপে প্রচলিত হয়ে গেল, তখন সবচেয়ে বড় আলিম হওয়াকে ইমামতির জন্য উত্তম বা মুস্তাহাব হওয়ার সর্বপ্রথম মানদণ্ড সাব্যস্ত করা হয়। কারণ, শ্রেষ্ঠ ক্বারীর প্রয়োজন শুধু একটি রুকন তথা শুধু কিরাতে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ আলিমের প্রয়োজন নামাযের সবগুলি রুকনে হয়ে থাকে। মোটকথা, রাসূল (সাঃ) অন্তিমশয্যার সময় হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন শ্রেষ্ঠ আলিম হওয়ার কারণে; আর যেহেতু এ ঘটনাটি একেবারে অন্তিমকালের, এজন্য এটি সেসব হাদীসের জন্য রহিতকারীর মর্যাদা রাখে, যেগুলোতে শ্রেষ্ঠ ক্বারীর প্রাধান্যের বিবরণ রয়েছে। (درس ترمذي ج١ ص٤٩٣)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ নাবালেগ শিশুর ইমামতিঃ

... عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ ... فَانْطَلَقَ اَبِيْ وَافِدًا اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ نَفَرٍ مِّنْ قَوْمِهِ فَعَلَّمَهُمُ الصَّلٰوةَ وَقَالَ يَؤُمُّكُمْ اَقْرَءُكُمْ فَكُنْتُ اَقْرَأَهُمْ لِمَا كُنْتُ اَحْفَظُ فَقَدَّمُوْنِيْ فَكُنْتُ اَؤُمُّهُمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِّيْ صَغِيْرَةٌ صَفْرَآءُ فَكُنْتُ اِذَا سَجَدْتُ تَكَشَّفَتْ عَنِّيْ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِّنَ النِّسَآءِ وَارُوْا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ ... فَكُنْتُ اَؤُمُّهُمْ وَاَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ اَوْ ثَمَانِ سِنِيْنَ– (ابو داود ج١ ص٨٦، نسائي ج١ ص١٢٧ امامة الغلام قبل ان يحتلم)

অনুবাদঃ ... হযরত আমর ইবন সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। ... রাবী বলেন, একদা আমার পিতা তাঁর গোত্রের প্রতিনিধি হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট যান। তখন তিনি তাদেরকে নামাযের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেন এবং একথাও বলেন যে, তোমাদের মধ্যে যার অধিক কুরআন মুখস্থ আছে সে যেন ইমামতি করে। আমি অধিক কুরআন মুখস্থকারী ও বিশুদ্ধরূপে তিলাওয়াতকারী হিসেবে তাঁরা আমাকেই ইমামতির দায়িত্ব প্রদান করেন। অতঃপর আমি তাঁদের ইমামতি করতে থাকি। এসময় আমার গায়ে হলুদ বর্ণের একটি ছোট চাদর ছিল। নামাযের সময় যখন আমি সিজদায় যেতাম, তখন তা খুলে যেত। মহিলাদের মধ্যে একজন বলেন, তোমরা তোমাদের ইমামের সতর ঢাকার ব্যবস্থা কর। ... আমি এমন সময় ইমামতি করতে আরম্ভ করি যখন আমার বয়স ছিল ৭ বা ৮ বছর।

বিশ্লেষণঃ নাবালেগের ইমামতি জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ ও ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মতে, নাবালেগ শিশুর ইমামতি জায়েয আছে। তবে শর্ত হল, ভাল-মন্দ বিশ্লেষণের ক্ষমতা থাকতে হবে।

দলীলঃ ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, হযরত আনর ইবন সালামা (রাঃ) ৭/৮ বছর বয়সে ইমামতি করেছেন।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, আহমদ ইবন হাম্বল, ইসহাক ও সাওরী (রহ.)-এর মতে, নাবালেগ ছেলের ইমামতি জায়েয নেই।

দলীল (১)ঃ ... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمِنٌ– (ابو داود ج١ ص٧٧ باب ما يجب على المؤذن الخ، ترمذي ج١ ص٥١ باب ان الامام ضامن الخ)

অর্থাৎ, ... হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, ইমাম হলো মুসল্লীদের জন্য যিম্মাদার এবং মুআযযিন আমানতদার স্বরূপ।

মূলত নাবালেগের উপর নামায ফরয নয়। অতএব সে যে নামায পড়বে বা পড়াবে তা নফল হিসেবে গণ্য হবে। আর নফল নামায আদায়কারী (متنفل)-এর উপর ফরয আদায়কারী (مفترض)-এর ইক্তিদা জায়েয নেই এবং ইমামের নামায ফাসেদ হওয়াতে মুক্তাদীর নামাযও ফাসেদ বা নষ্ট হয়ে যায়। কারণ কোন কিছু তার উপরস্থ জিনিসের জিম্মাদার হয় না। সুতরাং নাবালেগের ইমামতি জায়েয নেই।

দলীল (২)ঃ হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত-

لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتّٰى يَحْتَلِمَ– (تنظيم ج۱ ص۳۹۲)

অর্থাৎ, কোন ছেলে ইমামতি করবে না, যতক্ষণ না সাবালক হয়।

জবাবঃ (১) আহমদ ও হাসান বসরী (রহ.) উক্ত হাদীসকে যঈফ বলেছেন।
(২) সম্পূর্ণ হাদীস অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, রুকু ও সেজদার সময় তাঁর ছতর খুলে যেত। আর নামাযে ছতর খোলা নামায ভঙ্গের কারণ। সুতরাং উক্ত হাদীসটি দলীলযোগ্য নয়।
(৩) আমর ইবন সালামা (রাঃ)-কে যে ইমাম বানানো হয়েছিল, তা ছিল সাহাবায়ে কিরামের ইজতিহাদের ভিত্তিতে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নির্দেশে নয়। কেননা, তাঁরা ধারণা করেছিলেন যে, যে বেশি কুরআন জানে তাকেই ইমাম নিযুক্ত করা উচিত। কিন্তু তাঁরা নও মুসলিম হওয়ার কারণে নামায ও ইমামতির অন্যান্য আহ্কাম সম্পর্কে ছিলেন অজ্ঞ।
(৪) অথবা এটা ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের ঘটনা, যখন শরীআতের হুকুম-আহ্কাম পরিপূর্ণভাবে নাযিল হয়নি। অতএব উক্ত হাদীস দলীলযোগ্য নয়। (درس مشكوة ج۲ ص۱۰٦)

بَابُ اِمَامَةِ مَنْ صَلّٰى بِقَوْمٍ وَّقَدْ صَلّٰى تِلْكَ الصَّلٰوةَ ص۸۸

কোন ব্যক্তির একবার নামায আদায়ের পর ঐ নামাযে পুনরায় ইমামতি করা

... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَآءَ ثُمَّ يَأْتِيْ قَوْمَهُ فَيُصَلِّيْ بِهِمْ تِلْكَ الصَّلٰوةَ– (بخاري ج۱ ص۹۸ اذا صلى ثم ام قوما، نسائي ج۱ ص۱۳٤ اختلاف نية الامام والماموم)

অনুবাদঃ ... হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। হযরত মুআয (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে এশার নামায আদায়ের পর স্বীয় গোত্রে ফিরে গিয়ে পুনরায় তাদের ঐ এশার নামাযে ইমামতি করতেন।

বিশ্লেষণঃ উক্ত হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, হযরত মুআয (রাঃ) একবার নামায আদায়ের পর পুনরায় ঐ নামাযেরই ইমামতি করেছেন, অর্থাৎ ইমাম হচ্ছেন নফল আদায়কারী (متنفل) আর মুক্তাদী হচ্ছে ফরয আদায়কারী (مفترض)। সুতরাং প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইক্তিদা জায়েয কিনা। এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ, ইবন মুনযির, আতা, তাউস (রহ.) এবং ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের এক রেওয়ায়েত মোতাবেক নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইক্তিদা জায়েয আছে। (فتح الملهم ج٢ ص٨٢)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। প্রমাণের কারণ হল, হযরত মুআয (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে এশার নামায পড়তেন। অতঃপর নিজের কওমে গিয়ে সেই নামাযই পড়াতেন। অতএব, দ্বিতীয়বার তিনি হতেন নফল আদায়কারী। অথচ তাঁর মুক্তাদীরা ছিলেন ফরয আদায়কারী।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, যুহরী ও হাসান বসরী (রহ.)-এর মতে এবং আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইক্তিদা জায়েয নেই। (معارف السنن ج٥ ص٩١-٩٢)

দলীল (১)ঃ হযরত আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেন-

... اِنَّمَا جُعِلَ اْلاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ... (ابو داود ج١ ص٨٩ باب الامام يصلي من قعود، بخاري ج١ ص١٥٠ باب صلاة القاعد، مسلم ج١ ص١٧٧ باب ائتمام المأموم بالامام، ترمذي ج١ ص٨٣ باب اذا صلى الامام قاعدا الخ، نسائ ج١ ص١٤٦ تاويل قوله الخ، ابن ماجة ص٦١/٨٨خ)

অর্থাৎ, ... ইমামকে এজন্যই নিযুক্ত করা হয়েছে, যেন তার অনুসরণ করা হয়।

সুতরাং উক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, খোদ নামায, নামাযের ক্রিয়াসমূহ, নামাযের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং নামাযের নিয়তসহ সব বিষয়ে ইমামের অনুসরণ ও অনুকরণ করা জরুরী। সুতরাং ইমাম-মুক্তাদীর নিয়ত যদি ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে তাকে তার অনুসারী বলা যায় না।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمِنٌ— (ابو داود ج١ ص٧٧ باب ما يجب على المؤذن الخ، ترمذي ج١ ص٥١ باب ان الامام ضامن الخ)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, ইমাম হলো মুসল্লীদের যিম্মাদার এবং মুআযযিন আমানতদার।
সুতরাং ইমাম নফল আদায়কারী হয়ে ফরয আদায়কারীর যিম্মাদার হতে পারে না। কারণ কোন কিছু তার উপরস্ত জিনিসের যিম্মাদার হয় না।

আকলী দলীলঃ যদি নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর নামায জায়েযই হত, তাহলে শংকাকালীন নামাযে (صلوٰة الخوف) এত কষ্ট স্বীকার করে পড়ার কোন দরকার ছিল না; বরং সহজ পদ্ধতি এই ছিল যে, একই ইমাম দুই দলকে দুইবার পৃথক পৃথকভাবে নামায পড়িয়ে দিতে পারতেন। প্রথম দলের ক্ষেত্রে ফরযের নিয়তে এবং অপর দলের জন্য নফলের নিয়ত করলেই হত। (درس مشكوٰة ج٢ ص٧٧)

জবাবঃ (১) হযরত মুআয (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর পিছনে হয়ত নফলের নিয়তে শরীক হয়েছিলেন এবং কওমকে নামায পড়াচ্ছিলেন ফরযের নিয়তে।
(২) যদিও মেনে নেয়া হয় তিনি নফলের নিয়তে ইমামতি করেছিলেন, তবুও এতে নবী করীম (সাঃ) থেকে অনুমোদন প্রমাণিত নয়। ইহা ছিল তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ। আর তাই দেখা যায়, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট মুআয (রাঃ)-এর বিলম্বে আসা এবং দীর্ঘ সময় নিয়ে ইমামতি করার অভিযোগ করলে নবী করীম (সাঃ) বলেন-

يَا مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ لاَ تَكُنْ فَتَّانًا اِمَّا اَنْ تُصَلِّيَ مَعِيْ وَاِمَّا اَنْ تُخَفِّفَ عَلٰى قَوْمِكَ-

(مجمع الزوائد ج٢ ص٧٢)

অর্থাৎ, হে মুআয! তুমি ফিতনা সৃষ্টিকারী হয়ো না। হয় আমার সাথে নামায পড়বে, অথবা তোমার কওমকে সংক্ষেপে নামায পড়াবে।
(৩) আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর পিছনে মাগরিবের নামায পড়তেন আর কওমকে পড়াতেন এশার নামায। অতএব নফল আদায়কারীর পিছনে নফল আদায়কারীর প্রশ্নই আসে না।

(معارف السنن ج٥ ص١٠٢)

যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى قَوْمِهِ فَيَؤُمُّهُمْ- (ترمذي)

অর্থাৎ, ... হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। হযরত মুআয (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে মাগরিবের নামায আদায়ের পর স্বীয় গোত্রে ফিরে গিয়ে পুনরায় তাদের এশার নামাযে ইমামতি করতেন।

(৪) ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, এটা তখনকার ঘটনা যখন একই ফরয নামায একাধিকবার পড়া জায়েয ছিল। অতঃপর তা নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। (طحاوي ج١ ص١٩٩)

যেমন নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

لَا تُصَلُّوْا صَلٰوةً فِيْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ– (ابو داود ج١ ص٨٥–٨٦ باب اذا صلى في جماعة الخ، نسائي ج١ ص١٣٨ سقوط الصلٰوة، دار قطني ج١ ص٤١٦)

অর্থাৎ, তোমরা একই (ফরয) নামায একই দিনে দু'বার আদায় করো না।

بَابُ فِيْ تَحْرِيْمِ الصَّلٰوةِ وَتَحْلِيْلِهَا ص٩١

নামাযের হারামকারী (সূচনা) ও হালালকারী (সমাপ্তি) জিনিসের বর্ণনা

... عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ– (ترمذي ج١ ص٥٥ باب تحريم الصلٰوة وتحليلها، ابن ماجة ص٢٤)

অনুবাদঃ হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, পবিত্রতা নামাযের চাবি স্বরূপ। তাকবীর হল তার (নামাযের) জন্য অন্যান্য বিষয়কে হারামকারী এবং সালাম হল তার জন্য অন্যান্য বিষয়কে হালালকারী।

বিশ্লেষণঃ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ (নামায বহির্ভূত কাজ হারাম করার মাধ্যম হল তাকবীর)

নামাযে তাকবীরে তাহরীমা-এর উচ্চারণভঙ্গি এবং হুকুম কি, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যথা-

* হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব ও হাসান বসরী (রহ.)-এর মতে, নামায শুরু করার জন্য তাকবীর বা অন্য কোন যিকির জরুরী নয়; বরং শুধু নিয়ত দ্বারা নামায শুরু করা যায়।

* জমহুরের মতে, শুধু নিয়ত দ্বারা শুরু হতে পারে না, বরং যিকির (তাকবীর উচ্চারণ করা) জরুরী।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীসটি প্রথম মাযহাবের পরিপন্থী জমহুরদের প্রমাণ।

* উল্লেখ্য যে, ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ও আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে, নামাযে তাকবীর (اَللهُ اَكْبَرُ) বলা ফরয। তাঁদের মতে, সৃষ্টিকর্তার তাজীম সংক্রান্ত অন্য কোন শব্দ এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না।
* অতঃপর তাকবীরের শব্দ নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।
(ক) ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, তাকবীরের শব্দ শুধু আল্লাহু আকবার (اَللهُ اَكْبَرُ)।

(খ) ইমাম শাফেঈ (রহ.) এতে اَللهُ الْاَكْبَرُ-কেও অন্তর্ভুক্ত করেন।

(গ) ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এ দুটোর সাথে اَللهُ كَبِيْرٌ এবং اَللهُ الْكَبِيْرُ শব্দ দুটিকেও শামিল করেন। তাঁর মতে, আল্লাহর ছিফাতের মধ্যে اَفْعَل এবং فَعِيل উভয়টিই বরাবর।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস- تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ এতে খবরটি (التكبير) "ال" দ্বারা নির্দিষ্ট তথা معرف باللام যা সীমাবদ্ধতা বুঝায়। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, তাহরীমা তাকবীরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ (حصر)। আর উল্লিখিত ইমামগণ খবরে ওয়াহিদ দ্বারা ফরয সাব্যস্ত করার প্রবক্তা।

* ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, আল্লাহ তাআলার মাহাত্ম্য বুঝায় এরূপ যে কোন যিকির দ্বারা তাহরীমার ফরয আদায় হয়ে যাবে। যেমন- اَللهُ اَجَل – اَللهُ اَعْظَم –اَلرَّحْمٰنُ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করলে তার নামাযের ফরয আদায় হয়ে যাবে। তবে খবরে ওয়াহিদ দ্বারা যেহেতু তাকবীরের (اَللهُ اَكْبَرُ) বর্ণনা এসেছে। এজন্যই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, اَللهُ اَكْبَرُ ব্যতীত অন্য শব্দ ব্যবহার করলে নামায দোহরানো ওয়াজিব হবে।

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- وَذَكَرَاسْمَ رَبِّه فَصَلّٰى অর্থাৎ, সে তার পালনকর্তার নাম উচ্চারণ করেছে, অতঃপর নামায আদায় করেছে। (আল-আলাঃ ১৫)
উক্ত আয়াতে সাধারণভাবে আল্লাহ তাআলার নামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাকবীরের শব্দের কোন খাস নেই।

দলীল (২)ঃ তাকবীরের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সম্মান প্রদর্শন, বড়ত্ব, মাহাত্ম্য ইত্যাদি। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও পুরোপুরি আহনাফের অর্থের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে।

জবাবঃ (১) তিন ইমাম সীমাবদ্ধতার কথা যে উল্লেখ করেছেন, এর জবাব হল, এখানে সীমাবদ্ধতা দ্বারা আপেক্ষিক সীমাবদ্ধতা (حصر اضافي) উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, এমন শব্দের উপর সীমাবদ্ধ করা যে সকল শব্দে আল্লাহ তাআলার মাহাত্ম্যের নিদর্শনের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।

(২) হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ আর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা ফরয হওয়া প্রমাণিত হয় না। কেননা দলীল (প্রমাণ) চার প্রকার। যথাঃ

(১) قطعي الثبوت قطعي الدلالة (অকাট্য অর্থ অকাট্যভাবে প্রমাণিত)। যেমনঃ কুরআনের আয়াতে মুহকাম এবং হাদীসে মুতাওয়াতির- যার দ্বারা ফরয এবং হারাম প্রমাণিত হয়।

(২) ظني الدلالة ظني الثبوت (ধারণামূলক অর্থ ধারণামূলকভাবে প্রমাণিত)। যার অর্থ ও ভাব অনুমানভিত্তিক ও সন্দেহপূর্ণ, এ সকল দলীল দ্বারা মাকরূহ তানযিহী ও মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়।

(৩) ظني الثبوت قطعي الدلالة (অকাট্য অর্থ ধারণামূলকভাবে প্রমাণিত)। যেমন, ইহা আখবারে আহাদ। যার অর্থ ও ভাব সুনির্দিষ্ট ও সন্দেহাতীত। কিন্তু খবরে ওয়াহিদ হওয়ার কারণে তা সন্দেহের উর্ধ্বে নয়।

(৪) قطعي الثبوت ظني الدلالة (ধারণামূলক অর্থ অকাট্যভাবে প্রমাণিত)। যেমন- কুরআনুল কারীমের আয়াতে মুআওয়াল (ব্যাখ্যামূলক আয়াত) যেহেতু কুরআনের আয়াত, তাই তা অকাট্য। আর এগুলো যেহেতু মুআওয়াল সে কারণে ধারণামূলক।
তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রকার দলীল দ্বারা ওয়াজিব, সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ এবং মাকরূহ তাহরীমী প্রমাণিত হয়। আর উক্ত হাদীস ظني الثوت قطعي الدلالة তথা তৃতীয় প্রকার দলীলেল অন্তর্ভুক্ত। তাই এর দ্বারা ফরয প্রমাণিত হবে না, বরং ওয়াজিব প্রমাণিত হবে। তাই আহনাফগণ তাকবীরে তাহরীমা বা আল্লাহু আকবার বলাকে ফরয না বলে ওয়াজিব বলে থাকেন।

* মূলত এই এখতেলাফটি একটি মৌলিক মতানৈক্যের উপর নির্ভরশীল। তা হচ্ছে তিন ইমামের মতে ফরয ও ওয়াজিবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এবং ফরয-সুন্নতের মধ্যে আদিষ্ট বিষয়ের অন্য কোন স্তরও নেই। এজন্য তারা খবরে ওয়াহিদ দ্বারাও ফরয সাব্যস্ত করার প্রবক্তা। কিন্তু হানাফীদের নিকট ফরয ও সুন্নতের মাঝে আরেকটি স্তর হল ওয়াজিব। এই মৌলিক এখতেলাফের সাথে এটাও স্মরণ রাখা উচিত যে, এই মতপার্থক্য চিন্তাগত। আমলীভাবে উভয় মাযহাবে স্পষ্ট কোন পার্থক্য নেই। কারণ তাকবীর (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) ছেড়ে দিলে উভয় দলের মতেই নামায দোহরানো

ওয়াজিব। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, তিন ইমামের মতে এমতাবস্থায় ফরযও আদায় হবে না। অতএব, তাদের মতে এরূপ ব্যক্তিকে যে তাকবীরের শব্দের সাথে নামায না দোহরাবে তাকে নামায তরককারী বলা যাবে। পক্ষান্তরে, হানাফীদের মতে এরূপ ব্যক্তিকে ওয়াজিব তরককারী বা গোনাহগার বলবে, কিন্তু আমভাবে নামায তরককারী বলা যাবে না।

দ্বিতীয় বাক্য- "وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ" (নামাযে নিষিদ্ধ এমন কাজ হালাল করার মাধ্যম হল সালাম)

সালামের ব্যাপারেও ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যথা-
* তিন ইমাম ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে, নামায থেকে বের হওয়ার জন্য সালামের শব্দ তথা اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলা ফরয। অতএব, যদি কোন ব্যক্তি সালাম ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে নামায শেষ করে তবে তার নামায শুদ্ধ হবে না।

দলীলঃ নবী করীম (সাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীস- "وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ"

এখানেও معرف باللام-এর দ্বারা খবরকে সীমাবদ্ধতার সাথে আনা হয়েছে। যার সারনির্যাস হল, নামায থেকে হালাল হওয়া তাসলীম শব্দের সাথে বিশেষিত। তাছাড়া উপরোল্লিখিত তিন ইমামই খবরে ওয়াহিদ দ্বারা ফরয প্রমাণিত হওয়ার প্রবক্তা।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, এক্ষেত্রে ফরয হচ্ছে মুসল্লীর যেকোন কর্ম দ্বারা নামায থেকে বের হওয়া। বস্তুত সালামের শব্দ বলার ব্যাপারে হানাফী মাশায়েখদের দুই ধরনের উক্তি রয়েছেঃ
(ক) ইমাম তাহাবী (রহ.) হতে বর্ণিত আছে যে, ইহা সুন্নত।
(খ) আল্লামা ইবনে হুমাম বলেন, ইহা ওয়াজিব। দ্বিতীয় উক্তিটিই অগ্রাধিকারযোগ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর সালামের শব্দ ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে নামায থেকে বের হয়ে যায়, তার ফরয আদায় হবে, কিন্তু দোহরানো ওয়াজিব।

দলীলঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর সেই ঘটনা, যাতে নবী করীম (সাঃ) তাঁকে তাশাহুদের তালীম দিয়ে তাঁকে বলেছেন-

... اِذَا قُلْتَ هٰذَا اَوْ قَضَيْتَ هٰذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلٰوتَكَ اِنْ شِئْتَ اَنْ تَقُوْمَ فَقُمْ وَاِنْ شِئْتَ اَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ– (ابو داود ج۱ ص۱۳۹ باب التشهد)

অর্থাৎ, ... যখন তুমি তা বলবে অথবা তা আদায় করবে, তখন তুমি তোমার নামায সমাপ্ত করে ফেললে। এ সময় তুমি ইচ্ছা করলে দাঁড়িয়ে যেতে পার এবং ইচ্ছা করলে বসেও থাকতে পার।

প্রত্যুত্তরঃ এক্ষেত্রেও একই জবাব যা প্রথম অংশে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, আহনাফদের নিকট খবরে ওয়াহিদ দ্বারা ফরয প্রমাণিত হয় না। তাই আহনাফরা তাসলীমকে ফরয না বলে ওয়াজিব বলে থাকেন। (درس ترمذي ج١ ص٤٩٤–٤٩٦)

بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ ص١٠٢

যে যে কারণে নামায নষ্ট হয়

... عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ صَلٰوةَ الرَّجُلِ اِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَيْدُ اٰخِرَةِ الرَّحْلِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْاَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْاَسْوَدِ مِنَ الْاَحْمَرِ مِنَ الْاَصْفَرِ مِنَ الْاَبْيَضِ فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِيْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِيْ فَقَالَ الْكَلْبُ الْاَسْوَدُ شَيْطَانٌ– (مسلم ج١ ص١٩٧ باب سترة المصلى الخ، ترمذي ج١ ص٧٩ باب لا يقطع الصلٰوة الا الكلب الخ، نسائي ج١ ص١٢٢ ذكر ما يقطع الصلٰوة الخ، ابن ماجة ص٦٨)

অনুবাদঃ ... আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, নামায নষ্ট করে দেয় অথবা নামাযীর নামায ঐ সময় নষ্ট হয়, যখন তার সামনে উটের পিঠের হাওদার পিছন ভাগের কাঠের মত কোন কিছু না থাকে (অর্থাৎ সুতরা না থাকে) এবং তার সামনে দিয়ে গাধা, কাল কুকুর এবং স্ত্রীলোক গমন করে। রাবী বলেন, আমি বললাম, কালো কুকুরের কী বিশেষত্ব আছে? যদি লাল, হলুদ ও সাদা রংয়ের হয় তবে কি হবে? তিনি বলেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি যেরূপ আমাকে প্রশ্ন করলে, আমিও তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেন, কাল কুকুর হল শয়তান।

বিশ্লেষণঃ নামাযীর সামনে দিয়ে কুকুর, গাধা এবং মহিলা গমন করলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে কিনা, এ ব্যাপারে ফিকহবিদগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* আহলে যাহির, হাসান বসরী ও আবুল আহওয়াসের মতে, মুসল্লীদের সামনে দিয়ে কুকুর, গাধা এবং মহিলা গমন করার কারণে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

* তিরমিযী (রহ.) উল্লেখ করেছেন যে, ইসহাক এবং আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, কেবল কাল কুকুর সামনে দিয়ে গেলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

(معارف السنن ج٣ ص٣٥٩)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ– (ابو داود ج١ ص١٠٢، نسائي ج١ ص١٢٣)

অর্থাৎ, ... হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঋতুবতী মহিলা এবং কুকুর নামাযীর সম্মুখ দিয়ে গমন করলে তার নামায নষ্ট হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আহমদ ও ইসহাক (রহ.) এই হাদীস দ্বারাই দলীল পেশ করেন। তবে মহিলাদের ব্যাপারে হযরত আয়িশা (রাঃ) কর্তৃক এবং গাধার ব্যাপারে হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা নামায ভঙ্গের (যার বর্ণনা জমহূরদের দলীলে আসবে) কারণ সাব্যস্ত হয় না। কিন্তু কুকুরের ব্যাপারে কোন বিপরীত হাদীস নেই।

(درس مشكٰوة ج٢ ص٥٧)

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, নামাযীর সামনে দিয়ে কুকুর, মহিলা ও গাধা তথা কোন জিনিসই অতিক্রম করার কারণে নামায নষ্ট হবে না। (معارف السنن ج٣ ص٣٥٩، درس ترمذي ج٢ ص١١٦)

দলীল (১)ঃ ... عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ شَيْئٌ وَ اُدْرَؤُوْا مَا سْتَطَعْتُمْ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ– (ابو داود ج١ ص١٠٤ باب من قال لا يقطع الصلٰوة شيئ، ابن ماجة ص٦٨)

অর্থাৎ, ... হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, কোন কিছু নামাযীর সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার কারণে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না, তবে তোমরা সাধ্যানুযায়ী এরূপ করতে বাধা দেবে। কেননা (নামাযীর সামনে দিয়ে) গমনকারী একটা শয়তান।

উক্ত হাদীসে লক্ষণীয় বিষয় হল, شَيْئٌ (কোন কিছু) শব্দটি نكرة তথা অনির্দিষ্টভাবে না-সূচক বাক্যের অধীনে (تحت النفي) নেয়া হয়েছে, যা عموم نفي-এর ফায়েদা দেয়। অর্থাৎ কোন কিছুই নামাযীর সামনে দিয়ে গমন করলে নামায নষ্ট হবে না।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ صَلاَتَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ رَاقِدَةٌ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِيْ تَرْقُدُ عَلَيْهِ حَتَّى اِذَا اَرَادَ اَنْ يُّوْتِرَ اَيْقَظَهَا فَاَوْتَرَتْ– (ابو داود ج١ ص١٠٣ باب من قال المرأة لا تقطع الصلٰوة، بخاري ج١ ص٧٣ باب الصلٰوة خلف النائم، مسلم ج١ ص١٩٧، نسائي ج١ ص١٢٤ الرخصة في الصلٰوة الخ، ابن ماجة ص٦٨)

অর্থাৎ, ... হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রাতে নামায আদায়কালে তিনি (আয়িশা) তাঁর বিছানায় নবী করীম (সাঃ) ও কিবলার মধ্যবর্তী স্থানে ঘুমিয়ে থাকতেন। অতঃপর তিনি যখন বিতরের নামায পড়তে মনস্থ করতেন, তখন তাঁকে (আয়িশা) জাগ্রত করলে তিনিও বিতরের নামায পড়তেন।

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ بِئْسَ مَا عَدَلْتُمُوْنَا بِالْحِمَارِ وَالْكَلْبِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ وَاَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِيْ فَضَمَمْتُهَا اِلَيَّ ثُمَّ يَسْجُدُ– (ابو داود ج١ ص١٠٣، بخاري ج١ ص٧٣ من لا يقطع الصلٰوة شيئ/ص١٦١، مسلم ج١ ص١٩٨)

অর্থাৎ, ... হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে, তোমরা নামায নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে আমাদেরকে গাধা ও কুকুরের পর্যায়ভুক্ত করেছ। পক্ষান্তরে আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এরূপ অবস্থায় নামায আদায় করতে দেখেছি যে, আমি তাঁর সম্মুখে শুয়ে থাকতাম। যখন তিনি সিজদা করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি আমার পায়ে খোঁচা দিলে আমি পা টেনে নিতাম এবং তিনি সিজদায় যেতেন।

দলীল (৪)ঃ ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ اَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلٰى اَتَانٍ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلاَمَ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ بِمِنًى فَمَرَدْتُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَاَرْسَلْتُ الاَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ اَحَدٌ– (ابو داود ج١ ص١٠٣ باب من قال الحمار لا يقطع الصلٰوة، مسلم ج١ ص١٩٦، ابن ماجة ص٦٨)

অর্থাৎ, ... হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কাছাকাছি সময়ে একদিন গাধীর পিঠে আরোহণ করে মীনায় যাই, যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখানে নামাযের ইমামতি করছিলেন। তখন আমি নামাযীদের

কাতারের সামনে দিয়ে অতিক্রম করি। আমি আমার গাধীকে বিচরণের জন্য ছেড়ে দিয়ে নামাযের কাতারে শামিল হই। এ সময় কেউই আমাকে এ কাজের জন্য নিষেধ করেনি।

দলীল (৫)ঃ ... عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِيْ بَادِيَةٍ لَّنَا وَمَعَهُ عَبَّاسٌ فَصَلَّى فِيْ صَحْرَآءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ وَّحِمَارَةٌ لَّنَا وَ كَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا بَالٰى ذٰلِكَ– (ابو داود ج١ ص١٠٤ باب من قال الكلب لا يقطع الصلٰوة)

অর্থাৎ, ... হযরত আল-ফাদল ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের নিকট আসেন। আমরা তখন আমাদের খোলা মাঠে ছিলাম। হযরত আব্বাস (রাঃ)ও তাঁর সাথে ছিলেন। অতঃপর তিনি ঐ খোলা মাঠে সুতরাবিহীন অবস্থায় নামায পড়েন যখন তাঁর সামনে আমাদের গাধা ও কুকুর দৌড়াদৌড়ি করছিল। কিন্তু এটাকে তিনি আপত্তিকর মনে করেননি।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, নামাযীর সম্মুখ দিয়ে কোন কিছু গমন করলে নামায নষ্ট হয় না।

জবাবঃ (১) হাদীসে বর্ণিত قطع الصّلٰوة দ্বারা নামায ফাসেদ হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল বান্দা এবং তার রবের সম্পর্কের মাঝখানে একটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়া, যা বাস্তব অর্থে সম্পর্ক ছিন্নকরণ নয়।

(২) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল নামাযের খুশু-খুযু বা একাগ্রতা নষ্ট করে দেয়া।

(৩) ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, যে সকল হাদীসসমূহে কুকুর, গাধা ও মহিলার দ্বারা নামায ভঙ্গের কথা উল্লেখ রয়েছে, ঐ সকল হাদীস রহিত হয়ে গেছে।

(درس مشكٰوة ج٢ ص٥٨، تنظيم ج١ ص٢٨٠)

কেননা হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) নিজেই স্ববিরোধী হাদীস সত্ত্বেও বর্ণনা করেছেন।

* স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, কোন কিছুই অতিক্রম করলে যেহেতু নামায নষ্ট হয় না, তথাপি এ তিনটি জিনিসকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ কি?

এর উত্তর হল, এই তিনটি জিনিসের মাঝে শয়তানী প্রভাবের দখল রয়েছে। যথা-

(ক) কালো কুকুরঃ অনুচ্ছেদের শুরুতেই ইরশাদ হয়েছে-

اَلْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ অর্থাৎ, কালো কুকুর এক ধরনের শয়তান।

(খ) মহিলাঃ মহিলাদের সম্পর্কে ইরশাদ রয়েছে-

اَلنِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ (مشكٰوة المصابيح ج١ ص٤٤٤) অর্থাৎ, নারী হল শয়তানের ফাঁদ।

(গ) গাধাঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে এসেছে-

وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا– (مسلم ج٢ ص٣٥١)

অর্থাৎ, যখন তোমরা গাধার চিৎকার শ্রবণ কর, তখন আল্লাহর নিকট শয়তান থেকে পানাহ চাও। কারণ, সে একটি শয়তান দেখেছে।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ ص١٠٤

রাফউল ইয়াদাইন বা নামাযে হস্তদ্বয় উত্তোলন

... عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ– (بخاري ج١ ص١٠٢ باب رفع اليدين اذا كبر، مسلم ج١ ص١٦٨ باب استحباب رفع اليدين الخ، ترمذي ج١ ص٥٩ باب رفع اليدين عند الركوع، نسائي ج١ ص١٦١ باب رفع اليدين الخ، ابن ماجة ص٦٢)

অনুবাদঃ ... সালেম থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নামায আরম্ভ করার সময় তাঁর দু'হাত স্বীয় কাঁধ পর্যন্ত উঠাতে দেখেছি। অনুরূপভাবে রুকু করার সময় এবং রুকু হতে মাথা উঠানোর পরও তাঁকে হাত উঠাতে দেখেছি। কিন্তু তিনি দুই সিজদার মাঝখানে হাত উঠাতেন না।

বিশ্লেষণঃ রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হতে মাথা উঠানোর সময় উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠানোকে রাফউল ইয়াদাইন বা হস্তদ্বয় উত্তোলন বলা হয়। আর এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। উল্লেখ্য যে, চার ইমামের মাঝে এই মতবিরোধ শুধুমাত্র উত্তম ও অনুত্তমের; বৈধতা-অবৈধতার নয়। উভয় দলের নিকট বিনা মাকরূহ উভয় পদ্ধতি জায়েয। আর তাই না শাফিঈদের মাযহাব মতে হাত উত্তোলন না করা নামায ফাসেদ হওয়ার কারণ, না হানাফিদের মতে হাত উঠানো মাকরূহ। সুতরাং এই সাধারণ বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক করে মূল্যবান সময় নষ্ট করা বা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হওয়া কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়। যদিও ইমাম আওযাঈ, ইমাম হুমায়দী এবং ইমাম ইবন খুযায়মা (রহ.) হস্তদ্বয় উত্তোলনকে ওয়াজিব বলতেন। কিন্তু ইহা বিতর্কের খাতিরে তাদের পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ি বিধায় জমহুরগণ তাঁদের মতকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। (فتح الباري ج٢ ص١٧٤)

নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলঃ

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল, ইসহাক, হাসান বসরী, ইবন সীরীন, ইবন মুবারক (রহ.) প্রমুখের মতে এবং ইমাম মালিক (রহ.)-এর এক মত অনুযায়ী রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হতে উঠার সময় রাফউল ইয়াদাইন সুন্নত।

(تنظيم ج١ ص٢٩٢)

দলীল (১)ঃ ইমাম শাফেঈ ও হাম্বলীদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দলীল হল-

... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَقَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى تَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَهُمَا كَذَالِكَ فَيَرْكَعُ ثُمَّ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتّٰى تَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلاَ يَرْفَعُ فِيْ السُّجُوْدِ وَيَرْفَعُهُمَا فِيْ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوْعِ حَتّٰى تَنْقَضِيَ صَلاَتُهُ– (ابو داود ج١ ص١٠٤)

অর্থাৎ, ... হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে দাঁড়ানোর সময় নিজের দুই হাত কান পর্যন্ত উঠাতেন। তিনি তাকবীর বলে রুকুতে যেতেন এবং দুই হাত উপরে তুলতেন। রুকু হতে উঠার সময়ও স্বীয় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলতেন। তিনি সিজদার মধ্যে হাত উঠাতেন না এবং প্রত্যেক রুকুর জন্য তাকবীর বলার সময় তিনি হাত উঠাতেন এবং এইরূপে নামায শেষ করতেন। (পূর্ববর্তী হাদীসের সূত্র দ্রষ্টব্য)

দলীল (২)ঃ ... عَنْ عَلِيٍّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَبَّرَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَالِكَ اِذَا قَضٰى قِرَائَتَهُ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ اِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ شَيْئٍ مِّنْ صَلٰوتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَاِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَالِكَ وَكَبَّرَ– (ابو داود ج١ ص١٠٩ باب من ذكر انه يرفع يديه الخ)

অর্থাৎ, ... হযরত আলী ইবন আবু তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন ফরয নামাযে দাঁড়াতেন, তখন তাকবীর বলে স্বীয় হস্তদ্বয় কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন এবং কিরআত শেষ করার পর রুকুতে গমনকালে এবং রুকু হতে উঠবার সময় অনুরূপ করতেন। তিনি বসে নামায পড়াকালে এরূপ হাত

তুলতেন না। তিনি যখন সিজদার পর দণ্ডায়মান হতেন তখন হাত উঠিয়ে তাকবীর বলতেন। (পূর্বের হাদীসের সূত্র দ্রষ্টব্য)

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا كَبَّرَ وَاِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ حَتّٰى يَبْلُغَ بِهِمَا فُرُوْعَ اُذُنَيْهِ– (ابو داود ج١ ص١٠٩)

অর্থাৎ, ... হযরত মালিক ইবনুল হুয়ায়রিছ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-কে তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় হাত উঠাতে দেখেছি। আমি তাঁকে রুকুতে গমনকালে এবং রুকু হতে উঠার সময় স্বীয় হস্তদ্বয় কানের উপরিভাগ পর্যন্ত উঠাতে দেখেছি। (সূত্রঃ ঐ)

দলীল (৪)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। এছাড়া এ ব্যাপারে আরো অনেক হাদীস রয়েছে।

সুতরাং উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, রাফউল ইয়াদাইন সুন্নত। যা নবী করীম (সাঃ) থেকে প্রমাণিত।

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখঈ, আলকামা, যুফার (রহ.)-এর মতে এবং ইমাম মালিক (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী রাফউল ইয়াদাইন শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময় সুন্নত। আর রুকুর সময় যদিও জায়েয তবে এমনটি না করাই উত্তম। (تنظيم ج١ ص٢٩٢)

দলীল (১) ঃ ... عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ اَلَا اُصَلِّيْ بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَلّٰى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلَّا مَرَّةً– (ابو داود ج١ ص١٠٩. باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، ترمذي ج١ ص٥٩، نسائي ج١ ص١٦١/١٥٨)

অর্থাৎ, ... আলকামা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামায সম্পর্কে শিক্ষা দেব না? রাবী বলেন, অতঃপর তিনি নামায আদায়কালে মাত্র একবার হাত উত্তোলন করেন।

দলীল (২)ঃ ... عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ اِلٰى قَرِيْبٍ مِّنْ اُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ– (ابو داود ج١ ص١٠٩)

অর্থাৎ, ... হযরত বারাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামায আরম্ভের সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কেবলমাত্র একবার কান পর্যন্ত হাত উঠাতেন। এরপরে তিনি আর হাত উঠাতেন না।

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ رَافِعُوْا اَيْدِيْهِمْ فَقَالَ مَالِيْ اَرَاكُمْ رَافِعِيْ اَيْدِيْكُمْ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اُسْكُنُوْا فِيْ الصَّلٰوةِ– (ابو داود ج١ ص١٤٣ باب في السلام، مسلم ج١ ص١٨١ باب الامر بالسكون في الصلوة الخ، نسائي ج١ ص١٧٦ باب السلام بالايدي في الصلوة)

অর্থাৎ, ... হযরত জাবির ইবন সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের নিকট এমন সময় আগমন করেন, যখন লোকেরা নামাযের মধ্যে তাদের হাত উপরের দিকে উঠিয়ে ছিল। এতদ্দর্শনে নবী করীম (সাঃ) বলেন, আমি এটা কী দেখছি? মনে হয়, যেন তোমরা তোমাদের হস্তদ্বয়কে ঘোড়ার লেজের মত মশা-মাছি বিতাড়নের জন্য আন্দোলিত করছ? তোমরা নামাযের মধ্যে শান্ত থাকবে।

দলীল (৪)ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) যিনি রাফউল ইয়াদাইন সংক্রান্ত হাদীসের রাবী। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে-

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلاَّ فِيْ التَّكْبِيْرَاتِ الْاُوْلٰى مِنَ الصَّلٰوةِ– (طحاوي ج١ ص١١٠، مصنف ابن ابي شيبة ج١ ص٢٣٦، مصنف عبد الرزاق ج٢ ص٧١)

অর্থাৎ, ... মুজাহিদ বলেন, আমি ইবন উমর (রাঃ)-এর পিছনে নামায পড়েছি। তিনি কেবল নামাযে প্রথম তাকবীরের সময়ই হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন। অন্য কোথাও নয়।

সুতরাং, রাবী নিজের বর্ণিত হাদীসের বিপরীত আমল করাতে একথাই বুঝা যায় যে, প্রথম রেওয়ায়েত রহিত হয়ে গেছে।

দলীল (৫)ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস-

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرْفَعُ الاَيْدِيْ فِيْ سَبْعَةِ مَوَاطِنَ اِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ اِسْتِقْبَالَ الْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَالْمَوْقِفَيْنِ وَعِنْدَ الْحَجَرِ– (مجمع الزوائد ج٢ ص١٠٣، مصنف ابن ابي شيبة ج١ ص٢٣٦–٢٣٧)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণিত। সাত জায়গায় হাত উত্তোলন করা হবে- নামাযের শুরুতে, বায়তুল্লাহ শরীফ সামনে রেখে, সাফা-মারওয়ায়, দুই মাওকিফ সামনে রেখে এবং হজরে আসওয়াদের সামনে।

এই সাত জায়গার মধ্যে নামাযের শুরুতে তাকবীরের উল্লেখ রয়েছে; কিন্তু রুকু এবং রুকু থেকে উঠার ক্ষেত্রে কোন উল্লেখ নেই। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) প্রমাণ করেছেন যে, এই হাদীসটি প্রমাণযোগ্য। (نيل الفرقدين ص١١٩)

জবাবঃ (১) শাফেঈ ও হাম্বলীগণ রাফউল ইয়াদাইনের সুন্নত বা উত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য দলীলের সাথে সবচেয়ে বড় ও গ্রহণযোগ্য যে দলীলটি পেশ করেন, তাহল হযরত উমর (রাঃ)-এর হাদীস। আসলে এ হাদীসটি স্বয়ং রাবীর বিপরীতধর্মী আমলের কারণে তা রহিত হয়ে গেছে। কেননা, ইবন উমর (রাঃ)-এর একান্ত শাগরিদ মুজাহিদ বলেন, আমি দশ বছর যাবত ইবন উমর (রাঃ)-এর পিছনে নামায পড়েছি, কিন্তু তিনি তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য কোথাও রাফউল ইয়াদাইন করতেন না। (درس مشكٰوة ج٢ ص٦٥)

(২) যদিও উক্ত হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধতম। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রেষ্ঠত্বের উক্তির জন্য এ হাদীসটিকে হানাফীগণ এজন্য প্রাধান্য দেন না যে, হাত উত্তোলনের ব্যাপারে ইবন উমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত এতটাই পরস্পরবিরোধী যে, এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়া খুবই জটিল। কেননা, এ ব্যাপারে ছয় ধরনের রেওয়ায়েত রয়েছে। যথা-

১. কোনটিতে শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময়।

২. কোনটিতে শুধু তাকবীরে তাহরীমা ও রুকু হতে উঠার সময়।

৩. কোনটিতে তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হতে উঠার সময়।

৪. কোনটিতে তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু হতে উঠার সময় এবং প্রথম বৈঠক থেকে উঠার সময়।

৫. কোনটিতে উল্লিখিত চারটি সময় ও সিজদায় যাওয়ার সময়।

৬. এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে প্রত্যেক রুকু, কিয়াম, বৈঠক, সিজদা, দুই সিজদার মাঝখানে রাফউল ইয়াদাইনের কথা উল্লেখ রয়েছে।

(شرح معاني الآثار ج١ ص١١٠، مؤطا امام مالك ص٥٩، بخاري ج١ ص١٠٢، معارف السنن ج٢ ص٤٧٤)

শাফেঈগণ এসব রেওয়ায়েতের মধ্য থেকে তৃতীয়টির উপর আমল করতে গিয়ে শুধু একটি পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। আর অবশিষ্টগুলো ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ অন্য রেওয়ায়েতগুলোও প্রমাণযোগ্য। সহীহ অথবা ন্যূনতম পক্ষে হাসান সনদে প্রমাণিত। অতএব, হানাফীগণ যদি এগুলোর মধ্য থেকে প্রথম প্রকার রেওয়ায়েতটিকে গ্রহণ

করে কোন এক পদ্ধতি গ্রহণ করে, তবে শুধু তাদের উপরেই প্রশ্ন কেন? অথচ, হানাফীদের নিকট প্রথম রেওয়ায়েতটি অবলম্বন করার যৌক্তিক কারণও আছে, যদ্বারা অন্য রেওয়ায়েতগুলোরও ব্যাখ্যা হয়ে যায়। আর তা হচ্ছে নামাযের আমলগুলোতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, নামাযের আহ্‌কাম নড়াচড়া থেকে স্থিরতার দিকে পরিবর্তিত হয়ে আসছে। যেমন, প্রথমে নামাযে কথাবার্তা বলা জায়েয ছিল, অতঃপর তা রহিত হয়ে যায়। প্রথমে আমলে কাসীর নামায ভঙ্গের কারণ ছিল না, অতঃপর ইহাকে নামায ভঙ্গের কারণ সাব্যস্ত করা হয়। প্রথমে এদিক-সেদিক তাকানো জায়েয ছিল, অতঃপর এটাকে বাতিল করে দেয়া হয়, এতে বোঝা যায় যে, প্রথম দিকে প্রচুর পরিমাণ হাত উত্তোলন হত এবং প্রতিটি অবস্থান্তরকালে তা বৈধ ছিল। অতঃপর তা হ্রাস করা হয় এবং শুধু পাঁচটি স্থানে বিধিবদ্ধ থেকে যায়। এরপর আরো হ্রাস করা হয় এবং চারটি স্থানে বিধিবদ্ধ থেকে যায়। এমনিভাবে হ্রাস করতে করতে শুধুমাত্র প্রথম তাকবীরের সময় হাত উঠানোর বিধান অবশিষ্ট থেকে যায়।

হানাফীগণ যেহেতু হাত তোলার বিষয়টিকে প্রমাণিত বলে স্বীকার করেন, সেহেতু তারা হাত তোলার রেওয়ায়েতগুলোর কোন সমালোচনা করেন না। অতএব, হাত তোলার ব্যাপারে হানাফীদের পক্ষ থেকে আলোচনার উদ্দেশ্য এটা প্রমাণ করা নয় যে, হাত তোলা নাজায়েয, অথবা এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং উদ্দেশ্য হল, শুধু এতটুকু প্রমাণ করা যে, হাত না তোলার বিষয়টিও কুরআন, হাদীস, আছার দ্বারা প্রমাণিত এবং এই পদ্ধতিটিই প্রধান ও উত্তম। যেমন-

(১) আল্লাহ তাআলার বাণী- وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ অর্থাৎ, আর আল্লাহর সামনে তোমরা একান্ত আনুগত্যের সাথে (নামাযে) দণ্ডায়মান হও। (বাকারাঃ ২৩৮)

এই আয়াতের দাবী হল, নামাযে নড়াচড়া যেন সবচেয়ে কম হয়। অতএব, যেসব হাদীসে নড়াচড়া ন্যূনতম কম হওয়ার উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো এ আয়াতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

(২) হযরত ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে কোন এখতেলাফ নেই এবং এতে প্রশ্নোত্থাপন করারও সুযোগ নেই। কেননা, তার আমল ও বর্ণনার মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই।

(৩) হযরত ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতের সমস্ত রাবী ফকীহ। স্বয়ং ইবন মাসউদ (রাঃ) হাত উত্তোলন সংক্রান্ত সমস্ত রাবীদের তুলনায় বড় ফকীহ। আর হাদীসে মুসালসাল বিল ফুকাহা অন্যান্য হাদীসের তুলনায় প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

(৪) সর্বোপরি বলা যায় যে, হাদীসগুলোতে পারস্পরিক বিরোধের সময় সাহাবায়ে কিরামের আমল খুবই গুরুত্ববহ। তাই হানাফীগণ বলেন, আমরা যখন এ দিকটি লক্ষ্য করি তখন হযরত উমর, আলী ও ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর আমল দেখি হাত

উত্তোলন না করার। আর তাঁদের বিপরীতে যাঁদের থেকে হাত তোলা বর্ণিত আছে তাঁদের বেশির ভাগ কম বয়স্ক সাহাবী। যেমন হযরত ইবন উমর ও ইবন যুবাইর (রাঃ)। (درس ترمذي ج٢ ص٢٦-٤٣)

* তাই আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, হাত উঠানোর হাদীসগুলো অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির। কিন্তু হাত না তোলার হাদীসগুলো আমলের দিক থেকে মুতাওয়াতির। (نيل الفرقدين ص١١٩)

* আল্লামা নীমভী (রহ.) বলেন, সাহাবা ও তৎপরবর্তীগণের মধ্যে এ বিষয়ে মতবিরোধ থাকলেও খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্যত্র হাত তোলা প্রমাণিত নেই। (اثار السنن ص١٠٤-١١١)

بَابُ مَنْ لَّمْ يَرَالْجَهْرَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ– ص١١٤
উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ না বলা

... عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ– (بخاري ج١ ص١٠٣ باب ما يقرأ بعد التكبير، مسلم ج١ ص١٧٢ باب حجة من لا يجهر بالبسملة، ترمذي ج١ ص٥٧ باب في افتتاح القرأة بالحمد لله الخ، نسائي ج١ ص١٤٤ ترك الجهر ببسم الله الخ)

অনুবাদঃ ... আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ), আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ) ও উসমান (রাঃ) "আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" হতে কেরাত পাঠ শুরু করতেন।

বিশ্লেষণঃ এখানে যে দুটি বিষয় এক সাথে আলোচনা করা হবে, তাহল- বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম কুরআনের অংশ কিনা এবং উচ্চস্বরে কেরাত বিশিষ্ট নামাযে উচ্চস্বরে পড়তে হবে, নাকি আস্তে- এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, সূরা নমলে ৩০ নং আয়াতে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর চিঠিতে যে বিসমিল্লাহ এসেছে তা কুরআন মাজীদের অংশ।

* ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, দু'সূরার মাঝখানে যে বিসমিল্লাহ রয়েছে, তা কুরআনের অংশ নয়; বরং ইহা দু'সূরাকে পৃথক করার জন্য নাযিল হয়েছে। অন্যান্য যিকিরের ন্যায় ইহাও একটি যিকির। কতক হাম্বলীর অভিমতও তাই। সুতরাং ইমাম মালিক (রহ.) যেহেতু ইহাকে কুরআনের অংশ হিসেবে স্বীকার করেন না, তাই

নামাযের মধ্যেও ইহা পড়ার কোন প্রশ্নই আসে না। তা আস্তে হোক অথবা জোরে হোক। তবে নফলে পড়ার অনুমতি রয়েছে।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। এখানে বিসমিল্লাহ পড়ার উল্লেখ নেই। এতে বুঝা যায় যে, বিসমিল্লাহ কুরআনের অংশ নয় এবং নামাযেও তা পড়তে হবে না।

দলীল (২)ঃ আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল (রাঃ)-এর হাদীস। তিনি তাঁর ছেলেকে নামাযে বিসমিল্লাহ পড়তে নিষেধ করেছেন এবং এটাকে বিদআত সাব্যস্ত করে বলেছেন-

وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا مِّنْهُمْ يَقُوْلُهَا فَلاَ تَقُلْهَا اِذَا اَنْتَ صَلَّيْتَ فَقُلْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ– (ترمذي ج١ ص٥٧ باب في ترك الجهر ببسم الله الخ)

অর্থাৎ, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ), আবু বকর, উমর ও উসমান (রাঃ)-এর সাথে নামায পড়েছি। কিন্তু তাঁদের কাউকে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলতে শুনিনি। অতএব, তুমি তা বলো না। তুমি যখন নামায পড় তখন বল, আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, বিসমিল্লাহ কুরআন মাজীদের অংশ। এমনকি তাঁর মতে, বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহার অংশ এবং প্রত্যেক সূরার অংশ। তাই জোরে কেরাত বিশিষ্ট নামাযে বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়া এবং আস্তে কিরআত বিশিষ্ট নামাযে বিসমিল্লাহ আস্তে পড়া সুন্নত।

দলীল (১)ঃ হযরত নুআইম আল-মুজমির-এর রেওয়ায়েত। তিনি বলেন-

صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ثُمَّ قَرَأَ بِاُمِّ الْقُرْآنِ الخ (نسائي ج١ ص١٤٤ قراءة بسم الله الخ)

অর্থাৎ, আমি আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-এর পিছনে নামায পড়েছি। তিনি পড়ছেন বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। অতঃপর তিনি সূরা ফাতিহা পড়েছেন।

দলীল (২)ঃ ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلٰوتَهُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ– (ترمذي ج١ ص٥٧ باب من رأى الجهر بسم الله الخ)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দ্বারা তাঁর নামায আরম্ভ করতেন।

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْزِلَتْ عَلَيَّ اٰنِفًا سُوْرَةٌ فَقَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ... حَتّٰى خَتَمَهَا الخ (ابو داود ج١ ص١١٤، نسائي ج١ ص١٤٣-١٤٤)

অর্থাৎ, ... আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, এখনই আমার উপর একটি সূরা নাযিল হয়েছে। অতঃপর তিনি পাঠ করেন, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, ইন্না আতায়না কাল-কাওসার ... তিনি সূরাটির শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করেন।

দলীল (৪)ঃ হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত-

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ– (نصب الراية ج١ ص٣٤٥)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম উচ্চস্বরে পড়তেন।

সুতরাং উল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরার অংশ এবং জোরে কিরাতবিশিষ্ট নামাযে বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে এবং আস্তে কিরাতবিশিষ্ট নামাযে বিসমিল্লাহ আস্তে পড়া সুন্নত।

* ইমাম আবু হানিফা ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, বিসমিল্লাহ কুরআনের অংশ, তবে এটি কোন বিশেষ সূরার অংশ নয়।
অবশ্য প্রত্যেক নামাযে "বিসমিল্লাহ" আস্তে পড়া উত্তম। জোরে কেরাতবিশিষ্ট নামাযে হোক অথবা আস্তে কেরাতবিশিষ্ট নামাযে হোক।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلٰوةَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الخ (ابو داود ج١ ص١١٤)

অর্থাৎ, ... হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকবীরে তাহরীমা বলে নামায আরম্ভ করতেন এবং আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন বলে কেরাত শুরু করতেন।

দলীল (৩)ঃ عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا مِّنْهُمْ يَقْرَأُ/وَفِيْ رِوَايَةِ نَسَائِي يَجْهَرُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ– (مسلم ج١ ص١٧٢، نسائي ج١ ص١٤٤)

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ), আবুবকর, উমর ও উসমান (রাঃ)-এর সাথে নামায পড়েছি। তাঁদের কাউকে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়তে শুনিনি। নাসায়ী রেওয়ায়েতে আছে, উচ্চস্বরে পড়তে শুনিনি।

দলীল (৪)ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত-

صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُسْمِعْنَا قِرَاءَةَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَصَلَّى بِنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمْ يُسْمِعْنَا مِنْهُمَا– (نسائي ج١ ص١٤٤)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের নামাযে ইমামতি করেছেন, তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম আমাদের শুনিয়ে পড়েননি। এমনিভাবে আবু বকর ও উমর (রাঃ) আমাদের ইমামতি করেছেন। তাঁরাও আমাদেরকে শুনিয়ে পড়েননি।

দলীল (৫)ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত-

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ سُوْرَةً مِنَ الْقُرْاٰنِ ثَلاثُوْنَ اٰيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ– (ترمذي ج٢ ص١٣٢ ابواب فضائل القرآن عن النبي صلعم في سورة الملك)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, কুরআনে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা রয়েছে। এটি এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করেছে। ফলে তাকে মাফ করে দেয়া হয়েছে। সূরাটি হচ্ছে- تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ–

আর সূরা মুলকের ৩০ আয়াত তখনই হয়, যখন বিসমিল্লাহকে এর অংশ হিসেবে গণ্য করা না হয়। নতুবা ৩১ আয়াত হয়ে যাবে।

দলীল (৬)ঃ পবিত্র কুরআনের আয়াত- وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ

অর্থাৎ, আমি আপনাকে ‘সাবই মাসানী’ তথা পুনরাবৃত সাত আয়াত এবং মহান কুরআন দান করেছি। (হিজরঃ ৮৭)

অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে ‘সাবই মাসানী’ দ্বারা সূরা ফাতিহা উদ্দেশ্য।

(ابو داود ج١ ص٢٠٥ باب فاتحة الكتاب)

কারণ এটি এরূপ সাতটি আয়াত দ্বারা গঠিত যেগুলো নামাযে বারবার তিলাওয়াত করা হয়। অতএব, সূরা ফাতিহার সাত আয়াত তখনই হয়, যখন বিসমিল্লাহকে সূরা ফাতিহার অংশ ধরা না হয়। নতুবা আটটি আয়াত হয়ে যাবে।
অতএব, উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ ও আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিসমিল্লাহ কুরআনের অংশ তবে তা সর্বাবস্থায় আস্তে পড়াই উত্তম।

জবাবঃ ইমাম মালিক (রহ.)-এর প্রথম দলীলের জবাব-

উল্লিখিত হাদীসে **يفتتحون القرأة** দ্বারা বিসমিল্লাহ না পড়া প্রমাণিত হয় না। কেননা এখানে কেরাত শুরুর উল্লেখ করা উদ্দেশ্য। আর ইহা তো জানা কথা যে, বিসমিল্লাহ কেরাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এর দ্বারা বিসমিল্লাহ না পড়ার দলীল প্রদান করা সঠিক নয়। তবে তা জোরে না পড়া বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল (রাঃ)-এর হাদীসটি সংক্ষিপ্ত। এটি বিশ্লেষণের দাবী রাখে। আসলে হাদীসটিতে জোরে পড়তে বারণ করা হয়েছে, কিন্তু বিসমিল্লাহ পড়া নিষেধ করা হয়নি। আর তাই জোরে পড়াকে আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফফাল স্বীয় পুত্রকে বিদআত বলেছেন। কেননা খোদ হাদীসেই এর প্রমাণ রয়েছে-

سَمِعَنِيْ اَبِيْ ... فَلَمْ أَسْمَعْ اَحَدًا مِّنْهُمْ– অর্থাৎ, 'আমার পিতা আমাকে নামাযে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলতে শুনেছেন। ... আমি তাঁদের কাউকে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলতে শুনিনি।'
সুতরাং হাদীসটি দ্বারা বুঝা যাচ্ছে তাঁরা জোরে পড়তেন না। অতএব, হাদীসের পরের অংশে বর্ণিত **فَلاَ تَقُلْهَا** তথা তুমি তা বলো না- এর অর্থ হচ্ছে **فَلاَ تَجْهَرْبِهَا** অর্থাৎ তুমি তা জোরে বলো না।

ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর দলীলসমূহের জবাবঃ ইমাম শাফেঈ (রহ.) থেকে যতগুলো রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে, মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে সবগুলো রেওয়ায়েত যঈফ, অস্পষ্ট এবং বিশ্লেষণের দাবি রাখে। সুতরাং এগুলো হানাফীদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সহীহ রেওয়ায়েতের মুকাবিলায় দলীলযোগ্য হতে পারে না। তাছাড়া তাঁর তৃতীয় দলীলের জবাব হল, নবী করীম (সাঃ) সূরা কাওসারে বিসমিল্লাহ পড়েছিলেন মূলত সূরার অংশ হিসেবে নয়; বরং তিনি বিসমিল্লাহ বলেছিলেন তিলাওয়াত শুরু করার জন্য।
আর চতুর্থ দলীল হিসেবে তিনি হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর বরাত দিয়ে যে দলীলটি পেশ করেছেন, তাও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, স্বয়ং ইবন আব্বাস (রাঃ) ইরশাদ করেন- **اَلْجَهْرُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قِرَاءَةُ الْاَعْرَابِ**

(شرح معاني الآثار ج١ ص١٠٠، مصنف ابن ابي شيبة ج١ ص٤١١)

অর্থাৎ, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম জোরে পড়া বেদুঈনদের কেরাত।

* অথবা, কখনো কখনো নবী করীম (সাঃ) তালীমের নিমিত্তে উচ্চস্বরে "বিসমিল্লাহ" পড়তেন।

* অথবা, যতগুলো হাদীস দ্বারা উচ্চস্বরে "বিসমিল্লাহ" পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, আসলে সবই ছিল জায়েয বর্ণনা করার জন্য। উত্তম বুঝানোর জন্য নয়।

(درس مشكوة ج٢ ص٦٠-٦٣، درس ترمذي ج١ ص٤٩٩-٥٠٨)

بَابُ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِيْ صَلٰوتِهِ ص١١٨

কোন ব্যক্তি নামাযে (সূরা ফাতিহা অথবা) কেরাত পাঠ ত্যাগ করলে

... عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُنَ خَلْفَ اِمَامِكُمْ قُلْنَا نَعَمْ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَفْعَلُوْا اِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَاِنَّهُ لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا- (ابو داود ج١ ص١١٩، بخاري ج١ ص١٠٤ باب وجوب القراءة الخ، مسلم ج١ ص١٦٩ باب وجوب قراءة الفاتحة الخ، ترمذي ج١ ص٦٩-٧٠ باب قراءة خلف الامام، نسائي ج١ ص١٤٥ ايجاب قراءة فاتحة الكتاب الخ، ابن ماجة ص٦٠)

অনুবাদঃ ... উবাদা ইবনুস সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে ফজরের নামাযের জামাআতে শরীক ছিলাম। নামাযে কুরআন পাঠের সময় তাঁর কেরাত পড়া কঠিন হয়ে পড়ে। নামায শেষে তিনি বলেন, সম্ভবতঃ তোমরা ইমামের পিছনে কেরাত পাঠ করেছ। আমরা বলি, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বলেন, তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু পড়বে না। কেননা, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়বে না, তার নামায হবে না।

বিশ্লেষণঃ এখানে দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হবে। যথা-
(ক) ইমামের পিছনে কেরাত পড়া (খ) নামাযে সূরা ফাতিহার হুকুম।

প্রথম আলোচনাঃ উল্লেখ্য যে, ইমামের পিছনে কেরাত পড়ার বিধান নিয়ে ইমামদের মাঝে বড় ধরনের মতভেদ রয়েছে। আর বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর বিধায় অনেক ফকীহ এ সম্পর্কিত আলোচনা এড়িয়ে যান। কারণ, ইমামগণের মাঝে যে হাজারো

মতবিরোধ রয়েছে, এগুলোর মধ্যে এটি একটি অন্যতম জটিল ও কঠিন বিষয়। ইমামগণের মধ্যে যে মতবিরোধ রয়েছে সেগুলোর অধিকাংশই হল সুন্নত, মুস্তাহাব, মুবাহ, উত্তম-অনুত্তম, অথবা মাকরূহ তানযীহী পর্যায়ের। সেগুলোর মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে যা হয়ত অনেকের জীবনে একবারও সম্মুখীন হতে হয় না বা সম্মুখীন হলেও তা হয়ত জীবনে দু'একবারের জন্য। কিন্তু ইমামের পিছনে কেরাত পড়ার বিষয়টি হল নামায নিয়ে- যা বালেগ হওয়ার পর থেকে প্রত্যেকটি সুস্থ-সবল মুসলিম পুরুষকে দৈনিক পাঁচবার আদায় করতে বাধ্য। তাছাড়া নবী করীম (সাঃ) জামাআতের যে তাগিদ দিয়েছেন তাতে একজন খাঁটি মুমিন কখনো ইমামের পিছনে জামাআত ছাড়া একাকী নামায আদায় করে পরিতৃপ্ত হতে পারে না। আর ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর অভিমত তো এই যে, জামাআতে নামায আদায় করা ফরযে আইন। যেহেতু নামাযের মধ্যে ইচ্ছাকৃত কেরাত তরক করা কারো মতে যেন ফরয তরক করা, তেমনিভাবে কেরাত পড়াও কারো কারো মতে হারাম। বস্তুত ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কেরাত পড়ার মত প্রাত্যহিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইমামগণের এমন বৈপরীত্যপূর্ণ মতামত খুবই দুঃখজনক।

সহীহ বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা কুস্তলানী (রহ.) বলেন, "আমি জীবনে কখনো মুক্তাদী হয়ে নামায পড়িনি। কেননা যদি কেরাত পড়ি, তাহলে এক ইমামের মতে আমি হারাম সম্পাদনকারী হিসেবে গণ্য হব। পক্ষান্তরে যদি কেরাত না পড়ি তাহলে অন্য ইমামের দৃষ্টিতে ফরয তরককারী হিসেবে গণ্য হব।" (درس مشكوة ج٢ ص٧٢)

যাই হোক, যুগে যুগে এ বিষয়ের উপর উভয় পক্ষ থেকে এত গ্রন্থ রচিত হয়েছে যে, যা একত্র করলে একটি পূর্ণ গ্রন্থাগার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন প্রসিদ্ধ কয়েকটি কিতাব হল ইমাম বুখারী (রহ.) রচিত "জুযউল কেরাত খলফাল ইমাম", বায়হাকী রচিত "কিতাবুল কেরাত", আল্লামা আব্দুল হাই লখনভী রচিত "ইমামুল কালাম ফিল কিরাআতি খলফাল ইমাম", আল্লামা কাসিম নানুতভী রচিত "আদ-দালীলুল মুহকাম ফী তরকিল কিরাআতি লিল মুতাম", আল্লামা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রচিত "হিদায়াতুল মুতাদী ফী কিরাআতিল মুকতাদী", আল্লামা কাশ্মীরী (রহ.) রচিত "ফসলুল খিতাব ফী মাসআলাতি উম্মিল কিতাব", আল্লামা সরফরাজ খান সফদার রচিত "আহসানুল কালাম ফী তরকিল কিরাআতি খলফাল ইমাম" ইত্যাদি।

(درس ترمذي ج٢ ص٧١-٧٢)

মাযহাবসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

* ইমাম মালিক ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, জোরে কেরাত বিশিষ্ট নামাযগুলোতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব নয়। তবে তাঁদের কোন কোন রেওয়ায়েতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া মাকরূহ, কোনটিতে জায়েয

এবং কোনটিতে মুস্তাহাব সাব্যস্ত করা হয়েছে। আবার আস্তে কেরাত বিশিষ্ট নামাযগুলো সম্পর্কে তাঁদের থেকে তিনটি রেওয়ায়েত রয়েছে। যথা- (১) ওয়াজিব, (২) মুস্তাহাব, (৩) মুবাহ বা অনুমোদিত। (المغني ج١ ص٦٠٩)

দলীলঃ ... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْصَرَفَ مِنْ صَلٰوةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَد مِّنْكُمْ اٰنِفًا فَقَالَ رَجُل نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اِنِّيْ اَقُوْلُ مَالِيْ اُنَازَعُ الْقُرْآنَ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا جَهَرَ فِيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلٰوةِ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– (ابو داود ج١ ص١٢٠ باب من رأى القراءة الخ، ترمذي ج١ ص٧١ باب في ترك القراءة خلف الامام الخ، نسائي ج١ ص١٤٦، ابن ماجة ص٦١)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উচ্চস্বরে কেরাত পাঠের মাধ্যমে নামায আদায়ের পর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কেউ এখন আমার সাথে (নামাযের মধ্যে) কেরাত পাঠ করেছ কি? জবাবে এক ব্যক্তি বলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তখন নবী করীম (সাঃ) বললেন, এজন্যই বলি, কি ব্যাপারে আমার সাথে কুরআন নিয়ে ঝগড়া করা হচ্ছে?
রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে এরূপ শোনার পর সাহাবায়ে কিরাম উচ্চস্বরে কেরাতবিশিষ্ট নামাযে তাঁর পিছনে কেরাত পাঠ করা থেকে বিরত থাকেন।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, প্রত্যেক নামাযেই ইমামের পিছনে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব তথা ফরয। উচ্চস্বর কেরাত বিশিষ্ট নামায হোক বা আস্তে কেরাত বিশিষ্ট নামায হোক। (فتح الملهم ج٢ ص٢٠)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى صَلٰوةً لَّمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاج فَهِيَ خِدَاج غَيْرُ تَمَام– قَالَ فَقُلْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اِنِّيْ اَكُوْنُ اَحْيَانًا وَّرَاءَ الاِمَامِ قَالَ فَغَمَزَ ذِرَاعِيْ وَقَالَ اِقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِيْ نَفْسِكَ الخ (ابو داود ج١ ص١١٩، مسلم ج١ ص١٧٠، ترمذي ج١ ص٧١ باب في ترك القراءة الخ، نسائي ج١ ص١٤٤، ابن ماجة ص٦١)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তার নামায ক্রটিপূর্ণ, তার নামায ক্রটিপূর্ণ, তার নামায ত্রটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ। রাবী বলেন, পরবর্তীকালে আমি আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি যে, আমি যখন ইমামের পিছনে থাকি, তখন সূরা ফাতিহা পাঠ করব কি? তিনি আমার বাহু চাপ দিয়ে বলেন, হে ফারসী! তখন তুমি তোমার মনে মনে তা পাঠ করবে।

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُخْرُجْ فَنَادِ فِيْ الْمَدِيْنَةِ اَنَّهُ لاَ صَلٰوةَ اِلاَّ بِقُرْاٰنٍ وَّلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ-

(ابو داود ج١ ص١١٨)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) আমাকে নির্দেশ দেনঃ তুমি মদীনার রাস্তায় বের হয়ে ঘোষণা দাও যে, কুরআন পাঠ ব্যতীত নামাযই শুদ্ধ হয় না; অন্তত সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে সংক্ষিপ্ত কোন সূরা বা আয়াত অবশ্যই মিলাতে হবে।

সুতরাং উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমামের পিছনে কেরাত তথা সূরা ফাতিহা অবশ্যই পড়তে হবে। (এছাড়াও শাফেঈদের আরো অনেক দলীল রয়েছে।)

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন ও জমহুর সাহাবাগণের মাযহাব হল, মুকতাদী কোন নামাযেই ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা বা অন্য কোন কিরআত পড়বে না, উচ্চস্বরে কেরাত বিশিষ্ট নামায হোক বা আস্তে কেরাত বিশিষ্ট নামায হোক। ইমামের পিছনে কেরাত পড়া সর্বাবস্থায় মাকরূহ তাহরিমী।

(فتح الملهم ج٢ ص٢٠، تعليق الصبيح ج١ ص٣٦٢).

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ-

অর্থাৎ, আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগের সাথে শোন এবং তোমরা নিশ্চুপ থাক। যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। (আল-আরাফঃ ২০৪)

সুতরাং উক্ত আয়াতে দুটি হুকুম দেয়া হয়েছে। একটি কুরআন শোনার, অপরটি নীরবতার। সুতরাং সশব্দে কেরাত বিশিষ্ট নামাযে কুরআন শ্রবণ করবে এবং আস্তে কেরাত বিশিষ্ট নামাযে মুক্তাদী নীরব থাকবে। আর সূরা ফাতিহা যে কুরআন এটা সর্বসম্মত বিষয়। অতএব, এর দ্বারা ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠও নিষিদ্ধ বুঝা যায়।

* কেউ কেউ উক্ত আয়াতে প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, এই আয়াতটি নামায সম্পর্কে নয়; বরং জুমআর খুতবা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ, যখন ইমাম খুতবা পাঠ করেন, যাতে কুরআনের আয়াতও বিদ্যমান থাকে, তখন তোমরা নীরব থাক। কিন্তু এই প্রশ্ন উত্থাপন যথাযথ নয়। কেননা, (১) ইমাম বায়হাকী হযরত মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ)-এর যামানায় কোন কোন সাহাবী ইমামের পিছনে কেরাত পড়তেন। তখন উক্ত আয়াত নাযিল হয়। (كتاب القراءة ص٨٧)

(২) উক্ত আয়াতটি মক্কী, আর জুমআর নামাযের প্রবর্তন হয় মদীনায়।
(৩) আয়াতে কুরআন তেলাওয়াতের কথা উল্লেখ রয়েছে। অথচ খুতবাতে সম্পূর্ণটুকু কুরআনের আয়াত হয় না। পক্ষান্তরে নামাযের কেরাত সম্পূর্ণ কুরআন।
সুতরাং, অবশেষে আল্লামা ইবন জারীর ও সুয়ূতী (রহ.) বলেন, এ ব্যাপারে সমস্ত মুসলমানের ঐকমত্য রয়েছে যে, এ আয়াতের অর্থে নামায অন্তর্ভুক্ত।

(درس ترمذي ج٢ ص٨٨، روح المعاني ج٥ ص١٥٠، اعلاء السنن ج٤ ص٤٣)

অতএব, হানাফীদের দলীলের জন্য একটি আয়াতই যথেষ্ট। এর মুকাবিলায় যত হাদীস পেশ করা হবে সবগুলোকে এই আয়াতের আওতায় ব্যাখ্যা করা হবে।

দলীল (২)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّايَتَكَلَّمُوْنَ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا–

অর্থাৎ, যেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সত্য কথা বলবে। (নাবাঃ ৩৮)
উক্ত আয়াতে লক্ষণীয় বিষয় হল, আমাদের নামাযের সারিসমূহকে আল্লাহর নিকট ফেরেশতাদের সারিসমূহের সাথে তুলনা দেয়া যায়। যেভাবে ফেরেশতাদের সারিসমূহের মধ্য থেকে আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত অন্য কেউ কোন কিছু বলতে পারবে না। অনুরূপভাবে, নামাযেও আল্লাহর সাথে কিছু বলার অনুমতি নেই, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত আল্লাহ তাআলা যাকে অনুমতি দিয়েছেন। আর তিনি হলেন ইমাম। সুতরাং কেরাত একমাত্র ইমামেরই হক। অন্য কারো নয়। (درس مشكوة ج٢ ص٧٤)

দলীল (৩)ঃ আল্লামা কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, পবিত্র কুরআনে আয়াত এসেছে-
وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰى اِمَامًا وَّرَحْمَةً– অর্থাৎ, এর পূর্বে মূসার কিতাব ছিল পথ প্রদর্শক ও রহমতস্বরূপ। (আহকাফঃ ১২)

উক্ত আয়াতে হযরত মূসা (আঃ)-এর কিতাবকে ইমাম বলা হয়েছে। সুতরাং আমাদের জন্য ইমাম হবে পবিত্র কুরআনুল কারীম। আর প্রকৃত সামঞ্জস্য তো এই যে, ইমাম (কুরআন)-কে ইমামের নিকটই রাখা চাই। (درس مشكوة ج٢ ص٧٤)

দলীল (৪)ঃ হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে-

...عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الاِمَامُ جُعِلَ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا– (ابو داود ج١ ص٨٩ باب الامام يصلي من تعود، نسائي ج١ ص١٤٦ تاويل قوله واذا قرئ القرآن الخ، ابن ماجة ص٦١)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, ইমামকে এজন্যই নিযুক্ত করা হয়েছে, যেন তার অনুসরণ করা হয়। অতএব, ইমাম যখন তাকবীর বলে, তখন তোমরাও তাকবীর বল। আর ইমাম যখন কেরাত পড়ে, তখন তোমরা চুপ থাক।

উক্ত হাদীসে ইমামের কেরাতের সময় শর্তহীনভাবে নীরবতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যা সূরা ফাতিহা ও অন্য কেরাত উভয়টির জন্য ব্যাপক। এই দুটির মাঝে পার্থক্য করা কোন ক্রমেই জায়েয নয়। কেননা, উক্ত হাদীসে নবী করীম (সাঃ) এক একটি আমল খুলে খুলে বাতলে দিয়েছেন। যদি ফাতিহা ও সূরা পাঠের হুকুমে কোন পার্থক্য হত, তাহলে তিনি অবশ্যই তা বর্ণনা করতেন।

দলীল (৫)ঃ ইমাম মালিকের পক্ষে দলীল হিসেবে পূর্বে বর্ণিত হাদীস।

উক্ত হাদীসে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে একথা বুঝা যায় যে, উক্ত হাদীসে এমন কিছু দলীল ও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যদ্দরুণ ইমামের পিছনে কিরআত না পড়ার কথা প্রমাণিত হয়। যেমন-

(১) যখন নামাযান্তে নবী করীম (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের মধ্যে কি কেউ কেরাত পড়েছে?" এতে বুঝা যায় যে, নবী করীম (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে ইমামের পিছনে কেরাত পড়ার হুকুম ছিল না, নতুবা তিনি (সাঃ) এরূপ প্রশ্ন করতেন না।

(২) যদি ইমামের পিছনে কেরাত পড়ার হুকুম থাকত, তাহলে তো সবাই বলতেন যে, জি হুজুর! আমরা কেরাত পড়েছি, শুধু এক ব্যক্তি বলতেন না।

(৩) নবী করীম (সাঃ) তাঁর পিছনে কেরাত পড়াকে বাদানুবাদ (منازعت) সাব্যস্ত করেছেন। আর বাদানুবাদ হয় যখন অন্যের হকে অংশ নেয়ার চেষ্টা করা হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, কেরাত ইমামেরই হক, মুক্তাদীর হক নয়।

(৪) কিছু সাহাবী এমন ছিলেন, যাঁরা এই ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত ইমামের পিছনে কেরাত পড়তেন। এই ঘটনার পর আর কেউ ইমামের পিছনে কেরাত পড়তেন না। যা উক্ত

হাদীসের শেষে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) উল্লেখ করেছেন। অতএব, প্রমাণিত হল যে, ইমামের পিছনে কেরাত পড়া জায়েয নয়।

দলীল (৬)ঃ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الاِمَامِ لَهُ قِرَأَةٌ– (ابن ماجة ص٦١، مؤطا امام محمد ص٩٨، مصنف ابن ابي شيبة ج١ ص٣٧٦، شرح معاني الاثار ج١ ص١٠٦، بيهقي سنن كبرى ج٢ ص١٦٠، دار قطني ج١ ص٣٢٣)

অর্থাৎ, হযরত জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যার ইমাম আছে, ইমামের কেরাতই তার কেরাত।

আল্লামা আলুসী (রহ.) বলেন, বিশুদ্ধ সূত্রে এ হাদীসটি মারফূ। (روح المعاني ج٥ ص١٥١)

সুতরাং উক্ত হাদীসটিও হানাফীদের অভিমতের জন্য একটি স্পষ্ট দলীল। কেননা, এখানে একটি ব্যাপক মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে যে, ইমামের কেরাত মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। অতএব, মুক্তাদীর কেরাতের প্রয়োজন নেই। অতঃপর এই হাদীসে ব্যাপক কেরাতের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে, যা সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।

দলীল (৭)ঃ ... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَمَّنَ الاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّهُ مَنْ وَّافَقَ تَاْمِيْنُهُ تَاْمِيْنَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ– (ابو داود ج١ ص١٣٤ باب التامين وراء الامام، بخاري ج١ ص١٠٨ باب جهر الماموم بالتامين، مسلم ج١ ص١٧٦ باب التسميع والتحميد والتامين، ترمذي ج١ ص٥٨ باب فضل التامين، نسائي ج١ ص١٤٧ جهر الامام بأمين، ابن ماجة ص٦١)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, যখন ইমাম আমীন বলবে, তখন তোমরাও আমীন বলবে। কেননা, যে ব্যক্তির আমীন শব্দ ফেরেশতার আমীন শব্দের সাথে মিলবে তার পূর্ব জীবনের সমস্ত গোনাহ মার্জিত হবে। হাফেয ইবন আব্দুল বার্ (রহ.) ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কেরাত না পড়ার দলীল এভাবে প্রমাণ করেছেন যে, উক্ত হাদীসে মুক্তাদীকে আমীন বলার ব্যাপারে ইমামের অনুসরণ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। সুতরাং মুক্তাদীকে ইমামের ফাতিহা শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর অপেক্ষাকারী হবে চুপ থেকে শ্রবণকারী।

* আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) এই হাদীস দ্বারা এভাবে দলীল পেশ করেছেন যে, যদি কোন মুক্তাদী ফাতিহার মাঝখানে এসে জামাআতে শরীক হয়, এমতাবস্থায় ইমাম যখন সূরা ফাতিহা শেষ করবে তখন তো সে ব্যক্তি স্বীয়

ফাতিহার মাঝখানে আমীন বলতে হবে। যা কখনো যুক্তিসঙ্গত নয়। পক্ষান্তরে, ঐ ব্যক্তি যদি নিজের ফাতিহা শেষ করে আমীন বলে, তাহলে তা হবে উল্লিখিত হাদীসের বিপরীত। কেননা তথায় ইমামের আমীনের সাথে আমীন বলার কথা বলা হয়েছে। (درس مشکوٰۃ ج۲ ص۷۵)

সুতরাং, উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা গেল যে, মুক্তাদীর ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা বা অন্য সূরা পড়া জায়েয নয়।

ইজমাঃ ইমামের পিছনে কেরাত না পড়ার ব্যাপারে অনেক সাহাবীর অভিমত ও রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। আল্লামা আইনী (রহ.) উমদাতুল কারীতে ইমামের পিছনে কেরাত পরিহারের মাযহাব ৮০ জন সাহাবী থেকে প্রমাণিত আছে বলে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে অনেক সাহাবী এ ব্যাপারে খুবই কঠোর ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। (مصنف عبد الرزاق ج۲ ص۱۳۹)

ইবন মাসউদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বলে যে, ইমামের পিছনে কেরাত পড়তে হবে, এমন ব্যক্তির মুখে মাটি নিক্ষেপ করা উচিত। (مجمع الزوائد ج۲ ص۱۱۰-۱۱۱)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, এমন ব্যক্তি ফিতরতের উপর নেই। (সূত্রঃ ঐ)

হযরত সাআদ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন, এমন ব্যক্তির মুখে আগুনের টুকরো ঢেলে দেয়া উচিত। (مؤطا امام محمد ص۱۰۱-۱۰۲)

হযরত ইবন উমর (রাঃ) বলেন, এমন ব্যক্তি বেওকুফ।

এছাড়া যায়েদ ইবন সাবিত, জাবির ইবন আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণও ইমামের পিছনে কেরাত পড়ার বিপক্ষে অভিমত পোষণ করতেন। (شرح معاني الآثار ج۱ ص۱۰۸، مؤطا امام مالك ص٦٦)

আকলী দলীলঃ কিয়াস তো এই যে, ইমাম কওমের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি। মুক্তাদীগণের পক্ষ থেকে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে দরখাস্ত পেশ করবেন। কিন্তু রুকূ ও সিজদা এর বিপরীত। কেননা এগুলো হল নামাযের আদবসমূহ। এগুলোর উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তাআলার তাজীম করা, যা সবারই আদায় করা উচিত। আর কেরাত হল দরখাস্ত। যা সবার পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি সেজে আল্লাহর নিকট পেশ করবেন। আর তিনি হলেন ইমাম। যদি সবাই একই কথা একই সাথে বলে, তাহলে সেটা হবে বেয়াদবী। তাই কিয়াসেরও দাবী হল এই যে, কেরাত শুধু ইমাম পড়বেন, আর মুক্তাদী তা মনোযোগ সহকারে শুনবে বা চুপ থাকবে। (درس مشکوٰۃ ج۲ ص۷۵، تنظیم ج۱ ص۳۲۳، فتح الملهم ج۲ ص٢٤)

হানাফীদের পক্ষ থেকে ইমাম শাফেঈ (রহ.) কর্তৃক প্রদত্ত প্রথম দলীলের জবাবঃ

(১) যদিও শাফেঈদের নিকট উক্ত হাদীসটি নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী, কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিস উক্ত হাদীসটিকে সনদ ও মতনের দিক দিয়ে অসঙ্গতিপূর্ণ (ইযতিরাব) বলেছেন। ইমাম আহমদ ইবন হাব্বান, হাফেয ইবন আব্দুল বার, ইবন তাইমিয়াহ উক্ত হাদীসটিকে মালূল বা ত্রুটিযুক্ত বলেছেন।

(فتاوی ابن تيمية ج۲ ص۱۷۸، معارف السنن ج۳ ص۲۰۳-۲۰۵)

কেননা, উক্ত হাদীসের কোন কোন সনদ এভাবেও বর্ণিত হয়েছে-

عن مكحول عن عبادة ابن الصامت (دار قطني ج۱ ص۳۱۹)

আর মাকহূল সর্বসম্মতিক্রমে উবাদা (রাঃ) থেকে শ্রবণ করেননি।
কোন রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে-

عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع عن عبادة- (ابو داود ج۱ ص۱۱۹)

কোন কোন সূত্রে বর্ণিত আছে-

مكحول عن محمود ابي نعيم انه سمع عبادة- (دار قطني ج۱ ص۳۱۹)

এমনিভাবে সনদের অসঙ্গতির সাথে মাকহুল থেকে বিভিন্ন কিতাবে আটটি প্রকার বর্ণিত আছে। সুতরাং এতো অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও হাদীসটি কিভাবে দলীলযোগ্য হতে পারে? তাই অনেকেই মনে করেন, মাকহূল দু'তিনটি রেওয়ায়েত মিলিয়ে একটি স্বতন্ত্র রেওয়ায়েত বানিয়ে ফেলেছেন। অথবা, রেওয়ায়েতে তাঁর ভুল হয়ে গেছে। (فتاوی ابن تيمية ج۲ ص۱۷۸)

(২) যদি এ হাদীসটিকে সহীহও মেনে নেয়া হয়, তবুও এর দ্বারা শাফেঈদের প্রমাণ যথার্থ হতে পারে না। কারণ, হাদীসে সূরা ফাতিহা ও কেরাত ছাড়া নামায শুদ্ধ না হওয়ার যে হুকুম এসেছে, তা মূলত ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর (منفرد) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, মুক্তাদীর ক্ষেত্রে নয়। স্বয়ং ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর উস্তাদ সুফিয়ান (রহ.) এ ব্যাপারে বলেন- ... لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ- (ابو داود ص۱۱۹)

অর্থাৎ, এই নির্দেশ কেবলমাত্র একাকী নামায আদায়কারীর বেলায় প্রযোজ্য।

(৩) হতে পারে যে, হাদীসে কেরাতের দ্বারা উদ্দেশ্য ব্যাপক। প্রকৃতভাবেও হতে পারে (যেমন ইমাম ও মুনফারিদের কেরাত) বা হুকুমের দিক দিয়েও হতে পারে। আর উক্ত হাদীসের ক্ষেত্রে আমরা (হানাফীগণ) মুক্তাদীকে পাঠকারী বলে গণ্য করতে পারি।

যেমন হযরত জাবির (রাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

قَوْلُه عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَأَةُ الْاِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ–

(৪) উবাদা ইবনুস সামিত (রাঃ) হতেই বর্ণিত। অন্য একটি হাদীসে উল্লেখ আছে-

... قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا– (ابو داود ج١ ص١١٩، بخاري ج١ ص١٠٤ باب وجوب القراءة الخ، مسلم ج١ ص١٦٩، نسائي ج١ ص١٤٥)

অর্থাৎ, ... নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে অতিরিক্ত আয়াত পাঠ না করবে, তার নামায পূর্ণাঙ্গ হবে না।

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, সূরা ফাতিহার যে হুকুম, ঠিক সূরা মিলানোর একই হুকুম। অথচ ইমাম শাফেঈ (রহ.) মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানোর প্রবক্তা নন। তাই আমরা (আহনাফগণ) বলব, সূরা মিলানোর ক্ষেত্রে আপনাদের যে উত্তর, সূরা ফাতেহা পড়ার ক্ষেত্রেও আমাদের সেই একই জবাব।

(فتح الملهم ج٢ ص٢٠، تعليق الصبيح ج١ ص٣٦٢)

(৫) হযরত উবাদাহ (রাঃ) থেকে এভাবেও হাদীস বর্ণিত আছে-

... قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَفْعَلُوْا اِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ– (ابو داود ج١ ص١١٩)

অর্থাৎ, ... নবী করীম (সাঃ) বলেন, তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু পাঠ করবে না।

আল্লামা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন, উক্ত হাদীসে নাহী (নিষেধ) থেকে ইসতিসনা (ব্যতিক্রমভুক্তি) করা হয়েছে। আর যখন নাহী থেকে ইসতিসনা করা হয়, তখন মুসতাসনার (যা ব্যতিক্রম করা হয়েছে) বৈধতা প্রমাণিত হয়, আবশ্যকতা বা ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। (درس ترمذي ج٢ ص٧٨)

তাই উক্ত হাদীসের পর কিছু সংখ্যক সাহাবী সূরা ফাতিহা পড়তেন। পরে যখন নবী করীম (সাঃ) একে বাদানুবাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন, এরপর থেকে সাহাবীগণ তা আর করতেন না।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ (১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীসের দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশে বলা হয়েছে যে, সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায অসম্পূর্ণ। উক্ত হুকুমটি অন্যান্য দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, ইহা ইমাম এবং একাকী নামায আদায়কারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আর দ্বিতীয় অংশে যে মনে মনে পড়ার কথা বলা হয়েছে, প্রথমত তো এটা আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর নিজস্ব ইজতিহাদ। যা মারফূ হাদীসের বিপরীতে প্রমাণযোগ্য

নয়। দ্বিতীয়ত, উক্ত অংশটির অর্থ এও হতে পারে যে, উচ্চারণ ব্যতীত মনে মনে সূরা ফাতিহা পড়বে অথবা فِيْ نَفْسِكَ শব্দটি এখানে "একাকী" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং اِقْرَأْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ এর অর্থ হল- যখন তুমি নামায একাকী পড়বে। যেমন হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ রয়েছে-

فَمَنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ وَمَنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ– (بخاري ج٢ ص١١٠١ باب قول الله ويحذركم الله الخ، مسلم ج٢ ص٣٤٣ باب فضل الذكر والدعاء)

অর্থাৎ, যে আমাকে মনে মনে (একাকী) স্মরণ করে আমিও তাকে মনে মনে (একাকী) স্মরণ করি। আর যে আমাকে কোন মজলিশে স্মরণ করে, আমিও তাকে তাদের চেয়ে উত্তম মজলিশে স্মরণ করি।

উক্ত হাদীসে فِيْ نَفْسِهِ শব্দটি فِيْ مَلأٍ শব্দের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা একথা প্রমাণ করছে যে, এর দ্বারা একাকী অবস্থা বুঝানো উদ্দেশ্য।

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীসেও কেরাতে হুকমী উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ইমাম কেরাত পড়লে মুক্তাদীর পক্ষ থেকেও কেরাত আদায় হয়ে যাবে। (درس مشكوة ج٢ ص٧٦)
কেননা সবার নিকটই মুদরিক ব্যক্তি (যে পরে এসে নামাযে মিলিত হয়েছে) যদি ইমামের রুকু পায়, তাহলে উক্ত ব্যক্তি ঐ রাকাত পেয়েছে বলে গণ্য হবে। অথচ উক্ত ব্যক্তি তো প্রকৃতপক্ষে কেরাতই পাঠ করেনি। সুতরাং এর দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়েছে যে, ইমামের কেরাতের দ্বারা মুক্তাদীরও আইনতঃ কেরাত হয়ে যাবে।

(৩) অথবা, আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীস প্রথমে ঠিকই ছিল, কিন্তু যখন ইমামের সাথে মুক্তাদীর কেরাতে সমস্যার সৃষ্টি হল, তখন নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা দিলেন-

مَنْ كَانَ لَهُ اِمَام فَقِرَاءَةُ الاِمَامِ لَهُ قِرَاءَة–

তৃতীয় দলীলের জবাবঃ (১) উক্ত হাদীসের সনদে জাফর ইবন মায়মূন নামে একজন রাবী রয়েছেন। যিনি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন। ইমাম নাসায়ী (রহ.) তাঁর ব্যাপারে বলেন- انه ليس بثقة অর্থাৎ, তিনি আস্থাভাজন ব্যক্তি নন।

(২) উক্ত হাদীসে নামাযে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা বা আয়াত মিলানোর কথাও বলা হয়েছে। শাফেঈগণ শুধু ফাতিহার কথা বলে থাকেন, অন্য সূরা মিলানোর কথা বলেন না। অথচ একই হাদীসের নিজেদের মনমত একটি অংশ গ্রহণ করা এবং অন্য অংশ নিজেদের মনমত না হলে বাদ দেয়া যুক্তিসঙ্গত নয়।

(৩) মূলতঃ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর জন্য। ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পড়তে হবে, ইহা বুঝানোর জন্য নয়।

(تنظيم الاشتات ج١ ص٣٢٧-٣٢٨)

দ্বিতীয় আলোচনাঃ নামাযে সূরা ফাতিহার হুকুম।
নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয না ওয়াজিব, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ
* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, প্রত্যেক নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয। ইহা তরক করলে নামায সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে। তাঁদের মতে, সূরা মিলানো মাসনূন বা মুস্তাহাব।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।
উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, ফাতিহা না পড়লে নামাযই শুদ্ধ হবে না। সুতরাং বুঝা গেল ইহা ফরয। (এ ব্যাপারে আরো অনেক হাদীস ইতিপূর্বে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।)

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, সূরা ফাতিহা পড়া ফরয নয়; বরং ওয়াজিব। আর ফরয হল সাধারণ কেরাত পাঠ করা। উল্লেখ্য যে, ফাতিহার সাথে সূরা মিলানো ওয়াজিব; সুন্নত বা মুস্তাহাব নয়। অতএব, সূরা ফাতিহা বা সূরা মিলানো এগুলোর মধ্যে থেকে যেকোন একটি তরক করলে কেরাতের ফরযিয়াত আদায় হলেও ওয়াজিব তরক করার কারণে নামায দোহরানো ওয়াজিব হবে।

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ– অর্থাৎ, কুরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ, তোমরা ততটুকু পাঠ কর। (মুযযাম্মিলঃ ২০)
উক্ত আয়াতে مَا تَيَسَّرَ তথা যতটুকু সহজ হয়, ততটুকু পড়া ফরয সাব্যস্ত করা হয়েছে। নির্দিষ্ট কোন সূরাকে সাব্যস্ত করা হয়নি। আর মুতলাক খবরে ওয়াহিদ দ্বারা শর্তায়িত হতে পারে না।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلٰوةً لَّمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ الخ

(ابو داود ج١ ص١١٩)

(উক্ত হাদীসটি প্রথম আলোচনায় শাফেঈদের দ্বিতীয় দলীল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।)
এই হাদীসে সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামাযকে অসম্পূর্ণ বলা হয়েছে, কিন্তু আসলেই নামায হবে না একথা বলা হয়নি। এতে প্রমাণিত হল যে, সূরা ফাতিহা ব্যতীত মূল নামায সত্তা সম্পন্ন হয়ে যাবে, কিন্তু এর গুণাবলীতে ক্রটি থেকে যাবে।

জবাবঃ (১) শায়খ ইবন হুমাম বলেন, শাফেঈদের দলীল হিসেবে প্রদত্ত হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ। এর দ্বারা কিতাবুল্লাহর উপর অতিরিক্ত সংযোজন হতে পারে না। অতএব, আমরা (হানাফীগণ) সাধারণ কেরাতকে ফরয বলেছি; কিন্তু সূরা ফাতিহাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছি।

(২) আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীসে لَا দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কেরাত না পড়া অবস্থায় নামায সম্পূর্ণ ফাসিদ হয়ে যায় একথা বুঝানো। এখানে কেরাত দ্বারা শুধু ফাতিহা পড়া নয়; বরং সাধারণ কেরাত উদ্দেশ্য। যা অন্যান্য হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। এ বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) এ ব্যাপারে আরেকটি সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন- قَرَأَ يَقْرَأُ সাধারণত প্রত্যক্ষভাবে সকর্মক ক্রিয়া (مُتَعَدِّيْ) হয়। যেমন- قرأت الكتاب বলা হয়, কিন্তু قرأت بالكتاب বলা হয় না। সুতরাং যেসব ক্রিয়া (فعل) প্রত্যক্ষভাবে সকর্মক (متعدي) হয় সেগুলোকে কখনো কখনো ب (হরফ)-এর মাধ্যমে মুতাআদ্দী (সকর্মক) করা হয়। কিন্তু উভয় অবস্থাতে অর্থগত পার্থক্য হয়। এ কারণে যখন ب-এর মাধ্যম থাকে না তখন অর্থ হয়, কৃত বিষয়ের (مَفْعُوْلِيَّت) সাথে অন্য কিছু অংশীদার নেই। আর যখন ب-এর মাধ্যম হয় তখন অর্থ হয় মাফঊলে বিহী (مَفْعُول بِهٖ) মাফঊলের অংশ। মাফঊলিয়্যাতে অন্য কোন কিছুও তার সাথে শরীক থাকে। এজন্য قرأ-কে যখন প্রত্যক্ষভাবে মুতাআদ্দী করা হয়, তখন এর মাফঊলে বিহী পরিপূর্ণ বিষয় পঠিত হবে। আর অর্থ হবে শুধু এটাকেই পড়া হয়েছে, অন্য কোন জিনিস পড়া হয়নি। আর যখন ب-এর সাথে মুতাআদ্দী করা হবে তখন মাফঊলে বিহী হবে পঠিত বিষয়ের কোন অংশ। অর্থ এই হবে যে, মাফঊলে বিহীও পড়া হয়েছে এবং এর সাথে আরো কিছুও। আর আলোচ্য হাদীসে قرأ মুতাআদ্দীর সাথে ب প্রবিষ্ট হয়েছে। যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফাতিহা ছাড়া অন্য কিছুও পড়া উদ্দেশ্য। (درس ترمذي ج١ ص٥٠٨–٥١٢، درس مشكوة ج٢ ص٧١–٧٢)

بَابُ النُّهُوْضِ فِيْ الْفَرْدِ ص١٢٢

প্রথম ও তৃতীয় রাকাতের পর দাঁড়ানোর নিয়ম

... عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ قَالَ جَاءَنَا اَبُوْ سُلَيْمَانَ مَالِكُ ابْنُ الْحُوَيْرِثِ اِلٰى مَسْجِدِنَا فَقَالَ وَاللهِ اِنِّيْ لَاُصَلِّيْ وَمَا اُرِيْدُ الصَّلٰوةَ وَلٰكِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ قَالَ فَقَعَدَ فِيْ الرَّكْعَةِ الْأُوْلٰى حِيْنَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْاٰخِرَةِ– (بخاري ج١ ص١١٣ باب المكث بين السجدتين، نسائي ج١ ص١٧٣ باب الاستواء للجلوس الخ)

অনুবাদঃ ... আবু কিলাবা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু সুলায়মান মালিক ইবনুল হুআয়রিছ (রাঃ) আমাদের মসজিদে এসে বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি নামায আদায়ের মাধ্যমে তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে পদ্ধতিতে নামায আদায় করতে দেখেছি তা প্রদর্শন করতে চাই। রাবী বলেনঃ অতঃপর তিনি প্রথম রাকাতের দ্বিতীয় সিজদা হতে মাথা উত্তোলন করে একটু বসেন।

বিশ্লেষণঃ প্রথম ও তৃতীয় রাকাতে সিজদা থেকে ফারেগ হয়ে দাঁড়ানোর পূর্বে অল্পক্ষণ বিশ্রামের বৈঠক (جلسة استراحت) সুন্নত কিনা, এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যথা-

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, বিশ্রামের বৈঠক সুন্নত।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اَنَّهُ رَاٰىَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ فِيْ وِتْرٍ مِّنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتّٰى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا– (ابو داود ج١ ص١٢٢، بخاري ج١ ص١١٣ باب من استوى قاعدا في وتر الخ، ترمذي ج١ ص٦٤ باب كيف النهوض من السجود، نسائي ج١ ص١٧٣)

অর্থাৎ, ... মালিক ইবনুল হুওয়ারিছ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সাঃ) কে "বিতর নামাযের"* মধ্যে দ্বিতীয় সিজদা আদায়ের পর একটু বসে অতঃপর দাঁড়াতে দেখেছেন।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, সুফিয়ান সাওরী, আওযাঈ, ইসহাক (রহ.)-এর মতে এবং আহমদ (রহ.)-এরও সুপ্রসিদ্ধ অভিমত হল, বিশ্রামের বৈঠক মাসনূন নয়; বরং এর পরিবর্তে সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়া উত্তম।

---

* টীকাঃ এস্থলে "বিতর" শব্দের অর্থ- প্রথম রাকাত ও চার রাকাতবিশিষ্ট নামাযের তৃতীয় রাকাত এবং তিন রাকাত বিশিষ্ট নামাযের প্রথম রাকাত।

দলীল (১)ঃ ... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَضُ فِيْ الصَّلٰوةِ عَلٰى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ– (ترمذي ج١ ص٦٤ باب كيف النهوض من السجود، مصنف ابن ابي شيبة ج١ ص٣٩٤، مصنف عبد الرزاق ج٢ ص١٧٨)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দু'পায়ের পিঠের উপর ভর করে নামাযে দাঁড়াতেন। (অর্থাৎ, বিশ্রামের বৈঠক না করে সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন।)

দলীল (২)ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) হযরত খাল্লাদ ইবন রাফি (রাঃ)-কে নামাযের সহীহ্ পদ্ধতি শিক্ষা দিতে গিয়ে সিজদা শিক্ষা দেয়ার পর বলেছেন-

ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِيْ صَلٰوتِكَ كُلِّهَا– (بخاري ج٢ ص٩٨٦ باب اذا حنث ناسيا في الايمان ، فتح الباري ج٢ ص٢٣١)

অর্থাৎ, অতঃপর ওঠ এবং ভাল করে সোজা হয়ে দাড়াও। তারপর তুমি তোমার পুরো নামাযের অনুরূপ কর।
উল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিশ্রামের বৈঠক না করাই উত্তম।

জবাবঃ (১) হযরত মালিক ইবনুল হুওয়ায়রিছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে বলা যায় যে, এটি জায়েয বর্ণনা করার জন্য করা হয়েছে। কিন্তু মতানৈক্য তো কেবল উত্তমতা নিয়ে।
(২) অথবা, অপরাগতার কারণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এমনটি করেছিলেন। কেননা নবী করীম (সাঃ)-এর দেহ মোবারক শেষ বয়সে একটু ভারী হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া বিশ্রামের বৈঠক যদি সুন্নতই হত, তাহলে সাহাবাগণ এই আমলকে ছেড়ে দিতেন না। (تنظيم ج١ ص٢٩٩–٣٠٠)

بَابُ الْاِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ص١٢٢

দুই সিজদার মধ্যবর্তী উপবেশন পদ্ধতি

... عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِي اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ طَاؤُسًا يَقُوْلُ قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ الاِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فِيْ السُّجُوْدِ فَقَالَ هِيَ السُّنَّةُ قَالَ قُلْنَا اِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– (مسلم ج١ ص٢٠٢ باب جواز الاقعاء على العقبين، ترمذي ج١ ص٦٣ باب الرخصة في الاقعاء)

অনুবাদঃ ... ইবন জুরায়েজ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু যুবায়ের তাউস হতে শ্রবণ করে আমাকে বলেছেন, আমরা হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-কে দুই সিজদার মধ্যবর্তী সময়ে ইকআ (গোড়ালির উপর নিতম্ব রেখে বসা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি বলেন, তা সুন্নত। অতঃপর আমরা বলি যে, এটাকে আমরা তো পায়ের উপর যুলুম মনে করি। জবাবে হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, এটা তোমার নবী (সাঃ)-এর সুন্নত।

বিশ্লেষণঃ ইকআ (اقعاء)-এর দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে। যথাঃ

(১) হযরত তাহাবী (রহ.)-এর ব্যাখ্যাঃ নিতম্বকে জমিনের সাথে এমনভাবে সংশ্লিষ্ট করে বসা যে, উভয় রান খাড়া করে রাখবে এবং উভয় হাঁটুকে বুকের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং উভয় হাতকে জমিনের মধ্যে রাখবে আর এ ধরনের ইকআ মাকরুহ তাহরীমী হওয়ার ব্যাপারে সকল ইমাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন।
(২) ইমাম কারখী (রহ.) হতে ইকআ-এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল, উপয় পা-কে খাড়া করে উভয় গোঁড়ালির উপর নিতম্ব রেখে বসা। (تنظيم الاشتات ج١ ص٢٨٩)
আর এই দ্বিতীয় প্রকার নিয়েই ইমামগণের মতানৈক্য রয়েছে যে, ইহা সুন্নত কিনা।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, দুই সিজদার মাঝখানে উক্ত ইকআ সুন্নত।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইকআও সুন্নত।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, দুই সিজদার মাঝখানে ইকআ অবস্থায় বসা মাকরূহ তানযীহী।

দলীল (১)ঃ ... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ... وَكَانَ يَنْهٰى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ

الخ (ابو داود ج١ ص١١٤ باب من لم يرا لجهر بسم الله الخ، مسلم ج١ ص١٩٥ باب ما يجمع صفة الصلوة الخ، ابن ماجة ص٦٤)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) বলেন, ... তিনি (সাঃ) শয়তানের মত উপবেশন করা তথা উভয় গোঁড়ালির উপর নিতম্ব রেখে বসতে নিষেধ করতেন।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ

... لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ— (ترمذي ج١ ص٦٣ باب كراهية الاقعاء الخ، ابن ماجة ص٦٤، معارف السنن ج٣ ص٦٣–٦٤)

অর্থাৎ, ... আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বলেছেন, হে আলী! ... তুমি দুই সিজদার মাঝে ইকআ করে বসো না।

জবাবঃ (১) আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) এ হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। আবার কেউ কেউ এটাকে মানসূখ বলেছেন। যেমন- মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদে মুগীরা ইবন হাকাম থেকে বর্ণিত আছে-

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَجْلِسُ عَلٰى عَقِبَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِيْ الصَّلٰوةِ فَذُكِرَتْ لَهُ فَقَالَ اِنَّمَا فَعَلْتُهُ مُنْذُ اشْتَكَيْتُ— (مؤطا امام محمد ص١١٣)

অর্থাৎ, ... আমি ইবন উমর (রাঃ)-কে নামাযে দুই সিজদার মাঝে গোড়ালীদ্বয়ের উপর বসতে দেখেছি। ফলে এ বিষয়টি তার নিকট আলোচনা করলে তিনি বললেন, এটা কেবল তখন থেকে করেছি যখন থেকে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি।

এতে বুঝা যায় যে, এ আমলটি আসলে সুন্নতের খেলাফ। কিন্তু ইবন উমর (রাঃ) ওযরের কারণে এমনটি করেছেন।

(২) অথবা, ইকআ নবী করীম (সাঃ) জায়েয বর্ণনা করতে হয়ত কখনো এমনটি করেছেন। কেননা জায়েয বিষয়টি বর্ণনা করাও নবীদের দায়িত্ব।

(৩) সাহাবায়ে কিরামের মধ্য থেকে হযরত আব্বাস (রাঃ) ছাড়া আর কেউ ইকআ-এর প্রবক্তা নন। তাছাড়া একথা সর্বজনবিদিত যে, হযরত ইবন উমর (রাঃ) হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) অপেক্ষা সুন্নতের অধিক সংরক্ষণকারী ছিলেন। তাছাড়া ইবন আব্বাসের উক্তিতে এই ব্যাখ্যাও করা যায় যে, সুন্নত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ওযর অবস্থায় সুন্নত। (درس ترمذي ج٢ ص٥٣-٥٤)

بَابُ تَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ فِيْ الصَّلٰوةِ ص١٣٤

নামাযরত অবস্থায় হাঁচির জবাব দেয়া (নামাযে কথা বলার হুকুম)

... عَنْ مُّعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السَّلَمِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطِسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللهُ فَرَمَانِيْ الْقَوْمُ بِاَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ اُمِّيَاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُوْنَ اِلَيَّ قَالَ فَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْنَ بِاَيْدِيْهِمْ عَلٰى اَفْخَاذِهِمْ فَعَرَفْتُ اَنَّهُمْ يُصَمِّتُوْنِيْ قَالَ عُثْمَانُ فَلَمَّا رَاَيْتُهُمْ يُسْكِتُوْنِيْ لٰكِنِّيْ سَكَتُّ فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَبِيْ وَاُمِّيْ مَا ضَرَبَنِيْ وَلاَ كَهَرَنِيْ وَلاَ سَبَّنِيْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ لاَ يَحِلُّ فِيْهَا شَيْئٌ مِّنْ كَلاَمِ النَّاسِ هٰذَا اِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ

وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ الخ (مسلم ج١ ص٢٠٣ باب تحريم الكلام في الصلوٰة الخ، نسائي ج١ ص١٧٩–١٨٠ باب الكلام في الصلوٰة)

অনুবাদঃ ... মুআবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে নামায আদায় করি। এ সময় এক ব্যক্তি হাঁচি দিলে আমি 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন) বলি। তখন অন্যান্য লোকেরা আমার প্রতি বক্র দৃষ্টিতে তাকায়। তখন আমি অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে তাদের বলি, তোমরা আমার প্রতি এরূপ বক্রদৃষ্টিতে তাকাচ্ছ কেন? তখন তারা তাদের রানের উপর হাত মারছিল, ফলে আমি বুঝতে পারি যে, তারা আমাকে চুপ করতে বলছে।
রাবী উসমান (রহ.) বলেন, আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, তারা আমাকে চুপ থাকতে বলছে, তখন আমি চুপ করে থাকলাম। নামায সমাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে মারেননি, ধমক বা গালিও দেননি। অতঃপর তিনি (সাঃ) বলেন, মনে রাখবে এটা নামায। এর মধ্যে কথামার্তা বলা অনুচিত। বরং নামাযের মধ্যে কেবলমাত্র তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআনের আয়াত পাঠ করা যেতে পারে।

বিশ্লেষণঃ উল্লেখ্য যে, নিম্ন বর্ণিত দুটি বিষয়ে কোন মতবিরোধ নেই।

(১) নামায শুদ্ধ করার নিয়তে নয়, বরং ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ যদি নামাযে কথা বলে, তাহলে তার নামায ফাসেদ বা নষ্ট হয়ে যাবে।
(২) ইসলামের প্রাথমিক যুগে নামাযে ইচ্ছাকৃত, কম বা বেশি কথা বলা জায়েয ছিল, কিন্তু পরে তা রহিত হয়ে গেছে।
অত্র অনুচ্ছেদে যে বিষয়ে আলোচনা করা হবে তাহল, নামাযে কথা বললে, নামায ফাসেদ বা নষ্ট হয়ে যাবে কিনা। এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম আওযাঈ (রহ.)-এর মতে এবং মালিক (রহ.)-এরও এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী, কথা যদি নামায সংশোধনের জন্য হয় তাহলে নামায নষ্ট হবে না, যদিও তা ইচ্ছাকৃত হয়ে থাকে। (تنظيم الاشتات ج١ ص٣٤٨)

* ইমাম শাফেঈ, মালিক, আবু সাওর, হাসান বসরী ও আতা (রহ.)-এর মতে, কথাবার্তা যদি ভুলের কারণে অথবা বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে হয়ে থাকে (অর্থাৎ, নামাযে কথা বললে যে নামায নষ্ট হয়ে যায় সে ব্যাপারে যদি অবহিত না থাকে) এবং কথা যদি অল্প হয়, তাহলে নামায নষ্ট হবে না। (فتح الملهم ج٢ ص١٢٧)

* ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) থেকে এ ব্যাপারে চারটি মত পাওয়া যায়।

(ক) ইমাম আওযাঈ (রহ.)-এর অনুরূপ।

(খ) ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর অনুরূপ।
(গ) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অনুরূপ।
(ঘ) যদি এই ধারণার উপর ভিত্তি করে কথা বলে যে, নামায শেষ হয়ে গেছে কিন্তু পরবর্তীতে সে জানতে পারল যে, এখনও তার নামায পূর্ণ হয়নি, তাহলে এরূপ কথাবার্তার দ্বারা তার নামায ফাসেদ হবে না। কিন্তু যদি সে বুঝতে পারে যে, নামায এখনো শেষ হয়নি, তাহলে কথা বলার কারণে নামায ফাসেদ হবে।(شرح المهذب ج٤ ص١٧)

উপরোল্লিখিত সকল ইমাম (হানাফী ব্যতীত) দলীল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন-

... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْدٰى صَلاتَي الْعَشِيِّ الظُّهْرَ اَوِ الْعَصْرَ قَالَ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ اِلٰى خَشَبَةٍ فِيْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهَا اِحْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى يُعْرَفُ فِيْ وَجْهِهِ الْغَضَبُ ثُمَّ خَرَجَ سَرْعَانُ النَّاسِ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ قُصِرَتِ الصَّلٰوةُ قُصِرَتِ الصَّلٰوةُ وَفِيْ النَّاسِ اَبُوْا بَكْرٍ وَّعُمَرُ فَهَابَاهُ اَنْ يُكَلِّمَاهُ فَقَامَ رَجُلٌ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَمِّيْهِ ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَسِيْتَ اَمْ قُصِرَتِ الصَّلٰوةُ قَالَ لَمْ اَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرِ الصَّلٰوةُ قَالَ بَلْ نَسِيْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ اَصَدَقَ ذُوْ الْيَدَيْنِ فَاَوْمَؤُوْا اَيْ نَعَمْ فَرَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى مَقَامِهِ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ ... (ابو داود ج١ ص١٤٤ باب في سجدتي السهو، بخاري ج١ ص١٦٤ باب يكبر في سجدتي السهو، مسلم ج١ ص٢١٣ من ترك ركعتين الخ، ترمذي ج١ ص٩١ باب الرجل يسلم في الركعتين الخ، نسائي ج١ ص١٨١-١٨٢ ما يفعل من سلم الخ، ابن ماجة ص٨٦)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের সাথে যুহর অথবা আসরের নামায আদায় করেন। তিনি (সাঃ) দুই রাকাত নামায আদায়ের পর সালাম ফিরান। অতঃপর তিনি (সাঃ) মসজিদের সম্মুখে অবস্থিত কাষ্ঠখণ্ডের নিকট গিয়ে তার উপরে এক হাত অন্য হাতের উপর স্থাপন করে দণ্ডায়মান হন। ঐ সময় তাঁকে রাগান্বিত মনে হচ্ছিল। তখন লোকেরা মসজিদ হতে নির্গমনকালে বলছিল, নামায কসর করা হয়েছে, নামায কসর করা হয়েছে। (অর্থাৎ আল্লাহ চার রাকাতের স্থানে দুই রাকাত করে দিয়েছেন।) এ সময় সমবেত মুসল্লীদের মধ্যে হযরত আবু বকর ও উমর (রাঃ)ও ছিলেন এবং তাঁরা এ ব্যাপারে

তাঁর সাথে আলোচনা করতে ভয় পাচ্ছিলেন। ঐ সময় নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক যুল-ইয়াদাইন (লম্বা বাহুবিশিষ্ট) উপাধিপ্রাপ্ত জনৈক সাহাবী (খিরবাক) দাঁড়িয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি ভুল করেছেন, নাকি নামায কসর (সংক্ষিপ্ত) করা হয়েছে? জবাবে তিনি (সাঃ) বলেনঃ না, আমি ভুল করিনি এবং নামায কসরও করা হয়নি। তখন ঐ সাহাবী বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তবে আপনি ভুল করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সমবেত জনগণের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেনঃ আচ্ছা, যুল-ইয়াদাইন কি সত্য বলেছে? জবাবে সাহাবাগণ এশারায় বলেনঃ জি-হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বীয় স্থানে প্রত্যাবর্তন করে বাকী দুই রাকাত নামায আদায় করে সালাম ফিরান।

উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, যুল ইয়াদাইনের এই কথাবার্তা হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে হয়েছিল। আর নবী করীম (সাঃ)-এর এই কথাবার্তা হয়েছিল বিস্মৃতির ভিত্তিতে।

ইমাম মালিক ও আওযাঈ (রহ.) বলেন, এই কথাবার্তা হয়েছিল নামায সংশোধনের জন্য। আর ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, এই কথাবার্তা হয়েছিল নামায পূর্ণ হয়েছে মনে করে। নবী করীম (সাঃ) তো ইহা মনে করেই কথাবার্তা বলেছেন যে, চার রাকাত নামায পূর্ণ হয়ে গেছে। আর যুল ইয়াদাইন (রাঃ) ইহা মনে করেই কথাবার্তা বলেছিলেন যে, হয়ত নামাযের রাকাতের সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে। সুতরাং নামায পূর্ণ হয়ে গেছে। আর এ সকল কারণেই কথাবার্তা সত্ত্বেও নবী করীম (সাঃ) নামাযকে পুনরায় নতুন করে না পড়ে উক্ত নামাযের উপর ভিত্তি করেই বাকি নামায শেষ করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, অবস্থাভেদে নামাযে কথা বলা নামায ফাসেদের কারণ নয়। (درس ترمذي ج۲ ص۱٥۱)

কিয়াসী দলীলঃ যারা বলেন, ভুলে কথাবার্তা বললে নামায নষ্ট হবে না, তারা যুক্তি দেখান, হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রমযান মাসে দিনে রোযা রাখার পর ভুলে খেয়ে ফেললে রোযা ভঙ্গ হয় না। অনুরূপভাবে ভুলে নামাযের মধ্যে কথাবার্তা বললেও নামায নষ্ট হবে না।

* ইমাম আবু হানিফা ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে এবং ইমাম মালিক (রহ.)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী, নামাযে কথা বলার যে প্রচলন ছিল, তা রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং এখন ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত বা জেনে হোক, কম হোক বা বেশি হোক, সর্বাবস্থায় নামাযে কথা বললে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

(درس مشكوة ج۲ ص۹۰، تنظيم ج۱ ص۳٤۸)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- وَقُوْمُوْا للهِ قَانِتِيْنَ অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর একান্ত অনুগত বান্দা হিসেবে (নামাযে) দণ্ডায়মান হও। (বাকারাঃ ২৩৮)

উক্ত আয়াতে **قُنُوْت**-এর অর্থ নীরবতা। বহু সংখ্যক রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত যে, এ আয়াতটি নামাযে কথাবার্তা থেকে বিরত রাখার জন্য নাযিল হয়েছে। এতে কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নেই। সুতরাং এর আলোকে সব ধরনের কথাবার্তাই নিষিদ্ধ হবে।

দলীল (২)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসের শেষাংশে উল্লেখ আছে-

... اِنَّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ لاَ يَحِلُّ فِيْهَا شَيْئٌ مِّنْ كَلاَمِ النَّاسِ هٰذَا اِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ الخ

উক্ত হাদীসে **شيئ** (কোন কিছু) শব্দটি না-বোধক বাক্যের আওতায় ব্যবহৃত হয়েছে। যা ব্যাপকতার অর্থ প্রদান করে। সুতরাং নামাযের মধ্যে কোন প্রকার কথা বলা জায়েয নয়।

দলীল (৩)ঃ **... عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ كَانَ اَحَدُنَا يُكَلِّمُ الرَّجُلَ اِلٰى جَنْبِهٖ فِيْ الصَّلٰوةِ فَنَزَلَتْ وَقُوْمُوْا للهِ قَانِتِيْنَ فَاُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلاَمِ** – (ابو داود ج١ ص١٣٧ باب النهي عن الكلام في الصلٰوة، بخاري ج٢ ص٢٥٠ كتاب التفسير، مسلم ج١ ص٢٠٤، ترمذي ج١ ص٩٢ باب في نسخ الكلام في الصلٰوة، نسائي ج١ ص١٨١)

অর্থাৎ, ... যায়েদ ইবন আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (ইসলামের সূচনাকালে) আমরা নামাযের মধ্যে পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির সাথে কথোপকথন করতাম। এ সময় আল-কুরআনের এই আয়াত নাযিল হয়, "তোমরা আল্লাহর একান্ত অনুগত বান্দা হিসেবে (নামাযে) দণ্ডায়মান হও।" এ সময় আমাদেরকে নামাযে নীরবতা পালনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় এবং কথা বলতে নিষেধ করা হয়।

দলীল (৪)ঃ **... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ فِيْ الصَّلٰوةِ وَنَأْمُرُ بِحَاجَتِنَا فَقَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ فَاَخَذَنِيْ مَا قَدُمَ وَمَا حَدُثَ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلٰوةَ قَالَ اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْدِثُ مِنْ اَمْرِهٖ مَا يَشَاءُ وَاِنَّ اللهَ تَعَالٰى قَدْ اَحْدَثَ اَنْ لاَّ تَكَلَّمُوْا فِيْ الصَّلٰوةِ فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ** (ابو داود ج١ ص١٣٣ باب رد السلام في الصلٰوة)

অর্থাৎ, ... হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নামাযরত অবস্থায় সালাম দিতাম এবং আমাদের প্রয়োজনের কথা বলতাম। পরবর্তীকালে আমি হাবশা হতে প্রত্যাবর্তনের পর একদা তাঁকে নামাযের মধ্যে সালাম দিলে তিনি এর উত্তর দেননি। ফলে আমার মনে পুরাতন ও নতুন কথা স্মরণ হয় এবং সালামের জবাব না পাওয়ায় আমি শংকিত হয়ে পড়ি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামায শেষে আমাকে বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা যখন ইচ্ছা করেন, তখন তাই নির্দেশ প্রদান করেন। এখন আল্লাহ নামাযের মধ্যে কথা না বলার নির্দেশ জারী করেছেন।" একথা বলার পর তিনি আমার সালামের জবাব দেন।

অতএব, উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামাযের মধ্যে কোন প্রকার কথা বলা জায়েয নয়, বরং হারাম। এতে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

জবাবঃ ইমাম শাফেঈ (রহ.) সহ অন্যান্য ইমামগণ যুল ইয়াদাইনের হাদীস দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন এর বিস্তারিত জবাব হল-

(১) যুল-ইয়াদাইনের হাদীসটি হযরত যায়েদ ইবন আরকামের হাদীস দ্বারা মানসূখ। কেননা, যুল-ইয়াদাইনের ঘটনাটি ছিল নামাযের মধ্যে কথাবার্তা হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা। আর নামাযে কথা বলা নিষিদ্ধ হয় মদীনাতে বদর যুদ্ধের কিছুকাল পূর্বে। আর যুল-ইয়াদাইন বদর যুদ্ধে শহীদ হন। সুতরাং এ ঘটনাটি বদর যুদ্ধের পূর্বে ঘটেছিল।

(২) যুল-ইয়াদাইনের হাদীসটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা। উক্ত হাদীসটির রাবী হলেন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)। আর এ সময় হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) তথায় উপস্থিত ছিলেন না। কেননা, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ৭ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। সুতরাং হাদীসটি মুরসাল। আর উল্লিখিত তিন ইমামের মতেই মুরসাল হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা শুদ্ধ নয়। তাই প্রশ্ন থেকে যায় যে, দলীল হিসেবে তাঁরা এ হাদীসটি কিভাবে উল্লেখ করলেন?

(৩) যুল-ইয়াদাইনের হাদীসে লক্ষ্য করলে অনেক বিষয়ই দৃষ্টিগোচর হয়, যা আমলে কাসীর হওয়ার কারণে ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর নিকটও নামায ভঙ্গের কারণ। যেমন- নামাযের স্থান থেকে সরে গিয়ে মিম্বরের উপর আরোহণ করা, কওমের দিকে চলে যাওয়া, মসজিদ থেকে বের হওয়া, কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী হুজরায় গমন করা ইত্যাদি। (ابو داود ج١ ص١٤٦) এতে প্রমাণিত হয় যে, এই ঘটনাটি ঐ সময়ের, যখন নামাযে আমলে কাসীরসহ অনেক কিছুই জায়েয ছিল।

(৪) যুল-ইয়াদাইনের হাদীসের মধ্যে পাঁচটি অসঙ্গতি (اضطراب) রয়েছে। যথাঃ

প্রথমত, কোন্ ওয়াক্তের নামায ছিল তা নিয়ে অসঙ্গতি। কোন কোন রেওয়ায়েতে এটি যুহরের ঘটনা। (مسلم ج١ ص٢١٤ باب السهو في الصلوة الخ)

কোন রেওয়ায়েতে আছে এটি আসরের ঘটনা। (مسلم ج١ ص٢١٣)

কোন কোন রেওয়ায়েতে মাগরিব ও এশার কোন একটি নামাযের কথা উল্লেখ রয়েছে। (بخاري ج١ ص١٦٤، مسلم ج١ ص٢١٣)

দ্বিতীয়ত, রাকাত নির্দিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে অসঙ্গতি। আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে, নবী করীম (সাঃ) দুই রাকাত নামায আদায়ের পর সালাম ফিরান। ইমরান ইবন হুসাইন (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে, নবী করীম (সাঃ) তিন রাকাত নামায আদায়ের পর সালাম ফিরান। (مسلم ج١ ص٢١٤)

তৃতীয়ত, সিজদা সাহুর ব্যাপারে অসঙ্গতি। কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তিনি (সাঃ) সিজদা সাহু করেছেন। (بخاري ج١ ص١٦٤، مسلم ج١ ص٢١٤) আবার কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি সিজদা সাহু করেননি।

(ابو داود ج١ ص١٤٥، نسائي ج١ ص١٨٣)

চতুর্থত, সিজদা সাহুর ধরণ ও প্রকৃতির ব্যাপারে অসঙ্গতি। কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) সালামের পূর্বে সিজদা সাহু আদায় করেছেন। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, সিজদা সাহু সালামের পর আদায় করেছেন।

(ابو داود ج١ ص١٤٤–١٤٥)

পঞ্চমত, অবস্থানের জায়গা সম্পর্কে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে, তিনি মসজিদে অবস্থিত কাঠ পর্যন্ত তাশরীক নিয়ে গিয়েছিলেন। (بخاري ج١ ص١٦٤، ابو داود ج١ ص١٤٤) আর ইমরান ইবন হুসাইন (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি হুজরায় প্রবেশ করেছিলেন। (مسلم ج١ ص٢١٤، ابو داود ج١ ص١٤٦)

সুতরাং যে হাদীসের মধ্যে এত অসঙ্গতি রয়েছে, যেগুলোর মাঝে কোনক্রমেই সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব নয়, এমন হাদীসের দ্বারা দলীল পেশ করা মোটেই ঠিক নয়।

(معارف السنن ج٣ ص٥٣٦–٥٣٧، فتح المغيث ج١ ص٢٢٥)

কিয়াসী দলীলের জবাবঃ নামাযকে রোযার সাথে কিয়াস করা আদৌ সমীচীন নয়। কেননা, রোযায় পুনরাবৃত্তি করার কোন সুযোগ নেই। সেজন্য রোযাতে ভুল হওয়াটা একপ্রকার ওযর। পক্ষান্তরে, নামাযে ভুল হয়ে গেলে তাতে পুনরায় আদায় করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। অতএব, এখানে ভুল হওয়াটা কোন ওযর নয়।

(درس مشكوة ج٢ ص٩٢)

উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফেঈ (রহ.) আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীসটি সহীহ্ প্রমাণ করতে গিয়ে বলেন, যুলইয়াদাইনের ঘটনাটি কথাবার্তার হুকুম রহিত হওয়ার পরবর্তীকালের। অতএব, এটি উপরিউক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা রহিত হতে পারে না।

কেননা, উপাধিপ্রাপ্ত দুই ব্যক্তি আলাদা আলাদা। একজন যুল-ইয়াদাইন এবং অপরজন হলেন যুশ-শিমালাইন। বদর যুদ্ধে যিনি শহীদ হয়েছেন, তিনি যুল-ইয়াদাইন নন, বরং যুশ-শিমালাইন। যুল-ইয়াদাইনের নাম হল খিরবাক ইবন আমর, যিনি বনু সুলাইম গোত্রের। আর যুশ-শিমালাইনের নাম হল উবায়দুল্লাহ ইবন আমর। তিনি ছিলেন বনু খুযাআ গোত্রের। হযরত যুল-ইয়াদাইন উসমান (রাঃ)-এর সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। আর এ ঘটনাটি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ করার পর ঘটেছিল। আর নামাযে কথাবার্তা বলা রহিত হয়েছে এর অনেক পূর্বে। সুতরাং যুল-ইয়াদাইনের হাদীসকে মানসূখ বলা ঠিক নয়। (معارف السنن ج٣ ص٥٢٢)

জবাবঃ যুল-ইয়াদাইন এবং যুশ-শিমালাইন মূলত একই ব্যক্তির দুটি উপাধি। বাস্তব ঘটনা হল, তাঁর আসল নাম হল উবায়দ ইবন আমর। জাহেলী যুগে তাঁর উপাধি ছিল খিরবাক। ইসলাম যুগে তিনি যুল-ইয়াদাইন ও যুশ-শিমালাইন দুটি উপাধিতে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। বনু সুলাইম যেহেতু বনু খুযাআরই একটি শাখা, এজন্য তাকে উভয় গোত্রের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু তাঁর হাত খুব লম্বা ছিল, সেহেতু ইসলামের শুরুর দিকে তাঁর উপাধি হয়েছিল যুশ-শিমালাইন। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) ইহা পরিবর্তন করে যুল-ইয়াদাইন রাখেন। (درس ترمذي ج١ ص١٠٥)

তাই হাদীসের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, আবু হুরায়রা (রাঃ) একই রেওয়ায়েতে দুটি উপাধি একত্রিত করে বর্ণনা করেছেন। যেমন-

... فَقَالَ ذُوْ الشِّمَالَيْنِ بْنِ عَمْرٍو أَ نُقِصَتِ الصَّلٰوةُ اَمْ نَسِيْتَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُوْلُ ذُوْ الْيَدَيْنِ الخ– (نسائي ج١ ص١٨٣، مصنف ابن ابي شيبة ج٢ ص٣٧)

অর্থাৎ, ... তখন যুশ-শিমালাইন ইবন আমর বললেন, নামায কি হ্রাস করা হয়েছে, নাকি আপনি ভুলে গেছেন? তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, যুল-ইয়াদাইন কি বলছে?

উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, একই ব্যক্তির দুটি উপাধি।

এবার প্রশ্ন থেকে যায়, যদি যুল-ইয়াদাইন বদর যুদ্ধে শহীদ হয়ে থাকেন, তবে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) যুল-ইয়াদাইনের ঘটনায় কিভাবে বললেন-

صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের নিয়ে নামায পড়েছেন।

এবং অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে-

اَنَا اُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– (مسلم ج١ ص٢١٤)

অর্থাৎ, আমি রাসূল (সাঃ)-এর সাথে নামায পড়ি।
অথচ তিনি তো ৭ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, যুল-ইয়াদাইনের ঘটনাটি ৭ম হিজরীর পরে ঘটেছিল।

জবাবঃ যুল-ইয়াদাইনের ঘটনাটি নিশ্চিত বদর যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। তবে ঐ সকল হাদীসসমূহের জবাব হল, ঐ সকল হাদীসসমূহ মুরসাল। এর দ্বারা হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) তাদের সাথে শরীক থাকার কথা প্রমাণিত হয় না। কেননা, কুরআন-হাদীসে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যে, কোন এক গোত্র কোন এক কাজ করেছে বা কোন এক গোত্রের সাথে কোন ঘটনা সম্পৃক্ত; অথচ ইহা একক ব্যক্তির প্রতি আরোপিত হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে- **وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَأْتُمْ فِيْهَا**
অর্থাৎ, "যখন তোমরা একজনকে হত্যা করে পরে সে সম্পর্কে একে অপরকে অভিযুক্ত করেছিলে।" (বাকারাঃ ৭২)

উল্লেখ্য যে, উক্ত আয়াতে হত্যাকারী এবং উক্তিকারী নবী করীম (সাঃ)-এর সময়ের ইহুদী ছিল না। বরং হযরত মূসা (আঃ)-এর সময়ের ইহুদী ছিল। কিন্তু এরপরেও নবী করীম (সাঃ)-এর সময়কালের ইহুদীদের প্রতি তা আরোপিত হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হল এই বলা যে, তোমাদের গোত্র হত্যা করেছে।

* হাদীসসমূহেও এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। যেগুলোতে বর্ণনাকারী স্বয়ং উপস্থিত থাকেন না, তা সত্ত্বেও উত্তম পুরুষ বহুবচন (**جمع متكلم**)-এর শব্দ ব্যবহার করেন। যেমন- ইমাম তাহাবী (রহ.) বর্ণনা করেন, তাওস (রহ.) বলেন- **قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ** অর্থাৎ, আমাদের নিকট মুআয ইবন জাবাল (রাঃ) আসলেন। অথচ হযরত মুআয (রাঃ) যখন ইয়ামনে আগমন করেছেন, তখন তাউস (রহ.) জন্মলাভ করেননি। অতএব, **قَدِمَ عَلَيْنَا** দ্বারা উদ্দেশ্য- **قَدِمَ عَلَى قَوْمِنَا** তথা আমাদের কওমে আগমন করেছেন। (**شرح معاني الآثار ج١ ص٢١٨**)
তাছাড়া অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে-

... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِيْ الْمَسْجِدِ اِذْ خَرَجَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْطَلِقُوْا اِلَى يَهُوْدٍ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتّٰى جِئْنَاهُمْ الخ (**ابو داود ج٢ ص٤٢٣ باب كيف كان اخراج اليهود من المدينة**)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন,

ইহুদীদের সাথে মোকাবিলার জন্য বের হও। তখন আমরা তাঁর সঙ্গে বের হয়ে ইহুদীদের নিকট পৌঁছাই।

এটি ৬ষ্ঠ হিজরীর ঘটনা। উক্ত হাদীসের রাবী হলেন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)। অথচ তিনি ৭ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

সুতরাং হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বাণী- "صَلّٰى بِنَا"-এর অর্থ হল-

صَلّٰى بِالْمُسْلِمِيْنَ اَيْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ اَوْ صَلّٰى بِقَوْمِنَا– অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) মুসলমানদের জামাআত নিয়ে নামায পড়েছেন বা আমাদের কওমের সাথে নামায পড়েছেন।

আরেকটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে- اَنَا اُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلعم

এখানে স্পষ্ট انا বা 'আমি' শব্দ উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ তিনি স্বয়ং উক্ত ঘটনায় শরীক ছিলেন। এখানে তো আর কোন ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে না।

এর উত্তরে আল্লামা আনোয়ার শাহ (রহ.) বলেন, উত্তম পুরুষ একবচনের (وَاحِد متكلم) শব্দ শুধু শায়বানের একক বিবরণ। সুতরাং এমন রেওয়ায়েত করার মূল কারণ হল, রাবী যখন অন্যান্য হাদীসে صلى بنا দেখলেন, তখন তিনি ভেবে নিলেন যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) স্বয়ং উক্ত ঘটনায় ছিলেন। আর এ জন্যই তিনি "انا" দ্বারা রেওয়ায়েত করে দিলেন। যা ছিল বর্ণনাকারীর হস্তক্ষেপ (تصرّف)। যেমন সহীহ সনদে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

دَخَلْتُ عَلٰى رُقَيَّةَ بِنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– (مستدرك حاكم ج٤ ص٤٦)

অর্থাৎ, আমি নবী করীম (সাঃ)-এর কন্যা রুকাইয়্যাহ (রাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করলাম।

অথচ হযরত রুকাইয়্যাহ (রাঃ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের ৫ বছর পূর্বে ইন্তিকাল করেছেন। অতএব, আবু হুরায়রার (রাঃ) তাঁর নিকট যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং এর ব্যাখ্যা হল, আসলে হাদীসে ছিল, "মুসলমানগণ প্রবেশ করেছেন"। রাবী তাতে হস্তক্ষেপ করে "আমি প্রবেশ করেছি" (دَخَلْتُ) বলেছেন।

(معارف السنن ج٣ ص٥١٧)

بَابُ التَّامِيْنِ وَرَاءَ الْاِمَامِ ص١٣٤ ঃ ইমামের পিছনে আমীন বলা

... عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَرأَ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَه–

অনুবাদঃ ... ওয়াইল ইবন হুজর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ''ওয়ালাদ্দাল্লীন'' পাঠ করার পর জোরে ''আমীন'' বলতেন।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّهُ مَنْ وَّافَقَ تَاْمِيْنُهُ تَاْمِيْنَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه–

(ابو داود ج١ ص١٣٥، بخاري ج١ ص١٠٨ باب جهر الامام بالتامين، مسلم ج١ ص١٧٦ باب التسميع والتحميد والتامين، ترمذي ج١ ص٥٨، نسائي ج١ ص١٤٧ جهر الامام بامين، ابن ماجة ص٦١)

অনুবাদঃ ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যখন ইমাম ''আমীন'' বলবে, তখন তোমরাও আমীন বলবে। কেননা যে ব্যক্তির ''আমীন'' শব্দ ফেরেশতাদের আমীন শব্দের সাথে মিলবে তার পূর্ব-জীবনের সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।

বিশ্লেষণঃ এখানে দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হবে-
(১) আমীন কে বলবে, (২) আমীন জোরে বলবে, না আস্তে।
প্রথম আলোচনাঃ ফেরকায়ে ইমামিয়াদের মতে, নামাযে সূরা ফাতিহার পর আমীন উচ্চারণ করলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।
দলীলঃ আমীন কুরআনের কোন অংশ নয়। এবং বিশেষ কোন দোয়ায়ে মাছূরার অন্তর্ভুক্তও নয়।
* ইবন হুজম-এর মতে, আমীন বলা শুধু মুক্তাদীর উপর ওয়াজিব।
* আহলে যাহিরের মতে, আমীন বলা ইমাম এবং মুক্তাদী উভয়ের উপর ওয়াজিব।
দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীস। এতে নবী করীম (সাঃ) বলেন- اِذَا اَمَّنَ الاِمَامُ فَاَمِّنُوْا এখানে আমরের সীগা ব্যবহৃত হয়েছে। আর আমর আসে ওয়াজিব বুঝানোর জন্য।

* জমহুর ইমামদের মতে, ইমাম ও মুক্তাদী উভয়কে আমীন বলতে হবে। আমীন বলা উভয়ের জন্য সুন্নত। ইমাম মালিক (রহ.)-এরও একটি রেওয়ায়েত অনুরূপ।
দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীস।

* ইমাম মালিক (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মত হল, আমীন বলা শুধু মুক্তাদীর কর্তব্য, ইমামের নয়। এবং আস্তে কেরাত বিশিষ্ট নামাযে ইমাম, মুক্তাদী কাউকেই আমীন বলতে হবে না।

দলীলঃ ... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ– (ابو داود ج١ ص١٣٥، بخاري ج١ ص١٠٨، نسائي ج١ ص١٤٧)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যখন ইমাম "গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দাল্লীন" বলবে, তখন তোমরা আমীন বল।

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম এবং মুক্তাদীর মধ্যে কর্ম বন্টন করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, ইমামের কাজ হল ولا الضالين বলা, আর মুক্তাদীর কাজ হল আমীন বলা। (تنظيم الاشتات ج١ ص٣٣٢)

জবাবঃ (১) ইমাম মালিক (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ বস্তুত হাদীসে ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যে কর্ম বন্টন করা উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে আমীন বলার নির্দিষ্ট জায়গা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এর পদ্ধতি এই বলা হয়েছে যে, ইমাম যখন ওয়ালাদ্দাল্লীন বলে অবসর হবেন তখন মুক্তাদী তৎক্ষণাৎ আমীন বলবে, যাতে উভয়ের আমীন এক সাথে বলা হয়। কারণ ইমামও তখন আমীন বলবে।

(২) আহলে যাহিরের দলীলের জবাবঃ উক্ত হাদীসে আমরের যে সীগা বর্ণনা করা হয়েছে তা ওয়াজিবের জন্য নয়, বরং এখানে আমরের দ্বারা মুস্তাহাব বুঝানো হয়েছে।

(৩) আর ইমামিয়াদের কিয়াস সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। কারণ ইহা সহীহ রেওয়ায়েতের সম্পূর্ণ বিপরীত।

দ্বিতীয় আলোচনাঃ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, আমীন জোরে এবং আস্তে উভয় পন্থায়ই বলা জায়েয। কিন্তু মতানৈক্য হচ্ছে শুধু উত্তম পন্থা নির্ধারণের ব্যাপারে।

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল, ইসহাক ও দাউদ যাহেরী (রহ.)-এর মতে, আমীন জোরে বলা উত্তম। তবে ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর নতুন অভিমত হল ইমাম আস্তে আমীন বলবে, কিন্তু তাঁদের ফাতওয়া হচ্ছে প্রথম অভিমতের উপর।

(تعليق الصبيح ج١ ص٣٧٦)

দলীল (১)ঃ সুফিয়ান সাওরী সূত্রে বর্ণিত-

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ وَقَالَ آمِيْنَ وَمَدَّبِهَا صَوْتَهُ– (ترمذي ج١ ص٥٧ باب ما جاء في التامين)

অর্থাৎ, ... ওয়াইল ইবন হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি শুনেছি নবী করীম (সাঃ) "গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দাল্লীন" পাঠ করলেন এবং আমীন বললেন। এই আমীন তিনি টেনে পড়েছেন।

দলীল (২)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীস। উক্ত হাদীসে ইমামের আমীনের সাথে মুক্তাদীকে আমীন বলার হুকুম দেয়া হয়েছে। আর ইমামের আমীন জোরে বলা ব্যতীত বুঝা যাবে না। তাই প্রমাণিত হয় যে, ইমাম জোরে আমীন বলবে আর মুক্তাদীরাও ইমামের অনুসরণ করতে গিয়ে জোরে আমীন বলবে।
দলীল (৩)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে এবং ইমাম মালিকের (রহ.) প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী- ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের জন্য "আমীন" আস্তে বলা উত্তম। **(فتح الملهم ج٢ ص٤٩، درس ترمذي ج١ ص٥١٤)**

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- **قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا**
অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমাদের দোআ কবুল করা হয়েছে। (ইউনুসঃ ৮৯)
অথচ হারুন (আঃ) দোআ করেননি, বরং মূসা (আঃ) দোআ করেছেন আর হারুন (আঃ) শুধু "আমীন" বলেছেন। এর পরেও তার পক্ষ থেকে দোআ কবুল হওয়া দ্বারা বুঝা যায় যে, "আমীন"ও এক প্রকার দোআ, আর দোআ চুপে চুপে পড়াই উত্তম। যেমন, আল্লাহ তাআলার বাণী- **اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً** অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের প্রভুকে ডাক কাকুতি-মিনতি করে ও সংগোপনে। (আরাফঃ ৫৫)

দলীল (২)ঃ হযরত শুবা সূত্রে বর্ণিত হাদীস-
... عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقَالَ اٰمِيْنَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ– (ترمذي ج١ ص٥٨)
অর্থাৎ, আলকামা ইবন ওয়াইল তার পিতা ওয়াইল (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) **غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ** পাঠের পর আস্তে আমীন বলেছেন।

দলীল (৩)ঃ **... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ فَاِنَّهُ مَنْ وَّافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ– (ابو داود ج١ ص١٣٥، بخاري ج١ ص١٠٨، ترمذي ج١ ص٥٨، نسائي ج١ ص١٤٧، ابن ماجة ص٦١)**

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যখন ইমাম "গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দাল্লীন" বলবে, তখন তোমরা "আমীন" বলবে। কেননা যার "আমীন" শব্দটি ফেরেশতার উচ্চারিত আমীন শব্দের সাথে মিলবে, তার অতীতের যাবতীয় (সগীরা) গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।

উক্ত হাদীসের আলোকে আমরা (হানাফীগণ) বলতে পারি যে, নবী করীম (সাঃ) শর্তস্বরূপ বলেছেন যে, ইমাম যখন "ولا الضالين" বলবে, মুক্তাদী তখন আমীন বলবে। এতে বুঝা যায় যে, ইমাম আমীন আস্তে পড়বে। যদি জোরে আমীন বলা বুঝানো উদ্দেশ্য হত, তবে নবী করীম (সাঃ) এভাবে বলতেন-

"اِذَا قَالَ الْاِمَامُ اٰمِيْنَ قُوْلُوْا اٰمِيْنَ"

অর্থাৎ, ইমাম যখন আমীন বলে, তখন তোমরাও আমীন বল।

তাছাড়া ইমাম শাফেঈ (রহ.) "اِذَا اَمَّنَ الاِمَامُ فَاَمِّنُوْا" হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, আমীন জোরে পড়া উত্তম। কেননা উক্ত হাদীসে ইমামের আমীনের সাথে মুক্তাদীর আমীন বলার হুকুম দেয়া হয়েছে। আর ইমামের আমীন জোরে বলা ব্যতীত শোনা যাবে না। তাই ইমাম জোরে আমীন বলবে, আর মুক্তাদীরাও ইমামের অনুসরণ করতে গিয়ে জোরে আমীন বলবে। অথচ উক্ত হাদীসেই বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) বলেন- مَنْ وَّافَقَ تَاْمِيْنُهٗ تَاْمِيْنَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ-

এ হাদীস থেকেও বুঝা যায় যে, আমীন আস্তে বলাই উত্তম। কেননা উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মুক্তাদীর আমীন মিলে যাওয়া। আর ফেরেশতাদের আমীন তো জোরে হয় না, বরং আস্তে হয়। একথা তো সবাই স্বীকার করবে যে, আমরা ফেরেশতাদের আমীন বলার শব্দ শুনতে পাই না। তাই আমাদেরও আস্তে পড়াই উত্তম।

দলীল (৪)ঃ তাছাড়া সাহাবা, তাবীঈন এমনকি চার খলীফাদের পক্ষ থেকেও জোরে আমীন বলার কোন দলীল পাওয়া যায় না। বরং সহীহ সনদ দ্বারা প্রমাণিত আছে- انهم كانو لا يجهرون بها- (رواه الطبراني) অর্থাৎ, তাঁরা জোরে আমীন বলতেন না।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ ওয়াইল ইবন হুজরের হাদীসটি দুটি সূত্রে বর্ণিত- হযরত সুফিয়ান সাওরী সূত্রে যার শব্দগুলো নিম্নরূপ- ومد بها صوته

হযরত শোবা থেকে বর্ণিত- وخفض بها صوته-

শাফেঈ ও হাম্বলীগণ সুফিয়ানের রেওয়ায়েতকে প্রাধান্য দিয়ে শুবার রেওয়ায়েত বর্জন করেন এবং শুবার রেওয়ায়েতের উপর একাধিক প্রশ্নও উত্থাপন করেছেন। যার সন্তোষজনক জবাব উমদাতুল কারীতে বর্ণিত আছে। আর হানাফী ও মালিকীগণ আবু সুফিয়ানের রেওয়ায়েতের চেয়ে শুবার রেওয়ায়েতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা-

(১) হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর কর্মপদ্ধতি হযরত শুবার তরীকা অনুযায়ী। কেননা, সুফিয়ান (রহ.)-এর মতে আমীন আস্তে পড়া উত্তম। এতে বুঝা যায় যে, مد-এর অর্থ তাঁর নিকট তা নয়, যা ইমাম শাফেঈ (রহ.) ধারণা করেছেন।

(২) শুবার আমীন বলার পদ্ধতি কুরআন অনুযায়ী। যেমন- কুরআনের ইরশাদ হচ্ছে- ادعوا ربكم تضرعا وخفية আর আমীনও একপ্রকার দুআ, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

(৩) مد-এর অর্থ উচ্চস্বর বা জোরে বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে আমীনের আলিফ ও ইয়াকে একটু টেনে ও লম্বা (মদ) করে পড়া।

(৪) যদিও مد-এর অর্থ উচ্চস্বর বুঝানো মেনে নেয়া হয়, তাহলে এর দ্বারা তালীম উদ্দেশ্য ছিল। যেমন- আবু বিশর আদ দূলাবী (রহ.) "কিতাবুল আসমা ওয়াল কুনা"তে উল্লেখ করেছেন যে, স্বয়ং ওয়াইল ইবন হুজর হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন- مَا اَرَاهُ اِلاَّ لِيُعَلِّمَنَا ... অর্থাৎ, আমার ধারণা, তিনি কেবলমাত্র আমাদের তালীমের জন্য জোরে আমীন পড়েছেন।

(৫) তাছাড়া মু'জামে তিবরানীতে উল্লেখ আছে যে, নবী করীম (সাঃ) তিনবার আমীন বলেছেন। অথচ তিনবার আমীন বলা কারো নিকট সুন্নত নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, এখানে জোরে আমীন বলা ছিল শিক্ষা প্রদানের জন্য।

(৬) সুফিয়ান সাওরী সুমহান ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও কখনো কখনো তিনি তাদলীস করতেন। পক্ষান্তরে শুবা এটাকে যিনা অপেক্ষাও জঘন্য মনে করতেন। তিনি আরো বলেন- "তাদলীস করার চেয়ে আসমান থেকে পড়ে যাওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয়।" (درس ترمذي ج١ ص٥٢١)

(৭) যুক্তিরও চাহিদা এই যে, আমীন আস্তে হওয়াই উচিত। কেননা সর্বসম্মতিক্রমে আমীন শব্দটি পবিত্র কুরআনের কোন অংশ নয়। সুতরাং "আউযুবিল্লাহ" এবং "সুবহানাকাল্লাহুম্মা"-এর মত ইহাও আস্তে হওয়া উত্তম। "বিসমিল্লাহ" কুরআনের অংশ হওয়া সত্ত্বেও যখন ইহা আস্তে ও জোরে বলা নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে, সেক্ষেত্রে আমীন তো নিঃসন্দেহে কুরআনের অংশ নয়। ফলে তা আস্তে হওয়াই অধিক উত্তম ও যুক্তিসঙ্গত।

(৮) সর্বোপরি বলা যায়, রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধের সময় সাহাবায়ে কিরামের আমল (কর্ম) একটি ব্যাপক সীমা পর্যন্ত সিদ্ধান্তকারী হয়ে থাকে। আর এক্ষেত্রেও শুবার রেওয়ায়েত সাহাবীগণের আমল দ্বারাও সমর্থিত। যেমন, ইমাম তাহাবী (রহ.) আবু ওয়াইলের হাদীস বর্ণনা করেন-

قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ لاَ يَجْهَرُ اَنَّ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلاَ بِالتَّعَوُّذِ وَلاَ بِالتَّأْمِيْنِ– (شرح معاني الآثار ج١ ص٩٩)

অর্থাৎ, তিনি বলেছেন, উমর ও আলী (রাঃ) বিসমিল্লাহ, আউযুবিল্লাহ এবং আমীন কোনটিই জোরে পড়তেন না।

তাছাড়া ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর ন্যায় আরো অনেক ফুকাহায়ে কিরাম থেকেও আমীন আস্তে পড়ার প্রমাণ রয়েছে।

(كنز العمال ج٤ ص٢٤٩، مجمع الزوائد ج٢ ص١٠٨، معارف السنن ج٢ ص٤١٩)

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ ইমাম আবু হানীফা কর্তৃক প্রদত্ত তৃতীয় দলীল।

তৃতীয় দলীললের জবাবঃ (১) **رفع بها صوته**-তে অনুরূপ ব্যাখ্যা করা যায় যা **مد**-এর ক্ষেত্রে করা হয়েছে।

(২) এটাও সম্ভব যে, আসল রেওয়ায়েত **مد بها صوته** ছিল। অতঃপর সুফিয়ানের কোন শিষ্য এটাকে জোরে পড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরে অর্থগতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন।

(৩) অথবা, আমীন জোরে পড়াও যে জায়েয, তা বর্ণনার জন্যই নবী করীম (সাঃ) কখনো আমীন জোরে পড়েছেন। কেননা, জায়েয বর্ণনা করে দেয়াও নবীদের দায়িত্ব। তাই বলে ইহা উত্তম নয়। (درس ترمذي ج١ ص٥٢٢)

بَابُ فِيْ صَلٰوةِ الْقَاعِدِ ص١٣٧ ঃ বসে নামায আদায় করা

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلٰوةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ صَلاَتُهُ قَائِمًا اَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا وَصَلاَتُهُ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَتِهِ قَائِمًا وَصَلاَتُهُ نَائِمًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا– (بخاري ج١ ص١٥٠ باب صلوة القاعد، مسلم ج١ ص٢٥٣ باب جواز النافلة قائما وقاعدا الخ، ترمذي ج١ ص٨٥ باب صلوة القاعد على النصف الخ، نسائي ج١ ص٢٤٥ فضل صلوة القاعد الخ، ابن ماجة ص٨٧)

অনুবাদঃ ইমরান ইবন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বসে নামায আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। জবাবে তিনি বলেন, বসে নামায আদায় করার চাইতে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা উত্তম এবং বসে নামায আদায় করলে দাঁড়ানোর অর্ধেক সওয়াব পাওয়া যায়। তিনি আরো বলেন, শুয়ে নামায আদায় করলে বসে নামায আদায়ের অর্ধেক সওয়াব পাওয়া যাবে।

বিশ্লেষণঃ উক্ত হাদীসের আলোকে চারটি অবস্থা খেয়াল রাখলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে- (১) সুস্থতা, (২) অসুস্থতা, (৩) ফরয নামায, (৪) নফল নামায।
এই হাদীসের উপর প্রশ্ন জাগে যে, এটি ফরয নামায আদায়কারী সম্পর্কে, নাকি নফল আদায়কারী সম্পর্কে? যদি ফরয আদায়কারী সংক্রান্ত হয়, তাহলে এর দুটি অবস্থা- হয়ত নামাযী সুস্থ থাকবে অথবা অসুস্থ। যদি সুস্থ উদ্দেশ্য হয় তাহলে হাদীসের প্রথম অংশ সহীহ্ আছে- "صلاته قائما افضل"
কিন্তু হাদীসের অবশিষ্ট দুই অংশ সহীহ্ নয়। কেননা, ওযর ব্যতীত ফরয নামায বসে বা শুয়ে আদায় করা শুদ্ধই হবে না, অর্ধেক সওয়াবের তো প্রশ্নই ওঠে না। অথচ হাদীসে অর্ধেক সওয়াবের কথা বলা হয়েছে।
কিন্তু যদি ফরয আদায়কারী ব্যক্তি অসুস্থ হয়, তবুও হাদীসের ভাবার্থ সহীহ্ হবে না। কেননা, অসুস্থতার কারণে কেউ বসে অথবা শুয়ে নামায আদায় করলে সে তো ওযরের কারণে পুরো সওয়াব পাবে। অথচ হাদীসে অর্ধেক সওয়াবের কথা বলা হয়েছে।
পক্ষান্তরে, এর দ্বারা যদি নফল আদায়কারী উদ্দেশ্য হয় এবং নামাযী অসুস্থ হয়, এমতাবস্থায়ও যদি বসে অথবা শুয়ে নামায আদায় করে, তাহলেও তো পুরো সওয়াব পাওয়া যাবে।
কিন্তু নামাযী যদি সুস্থ হয় এবং ঐ নামাযটি যদি নফল হয়, তাহলে হাদীসের প্রথম দুই অংশ সহীহ্ আছে। এমতাবস্থায় দাঁড়িয়ে নফল নামায পড়া উত্তম (পুরো সওয়াব পাবে) এবং বসে পড়লে অর্ধেক সওয়াব পাবে।
কিন্তু হাদীসের তৃতীয় অংশ সহীহ্ নয়। কেননা, ওযর ব্যতীত নফল নামাযও (হযরত হাসান বসরী রহ. ব্যতীত অন্য কারো নিকট) শুয়ে আদায় করা জায়েয নেই। অথচ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, শায়িত ব্যক্তির নামাযের সওয়াব বসে আদায়কারীর সওয়াবের অর্ধেক।
তাই এ জটিলতাকে দূর করার জন্য কতিপয় উলামা বলেছেন যে, হাদীসে "صلاته نائما" বাক্যাংশটি হযরত ইমরান ইবন হুসাইন (রাঃ) কর্তৃক অতিরিক্ত সংযোজন, যা মূল হাদীসের অংশ নয়। অতএব হাদীসের প্রথম দুই অংশ সহীহ্। আর তখন

হাদীসটির উদ্দেশ্য হবে সুস্থ ব্যক্তির নফল নামায আদায় করা। ফলে অর্থের কোন সমস্যা হবে না। ওযর ব্যতীত নফল নামায দাঁড়িয়ে আদায় করলে পূর্ণ সওয়াব পাওয়া যাবে, আর বসে আদায় করলে অর্ধেক সওয়াব পাওয়া যাবে।

কিন্তু এই সমাধান সঠিক নয়। কেননা, "صلاته نائما" শব্দটি যে রাবী কর্তৃক অতিরিক্ত সংযোজন, এর কোন স্পষ্ট দলীল নেই। তাই সর্বোত্তম সমাধান হল এই, যা আল্লামা খাত্তাবী ও ইবন হাজার (রহ.) প্রদান করেছেন। আল্লামা কাশ্মীরী (রহ.)ও ইহা খুব পছন্দ করেছেন। বস্তুতঃ মাযুর দুই প্রকার- (১) একেবারেই দাঁড়াতে বা বসতে পারে না, (২) অথবা খুব কষ্ট করে দাঁড়াতে বা বসতে পারে।

অতএব, যে মাযুরকে শরীয়ত বসে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছে, এমন ব্যক্তি যদি কষ্ট স্বীকার করে একমাত্র আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, তখন স্বীয় নামাযের হিসেব অনুযায়ী ঐ ব্যক্তি অধিক সওয়াবের অধিকারী হবে। আর এমন ব্যক্তি যখন বসে নামায পড়বে তখন স্বীয় নামাযের হিসাব অনুযায়ী অর্ধেক সওয়াব পাবে। যদিও এই অর্ধেকও সুস্থদের পূর্ণ সওয়াবের সমান হবে।

এমনিভাবে, যদি কোন মাযুর ব্যক্তি যাকে শরীয়ত শুয়ে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু কষ্ট সহ্য করে যদি সে ব্যক্তি বসে নামায পড়ে, তাহলে সে অধিক সওয়াব পাবে। আর এমন ব্যক্তি যখন শুয়ে নামায পড়বে, তখন স্বীয় নামাযের হিসেব অনুযায়ী অর্ধেক সওয়াব পাবে। যদিও এই অর্ধেকও সুস্থদের পূর্ণ সওয়াবের সমান হবে। (درس مشكٰوة ج٢ ص١١٢-١١٣، درس ترمذي ج٢ ص١٤٠-١٤١)

উক্ত সমাধানটির সমর্থন পাওয়া যায় মুয়াত্তা ইমাম মালিকে বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রাঃ) এবং মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত দ্বারা। যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, এ হাদীসটি নবী করীম (সাঃ) তখন এরশাদ করেছিলেন, যখন তিনি সাহাবায়ে কিরামকে প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত অবস্থায় বসে নামায আদায় করতে দেখেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটির প্রয়াগ ক্ষেত্র ওযর বিশিষ্ট লোকজন। (مؤطا امام مالك ص١١٩، معارف السنن ج٣ ص٤٤٨)

بَابُ التَّشَهُّدِ ص١٣٩ ঃ তাশাহহুদের বর্ণনা

... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا اِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ الصَّلٰوةِ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللهِ قِبَلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلٰى فُلَانٍ وَّفُلَانٍ فَقَالَ

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُوْلُوْا السَّلاَمُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ وَلٰكِنْ اِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ فَاِنَّكُمْ اِذَا قُلْتُمْ ذٰلِكَ اَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِيْ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ اَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ اَحَدُكُمْ مِّنَ الدُّعَاءِ اَعْجَبَهُ اِلَيْهِ فَيَدْعُوْ بِهِ– (بخاري ج١ ص١١٥ باب التشهد في الآخرة، مسلم ج١ ص١٧٣ باب التشهد في الصلوة، ترمذي ج١ ص٦٥ باب التشهد، نسائي ج١ ص١٧٤ كيف التشهد الاول، ابن ماجة ص٦٤)

অনুবাদঃ ... হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে নামাযে রত থাকা অবস্থায় তাশাহ্‌হুদের মধ্যে ''ওয়া আলা ইবাদিহীস-সালামু আলা ফুলান ওয়া ফুলান''-এর পূর্বে ''আস্‌সালামু আলাল্লাহি'' বলতাম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ তোমরা ''আসসালামু আলাল্লাহি'' বলো না; কেননা আল্লাহ তাআলা নিজেই 'সালাম' বা শান্তি বর্ষণকারী। আর তোমরা যখন তাশাহ্‌হুদের সময় বসবে তখন অবশ্যই পড়বে, ''আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াত্‌তায়্যিবাতু আস্‌-সালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস্‌-সালামু আলাইনা ওয়া 'আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন'। তোমরা যখন এটা পাঠ করবে তখন এর সাওয়াব আসমান-যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যে সমস্ত নেক বান্দা রয়েছেন তাদের উপর পৌঁছবে। অতঃপর তিনি (সাঃ) ''আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু'' পাঠ করতে বলেন। অতঃপর তোমরা নিজেদের পছন্দনীয় উত্তম দুআ বেছে নিয়ে তা পাঠ করবে।

বিশ্লেষণঃ হাদীসসমূহ অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, নামাযে তাশাহ্‌হুদ পড়ার ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের তাশাহ্‌হুদ উল্লেখ রয়েছে। যেমন- ইবন মাসউদ, ইবন আব্বাস, উমর, ইবন উমর, আয়িশা এবং ইবন যুবাইর (রাঃ)-এর তাশাহ্‌হুদ সহ ২৪ জন সাহাবা থেকে তাশাহ্‌হুদের বিভিন্ন প্রকারের শব্দরাজি বর্ণিত হয়েছে। (العيني ج٣ ص١٧٨) সুতরাং সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, যে কোন একটি (যা সহীহ রেওয়ায়েত দ্বারা বর্ণিত হয়েছে) পড়লেই যথেষ্ট হবে। মতানৈক্য শুধু শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে। যথা-

* ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, হযরত উমর (রাঃ)-এর তাশাহ্‌হুদ পড়া উত্তম। আর তা হল-

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ الخ (مؤطا امام مالك ص٧٢)

(বাকিটুকু ইবন মাসউদ রাঃ-এর তাশাহ্‌হুদের মত)

হযরত উমর (রাঃ) লোকদেরকে এই তাশাহ্‌হুদ শিখাতেন এবং কারো পক্ষ থেকে যেহেতু এর উপর কোনপ্রকার আপত্তি উত্থাপিত হয়নি, সুতরাং বুঝা যায় যে, ইহাই উত্তম। (تنظيم ج١ ص٣٤٠)

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসের তাশাহ্‌হুদ উত্তম। আর তা হল-

... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ وَكَانَ يَقُوْلُ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاةُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ الخ (ابو داود ج١ ص١٤٠، ترمذي ج١ ص٦٥، نسائي ج١ ص١٧٥ نوع آخر من تشهد، ابن ماجة ص٦٥)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে কুরআনের মতই তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিতেন এবং তিনি বলতেন, আত্তাহিয়্যাতু আল-মুবারাকাতু আস-সালাওয়াতু ওয়াত্-তাইয়্যিবাতু লিল্লাহি আস-সালামু আলাইকা (বাকিটুকু ইবন মাসউদ রাঃ-এর তাশাহ্‌হুদের অনুরূপ)
উক্ত তাশাহ্‌হুদে যেহেতু 'আল-মুবারাকাতু' শব্দ অতিরিক্ত রয়েছে, সুতরাং ইহাই উত্তম।

* ইমাম আবু হানিফা, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক এবং ইবন মুবারক (রহ.)-এর মতে, হযরত ইবন মাসউদ (রহ.)-এর তাশাহ্‌হুদ উত্তম। (درس مشكوة ج٢ ص٨٢) যা অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে। ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর তাশাহ্‌হুদ প্রাধান্য লাভের কিছু কারণ নিম্নে দেওয়া হল-

ক. ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর সুস্পষ্ট বিবরণ মুতাবিক হযরত ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতটি এ প্রসঙ্গে বিশুদ্ধতম। (ترمذي ج١ ص٦٥)
খ. ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন-

كَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ يَكْرَهُ اَنْ يُزَادَ فِيْهِ حَرْفٌ اَوْ يُنْقَصَ مِنْهُ حَرْفٌ– (مؤطا امام محمد ص١١١)

অর্থাৎ, ইবন মাসউদ (রাঃ) তাশাহ্হুদে কোন হরফ বাড়ানো বা কমানোকে অপছন্দ করতেন। এতে বুঝা যায় এবং প্রমাণিত হয় যে, এই তাশাহ্হুদ উত্তম হওয়ার ব্যাপারে কতটুকু গুরুত্বের দাবিদার।

গ. হযরত ইবন মাসউদের (রাঃ) তাশাহ্হুদ সিহাহ সিত্তায় বর্ণিত আছে। (অনুচ্ছেদের শুরুতে প্রদত্ত হাদীসের সূত্র দ্রষ্টব্য)

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এই তাশাহ্হুদের শব্দাবলীতে কোথাও কোন এখতেলাফ নেই। অথচ অন্যান্য সমস্ত তাশাহ্হুদের শব্দাবলীতে ব্যাপক এখতেলাফ রয়েছে।

ঘ. আল্লামা বায্যার (রহ.) বলেন, এই তাশাহ্হুদ বিশজন সাহাবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

ঙ. ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর তাশাহ্হুদ নির্দেশসূচক শব্দ দ্বারা সাব্যস্ত। এজন্য হাদীসগুলোতে "فَقُوْلُوْا" "قُوْلُوْ" "فَلْيَقُلْ" শব্দ বর্ণিত হয়েছে।

(ابو داود ج١ ص١٣٩، نسائي ج١ ص١٧٣)

কিন্তু এছাড়া অন্যগুলো শুধুমাত্র বিবৃত হয়েছে।

চ. উক্ত তাশাহ্হুদে وَاوْ হরফ অতিরিক্ত রয়েছে, যা নতুন বাক্যের জন্য প্রত্যেকটি শব্দের স্বতন্ত্র শান সৃষ্টি করে। যেমন, কেউ এভাবে কসম করল-

وَاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ তখন শুধু একটি কসম হবে। কিন্তু কেউ যদি وَاوْ-এর সাথে এভাবে বলে- وَاللهِ وَالرَّحْمٰنِ وَالرَّحِيْمِ তখন তিনটি কসম হবে।

ছ. হযরত ইবন মাসউদ (রাঃ) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে এই তাশাহ্হুদের তালীম দিয়েছেন আমার হাত ধরে। (مسلم ج١ ص١٧٤) এটি বিষয়টির গুরুত্ব বহন করে। আর এই রেওয়ায়েতটি হস্তধারণ পদ্ধতিতে পরম্পরাযুক্ত (مسلسل بأخذ اليد) হাদীস হিসেবে পরিচিত। (معارف السنن ج٣ ص٩١)

জবাবঃ ইমাম মালিক (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ এই হাদীসটি হযরত উমর (রাঃ)-এর উপর মাওকূফ। সুতরাং এই হাদীসটি মারফু-এর মুকাবিলায় দলীলযোগ্য নয়।

ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ অতিরিক্ত শব্দ হওয়াই যদি প্রাধান্য লাভের কারণ হয়ে থাকে, তাহলে তো হযরত জাবির (রাঃ)-এর তাশাহ্হুদটি সর্বাগ্রে প্রাধান্য লাভের দাবিদার। কারণ, তাঁর তাশাহ্হুদে সবচেয়ে বেশি শব্দ রয়েছে। যেমন, তাতে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" অতিরিক্ত শব্দও রয়েছে। (نسائي ج١ ص١٧٥) অথচ ইহা সর্বসম্মতিক্রমে প্রাধান্য পায়নি। (تنظيم ج١ ص٣٤١)

بَابُ الْاِشَارَةِ فِيْ التَّشَهُّدِ ص١٤٢

তাশাহহুদের মধ্যে (আংগুল দ্বারা) ইশারা করা

... عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُعَاوِيِّ قَالَ رَاٰنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَاَنَا اَعْبَثُ بِالْحَصٰى فِيْ الصَّلٰوةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِيْ وَقَالَ اِصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فَقُلْتُ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قَالَ اِذَا جَلَسَ فِيْ الصَّلٰوةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَقَبَضَ اَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ الَّتِيْ تَلِيَ الْاِبْهَامَ وَ وَضَعَ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى– (مسلم ج١ ص٢١٦ باب صفة الجلوس الخ، نسائي ج١ ص١٨٧ باب قبض الاصابع من اليدي اليمنى الخ، ابن ماجة ص٦٦)

অনুবাদঃ ... আলী ইবন আব্দুর রহমান আল-মুআবী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) আমাকে নামাযের মধ্যে কংকর নিয়ে অনর্থক খেলতে দেখেন। তিনি নামায শেষে আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেরূপে নামায আদায় করতেন, তদ্রূপ করবে। তখন আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামায পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি বলেনঃ তিনি (সাঃ) যখন নামাযের মধ্যে বসতেন, তখন ডান হাতের তালুকে ডান পায়ের রানের উপর রাখতেন এবং তাঁর সমস্ত আংগুলগুলো (শাহাদাত আঙ্গুল ব্যতীত) বন্ধ করে রাখতেন এবং শাহাদাত আংগুল দ্বারা ইশারা করতেন এবং তিনি বাম হাতের তালু বাম পায়ের রানের উপর রাখতেন।

বিশ্লেষণঃ তাশাহহুদের সময় শাহাদাত আঙ্গুল (তর্জনী) দ্বারা ইশারা করা নিয়ে ইসলামী চিন্তাবিদদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* খুরাসানবাসী, ইরাকবাসী এবং পরবর্তী কতক ভারতীয় উলামার মতে, তাশাহহুদের সময় তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা কোন প্রয়োজন নেই। তাঁরা বলেনঃ (১) ইহা একটি অতিরিক্ত বিষয়। ফলে ইহা সুন্নত হতে পারে না। বরং তা পরিত্যাগ করাই উত্তম। (২) এটি একটি রাফেযী সম্প্রদায়ের প্রতীক। এজন্যই তাদের সাদৃশ্য থেকে বেঁচে থাকার নিমিত্তে তা না করাই উত্তম। (৩) তাছাড়া

তাশাহহুদের সময় রানের উপর হাত রাখা সুন্নত। আর তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতে গেলে সুন্নত পরিত্যাগ করতে হয়।

* উপরন্তু মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) বলেন, তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করার হাদীস অসঙ্গতিপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল। তাই এর উপর আমল না করাই উত্তম। (تنظيم ج١ ص٣٠٣)

* চার ইমাম, জমহুর উলামা ও মিশরীয় উলামাদের মতে, তাশাহহুদে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা প্রমাণিত এবং সুন্নত। (تنظيم ج١ ص٣٠٣)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- مَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ– অর্থাৎ, রাসূল তোমাদের নিকট যা নিয়ে আসেন তোমরা তা গ্রহণ কর। (হাশরঃ ৭)
وَمَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ– অর্থাৎ, যে লোক রাসূলের অনুসরণ করল, সে আল্লাহরই অনুসরণ করল। (নিসাঃ ৮০)
তাই ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) মুয়াত্তায় শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা সংক্রান্ত একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলই আমরা গ্রহণ করি। আর এটাই ইমাম আবু হানিফার মাযহাব।" (مؤطا امام محمد ص١٠٨–١٠٩)

দলীল (২)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (৩)ঃ ... حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... اَشَارَ بِاِصْبَعِهِ وَاَرَانَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ– (ابو داود ج١ ص١٤٢)

অর্থাৎ, ... আমের ইবন আব্দুল্লাহ ইবনুয্ যুবাইর (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ... শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন।
তাছাড়া কতক মুহাদ্দিস তাশাহহুদে তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করার হাদীসকে মুতাওয়াতির বলে গণ্য করেন। এমনকি এর উপর সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন এবং সালফে সালেহীনদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ব্যাপারে আব্দুল বার বলেন- لَا خِلَافَ فِيْ ذٰلِكَ– (تنظيم ج١ ص٣٠٣) অর্থাৎ, এতে কোন মতানৈক্য নেই।

জবাবঃ যারা বলেন, ইশারা করা একটি অতিরিক্ত ঝামেলা, তাদের দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, এটি যদি ছেড়ে দেয়াই উত্তম হত, তাহলে নবী করীম (সাঃ) এমনটি করতেন না।

* যারা তাশাহহুদে তর্জনী ইশারাকে রাফেজী সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য মনে করে স্বীকৃতি দেন না, তাদের জবাবে বলা যায়, নিছক সাদৃশ্য নাজায়েয নয়। বরং ঐ সমস্ত কর্মসমূহের সাদৃশ্য নাজায়েয, যেগুলোকে তারা নিজেরা মনগড়াভাবে প্রচলিত করেছে এবং তা তাদের প্রতীক হয়ে গেছে। আর তাশাহহুদে ইশারা করা তাদের পক্ষ থেকে নতুন কোন আবিষ্কৃত বিষয় নয়, বরং তা হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং ইশারা রাফেজী সম্প্রদায়ের নিজস্ব কোন প্রতীক নয়; ইহা ইসলামের প্রতীক।

* তাছাড়া আরেকটি যে অভিযোগ দেয়া হয়, রানের উপর হাত রাখা সুন্নত, যা ইশারা করার দ্বারা তরক হচ্ছে। আসলে ব্যাপারটি এমন নয়, বরং হাত তো রানের উপরেই থাকে। শুধুমাত্র আঙ্গুল উঠানো হচ্ছে। এতে সুন্নত তরক হল কিভাবে? বরং এক সুন্নতের সাথে আরেকটি সুন্নত আদায় হচ্ছে। অথবা বলা যায়, সেক্ষেত্রে হাতের তালু একটু উপরে উঠলেও এক সুন্নতকে তরক করে অন্য সুন্নতের উপর আমল করা হচ্ছে। যা সহীহ হাদীস দ্বার স্বীকৃত।

* মুজাদ্দিদ আলফে সানী (রহ.) যে ইযতিরাব (অসঙ্গতি)-এর কথা উল্লেখ করেছেন, সেক্ষেত্রেও আমরা হাদীসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে, খোদ ইশারার ব্যাপারে কোন ইযতিরাব নেই; বরং ইশারার পদ্ধতির মধ্যে হাদীসের বিভিন্ন ধরন পাওয়া যায়। যাকে তিনি ইযতিরাব বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং যে "ইশারা" অকাট্য দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত তা অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই। (درس مشكوة ج٢ ص٨٣، معارف السنن ج٣ ص١٠٥–١٠٩)

* উল্লেখ্য যে, ইশারার ধরনের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকারের হাদীস পাওয়া যায়। মূলত ইহা সময় ও অবস্থাভেদে হয়েছে। কখনো প্রিয় নবী (সাঃ) ইশারা একভাবে করেছেন, আবার কখনো অন্যভাবে। তাই তন্মধ্যে প্রত্যেকটির উপর আমল করা জায়েয। যেমন, ইবন উমর (রাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে, কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা আঙ্গুলকে বন্ধ করে বৃদ্ধাঙ্গুলিকে শাহাদাত আঙ্গুলির গোড়ায় রেখে তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে।

*. আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর (রাঃ)-এর হাদীসে এসেছে, উল্লিখিত তিন আঙ্গুলকে বন্ধ করে বৃদ্ধাঙ্গুলকে মধ্যমা আঙ্গুলের উপর রেখে ইশারা করবে।

* ওয়ায়েল ইবন হুজর (রাঃ)-এর হাদীসে এসেছে, কনিষ্ঠা এবং অনামিকা আঙ্গুলকে বন্ধ করে মধ্যমা এবং বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা বৃত্ত বানিয়ে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে। আহনাফদের নিকট এই পদ্ধতিই উত্তম। (تنظيم ج١. ص٣٠٤)

অতঃপর বৃত্ত বা বন্ধন করার সময় নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, তাশাহহুদের শুরু থেকেই বন্ধন করবে, এবং "আশহাদু" বলার সময় আঙ্গুল উঠাবে এবং "লা ইলাহা" বলার সময় নিচে নামিয়ে ফেলবে।

* অতঃপর কতক রেওয়ায়েতে এসেছে, উপর-নিচে নাড়াবে। এবং কতক রেওয়ায়েতে এসেছে, ডানে-বামে নাড়াবে। এবং কতক রেওয়ায়েতে স্থির রাখার কথা বলা হয়েছে।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, আঙ্গুলসমূহ তাশাহহুদের প্রথম থেকেই খোলা রাখবে এবং لَا اِلٰهَ বলার সময় বৃত্ত বানিয়ে শাহাদাত আঙ্গুল উঠাবে এবং اِلَّا اللهُ বলার সময় আঙ্গুল নামিয়ে ফেলবে।

(فتح القدير ج١ ص٢٢١، معارف السنن ج٣ ص١٠٥، تنظيم ج١ ص٣٠٤، درس مشكوٰة ج٢ ص٨٤)

بَابُ فِيْ السَّلَامِ ص١٤٣ ঃ সালাম সম্পর্কে

... عَنْ عَبْدِ اللهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ–

(ترمذي ج١ ص٦٥ باب التسليم في الصلوٰة، ابن ماجة ص٦٦)

অনুবাদঃ ... আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে এমনভাবে মুখ ঘুরিয়ে সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর মুখমণ্ডলের শুভ্র অংশটি পরিলক্ষিত হত এবং তিনি আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে সালাম ফিরাতেন।

বিশ্লেষণঃ নামাযের মধ্যে সালামের সংখ্যা কয়টি এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক ও আওযাঈ (রহ.)-এর মতে, ইমাম শুধু একবার নিজের সামনের দিকে মুখ তুলে সালাম দেবেন, অতঃপর হালকা ডান দিকে মোড় নেবেন। আর মুক্তাদী তিন সালাম করবে। একটি সামনের দিকে ইমামের সালামের জবাবের জন্য, একটি করে ডানে ও বামে সালাম ফিরাবে।

দলীল (১)ঃ ... عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلٰوةِ تَسْلِيْمَةً وَّاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهٖ ثُمَّ يَمِيْلُ اِلَى الشِّقِّ الْاَيْمَنِ شَيْئًا– (ترمذي ج١ ص٦٦ باب التسليم في الصلٰوة، ابن ماجة ص٦٦)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে সামনের দিকে একটি সালাম ফিরাতেন। অতঃপর ডান দিকে সামান্য ঝুকতেন।

দলীল (২)ঃ হযরত ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদীস। এতে সালিম ইবন আব্দুল্লাহ স্বীয় পিতা হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ)-এর সফরের নামাযের ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন-

... فَصَلَّى الْعِشَآءَ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ سَلَّمَ وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهٖ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمْ اَمْرٌ يَخْشٰى فَوْتَهُ فَلْيُصَلِّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ– (نسائي ج١ ص٩٩ باب الوقت الذي يجمع فيه الخ)

অর্থাৎ, ... অতঃপর তিনি ইশার নামায আদায় করলেন, তাতে তিনি একবার সালাম ফিরালেন চেহারার দিকে। অতঃপর বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কারো সামনে এমন কোন বিষয় উপস্থিত হয় যা ফওত হওয়ার আশংকা হয়, তখন যেন সে এই নামায আদায় করে।
এতে প্রমাণিত হয় যে, নামাযে একটি সালাম করাই উত্তম।

* ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী, ইবন মুবারক ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, নামাযে ইমাম-মুক্তাদী ও মুনফারিদ (একাকী নামায আদায়কারী) সবার উপর দু'দুটি সালাম ওয়াজিব। একটি ডান দিকে অপরটি বাম দিকে।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَتْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَّمِيْنِهٖ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَعَنْ شِمَالِهٖ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ– (ابو داود ج١ ص١٤٣)

অর্থাৎ, ... আলকামা ইবন ওয়ায়েল (রহ.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে নামায আদায় করি। তিনি সালাম ফিরাবার সময় প্রথমে ডান দিকে ফিরে "আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" বলেন এবং বাম দিকে ফিরে "আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বলেন।

উল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামাযে দু'দুটি সালাম ওয়াজিব।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ জমহুর উলামা হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসটিকে যঈফ (দুর্বল) সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, উক্ত হাদীসের সনদে যুহাইর ইবন মুহাম্মদ নামক একজন রাবী রয়েছেন। তার ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, শামবাসী তার সূত্রে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। আর এ রেওয়ায়েতটিও শামবাসী থেকে বর্ণিত। অতএব, এটি গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ কতক উলামা বলেছেন যে, এটি ওযরের অবস্থায় প্রযোজ্য। যা রেওয়ায়েতের শেষ বাক্যটিতেও এর সমর্থন রয়েছে। কিন্তু এই উত্তরটি কেবল তাদের মাযহাব মতে তো সঠিক হতে পারে, যারা প্রথম সালামকে ওয়াজিব এবং দ্বিতীয় সালামকে সুন্নত বা মুস্তাহাব বলেন। এমতাবস্থায় এ উত্তরটি (হানাফীদের পক্ষ থেকে) সহীহ হবে না। কারণ তাঁদের মতে উভয় সালাম ওয়াজিব। তাই আল্লামা আইনী (রহ.) এ ব্যাপারে একটি সুন্দর জবাব দিয়েছেন, "নবী করীম (সাঃ) হয়ত কোন সময় এত আস্তে দ্বিতীয় সালাম বলেছিলেন যে, কেউ কেউ এখানে একটি সালামই মনে করেছেন।"

তাছাড়া, অসংখ্য রেওয়ায়েতের মুকাবিলায় কয়েকটি শায বা নগণ্য রেওয়ায়েতকে কিভাবে প্রাধান্য দেয়া যায়? অথচ ইমাম তাহাভী (রহ.) যেখানে অনেক সাহাবা (রাঃ) থেকে দুই সালামের একাধিক মুতাওয়াতির হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতএব, হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, নামাযে দুই সালাম ওয়াজিব। (درس ترمذي ج١ ص٦٤–٦٥)

بَابُ مَنْ قَالَ يُلْقِيْ الشَّكَّ ص١٤٧

যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে সন্দিহান হয়েছে

... عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلٰوتِهِ فَاِنِ اسْتَيْقَنَ اَنْ قَدْ صَلّٰى ثَلَاثًا فَلْيَقُمْ فَلْيُتِمَّ رَكْعَةً بِسُجُوْدِهَا ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ فَاِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ اِلاَّ اَنْ يُّسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ–

অনুবাদঃ ... যায়েদ ইবন আসলাম (রাঃ) রাবী মালিকের সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ যদি তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে সন্দেহে পতিত হয় এবং তার দৃঢ়ভাবে মনে হয় যে, সে (চার রাকাতের স্থলে) তিন রাকাত আদায় করেছে, তখন সে যেন চতুর্থ রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে তা সিজদা

সহকারে আদায় করে। অতঃপর তাশাহহুদ পাঠের নিমিত্তে বসবে। তাশাহহুদ পাঠের পর বসা অবস্থায় সালাম ফিরিয়ে দুটি সিজদা দেবে এবং সবশেষ পুনরায় সালাম ফিরাবে।

বিশ্লেষণঃ যদি কারো নামাযের মধ্যে এই সন্দেহ হয় যে, সে কত রাকাত নামায পড়েছে, বেশি পড়েছে নাকি কম পড়েছে, তখন নামাযী কি করবে, এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছেঃ

* ইমাম আওযাঈ ও শাবী (রহ.)-এর মতে, মুসল্লী যদি নামাযের রাকাত সংখ্যায় সন্দিহান হয় তাহলে সর্বাবস্থায় নামায দোহরানো ওয়াজিব। ব্যতিক্রম শুধু তখন যখন রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে ইয়াকীন হয়ে যায়।

দলীলঃ عَنِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِيْ لاَ يَدْرِيْ ثَلاَثًا صَلّٰى اَوْ اَرْبَعًا قَالَ يُعِيْدُ حَتّٰى يَحْفَظَ–

(مصنف ابن ابي شيبة ج٢ ص٢٨)

অর্থাৎ, ইবন উমর (রাঃ) যে মুসল্লী তিন রাকাত পড়েছে না চার রাকাত পড়েছে তা সে জানে না এরূপ মুসল্লী সম্পর্কে বলেছেন, সে নামায দোহরিয়ে নিবে। যতক্ষণ না নিশ্চিতভাবে মনে আসে।

* হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর মতে, সর্বাবস্থায় সিজদা সাহু ওয়াজিব। কমের উপর ভিত্তি করুক অথবা বেশির উপর ভিত্তি করুক।

দলীলঃ ... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ يُصَلِّيْ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبِسَ عَلَيْهِ حَتّٰى لاَ يَدْرِيْ كَمْ صَلّٰى فَاِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ ذٰلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ– (ابو داود ج١ ص١٤٧ باب من قال يتم على اكبر ظنه، بخاري ج١ ص٥٨، مسلم ج١ ص٢١٠ باب السهو في الصلوة والسجود، ترمذي ج١ ص٩٠ باب من يشك في الزيادة والنقصان، نسائي ج١ ص١٨٥ باب التحري، ابن ماجة ص٨٦)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়ায়, তখন শয়তান তার নিকট এসে তাকে ধোঁকা দিতে দিতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে দেয় যে, সে কয় রাকাত নামায আদায় করেছে, তা স্মরণ করতে পারে না। তোমাদের কারো যখন এমন অবস্থা হবে, তখন সে যেন বসা অবস্থায় দুটি সিজদা দেয়।

উক্ত হাদীসে কম বা বেশির কথা উল্লেখ নেই; বরং ব্যাপকভাবে দুটি সাহু সিজদা দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, এমন সন্দিহান অবস্থায় কমের উপর ভিত্তি করা ওয়াজিব। এবং এরূপ প্রতিটি রাকাতে বসা ওয়াজিব যাতে সম্ভাবনা থাকে যে, ইহা শেষ রাকাত হতে পারে এবং সিজদায়ে সাহু দেওয়াও ওয়াজিব।

দলীলঃ ... عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا سَهَا اَحَدُكُمْ فِيْ صَلٰوتِهٖ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلّٰى اَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلٰى وَاحِدَةٍ فَاِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلّٰى اَوْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلٰى ثِنْتَيْنِ فَاِنْ لَّمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلّٰى اَوْ اَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلٰى ثَلَاثٍ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُّسَلِّمَ– (بخاري ج۱ ص۵۸، مسلم ج۱ ص۲۱۱، ترمذي ج۱ ص۹۰–۹۱)

অর্থাৎ, ... আব্দুর রহমান ইবন আউফ (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের কেউ নামাযে ভুলে যায়, ফলে এক রাকাত পড়েছে না দু'রাকাত তা ঠিক করতে না পারে, তখন সে যেন, অবশ্যই এক রাকাতের উপর ভিত্তি করে। যদি দু'রাকাত পড়েছে, না তিন রাকাত পড়েছে তা ঠিক করতে না পারে, তবে দু' রাকাতের উপর ভিত্তি করবে। আর যদি তিন রাকাত পড়েছে, না চার রাকাত পড়েছে তা ঠিক করতে না পারে, তবে তিন রাকাতের উপর ভিত্তি করবে এবং সালাম দেয়ার পূর্বে দুটি সিজদা করবে।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, এ মাসআলাটিতে বিশ্লেষণ রয়েছে-
(১) যদি মুসল্লীর এই সন্দেহ জীবনে প্রথমবার হয়, তাহলে নামায দোহরিয়ে পড়া ওয়াজিব। (২) আর যদি সন্দেহ বারবার হয়, তাহলে নামায পুনরাবৃত্তি করা ওয়াজিব নয়, বরং সে চিন্তা-ফিকির করবে। চিন্তা-ফিকিরের পরে যেদিকে তার প্রবল ধারণা জন্মিবে তার উপর আমল করবে। (৩) আর এই চিন্তা-ফিকিরের পরে যদি কোন দিকে প্রবল ধারণা না জন্মে তাহলে কমের উপর ভিত্তি করবে এবং শেষে সিজদায়ে সাহু করবে। উল্লেখ্য যে, কমের উপর ভিত্তি করার ক্ষেত্রে যেসব রাকাতে সর্বশেষ রাকাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেগুলোতে বসাও জরুরী।

দলীল (১)ঃ عَنْ طَاؤُسٍ قَالَ اِذَا صَلَّيْتَ فَلَمْ تَدْرِ كَمْ صَلَّيْتَ فَأَعِدْهَا مَرَّةً فَاِنْ اُنْسِيْتَ عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰى فَلَا تُعِدْهَا– (مصنف ابن ابي شيبة ج۲ ص۲۸)

অর্থাৎ, তাউস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তুমি নামায পড় আর কত রাকাত পড়েছ তা তোমার মনে না থাকে, তখন এই নামায পুনরায় আদায় কর। যদি আবার তোমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়, তাহলে আর তা পুনরায় পড়বে না।

দলীল (২)ঃ ঐ হাদীস, যা ইমাম আওযাঈ (রহ.) দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। (উল্লিখিত দলীল দুটি নামায পুনরায় পড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

দলীল (৩)ঃ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ... اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ– (مسلم ج١ ص٢١٢ باب السهو في الصلٰوة السجود، بخاري ج١ ص٥٨ باب التوجه نحو القبلة الخ، نسائي ج١ ص١٨٤، ابن ماجة ص٨٦)

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। ... নবী করীম (সাঃ) বলেন, তোমাদের কারো যদি নামাযে সন্দেহ হয়, তবে ভেবে-চিন্তে যেটি সঠিক মনে হবে, তার ভিত্তিতে নামায পূর্ণ করে নিবে। অতঃপর দুটি সিজদা করবে।
(এই দলীলটি চিন্তা-ফিকির করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

দলীল (৪)ঃ ঐ হাদীস যা তিন ইমাম দলীল হিসেবে পেশ করেছেন।
(উক্ত হাদীসটি কমের উপর ভিত্তি করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

হানাফী মাযহাবের প্রাধান্যের কারণঃ উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, এই মাসআলায় ব্যাপক এখতেলাফ হওয়ার মূল কারণ হল, এখতেলাফপূর্ণ রেওয়ায়েত। কেননা কতক রেওয়ায়েতে নামায আবার পড়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। আবার কতক রেওয়ায়েতে চিন্তা-ফিকির করার হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং সে অনুযায়ী প্রবল ধারণার উপর ভিত্তি করে আমল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আবার কতক রেওয়ায়েতে কমের উপর ভিত্তি করার হুকুম দেয়া হয়েছে। আবার কতক রেওয়ায়েতে সিজদায়ে সাহুর হুকুম দেয়া হয়েছে।

* তিন ইমাম এসব হাদীসসমূহ থেকে কমের উপর ভিত্তি করার হাদীসসমূহ গ্রহণ করেছেন এবং এর সাথে রয়েছে সিজদায়ে সাহুর হাদীস।
* আর ইমাম আওযাঈ ও শাবী (রহ.) নতুনভাবে নামায পড়ার হাদীসগুলো গ্রহণ করেছেন, আর বাকীগুলোকে অগ্রাহ্য করেছেন।
* আর হাসান বসরী (রহ.) শুধু সিজদায়ে সাহুর হাদীস গ্রহণ করেছেন।
* কিন্তু যদি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতামতের দিকে বিচক্ষণতার সাথে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে দেখা যায়, তিনি এ সবগুলো হাদীসের উপর আমল করেছেন এবং প্রত্যেকটি হাদীসের একটি বিশেষ প্রয়োগক্ষেত্র সাব্যস্ত করে সবগুলো হাদীসের মাঝে এক অপূর্ব ও সর্বোত্তম সামঞ্জস্য বিধান করেছেন।
* যে সকল হাদীসে নামায পুনরায় পড়ার হুকুম রয়েছে, সে সকল হাদীস ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে, যার জীবনে প্রথমবার নামাযে সন্দেহ হয়।
* আর যে সকল হাদীসে চিন্তা-ফিকিরের হুকুম রয়েছে, সে সকল হাদীস ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে, যার নামাযে প্রায়ই সন্দেহ হয়ে থাকে।

* আর যে সকল হাদীসে কমের উপর ভিত্তি করার হুকুম রয়েছে, সে সকল হাদীস ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে, যার চিন্তা-ফিকিরের দ্বারাও নামাযের রাকাতের নির্দিষ্ট সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রবল ধারণা না জন্মে। (درس ترمذي ج٢ ص١٤٨–١٥٠)

بَابُ الْجُمُعَةِ فِيْ الْقُرٰى ص١٥٣

গ্রামাঞ্চলে জুমআর নামাযের বিধান

... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِيْ الاِسْلَامِ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ لَجُمُعَةٌ جُمِّعَتْ بِجُوَاثَا قَرْيَةٌ مِّنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ قَالَ عُثْمَانُ قَرْيَةٌ مِّنْ قُرٰى عَبْدِ الْقَيْسِ– (بخاري ج١ ص١٢٢ باب الجمعة في القرى والمدن)

অনুবাদঃ ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইসলামের প্রথম জুমআ মদীনাতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মসজিদে (মসজিদে নববীতে) অনুষ্ঠিত হওয়ার পর অন্য যেখানে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছে তা হল বাহ্‌রাইনের আব্দুল কায়েস গোত্রে অবস্থিত "জোওয়াছা" নামক গ্রামে। রাবী উসমান (রহ.) বলেন, তা আব্দুল কায়েস নামীয় গোত্রের বসতি এলাকা।

বিশ্লেষণঃ এখানে দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হবে-
(ক) যারা গ্রামে বা শহর থেকে দূরে, তাদের উপর কত দূর থেকে জুমআর নামাযে অংশগ্রহণ করা ওয়াজিব।
(খ) গ্রামে জুমআ আদায় সংক্রান্ত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

প্রথম আলোচনাঃ ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, যে ব্যক্তি শহর থেকে এতটুকু দূরে অবস্থান করে যে, শহরে জুমআর নামাযের জন্য এসে সূর্যাস্তের পূর্বেই নিজ বাড়িতে পৌঁছতে পারে, এমন ব্যক্তির জন্য জুমআতে অংশগ্রহণ করা ওয়াজিব। আর যে ব্যক্তি এর থেকে বেশি দূরে থাকে তার জন্য জুমআতে অংশগ্রহণ করা ওয়াজিব নয়। কোন কোন হানাফী আলিমের অভিমতও অনুরূপ। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর একটি মতও তাই।

দলীলঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত-

اَلْجُمُعَةُ عَلٰى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ اِلٰى اَهْلِه– (ترمذي ج١ ص١١٢ باب من كم يؤدى الى الجمعة)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি (জুমআর নামায আদায় করে) তার পরিবারে এসে রাত্রি যাপন করতে পারবে, তার উপর জুমআ আবশ্যক।

* ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল ও মালিক (রহ.)-এর মতে, জুমআ ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব, যে শহর থেকে এতটুকু দূরে অবস্থান করে যেখানে সে আযানের আওয়ায শুনতে পায়। অতএব, যে শহর থেকে এত দূরে থাকে যার ফলে আযানের আওয়ায শুনতে পায় না, তার উপর জুমআ ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর একটি মতও তাই। (معارف السنن ج٤ ص٣٤٥)

দলীলঃ ... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ– (ابو داود ج١ ص١٥١ باب من تجب عليه الجمعة)

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির উপর জুমআর নামায ওয়াজিব, যে আযান শুনতে পায়।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, জুমআ ঐ ব্যক্তির জন্য ফরয যে শহরে বা শহরতলীতে বসবাস করে। (التعليق الصبيح ج٢ ص١٣٨)

দলীলঃ দ্বিতীয় আলোচনায় কুরআন ও হাদীস দ্বারা হানাফীদের প্রদত্ত দলীলসমূহ দ্রষ্টব্য।

জবাবঃ ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর প্রদত্ত দলীলের জবাবঃ ইমাম তিরমিযী এবং বায়হাকী (রহ.) উক্ত হাদীসকে যঈফ বলেছেন। এবং ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) উক্ত হাদীসটি শোনার পর এ হাদীসের রাবীকে বললেন-

اِسْتَغْفِرْ رَبَّكَ اِسْتَغْفِرْ رَبَّكَ– (ترمذي ج١ ص١١٢)

অর্থাৎ, তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।
সুতরাং এমন একটি দুর্বল হাদীস হানাফীদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সহীহ হাদীসের বিপরীতে দলীলযোগ্য হতে পারে না।

ইমাম আহমদ ও মালিক (রহ.)-এর প্রদত্ত দলীলের জবাবঃ
(১) ইমাম আবু দাঊদ (রহ.) উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন, একদল মুহাদ্দিস এই হাদীসটি সুফিয়ান থেকে আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ)-এর উপর মাওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছে। সুতরাং হাদীসটি মারফূ নয়।
(২) তাছাড়া, যে ব্যক্তি খুব বড় শহরে অবস্থান করবে, কোন কোন সময় সে হয়ত আযান নাও শুনতে পারে। সুতরাং আযান শোনার উপর জুমআর নামায ভিত্তি করা মোটেই সমীচীন নয়। (تنظيم ج١ ص٤٥٤–٤٥٥)

দ্বিতীয় আলোচনাঃ গ্রামে জুমআ আদায় সংক্রান্ত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণঃ গ্রামে জুমআর নামায আদায় করা যায় কিনা, এ সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, গ্রাম হোক কিংবা শহর হোক, সর্বত্রই জুমআর নামায আদায় করা ওয়াজিব। অর্থাৎ, গ্রামে জুমআ আদায়ে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে এজন্য সেখানে মসজিদ বা বাজার থাকা শর্ত।
* ইমাম শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, জুমআর জন্য শহর হওয়া শর্ত নয়, বরং প্রত্যেক ঐ গ্রামে জুমআ আদায় করা ওয়াজিব যেখানে কমপক্ষে এমন চল্লিশজন পুরুষ রয়েছে, যারা বোধশক্তিসম্পন্ন, বালেগ, মুকীম ও স্বাধীন।

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ–

অর্থাৎ, জুমআর দিনে যখন নামাযের জন্য ডাকা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে দৌড়াও (ত্বরা কর) এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। (জুমআঃ ৯)

উক্ত আয়াতে "فَاسْعَوْا" (দৌড়াও) শব্দটি সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে শহর কিংবা গ্রাম উল্লেখ করা হয়নি।

দলীল (২)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে "জোওয়াছা"কে গ্রাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, গ্রামেও জুমআ হতে পারে।

দলীল (৩)ঃ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعَبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ اَبِيْهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ عَنْ اَبِيْهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ كَانَ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِاَسْعَدِبْنِ زُرَارَةَ فَقُلْتُ لَهُ مَا لَكَ اِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لِاَسْعَدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ لِاَنَّهُ اَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِنَا فِيْ هَزْمِ النَّبِيْتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِيْ بَيَاضَةَ فِيْ نَقِيْعٍ يُّقَالُ لَهُ نَقِيْعُ الْخَضَمَاتِ قُلْتُ كَمْ اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ اَرْبَعُوْنَ (ابو داود ج۱ ص۱۵۳، ابن ماجة ص۷۷)

অর্থাৎ, আব্দুর রহমান ইবন কাব ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁর পিতা কাব (রাঃ)-এর দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হওয়ার পর তিনি তাঁর চালক ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা কাব (রাঃ)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, তাঁর পিতা যখন জুমআর নামাযের আযান শুনতেন, তখন আসআদ ইবন যুরারা (রাঃ)-এর জন্য দোআ করতেন। তাঁর এরূপ দোআ করার কারণ সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, যেহেতু তিনি য়ামানের "হায্ম আল্-নাবিত" নামক গ্রামে আমাদের জন্য সর্বপ্রথম জুমআর নামায কায়েম করেন। এই স্থানটি নাকী নামক স্থানের "বনু বায়াদার হার্রাতে" অবস্থিত এবং তা "নাকী আল্-খাদামাত" হিসেবে প্রসিদ্ধ। তখন আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করি, সে সময়ে সংখ্যায় আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বলেন, চল্লিশজন।

এতে প্রমাণিত হয় যে, চল্লিশজন ব্যক্তির এলাকায়ও জুমআ পড়া যায়।

দলীল (৪)ঃ এ কথার উপর সকল রাবী একমত যে, নবী করীম (সাঃ) সর্বপ্রথম জুমআ কুবা থেকে মদীনায় আসার পথে বনূ সালিম মহল্লায় আদায় করেছিলেন। আর এটি একটি ছোট গ্রাম ছিল। (آثار السنن ص۲۳۲)

দলীল (৫)ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত-

اِنَّهُمْ كَتَبُوْا اِلٰى عُمَرَ يَسْأَلُوْنَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ فَكَتَبَ عُمَرُ جَمِّعُوْا حَيْثُ كُنْتُمْ– (مصنف ابن ابي شيبة ج۲ ص۱۰۱–۱۰۲)

অর্থাৎ, তারা উমর (রাঃ)-এর নিকট জুমআর ব্যাপারে জানতে চেয়ে লিখে পাঠাল। উমর (রাঃ) তাদের উত্তরে লিখলেন, তোমরা যেখানে থাক না কেন জুমআ আদায় কর।

হযরত উমর (রাঃ) শর্তহীনভাবে প্রত্যেক জায়গায় জুমআ কায়েম করার হুকুম দিয়েছেন। তিনি শহর কিংবা গ্রাম নির্দিষ্ট করেননি। সুতরাং বুঝা গেল জুমআর জন্য শহর শর্ত নয়, বরং গ্রামেও জুমআ আদায় করা শুদ্ধ হবে।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, জুমআ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শহর বা শহরতলী হওয়া শর্ত। যেখানে কমপক্ষে চার হাজার লোক বাস করে। তাঁর মতে, গ্রামে জুমআ জায়েয নয়।

* এখানে উল্লেখ্য যে, শহরের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে হানাফী-মাশায়েখদের ভিন্ন ভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়।

* কেউ কেউ শহরের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, "এমন এলাকাকে শহর হিসেবে গণ্য করা হবে, যেখানে সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান অথবা তাঁর প্রতিনিধি বিদ্যমান।"

* কেউ কেউ বলেন, "শহর ঐ এলাকাকে বলা হবে, যেখানকার সবচেয়ে বড় মসজিদে ঐ এলাকার সকল মানুষের স্থান সংকুলান হয় না।"

* আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন, যে এলাকায় বাজার আছে, অধিকাংশ লোকের প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা আছে, যেখানে চার হাজার পুরুষ লোক বসবাস করে, তাকেই শহর বলে। আর যেখানে নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অনেক দূর যেতে হয়, তাই গ্রাম। (الكوكب الدري ج۱ ص۱۹۹)

মূল কথা হল, শহরের নির্দিষ্ট কোন সমন্বিত ও যথার্থ সংজ্ঞা দেয়া মুশকিল। বরং ইহা প্রচলিত ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে। কেননা, সভ্যতা ও তমুদ্দুনের উপর ভিত্তি করে প্রত্যেক সময়ের প্রচলিত ঐতিহ্য পরিবর্তন হয়। অতএব, যে সময়ে প্রচলিত ঐতিহ্য যাকে শহর বলে, তাই শহর।

তবে বর্তমানে শহর বলা হবে সাধারণত ঐ সমস্ত জায়গাকে, যেখানে ডাকঘর, যানবাহন, টেলিফোন, পুলিশ স্টেশন, বাজার, হাসপাতাল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি থাকবে এবং যেখানে সাধারণত সবধরনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাওয়া যায়।

(درس مشكوة ج٢ ص١٣٥)

আবু হানিফা (রহ.)-এর অভিমতের দলীলঃ (১) সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) যখন বিভিন্ন দেশ জয় করেন, তখন জুমআর জন্য শহরে মিম্বর তৈরী করেন কিন্তু কোন রেওয়ায়েতে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তাঁরা কোন গ্রামাঞ্চলে জুমআ কায়েম করেছেন। তাহলে বুঝা যায়, একথার উপর সাহাবাদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, গ্রামাঞ্চলে জুমআ শুদ্ধ হবে না।

তাছাড়া নবী করীম (সাঃ)-এর সময় মসজিদে নববী ব্যতীত অন্য মসজিদও ছিল, কিন্তু জুমআ শুধু মসজিদে নববীতেই অনুষ্ঠিত হত, না মসজিদে কুবাতে, না অন্য কোন মসজিদে। এতে প্রমাণিত হয় যে, জুমআর জন্য শহর হওয়া শর্ত। ছোট গ্রাম বা বস্তিতে জুমআ জায়েয নয়।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُوْنَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَّنَازِلِهِمْ وَمِنَ الْعَوَالِيْ– (ابو داود ج١ ص١٥١ باب من تجب عليه الجمعة، بخاري ج١ ص١٢٣ باب من اين تؤتي الجمعة الخ)

অর্থাৎ, ... নবী করীম (সাঃ)-এর স্ত্রী আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন নিজ নিজ ঘর হতে (মদীনা শহরে) জুমআর নামায আদায়ের জন্য পালাক্রমে মসজিদে নববীতে আগমন করতেন, এমনকি "আওয়ালীয়ে মদীনা" (অর্থাৎ মদীনার পূর্বে অবস্থিত গ্রামগুলো) হতেও লোকজন আসত।

এতেও বুঝা যায় যে, যদি ছোট বস্তিগুলোতে জুমআ জায়েয হত তাহলে তাদেরকে জুমআর জন্য মদীনায় আগমনের প্রয়োজন ছিল না।

দলীল (৩)ঃ হযরত আলী (রাঃ)-এর আছার-

لاَ جُمُعَةَ وَلاَ تَشْرِيْقَ اِلاَّ فِيْ مِصْرٍ جَامِعٍ– (مصنف ابن ابي شيبة ج٢ ص١٠١)

অর্থাৎ, জুমআ ও তাকবীরে তাশরীক বড় শহর ছাড়া অন্যত্র (জায়েয) নেই।

যদিও কেউ কেউ উক্ত আছারটিকে মাওকূফ বলে থাকেন, কিন্তু হাদীসের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করলে একথা বলা যায় যে, এর সনদ বিলকুল সহীহ। তাই হাফিয ইবন হাজার (রহ.) মুসান্নাফে আব্দুর রায্‌যাক সূত্রে এই আছারটি বর্ণনা করার পর লিখেছেন- اِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ– (الدراية في تخريج احاديث الهداية ج١ ص٢١٤)

অর্থাৎ, এর সনদ সহীহ।

দলীল (৪)ঃ সহীহ রেওয়ায়েতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, বিদায় হজ্জে আরাফাতে অবস্থান হয়েছিল জুমআর দিনে। (بخاري ج١ ص١١ باب زيادة اليمان ونقصانه)

এ ব্যাপারেও রেওয়ায়েত আছে যে, নবী করীম (সাঃ) আরাফায় জুমআর নামায আদায় করেননি, বরং তিনি যুহরের নামায আদায় করেছেন।

(مسلم ج۱ ص۳۹۷ باب حجة النبي صلعم)

এর কারণ এতদ্ব্যতীত অন্য কিছু নয় যে, জুমআর জন্য শহর হওয়া শর্ত। কিন্তু আরাফা শহর নয়।

যদিও কতক শাফেঈ মতাবলম্বী জুমআ না পড়ার কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) মুসাফির ছিলেন। কিন্তু এ দলীল ঠিক নয়। কারণ, নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে বিরাট একটি জামাআত ছিল মুকীমদের। মক্কাবাসী সবাই তো মুকীম ছিলেন। তাঁদের উপর জুমআ ওয়াজিব ছিল। অতএব, প্রশ্ন হয় যে, নবী করীম (সাঃ) তাঁদের জন্য জুমআর ব্যবস্থা কেন করেননি। যদিও জুমআর নামায মুসাফিরের ওপর ওয়াজিব নয়। কিন্তু নাজায়েযও নয়। সুতরাং নবী করীম (সাঃ) যদি তথায় জুমআর নামায পড়তেন, তাহলে তাঁর নামাযও আদায় হয়ে যেত, পাশাপাশি মুকীমদেরও নামায আদায় হত। তা সত্ত্বেও তিনি যে শুধু নিজেই জুমআর নামায পড়েননি তা নয়; বরং মুকীমদেরকেও পড়ার নির্দেশ দেননি। এমনকি তথায় নবী করীম (সাঃ)-এর খুতবা দেওয়ার কথাও প্রমাণিত আছে। অতএব, তাঁর জুমআ না পড়ার ব্যাখ্যা শুধু এটাই হতে পারে যে, তা শহর না হওয়ার কারণে যেখানে জুমআ জায়েয ছিল না।

দলীল (৫)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ– (الجمعة ٩)

উক্ত আয়াতে বেচা-কেনা ছেড়ে আল্লাহর স্মরণের দিকে ছুটে আসার কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, জুমআ বাণিজ্যিক এলাকার জন্য নির্ধারিত। আর শহরই হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র। সুতরাং সেখানে ছাড়া অন্যত্র জুমআ ওয়াজিব নয়।

(درس مشكوة ج۲ ص١٣٤)

জবাবঃ আহনাফদের পক্ষ থেকে শাফেঈদের প্রথম দলীলের জবাবঃ উল্লিখিত আয়াতে জুমআর দিকে দৌড়ে যাওয়াকে আযানের উপর মাওকূফ বা নির্ভরশীল করা হয়েছে। আর উক্ত আয়াতে ইহা বর্ণনা করা হয়নি যে, আযান কোথায় হওয়া উচিত, আর কোথায় না হওয়া উচিত। সুতরাং গ্রামে যেহেতু জুমআর আযান (ندا) হবে না, সেহেতু জুমআর জন্য দ্রুত যাওয়াও ওয়াজিব হবে না।

আল্লামা কাসিম নানুতভী (রহ.) এই আয়াতের দ্বারা হানাফীদের অভিমত প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেন, উক্ত আয়াতে জুমআর জন্য সায়ী (দ্রুত যাওয়া)-এর হুকুম

দেওয়া হয়েছে। যার অর্থ হল দৌড়ে যাওয়া, দ্রুত চলা। এটার সুযোগ সেখানেই আসে যেখানে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। আর গ্রামাঞ্চলে এমনটা সম্ভব নয়।

এরপর নির্দেশ দেয়া হয়েছে- "وَذَرُوا الْبَيْعَ" অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় ছেড়ে দাও। এতে বুঝা যায় যে, জুমআর হুকুম এমন স্থানের জন্যই যেখানে কোন বড় বাজার রয়েছে। আর লোকজন সেখানে ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনে খুব বেশি ব্যস্ত থাকে। আর গ্রামে এরূপ ব্যস্ততাপূর্ণ বাজার থাকে না।

এরপর বলা হয়েছে- –"فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ"

অর্থাৎ, অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তথা আয়-রোজগার আমদানীর উপকরণ তালাশ কর। (জুমআঃ ১০)

এতেও বুঝা যায় যে, যেখানে জুমআ আদায় করা হবে সেখানে এ ধরনের ব্যাপক ব্যস্ততা থাকা চাই।

(ماهنامة البلاغ ج١٦ شماره ص٢ صفر المظفر ١٤٠٢هـ ص٤١-٤٢ دار العلوم ديوبند كي فقهي خدمات)

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ قرية (গ্রাম) শব্দটি আরবী বাগধারায় অনেক সময় শহরের জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে-

"وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ"

অর্থাৎ, তারা বলে, কুরআন কেন দুই জনপদের কোন প্রধান ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হল না? (যুখরুফঃ ৩১)

উক্ত আয়াতে قريتين (দুটি গ্রাম) দ্বারা উদ্দেশ্য হল মক্কা এবং তায়েফকে বুঝানো।

অথচ মক্কা এবং তায়েফ নিঃসন্দেহে দুটি বড় শহর। (روح المعاني ج١٣ ص٧٨)

এমনিভাবে হাদীসে জোওয়াছা বলে যে গ্রামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা মূলত গ্রাম নয়, বরং শহর। কেননা ইহা একটি বিরাট বাণিজ্যিক কেন্দ্রও ছিল। যেখানে চার হাজারেরও বেশি বাসিন্দা ছিল। অথচ তৎকালীন যুগে গ্রাম অনুরূপ ছিল না।

(اثار السنن ج٢٣١)

জোওয়াছা সম্পর্কে ইমাম জাওহারী (রহ.) 'সিহাহ'-এ এবং আল্লামা যমখশারী 'কিতাবুল বুলদানে' লিখেন- –"ان جواثى اسم حصن بالبحرين لعبد القيس"

অর্থাৎ, জোওয়াছা হল, বাহরাইনে অবস্থিত আবুল কায়েস গোত্রের একটি দুর্গের নাম। (আর দুর্গের নামে এই এলাকার নাম হয়ে গেছে জোওয়াছা) আর দুর্গ ছোট গ্রামে থাকে না বরং বড় শহরে থাকে। আর বিষয়টিও তাই, জোওয়াছা এক বড় শহর ছিল।

আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, ইমরুল কায়েসও তার এক কবিতায় 'জোওয়াছা' শব্দটি উল্লেখ করেন। যা বিশ্লেষণ করলে এটি শহরই প্রমাণিত হয়।

(عمدة القاري ج٦ ص١٨٧)

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) লিখেন যে, হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর সময়ে হযরত আলা ইবন হাযরামীকে জোওয়াছার গভর্নর বানানো হয়েছিল এবং আলা (রাঃ) সেখানে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত গভর্নর হিসেবে অবস্থান করেছিলেন। যদি তা শহরই না হত তাহলে তাতে গভর্নর নিয়োগের প্রয়োজন হত না।
সুতরাং উক্ত হাদীসটি আমাদের (হানাফীদের) বিপরীত নয়, বরং এ রেওয়ায়েতটি স্বয়ং হানাফীদের দলীল।

তৃতীয় দলীলের জবাবঃ "قُلْتُ كَمْ اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ اَرْبَعُوْنَ" এই জুমআ সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের ইজতিহাদের ভিত্তিতে পড়েছিলেন। অথচ তখন পর্যন্ত জুমআ ফরয হয়নি এবং এর আহ্‌কামও নাযিল হয়নি। যার প্রমাণ মেলে মুহাম্মদ ইবন সীরীন থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ রেওয়ায়েত থেকে। সুতরাং এ ঘটনাটি দলীলযোগ্য নয়। (مصنف ابن عبد الرزاق ج٣ ص١٥٩–١٦٠)

চতুর্থ দলীলের জবাবঃ বনূ সালিম মহল্লা মূলতঃ মদীনা তায়্যিবার এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং সেখানে জুমআ পড়া মদীনা তায়্যিবায় জুমআ পড়ার হুকুম।

(اثار السنن ص٢٣٢)

পঞ্চম দলীলের জবাবঃ "جمعوا حيث كنتم" আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, "حيث كنتم"-এর অর্থ হচ্ছে- "حَيْثُ كُنْتُمْ مِنَ الاَمْصَارِ" অর্থাৎ, তোমরা যেকোন শহরেই থাক না কেন। সুতরাং, এখানে حَيْثُ শব্দটি ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য নয়। কেননা এটি যদি ব্যাপকের অর্থ দেয়, তাহলে জনবসতিহীন ময়দানেও জুমআর নামায জায়েয হওয়া উচিত। অথচ ময়দানে জুমআ জায়েয না হওয়ার উপর উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া ইমাম শাফেঈ (রহ.) যদিও جمعوا حيث كنتم-এর ব্যাখ্যায় বলেন, جَمِّعُوْا فِيْ اَيِّ قَرْيَةٍ كُنْتُمْ অর্থাৎ যেকোন গ্রামেই থাক না কেন তোমরা জুমআ আদায় কর। অথচ তাঁর নিকটও প্রত্যেক গ্রামে জুমআ জায়েয নয়। কেননা তিনিও শর্ত দেন যে, ঐ গ্রামে জুমআ জায়েয যেখানে কমপক্ষে চল্লিশজন পুরুষ রয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, চল্লিশটি পরিবার হওয়া শর্ত। অতএব, এর দ্বারা স্ববিরোধী বক্তব্য প্রমাণিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে উক্ত হাদীসের পুরো ঘটনা হল এই, হযরত আলা ইবনুল হাযরামী (রাঃ)-এর স্থলে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। তাঁরা সেখান থেকে হযরত উমর (রাঃ)-কে পত্র লিখেছিলেন যে, এখানে আমরা জুমআ আদায় করব কিনা। উল্লেখ্য যে, যেখানে গভর্নর নিযুক্ত আছে, সেখানে জুমআ না পড়ার কোন প্রশ্নই আসে না। তাই হযরত উমর (রাঃ) প্রশ্নের জবাবে বলেছেন- "جمعوا حيث ما كنتم" যার মর্মার্থ এই যে, তোমরা শহরের যেখানেই থাক না কেন, জুমআ আদায় কর। অতএব, যারা ময়দানে-জঙ্গলে, বস্তিতে অথবা অজপাড়াগায়ে জুমআ পড়ার উপর যে প্রমাণ পেশ করে থাকে, তা সম্পূর্ণ নিরর্থক। কারণ যদি জুমআ আদায় করার ক্ষেত্রে এতটা ব্যাপকতা থাকত তাহলে আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক এই প্রশ্নের কোন অর্থই ছিল না। সুতরাং এমন প্রশ্ন দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) সব জায়গায় জুমআ জায়েয মনে করতেন না।

(درس ترمذي ج٢ ص٢٧٢)

بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ ص١٥٥ ঃ জুমআর নামাযের সময়

... عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ الْجُمُعَةَ اِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ– (بخاري ج١ ص١٢٣ باب وقت الجمعة اذا زالة الشمس، ترمذي ج١ ص١١٢ باب في وقت الجمعة)

অনুবাদঃ ... আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার পর জুমআর নামায আদায় করতেন।

বিশ্লেষণঃ সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার পূর্বে জুমআর নামায আদায় করা জায়েয কিনা- এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যথা-

* ইমাম আহমদ, ইসহাক, আহলে যাহির এবং শাওকানীর (রহ.) মতে, জুমআর নামায সূর্য হেলার পূর্বেও আদায় করা জায়েয আছে। (اثار السنن ص٢٤٢)

দলীল (১)ঃ ... عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نَقِيْلُ وَنَتَغَدّٰى بَعْدَ الْجُمُعَةِ– (ابو داود ج١ ص١٥٥، بخاري ج١ ص١٢٨ باب قول الله فاذا قضيت الصلوة الخ، مسلم ج١ ص٢٨٣ فضل في وقت صلوة الجمعة، ترمذي ج١ ص١١٨ باب في القاعلة يوم الجمعة، ابن ماجة ص٧٨)

অর্থাৎ, ... সাহ্ল ইবন সাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমআর নামায আদায়ের পরে দিনের প্রথমাংশের খানা খেয়ে 'কায়লূলা' (দুপুরের বিশ্রাম) করতাম।

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণের কারণ হল, আরবী ভাষায় "غداء" ঐ খাদ্যকে বলা হয়, যা সূর্যোদয়ের পর এবং সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পূর্বে খাওয়া হয়। আর কায়লূলা বলা হয় দুপুরের শোয়াকে। তাই সাহাবায়ে কিরামগণ যেহেতু এই উভয় কাজটি জুমআর পরে করতেন, সুতরাং বুঝা যায় যে, তাঁরা জুমআ সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার পূর্বেই আদায় করতেন।

দলীল (২)ঃ কোন কোন হাদীসে জুমআকে ঈদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর ঈদের নামাযের সময় হল সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পূর্বে। সুতরাং জুমআর নামাযও ঐ সময় আদায় করা জায়েয আছে।

* ইমাম আবু হানিফা, শাফিঈ, মালিক (রহ.) ও জমহূরের মতে-
জুমআর সময় হল, যুহরের নামাযের সময়। অর্থাৎ, যুহরের নামায যেমন সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পূর্বে আদায় করা জায়েয নয়, তেমনিভাবে জুমআর নামাযও জায়েয নয়। (درس مشكوة ج۲ ص۱۳۵)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) বলেন-

كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ– (مسلم ج۱ ص۲۸۳)

অর্থাৎ, সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে হেলে যেত, তখন আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে জুমআ আদায় করতাম।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ (১) সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) যেহেতু খুব সকালেই মসজিদে চলে যেতেন, তাই তাঁরা নাস্তা এবং কায়লূলা করার সময় ও সুযোগ পেতেন না। তাই তাঁরা জুমআ পরে এ দুইটি কাজের আঞ্জাম দিতেন। সুতরাং নাস্তা এবং কায়লূলাকে স্বীয় সময় থেকে দেরী করার অর্থ এই নয় যে, জুমআ সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বেই আদায় করতেন। কেননা যদি তা মেনে নেয়া হয়, তাহলে অন্যান্য অনেক হাদীসের সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়।

(২) যদিও "غداء" শব্দটি আরবী ভাষায় সে খানাকে বলে, যা সূর্যোদয়ের পর এবং সূর্য হেলার আগে আগে খাওয়া হয়, কিন্তু কেউ যদি দুপুরের খানা সূর্য হেলার পরে খায়, তারপরেও একে রূপকার্থে "غداء" বলা হবে। হাদীসেও এর উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন, নবী করীম (সাঃ) সেহেরীর ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন-

... عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ دَعَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى السُّحُوْرِ فِيْ رَمَضَانَ قَالَ هَلُمَّ اِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ– (ابو داود ج۱ ص۳۲۰ باب من سمى السحور الغداء، نسائي ج۱ ص۳۰٤ باب دعوة السحور)

অর্থাৎ, ... আল-ইরবায ইবন সারিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে রমযান মাসে সাহ্‌রীর সময় আহ্বান করেন এবং বলেন, কল্যাণময় সকালের খাবারের দিকে (সাহ্‌রীর দিকে) সত্তর আগমন কর।
এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করা কারো মতেই জায়েয নয় যে, সূর্যোদয়ের পর সেহেরী খাওয়া যায়।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ ''জুমআকে ঈদ বলা''-এর ব্যাখ্যা হল, কোন জিনিসকে অন্য জিনিসের সাথে তুলনা দেয়ার অর্থ এই নয় যে, সকল দিক থেকে তার অনুরূপ হতে হবে; বরং অল্প কোন সামঞ্জস্যের ভিত্তিতেও তুলনা দেয়া যেতে পারে। যেমন, সাদী বাঘের মত। এর অর্থ এই নয় যে, সাদীর বাঘের মত চারটি পা, একটি লেজ এবং সারা শরীর ডোরাকাটা দাগ থাকতে হবে। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, বাঘের গায়ে যেমন প্রচণ্ড শক্তি আছে, তেমনিভাবে সাদীর গায়েও বেশ শক্তি আছে।
সুতরাং জুমআর দিনেও যেহেতু ঈদের মত সবাই একত্রিত হয় এবং খুশীর আমেজ সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে, তাই জুমআকে ঈদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। নতুবা যদি সকল হুকুমের দিক থেকেই এক হওয়া অপরিহার্য হত, তাহলে ঈদের দিনের মত জুমআর দিনও রোযা রাখা হারাম হত এবং জুমআর খুতবা নামাযের পরে হত এবং ঈদগাহে জুমআর আগে ও পরে নফল পড়া মাকরূহ হত। অথচ এই সকল আহকাম জুমআতে নেই। এতে বুঝা গেল যে, জুমআ ও ঈদ এক নয়। এবং এ দুইয়ের সময়ও ভিন্ন। (درس مشكوٰة ج۲ ص۱۳٦)

بَابُ اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالاِمَامُ يَخْطُبُ ص۱٥۹

ইমামের খুতবা দেয়ার সময় মসজিদে প্রবেশ করলে

... عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ اَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ قَالَ لاَ قَالَ قُمْ فَارْكَعْ– (بخاري ج۱ ص۱٥٦ باب التطوع مثنى مثنى، مسلم ج۱ ص۲۸۷ فضل من دخل المسجد الخ، ترمذي ج۱ ص۱۱٤ باب في الركعتين اذا جاء الرجل والامام يخطب، نسائي ج۱ ص۲۰۸ مخاطبة الامام الخ، ابن ماجة ص۷۹)

অনুবাদঃ ... জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ)-এর খুতবা দানকালে সেখানে এক ব্যক্তি আগমন করেন। তিনি (সাঃ) তাঁকে বলেন, হে অমুক! তুমি কি নামায পড়েছ? ঐ ব্যক্তি বলেন, না। তিনি বলেন, তুমি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করে নাও।

বিশ্লেষণঃ জুমআর দিন ইমামের খুতবা দানকালে কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাকাত (তাহিয়্যাতুল মসজিদ) নামায পড়বে, নাকি চুপচাপ বসে যাবে- এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, জুমআর খুতবা চলাকালে আগন্তুক ব্যক্তির জন্য তাহিয়্যাতুল মসজিদের দু'রাকাত নামায পড়ে নেয়া মুস্তাহাব।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ سُلَيْكُ الْعَطْفَانِيُّ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَه اَصَلَّيْتَ شَيْئًا قَالَ لاَ قَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزْ فِيْهِمَا-

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খুতবা দানকালে সেখানে সুলাইক আল-গাতফানী (রাঃ) নামক এক ব্যক্তি উপস্থিত হন। তখন তিনি বলেনঃ তুমি কি কিছু (নামায) পড়েছ? ঐ ব্যক্তি বলেন, না। তিনি তাকে বলেন, তুমি সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকাত নামায আদায় করে নাও। (সূত্রঃ ঐ)

উক্ত হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, খুতবা দেয়ার সময় সংক্ষেপে দুই রাকাত নামায পড়া জায়েয আছে। নতুবা নবী করীম (সাঃ) নামাযের জন্য হুকুম দিতেন না।

দলীল (৩)ঃ হযরত জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ)-এর একটি বাচনিক (কাওলী) হাদীস-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ وَالاِمَامُ يَخْطُبُ اَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ- (بخاري ج١ ص١٥٦، مسلم ج١ ص٢٨٧، ابو داود ج١ ص١٥٩)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খুতবা প্রদানকালে ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেউ খুতবা চলাকালে অথবা ইমামের বেরিয়ে আসার পর উপস্থিত হয়, তবে সে যেন দু'রাকাত নামায আদায় করে নেয়।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে, জুমআর খুতবা চলাকালে কোন প্রকার কথাবার্তা বলা বা নামায পড়া জায়েয নয়। অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেঈর মাযহাবও এটাই। (شرح مسلم ج١ ص٢٨٧، مغني ج١ ص١٦٥)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَه وَأَنْصِتُوْا

অর্থাৎ, আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা কান লাগিয়ে শোন এবং নিশ্চুপ থাক। (আরাফঃ ২০৪)

এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

শাফেঈগণ তো এই আয়াতটিকে শুধু জুমআর খুতবার সাথে নির্দিষ্ট করে থাকেন। অবশ্য হানাফীগণ প্রমাণ করেছিল যে, এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল নামায সম্পর্কে, কিন্তু এর ব্যাপকতায় খুতবাও অনেকটা শামিল। কেননা, খুতবাতে কুরআনের অনেক আয়াত পাঠ করা হয়। অতএব, বলা যায় যে, যেখানে খুতবা শোনা ওয়াজিব এবং তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া মুস্তাহাব, সেক্ষেত্রে একটি মুস্তাহাব আদায়ের জন্য ওয়াজিব ছেড়ে দেয়া কিভাবে জায়েয হতে পারে?

দলীল (২)ঃ ... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قُلْتَ اَنْصِتْ وَالاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ– (ابو داود ج۱ ص۱۵۸ باب الكلام والامام يخطب، مسلم ج۱ ص۲۸۱ فضل في عدم ثواب من تكلم الخ، ترمذي ج۱ ص۱۱٤ باب كراهية الكلام الخ، نسائي ج۱ ص۲۰۸ باب الانصات للخطبة الخ، ابن ماجة ص۷۹)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ ইমামের খুতবা দেয়ার সময় যদি তুমি কাউকে চুপ থাকতেও বল, তবে তুমি বেহুদা কাজ করলে।

উক্ত হাদীসেও দেখা যাচ্ছে যে, খুতবা চলাকালে সৎ কাজের আদেশ করতে নিষেধ করেছেন। অথচ সৎ কাজের আদেশ করা ফরয। আর তাহিয়্যাতুল মসজিদ মুস্তাহাব। সুতরাং, এ সময় তাহিয়্যাতুল মসজিদ অকাট্যভাবেই নিষিদ্ধ হবে।

দলীল (৩)ঃ মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হযরত নুবাইশা হুযালী (রাঃ)-এর হাদীস-

... وَاِنْ وُجِدَ الاِمَامُ قَدْ خَرَجَ جَلَسَ وَاسْتَمَعَ وَاَنْصَتَ حَتّٰى يَقْضِيَ الاِمَامُ جُمُعَتَه الخ– (مجمع الزوائد ج۲ ص۱۷۱)

অর্থাৎ, ... আর ইমামকে যদি বেরিয়ে আসা অবস্থায় পায়, তখন সেখানে বসে যাবে। অতঃপর গভীরভাবে শুনবে এবং নীরব থাকবে। যতক্ষণ না ইমাম তার জুমআ শেষ করবে।

উক্ত হাদীসে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, ইমাম যখন খুতবার জন্য বের হবে, তখন চুপ করে বসে যাওয়া এবং খুতবা শোনা উচিত।

দলীল (৪)ঃ আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) থেকে এক মারফূ হাদীস-

قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالاِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلاَ صَلٰوةَ وَلاَ كَلاَمَ حَتّٰى يَفْرُغَ الاِمَامُ– (مجمع الزوائد ج٢ ص١٨٤)

অর্থাৎ, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যখন ইমামের মিম্বরে অবস্থিত অবস্থায় তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন কোন নামায নেই, কথাও নেই, যতক্ষণ না ইমাম (জুমআ থেকে) অবসর হবেন।

দলীল (৫)ঃ সুলাইক ইবন হুদবা আল-গাতফানী (রাঃ)-এর ঘটনা ব্যতীত নবী করীম (সাঃ) থেকে আর কোথাও এ বিষয়টি প্রমাণিত নেই যে, তিনি খুতবার মাঝখানে আগত ব্যক্তিকে নামায পড়ার হুকুম দিয়েছেন।

আরো দেখা যায় যে, এক বেদুইন দুর্ভিক্ষের অভিযোগ নিয়ে নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট এসেছিল। অতঃপর এক সপ্তাহ পরে আবার প্রবল বৃষ্টির অভিযোগ নিয়ে এসেছিল। আর এই দুই ঘটনাতে লোকটি খুতবার মাঝখানে এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) তাঁকে নামাযের নির্দেশ দেননি।

(بخاري ج١ ص١٣٧ باب الاستثناء في المسجد الجامع)

তাছাড়া আরো বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রাঃ)-এর খুতবার মাঝখানে হযরত উসমান (রাঃ) তাশরীফ আনলে, উমর (রাঃ) উসমান (রাঃ)-কে মসজিদে বিলম্বে পৌঁছা ও গোসল না করার কারণ জিজ্ঞেস করেছিলেন, কিন্তু নামাযের নির্দেশ দেননি। (مسلم ج١ ص٢٨٠ باب في الاغتسال في يوم الجمعة)

সুতরাং এই সমস্ত হাদীসসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, খুতবার মাঝখানে কোন নামায পড়া জায়েয নয়।

জবাবঃ হানাফীদের পক্ষ থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ হযরত সুলাইক ইবন হুদবা আল-গাতফানী (রাঃ)-এর বিষয়টি ছিল খাস। এ বিশেষ ঘটনাটিকে ব্যাপক মূলনীতির বিপরীতে পেশ করা যায় না। যার বিস্তারিত বিবরণ হল- একবার নবী করীম (সাঃ) খুতবা দেয়ার জন্য মিম্বরে আরোহণ করলেন। কিন্তু তখনো খুতবা শুরু করেননি। এমতাবস্থায় সুলাইক ইবন হুদবা নামক এক সাহাবী খুবই জীর্ণশীর্ণ পুরনো পোশাক পরিধান করে মসজিদে প্রবেশ করেন। (ترمذي ج١ ص٩٣، نسائي ج١ ص٢٠٨)

তাঁর এই দুরবস্থা অন্যান্য সাহাবীদেরকে দেখানোর জন্য নবী করীম (সাঃ) তাঁকে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার হুকুম দিলেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নামাযে ছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত নবী করীম (সাঃ) নীরব ছিলেন, খুতবা আরম্ভ করেননি। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে-

اَمْسَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخُطْبَةِ حَتّٰى فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ– (مصنف ابن ابي شيبة ج٢ ص١١٠)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) তার এ দু'রাকাত থেকে অবসর হওয়া পর্যন্ত খুতবা থেকে বিরত থাকেন।

অতঃপর তিনি (সাঃ) আগন্তুককে দান করার জন্য সাহাবায়ে কিরামকে উদ্বুদ্ধ করেন। যেমন হাদীসে এসেছে- وَحَثَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَاَلْقَوْا ثِيَابَهُمْ الخ– (نسائي ج١ ص٢٠٨ باب حث الامام على الصدقة)

অর্থাৎ, এবং নবী করীম (সাঃ) লোকজনকে সদকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে তাঁরা তাঁদের কাপড় নিক্ষেপ (দান) করলেন।

(২) কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে সুলাইক (রাঃ) যখন আসেন, নবী করীম (সাঃ) তখনো খুতবা আরম্ভ করেননি। যেমন হাদীসে এসেছে-

جَاءَ سُلَيْكُ اَلْغَطْفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ– (مسلم ج١ ص٢٨٧)

অর্থাৎ, সুলাইক আল-গাতফানী (রাঃ) জুমআর দিন এমন সময় উপস্থিত হয়েছিলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মিম্বরের উপর বসা ছিলেন।

এটা জানা কথা যে, নবী করীম (সাঃ) সর্বদা দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। সুতরাং উল্লিখিত হাদীসে বসে থাকার উদ্দেশ্য হল, তিনি তখনো খুতবা শুরু করেননি। (معارف السنن ج٤ ص٣٧٠–٣٧١)

(৩) হাদীসে বর্ণিত আছে, "قُمْ فَارْكَعْ" (তুমি দাঁড়াও, অতঃপর নামায পড়)। উল্লিখিত শব্দদ্বয় হতে বুঝা যায় যে, হযরত সুলাইক (রাঃ) মসজিদে এসে বসে পড়েছিলেন। নতুবা তিনি (সাঃ) তাঁকে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিতেন না। তাছাড়া সহীহ মুসলিমে তো এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট উল্লেখ আছে-

فَقَعَدَ سُلَيْكُ قَبْلَ اَنْ يُّصَلِّيَ الخ– (مسلم ج١ ص٢٨٧)

অর্থাৎ, অতঃপর সুলাইক নামায পড়ার পূর্বেই বসে গেছেন।

আর স্পষ্ট বিষয় হল, শাফেঈদের মতে বসার পর তাহিয়্যাতুল মসজিদের সুযোগ থাকে না।

তৃতীয় দলীল তথা বাচনিক হাদীসের জবাবঃ আসলে উক্ত হাদীসটি বিশ্লেষণের দাবী রাখে। সুতরাং হাদীসে উল্লিখিত وَالاِمَامُ يَخْطُبُ দ্বারা উদ্দেশ্য হল- يُرِيْدُ الاِمَامُ اَنْ

كَادَ الْاِمَامُ اَنْ يَّخْطُبَ– (ইমাম খুতবা দেয়ার জন্য মনস্থ করেন) অথবা –يَّخْطُبَ (ইমাম যখন খুৎবা দেয়ার নিকটবর্তী হন)।

তাছাড়া আরো বেশ কিছু কারণে হানাফীদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞার রেওয়ায়েতসমূহ প্রাধান্য পাবে। যেমন-

ক. শাফেঈদের হাদীস দ্বারা নামাযের বৈধতা সাব্যস্ত হয়। পক্ষান্তরে হানাফীদের কুরআন ও হাদীস দ্বারা নামায পড়া হারাম সাব্যস্ত হয়। আর নিয়ম হল, হারাম ও বৈধতার মধ্যে বৈপরীত্য দেখা গেলে হারাম প্রাধান্য পাবে।

খ. নিষেধাজ্ঞার রেওয়ায়েতগুলো কুরআন কর্তৃক সমর্থিত।

গ. এগুলো সাহাবা ও তাবেঈগণের আমল দ্বারা সমর্থিত।

(مسلم ج١ ص٢٨٧، مصنف ابن ابي شيبة ج٢ ص١١١، شرح معاني الآثار ج١ ص١٧٨–١٨١)

সর্বোপরি বলা যায় যে, আহনাফদের বর্ণিত অভিমতে সতর্কতা বেশি। কেননা তাহিয়্যাতুল মসজিদ কারো মতেই ওয়াজিব নয়। সুতরাং তা ছেড়ে দেয়াতে কারো মতেই গুনাহের আশংকা নেই। পক্ষান্তরে নামায পড়া ও কথা বলা নিষেধের হাদীসগুলো পরিহার করলে গুনাহের আশংকা রয়েছে।

بَابُ مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً ص١٥٩

যে ব্যক্তি জুমআর নামাযের এক রাকাত পায়

... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلٰوةِ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلٰوةَ– (بخاري ج١ ص٨٢ باب من ادرك من الصلوة، مسلم ج١ ص٢٢١، ترمذي ج١ ص١١٨ باب من يدرك من الجمعة ركعة/٤٥، نسائي ج١ ص٩٠ من ادرك الخ، ابن ماجة ص٨٠)

অনুবাদঃ ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকাত পেল, সে যেন সম্পূর্ণ নামায পেল।

বিশ্লেষণঃ ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ, লাইস (রহ.)-এর মতে এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর এক মত অনুসারে, যদি কোন ব্যক্তি জুমআর পুরো এক রাকাত ইমামের সাথে না পায় অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি দ্বিতীয় রাকাতের রুকুর পরে এসে নামাযে শরীক হয় তাহলে ঐ ব্যক্তির উপর যুহরের চার রাকাত নামায আদায় করা ওয়াজিব। (تنظيم ج١ ص٤٦٥)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। অতএব, উক্ত হাদীসের আলোকে বলা যায়, যে ব্যক্তি এক রাকাতও পায়নি, সে যেন নামাযই পেল না।

দলীল (২)ঃ নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

مَنْ اَدْرَكَ مِنْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ اَدْرَكَ– (نسائي ج١ ص٢١٠ باب من ادرك ركعة الخ)

অর্থাৎ, যে জুমআর নামাযের এক রাকাত পেল সে জুমআ পেল।
উক্ত হাদীসে সরাসরি জুমআর কথা উল্লেখ রয়েছে।

* ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, ইবরাহীম নাখঈ, দাউদ যাহেরী (রহ.)-এর মতে এবং মুহাম্মদ (রহ.)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী, যদি কোন ব্যক্তি সালামের পূর্ব মুহূর্তেও ইমামের সাথে শরীক হয়, তবুও ঐ ব্যক্তি জুমআর দুই রাকাত নামাযই আদায় করবে। যুহরের চার রাকাত আদায় করবে না।

(بدائع الصنائع ج١ ص٢٦٧)

দলীল (১)ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত মারফূ হাদীস। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

اِذَا اَتَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا– (بخاري ج١ ص١٢٤ باب المشي الى الجمعة)

অর্থাৎ, তোমরা যখন নামাযে উপস্থিত হও তখন অবশ্যই ধীরস্থিরতা অবলম্বন কর। যতটুকু পাও তা আদায় কর, আর যতটুকু বাদ পড়েছে তা পূর্ণ কর।

দলীল (২)ঃ ইবন আবী শায়বা কিতাবে ইবন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত-

مَنْ اَدْرَكَ التَّشَهُّدَ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلٰوةَ– (تنظيم ج١ ص٤٦٥)

অর্থাৎ, যে তাশাহহুদ পেল, সে নামায পেল।
উপরোল্লিখিত হাদীস দুটিতে জুমআ অথবা অন্য কোন নামাযের বিশ্লেষণ নেই। এতে বুঝা যায় যে, সালামের পূর্বেও ইমামের সাথে শরীক হতে পারলে না পাওয়া দুই রাকাত জুমআর নামায আদায় করলে জুমআ আদায় হয়ে যাবে। চার রাকাত যুহর পড়তে হবে না।

দলীল (৩)ঃ হযরত মুআয ইবন জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত-

اِذَا دَخَلَ فِيْ الصَّلٰوةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ وَهُوَ جَالِس فَقَدْ اَدْرَكَ الْجُمُعَةَ–

অর্থাৎ, যদি কেউ জুমআর নামাযে সালামের পূর্বে বসা অবস্থায় শামিল হয়, তাহলেও সে জুমআ পেয়ে গেল। (সূত্রঃ ঐ)
উক্ত হাদীসে স্পষ্টভাবে জুমআর কথা উল্লেখ রয়েছে।

জবাবঃ আহনাফদের পক্ষ থেকে উল্লিখিত তিন ইমামের দলীলের জবাবঃ

(১) হানাফীগণ বলেন, তিন ইমাম যে দলীল পেশ করেছেন, তা আমাদের বিপরীত নয়। কেননা আমরাও বলি, যে ব্যক্তি এক রাকাত পেল, সে জুমআ পেয়ে যাবে। বাকী কথা হল, এর চেয়ে কম পেলে জুমআ পাওয়া যাবে কিনা, এ ব্যাপারে উক্ত হাদীসে কিছু বলা হয়নি। আর অন্যান্য হাদীস দ্বারা এ ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সালামের পূর্বে ইমামের সাথে শরীক হলেও জুমআ পাওয়া যাবে।

(২) এখানে مَفْهُوْم مُخَالِف তথা বিপরীত অর্থ দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। আর হানাফীদের নিকট ইহা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, হাদীসের বাহ্যিক অবস্থার উপর কেউই আমল করে না। কারণ, হাদীসটির বাহ্যিক অর্থ এ কথাই প্রমাণ করে যে, শুধু এক রাকাত নামায যে পাবে, পূর্ণ নামায সে পেয়ে যাবে। যার দাবি হল এই যে, দ্বিতীয় রাকাত পড়ার প্রয়োজন নেই। অথচ এর উপর কেউ আমল করে না।

সুতরাং হাদীসে বর্ণিত فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلٰوةَ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, নামাযের ফযীলত পেয়ে যাবে। (درس ترمذي ج٢ ص٣٠١-٣٠٢)

بَابُ صَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ ص١٦١ ঃ দুই ঈদের নামায

... عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَان يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا فَقَالَ مَا هٰذَان الْيَوْمَان قَالُوْا كُنَّا نَلْعَبُ فِيْهِمَا فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللهَ قَدْ اَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا يَوْمَ الْاَضْحٰى وَيَوْمَ الْفِطْرِ-

অনুবাদঃ ... আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় পৌঁছে দেখতে পান যে, সেখানকার অধিবাসীরা বছরে দুটি দিন (নায়মূক ও মিহিরজান) খেলাধুলা ও আনন্দ-উৎসব করে থাকে। তিনি (সাঃ) জিজ্ঞেস করেন, এই দুটি দিন কিসের? তারা বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে আমরা এ দুটি দিনে খেলাধূলা ও উৎসব করতাম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের এই দুটি দিনের বিনিময়ে অন্য দুটি উত্তম দিন দান করেছেন। আর তা হল ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন।

বিশ্লেষণঃ ঈদের নামায সুন্নতে মুআক্কাদা নাকি ওয়াজিব- এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ (রহ.) ও সাহেবাইনের মতে, ঈদের নামায সুন্নতে মুআক্কাদাহ। আবু হানিফা (রহ.)-এর একটি অভিমতও তাই। (تعليق الصبيح ج٢ ص١٥٩)

দলীলঃ বেদুঈনের প্রসিদ্ধ হাদীস-

... فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ لاَ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ الخ (ابو داود ج١ ص٥٦ باب فرض الصلوة)

অর্থাৎ, ... রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, দিবারাত্রির মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয। তখন সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, তাছাড়া আর কিছু করণীয় আছে কি? জবাবে নবী করীম (সাঃ) বলেনঃ না, তবে যদি তুমি অতিরিক্ত (নফল) কিছু আদায় কর।

সুতরাং বুঝা গেল পাঁচ ওয়াক্ত নামায ব্যতীত সকল নামায নফলের অন্তর্ভুক্ত।

দলীল (২)ঃ ঈদের নামাযে যেহেতু আযান এবং ইকামত নেই। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইহা ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নত।

* ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, ঈদের নামায, জানাযার নামাযের মত ফরযে কিফায়াহ।

দলীলঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ- অর্থাৎ, অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্য নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন। (কাওসারঃ ২)

উল্লিখিত আয়াতের দ্বারা ওয়াজিব (ফরয) প্রমাণিত হয়। আর বেদুঈনের প্রসিদ্ধ হাদীসটির দ্বারা নফল প্রমাণিত হয়। সুতরাং দুই অবস্থার মাঝখানে ফরযে কিফায়াহর বিধান নির্ধারণ করাই সমীচীন। (تنظيم ج١ ص٤٧٢)

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মত হল, ঈদের নামায ওয়াজিব এবং এর উপরই ফাতওয়া। (فتح الملهم ج٢ ص٤٢٣)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ- প্রসিদ্ধ তাফসীর অনুযায়ী এতে صَلِّ দ্বারা উদ্দেশ্য হল- "صَلِّ صَلاَةَ الْعِيْدِ" অর্থাৎ আপনি ঈদের নামায আদায় করুন। (معارف السنن ج٤ ص٤٢٦، روح المعاني ج٣٠ ص٢٨٤)

সুতরাং উক্ত আয়াতে যেহেতু ঈদের নামাযের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাই ইহা ওয়াজিব।

দলীল (২)ঃ মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী করীম (সাঃ) ঈদের নামায নিরবচ্ছিন্নভাবে সম্পন্ন করেছেন, কখনো তরক করেননি। যেমন, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত-

اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الاَضْحٰى اِلَى الْمُصَلّٰى فَيُصَلِّيْ بِالنَّاسِ الخ (نسائي ج١ ص٢٣٣ استقبال الامام بالناس الخ)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে বেরিয়ে আসতেন, সেখানে লোকজনদের নিয়ে নামায পড়তেন।

দলীল (৩)ঃ সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে আজ অবধি এর উপর আমল অব্যাহত থাকাও ইহা ওয়াজিব হওয়ার দলীল।

দলীল (৪)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- وَلِتُكَبِّرُوْا اللهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ- অর্থাৎ, তোমাদের হেদায়েত দান করার কারণে আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর। (বাকারাঃ ১৮৫) কতিপয় আলেম বলেন, উক্ত আয়াতটি ঈদুল ফিতরের নামাযেরই প্রত্যায়ন করে। কেননা, এই আয়াতটি রোযার আলোচনায় বর্ণিত হয়েছে। আর আয়াতে যেহেতু নির্দেশের (আমর) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সুতরাং এতে প্রমাণিত হয় যে, ঈদের নামায ওয়াজিব। সূরা হজ্জে ৩৭ নং আয়াতেও এর ইঙ্গিত রয়েছে যার দ্বারা ঈদুল আযহার নামায ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ মেলে। (درس ترمذي ج٢ ص٣٠٧)

জবাবঃ বেদুঈনের হাদীসের জবাবে আহনাফগণ বলেন-

(১) উক্ত হাদীসটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের। যখন ঈদের হুকুম নাযিল হয়নি।
(২) অথবা, হাদীসে শুধুমাত্র সুনির্দিষ্ট পাঁচ ওয়াক্ত ফরযসমূহ বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য ছিল। আর ঈদের নামায তো ফরয নয়; বরং ওয়াজিব।
(৩) অথবা, কোন বিষয় অনুল্লেখের দ্বারা ইহা ওয়াজিব না হওয়া প্রমাণিত হয় না।
(৪) বেদুঈনের উপর তো ঈদের নামায ওয়াজিব নয়, তাই তা উল্লেখ করা হয়নি।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ আযান এবং ইকামত শুধু ফরয ইবাদতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর দুই ঈদের নামায ফরয নয়, বরং ওয়াজিব।

ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ তাঁর প্রদত্ত নিজস্ব অভিমতটি বিলকুল অগ্রহণযোগ্য। কারণ, ইহা প্রকাশ্য দলীলের বিপরীত। কেননা, যে বিষয়টি দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত, তা কিভাবে ফরযে কিফায়াহ সাব্যস্ত হতে পারে? (تنظيم ج١ ص٤٧٢)

بَابُ التَّكْبِيْرِ فِيْ الْعِيْدَيْنِ ص١٦٣

ঈদের নামাযের তাকবীর সংখ্যা

... عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِيْ الْفِطْرِ وَالاَضْحٰى فِيْ الاُوْلٰى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ وَفِيْ الثَّانِيَةِ خَمْسًا– (ترمذي ج١ ص١٢٠ باب التكبير في العيدين، ابن ماجة ص٩٢)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার প্রথম রাকাতে সাত এবং দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচবার তাকবীর বলতেন।

বিশ্লেষণঃ উভয় ঈদে অতিরিক্ত তাকবীর কয়টি বলা হবে, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ
* ইমাম মালিক, আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, উভয় ঈদেই অতিরিক্ত তাকবীর হল ১১টি। ৬ তাকবীর প্রথম রাকাতে। (তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত) অপর ৫টি তাকবীর দ্বিতীয় রাকাতে।
* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, উভয় ঈদেই অতিরিক্ত তাকবীর হচ্ছে ১২টি। ৭টি প্রথম রাকাতে (তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত) আর ৫টি দ্বিতীয় রাকাতে।
তবে মালিকী এবং শাফেঈগণ এ কথার উপর একমত যে, উভয় রাকাতেই তাকবীরগুলো হবে কেরাতের পূর্বে। উভয় ইমামের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, শাফেঈগণ তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীতই সাতটি তাকবীরের দাবিদার। আর মালিকীগণ তাকবীরে তাহরীমাসহ সাতটি তাকবীরের দাবিদার।
উমর ইবন আব্দুল আযীয, যুহরী (রহ.), আয়িশা, আবু হুরায়রা, যায়েদ ইবন সাবেত, আবু আইউব ও আলী (রাঃ)-এর অভিমতও তাই। (بذل المجهود ج٢ ص٢٠٦)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلتَّكْبِيْرُ فِيْ الْفِطْرِ سَبْع فِيْ الاُوْلٰى وَخَمْس فِيْ الاٰخِرَة الْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا–
(ابو داود ج١ ص١٦٣)

অর্থাৎ, ... আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, ঈদুল ফিতরের প্রথম রাকাতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচ তাকবীর এবং উভয় রাকাতে তাকবীরের পরে কেরাত পাঠ করতে হবে।

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّه اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِيْ الْعِيْدَيْنِ فِيْ الاُوْلَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِيْ الاٰخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ– (ترمذي ج١ ص١١٩–١٢٠، ابن ماجة ص٩٢)

অর্থাৎ, ... কাসীর ইবন আব্দুল্লাহ-এর দাদা থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) দুই ঈদে প্রথম রাকাতে কেরাতের পূর্বে সাত তাকবীর দিয়েছেন। আর শেষ রাকাতে কেরাতের পূর্বে দিয়েছেন পাঁচ তাকবীর।

* ইমাম আবু হানিফা এবং সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে, উভয় ঈদেই অতিরিক্ত তাকবীর হচ্ছে ৬টি। ৩টি হচ্ছে প্রথম রাকাতে কেরাতের পূর্বে। আর বাকি ৩টি দ্বিতীয় রাকাতে কেরাতের পরে। ইবন মাসউদ, আবু মূসা আশআরী ও আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) সহ প্রমুখের অভিমতও অনুরূপ।

(تنظيم ج١ ص٤٧٥، درس ترمذي ج٢ ص٣١٣، درس مشكوٰة ج٢ ص١٤٣)

দলীল (১)ঃ ... عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ سَأَلَ اَبَا مُوْسَى الاَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِيْ الاَضْحٰى وَالْفِطْرِ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى كَانَ يُكَبِّرُ اَرْبَعًا تَكْبِيْرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى كَذٰلِكَ كُنْتُ اُكَبِّرُ فِيْ الْبَصَرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ– (ابو داود ج١ ص١٦٣)

অর্থাৎ, ... সাঈদ ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি আবু মূসা আল আশআরী (রাঃ)-কে এবং হুযায়ফা ইবনুল য়ামান (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার তাকবীর কিরূপে আদায় করতেন? আবু মূসা (রাঃ) বলেন, তিনি জানাযার নামাযের (ন্যায়) চার তাকবীর আদায় করতেন। (অর্থাৎ তিনি জানাযার নামাযের অনুরূপ ঈদের নামাযেও প্রতি রাকাতে চারটি তাকবীর বলতেন এবং তা তাহরীমা ও রুকুর তাকবীর সহ)। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আবু মূসা আল-আশআরী (রাঃ) সত্য বলেছেন। তিনি বলেন, আমি বসরার আমীর থাকাকালে এইরূপ তাকবীর দিয়েছি।

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর ছয়টি। তিনটি তাকবীর প্রথম রাকাতে কেরাতের পূর্বে এবং অপর তিনটি তাকবীর দ্বিতীয় রাকাতে কেরাতের পরে। আর উপরোল্লিখিত হাদীসটি দুটি হাদীসের স্থলাভিষিক্ত। কেননা এখানে হযরত হুযায়ফা (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে হযরত আবু মূসা (রাঃ)-এর কথাকে সত্যায়নের উল্লেখ রয়েছে।

দলীল (২)ঃ তাহাবী শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِيْ بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيْدٍ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا وَّ اَرْبَعًا ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ حِيْنَ انْصَرَفَ فَقَالَ لاَ تَنْسُوْا كَتَكْبِيْرِ الْجَنَائِزِ وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهٖ وَقَبَضَ اِبْهَامَهُ– (تنظيم الاشتات ج١ ص٤٧٦، درس مشكوة ج٢ ص١٤٣)

অর্থাৎ, কাসিম ইবন আব্দুর রহমান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ)-এর কতক সাহাবী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুলাহ (সাঃ) আমাদেরকে ঈদের নামায পড়ালেন, তাতে তিনি চার চারটি করে তাকবীর বললেন। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা ভুলে যেও না (ঈদের নামাযের তাকবীর হল) জানাযার তাকবীরের ন্যায়। (এই বলে) তিনি তাঁর আঙ্গুলের দ্বারা ইশারা করলেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলটি গুটিয়ে নিলেন।
উক্ত হাদীসে নবী করীম (সাঃ) কথা ও কর্মের দ্বারা ইশারা করেছেন যে, ঈদের তাকবীর তাকবীরে তাহরীমা এবং রুকুর তাকবীর সহ প্রতি রাকাতে চারটি করে। সুতরাং অতিরিক্ত তাকবীর হল মোট ৬টি।

দলীল (৩)ঃ হযরত উমর (রাঃ)-এর সময় দুই ঈদে অতিরিক্ত ৬টি করে তাকবীর হওয়ার ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (شرح معاني الآثار ج١ ص٢٣٩)

জবাবঃ (১) শাফেঈ ও অন্যান্য মনীষীবৃন্দ তাঁদের পক্ষে যেসব হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেছেন, সেগুলো যাচাই করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরাম এগুলোকে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, এগুলোতে কতক রেওয়ায়েত ও রাবী এমন রয়েছে যারা খুবই যঈফ। যেমন সংক্ষেপে বলা যায়, প্রথম হাদীসে ইবন লাহীআ, দ্বিতীয় হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান এবং তৃতীয় হাদীসে কাসীর ইবন আব্দুল্লাহ নামক রাবী রয়েছেন। যাদের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ অভাবনীয় নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। যেমন তাদের কারো কারো সম্পর্কে স্বয়ং ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, "মিথ্যার একটি স্তম্ভ"। আবু দাউদ (রহ.) বলেন, "বড় মিথ্যুক"। নাসায়ী ও দারা কুতনী (রহ.) বলেন, "তার (কাসীর ইবন আব্দুল্লাহর) হাদীস বর্জনীয়। আহমদ (রহ.) বলেন, "তার হাদীস মুনকার"। ইবন মাঈন (রহ.) বলেন, "তিনি (আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান) যঈফ। নাসায়ী (রহ.) বলেন, "তিনি মজবুত রাবী নন।" এমনিভাবে ইবন লাহীআ-এ সম্পর্কে এরূপ অনেক নেতিবাচক মন্তব্য রয়েছে। তাই এসকল হাদীস দলীলযোগ্য নয়।

(سنن الكبرى للبيهقي ج٣ ص٢٨٥، معارف السنن ج٤ ص٤٣٦، ميزان الاعتدال ج٢ ص٤٥٢)

(২) হযরত উমর (রাঃ)-এর সময় এর বিপরীত ইজমা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারা এ সকল হাদীস রহিত হয়ে যায়। প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লামা ইবন রুশ্‌দ "বিদায়াতুল মুজতাহিদ"-এ লিখেছেন যে, ঈদের তাকবীর সংখ্যার ব্যাপারে কোন মারফূ হাদীস বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত নেই। এ ব্যাপারে তিনি ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর উক্তিটি বর্ণনা করেছেন-

لَيْسَ يَرْوِيْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ التَّكْبِيْرِ فِيْ الْعِيْدَيْنِ حَدِيْث صَحِيْح– (بذل المجهود ج٢ ص٢٠٧–٢٠٨)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) থেকে দুই ঈদের তাকবীর সম্পর্কে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত নেই।

যার ফলে বিভিন্ন সাহাবাদের বিভিন্ন আমলের কারণে এরকম মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। তবে একথা সত্য যে, নামায সর্বাবস্থায় আদায় হয়ে যাবে। কেননা, এই মতানৈক্যটি উত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে। তাই ফুকাহায়ে কিরাম সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন, যদি ইমাম ৬-১৩ পর্যন্ত তাকবীর বলেন, তাহলে তা অনুসরণ করা মুক্তাদীর উপর আবশ্যক হবে। বরং কারো কারো মতে ১৬ তাকবীর পর্যন্ত অনুসরণের অবকাশ রয়েছে। তবে এর বেশি অনুসরণ করা যাবে না। (فتح القدير ج١ ص٤٢٨)

بَابُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ صَلٰوةِ الْعِيْدِ ص١٦٤

ঈদের নামাযের পর অন্য নামায

... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِيْ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا– (بخاري ج١ ص١٣٥ باب الصلٰوة قبل العيد وبعدها، مسلم ج١ ص٢٨٩ فضل في الصلٰوة قبل الخطبة الخ، ترمذي ج١ ص١٢٠ باب لا صلٰوة قبل العيدين ولا بعدهما، نسائي ج١ ص٢٣٥ الصلٰوة قبل العيدين وبعدها، ابن ماجة ص٩٣)

অনুবাদঃ ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদুল ফিতরের নামায আদায়ের জন্য রওয়ানা হয়ে দুই রাকাত ঈদের নামায আদায় করেন। তিনি তার আগে বা পরে কোন নামায আদায় করেননি। অতঃপর তিনি বিলাল (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে মহিলাদের নিকট যান এবং তাদেরকে দান-খয়রাতের নির্দেশ দেন। মহিলাগণ তাদের কানের দুল ও গলার হার দান-খয়রাত করেন।

বিশ্লেষণঃ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, উভয় নামাযের পূর্বে ও পরে কোন সুন্নত নামায নেই। তবে ঈদের পূর্বে এবং পরে নফল নামায পড়া জায়েয কিনা- এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যা সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে চলে আসছে-

* ইমাম আহমদ, যুহরী ও ইবন জুরাইজ (রহ.)-এর মতে, ঈদের পূর্বে ও পরে নফল নামায পড়া সাধারণত মাকরূহ। (معارف السلن ج٤ ص٤٤٤)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

* ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, ঈদের পূর্বে ও পরে ঈদগাহে নফল নামায পড়া সাধারণভাবে মাকরূহ।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, ঈদের পূর্বে ও পরেও নফল নামায পড়া সাধারণভাবে জায়েয। অবশ্য তিনি ইমামের ক্ষেত্রে মাকরূহ হওয়ার প্রবক্তা।

(معارف السلن ج٤ ص٤٤٤)

* হাসান বসরী (রহ.)-এর মতে, ঈদের নামাযের পরে মাকরূহ, কিন্তু পূর্বে নয়।

* ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আওযাঈ (রহ.) ও অন্যান্য কূফাবাসীর মতে, ঈদের পূর্বে মাকরূহ, পরে নয়। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এক্ষেত্রে আরেকটু ব্যাখ্যা করে বলেন, ঈদের পরে নিজ গৃহে মাকরূহ নয়, ঈদগাহে মাকরূহ। (فتح الملهم ج٢ ص٤٣٣، بذل ا لمجهود ج٢ ص٢١١)

দলীল (১)ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত-

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الْعِيْدِ شَيْئًا فَاِذَا رَجَعَ اِلٰى مَنْزِلِه صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ– (ابن ماجة ص٩٢)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদের পূর্বে কোন নামায আদায় করতেন না। তবে ঘরে প্রত্যাবর্তনের পর দু'রাকাত নামায আদায় করতেন।

দলীল (২)ঃ হযরত ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর আমল বর্ণিত আছে-

كَانَ عَبْدُ اللهِ اِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيْدِ صَلّٰى فِيْ اَهْلِه اَرْبَعًا– (مصنف ابن ابي شيبة ج٢ ص١٧٩)

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ যখন ঈদের দিন প্রত্যাবর্তন করতেন তখন তাঁর ঘরে চার রাকাত আদায় করতেন।

দলীল (৩)ঃ আবু মাসউদ (রাঃ)-এর আছার-

لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ الصَّلاَةَ قَبْلَ خُرُوْجِ الاِمَامِ يَوْمَ الْعِيْدِ– (مجمع الزوائد ج٢ ص٢٠٢)

অর্থাৎ, ঈদের দিন ইমামের বের হওয়ার পূর্বে কোন সুন্নত নেই।

জবাবঃ যে সকল রেওয়ায়েতে ঈদের পূর্বে নামায পড়া নিষেধ বর্ণিত আছে, সেগুলো তো হানাফী ও অন্যান্যদের বিপরীত নয়। কেননা তাঁরাও বলেন যে, ঈদের নামাযের পূর্বে নামায নিষেধ। কিন্তু যে সকল রেওয়ায়েতে ঈদের পরে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা হল, ঈদের পরে ঈদগাহে যেন নামায না পড়ে। আর এটাই হানাফীদের অভিমত।

* আর শাফেঈ ও হাসান বসরী (রহ.) কিয়াস ও মাওকূফ হাদীসের উপর ভিত্তি করে যে মত দিয়েছেন তা মারফূ হাদীসের বিপরীতে গ্রহণযোগ্য নয়।

(معارف السنن ج٤ ص٤٤٤، تنظيم ج١ ص٤٧٣)

بَابُ مَتٰى يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ ص١٧٠

মুসাফির কখন নামায কসর পড়বে

... عَنْ يَحْيَ بْنِ يَزِيْدَ الْهَنَائِيِّ قَالَ سَأَلْتُ انَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَجَ مَسِيْرَةَ ثَلٰثَةِ اَمْيَالٍ اَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ شُعْبَةُ شَكَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ — (مسلم ج١ ص٢٤٢ صلٰوة المسافرين وقصرها)

অনুবাদঃ ... ইয়াহ্‌ইয়া ইবন ইয়াযীদ আল-হানানী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রাঃ)-কে সফরের সময় নামাযে কসর পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তিন মাইল অথবা তিন ফারসাখ দূরত্ব অতিক্রম করতেন, তখন তিনি চার রাকাত ফরয নামাযের পরিবর্তে দুই রাকাত পড়তেন।

... عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِيْ الْحُلَيْفَلَةِ رَكْعَتَيْنِ — (ابو داود ج١ ص١٧٠، بخاري ج١ ص١٤٨ باب يقصر اذا خرج من موضعه، مسلم ج١ ص٢٤٢، ترمذي ج١ ص١٢٢ باب التقصير في السفر، نسائي ج١ ص٨٣ باب صلٰوة العصر في السفر)

অনুবাদঃ ... আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে (সফরে রওয়ানা হয়ে) মদীনাতে চার রাকাত যুহরের নামায আদায় করেছি এবং যুল-হুলায়ফাতে গিয়ে আসরের নামায দুই রাকাত আদায় করি।

বিশ্লেষণঃ কতটুকু রাস্তা অতিক্রম করলে কসর (চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায দুই রাকাত) পড়া জায়েয হবে, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

* কতক আহলে যাহিরের মতে, সফরের জন্য নির্দিষ্ট কোন দূরত্ব নির্ধারণ প্রয়োজন নেই, বরং সাধারণ সফরেও কসর করা জায়েয। তবে, ইবন হাযিম সাধারণ সফরকে এক মাইল পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। (معارف السنن ج٤ ص٤٧٣)

* কোন কোন আহলে যাহিরের মতে, কসর ওয়াজিব হওয়ার জন্য শুধু তিন মাইল পরিমাণ পথ অতিক্রম করাই যথেষ্ট। (فتح الباري ج٢ ص٤٦٧)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত উভয় হাদীস। উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় হাদীসে মদীনা ও যুল-হুলায়ফার কথা বর্ণিত আছে। আর যুল-হুলায়ফা মদীনা থেকে তিন মাইলের ব্যবধান।

সুতরাং উভয় হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, তিন মাইলের দূরত্বের ব্যবধানে কসর করা যাবে। (بذل المجهود ج٢ ص٢٣١)

* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, ১৬ ফরসখের ব্যবধানে নামায কসর করা যাবে। উল্লেখ্য যে, এক ফরসখ=৩মাইল। সুতরাং ১৬ ফরসখ=৩x১৬=৪৮ মাইল। মোট কথা হল, শরঈ ৪৮ মাইল দূরত্বের ব্যবধানে নামায কসর করা হবে। (معارف السنن ج٤ ص٤٧٣، درس مشكوٰة ج٢ ص١٢٩)

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, কমপক্ষে তিন মনযিলের সফর কসর ওয়াজিব হওয়ার কারণ হয়। আর একদিন একরাতের দূরত্বকে এক মনযিল বলে। আর একদিন একরাতে সাধারণভাবে চললে ১৬ মাইল অতিক্রম করা যায়। এ হিসেবে ৩ দিনে (৩x১৬=) ৪৮ মাইল অতিক্রম করলে তার উপর কসর ওয়াজিব হবে। আর এরই ভিত্তিতে বলা যায় যে, চার ইমামের মাঝে এক্ষেত্রে যে মতপার্থক্য রয়েছে তা শুধু শব্দগত, দূরত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নয়। (فتح الملهم ج٢ ص٢٥٢)

চার ইমামের দলীল (১)ঃ ... عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ فَوْقَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ فَصَاعِدًا اِلاَّ وَمَعَهَا اَبُوْهَا اَوْ اَخُوْهَا اَوْ زَوْجُهَا اَوِ ابْنِهَا اَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ مِّنْهَا– (ابو داود ج١ ص٢٤٢ باب في المرة تحج بغير محرم، بخاري ج١ ص١٤٧ باب في كم يقصر الصلوٰة)

অর্থাৎ, ... আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে তার তিন দিনের অধিক দূরত্ব সফর করা বৈধ নয়, যদি তার সাথে তার পিতা, তার ভাই, তার স্বামী, তার পুত্র বা কোন মুহরিম ব্যক্তি না থাকে।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَّلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَّلَيْلَةً– (ابو داود ج١ ص٢١ باب التوقيت في المسح، ترمذي ج١ ص٢٧ باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم)

অর্থাৎ, ... খুযাইমা ইবন সাবিত (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সাঃ) ইরশাদ করেন, মুসাফিরের জন্য মোজার উপর মাসেহ করার নির্ধারিত সময়সীমা হল তিন দিন এবং মুকীমের (নিজ বাড়িতে অবস্থানকারী) জন্য একদিন একরাত।

হাদীসদ্বয় থেকে বুঝা যায় যে, সফরের সময়সীমা শরীয়ত প্রণেতা কর্তৃক নির্ধারিত। আর তা হল তিন দিন তিন রাত। কেননা, এর দ্বারা ব্যক্তির হুকুম ও অবস্থা পরিবর্তন হয়। (فتح الملهم ج٢ ص٢٠٣)

জবাবঃ আহলে যাহিরের প্রথম দলীলের জবাবে ইমামগণ বলেন- উক্ত হাদীসে তিন মাইলের কথা বলা হয়েছে বটে, কিন্তু সাথে সাথে 'অথবা' (او) বলে তিন ফারসাখের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং খোদ হাদীসেই যখন সন্দেহ, তখন তা দলীল হতে পারে না।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ যদিও উক্ত হাদীসে 'যুল-হুলাইয়া' স্থানের কথা উল্লেখ রয়েছে। মূলতঃ নবী করীম (সাঃ) মক্কা শরীফ সফর করার ইচ্ছায় বের হন। আর পথিমধ্যে যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছার পর আসরের সময় হয়ে যায়। যুল-হুলায়ফা সফরের শেষ মনযিল ছিল না, বরং তা ছিল সফরের পথিমধ্যে অবস্থিত একটি স্থান। সুতরাং তাতে কসর পড়াতে এটা জরুরী নয় যে, সফরের দূরত্ব হল তিন মাইল। কারণ স্বীয় আবাসস্থল থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই কসর শুরু হয়ে যায়। যদিও তা এক মাইল হোক না কেন। সুতরাং উক্ত হাদীসটি দ্বারা দলীল দেয়া সহীহ নয়।

بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ ص١٧٠

দুই ওয়াক্তের নামায একত্র করা

... عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَخْبَرَهُمْ اَنَّهُمْ خَرَجُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَاَخَّرَ الصَّلٰوةَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ

دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا– (مسلم ج١ ص٢٤٦ باب جواز الجمع بين الصلوتين في السفر، ترمذي ج١ ص١٢٤ باب الجمع بين الصلوتين، ابن ماجة ص٧٦)

অনুবাদঃ ... মুআয ইবন জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবূকের যুদ্ধের সময় তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সফরে বের হলে তিনি তখন যুহর ও আসরের নামায একত্রে এবং মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করেন। একদিন তিনি যুহরের নামায বিলম্ব করে যুহর ও আসরের নামায একত্রে পড়েন। অতঃপর তিনি মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করেন।

বিশ্লেষণঃ দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া জায়েয কিনা- এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। উল্লেখ্য যে, একত্র করা দুই প্রকার।

(১) جمع حقيقي (বাস্তবে একত্রিত করা)

(২) جمع صوري (বাহ্যিক অর্থে একত্রিত করা)

جمع حقيقي হল, দুই নামাযকে একই ওয়াক্তে আদায় করা। যেমন, যুহর ও আসরকে অথবা মাগরিব ও এশাকে কোন এক ওয়াক্তে একসাথে আদায় করা।

جمع صوري হল, দুই নামাযের মধ্য থেকে একটিকে তার শেষ সময়ে এবং দ্বিতীয়টিকে তার প্রথম সময়ে আদায় করা। যেমন, যুহরকে দেরি করে একেবারে যুহরের শেষ সময়ে আদায় করা এবং আসরকে একেবারে আওয়াল ওয়াক্তে আদায় করা। এমনিভাবে মাগরিবকে দেরি করে একেবারে শেষ ওয়াক্তে আদায় করা এবং এশাকে আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করা। (تنظيم ج١ ص٤٤٣)

এই দুই প্রকারের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার তথা جمع صوري সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয আছে। কেননা, এমতাবস্থায় প্রত্যেক নামাযই নিজ নিজ সময়ে আদায় হচ্ছে, যদিও একটু পূর্বাপর করা হয়েছে। কিন্তু প্রথম প্রকার তথা جمع حقيقي জায়েয কিনা, এ নিয়ে তিন ইমামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমামত্রয়ের মতে, ওযর অবস্থায় جمع حقيقي জায়েয আছে। তবে ওযরের ব্যাখ্যায় তাঁদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালিক ও শাফেঈ (রহ.)-এর নিকট সফর এবং বৃষ্টিপাত ওযর। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর নিকট অসুস্থতাও একটি ওযর।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ

الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِيْنَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ– (ابو داود ج١ ص١٧١، مسلم ج١ ص٢٤٦، نسائي ج١ ص٩٩ الجمع بين الصلاتين في الحضر)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় অবস্থানকালে ভয়ভীতি ও বৃষ্টিজনিত কারণ ছাড়াই যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করেছেন।

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اِرْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ اِلٰى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَاِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–

(ابو داود ج١ ص١٧٢، بخاري ج١ ص١٥٠ باب اذا ارتحل بعد الخ، مسلم ج١ ص٢٤٥، نسائي ج١ ص٩٨)

অর্থাৎ, ... আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দুপুরের পূর্বে সফরে রওয়ানা হলে যুহরের নামাযকে আসর পর্যন্ত বিলম্বিত করে যুহর ও আসর একত্রে আদায় করতেন। তিনি (সাঃ) সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর সফরের উদ্দেশ্যে বের হলে যুহরের নামায আদায়ের পর বাহনে সওয়ার হতেন।

দলীল (৪)ঃ অন্য আরেকটি হাদীসে বর্ণিত আছে-

... حَتّٰى غَابَ الشَّفَقُ وَتَصَوَّبَتِ النُّجُوْمُ ثُمَّ اِنَّهُ نَزَلَ فَصَلَّى الصَّلٰوتَيْنِ جَمِيْعًا– (ابو داود ج١ ص١٧٢، مسلم ج١ ص٢٤٦، ترمذي ج١ ص١٢٤)

অর্থাৎ, ... অতঃপর যখন 'শাফাক' বিদূরিত হল এবং তারকারাজির আলো স্পষ্ট হল, তখন তিনি (উমর রাঃ) অবতরণ করে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করেন।

উল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, **جمع حقيقي** বৈধ।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.), সাহেবাইন, সুফিয়ান সাওরী, হাসান বসরী, ইবন সীরীন ও ইবরাহীম নাখঈ (রহ.)-এর মতে, আরাফা ও মুযদালিফা ব্যতীত আর কোথাও কোন সময়ই **جمع حقيقي** জায়েয নয়। (بذل المجهود ج١٢ ص٢٣٢)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا

অর্থাৎ, নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরয করা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। (নিসাঃ ১০৪)

নামায শুরু করার সময় যেমন নির্দিষ্ট রয়েছে, ঠিক তেমনি এর শেষ সময়ও নির্দিষ্ট রয়েছে। সুতরাং নামায সময়ের আগেও আদায় করা যাবে না এবং নির্দিষ্ট সময়ের

পরেও পড়া যাবে না। সময় যেহেতু নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, তাই সুনির্দিষ্ট সময়েই তা আদায় করতে হবে।

দলীল (২)ঃ পবিত্র কুরআনের আয়াত- فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ

অর্থাৎ, অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বেখবর। (মাউনঃ ৪, ৫)

যদিও উক্ত আয়াতদ্বয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যায়, কিন্তু যারা নামাযের সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে না এবং নামাযকে যারা যথাসময়ে আদায় করে না, তারাও উক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

দলীল (৩)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى

অর্থাৎ, সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে। (বাকারাঃ ২৩৮)

উক্ত আয়াতে সুনির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায়ের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

দলীল (৪)ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন-

مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلٰوةً اِلاَّ لِوَقْتِهَا اِلاَّ بِجَمْعٍ فَاِنَّه جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ— (ابو داود ج١ ص٢٦٧ باب الصلوة بجمع ، بخاري ج١ ص٢٢٨ باب متى يصلي الفجر بجمع)

অর্থাৎ, ... আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কোন নামায এর (জন্য নির্ধারিত) সময় ব্যতীত আদায় করতে দেখিনি। কিন্তু তিনি মুযদালিফাতে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করেন।

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ ও হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নামাযের সময় সুনির্দিষ্ট। সুতরাং সময়ের বাইরে নামায শরীয়তসম্মত নয়।

জবাবঃ তিন ইমামের প্রদত্ত দলীলসমূহের জবাবে হানাফীগণ বলেন,

(১) ঐ সকল রেওয়ায়েত যেখানে নবী করীম (সাঃ) থেকে দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায়ের কথা বর্ণিত হয়েছে, এর দ্বারা جمع حقيقي উদ্দেশ্য নয় বরং جمع صوري উদ্দেশ্য। এর বিভিন্ন দলীলও রয়েছে। যেমন-

... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ اَنَّ مُؤَذِّنَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الصَّلٰوةُ قَالَ سِرْسِرْ حَتّٰى اِذَا كَانَ قَبْلَ غُيُوْبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ اِنْتَظَرَ حَتّٰى غَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا عَجِلَ بِهِ اَمْرٌ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِيْ صَنَعْتُ فَسَارَ فِيْ ذَالِكَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَسِيْرَةَ ثَلَاثٍ— (ابو داود ج١ ص١٧١)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ ইবন ওয়াকিদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ইবন উমর (রাঃ)-এর মুআয্যিন নামাযের সময় আস-সালাত (নামায) শব্দ উচ্চারণ পূর্বক তাঁকে ডাকলে তিনি বললেন, চল, চল। অতঃপর তিনি পশ্চিমাকাশের সাদা বর্ণ দূরীভূত হওয়ার প্রাক্কালে বাহন হতে অবতরণ করে মাগরিবের নামায আদায় করেন এবং এরপর সামান্য অপেক্ষা করে পশ্চিমাকাশের সাদা বর্ণ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হলে তিনি এশার নামায আদায় করেন, অতঃপর বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকলে এরূপ করতেন, যেরূপ আমি করেছি। তিনি সেই দিন ও রাতের সফরে তিন দিনের রাস্তা অতিক্রম করেন। (অর্থাৎ, তিনি তড়িঘড়ি পথ অতিক্রম করেন)

উক্ত হাদীস দ্বারা جمع صوري প্রমাণিত হয়। আর এমন উদাহরণ হাদীসের কিতাবসমূহে যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে।

(২) جمع حقيقي অর্থ নিলে অনেক হাদীসকেই পরিত্যাগ করতে হয়। আর جمع صوري অর্থ নিলে সকল হাদীসের উপর আমল করা সম্ভব হয়।

(৩) যে সকল হাদীসে দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়ার উল্লেখ রয়েছে, সে সকল প্রত্যেক হাদীসেই যুহরের সাথে আসরের কিংবা মাগরিবের সাথে এশার কথা উল্লেখ রয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, একত্র দ্বারা جمع صوري-ই উদ্দেশ্য। কেননা অন্যান্য ওয়াক্তে একত্র করা সম্ভব নয়।

(৪) হানাফীদের যে সকল দলীল রয়েছে, তা সবই পবিত্র কুরআনের আয়াত ও মারফূ হাদীস। খবরে ওয়াহিদের দ্বারা এগুলোর মুকাবিলা করা সম্ভব নয়।

চতুর্থ দলীলের জবাবঃ উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীসে 'শাফাক' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। আর 'শাফাক'-এর দুটি অর্থ রয়েছে-

ক. সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পশ্চিমাকাশের লালিমা।

খ. পশ্চিমাকাশের লালিমা অংশ অস্তমিত হওয়ার পর শুভ্রতা। আর হযরত উমর (রাঃ) جمع صوري করতে গিয়ে মাগরিবের নামাযকে লালিমা অস্ত যাওয়ার পর শুভ্রতা পর্যন্ত বিলম্বিত করেন। আর হানাফীদের মতে, শুভ্রতা পর্যন্ত মাগরিবের শেষ ওয়াক্ত থাকে। সুতরাং উক্ত হাদীস দ্বারা جمع حقيقي-এর উদাহরণ গ্রহণযোগ্য নয়। আর হানাফীদের এই অভিমতটির পুরোপুরি সামঞ্জস্যতা পাওয়া যায় ইতিপূর্বে বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবন ওয়াকিদের বর্ণিত হাদীসে। (تنظيم ج١ ص٤٤٥)

بَابُ التَّطَوُّعِ فِيْ السَّفَرِ ص١٧٢

সফরে সুন্নত ও নফল নামায

... عَنْ حَفْص بْنِ عَاصِمٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِيْ الطَّرِيْقِ قَالَ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَقْبَلَ فَرَاٰى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هٰؤُلَاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُوْنَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا اَتْمَمْتُ صَلَاتِيْ يَا ابْنَ اَخِيْ اِنِّيْ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَحِبْتُ اَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَة حَسَنَة–

(بخاري ج١ ص١٤٩ باب من لم يتطوع في السفر الخ، مسلم ج١ ص٢٤٢ صلوٰة المسافرين وقصرها، نسائي ج١ ص٢١٣ ترك التطوع في السفر، ابن ماجة ص٧٦)

অনুবাদঃ .. হযরত হাফস ইবন আসিম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রাঃ)-এর সাথে সফরে গেলাম। পথিমধ্যে তিনি আমাদের সাথে দুই রাকাত (ফরয) নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি মুখ ফিরিয়ে দেখতে পান যে, কিছু সংখ্যক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, এরা কি করছে? আমি বললাম, তারা নফল নামায পড়ছে। তিনি বলেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! যদি আমি নফল আদায় করতে পারতাম তবে ফরয নামায চার রাকাতই আদায় করতাম। অতঃপর তিনি বলেন, বহু সফরে আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গী ছিলাম। কিন্তু আমি কখনো তাঁকে তাঁর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত দুই রাকাতের অধিক নামায আদায় করতে দেখিনি। আমি (বহু সফরে) হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সঙ্গী ছিলাম। তাঁকেও তাঁর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত দুই রাকাতের অধিক নামায পড়তে দেখিনি। তিনি আরো বলেন, আমি উমর (রাঃ) ও উসমান (রাঃ)-এর সঙ্গী ছিলাম। তাঁদেরকেও তাঁদের ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত দুই রাকাতের অধিক নামায পড়তে দেখিনি। কেননা, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে।"

বিশ্লেষণঃ সফর অবস্থায় সুন্নত নামায আদায়ের ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের সুচিন্তিত অভিমত হল, সুন্নতে কোন কসর নেই। তবে এতটুকু সুযোগ রয়েছে যে, সফর অবস্থায় সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ সুন্নতে যায়েদাহ হয়ে যায়। যদি সুযোগ হয় তাহলে

পড়ে নিবে, যদি সুযোগ না হয় তাহলে পড়া জরুরী নয়। তবে ফজরের সুন্নতের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া উচিত। কেননা স্বয়ং নবী করীম (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে সফর অবস্থায়ও ফজরের সুন্নত পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়-

وَرَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ السَّفَرِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ– (بخاري ج۱ ص۱٤۹ باب من تطوع في السفر الخ)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) সফরে ফজরের দু'রাকাত আদায় করেছেন।

* আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। এ ব্যাপারে নবী করীম (সাঃ) বলেন-

لَا تَدْعُوْهُمَا وَاِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ– (ابو داود ج۱ ص۱۷۹ باب في تخفيفها)

অর্থাৎ, ফজরের সুন্নত ত্যাগ করবে না, যদিও তোমাকে ঘোড়া হাঁকিয়ে নিক। উল্লেখ্য যে, ঘোড়া হাঁকানো অধিকাংশ সময় সফরে হয়ে থাকে, অন্যত্র নয়।

আল্লামা নববী (রহ.) বলেন, "উলামাগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, সফর অবস্থায় সাধারণ নফল তথা ইশরাক, চাশত, আওয়াবীন এবং তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য নফল নামায পড়া জায়েয। কিন্তু সুন্নতে মুয়াক্কাদার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইবন উমর (রাঃ) প্রমুখ এসব সুন্নতে মুয়াক্কাদা ছেড়ে দেয়ার পক্ষপাতী। আর ইমাম শাফেঈ (রহ.) এবং জমহুরের অভিমত হল, সুন্নতে মুয়াক্কাদা আদায় করা মুস্তাহাব। (شرح مسلم ج۱ ص۲٤۲)

আর এ ব্যাপারে হানাফীগণ বলেন, যদি সুযোগ হয় তাহলে সুন্নতে মুয়াক্কাদা আদায় করার মধ্যে ফযীলত রয়েছে। তবে তরক করাতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ সফর অবস্থায় এগুলোর তাকীদ অনেকখানি কমে যায়। (اعلاء السنن ج۷ ص۲۸۹)

بَابُ مَتٰى يَتِمُّ الْمُسَافِرُ ص۱۷۲

মুসাফির কখন পুরা নামায আদায় করবে?

... عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَقُلْنَا هَلْ اَقَمْتُمْ بِهَا شَيْئًا قَالَ اَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا– (بخاري ج۱ ص۱٤۷ باب ما جاء في التقصير وكم يقيم الخ، مسلم ج۱ ص۲٤۳ صلوة المسافرين وقصرها، ترمذي ج۱ ص۱۲۲ باب في كم تقصر الصلوة، نسائي ج۱ ص۲۱۲ باب المقام الذي يقصر الخ، ابن ماجة ص۷٦–۷۷)

অনুবাদঃ ... আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে মদীনা হতে মক্কায় রওয়ানা করলাম। আমরা পুনরায় মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি নামায (চার রাকাত ফরয) দুই রাকাত করে আদায় করেন। রাবী বলেন, আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা সেখানে কতদিন অবস্থান করেন? তিনি বলেন, দশ দিন মাত্র।

বিশ্লেষণঃ সফরে কতদিন ইকামত বা অবস্থান করার নিয়ত করলে কসর বাতিল হয়ে যায়, এ ব্যাপারে ইমামদের মতানৈক্য রয়েছে। আল্লামা আঈনী (রহ.) উমদাতুল ক্বারী গ্রন্থে এ ব্যাপারে ২২টি মত উল্লেখ করেছেন। এখানে প্রথমে সংক্ষেপে কয়েকটি অভিমত দেয়া হল। অতঃপর চার ইমামের মতামত বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

রবীয়াতুর রায়ের মতে, একদিন একরাত ইকামতের নিয়ত করলে কসর বাতিল হয়ে যাবে।

* সাঈদ ইবন যুবাইর (রাঃ) বলেন, তুমি যখন তোমার পা অন্য কোন কওমের জমিতে রাখ, তখন নামায পূর্ণ কর। (معارف السنن ج٤ ص٤٧٤)

* ইমাম আওযাঈ (রহ.)-এর মতে, ১২ দিন ইকামতের নিয়ত করলে কসর বাতিল হয়ে যাবে। (مصنف عب الرزاق ج٢ ص٥٣٤)

* ইমাম ইসহাক (রহ.)-এর মতে, ১৯ দিন ইকামতের নিয়ত করলে কসর বাতিল হয়ে যাবে। (ترمذي ج١ ص١٢٣)

* হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর মতে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসাফির ব্যক্তি ওয়াতনে আসলী তথা মূল আবাসস্থলে ফিরে না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি কসর করতে পারবে। চাই অন্যান্য জায়গায় যত দীর্ঘ সময়ই অবস্থান করুক না কেন।

(طحاوي ج١ ص٢٠٢)

* ইমাম আহমদ ও দাউদ যাহেরী (রহ.)-এর মতে, চার দিনের অতিরিক্ত অবস্থানের নিয়ত করার দ্বারা কসর বাতিল হয়ে যাবে। (فتح الملهم ج٢ ص٢٥٤)

দলীলঃ নবী করীম (সাঃ) যেহেতু মক্কায় চারদিন পর্যন্ত সফর অবস্থায় হজ্জ পালন করেছেন, এতে বুঝা যায় যে, চারদিন (২০ ওয়াক্ত নামায) পর্যন্ত কসর করা যায়। এর অধিক নয়।

* ইমাম শাফেঈ ও মালিক (রহ.)-এর মতে এবং আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী চার দিনের অবস্থানের নিয়ত করলে কসর বাতিল হয়ে যাবে। (معارف السنن ج٤ ص٤٧٤)

দলীলঃ সাঈদ ইবন মুসায়্যিবের আছার। তিনি বলেন-

إِذَا قَامَ أَرْبَعًا صَلَّى أَرْبَعًا– (ترمذي ج١ ص١٢٢-١٢٣)

অর্থাৎ, যখন চারদিন অবস্থান করবে, তখন (কসর না করে) চার রাকাত নামায পড়বে।

* ইমাম আবু হানিফা ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে, পনের দিন ইকামতের নিয়ত করলে কসর বাতিল হয়ে যাবে। আর ১৫ দিনের কম অবস্থানের নিয়ত করলে কসর আদায় করবে। (بذل المجهود ج٢ ص٢٤٢)

দলীলঃ আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর (রাঃ)-এর আছার। তিনি বলেন-

إِذَا كُنْتَ مُسَافِرًا فَوَطَنْتَ نَفْسَكَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَةَ عَشْرَةَ يَوْمًا فَاَتْمِمِ الصَّلٰوةَ وَاِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِيْ فَاقْصِرِ الصَّلٰوةَ– (كتاب الآثار ص٣٤)

অর্থাৎ, যখন তুমি মুসাফির হও এবং ১৫ দিন অবস্থান করার নিয়ত কর, তাহলে নামায পূর্ণাঙ্গ আদায় কর। আর যদি এ সম্পর্কে তোমার জানা না থাকে তাহলে নামায কসর কর।

জবাবঃ ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ প্রদত্ত দলীলটি খুবই দুর্বল। কেননা, উক্ত দলীলে শুধু চারদিনের অবস্থা জানা যায়। যেহেতু তিনি চারদিন ছিলেন। কিন্তু চারদিনের বেশি অবস্থান করলে এর হুকুম কি হবে, তা জানা যায়নি। অথচ অন্য হাদীসে এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণিত আছে।

শাফেঈ ও মালিকীগণের দলীলের জবাবঃ সাঈদ ইবন মুসায়্যিব (রহ.)-এর পক্ষ থেকেই হানাফীদের অনুকূলে আছার বর্ণিত আছে। তিনি বলেন-

إِذَا قَدِمْتَ بَلْدَةً فَاَقَمْتَ خَمْسَةَ عَشْرَةَ يَوْمًا فَاَتِمَّ الصَّلٰوةَ– (اثار السنن ص٢١٧)

অর্থাৎ, যখন তুমি কোন শহরে এসে সেখানে ১৫ দিন অবস্থান করবে, তখন তুমি নামায পূর্ণাঙ্গ আদায় করবে।

সুতরাং সাঈদ ইবন মুসায়্যিব-এর আছারদ্বয়ে অসামঞ্জস্য (تعارض) দেখা যাচ্ছে। আর নিয়ম হল, إِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا। অর্থাৎ যখন দুটি রেওয়ায়েত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখন উভয়টি পরিত্যাজ্য হবে। আর এই ভিত্তিতে যদি উভয়টি পরিত্যাজ্যও হয়, তবুও আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর (রাঃ)-এর আছারের দ্বারা হানাফীদের অভিমত প্রতিষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য যে, হাদীসের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, অবস্থানের ক্ষেত্রে কোন রেওয়ায়েতে ১৭ দিনের কথা, কোনটিতে ১৮ দিনের, কোনটিতে ১৯ দিনের,

কোনটিতে ২০ দিনের এবং কোনটিতে ১৫ দিনের কথা উল্লেখ রয়েছে। এক্ষেত্রে হানাফীগণ অধিক সতর্কতাবশত সবচেয়ে কম ১৫ দিনকে সাব্যস্ত করেছেন।

(تنظيم الاشتات ج١ ص٤٤٢)

ইসহাক (রহ.)-এর অভিমতের জবাবঃ যত রেওয়ায়েতে ১৫ দিনের চেয়ে বেশি সময়ের কথা উল্লেখ রয়েছে, এগুলো ঐ অবস্থার হিসেবে বিবেচিত হবে, যখন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বসবাসের নিমিত্তে অবস্থানের নিয়ত করা হয়নি। যার প্রবক্তা হানাফীগণও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ কসরের নামায আযীমত (আবশ্যিক), নাকি রুখসত (ঐচ্ছিক)ঃ

এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, সফরের দরুন দুই ও তিন রাকাত (ফজর, মাগরিব) বিশিষ্ট নামাযে (এবং সুন্নত নামাযে) কোন কসর নেই এবং এ ব্যাপারেও সবাই একমত যে, সফরের কারণে চার রাকাত বিশিষ্ট নামায কসর অবস্থায় দুই রাকাত পড়তে হয়। কিন্তু এই কসর আযীমত (আবশ্যিক), নাকি রুখসত (ঐচ্ছিক), এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে এবং ইমাম মালিক (রহ.)-এর এক মত অনুযায়ী, কসর করা রুখসত তথা এর অবকাশ রয়েছে এবং সম্পূর্ণ আদায় করা শুধু জায়েযই নয়, বরং উত্তম। আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা বলেন, কোন ব্যক্তি যদি চার রাকাত নামায পড়ে এবং এতে যদি প্রথম বৈঠকে নাও বসে, তবুও তার নামায আদায় হয়ে যাবে। (شرح المهذب ج٤ ص٣٣٥، درس مشكوة ج٢ ص١٢٤)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ

অর্থাৎ, তোমরা যখন পৃথিবীতে সফর কর, তখন তোমাদের নামাযে কসর করাতে কোন দোষ নেই। (নিসাঃ ১০১)

উক্ত আয়াতে "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ হল, তোমাদের কোন দোষ নেই। এই শব্দটি মুবাহ বা বৈধ (রুখসত) হওয়ার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়, ওয়াজিবের ক্ষেত্রে নয়।

দলীল (২)ঃ হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীস-

اِنَّهَا اِعْتَمَرَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ حَتّٰى اِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ قَصَرْتَ وَاَتْمَمْتُ وَاَفْطَرْتَ وَصُمْتُ

قَالَ أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ وَمَاعَبَ عَلَيَّ– (نسائي ج١ ص٢١٣ باب المقام الذي يقصر بمثله، بيهقي ج٣ ص١٤٢)

অর্থাৎ, তিনি (আয়িশা রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে মদীনা থেকে মক্কায় এসে উমরা করলেন। মক্কায় আসার পর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতাপিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আপনি তো কসর করেছেন, আর আমি পূর্ণ নামায পড়েছি। আপনি রোযা রাখেননি। আর আমি রোযা রেখেছি। উত্তরে তিনি (সাঃ) বললেন, হে আয়িশা! বেশ তো ভালই করেছ। তিনি আমাকে দোষারোপ করেননি।

উক্ত হাদীস দ্বারা এ কথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সফরে নামায পূর্ণ করা জায়েয, তদুপরি উত্তম।

দলীল (৩)ঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে অপর একটি হাদীস-

"اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْصُرُ فِيْ السَّفَرِ وَيُتِمُّ وَيُفْطِرُ وَيَصُوْمُ"–

(دار قطني ج٢ ص١٨٩)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) সফরে কসর করতেন এবং পূর্ণও আদায় করতেন। রোযা রাখতেন, আবার কখনো কখনো ছেড়েও দিতেন।

দলীল (৪)ঃ হযরত উসমান (রাঃ)-এর আমল। তিনি মক্কা মুকাররামায় পূর্ণ নামায আদায় করতেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামের সামনেই এই আমল করেছেন। অথচ কেউই এতে বাধা দেননি। যদি ইহা জায়েযই না হত, তাহলে তিনি ইহা কিভাবে করতেন? (بخاري ج١ ص١٤٧)

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, হাসান বসরী, হাম্মাদ (রহ.)-এর মতে এবং ইমাম মালিক (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মত হল, কসর আযীমত তথা ওয়াজিব। অতএব, ইহা ছেড়ে পূর্ণ নামায আদায় করা জায়েয নয়। তাই হানাফীদের মতে, মুসাফির অবস্থায় যদি চার রাকাত ফরয নামায পড়ে এবং এতে যদি প্রথম বৈঠক না করে, তবে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, তার উপর দুই রাকাতে বসা ফরয ছিল, কিন্তু সে তা তরক করেছে।

(بذل المجهود ج٢ ص٢٢٩، تعليق الصبيح ج٢ ص١٢١، درس مشكوٰة ج٢ ص١٢٤)

দলীল (১)ঃ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ رَكْعَتَيْنِ فِيْ الْحَضَرِو السَّفَرِ فَاُقِرَّتْ صَلٰوةُ السَّفَرِ وَزِيْدَ فِيْ صَلٰوةِ الْحَضَرِ– (ابو داود ج١ ص١٦٩ باب صلوة المسافر، بخاري ج١ ص١٤٨ باب يقصر اذا خرج من موضعه الخ، مسلم ج١ ص٢٤١، نسائي ج١ ص٧٩ باب كيف فرضة الصلٰوة)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (প্রথমে) সফরে ও আবাসে দুই দুই রাকাত নামাযই ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর সফরের সময়ের নামায ঠিক রাখা হয়েছে এবং আবাসের নামায বৃদ্ধি করা হয়েছে।

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যায় যে, সফর অবস্থায় চার রাকাতের স্থলে দুই রাকাত নামায পড়া তা সফরের উপর ভিত্তি করে কমানো হয়নি। বরং আসল ফরযের উপর ভিত্তি করেই তা আদায় করা হয়। সুতরাং ইহা আযীমত তথা ওয়াজিব, রুখসত বা ঐচ্ছিক নয়।

দলীল (২)ঃ হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস-

قَالَ اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلٰوةَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ الْحَضَرِ اَرْبَعًا وَّفِيْ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ– (نسائي ج١ ص٢١٢ كتاب تقصير الصلوة في السفر)

অর্থাৎ, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবী করীম (সাঃ)-এর ভাষায় মুকীম অবস্থায় চার রাকাত নামায ফরয করেছেন। আর সফর অবস্থায় দুই রাকাত।

দলীল (৩)ঃ হযরত উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস-

صَلاَةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَالْفِطْرُ رَكْعَتَانِ وَالنَّحْرُ رَكْعَتَانِ وَالسَّفَرُ رَكْعَتَانِ (نسائي ج١ ص٢١١)

অর্থাৎ, জুমআর নামায দুই রাকাত, ঈদুল ফিতরের নমায দুই রাকাত, কুরবানীর নামায দুই রাকাত, সফরের নামায দুই রাকাত।

দলীল (৪)ঃ মুআররিক থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন-

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلٰوةِ فِيْ السَّفَرِ فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ– (مجمع الزوائد ج٢ ص١٥٤–١٥٥، طحاوي ج١ ص٢٠٥)

অর্থাৎ, আমি ইবন উমর (রাঃ)-কে সফরের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। উত্তরে তিনি বললেন, দু'রাকাত করে (চার রাকাত ফরযের ক্ষেত্রে)। যে সুন্নতের (নিয়মের) বিরোধিতা করল সে কুফরী করল।

এ সকল রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় যে, সফর অবস্থায় কসর আযীমত, রুখসত নয়।

জবাবঃ আহনাফদের পক্ষ থেকে শাফেঈ ও হাম্বলীদের দলীলের জবাবঃ

(১) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ শব্দের দ্বারা কসর ওয়াজিব না হওয়া বুঝায় না। যেমনিভাবে সাফা এবং মারওয়াহতে দৌড়ানোর ব্যাপারে لَا جُنَاحَ (গোনাহ হবে না) শব্দ ব্যবহার করা সত্ত্বেও ইমাম শাফেঈ (রহ.)-সহ সবার মতে, সাফা-মারওয়াহ সাঈ করা ওয়াজিব। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী-

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا–

অর্থাৎ, কেউ যদি বায়তুল্লায় হজ্জ অথবা উমরা করে, তাহলে তার জন্য সাফা-মারওয়াহতে (পাহাড়দ্বয়) তাওয়াফ করতে কোন দোষ নেই। (বাকারাঃ ১৫৮)

* এ ব্যাপারে আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন, কসর ওয়াজিব। আর কুরআনে যে এভাবে বলা হয়েছে, তোমাদের কোন গুনাহ হবে না। যদ্বারা সন্দেহ হয়, কসর না করাও জায়েয। এর প্রকৃত কারণ এই যে, সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) সর্বদা পূর্ণ নামায আদায়ে অভ্যস্ত ছিলেন। তাই তাঁরা সফর অবস্থায় কসর করাকে বাহ্যত গুনাহের ওয়াসওয়াসা হত। তাই তাঁদের সন্দেহ দূর করার জন্য এমন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

(২) বস্তুতঃ এই আয়াতটি সফরের কসর সংক্রান্ত নয়, বরং সালাতুল খাওয়াফ তথা শংকার নামায সংক্রান্ত। কেননা উক্ত আয়াতেই উল্লেখ আছে যে-

اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا– অর্থাৎ, যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্যক্ত করবে।

সুতরাং উক্ত আয়াত দ্বারা কসর না করা যে জায়েয আছে, এর দলীল দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা, এ আয়াতে শংকাকালীন নামাযে কসর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ধরনের ক্ষেত্রে কসর, পরিমাণের ক্ষেত্রে কসর নয়। (معارف السنن ج٤ ص٤٦١)

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ (১) প্রথমত হাফিজ যায়লাঈ (রহ.) এই হাদীসটির মূল পাঠকে (মতন) মুনকার সাব্যস্ত করেছেন। কারো কারো মতে হাদীসটি মুযতারিব।

(نصب الراية ج٢ ص١٩١، بيهقي ج٣ ص١٤٢)

তাছাড়া আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে-

حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةً وَّاحِدَةً وَاعْتَمَرَ اَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِيْ ذِيْ الْقَعْدَةِ اِلاَّ الَّتِيْ مَعَ حَجَّتِهِ– (بخاري ج١ ص٢٣٩ باب كم اعتمر النبي صلعم، مسلم ج١ ص٤٠٩ باب بيان عدد عمر النبي صلعم)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) একবার হজ্জ করেছেন। আর উমরা করেছেন চারবার। সবগুলোই যিলকাদ মাসে। শুধুমাত্র হজ্জের সাথে কৃত উমরা ছাড়া।

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) রমযানে কখনো উমরা করেননি। অথচ হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসে রমযানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

তবে কোন কোন শাফেঈ বলেন, এটা মক্কা বিজয়ের ঘটনা। আর মক্কা বিজয় হয়েছিল রমযানে। তদুপরি তাদের দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা মক্কা বিজয়ের সফরে আয়িশা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন না। (فتح الباري ج٣ ص٣٧٤)

বরং এই সফরে নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) এবং হযরত যয়নব (রাঃ) অথবা হযরত মায়মুনা (রাঃ)। (معارف السنن ج٤ ص٤٦٠)
* অগত্যা যদি এই হাদীসটিকে বিশুদ্ধ স্বীকৃতি দিয়ে ইহা মেনে নেয়া হয় যে, মক্কা বিজয়ের সময় হযরত আয়িশা (রাঃ)ও নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন, তাহলেও এর উত্তরে বলা হবে যে, এই সফরে নবী করীম (সাঃ) পনের দিন অথবা এর চেয়ে বেশি দিন মক্কায় মুকীম ছিলেন। (معارف السنن ج٤ ص٤٦٠)
কিন্তু এ সময় নবী করীম (সাঃ) অবস্থানের নিয়ত করেননি। কেননা তিনি (সাঃ) হুনাইন যাওয়ার কথা ভাবছিলেন। আর এদিকে হযরত আয়িশা (রাঃ) মনে করলেন যে, নবী করীম (সাঃ) হয়ত দীর্ঘদিন মক্কায় অবস্থান করবেন। এর ভিত্তিতেই হযরত আয়িশা (রাঃ) নামায পূর্ণ আদায় করেছিলেন এবং রোযাও রাখতে লাগলেন। ফলে নবী করীম (সাঃ) হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর কাজ ভাল হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন।
কতক সাহিত্যিক তো একথাও বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) ছিলেন সমস্ত গুণের অধিকারী। তিনি একজন সুসাহিত্যিক ও রহমতের নবী ছিলেন। তাই তিনি কাউকে কোন বিষয়ে সরাসরি কষ্টদায়ক কথা বলতেন না। বরং হেকমতের মাধ্যমে কাজ হাসিল করে নিতেন। এমনিভাবে উক্ত হাদীসে নবী করীম (সাঃ) হযরত আয়িশা (রাঃ)-কে اَحْسَنْتِ (তুমি ভাল করেছ) বলে সূক্ষ্ম পন্থায় তাঁর আমলের অসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। নবী করীম (সাঃ) اَحْسَنْتِ বলে বুঝাতে চাচ্ছেন যে, আমি হলাম অনুসৃত (متبوع) আর তুমি হলে অনুসারী (تَابِع)। তুমি আমার নিকট জিজ্ঞেস না করে নিজে নিজেই ইজতিহাদ করে আমল করা শুরু করে দিয়েছ। বাহ! বেশতো! ভালই করেছ! (اَحْسَنْتِ)
আসলে প্রত্যেকটি ভাষাতেই এমন প্রচলন রয়েছে যে, শাব্দিক অর্থে যদিও ইতিবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এর মূল লক্ষ্য হল নেতিবাচক বুঝানো। উক্ত হাদীসেও তাই ঘটেছে।

তৃতীয় দলীলের জবাবঃ উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য হল এই যে, নবী করীম (সাঃ) যখন সংক্ষিপ্ত সফর তথা ৪৮ মাইল থেকে কম দূরত্বের ব্যবধান সফর করতেন। তখন তিনি (সাঃ) পূর্ণ নামায আদায় করতেন। আর তিনি যখন ৪৮ মাইল বা এর চেয়ে বেশি দূরত্বের সফর করতেন, তখন তিনি কসর করতেন। প্রকৃতপক্ষে হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর নিকটও এ ব্যাপারে কোন মারফু হাদীস নেই। বরং সবই ছিল তাঁর ইজতিহাদ। আর তাই ইমাম যুহরী যখন উরওয়াকে প্রশ্ন করলেন-

فَمَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ– (بخاري ج١ ص١٤٨)

অর্থাৎ, আয়িশা (রাঃ)-এর কি হল যে, তিনি নামায পূর্ণ পড়েছেন?

উত্তরে উরওয়া বলেন- تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ অর্থাৎ, যে ব্যাখ্যার দ্বারা হযরত উসমান (রাঃ) মক্কায় পূর্ণ নামায পড়তেন, এমনি ধরনের কোন ব্যাখ্যার ভিত্তিতে আয়িশা (রাঃ)ও নামায পূর্ণ করতেন। এতে বুঝা যায় যে, হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর নিকট কোন মারফু হাদীস নেই। নতুবা উরওয়া এমন কথা বলতেন না। বরং সরাসরি হাদীস বলতেন।

চতুর্থ দলীলের জবাবঃ (১) হযরত উসমান (রাঃ) মক্কা মুকাররামায় বাড়ি বানিয়েছিলেন। আর তাঁর ইজতিহাদ ছিল, যে শহরে মানুষ ঘর তৈরি করে নিবে, তাতে পরিপূর্ণ নামায পড়া ওয়াজিব। (ابو داود ج١ ص٢٧٠ باب الصلاة في المنى)

(২) কতক মুহাদ্দিস বলেন, হযরত উসমান (রাঃ) মক্কায় অবস্থানের নিয়ত করেছিলেন।

(৩) কেউ কেউ বলেন, হযরত উসমান (রাঃ) মুসাফিরই ছিলেন। কিন্তু হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় বেদুঈনদের সমাবেশ হত। এমতাবস্থায় যদি তিনি কসর করতেন, তাহলে বেদুঈনরা হয়ত মনে করে বসত যে, পূর্ণ নামাযই দুই রাকাত। তাই তাদেরকে শিক্ষার উদ্দেশ্যে ইকামত বা অবস্থানের নিয়ত করে পূর্ণ নামায আদায় করা সঙ্গত মনে করেছেন। (فتح الباري ج٢ ص٤٧١)

بَابُ اِذَا اَدْرَكَ الْاِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ص١٨٠

ফজরের সুন্নত পড়ার পূর্বেই ইমাম জামাআতে দাঁড়িয়ে গেলে

... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا صَلٰوةَ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ– (ترمذي ج١ ص٩٦ باب اذا اقيمت الصلوة فلا صلوة الا المكتوبة، ابن ماجة ص٨١)

অনুবাদঃ ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, ফরয নামাযের ইকামত হয়ে যাওয়ার পর ফরয ব্যতীত আর কোন নামায পড়া দুরস্ত নয়।

বিশ্লেষণঃ ফরয নামাযের জামাআত দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর সুন্নত আদায় করা যাবে কিনা এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

তবে যুহর, আসর ও এশা এই তিন ওয়াক্তের নামাযের ব্যাপারে সকল ইমামের অভিমত এই যে, জামাআত দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর সুন্নত পড়া নাজায়েয। কিন্তু ফজরের দুই রাকাত সুন্নতের ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ, ইসহাক ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে, ফজরেও এই হুকুম যে, জামাআত দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর ফজরের সুন্নত পড়া জায়েয নয়।
দলীলঃ পূর্বোল্লিখিত হাদীস।

* ইমাম আবু হানিফা ও মালিক (রহ.)-এর মতে, জামাআত দাঁড়িয়ে গেলেও শর্তসাপেক্ষে ফজরের সুন্নত আদায় করা জায়েয আছে। ইমাম মালিক (রহ.)-এর নিকট দুটি শর্ত- (১) সুন্নত মসজিদের বাইরে পড়তে হবে, মসজিদ ছোট হোক কিংবা বড় হোক। (২) সুন্নতের পর যদি উভয় রাকাত জামাআতে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর নিকট দুটি শর্ত- (১) কমপক্ষে এক রাকাত জামাআতে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে। (যদিও দ্বিতীয় রাকাতের রুকুতে হোক না কেন) (২) মসজিদ যদি ছোট হয় তাহলে জামাআত শুরু হয়ে গেলে সুন্নত বাইরে পড়বে। আর মসজিদ বড় হলে সুন্নত মসজিদের কোন এক কোণে বা বারান্দায় আদায় করে নেবে। যাতে কাতারের সাথে মিলে না যায়।

দলীলঃ ইমাম আবু হানিফা ও মালিক (রহ.) দলীল হিসেবে ঐ সমস্ত রেওয়ায়েত পেশ করেন,যাতে ফজরের সুন্নতের ব্যাপারে জোর দেয়া হয়েছে। যেমন-

... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَدْعُوْهُمَا وَاِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ– (ابو داود ج١ ص١٧٩ باب في تخفيفها)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা কোন সময় ঐ দুই রাকাত নামায (ফজরের সুন্নত) ত্যাগ করবে না, যদিও তোমাদেরকে ঘোড়া হাঁকিয়ে নেয়।

হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীস- ... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْئٍ مِنَ النَّوَافِلِ اَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِّنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ– (ابو داود ج١ ص١٧٨ باب ركعتي الفجر، بخاري ج١ ص١٥٥ باب تعاهد ركعتي الفجر، مسلم ج١ ص٢٥١ باب الاستحباب ركعتى سنة الفجر الخ)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাকাত নামায আদায়ের ব্যাপারে যে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা পালন করেছেন তা অন্য কোন নামাযের (সুন্নত বা নফল) ব্যাপারে পালন করেননি।

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ حَتّٰى اِنِّيْ لَاَقُوْلُ هَلْ قَرَأَ فِيْهِمَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ– (ابو داود ج١ ص١٧٨، مسلم ج١ ص٢٥٠)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাকাত নামায এত সংক্ষেপ করতেন যে, আমি ধারণা করতাম, তিনি কি তাতে কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন?

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

رَكْعَتَى الْفَجْرِ خَيْر مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا– (مسلم ج١ ص٢٥١، ترمذي ج١ ص٩٥ باب ركعتي الفجر من الفضل، نسائي ج١ ص٢٥٣ المحافظة على الركعتين قبل الفجر)

অর্থাৎ, ফজরের দু'রাকাত (সুন্নত) দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তা থেকে উত্তম।

এছাড়া বহু ফকীহ সাহাবা (রাঃ) থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, জামাআত দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরেও তাঁরা ফজরের সুন্নত আদায় করতেন। যেমন-

(১) হযরত নাফি বলেন-

اَيْقَظْتُ ابْنَ عُمَرَ لِصَلٰوةِ الْفَجْرِ وَقَدْ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَقَامَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ– (طحاوي ج١ ص١٨٣)

অর্থাৎ, আমি ইবন উমর (রাঃ)-কে ফজরের নামাযের জন্য জাগিয়ে দিলাম। তখন নামাযের ইকামত হয়ে গেছে। এতদসত্ত্বেও তিনি দাঁড়িয়ে দু'রাকাত (সুন্নত) নামায পড়লেন।

(২) আবু উসমান আনসারী বলেন-

جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَالْاِمَامُ فِيْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْاِمَامِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَهُمْ– (طحاوي ج١ ص١٨٣)

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) এমন সময় এলেন, যখন ইমাম ফজরের নামায শুরু করে দিয়েছেন। অথচ ইবন আব্বাস (রাঃ) দু'রাকাত (সুন্নত) আদায় করেননি। তখন আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস ইমামের (থেকে একটু) পিছনে (গিয়ে) দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। অতঃপর তাঁদের সাথে নামাযে শামিল হলেন।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ এবং সাহাবায়ে কিরামের আমল (আছার) দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফজরের সুন্নত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে জামাআত শুরু হওয়ার পরেও কিছু শর্তসাপেক্ষে আদায় করা জায়েয।

আকলী দলীলঃ হাদীসে সাধারণত ফজরের নামাযে বড় সূরা পাঠ করার তাকীদ এসেছে। এতে এ হেকমতেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ফজরের জামাআত শুরু হলে গেলেও কোন মুসল্লী সুন্নত পড়েও যাতে জামাআতে শরীক হতে পারে।

জবাবঃ শাফেঈদের প্রদত্ত দলীলের জবাবে আহনাফগণ বলেন-
(১) উল্লিখিত হাদীসটির উপর পরিপূর্ণরূপে শাফেঈগণও আমল করেন না। কারণ যদি কেউ জামাআত দাঁড়ানোর পর স্বীয় ঘরে সুন্নত পড়ে রওয়ানা দেয়, তাহলে এটা ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতেও জায়েয। অথচ সাধারণভাবে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসের হুকুমে এটিও অন্তর্ভুক্ত। এতে ঘরে এবং মসজিদের কোন পার্থক্য নেই।
(২) প্রকৃতপক্ষে হাদীসটির উদ্দেশ্য হল, ফরয নামাযের তাগিদ প্রদান। যাতে ফরয নামাযের পূর্বেই সুন্নতসমূহ সময় থাকতে আদায় করে নেয়, যাতে জামাআতের সময় তাড়াহুড়া করতে না হয়। (درس ترمذي ج۲ ص۱۸٦—۱۸۸، درس مشكوة ج۲ ص۱۰۰—۱۰۱)

بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ مَتٰى يَقْضِيْهَا ص۱۸۰

যদি কারো ফজরের সুন্নত বাদ পড়ে তবে সে তা কখন পড়বে?

... عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُّصَلِّيْ بَعْدَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ فَقَالَ الرَّجُلُ اِنِّيْ لَمْ اَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْاٰنَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ— (ترمذي ج۱ ص۹٦ باب تفوته الركعتان قبل الفجر، ابن ماجة ص۸۲)

অনুবাদঃ ... কায়েস ইবন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দেখতে পান যে, এক ব্যক্তি ফজরের ফরয নামায আদায়ের পর দুই রাকাত নামায আদায় করছে। মহানবী (সাঃ) বলেন, ফজরের নামায দুই রাকাত। তখন ঐ ব্যক্তি বলেন, আমি ইতিপূর্বে ফজরের দুই রাকাত সুন্নত আদায় করতে পারিনি, তা এখন আদায় করছি। তার কথায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নীরব থাকেন।

বিশ্লেষণঃ যদি কোন ব্যক্তি জামাআতের পূর্বে ফজরের সুন্নত না পড়ে থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি তা কখন আদায় করবে, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম শাফেঈ ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, যদি কোন ব্যক্তি ফজরের ফরযের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নত আদায় না করে থাকে, তাহলে ফরযের পর সূর্য উঠার পূর্বেই আদায় করতে পারবে।

দলীল (১)ঃ উপরিউক্ত হাদীস।

দলীল (২)ঃ কায়েস (রাঃ) বলেন-

... يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ لَمْ اَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَى الْفَجْرِ قَالَ فَلاَ اِذَنْ– (ترمذي ج١ ص٩٦ باب فيمن تفويته الركعتان الخ)

অর্থাৎ, ... ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ফজরের দু'রাকাত (সুন্নত) পড়তে পারিনি। এতদশ্রবণে নবী করীম (সাঃ) বলেন- "فَلاَ اِذَنْ"

ইমাম শাফেঈ ও আহমদ "فَلاَ اِذَنْ" কে "فَلاَ بَاْسَ اِذَنْ" শব্দে বিশ্লেষণ করেছেন। অর্থাৎ, যদি ছুটে যাওয়া এ দু'রাকাত তখন পড়ে নেয় তাহলে কোন ক্ষতি নেই।

* ইমাম আবু হানিফা ও মালিক (রহ.)-এর মতে, ফজরের ফরযের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে সুন্নত পড়া জায়েয নয়। বরং তা সূর্যোদয়ের পরে আদায় করবে। (তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে কোন কোন কিতাবে বর্ণিত আছে যে, শুধু সুন্নতের কোন কাযা নেই। হাঁ, যদি ফরযের সাথে সুন্নত কাযা হয়, তাহলে কাযা করতে পারে। তাঁর এ রেওয়ায়েতটিই প্রাধান্য লাভ করেছে।)

দলীল (১)ঃ ... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ رَكْعَتَى الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ– (ترمذي ج١ ص٩٦ باب في اعادتهما بعد طلوع الشمس)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ফজরের দু'রাকাত সুন্নত পড়ল না, সে যেন অবশ্যই এ দু'রাকাত সূর্যোদয়ের পর আদায় করে নেয়।

দলীল (২)ঃ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ صَلٰوةَ بَعْدَ صَلٰوةِ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلٰوةَ بَعْدَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ– (بخاري ج١ ص٨٢ باب الصلوة بعد الفجر الخ، نسائي ج١ ص٩٦ اللهي عن الصلوة بعد العصر، ابن ماجة ص٨٩)

অর্থাৎ, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, আসরের নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত আর কোন নামায নেই। অনুরূপ, ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত আর কোন নামায নেই।

দলীল (৩)ঃ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ–

অর্থাৎ, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং সকালের (ফজর) পর সূর্যোদয় পর্যন্ত নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। (সূত্রঃ ঐ) সুতরাং উপরোল্লিখিত দলীলসমূহ দ্বারা একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ফজরের ফরয নামাযের পর সূর্য উদয়ের পূর্বে ফজরের সুন্নত আদায় করা জায়েয নয়।

জবাবঃ শাফেঈ ও হাম্বলীগণ কায়েস (রাঃ)-এর যে হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন এর জবাবে হানাফীগণ বলেন, ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিযী (রহ.) উক্ত হাদীসটি মুরসাল সাব্যস্ত করেছেন। আর শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে মুরসাল হাদীস দলীলযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ فَلاَ اِذَنْ-এর অর্থ আহনাফদের নিকট فَلاَ بَأْسَ اِذَنْ নয় বরং এর অর্থ হল فَلاَ تُصَلِّ اِذَنْ তথা তখন নামায পড়ো না।

* এমতাবস্থায় নামায পড়ার জন্য অনুমতি দিয়েছেন- এ সংক্রান্ত হাদীস খুবই কম এবং সেগুলো ক্রিয়ামূলক (فعلي)। কিন্তু নামায না পড়ার হাদীস সংখ্যা অনেক এবং মুতাওয়াতির ও বাচনিক (قولي)। সুতরাং সংখ্যায় আধিক্য, মুতাওয়াতির ও বাচনিক হাদীসসমূহই প্রাধান্য পাবে। (درس ترمذي ج٢ ص١٨٩–١٩١)

بَابُ فِيْ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ ص١٩٤

রমযান মাসের রাত্রিকালীন ইবাদত

... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْغَبُ فِيْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّأْمُرَهُمْ بِعَزِيْمَةٍ ثُمَّ يَقُوْلُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالاَمْرُ عَلٰى ذَالِكَ ثُمَّ كَانَ الاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ فِيْ خِلاَفَةِ اَبِيْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِّنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ–

(بخاري ج١ ص٢٦٩ باب فضل من قام رمضان، مسلم ج١ ص٢٥٩ باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، ترمذي ج١ ص١٦٦-١٦٧ باب الترغيب في قيام شهر رمضان الخ، نسائي ج١ ص٢٣٨ باب ثواب من قام رمضان الخ/٣٠٩، ابن ماجة ص٩٥)

অনুবাদঃ ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীদের রমযান মাসের (রাতে) নামায আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন; তবে তিনি (সাঃ) তা আদায়ের ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব (ফরয-ওয়াজিবের ন্যায়) আরোপ করতেন না। তিনি (সাঃ) বলতেন, যে ব্যক্তি রমযান মাস ঈমানের সাথে এবং মর্যাদা লাভের আশায় দণ্ডায়মান হয়ে তারাবীহ নামায আদায় করে, আল্লাহ তাআলা তার জীবনের পূর্ববর্তী সমস্ত (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তিকালের পরেও এই নামাযের (তারাবীহ) বিধান একইরূপ থাকে। অতঃপর আবুবকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালেও তদ্রূপ থাকে এবং উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের প্রথম দিকেও এরূপ ছিল।

বিশ্লেষণঃ ইমাম নববী (রহ.) বলেন, কিয়ামে রমযান দ্বারা তারাবীহর নামায বুঝানো উদ্দেশ্য।

আল্লামা কিরমানী (রহ.) ইজমা নকল করে বলেন-

اِتَّفَقُوْا عَلٰى اَنَّ الْمُرَادَ بِقِيَامِ رَمَضَانَ صَلٰوةُ التَّرَاوِيْحِ- (فتح الباري ج٤ ص٢١٧)

অর্থাৎ, সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, কিয়ামে রমযান দ্বারা উদ্দেশ্য সালাতুত তারাবীহ।

এ ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠের ঐকমত্য হচ্ছে, তারাবীর নামায সুন্নতে মুআক্কাদাহ এবং পুরুষদের মসজিদে জামাআতে আদায় করা উত্তম।

(البحر الرائق ج٢ ص٦٦، معارف السنن ج٦ ص٢٢١، فتح الباري ج٤ ص٢١٩)

* তারাবীর নামাযে রাকাত সংখ্যা কত, এ নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছেঃ

* আহলে যাহির, ইবন হুমাম এবং ইবন তাইমিয়ার (রহ.) মতে, তারাবীর নামায মাত্র আট রাকাত এবং তা মুস্তাহাব।

(تحفة الاحوذي ج٢ ص٧٢-٧٦، فتح القدير ج١ ص٣٣٤، الفتاوي الكبرٰى لابن تيمية ج١ ص١٧٦)

দলীল (১)ঃ ... عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلاَ فِيْ غَيْرِهِ عَلٰى اِحْدٰى عَشَرَةَ

رَكَعَةً الخ (ابو داود ج١ ص١٨٩ باب في صلوة الليل، بخاري ج١ ص١٥٤، مسلم ج١ ص٢٥٤ باب صلوة الليل الخ، ترمذي ج١ ص٩٩ باب وصف صلوة النبي صلعم بالليل، نسائي ج١ ص٢٤٨ باب كيف الوتر بثلث، ابن ماجة ص٩٧)

অর্থাৎ, ... আবু সালামা হতে বর্ণিত, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্ত্রী হযরত আয়িশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রমযান মাসে কিরূপে নামায আদায় করতেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রমযান মাস ও অন্যান্য সময়ের রাত্রিতে এগার রাকাত নামায আদায় করতেন।...
তাঁরা বলেন, এই এগার রাকাতের মধ্যে তিন রাকাত হল বিতির। আর বাকী চার রাকাত করে মোট আট রাকাত হল তারাবীর নামায।

দলীল (২)ঃ হযরত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত-

... عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِّنَ الشَّهْرِ حَتّٰى بَقِيَ سَبْعٍ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ ... فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ اَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسُ فَقَامَ بِنَا ... ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ-

(ابو داود ج١ ص١٩٥، ترمذي ج١ ص١٦٦ باب قيام شهر رمضان، نسائي ج١ ص٢٣٨، ابن ماجة ص٩٥)

অর্থাৎ, ... আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে রমযানমাসে রোযাব্রত পালন করেছি। তিনি (সাঃ) রমযান মাসের প্রথম দিকে (তারাবীহ) নামায আমাদের সাথে আদায় করেননি। অতঃপর উক্ত মাসের মাত্র সাতটি রাত অবশিষ্ট থাকতে তিনি আমাদের নিয়ে (তারাবী) নামায আদায় করেন। এভাবে রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়। অতঃপর তিনি (সাঃ) ষষ্ঠ রাতে (অর্থাৎ পরের রাত) আমাদের সাথে (তারাবীহ) নামায আদায় করেননি। পরে পঞ্চম রাতে তিনি আমাদের সাথে নামায আদায়কালে রাতের অর্ধাংশ অতিবাহিত করেন। ... অতঃপর তৃতীয় রাতে তিনি তাঁর স্ত্রী ও পরিবার-পরিজনকে এবং অন্যান্য লোকদেরকে একত্রিত করে জামাআতের সাথে (তারাবীহর) নামায আদায় করেন। ... অতঃপর তিনি উক্ত মাসের বাকি দিনগুলোতে (২৯ ও ৩০) আমাদের সাথে জামাআতে আর তারাবীহ আদায় করেননি।
উপরোল্লিখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) মাত্র তিন দিন তারাবীহ পড়েছেন। যদ্বারা তারাবীহ মুস্তাহাব বুঝা যায়, সুন্নতে মুআক্কাদাহ প্রমাণিত হয় না।

* চার ইমাম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মতের এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, তারাবীহ নামায বিশ রাকাত। এবং ইহা সুন্নতে মুআক্কাদা।

(البحر الرائق ج٢ ص٦٦، معارف السنن ج٦ ص٢٢١، فتح الباري ج٤ ص٢١٩)

কেউ কেউ হয়ত বলতে পারে, ইমাম মালিক (রহ.) থেকে তো ৩৬ এবং ৪১ রাকাতেরও বর্ণনা পাওয়া যায়। উক্ত প্রশ্নের নিরসন হল এই যে, ৪১ রাকাতবিশিষ্ট রেওয়ায়েতে ৩ রাকাত বিতির এবং বিতরের পরে ২ রাকাত নফল নামায শামিল রয়েছে। অর্থাৎ ৩ রাকাত বিতির এবং ২ রাকাত নফল মোট ৫ রাকাত নামায ৪১ রাকাত নামায থেকে বাদ দিলে ৩৬ রাকাত নামায থাকে। সুতরাং তাঁর থেকে মোট রেওয়ায়েত পাওয়া যায় দুটি- (১) ২০ রাকাত এবং (২) ৩৬ রাকাত।

আর ৩৬ রাকাতের মূল ঘটনা হল এই, মদীনা এবং মক্কাবাসীরা ২০ রাকাত তারাবীহ নামাযের উপরই আমল করত। কিন্তু মক্কাবাসীরা প্রত্যেক ৪ রাকাত অন্তর তওয়াফ করত। কিন্তু মদীনাবাসীরা যেহেতু তওয়াফ করার কোন সুযোগ পেত না, তাই তারা সওয়াবের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক তওয়াফের পরিবর্তে ৪ রাকাত নামায নফল হিসেবে অতিরিক্ত আদায় করত। এভাবে মদীনাবাসীরা মক্কাবাসীদের মোকাবেলায় ১৬ রাকাত নামায অতিরিক্ত আদায় করত। ফলে তাদের সর্বমোট (২০+১৬)=৩৬ রাকাত হত। সুতরাং এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে তারাবীহ নামায বিশ রাকাতই ছিল।

(بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج١ ص١٥٢، المغني ج٢ ص١٦٧، ركعات تروايح ص٦٠-٦١)

চার ইমামের দলীলঃ (১) হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর মারফূ হাদীস, যা ইবন হুমাইদ সূত্রে বর্ণিত।

اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ فِيْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ-

(المطالب العالية ج١ ص١٤٦)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রমযানে ২০ রাকাত নামায পড়তেন আবার বিতরও পড়তেন। এ হাদীসটি যদিও সনদগতভাবে দুর্বল, কিন্তু ইজমা ও এর উপর ব্যাপক আমলের দ্বারা এতে শক্তি সঞ্চারিত হয়।

(২) ইয়াযীদ ইবন রূমান থেকে বর্ণিত- قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ فِيْ زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيْ رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَّعِشْرِيْنَ رَكْعَةً- (مؤطا امام مالك ص٩٨)

অর্থাৎ, তিনি বলেন, উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ)-এর সময়ে লোকজন রমযানে ২৩ রাকাত নামায পড়ত (২০ রাকাত তারাবীহ এবং ৩ রাকাত বিতির)।

(৩) আল্লামা ইবন তাইমিয়াহ (রহ.) এক জায়গায় স্বীয় ফাতওয়ায় লিখেন-

قَدْ ثَبَتَ اَنَّ اُبَيَّ بْنَ كَعَبٍ كَانَ يَقُوْمُ بِالنَّاسِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً فِيْ قِيَامِ رَمَضَانَ وَيُوْتِرُ بِثَلاَثٍ ... (مجموع فتاوى ابن تيمية ج٢٣ ص١١٢)

অর্থাৎ, একথা প্রমাণিত যে, উবাই ইবন কাব (রাঃ) লোকজনকে নিয়ে ২০ রাকাত তারাবীহ্ পড়তেন এবং তিন রাকাত বিতর পড়তেন।

অতএব, প্রচুর সংখ্যক আলিম এ মত পোষণ করেন যে, এটাই সুন্নত। কারণ তিনি এই সুন্নত আদায় করেছেন মুহাজির ও আনসারদের মাঝে। আর এটা কোন প্রত্যাখ্যানকারী প্রত্যাখ্যান করেননি।

(৪) বিশ রাকাত হওয়ার ব্যাপারে হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ)-এর সময়ে সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সাঃ) মাত্র তিন রাত জামাআতের সাথে তারাবীহ্র নামায আদায় করেছেন। কিন্তু তিনি একা একা স্বীয় গৃহে অধিক নফল নামায তথা তারাবীহ্ আদায় করতেন। যার প্রমাণ অনেক রেওয়ায়েত দ্বারা বর্ণিত আছে যে, তিনি রমযান মাসে অন্যান্য মাসের রাতের ইবাদতের তুলনায় বেশি ইবাদত করতেন। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) তারাবীর প্রতি অধিক গুরুত্ব না দেয়ার কারণ হিসেবে তিনি নিজেই বলেন-

... عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَمْنَعْنِيْ مِنَ الْخُرُوْجِ اِلَيْكُمْ اِلاَّ اَنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذٰلِكَ فِيْ رَمَضَانَ–

(ابو داود ج١ ص١٩٤–١٩٥، بخاري ج١ ص٢٦٩، مسلم ج١ ص٢٥٩، نسائي ج١ ص٢٣٨)

অর্থাৎ, ... নবী করীম (সাঃ)-এর স্ত্রী হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ... নবী করীম (সাঃ) বলেন, আমি এ কারণেই নামায জামাআতের সাথে আদায় করার জন্য আসিনি যে, আমার ভয় হচ্ছিল তোমাদের উপর ফরয করা হয় কিনা। এটা রমযান মাসের (তারাবীহ্ নামায আদায়ের) ঘটনা।

এতে বুঝা যায় যে, নবী করীম (সাঃ)-এর ইচ্ছা ছিল তারাবীহ্ নামায জামাআতের সাথেই আদায় করা হোক। আর তাই দেখা যায় যে, কিছু লোক যখন উবাই ইবন কাবের (রাঃ) পিছনে কুরআন শুনার জন্য মুক্তাদী হয়ে তারাবীর নামায আদায় করছিলেন, তখন নবী করীম (সাঃ) তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেন-

... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ... فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَابُوْا وَنِعْمَ مَا صَنَعُوْا–

(ابو داود ج١ ص١٩٥)

অর্থাৎ, ... হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। ... নবী করীম (সাঃ) বলেন, তারা ঠিকই করেছে এবং উত্তম কাজ করেছে।

এমতাবস্থায় নবী করীম (সাঃ)-এর ইন্তিকাল হয়ে গেল যে, তারাবীর কোন নিয়মিত জামাআত কায়েম করেননি। অতঃপর আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর যুগ আসল। তিনিও এ ব্যাপারে কোন এন্তেজাম করেননি। কেননা তাঁর উপর তখন মুসলিম খিলাফত টিকিয়ে রাখার এক গুরুদায়িত্ব ছিল। একদিকে উসামা (রাঃ)-এর বাহিনী প্রেরণ করা, অন্য দিকে মুরতাদদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা, অপরদিকে নবুওয়াতের দাবিদারদের প্রতিহত করা এবং যাকাত অস্বীকারকারীদেরকে যাকাত প্রদানে বাধ্য করা- এগুলো সবই ছিল নিঃসন্দেহে তারাবীর চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সর্বোপরি তাঁর খেলাফতকাল ছিল খুবই স্বল্প সময়ের। যার ফলে তিনি তারাবীর সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেননি।

অতঃপর এল হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের যুগ। তাঁর প্রাথমিক অবস্থা এমনিভাবেই চলতে লাগল। অবশেষে যখন রাষ্ট্রের বিশৃংখলা কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসল, তখন তিনি খিলাফতের দ্বিতীয় বর্ষে এদিকে মনোযোগ দিলেন। একদিন তিনি মসজিদে গিয়ে দেখেন যে, লোকেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী তারাবীর নামায আদায় করছে। তখন তিনি আফসোস করে বললেন-

... اِنِّيْ اُرٰى لَوْ جَمَعْتُ هٰؤُلَاءِ عَلٰى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ اَفْضَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلٰى اُبَيِّ بْنِ كَعَبٍ الخ (بخاري ج١ ص٢٦٩/١٥٢)

অর্থাৎ, ... আমি ভাবছি যদি এদেরকে একজন কারীর আওতায় একত্রিত করে দিতে পারতাম, তবে উত্তম হত। অতঃপর তিনি দৃঢ় সংকল্প নিয়ে উবাই ইবন কাব (রাঃ)-এর ইমামতিতে তাদেরকে একত্রিত করেন।

এভাবেই হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের যুগে গুরুত্ব সহকারে তারাবীর বিশ রাকাত নামায নির্দিষ্ট হয়ে যায়। যা সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) থেকে শুরু করে তাবিঈন ও সকল হক্কানী আলিম এর উপর আমল করে আসছেন।

সুতরাং এর দ্বারা বুঝা যায় যে, সাহাবায়ে কিরামের এক বড় জামাআত জীবিত থাকা সত্ত্বেও যেহেতু এর উপর আমল করতে অস্বীকার করেননি, তাই ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তারাবীর নামায বিশ রাকাতের উপর সাহাবায়ে কিরামের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(৬) সর্বোপরি বলা যায় যে, যদিও মেনে নেয়া হয় যে, নবী করীম (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে তারাবীর বিশ রাকাতের ব্যাপারে কোন কিছুই বর্ণিত এবং প্রমাণিত নেই। তবুও হযরত উমর (রাঃ)-এর নিজের পক্ষ থেকে প্রদত্ত রায় অনুযায়ী সুন্নত হিসেবে পরিগণিত হবে। কেননা নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّيْنَ الرَّاشِدِيْنَ–

অর্থাৎ, তোমরা আমার সুন্নত এবং সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত আঁকড়ে ধর।

* হযরত হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْتَدُوْا بِالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ–

(سلن ترمذي ج٢ ص٢٢٩)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, তোমরা আমার পরে আবুবকর ও উমর (রাঃ)-এর অনুসরণ কর।

জবাবঃ (১) হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর এগার রাকাত হাদীসের জবাবে বলা যায় যে, হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকেই তের রাকাত নামাযের রেওয়ায়েত সহীহ সনদে প্রমাণিত আছে-

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلٰثَ عَشَرَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْهَا ... (ابو داود ج١ ص١٨٩، بخاري ج١ ص١٥٣ كيف صلوٰة الليل، ترمذي ج١ ص١٠٠، ابن ماجة ص٥٨)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রাতে বিতির সহ তের রাকাত নামায আদায় করতেন।

আরো বর্ণিত আছে যে-

... عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ بِتِسْعٍ ... (ابو داود ج١ ص١٩١)

অর্থাৎ, ... হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রাত্রিতে তের রাকাত নামায আদায় করতেন এবং তিনি (সাঃ) নবম রাকাতে বিতির পাঠ শেষ করতেন।

এই সকল একাধিক বিপরীত রেওয়ায়েতের পরিপ্রেক্ষিতে ইবন হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন যে, আহলে যাহিরের আট রাকাতের মধ্যে তারাবীকে সীমাবদ্ধ করার দাবি বাতিল হয়ে যায়।

তাছাড়া আব্দুর রহমান মোবারকপুরী আহলে যাহিরের এক বড় ইমাম হওয়া সত্ত্বেও তার থেকেই তের রাকাতের রেওয়ায়েত প্রমাণিত। সুতরাং বুঝা যায় যে, তারাবীহ আট রাকাত নয়।

(২) যে হাদীসের দ্বারা আহলে যাহিরের তারাবীহ চার চার রাকাত করে মোট আট রাকাত আদায় করা এবং এক সালামে তিন রাকাত বিতির আদায়ের কথা উল্লেখ রয়েছে। তাও আহলে যাহিরের আমলের সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা আহলে যাহিররা

বিতির এক রাকাত আদায় করে থাকে অথবা তিন রাকাতই আদায় করে, তবে দুই সালামে এবং তারাবীর নামাযও দুই দুই রাকাত করে আদায় করে থাকে। সুতরাং উক্ত হাদীস তাদের দলীল হতে পারে না।

(৩) মুহাদ্দিসগণ হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর এগার, তের প্রভৃতি বর্ণিত হাদীসসমূহকে তাহাজ্জুদের নামায হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তাছাড়া একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মুহাদ্দিসগণ হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর বর্ণিত এগার রাকাতের হাদীসটিকে তারাবীর অনুচ্ছেদে উল্লেখ না করে তাহাজ্জুদের অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন।

যদিও আহলে যাহিররা বলেন যে, তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদ উভয়টি একই বিষয়, কিন্তু তাদের দাবি সম্পূর্ণ ভুল। কেননা নবী করীম (সাঃ) কখনো আনুষ্ঠানিকতার সাথে জামাআতে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করেননি। অথচ আবু যার (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সাঃ) আনুষ্ঠানিকতার সাথে জামাআতে তারাবীর নামায আদায় করেছেন।

* আবু যার (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা আরো জানা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) তারাবীর জামাত অধিক রাত তথা সেহেরী পর্যন্ত বিলম্ব করেছেন-

فَقَامَ بِنَا حَتّٰى خَشِيْنَا اَنْ يَّفُوْتَنَا الْفَلَاحَ–

অর্থাৎ, তিনি আমাদেরকে নিয়ে এত দীর্ঘ সময় নামায পড়েন, আমাদের আশংকা হচ্ছিল যে, হয়ত আমরা ফালাহ (সেহেরী খাওয়া)-এর সুযোগ হারিয়ে ফেলব।
কিন্তু তাহাজ্জুদের ব্যাপারে হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন-

لَمْ يَقُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً يَتِمُّهَا اِلَى الصَّبَاحِ– (ابو داود ج۱ ص۱۹۰

باب في صلوة الليل، سنن دارمي ج۱ ص۲۸۵)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সারা রাত জেগে থেকে কোন সময়ই ইবাদত করেননি।
অথচ আয়িশা (রাঃ) থেকে অনেক রেওয়ায়েত পাওয়া যায় যে, নবী করীম (সাঃ) রমযানে অনেক রাত্র পর্যন্ত ইবাদত করতেন এমনকি কোন কোন রাত বিছানায় শয়ন করতেন না।

অতএব, হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী যদি রমযান এবং রমযান ব্যতীত অন্যান্য সকল মাসের রাতের নামায একই রকম হয় (এগার রাকাত), তাহলে রমযানে রাতে না ঘুমিয়ে এত বেশি চেষ্টা-পরিশ্রম এবং ইবাদত করার তাৎপর্য কি?

প্রকৃতপক্ষে হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসের মূল লক্ষ্য হল এই যে, রমযানে এবং রমযান ব্যতীত অন্য মাসেও নবী করীম (সাঃ) তাহাজ্জুদের নামায সর্বদা আট

রাকাতই আদায় করতেন। এতে তো তারাবীর বিশ রাকাত আদায়ে নিষেধ প্রমাণিত হয় না।

হযরত আবু যার (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা আহলে যাহিরের তারাবীর নামায মুস্তাহাব প্রমাণ করার জবাবঃ

নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَّنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ الخ (نسائي ج١ ص٣٠٨، ابن ماجة ص٩٤)

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রমযানের রোযা ফরয করেছেন। আর আমি তোমাদের উপর সুন্নত করেছি এ তারাবীহ।

সুতরাং উক্ত হাদীসে যেখানে নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক সরাসরি সুন্নতের কথা বিদ্যমান, ইহাকে কিভাবে মুস্তাহাব বলা হবে? তাছাড়া ইতিপূর্বে তো আমরা জেনেছি, ইহা যাতে আমাদের উপর ফরয বা ওয়াজিব সাব্যস্ত না হয়, এজন্য তিনি জামাআতে নিয়মিত শরীক হতেন না।

كَمْ سَجْدَةً فِيْ الْقُرْاٰنِ ص١٩٩

কুরআন মজীদে সিজদায়ে তিলাওয়াত কয়টি?

... عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْرَاَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِيْ الْقُرْاٰنِ مِنْهَا ثَلَاثٌ فِيْ الْمُفَصَّلِ وَفِيْ سُوْرَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ– (ابن ماجة ص٧٥)

অনুবাদঃ ... আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) তাঁকে কুরআনের মধ্যে পনেরটি সিজদা আছে বলে শিক্ষা দিয়েছেন। এর তিনটি মুফাস্‌সালের মধ্যে (সূরা নাজম, ইনশিকাক ও আলাক), সূরা হজ্জের মধ্যে দুটি (হানাফী মাযহাব অনুযায়ী একটি)।

বিশ্লেষণঃ উক্ত অনুচ্ছেদে দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হবেঃ

(১) তেলাওয়াতের সিজদা সুন্নত না ওয়াজিব?

(২) পবিত্র কুরআনে তেলাওয়াতের সিজদা কয়টি?

প্রথম আলোচনাঃ তেলাওয়াতের সিজদা সুন্নত না ওয়াজিব এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ, ইসহাক, আওযাঈ ও দাউদ যাহেরী (রহ.)-এর মতে, তেলাওয়াতের সিজদা সুন্নত, ওয়াজিব নয়। (بذل المجهود ج٢ ص٣١٤)

দলীল (১)ঃ ... عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا– (ابو داود ج١ ص١٩٩ باب من لم ير السجود في المفصل، بخاري ج١ ص١٤٦ باب من قرأة السجدة ولم يسجد، مسلم ج١ ص٢١٥ باب السجود التلٰوة، ترمذي ج١ ص١٢٧ باب من لم يسجد فيه، نسائي ج١ ص١٥٢ ترك السجود في النجم)

অর্থাৎ, ... যায়েদ ইবন সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সম্মুখে 'সূরা নাজম' পাঠ করি। এই সূরা পাঠের পর তিনি সিজদা করেননি।

নবী করীম (সাঃ) যেহেতু সিজদা করেননি, এতে বুঝা যায় যে ইহা ওয়াজিব নয়।

দলীল (২)ঃ একদা হযরত উমর (রাঃ) মিম্বরের উপর একটি সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করলেন। এরপর নেমে সিজদা করলেন। অতঃপর এ আয়াতটি দ্বিতীয় জুমআতে তিলাওয়াত করলেন। ফলে লোকজন সিজদার জন্য প্রস্তুত হলে তিনি বলেন- اِنَّهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا اِلاَّ اَنْ نَشَاءَ فَلَمْ يَسْجُدْ وَلَمْ يَسْجُدُوْا– (بخاري ج١ ص١٤٧ باب من رأى ان الله عز وجل الخ، ترمذي ج١ ص١٢٧)

অর্থাৎ, আমাদের ইচ্ছা ব্যতীত সিজদা আমাদের উপর ফরয করা হয়নি। তাই তিনি সিজদা করলেন না এবং অন্যান্যরাও সিজদা করল না।

হযরত উমর (রাঃ)-এর বাণী ও আমল থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব নয়।

* ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইন (রহ.)-এর মতে, তিলাওয়াতে সিজদা ওয়াজিব- সুন্নত নয়। আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, যদি নামাযে পড়া হয়, তাহলে ওয়াজিব। আর নামাযের বাইরে পড়া হলে সুন্নত। (معارف السنن ج٥ ص٥٥)

দলীল (১)ঃ পবিত্র কুরআনের সিজদার আয়াত যেগুলোতে নির্দেশসূচক শব্দ এসেছে। আর নির্দেশ পালন করা ওয়াজিব। যেমন- كَلاَّ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

অর্থাৎ, কখনোই নয়, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। আপনি সিজদা করুন ও আমার নৈকট্য অর্জন করুন। (আলাকঃ ১৯)

কতক আয়াতে সিজদা না করার ক্ষেত্রে কাফেরদের অহংকার ও ঔদ্ধত্যের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন- وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لاَ يَسْجُدُوْنَ

অর্থাৎ, যখন তাদের কাছে কুরআন পাঠ করা হয়, তখন সিজদা করে না। (ইনশিকাকঃ ২১)

সুতরাং এমতাবস্থায় এর বিপরীতে একজন মুসলমানের উপর সিজদা ওয়াজিব হওয়ারই কথা।
কোন কোন আয়াতে পূর্ববর্তী নবীগণের সিজদার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে এবং আমাদেরকে তাঁদের অনুসরণের হুকুমও দেয়া হয়েছে। (সোয়াদঃ ২৪, আনআমঃ ৯০) সুতরাং যদি সিজদা করা হয়, তাহলে কাফেরদের বিরোধিতাও হয় এবং আম্বিয়া (আঃ)-এর অনুসরণও হয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে যার নির্দেশ রয়েছে। (فتح القدير ج١ ص٣٨٢)

দলীল (২)ঃ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ الخ (بخاري ج١ ص١٤٦ باب سجود المسلمين/ ج٢ ص٧٢١، مسلم ج١ ص٢١٥ باب سجود التلاوة، ترمذي ج١ ص١٢٧، نسائي ج١ ص١٥٢ السجود في النجم)

অর্থাৎ, ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) সূরা নজম পাঠান্তে সিজদা করেন এবং তাঁর সাথে মুসলমানগণও সিজদা করেন।

জবাবঃ আহনাফদের পক্ষ থেকে প্রথম দলীলের জবাবঃ ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) সিজদা করেছেন। সুতরাং যায়েদ ইবন সাবিতের হাদীসে বর্ণিত **فلم يسجد**-এর অর্থ হবে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সিজদা করেননি। আর আহনাফদের মতেও তাৎক্ষণিক সিজদা করা ওয়াজিব নয়।
নবী করীম (সাঃ)-এর তাৎক্ষণিক সিজদা না করার আরেকটি কারণ এই হতে পারে যে, এই সময় তিনি অযুবিহীন ছিলেন অথবা তাৎক্ষণিক সিজদা না করাও যে জায়েয তা বুঝানো উদ্দেশ্য ছিল।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ হযরত উমর (রাঃ)-এর আছারের উত্তর হল এই যে, মারফু হাদীসের মুকাবিলায় সাহাবীদের আছার দলীলযোগ্য নয়। অথবা, তাৎক্ষণিকভাবে সিজদা ওয়াজিব হওয়ার কথা তিনি অস্বীকার করেছেন।
অথবা এর অর্থ হল, জামাআতের সাথে সিজদা আমাদের উপর ফরয করা হয়নি। (درس ترمذي ج٢ ص٣٦١)

দ্বিতীয় আলোচনাঃ পবিত্র কুরআনে তিলাওয়াতের সিজদা কয়টি, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।
* ইমাম মালিক, হাসান বসরী, মুজাহিদ ও তাউস (রহ.)-এর মতে, তিলাওয়াতের সিজদা এগারটি। তাঁদের মতে, হানাফীদের যে প্রসিদ্ধ চারটি সিজদা আছে, সেখান থেকে মুফাসসালের তিনটি সিজদা নেই। [সূরা হুজুরাত থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত

সূরাগুলোকে মুফাসসিলাত বলা হয়। অতএব, সূরা নজম, ইনশিফাক ও আলাকে কোন সিজদা নেই।] (معارف السنن ج٥ ص٥٨)

দলীল (১)ঃ ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ فِيْ شَيْئٍ مِّنَ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ– (ابو داود ج١ ص١٩٩)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় আসার পর মুফাসসালের কোন আয়াত পাঠের পর সিজদা করেননি।

দলীল (২)ঃ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا–

(ইতিপূর্বে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।)
উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় যে, মুফাসসিলাতে কোন সিজদা নেই। ফলে তিলাওয়াতের সিজদা এগারটি।

* ইমাম আহমদ, ইসহাক, লাইছ ও ইবনুল মুনযির (রহ.)-এর মতে, পবিত্র কুরআনে তেলাওয়াতের সিজদা পনেরটি। তাঁদের মতে, হানাফীদের যে প্রসিদ্ধ ১৪টি সিজদা রয়েছে, তা ছাড়াও সূরা হজ্জে অতিরিক্ত আরেকটি সিজদা প্রমাণিত আছে।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ ... اِنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُ قَالَ قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سُوْرَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَّمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا– (ابو داود ج١ ص١٩٩ باب كم سجدة في القراٰن، ترمذي ج١ ص١٢٨ باب السجدة في الحج)

অর্থাৎ, ... উকবা ইবন আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলি যে, সূরা হজ্জের মধ্যে কি দুটি সিজদা আছে? তিনি (সাঃ) বলেন, হাঁ। যে এই দুটি সিজদা আদায় করে না সে যেন এই সূরা তিলাওয়াত না করে।

* ইমাম আবু হানিফা ও শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, পবিত্র কুরআনে তেলাওয়াতের সিজদা মোট চৌদ্দটি। কিন্তু ইহা নির্দিষ্টকরণের ক্ষেত্রে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, সূরা সোয়াদ (ص)-এ কোন সিজদা নেই। আর সূরা হজ্জে দুটি সিজদা রয়েছে। আর আহনাফের মতে, সূরা হজ্জে শুধু একটি সিজদা এবং সূরা সোয়াদ-এ একটি সিজদা রয়েছে। (بذل المجهود ج٢ ص٣١٤)

[ইমাম আবু হানিফার মাযহাব অনুযায়ী তেলাওয়াতের সিজদার সূরা ও আয়াত নং প্রদান করা হলঃ আরাফ- ২০৬, রাদ- ১৫, নহল- ৫০, বনী ইসরাঈল- ১০৯, মরিয়ম- ৫৮, হজ্জ- ১৮, ফুরকান- ৬০, নমল- ২৬, আলিফ-লাম সিজদাহ- ১৫, সোয়াদ- ২৫, হা-মীম আস্ সিজদাহ- ৩৮, নজম- ৬২, ইন্শিকাক- ২১, আলাক- ১৯]

ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, সূরা সোয়াদ-এ সিজদা না হওয়ার দলীল-

... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ ص مِنْ عَزَائِمِ السُّجُوْدِ الخ (ابو داود ج١ ص٢٠٠ باب السجود في ص، بخاري ج١ ص١٤٦ باب سجدة ص، ترمذي ج١ ص١٢٧ باب السجدة في ص)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা সোয়াদের মধ্যে যে সিজদাটি আছে তা আবশ্যিক নয়।

পক্ষান্তরে সূরা হজ্জে দুটি সিজদা হওয়ার ব্যাপারে দলীল হিসেবে ঐ দুটি হাদীস পেশ করা যায়, যা ইমাম আহমদ (রহ.) দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। (সূরা হজ্জের দুটি সিজদার মধ্যে একটি হল যা হানাফীদের মতানুযায়ী ১৮ নং আয়াত, আর দ্বিতীয়টি হল ৭৭ নং আয়াত।)

হানাফীদের দলীলঃ সূরা সোয়াদে সিজদাঃ

... عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ قَالَ قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ص فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ الخ (ابو داود ج١ ص٢٠٠)

অর্থাৎ, ... আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মিম্বরের উপর অবস্থানকালে সূরা সোয়াদ তিলাওয়াত করেন। তিনি সিজদার আয়াতে পৌঁছে মিম্বর হতে অবতরণ করে সিজদা আদায় করেন। ঐ সময় লোকেরাও তাঁর সাথে সিজদা আদায় করে।

দলীল (২)ঃ হযরত মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করি সূরা সোয়াদে কি সিজদা আছে? তিনি বলেন, হ্যাঁ।

(بخاري ج٢ ص٦٦٦ كتاب التفسير)

এ সমস্ত রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সূরা সোয়াদে সিজদা রয়েছে।

সূরা হজ্জে এক সিজদা হওয়ার ব্যাপারে আহনাফদের দলীলঃ

(১) হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর আছার-

قَالَ فِيْ سُجُوْدِ الْحَجِّ الاَوَّل عَزِيْمَة وَالاٰخِرِ تَعْلِيْم– (طحاوي ج١ ص١٧٧)

অর্থাৎ, তিনি বলেছেন, সূরা হজ্জের প্রথম সিজদা হল আযীমত তথা আবশ্যিক, আর দ্বিতীয়টি হল শিক্ষামূলক।

দলীল (২)ঃ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يَرٰى فِيْ سُوْرَةِ الْحَجِّ اِلاَّ سَجْدَةً وَاحِدَةً الاُوْلٰى–
(موطا محمد ص١٤٨)

অর্থাৎ, ইবন আব্বাস (রাঃ) সূরা হজ্জের শুধু প্রথম সিজদার মত পোষণ করতেন। উপরোল্লিখিত দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সূরা হজ্জে একটি সিজদা রয়েছে।

জবাবঃ আহনাফদের পক্ষ থেকে মালিকীদের প্রথম দলীলের জবাবঃ যদিও ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে সিজদা না করার কথা উল্লেখ রয়েছে, অথচ আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে-

... قَالَ سَجَدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ– (ابو داود ج١ ص١٩٩ باب السجود في اذا السماء الخ، مسلم ج١ ص٢١٥، ترمذي ج١ ص١٢٧ باب في السجدة اذا السماء انشقت، نسائي ج١ ص١٥٢ باب السجود في اذا السماء انشقت)

অর্থাৎ, ... তিনি বলেন, আমরা সূরা ইযাস-সামাউন শাক্কাত ও ইক্‌রা বিসমি রব্বিকাল্লাযী খালাকা পাঠের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সিজদা আদায় করেছি।

সূরা 'নজম'-এর ব্যাপারে ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েত-

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ ... (بخاري ج١ ص١٤٦، مسلم ج١ ص٢١٥، ترمذي ج١ ص١٢٧) [অর্থ ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে]

যাই হোক, ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা সিজদা না করার কথা বুঝা গেলেও আবু হুরায়রা (রাঃ) (মুসলিম শরীফে ইবন মাসউদ)-এর হাদীস দ্বারা সিজদা করার কথা স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। আর এক্ষেত্রে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীসই প্রাধান্য লাভ করা স্বাভাবিক। কেননা, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা ইবন আব্বাসের হাদীস রহিত হয়ে গেছে।

* অথবা, হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর এ ব্যাপারে জানা ছিল না, তাই তিনি স্বীয় এলেম অনুযায়ী 'না' বলে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ছিলেন এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শী।

* ইবন আব্বাসের সনদে ''মাতারুল ওয়াররাক'' নামক একজন রাবী রয়েছেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবন মুঈন এবং আবু হাতেমের মতে তিনি হলেন যঈফ রাবী। (بذل المجهود ج٢ ص٣١٦)

ইমাম মালিক (রহ.)-এর দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ (১) যায়েদ ইবন সাবিত (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা একেবারেই সিজদা না করার কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। হতে পারে কোন ওযরবশত তাৎক্ষণিকভাবে সিজদা আদায় করেননি, পরে আদায় করেছেন।

(২) অথবা, তখন ছিল মাকরূহ সময়। ফলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সিজদা আদায় করেননি। (تنظيم ج١ ص٣٦٥)

ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ লক্ষণীয় যে, তিনি সূরা হজ্জের যে আয়াতটি দ্বারা দ্বিতীয় সিজদা প্রমাণ করতে চান সে আয়াতটিতে রুকু এবং সিজদার হুকুম একই সাথে দেয়া হয়েছে। যেমন- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, তোমরা রুকু কর এবং সিজদা কর। (হজ্জঃ ৭৭)

অথচ পবিত্র কুরআনে যেখানে তেলাওয়াতের সিজদা রয়েছে, সেখানে শুধু সিজদা অথবা শুধু রুকুর কথা উল্লেখ রয়েছে। এবং যেখানে উভয়টি একত্রিত করা হয়েছে, সেখানে সিজদায়ে তেলাওয়াত নেই। যেমন-

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ–

অর্থাৎ, হে মারইয়াম! তোমার পালনকর্তার উপাসনা কর এবং রুকুকারীদের সাথে সিজদা ও রুকু কর। (আল-ইমরানঃ ৪৩)

উক্ত আয়াতে যেমন সিজদায়ে তিলাওয়াত নেই, তেমনিভাবে "সূরা হজ্জ"-এর ৭৭ নং আয়াতেও সিজদায়ে তিলাওয়াত নেই।

তবে এতটুকু বলা যায় যে, বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে যেহেতু সিজদার কথা পাওয়া যায়, তাই ফাতহুল মুলহিমের গ্রন্থকারসহ হানাফী মাযহাবের অভিজ্ঞ আলিমদের অভিমত হল, সতর্কতামূলক সিজদা করে নেয়াই ভাল। (فتح الملهم ج٢ ص١٦٧)

* হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন, যদি তিলাওয়াতকারী নামাযের বাইরে হয়, তাহলে তার হজ্জের দ্বিতীয় সিজদার আয়াতেও সিজদা করে নেয়া উচিত। যদি নামাযের মধ্যে হয়, তাহলে এই আয়াতে রুকু করে নেয়া উচিত এবং রুকুতেই সিজদার নিয়ত করে নেবে, যাতে এর আমল সকল ইমামের অনুযায়ী হয়ে যায়। (المعارف ج٥ ص٨٣)

* তাছাড়া তাঁর প্রদত্ত প্রথম দলীলের জবাবে আব্দুল হক ও ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ বলেন, হাদীসটি যঈফ। কেননা এতে হারিস ইবন সাঈদ এবং আব্দুল্লাহ ইবন মুনাইন দু'জন রাবী রয়েছেন যারা অজ্ঞাত। (تنظيم ج١ ص٣٦٥)

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ উকবা ইবন আমের (রাঃ)-এর সনদেও ইবন লাহীআহ এবং মুশাররিহ ইবন হাআন নামক যে দু'জন রাবী রয়েছে উভয়েই দুর্বল। তাই ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন, হাদীসটি তেমন শক্তিশালী নয়। (بذل المجهود ج٢ ص٣١٥)

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর দলীল হিসেবে প্রদত্ত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসের জবাব স্বয়ং ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে অন্য এক রেওয়ায়েতে সূরা সোয়াদে সিজদার প্রমাণ মিলে। (এজন্য ইমাম আবু হানিফার প্রদত্ত দলীল দ্রষ্টব্য) সুতরাং স্ববিরোধী রেওয়ায়েত দলীলযোগ্য নয়।

* আর সূরা হজ্জে তিনি যে দু'সিজদার দাবীদার এর জবাব তাই, যা আহমদ (রহ.)-এর অভিমতের জবাবে প্রদান করা হয়েছে।

بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْوِتْرِ ص٢٠٠ ঃ বিতিরের নামায সুন্নত

... عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ اَوْتِرُوْا فَاِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ– (ابو داود ج١ ص٢٠١، ترمذي ج١ ص١٠٣ باب ان الوتر ليس بحتم، نسائي ج١ ص٢٤٦ باب الامر بالوتر، ابن ماجة ص٨٣)

অনুবাদঃ ... আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, হে কুরআনের অনুসারীগণ! তোমরা বিতিরের নামায আদায় কর। কেননা আল্লাহ তাআলা বেজোড় (একক), কাজেই তিনি বেজোড় (বিতির)-কে ভালবাসেন।

বিশ্লেষণঃ বিতিরের নামায ওয়াজিব না সুন্নত- এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ও সাহেবাইনের মতে, বিতিরের নামায সুন্নত, ওয়াজিব নয়। (هداية ج١ ص١٤٤، تنظيم ج١ ص٤١٩)

দলীল (১)ঃ ... فَقَالَ عُبَادَةُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اِسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ الخ (ابو داود ج١ ص٢٠١)

অর্থাৎ, ... উবাদা ইবনুস সামিত (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন।

যে ব্যক্তি তা সঠিকভাবে আদায় করবে এবং অলসতাবশতঃ কিছুই পরিত্যাগ করবে না, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবার জন্য অঙ্গীকার করেছেন।

দলীল (২)ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত-

قَالَ سَأَلَ رَجُل رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَمْ اِفْتَرَضَ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى عِبَادِه مِنَ الصَّلٰوةِ؟ قَالَ اِفْتَرَضَ اللهُ عَلٰى عِبَادِه صَلَوَاتِ خَمْس، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ قَبْلَهُنَّ اَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْئًا؟ قَالَ اِفْتَرَضَ اللهُ عَلٰى عِبَادِه صَلَوَاتِ خَمْسٍ الخ (نسائي ج١ ص٨٠ باب كم فرضت في اليوم والليلة، بخاري ج١ ص٢٥٤ كتاب الصوم باب وجوب الصوم)

অর্থাৎ, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা বান্দাদের উপর কত ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর পূর্বে বা পরে কোন কিছু আছে কি? জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন।

অতএব, বিতির যদি ওয়াজিব হত, তাহলে নামাযের সংখ্যা হয়ে যেত ছয়।

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَلْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَاتِكُمُ الْمَكْتُوْبَةِ وَلٰكِنْ سَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ (ترمذي ج١ ص١٠٣، نسائي ج١ ص٢٤٦)

অর্থাৎ, ... আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বিতির তোমাদের ফরয নামাযের মত আবশ্যক নয়। তবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এটিকে সুন্নত সাব্যস্ত করেছেন। উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহে শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকেই ফরয হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং বিতির নামায সুন্নত।

আকলী দলীলঃ বিতির নামাযে না আযান আছে, না ইকামত আছে এবং না ইহা আদায়ের জন্য আলাদা কোন সময় আছে। আর এসব হচ্ছে সুন্নতের আলামত। তাই বিতিরের নামায সুন্নত।

* ইমাম আবু হানিফা, হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ.)-এর মতে, বিতিরের নামায ওয়াজিব, সুন্নত নয়। (هداية ج١ ص١٤٤، تنظيم ج١ ص٤٢٠)

দলীল (১)ঃ ... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَّمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَّمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَّمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا– (ابو داود ج١ ص٢٠١ باب فيمن لم يوتر)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ ইবন বুরায়দা (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, বিতিরের নামায একটি দায়িত্ব। যে ব্যক্তি এটা আদায় করবে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। এই উক্তিটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন।

সুন্নত ত্যাগকারীর উপর একাধিকবার এমন কঠোর বাণী উচ্চারণ করা হতো না। সুতরাং বিতিরের নামায ওয়াজিব, সুন্নত নয়।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ قَالَ اَبُو الْوَلِيْدِ الْعَدَوِيُّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ اللهَ تَعَالٰى قَدْ اَمَدَّكُمْ بِالصَّلٰوةِ هِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِّنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيْهَا بَيْنَ الْعِشَاءِ اِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ–

(ابو داود ج١ ص٢٠١، ترمذي ج١ ص١٠٣ باب فضل الوتر، ابن ماجة ص٨٣)

অর্থাৎ, ... খারিজা ইবন হুযাফা আল-আদাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এসে বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য লাল বর্ণের ঘোড়া (অতি মূল্যবান সম্পদ) অপেক্ষা উত্তম একটি নামায নির্ধারণ করেছেন এবং এটাই হল বিতির। এই নামাযের আদায়কাল হল এশার নামাযের পর হতে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত।

উক্ত হাদীসে লক্ষণীয় যে, বিতিরের নামাযকে আল্লাহ তাআলার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। আর আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ সাধারণত ফরযের ক্ষেত্রেই করা হয়ে থাকে। আর সুন্নতের সম্বন্ধ নবী করীম (সাঃ)-এর দিকে করা হয়ে থাকে। সুতরাং কিয়াসের চাহিদা ছিল তো এই যে, বিতিরের নামায ফরয হোক। কিন্তু খবরে ওয়াহেদের ভিত্তিতে আমরা (হানাফীগণ) বিতিরকে ফরয না বলে ওয়াজিব বলে থাকি।

দলীল (৩)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

উক্ত হাদীসে বিতির আদায়ের ক্ষেত্রে আমর (নির্দেশ)-এর ছীগা বর্ণিত হয়েছে। আর আমর ব্যবহৃত হয় ওয়াজিব বুঝানোর জন্য। সুতরাং বিতিরের নামায ওয়াজিব। (আইনী রহ. বলেন, যার একটি আয়াতও মুখস্থ আছে, সেও আহলে কুরআন। সুতরাং আহলে কুরআন বলতে শুধু হাফেজই নন)

দলীল (৪)ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَّامَ عَنْ وِتْرِهِ اَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ اِذَا ذَكَرَهُ–

(ابو داود ج۱ ص۲۰۳ باب في الدعاء بعد الوتر، ترمذي ج۱ ص۱۰٦ باب الرجل ينام عن الوتر او ينسى، ابن ماجة ص۸٤)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিদ্রা বা ভুলের কারণে বিতিরের নামায আদায় করেনি, সে যেন তা স্মরণ হওয়ার পরপরই আদায় করে নেয়।
উক্ত হাদীসে বিতিরের কাযা আদায় করার হুকুম দেয়া হয়েছে। আর কাযার হুকুম ওয়াজিবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সুন্নতের ক্ষেত্রে নয়। সুতরাং স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, বিতির ওয়াজিব- সুন্নত নয়।

জবাবঃ তিন ইমামের প্রদত্ত দলীলের জবাবে আহনাফগণ বলেন, তাঁদের প্রদত্ত দলীলসমূহ দ্বারা এতটুকু বুঝা যায় যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ব্যতীত আর কোন ফরয নামায নেই। আর বিতিরকে তো আমরাও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মত ফরয মনে করি না এবং এর অস্বীকারকারীকে কাফেরও বলি না। সুতরাং এর দ্বারা তো বিতির নামায ওয়াজিব না হওয়া প্রমাণিত হয় না।

* অথবা উক্ত হাদীসসমূহ বিতির ওয়াজিব হওয়ার পূর্বের হাদীস।

আকলী দলীলের জবাবঃ আযান-ইকামত শুধু فرض اعتقادي বা দৃঢ় বিশ্বাস সম্পন্ন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বিতির যেহেতু ওয়াজিব এবং এশার নামাযের অধীন, তাই এশার আযান-ইকামতই এর জন্য যথেষ্ট। সুতরাং এর দ্বারা বিতির ওয়াজিব না হওয়ার দলীল হতে পারে না। (تنظيم ج۱ ص۴۲۱، درس مشكوة ج۲ ص۱۱٤)
বাস্তবতা হল, এই এখতেলাফ কার্যত শুধু শব্দগত পার্থক্যের পর্যায়ে। এর উদ্দেশ্য হল, তিন ইমামের মতে সুন্নত এবং ফরযের মাঝে আদিষ্ট বিষয়ের কোন স্তর নেই। তাই তাঁরা এর জন্য সুন্নত শব্দ ব্যবহার করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে এ দুটির মাঝে ওয়াজিবের একটি স্তর রয়েছে। তাই তাঁরা এর জন্য ওয়াজিব শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিন ইমামও বিতিরকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত মনে করেন। আর হানাফীগণও এর ফরযিয়্যাতের প্রবক্তা নন। ফলে এতে অস্বীকারকারীকে তাঁরা কেউই কাফির বলার প্রবক্তা নন। অতএব, উভয়ের মাঝে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। (درس ترمذي ج۲ ص۲۱۱)

بَابُ كَمِ الْوِتْرُ ص٢٠١

বিতিরের নামাযের রাকাত সংখ্যা কত

... عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ فَقَالَ بِاِصْبَعَيْهِ هٰكَذَا مَثْنٰى مَثْنٰى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِّنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ– (مسلم ج١ ص٢٥٧ باب صلٰوة الليل وعدد ركعات النبي صلعم الخ، نسائي ج١ ص٢٤٨ باب كم الوتر)

অনুবাদঃ ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা এশারা করে বলেন, দুই, দুই এবং শেষ রাতে এক রাকাত বিতির। (অর্থাৎ দুই ও এক রাকাত, মোট তিন রাকাত বিতির)

বিশ্লেষণঃ বিতির নামায কয় রাকাত, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছেঃ
* ইমাম শাফেঈ, মালিক ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, বিতিরের নামায এক থেকে তের রাকাত পর্যন্ত পড়া জায়েয আছে। তবে তাঁদের সাধারণ নিয়ম হল এই যে, দুই সালামের দ্বারা তিন রাকাত পড়া। প্রথম দুই রাকাত এক সালামে এবং অবশিষ্ট এক রাকাত এক সালামের দ্বারা। উল্লেখ্য যে, একমাত্র ইমাম শাফেঈ (রহ.) বিতিরের নামায এক রাকাত হওয়ার উপর অধিক জোর দেন। তাঁর নিকট বিতির তাহাজ্জুদ নামাযের অধীনে। এছাড়া ইমাম মালিক ও আহমদ (রহ.) থেকে এক রাকাতের ব্যাপারে তেমন সমর্থন পাওয়া যায় না। (معارف السنن ج٤ ص٢٢٠)

দলীল (১)ঃ ... عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ اِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ الخ (ابو داود ج١ ص١٨٨ باب في صلٰوة الليل، بخاري ج١ ص١٥٤، مسلم ج١ ص٢٥٣ باب صلٰوة الليل الخ، ترمذي ج١ ص١٠٠ باب وصف صلاة النبي صلعم بالليل، نسائي ج١ ص٢٤٨ باب كيف الوتر بثلاث)

অর্থাৎ, ... নবী করীম (সাঃ)-এর স্ত্রী আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি (সাঃ) রাত্রিতে এক রাকাত বিতিরসহ মোট এগার রাকাত নামায আদায় করতেন।

দলীল (২)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوِتْرُ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّوْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ

يُّوْتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّوْتِرَ وَاحِدَةً فَلْيَفْعَلْ– (ابو داود ج١ ص٢٠١، نسائي ج١ ص١٤٩، ابن ماجة ص٨٤)

অর্থাৎ, ... আবু আইউব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, বিতিরের নামায প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। যে ব্যক্তি ইহা পাঁচ রাকাত আদায় করতে চায়, সে পাঁচ রাকাত আদায় করবে; যে ব্যক্তি তিন রাকাত আদায়ের ইচ্ছা করে, সে ঐরূপ করবে এবং যে ব্যক্তি এক রাকাত আদায় রকতে চায়, সে এক রাকাত আদায় করবে।

উক্ত হাদীস পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, হানাফীগণ যে আগের দুই রাকাতের সাথে এক রাকাত মিলিয়ে মোট তিন রাকাত বিতির আদায় করার কথা বলতেন, উক্ত হাদীসের ফলে এখন আর এই অবকাশ নেই। কারণ এই হাদীসে স্পষ্টভাবে পাঁচ, তিন ও এক রাকাত পড়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে।

দলীল (8)ঃ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ بَيْنَ الْوِتْرِ وَالشَّفْعِ بِتَسْلِمَةٍ وَيَسْمَعُنَاهَا– (اثار السنن ص١٥٨، طحاوي ج١ ص١٣٦)

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিতির ও জোড় দু'রাকাতের মাঝে সালাম দিয়ে ব্যবধান করতেন। আর এই সালাম আমাদেরকে শুনাতেন।

উক্ত হাদীসে দেখা যায় যে, দুই সালামে বিতির তিন রাকাত।

* ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী, হাসান বসরী ও ইবন মুবারক (রহ.)-এর মতে, বিতরের নামায দু বৈঠকে এক সালামের সাথে তিন রাকাত। ইহা তাহাজ্জুদের অধীনে নয়, বরং একটি স্বতন্ত্র নামায। আর এক রাকাত বিশিষ্ট কোন নামায নেই।

(تنظيم الاشتات ج١ ص٤٢١، درس ترمذي ج٢ ص٢١٦)

দলীল (৯)ঃ ... عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعَبٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلٰى وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَاللهِ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ– (ابو داود ج١ ص٢٠١ باب ما يقرأ في الوتر، ترمذي ج١ ص١٠٦ باب ما يقرأ في الوتر، نسائي ج١ ص٢٤٨، ابن ماجة ص٨٣)

অর্থাৎ, ... উবাই ইবন কাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিতিরের নামাযে সূরা সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আলা, কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন এবং সূরা ইখলাস পাঠ করতেন।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلاَ فِيْ غَيْرِهِ عَلٰى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُّصَلِّيْ اَرْبَعًا ... ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَلٰثًا– (ابو داود ج١ ص١٨٩ باب في صلٰوة الليل، بخاري ج١ ص١٥٤ باب قيام النبي صلعم الخ، مسلم ج١ ص٢٥٤، ترمذي ج١ ص٩٩، نسائي ج١ ص٢٤٨)

অর্থাৎ, ... আবু সালামা ইবন আব্দুর রহমান হতে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্ত্রী হযরত আয়িশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রমযান মাসে কিরূপে নামায আদায় করতেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রমযান মাস ও অন্যান্য সময়েও রাত্রিতে এগার রাকাত নামায আদায় করতেন। প্রথমে তিনি চার রাকাত আদায় করতেন ... এবং সবশেষে তিনি বিতিরের তিন রাকাত নামায আদায় করতেন।

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, শেষের তিন রাকাত বিতিরের নামায এক সালামে আদায় করেছেন।

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَيِّ شَيْئٍ كَانَ يُوْتِرُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ وَفِيْ الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللهُ اَحَد وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ– (ابو داود ج١ ص٢٠١، ترمذي ج١ ص١٠٦، ابن ماجة ص٨٣)

অর্থাৎ, ... আব্দুল আযীয ইবন জুরাইজ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিতিরের নামাযে কোন্ সূরা পড়তেন? উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ (অর্থাৎ, তিনি বলেন, তিনি সাঃ প্রথম রাকাতে সূরা সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা, দ্বিতীয় রাকাতে কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পাঠ করতেন।) রাবী বলেন, তিনি (সাঃ) তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস, নাস ও ফালাক পাঠ করতেন।

দলীল (৪)ঃ ... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِيْ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِكَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ قَالَتْ كَانَ يُوْتِرُ بِاَرْبَعٍ وَّثَلاَثٍ وَّسِتٍّ وَّثَلاَثٍ وَّثَمَانٍ وَّثَلاَثٍ وَّعَشْرٍ وَّثَلاَثٍ الخ (ابو داود ج١ ص١٩٣ باب في صلاة الليل)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ ইবন কায়েস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আয়িশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রাত্রিতে বিতিরসহ কত রাকাত নামায আদায় করতেন? তিনি বলেন, তিনি (সাঃ) চার রাকাত ও তিন রাকাত বিতির আদায় করতেন এবং কখনো ছয় রাকাত ও তিন রাকাত বিতির আদায় করতেন এবং কখনো আট রাকাত ও তিন রাকাত বিতির আদায় করতেন এবং (কোন কোনসময়) তিনি মোট তের রাকাত নামায আদায় করতেন।

এই হাদীস দ্বারা একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাহাজ্জুদের রাকাতের সংখ্যা পরিবর্তন হতো, কিন্তু বিতিরের তিন রাকাতের কোন ব্যতিক্রম হয়নি। বরং বিতির সর্বদাই তিন রাকাতেই নির্দিষ্ট আছে।

দলীল (৫)ঃ ইমাম আহমদ (রহ.) নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ دَخَلَ الْمَنْزِلَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهُمَا رَكْعَتَيْنِ اَطْوَلُ مِنْهُمَا ثُمَّ اَوْتَرَ بِثَلَاثٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ– (آثار السنن ص١٦٢)

অর্থাৎ, আয়িশা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন এশার নামায পড়তেন তখন ঘরে প্রবেশ করতেন। তারপর দু'রাকাত নামায পড়তেন। এরপর এর চেয়ে অনেক দীর্ঘ আরো দু'রাকাত আদায় করতেন। তারপর একত্রে ব্যবধান ব্যতীত তিন রাকাত বিতির পড়েছেন।

দলীল (৬)ঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন-

اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِيْ رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ– (نسائي ج١ ص٢٤٨ باب كيف الوتر بثلاث)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) বিতিরের দু'রাকাতে সালাম ফিরাতেন না।

দলীল (৭)ঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوِتْرُ ثَلَاث كَثَلَاثِ الْمَغْرِبِ– (مجمع الزوائد ج٢ ص٢٤٢)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, বিতির মাগরিবের ন্যায় তিন রাকাত।

ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন- **اَلْوِتْرُ كَصَلٰوةِ الْمَغْرِبِ**– (موطا امام محمد ص١٤٦)

অর্থাৎ, বিতির মাগরিবের নামাযের মত।

উক্ত হাদীসদ্বয়ের দ্বারা উদ্দেশ্য হল এই যে, বিতিরের তিন রাকাত নামাযকে মাগরিবের তিন রাকাত নামাযের ন্যায় এক সালামে আদায় করা হবে।

জবাবঃ প্রথম দুই দলীলের জবাবে আহনাফগণ বলেন যে, দুই রাকাতের সাথে আরো এক রাকাত মিলিয়ে মোট তিন রাকাত আদায় করে নিবে। এ উদ্দেশ্য নয় যে, পৃথকভাবে এক রাকাত পড়ে নিবে।

হানাফীদের অভিমতের সমর্থন এই কথার দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)ও উক্ত হাদীসের রাবী। (مسلم ج١ ص٢٥٧)

তিনি (রাঃ) বিতিরের নামায এক সালামে তিন রাকাত হওয়ার দাবিদার। কেননা, তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর রাতের নামায বর্ণনা করার পর বলেন-

ثم اوتر بثلاث (مسلم ج١ ص٢٦١)

সুতরাং হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) "الوتر ركعة من اخر الليل" দ্বারা এই কথাই বুঝেছেন, যা হানাফীগণ বর্ণনা করেছেন।

তাছাড়া শরীয়তে এক রাকাত বলতে কোন নামায নেই। (مؤطا محمد ص١٤٦)

বরং নবী করীম (সাঃ) এক রাকাত নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। ইবন আব্দুল বার্ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন-

اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْبُتَيْرَاءِ اَنْ يُّصَلِّيَ الرَّجُلُ رَكْعَةً وَاحِدَةً يُوْتِرُ بِهَا– (نصب الراية ج٢ ص١٢٠)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বুতায়রা থেকে নিষেধ করেন। আর বুতায়রা অর্থ হল, এক রাকাত বেজোড় নামায পড়া।

সুতরাং এক রাকাত বিতির নামায শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়।

তৃতীয় দলীলের জবাবঃ ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, উক্ত হাদীসটি রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (شرح معاني الاثار ج ١ ص١٤٢)

এবং তিন রাকাত বিতির নামাযের ইজমা হওয়ার ব্যাপারে হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন-

اَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى اَنَّ الْوِتْرَ ثَلاَث لاَ يُسَلِّمُ اِلاَّ فِيْ آخِرِهِنَّ– (مصنف ابن ابي شيبة ج٢ ص٢٩٤)

অর্থাৎ, মুসলমানরা একথার উপর একমত হয়েছেন যে, বিতিরের নামায তিন রাকাত এবং সালাম শুধু (একটিই) তৃতীয় রাকাতের শেষে।

এখানে "اجمع المسلمون" বলতে সাহাবায়ে কিরাম তথা আবুবকর, উমর, আলী, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ, ইবন আব্বাস, হুযায়ফা, আনাস, উবাই ইবন কাব, আয়িশা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী ও তাবিঈনদের বুঝানো হয়েছে।

তাছাড়া একথা তো সহজেই বোধগম্য যে, একই নামায কখনো পাঁচ রাকাত, কখনো সাত রাকাত, কখনো তিন রাকাত, আবার কখনো এক রাকাত হওয়া কিভাবে সম্ভব?

চতুর্থ দলীলের জবাবঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ)-এর আছারের ব্যাপারে মূল কথা হল, ইবন উমর (রাঃ) স্বয়ং নবী করীম (সাঃ)-কে এমনিভাবে নামায পড়তে দেখেননি এবং নবী করীম (সাঃ) থেকেও এই আমল শেখেননি। সুতরাং এটা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত ইজতিহাদ।
উক্ত হাদীসের প্রকৃত ঘটনা হল এই যে, নবী (সাঃ) যখন তাশাহুদের মধ্যে যে সালাম রয়েছে "السلام عليك ايها النبي" উচ্চারণ করলেন, এটাকে তিনি নামায ভঙ্গের সালাম মনে করেছেন।

* তিন রাকাত বিতিরে দু'রাকাতে সালাম দিয়ে মাঝখানে পৃথককরণের হাদীস বর্ণনাকারী শুধু হযরত ইবন উমর (রাঃ)। পক্ষান্তরে, ইবন মাসউদ, উবাই ইবন কাব, আনাস (রাঃ) সহ বিশিষ্ট সাহাবীগণ এক সালামে তিন রাকাত বিতির আদায়ের প্রবক্তা। সর্বোপরি নবী করীম (সাঃ) এভাবেই আদায় করতেন।
তাছাড়া পৃথক করে যদি নামায পড়া হয়, তাহলে শেষের নামায হচ্ছে এক রাকাত, যা হাদীসে বুতায়রার (এক রাকাত নিষেধাজ্ঞার) বিপরীত। সুতরাং উভয় হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দেয়ায় উসূলে হাদীসের ফায়সালা হল, হাদীসে বুতায়রা হচ্ছে বাচনিক। আর ইবন উমর (রাঃ)-এর হাদীস হচ্ছে ক্রিয়ামূলক। সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে ক্রিয়ামূলক হাদীসের উপর বাচনিক হাদীস প্রাধান্য লাভ করবে।
ইবন উমর (রাঃ)-এর হাদীস হচ্ছে হালাল সম্পর্কিত, আর হাদীসে বুতায়রা হচ্ছে হারাম সম্পর্কিত। আর যখন হালাল এবং হারামের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তখন হারাম সম্পর্কিত হাদীস প্রাধান্য লাভ করে। সুতরাং এ সমস্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ইবন উমরের রেওয়ায়েত দলীলযোগ্য নয়।
তাছাড়া বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, নবী করীম (সাঃ)-এর রাত্রের নামায এবং বিতিরের রেওয়ায়েতকারী সাহাবা অনেক। যাঁদের মধ্যে হযরত আয়িশা (রাঃ), উম্মে সালমা (রাঃ), হযরত ইবন উমর (রাঃ) এবং হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ অন্যতম। এখন দেখতে হবে যে, তাঁদের মধ্যে কার রেওয়ায়েত অধিক গ্রহণীয় এবং ফায়সালাযোগ্য।

সুতরাং যিনি সর্বদা সন্নিকটে থেকে নবী করীম (সাঃ)-এর নামায সচক্ষে দেখেছেন, তাঁর রেওয়ায়েতই অধিক গ্রহণযোগ্য হবে। এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, হযরত আয়িশা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর বিতির সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। কেননা, তিনি দীর্ঘ সময় নবী করীম (সাঃ)-এর সান্নিধ্যে ছিলেন। তাঁর জ্ঞান ও

মেধার পূর্ণতা, ইলমের প্রতি আগ্রহ ছিল ঈর্ষণীয়। বিতিরের সময় তিনিই নবী করীম (সাঃ)-কে ডেকে দিতেন। আর অন্য সাহাবীগণ ঘটনাচক্রে হয়ত দু'একবার নবী করীম (সাঃ)-এর বিতিরের নামায দেখেছেন। সুতরাং বিবেকের দাবি হল এই যে, হযরত আয়িশা (রাঃ) যে রেওয়ায়েত করেছেন, তাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর তা হল এক সালামে তিন রাকাত নামায আদায় করা। যা সাহাবায়ে কিরামের আমলও তাঁর রেওয়ায়েতকে শক্তিশালী করে। সুতরাং রেওয়ায়েত এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণিত হল, হানাফী মাযহাবই অধিক যুক্তিসঙ্গত। (درس مشكوة ج٢ ص١١٦–١١٧)

بَابُ الْقُنُوْتِ فِيْ الْوِتْرِ ص٢٠١

বিতিরের নামাযে দুআ কুনূত

... عَنْ اَبِيْ الْحَوْرَاءِ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ اَقُوْلُهُنَّ فِيْ الْوِتْرِ الخ (ترمذي ج١ ص١٠٦ باب القنوت في الوتر، نسائي ج١ ص٢٥٢ باب الدعاء في الوتر، ابن ماجة ص٨٤)

অনুবাদঃ ... আবুল হাওরা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত হাসান ইবন আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন, যা আমি বিতিরের নামাযে পাঠ করি।

বিশ্লেষণঃ উক্ত অনুচ্ছেদে দুআ কুনূতের ব্যাপারে দুইটি বিষয়ে আলোচনা করা হবে। (ক) বিতিরে দুআ কুনূত সারা বছরই পড়তে হবে নাকি রমযানের শেষ অর্ধেকে। (খ) দুআ কুনূত রুকুর আগে না পরে?

প্রথম আলোচনাঃ ইমাম শাফেঈ ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, দুআ কুনূত সারা বছর নয়, বরং শুধু রমযানের শেষ অর্ধেকে পড়া হবে। আর ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, শুধুমাত্র পুরা রমযানে পড়া হবে। (معارف السنن ج٤ ص٢٤٢)

দলীল (১)ঃ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِهِ اَنَّ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ اَمَّهُمْ يَعْنِيْ فِيْ رَمَضَانَ وَكَانَ يَقْنُتُ فِيْ النِّصْفِ الْاٰخِرِ مِنْ رَمَضَانَ– (ابو داود ج٢ ص٢٠٢)

অর্থাৎ, মুহাম্মদ (রহ.) থেকে তাঁর কোন কোন বন্ধুর সূত্রে বর্ণিত, উবাই ইবন কাব (রাঃ) রমযানে তাদের ইমামতি করতেন এবং শেষার্ধে দুআ কুনূত পাঠ করতেন।

দলীল (২)ঃ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ جَمَعَ النَّاسَ عَلٰى اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ... وَلاَ يَقْنُتُ بِهِمْ اِلاَّ فِيْ النِّصْفِ الْبَاقِيْ الخ (ابو داود ج١ ص٢٠٢)

অর্থাৎ, হাসান বসরী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) লোকদেরকে উবাই ইবন কাবের পিছনে তারাবীর নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে একত্রিত করেন। ... এবং তিনি রমযানের বাকী শেষ দশদিন বিতিরের নামাযে দুআ কুনূত পাঠ করতেন।

দলীল (৩)ঃ হযরত আলী (রাঃ)-এর আছার-

اِنَّهُ كَانَ لاَ يَقْنُتُ اِلاَّ فِيْ النِّصْفِ الاٰخِرِ مِنْ رَمَضَانَ– (ترمذي ج١ ص١٠٦)

অর্থাৎ, তিনি রমযানে শুধু শেষ অর্ধাংশেই কুনূত পড়তেন।

* ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী, ইবন মুবারক ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, বিতিরের কুনূত রমযানসহ সারা বছরই পড়তে হবে।

(معارف السنن ج٤ ص٢٤١، تنظيم ج١ ص٤٢٨)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।
উক্ত হাদীসে রমযান বা রমযানের অর্ধেক সময় পড়া হবে এমন কোন সময় নির্দিষ্ট করা হয়নি। সুতরাং বিতিরের কুনূত সারা বছরই পড়তে হবে।

দলীল (২)ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর আছার-

اِنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا فِيْ الْوِتْرِ وَاخْتَارَ الْقُنُوْتَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ– (ترمذي ج١ ص١٠٦، مجمع الزوائد ج٢ ص٢٤٤، مصنف ابن ابي شيبة ج٢ ص٣٠٦)

অর্থাৎ, তিনি সারা বছরই বিতিরে রুকুর পূর্বে দুআ কুনূত পড়তেন।

জবাবঃ আহনাফদের পক্ষ থেকে শাফেঈদের প্রথম ও তৃতীয় দলীলের জবাবঃ (১) হযরত উবাই ইবন কাব (রাঃ)-এর রমযানের কুনূত দ্বারা বিতিরের কুনূত উদ্দেশ্য নয় বরং কেরাত পাঠে দীর্ঘ কিয়াম বুঝানো উদ্দেশ্য। কেননা দীর্ঘ কিরাতকেও কুনূত বলা হয়। এমনিভাবে তৃতীয় দলীল হযরত আলী (রাঃ)-এর উত্তরও তাই। অর্থাৎ, তাঁরা রমযানের শেষার্ধে যতটুকু দীর্ঘ কিয়াম করতেন, সাধারণত অন্যান্য দিনে তা করতেন না।
তাছাড়া প্রথম হাদীসের সনদে বলা হয়েছে, হাদীসটি "তাঁর কোন কোন বন্ধুর সূত্রে" বর্ণিত। আর ইহা একটি অজ্ঞাত ব্যাপার। সুতরাং ইহা দলীলযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ উক্ত হাদীসটি মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন)। কেননা, হাদীসের সনদে হাসান দ্বারা হাসান বসরীকে বুঝানো হয়েছে। অথচ তাঁর সাথে উমর (রাঃ)-এর

সাক্ষাৎ ঘটেনি, কেননা হাসান বসরী (রহ.) হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের দুই বছর বাকি থাকতে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং দুই বছরের বাচ্চা কিভাবে হাদীস বর্ণনা করেন? সুতরাং এই হাদীসটি মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন)। আর মুনকাতি হাদীস দলীলযোগ্য নয়। (بذل المجهود ج٢ ص٣٢٩، تنظيم ج١ ص٤٢٨)

* যেখানেই কুনূতের কথা উল্লেখ রয়েছে সেখানেই كان يقنت শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

যা অব্যাহত চলমানের (استمرار) নির্দেশক। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, দুআ কুনূত নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন বা মাস হিসেবে পড়া হবে না। বরং সারা বছরই পড়তে হবে। তাছাড়া কিয়াসের চাহিদাও এই যে, দুআ কুনূত সারা বছরই পড়া হোক। কেননা বিতির যেহেতু সারা বছর, তাই দুআ কুনূতও সারা বছর হওয়াই উচিত।

(التعليق ج٢ ص١٠٢)

দ্বিতীয় আলোচনাঃ দুআ কুনূত রুকুর আগে না পরে- এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যথা-

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ও ইবন সীরীন (রহ.)-এর মতে, দুআ কুনূত পড়তে হবে রুকুর পরে।

দলীল (১)ঃ দারা কুতনীতে বর্ণিত। হযরত সুয়াইদ ইবন গাফলাহ বলেন-

سَمِعْتُ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا يَّقُوْلُوْنَ قَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ آخِرِ الْوِتْرِ– (تنظيم ج١ ص٤٢٧)

অর্থাৎ, আমি আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, নবী করীম (সাঃ) বিতিরের শেষের দিকে দুআ কুনূত পাঠ করেছেন।

দলীল (২)ঃ হযরত আলী (রাঃ)-এর আছার-

وَكَانَ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوْعِ– (ترمذي ج١ ص١٠٦)

অর্থাৎ, ... হযরত আলী (রাঃ) রুকুর পরে দুআ কুনূত পড়তেন।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, দুআ কুনূত রুকুর পূর্বে পড়তে হবে। ইমাম মালিক ও আহমদ (রহ.) থেকে অনুরূপ একটি অভিমত বর্ণিত আছে।

দলীল (১)ঃ উবাই ইবন কাব-এর হাদীস-

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ– (ابن ماجة ص٨٤)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) বিতিরে রুকুর পূর্বে দুআ কুনূত পড়তেন।

দলীল (২)ঃ মুসান্নাফ ইবন আবু শায়বাতে হযরত আলকামা থেকে বর্ণিত আছে-

اِنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ وَاَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوْا يَقْنُتُوْنَ فِيْ الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ– (اثار السنن ص١٦٨)

অর্থাৎ, ইবন মাসউদ (রাঃ) এবং নবী করীম (সাঃ)-এর অন্যান্য সাহাবীগণ বিতিরের রুকুর পূর্বে দুআ কুনূত পড়তেন।

জবাবঃ আহনাফগণ শাফেঈদের প্রদত্ত প্রথম দলীলের জবাবে হেদায়া প্রণেতার ভাষায় বলেন, বিতিরের শেষের দিক বলতে রুকুর পরে হওয়া বুঝানো আবশ্যক নয়। বরং এর দ্বারা তৃতীয় রাকাত বুঝানো উদ্দেশ্য। কেননা, কোন জিনিসের অর্ধেকের বেশি হলেই তাকে আখের বা শেষ বলা যাবে। অতএব, রুকুর পূর্বেও যদি কুনূত পড়া হয়, তবে একেও আখের বলা সহীহ হবে। আর হানাফীদের হাদীসে তাই বুঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ রুকুর পরে কুনূত পড়া ছিল হযরত আলী (রাঃ)-এর নিজস্ব ইজতিহাদ। তিনি নবী করীম (সাঃ)-কে শুধুমাত্র এক মাস কুনূতে নাযিলা (যা মুসলমানদের বিপদের সময় পড়া হয়) পড়তে দেখেছেন। আর এর উপরই তিনি (রাঃ) বিতিরের কুনূতকে কিয়াস করেছেন। যা হানাফীদের মারফূ হাদীসের মুকাবিলায় দলীলযোগ্য নয়। কুনূতে নাযিলাতে আমরাও (আহনাফগণ) রুকুর পরে কুনূত পড়ার প্রবক্তা। (درس ترمذي ج٢ ص٢٣٦–٢٣٧)

كِتَابُ الزَّكٰوةِ ঃ যাকাত অধ্যায়

بَابُ مَا تَجِبُ فِيْهِ الزَّكٰوةُ ص٢١٧

যে পরিমাণ মালে যাকাত ওয়াজিব হয়

... عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ– (بخاري ج١ ص١٩٦ باب ليس فيما دون خمسة الخ، مسلم ج١ ص٣١٥ كتاب الزكٰوة، ترمذي ج١ ص١٣٦ باب صدقة الزرع والثمر والحبوب، نسائي ج١ ص٣٤٤ القدر الذي تجب فيه الصدقة، ابن ماجة ص١٢٩)

অনুবাদঃ ... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, পাঁচটি উটের কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না, রূপার পরিমাণ দুই শত দিরহামের কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না এবং ভূমি হতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

যাকাতের আভিধানিক অর্থঃ زَكَاة শব্দটি تَزْكِيَة-এর ইসমে মাসদার। এর মূল ধাতু হল و – ك – ز যা বাবে نصر ينصر থেকে উদ্ভূত। আভিধানিক অর্থ হল- পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা।

* ''লিসানুল আরব'' গ্রন্থকারের মতে, যাকাত শব্দের অর্থ হল-

(১) اَلنَّمَاءُ - বৃদ্ধি পাওয়া, পরিমাণে বেশি হওয়া।

(২) اَلطَّهَارَةُ - পবিত্রতা। যেমন, পবিত্র কুরআনের আয়াত- قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا অর্থাৎ, যে নিজেকে শুদ্ধ (পবিত্র) করে, সেই সফলকাম হয়। (আশ-শাম্‌সঃ ৯)

(৩) اَلْبَرَكَةُ - বরকত, প্রাচুর্য।

(৪) اَلْمَدْحُ - গুণকীর্তন বা প্রশংসা।

* আবু আলী বলেন, যাকাতের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, খাঁটি, নিখুঁত বা নির্ভেজাল।

* কেউ কেউ বলেন, যাকাত শব্দের অর্থ হচ্ছে- اَلصَّدَقَةُ বা দান।

* কারো কারো নিকট এর অর্থ হচ্ছে- صَفْوَةُ الشَّيْئِ বা উত্তম বস্তু।

প্রকৃত অর্থে যাকাতের মাধ্যমে যেহেতু সম্পদ বৃদ্ধি, পবিত্রতা, বরকত ও খাঁটিত্ব লাভ করে, তাই যাকাতের এরূপ অর্থ করা হয়েছে।

যাকাতের পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

تَمْلِيْكُ جُزْءِ مَال عَيَّنَهُ الشَّارِعُ مِنْ مُسْلِمٍ فَقِيْرٍ غَيْرِ هَاشِمِي وَلَا مَوْلَاهُ مَعَ قَطْعِ الْمَنْفَعَةِ عَنِ الْمُمَلَّكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى– (تنوير الابصار ج٢ ص٢)

অর্থাৎ, শরীয়তের নির্ধারণ অনুযায়ী মালের এক নির্দিষ্ট পরিমাণ মুসলিম দরিদ্রকে নিঃস্বার্থভাবে প্রদান করা যাতে কোন উপকারের আশা না থাকে। গরীব লোকটি হাশেমী বা তাদের গোলাম হবে না।

* ইউসুফ আল কারযাভী বলেন-

اَلزَّكٰوةُ تُطْلَقُ عَلَى الْحِصَّةِ الْمُقَدَّرَةِ مِنَ الْمَالِ الَّتِيْ فَرَضَهَا اللّٰهُ لِلْمُسْتَحِقِّيْنَ–

অর্থাৎ, প্রকৃত অধিকারীকে শরীয়ত নির্ধারিত সম্পদ দেয়াকে যাকাত বলে।

* আল্লামা ইবনে কুদামা বলেন- اَلزَّكٰوةُ حَقٌّ يَجِبُ فِيْ الْمَالِ–

অর্থাৎ যাকাত এমন দায়িত্ব যা মালের উপর ওয়াজিব হয়।

* লুবাব গ্রন্থকার বলেন- تَمْلِيْكُ جُزْءٍ مَخْصُوْصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوْصٍ لِشَخْصٍ مَخْصُوْصٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى– (اللباب ج١ ص١٣٩)

অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্টকালের একটি নির্ধারিত অংশের মালিক বানিয়ে দেয়া।

* আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক তার সম্পদ থেকে নির্ধারিত কিছু অংশ গরীবদের মধ্যে দিয়ে দেওয়া, তবে তা হতে হবে হাশেমী পরিবার ব্যতীত।

মূল কথা হল, কোন সাহেবে নিসাব মুসলমান নিজ পরিবার-পরিজনের জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় ব্যয় মিটানোর পর বছরান্তে যদি ন্যূনতম পক্ষে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য কিংবা তার সমপরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকে, তবে উক্ত ধন-সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত আটটি খাতে প্রদান করাকে যাকাত বলে।

* যাকাত কখন কোথায় ফরয হয়ঃ যাকাত কখন, কোথায় ফরয হয়েছে তা নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যথা-

* ইবন খুযাইমা বলেন, اِنَّ فَرْضَ الزَّكَاةِ كَانَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ–

অর্থাৎ যাকাত হিজরতের পূর্বেই (মক্কায়) ফরয হয়েছিল।

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْا الزَّكٰوةَ

অর্থাৎ, তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও। (মুয্যাম্মিলঃ ২০)
আর সূরা মুয্যাম্মিল ইসলামের শুরুর দিকে মক্কায় অবতীর্ণ হয়।

দলীল (২)ঃ উম্মে সালামা (রাঃ) হতে সাহাবীদের আবিসিনীয়া হিজরতের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, হযরত জাফর ইবন আবু তালিব (রাঃ) কর্তৃক নাজ্জাশীর রাজদরবারে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেছেন-

وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ– অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) আমাদেরকে নামায ও যাকাতের আদেশ করেন।

* জমহুরগণের মতে, হিজরতের পরে মদীনাতেই যাকাত ফরয হয়েছিল। তবে কত হিজরীতে যাকাতের বিধান প্রযোজ্য হয় তা নিয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত প্রদান করেন। যেমন-
* কেউ কেউ ধারণা করেন, ১ম হিজরীতে যাকাত ফরয হয়।
* ইমাম নববী (রহ.) বলেন, হিজরী দ্বিতীয় সালে যাকাত ফরয হয়।
* আল্লামা ইবন আছীর (রহ.) বলেন, যাকাত নবম হিজরীতে ফরয হয়।

(فتح الباري ج٣ ص٢١١)

দলীলঃ নবী করীম (সাঃ) জনৈক সাহাবীকে যাকাত সংগ্রহে পাঠালে সালাবা যাকাত প্রদানে অস্বীকার করে। আর এ ঘটনা ঘটে নবম হিজরীতে। সুতরাং যাকাত নবম হিজরীতে ফরয হয়েছিল।
* হাফিয ইবন হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, নবম হিজরীর পূর্বে তথা পঞ্চম হিজরীরও পূর্বে যাকাত ফরয হয়।
দলীলঃ যিমাম ইবন সালাবা (রাঃ)-এর হাদীস-

اَنْشُدُكَ بِاللهِ آللهُ اَمَرَكَ اَنْ تَاْخُذَ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ اَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلٰى فُقَرَائِنَا–

(بخاري ج١ ص١٥ باب القراءة والعرض)

অর্থাৎ, আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমাদের ধনীদের নিকট থেকে এই সদকা উসূল করে আমাদের ফকীরদের মাঝে তা বন্টন করতে?
আর হযরত যিমাম ইবন সালাবা (রাঃ) মদীনা তায়্যিবায় এসেছিলেন পঞ্চম হিজরীতে। সুতরাং এতে বুঝা যায় যে, যাকাত আদায় করা এবং বন্টনের বিধান পঞ্চম হিজরীর পূর্বেই হয়েছিল।

* আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, বিশুদ্ধতম উক্তি হল-

إِنَّ الزَّكٰوةَ نَزَلَ بِمَكَّةَ مَقَادِيْرُ النُّصَبِ وَالْمَخْرَجُ لَمْ تُبَيَّنْ اِلاَّ بِالْمَدِيْنَةِ–

অর্থাৎ, যাকাত তো (হিজরতের পূর্বে) মক্কাতেই নাযিল (ফরয) হয়েছিল। তবে এর নিসাব ও বিস্তারিত নিয়ম-বিধি মদীনায় নাযিল হয়েছে। মূলতঃ যাকাত, রোযা, জুমআ এবং ঈদের নামায ইত্যাদি হিজরতের পূর্বে মক্কাতেই ফরয হয়েছিল। কিন্তু সেখানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণে এবং সাহাবীদের মন-মানসিকতা তখনো সেভাবে গড়ে না ওঠার কারণে এর বাস্তব কার্যকারিতা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। (معارف السنن ج٥ ص١٥٩، فتح الباري ج٣ ص٢١١)

যাকাত কার উপর ফরয?

যাকাতের বিধান সকলের উপর সমভাবে প্রযোজ্য নয়। বিশেষ কিছু শর্তাবলীর বিবেচনায় যাকাতের বিধান প্রযোজ্য হবে। যথাঃ

(১) মুসলমান হওয়া। কাফেরের উপর যাকাত ফরয নয়। কারণ, কাফের ইসলামের বিধি-বিধান পালনে বাধ্য নয়।

(২) স্বাধীন বা মুক্ত হওয়া। সুতরাং কোন পরাধীন গোলামের উপর যাকাতের বিধান প্রযোজ্য নয়।

(৩) বালেগ হওয়া। সুতরাং নাবালেগের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়।

(৪) জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। সুতরাং কোন অজ্ঞান, মাতাল বা পাগলের ক্ষেত্রে যাকাতের বিধান প্রযোজ্য নয়।

(৫) পূর্ণ নিসাবের মালিক হওয়া। যে পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে যাকাত ওয়াজিব হবে সে পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া। অর্থাৎ, যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের পর সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য অথবা তার সমপরিমাণ নগদ অর্থ বা সম্পদের মালিক হওয়া।

(৬) নিসাব এক বছর স্থায়ী হওয়া। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

... لَيْسَ فِيْ مَالٍ زَكٰوة حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ– (ابو داود ج١ ص٢٢١ باب في زكوة السائمة، ترمذي ج١ ص١٣٨ باب لا زكوة على المال الخ، ابن ماجة ص١٢٩)

অর্থাৎ, ... যে মালের উপর এক বছর পূর্ণ হয় না তার কোন যাকাত নেই।

(৭) ঋণগ্রস্ত না হওয়া। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয নয়।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাতঃ

স্বর্ণ ও রৌপ্যের নিসাবঃ ফিকহ শাস্ত্রবিদগণ একথার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কারো গৃহে যদি ২০ মিসকাল স্বর্ণ পুরোপুরি এক বৎসরকাল অতিবাহিত হয় তাহলে ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তাকে উক্ত সম্পদের ৪০ ভাগের ১ ভাগ হিসেবে আধা মিসকাল যাকাত দিতে হবে। ২০ মিসকাল যার বর্তমান হিসাব

অনুযায়ী ওজন হল সাড়ে সাত তোলা বা ৮৭.৪৫ গ্রাম স্বর্ণ। এবং এ ব্যাপারেও সবাই একমত যে, ২০০ দিরহাম অর্থাৎ সাড়ে ৫২ তোলা বা ৬১২.২৫ গ্রাম রূপা কারো গৃহে পূর্ণ এক বৎসরকাল থাকে, তাহলে তার উপর ৪০ ভাগের ১ ভাগ তথা ৫ দিরহাম বা এর সমপরিমাণ সম্পদ যাকাত দিতে হবে। এর কমে কারো মতে যাকাত ওয়াজিব নয়। (معارف السنن ج٥ ص١٧٠-١٧١)

দলীল (১)ঃ ... عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْئٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا نِصْفُ دِيْنَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذٰلِكَ الخ (ابو داود ج١ ص٢٢١ باب في زكٰوة السائمة)

অর্থাৎ, ... আলী (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, যদি তোমার নিকট এক বছরের জন্য দুইশত দিরহাম থাকে, তবে বৎসরান্তে এর জন্য পাঁচ দিরহাম যাকাত দিতে হবে। আর বিশ দীনারের কম পরিমাণ স্বর্ণে যাকাত ওয়াজিব নয়। অতঃপর যদি কোন ব্যক্তির নিকট বিশ দীনার পরিমাণ স্বর্ণ এক বছর পর্যন্ত থাকে তবে এর জন্য অর্ধ দীনার যাকাত দিতে হবে। আর যদি এর পরিমাণ আরো বেশি হয়, তবে উক্ত হিসাব অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে।
[উল্লেখ্য যে, এক দীনারের স্বর্ণমুদ্রার ওযন এক মিসকাল। সুতরাং বিশ দীনার সমান ২০ মিসকাল।]

দলীল (২)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। এছাড়াও এ ব্যাপারে অনেক মারফূ হাদীস রয়েছে।

* নিসাবের অতিরিক্ত স্বর্ণ ও রূপার যাকাতঃ কারো নিকট যদি ২০ মিসকালের অতিরিক্ত স্বর্ণ এবং ২০০ দিরহামের অতিরিক্ত রৌপ্য থাকে, তবে এর যাকাতের বিধান কি হবে- এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছেঃ
* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে, ২০ মিসকালের অতিরিক্ত যদি এক মিসকালও থাকে এবং ২০০ দিরহামের অতিরিক্ত এক দিরহামও থাকে, তাহলে সেই অতিরিক্ত প্রতি মিসকাল ও প্রতি দিরহামের জন্য হিসেব মতে ৪০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত প্রদান করতে হবে। (تنظيم الاشتات ج٢ ص١٨)

দলীলঃ ইতিপূর্বে উল্লিখিত হযরত আলী (রাঃ)-এর হাদীস- فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذٰلِكَ

উক্ত হাদীসে ما زاد শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। কম হোক অথবা বেশি হোক।

* ইমাম আবু হানিফা, হাসান বসরী, আতা, তাউস, যুহরী, আওযাঈ, শাবী (রহ.) প্রমুখের মতে, ২০ দিনারের পর যদি অতিরিক্ত ৪ দিনার হয়, তাহলে প্রতি ৪ দিনারের জন্য ১ দিরহাম যাকাত দিতে হবে। এমনিভাবে ২০০ দিরহামের অতিরিক্ত যদি ৪০ দিরহাম হয়, তাহলে প্রতি ৪০ দিরহামের জন্য ১ দিরহাম যাকাত দেয়া ওয়াজিব। মূল কথা হল, নিসাবের অতিরিক্ত প্রতি এক পঞ্চমাংশে ঐ হিসাবেই (২.৫%) যাকাত দেয়া ওয়াজিব। (تنظيم الاشتات ج٢ ص١٩)

দলীল (১)ঃ নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন- لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ اَرْبَعَةَ مَثَاقِيْل صَدَقَة

অর্থাৎ, কোন যাকাত হবে না চার মিসকালের কম স্বর্ণে।

দলীল (২)ঃ মাকহুল হতে বর্ণিত আছে-

لَيْسَ فِيْمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْئٌ حَتّى يَبْلُغَ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا (ابن ابي شيبة)

অর্থাৎ, দুই শতের উপরে আরো চল্লিশ দিরহাম পর্যন্ত না পৌঁছালে তার উপর যাকাত হবে না।

দলীল (৩)ঃ নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

فَمَا زَادَ عَلَى الْمِأَتَيْنِ فَفِيْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَم– (تنظيم ج٢ ص١٩)

অর্থাৎ, ২০০ দিরহামের উপর বেড়ে গেলে প্রতি ৪০ দিরহামের জন্য ১ দিরহাম পরিমাণ যাকাত প্রদান করতে হবে।

জবাবঃ (১) ইমাম মালিক ও শাফেঈ (রহ.)-এর প্রদত্ত হাদীসে আসেম ও হারেস দু'জন রাবী রয়েছেন, যারা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন।

(২) فما زاد দ্বারা নিঃশর্ত অতিরিক্ত নয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যদি নিসাব থেকে চল্লিশ দিরহাম বেশি হয়। (تنظيم الاشتات ج٢ ص١٩)

* প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কারও নিকট স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়টি থাকলে এবং এর কোন একটির পরিমাণ এককভাবে নিসাব পরিমাণ না হলে তখন যাকাত আদায় করতে হবে কিনা, এ নিয়ে সামান্য মতভেদ থাকলেও ইমাম আবু হানিফা, মালিক, আওযাঈ, সুফিয়ান সাওরী, সাহেবাইন (রহ.) প্রমুখের মতে, এমতাবস্থায় স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়টি মিলিয়েও যদি কোন একটির নিসাব পরিমাণ হয়, তবু তাকে যাকাত দিতে হবে। তাঁদের কথা হল, স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়ই একই জাতের ধাতু। আর উভয়টি মিলে নগদ অর্থে পরিণত হয়। সুতরাং বর্তমানে যেহেতু রৌপ্যের নিসাব ধরলে একজন সহজেই সাহেবে নিসাব হয়ে যায়, তাই সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা এর সমপরিমাণ টাকা (আনুমানিক আট/দশ হাজার) যদি কারো নিকট বছরের

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকে, যদিও মাঝে কম-বেশি হয়, তাহলে উক্ত টাকার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। মূল কথা হল, যে নিসাব (পরিমাণ) ধরলে গরীবদের বেশি উপকার হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কেননা, যাকাতের মূল উদ্দেশ্যই হল গরীবদের সহায়তা করা। (هداية ج١ ص١٩٠)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ যে সকল মালের উপর যাকাতের বিধান ওয়াজিব নয়ঃ
প্রত্যেক সাহেবে নিসাবের উপর যাকাতের বিধান ফরয করা হয়েছে। এ বিধানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে সম্পদ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল সম্পদের উপরই মানুষের জন্য যাকাতের বিধান আরোপ করেননি। এক্ষেত্রে যে সকল মালের উপর যাকাতের বিধান প্রযোজ্য নয়, তা নিম্নে আলোচনা করা হল-

১. আবাসিক গৃহঃ মানুষ বসবাসের জন্য এবং নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য যে গৃহ তৈরি করে তার উপর যাকাতের বিধান প্রযোজ্য নয়। তা যতই মূল্যবান হোক না কেন।

২. পরিধেয় পোশাকঃ যে সকল বস্ত্র মানুষ নিজের পরিধানের জন্য তৈরি বা ক্রয় করে, উহা যত মূল্যেরই হোক না কেন, আর যে পরিমাণই থাকুক না কেন, তার উপর যাকাত দিতে হবে না। যেমন- কোট, প্যান্ট, শাড়ি, শেরওয়ানী, মুকুট, চাদর, কম্বল, টুপি, জামা, জুতা ইত্যাদি।

৩. কৃষিপণ্যের যাকাতঃ কৃষিকাজে ব্যবহারযোগ্য সরঞ্জামাদির (যেমন- গরু, মহিষ, উট, লাঙ্গল, কোদাল, কুড়াল, কাঁচি ইত্যাদি) উপর যাকাতের বিধান প্রযোজ্য হবে না। কেননা, এগুলোর যাকাত ভূমিতে উৎপাদিত ফল ও ফসল হতেই উশর হিসেবে আদায় হয়ে যায়।

৪. ব্যবহৃত আসবাবপত্রঃ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারযোগ্য আসবাবপত্রের (যেমন- খাট, চেয়ার, টেবিল, আলনা, সোফা, সুকেস, আলমারী, সিন্দুক, ঘড়ি, কলম ইত্যাদি) উপর যাকাত ফরয নয়।

৫. শখের বস্তুঃ কেউ যদি শখ করে হাউজে বা পুকুরে মাছ পুষে অথবা শখের বশে মুরগী বা পাখি পুষে তাহলে তার উপর যাকাত দিতে হবে না।

৬. বাহন হিসেবে ব্যবহৃত পশুঃ যে সকল পশু বাহনের জন্য ব্যবহৃত হয়, (যেমন- গাধা, ঘোড়া, খচ্চর ইত্যাদি) এ সকল পশুর উপরে যাকাত দিতে হবে না।

৭. হাঁস-মুরগীঃ কেউ যদি হাঁস-মুরগী প্রতিপালন করে ডিম উৎপাদন এবং বিক্রির উদ্দেশ্যে, তাহলে তার উপর যাকাত নেই। তবে ফার্মের উৎপাদিত বিক্রি করা ডিম বা মুরগীর উপর অন্যান্য ব্যবসায়ী মালের মতই যাকাত দিতে হবে।

৮. স্ব-ব্যবহৃত বাহনঃ স্বীয় কাজে ব্যবহৃত যানবাহনের (যেমন- মোটর সাইকেল, কার, মাইক্রোবাস, টেক্সি ইত্যাদি) উপর যাকাত দিতে হবে না।

৯. উৎপাদন যন্ত্রঃ উৎপাদন যন্ত্র বলতে বুঝায়, কলকারখানায় ব্যবহৃত মেশিন, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। এগুলোর নিরাপত্তার জন্য যাবতীয় উপকরণের (যেমন- দালান-কোঠা, ঘর-বাড়ী ইত্যাদি) উপর যাকাত দিতে হবে না।

১০. দুগ্ধ খামারঃ দেশে প্রচলিত যে সকল দুগ্ধ খামারগুলো রয়েছে, সে সকল খামারের দুধ উৎপাদনকারী পশুগুলো উৎপাদনেরই উপকরণ মাত্র। তবে উৎপাদিত বস্তুর উপর অবশ্যই যাকাত দিতে হবে।

১১. দুষ্প্রাপ্য বস্তুঃ যদি কোন ব্যক্তি মহামূল্যবান দুষ্প্রাপ্য কোন বস্তু শখ ও আনন্দের বশে নিজের কাছে সংরক্ষণ করে তাহলে তার যাকাত দিতে হবে না। তবে যদি তা দিয়ে ব্যবসা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তার উপর যাকাত দিতে হবে।

১২. ব্যক্তিগত প্রয়োজনের গৃহপালিত পশুঃ কেউ যদি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যেমন- দুধ পানের জন্য গাভী এবং যানবাহনের কাজে ব্যবহার করার জন্য হাতী, ঘোড়া, উট প্রতিপালন করে তবে তার উপর যাকাত দিতে হবে না।

১৩. জিহাদের কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামঃ যে সকল সরঞ্জাম যুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য মজুদ রাখা হয় (যেমন- ঘোড়া, অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদি), যেগুলোর মাধ্যমে ইসলামের খিদমত লাভ সম্ভব, এ সকল বস্তুর উপর যাকাত দিতে হবে না।

ফিকাহবিদগণ বলেন, উপরোল্লিখিত সকল ক্ষেত্রে যাকাতের বিধান প্রযোজ্য হবে না, কেননা এ সকল সম্পদ নিত্য ব্যবহারযোগ্য। তাছাড়া এগুলো ক্রমবর্ধমান নয়। সুতরাং এদের উপর যাকাত নেই।

بَابُ الْعُرُوْضِ اِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ هَلْ فِيْهَا مِنْ زَكٰوةٍ ص٢١٨

বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাত

... عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا اَنْ نُّخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِيْ نُعِدُّ لِلْبَيْعِ–

অনুবাদঃ ... সামুরা ইবন জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে খরিদকৃত পণ্যের যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।

ব্যবসায়ী মালে যাকাতের বিধানঃ ব্যবসা সম্পদের সমারোহ ঘটায়। ব্যবসা এমন একটি মাধ্যম যার দ্বারা ব্যবসায়ীর নিকট বিভিন্ন সম্পদের সমারোহ ঘটে। কোন কোন সম্পদ হয়ত অল্পদিন স্থায়ী হয়, আবার কোন কোন সম্পদ বছরের পর বছর ব্যবসায়ীর ভাণ্ডারে জমা থাকে। ইসলামী শরীয়ত ব্যবসায়ীদের ঐ সকল সম্পদের

এবং সম্পদ বিক্রয়োত্তর মুনাফার উপর যাকাতের বিধান আরোপ করেছে। এ বিধান নগদ সম্পদের বিধানেরই অনুরূপ।

যাকাতের বিধানঃ ব্যবসা পরিচালনার উদ্দেশ্যে যে সকল পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে ইসলাম সেগুলোকে ব্যবসার পণ্য হিসেবেই গণ্য করে। কোন ব্যক্তি যদি ব্যবসায়ী পণ্যের মালিক হয়ে নিজের আয়ত্তে ঐ সকল সম্পদগুলো পূর্ণ এক বছর সঞ্চয় করে রাখে আর তা যদি বছরান্তে নগদ মূল্যে নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে ব্যবসায়ের এ সকল সম্পদের যাকাত প্রদান করতে হবে।

ব্যবসায়ী সম্পদে যাকাত ফরজ হওয়ার দলিলঃ ব্যবসায়ের সম্পদে যাকাত ফরয হওয়ার বিধান পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। নিম্নে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক দলিল উপস্থাপন করা হলো।

দলীল (১)ঃ যাকাতের বিধান জারি করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الاَرْضِ–

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের পবিত্র উপার্জন এবং ভূমি থেকে যা তোমাদের জন্য উৎপাদন করেছি তা থেকে খরচ কর।" (বাকারাঃ ২৬৭)

দলীল (২)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

অর্থাৎ, তাদের ধন-সম্পদে অধিকার রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের। (যারিয়াতঃ ১৯) এখানে সকল প্রকার সম্পদের উপরই যাকাত ফরয করা হয়েছে।

দলীল (৩)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

ইজমা দ্বারা দলীলঃ পবিত্র কুরআন ও সুন্নায় স্পষ্ট প্রমাণের পরও সাহাবী, তাবেঈ এবং পূর্ববর্তী বিশেষজ্ঞগণ একথার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, ব্যবসায়ের সম্পদের উপর যাকাতের বিধান প্রযোজ্য হবে।

ইবনুল মুনযির বলেন, ব্যবসা লব্ধ সকল সম্পদের এক বছর পূর্ণ হলে তার উপর যাকাতের বিধান ফরয। শরীয়তের সকল অভিজ্ঞজনেরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। ইবন আব্বাস, ইবন উমর, ফিকাহবিদ হাসান, জাবির ইবন যায়েদ, নাখঈ, আওযাঈ (রহ.) প্রমুখ একই মত পোষণ করেছেন। তাঁরা তাঁদের মতের স্বপক্ষে উল্লিখিত আয়াত এবং রাসূলের হাদীসকেই দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

ব্যবসায়ী মালে যাকাতের পদ্ধতিঃ কোন ব্যবসায়ী যে দিন থেকে তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করবে ঠিক সেই দিন থেকেই ব্যবসার যখন এক বছর পূর্ণ হবে তখন তার জমাকৃত অর্থাৎ মজুদ সম্পদের হিসাব বের করতে হবে, তারপর নগদ অর্থের ভিত্তিতে দেখতে হবে নিসাব পরিমাণ হয় কিনা। যদি নিসাব পূর্ণ হয় তাহলে যাকাত

দিতে হবে। আর যদি মজুদ সম্পদ এবং নগদ অর্থ উভয় মিলেও যাকাতের নিসাব পরিমাণ না হয়, কিন্তু পরবর্তীতে দাম বেড়ে গিয়ে নিসাবে উপনীত হয় তখন যে দিন দাম বেড়েছে সে দিন থেকেই যাকাতের পূর্ণ হিসাব করতে হবে।

অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রেঃ কোন ব্যবসায় যদি একাধিক অংশীদার থাকে তাহলে সম্মিলিতভাবে নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে প্রত্যেক অংশীদার তার অংশের উপর নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তাকে যাকাত প্রদান করতে হবে।

ব্যবসায়ী সম্পদের যাকাতের পরিমাণঃ কোন ব্যবসায়ী যখন নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবেন তখন তাঁকে ঐ সম্পদের উপর ২.৫% হিসেবে প্রতি ২০০ টাকায় ৫ টাকা যাকাত প্রদান করতে হবে।
উল্লেখ্য যে, স্বর্ণ, রৌপ্য এবং অন্যান্য পণ্য এ তিনটি মাধ্যমের সব কটিই যদি কোন ব্যবসায়ীর নিকট অবশিষ্ট থাকে অথচ এককভাবে কোনটাই যদি যাকাতের নিসাব পরিমাণ না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সব কটিরই সার্বিক মূল্য একত্রে হিসেব করে নিসাব পরিমাণ হলে তার যাকাত প্রদান করবে।

بَابُ الْكَنْزِ مَا هُوَ وَزَكٰوةُ الْحُلِيِّ ص٢١٨

গচ্ছিত ধনের এবং অলংকারের যাকাত

... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ اِمْرَأَةً اَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا اِبْنَةٌ لَّهَا وَفِيْ يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ غَلِيْظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا اَتُعْطِيْنَ زَكٰوةَ هٰذَا قَالَتْ لَا قَالَ اَيَسُرُّكِ اَنْ يُّسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَّارٍ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَاَلْقَتْهُمَا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ-- (ترمذي ج١ ص١٣٨ باب زكوة الحليّ، نسائي ج٣٤٣ زكوة الحلى)

অনুবাদঃ ... আমর ইবন শুআইব (রহ.) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, এক মহিলা তার কন্যাসহ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হন। তার কন্যার হাতে মোটা দুই গাছি সোনার কাকন ছিল। তিনি (সাঃ) তাকে বললেন, তোমরা কি এর যাকাত দাও? মহিলা বলেন, না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তুমি কি চাও যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা এর পরিবর্তে তোমাকে এক জোড়া আগুনের কাঁকন পরিধান করান? রাবী বলেন, একথা শুনে

মেয়েটি তার হাত থেকে তা খুলে নবী করীম (সাঃ)-এর সামনে রেখে দিয়ে বলল, এ দুটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য।

বিশ্লেষণঃ মহিলাদের ব্যবহৃত অলংকারের যাকাত প্রসঙ্গে।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। তবে স্বর্ণ-রৌপ্য দিয়ে অলংকার বানালে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কিনা- সে ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল, ইসহাক, আয়িশা, জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ) প্রমুখের মতে-

ব্যবহার্য অলংকারের মধ্যে কোন যাকাত নেই। (المغني ج٣ ص١١)

দলীল (১)ঃ হযরত জাবির (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

لَيْسَ فِيْ الْحُلِيِّ زَكٰوةً– (تنظيم الاشتات ج٢ ص٢٢) অর্থাৎ অলংকারে কোন যাকাত নেই।

দলীল (২)ঃ হযরত ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

لَيْسَ فِيْ الْحُلِيِّ زَكٰوةً– (تنظيم الاشتات ج٢ ص٢٢) অর্থাৎ, অলংকারে কোন যাকাত নেই।

কিয়াসী দলীলঃ পরিধেয় বস্ত্রে যাকাত নেই। অলংকারও অনেকটা পরিধেয় বস্তু। তাই অলংকারেও যাকাত ওয়াজিব হবে না।

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, সুফিয়ান সাওরী, আতা, মুজাহিদ, যুহরী, আওযাঈ (রহ.), উমর, ইবন মাসউদ, ইবন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখের মতে, সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য যে আকারেই থাকুক না কেন, তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। তা মুদ্রা, বিস্কিট, লকেট, চেইন, কঙ্কন, কাপড়ে খচিত সুতা অথবা অন্যান্যভাবে তৈরি অলংকার হোক না কেন।

(المغني ج٣ ص١١، تنظيم الاشتات ج٢ ص٢٢)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَلْبَسُ اَوْضَاحًا مِّنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَ كَنْزٌ هُوَ فَقَالَ مَا بَلَغَ اَنْ تُؤَدِّيْ زَكَاتَهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ (ابو داود ج١ ص٢١٨)

অর্থাৎ, উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করতাম। একদা আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এই সকল অলংকার "কান্‌য" (যমীনের অভ্যন্তরে প্রোথিত সম্পদকে 'কান্‌য' বলে) হিসেবে গণ্য হবে কি? তিনি (সাঃ) বলেন, যে মালের পরিমাণ যাকাতের সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছে, সেখান থেকে যাকাত দিতে হবে। তা (ভূগর্ভে) গচ্ছিত ধন নয়।

দলীল (৩)ঃ একদা রাসূল (সাঃ) হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর হাতে স্বর্ণের তৈরি বড় অঙ্গুরী পরিহিত দেখে জানতে চাইলেন এটা কি? এতে আয়িশা (রাঃ) উত্তরে বললেন-

... صَنَعْتُهُنَّ اَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَتُؤَدِّيْنَ زَكَاتَهُنَّ قُلْتُ لاَ اَوْ مَاشَآءَ اللّٰهُ

قَالَ هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ– (ابو داود ج١ ص٢١٨، دار قطني ج٢ ص١٠٥)

অর্থাৎ, ... ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উদ্দেশ্যে রূপচর্চা করার জন্য তা গড়িয়েছি। তিনি (সাঃ) জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি এর যাকাত পরিশোধ করে থাক? আমি বললাম, না অথবা আল্লাহ পাকের যা ইচ্ছা ছিল। তিনি (সাঃ) বলেন, তোমাকে দোযখে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।

দলীল (৪)ঃ ইমাম রাযী (রহ.) বলেন, অলংকারের মধ্যে যাকাত হওয়াটাই সঠিক। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ–

অর্থাৎ, আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে, এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না, তাদেরকে কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দিন। (তাওবাহঃ ৩৪)

উক্ত আয়াতে আমভাবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত প্রদানের কথা বলা হয়েছে। কোন ব্যতিক্রম করা হয়নি।

কিয়াসী দলীলঃ কিয়াসের চাহিদাও এই যে, অলংকারে যাকাত ওয়াজিব হবে। কেননা, এই অলংকার যদি পুরুষের নিকট থাকে, তাহলে সবার মতে যাকাত ওয়াজিব হবে। সুতরাং যখন মহিলার অধিকারে হবে, তখনও যাকাত ওয়াজিব হওয়া চাই।

জবাবঃ আহনাফগণের পক্ষ থেকে উল্লিখিত তিন ইমামের দলীলের জবাব-

১. কুরআনের আয়াতের বিপরীতে সাহাবাদের আছার গ্রহণযোগ্য নয়।

২. অলংকারে যাকাত ওয়াজিব প্রমাণকারী হাদীসটি মাশহুর। অন্য হাদীসগুলো (যেমন- জাবিরের হাদীস) খবরে ওয়াহিদ এবং যঈফ। সুতরাং মাশহুর হাদীস প্রাধান্য লাভ করবে।

৩. অথবা, হাদীসে উল্লিখিত حليٌ -এর অর্থ স্বর্ণ নয়; বরং মুক্তা। যেমন, পবিত্র কুরআনেও حليٌ দ্বারা মুক্তা বুঝানো হয়েছে। আর মণি-মুক্তার কোন যাকাত নেই।

৪. অলংকারের সাথে পরিধেয় বস্তুর তুলনা অযৌক্তিক। কারণ, পরিধেয় বস্ত্র বর্ধনশীল নয়, বরং aŸংসশীল। আর অলংকার বর্ধনশীল।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বর্ণালংকার বা রৌপ্যালংকারে যাকাত ওয়াজিব। তাই অলংকারে যাকাত দিতে হবে। (تنظيم ج٢ ص٢٢–٢٣)

بَابُ صَدَقَةِ الزَّرْعِ ص٢٢٥ ঃ কৃষিজ ফসলের যাকাত

... عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ مَا سَقَتِ السَّمَآءُ وَالاَنْهَارُ وَالْعُيُوْنُ اَوْكَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِيْ اَوِ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ– (بخاري ج١ ص٢٠١ باب العشر فيما يسقي الخ، مسلم ج١ ص٣١٦ فيما سقت الانهار والغيم العشور، ترمذي ج١ ص١٣٩ باب الصدقة فيما يسقى الخ، نسائي ج١ ص٣٤٤ باب ما يوجب العشر الخ، ابن ماجة ص١٣١ باب صدقة الزرع والثمار)

অনুবাদঃ ... সালিম ইবন আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ যে যমীন বৃষ্টি, নদী ও কূয়ার পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয় অথবা যেখানে পানি সেচের আদৌ কোন প্রয়োজন হয় না- এমন ক্ষেতের ফসলের যাকাত হল উশর বা উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ। আর যে যমীতে কৃত্রিম উপায়ে পানি সিঞ্চিত হয়, তার যাকাত হল নিস্ফে উশর অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ।

عُشْر (উশর)-এর আভিধানিক অর্থঃ

* عُشْر শব্দটি আরবী। এটি عَشْر শব্দ থেকে উৎকলিত। عَشْر অর্থ দশ। আর عُشْر শব্দের অর্থ এক দশমাংশ। ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের এক দশমাংশ। عُشْر-এর বহুবচন হল- عُشُوْر বা اَعْشَار।

উশর-এর পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

* المعجم الوسيط প্রণেতা বলেন- اَلْعُشْرُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ زَكٰوةِ الاَرْضِ الَّتِيْ اَسْلَمَ اَهْلُهَا عَلَيْهَا– অর্থাৎ, উশর হল যা ভূমির যাকাত হিসেবে আদায় করা হয়, যার অধিবাসী হল মুসলমান।

* সায়্যেদ মুহাম্মদ আলী বলেন, ভূমির ফসলের যাকাতকেই উশর বলা হয়।

* কেউ কেউ বলেন, উশর শব্দের অর্থ এক দশমাংশ। মুসলমানদের কর্ষিত জমির ফসলের এক দশমাংশ বা বিশ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ কর বা রাজস্ব গ্রহণ করাকে উশর বলা হয়।

* ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক বলেন- কৃষিজ উৎপাদনের উপর যে যাকাত দিতে হয় তাকে আইনের পরিভাষায় 'উশর' বলে। শব্দটির অর্থ 'এক দশমাংশ'।

মোটকথা, ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমানদের অধিকৃত ভূ-খণ্ডে প্রাকৃতিক জলসেচে উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ ভূমিকর আদায় করাকে উশর বলা হয়।

ভূমি হতে উৎপন্ন ফসলের কোন্ কোন্ শস্যে এবং কি পরিমাণ শস্যে উশর ওয়াজিব হবে, এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ইব্ন হাম্বল, আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, ভূমির উৎপন্ন ফসল ও ফল যদি কাঁচামাল না হয় অর্থাৎ খাদ্য জাতীয় শস্য হয় যা গুদামজাত করে রাখা যায় এবং সহজে নষ্ট না হয় (যেমন- চাল, ডাল, গম ইত্যাদি) এবং এর পরিমাণ যদি কমপক্ষে ৫ ওয়াসাক (প্রায় ২৭ মণ) হয়, বছরের অধিকাংশ সময় স্থায়ী থাকে, তবে বৃষ্টির পানির ক্ষেত্রে এক দশমাংশ এবং কৃত্রিম উপায়ে সেচ করা হলে বিশভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। আর যদি ৫ ওয়াসাক থেকে কম হয় বা অস্থায়ী ফসল হয় (যেমন ফল-মূল, শাক-সবজি) তবে তাতে যাকাত বা উশর দিতে হবে না।

(تنظيم الاشتات ج۲ ص۱۰، درس مشكوة ج۲ ص۱۷۰، درس ترمذي ج۲ ص۴۳۸)

দলীল (১)ঃ হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস-

... قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةً– (ابو داود ج۱ ص۲۱۷ باب تجب فيه الزكوة، بخاري ج۱ ص۲۰۱ باب ليس فيما دون خمسة الخ، ترمذي ج۱ ص۱۳۶ باب صدقة الزرع الخ، نسائي ج۱ ص۳۴۴، ابن ماجة)

অর্থাৎ, ... ভূমি হতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে সদকা ওয়াজিব হবে না।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ مُعَاذٍ اَنَّه كَتَبَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُه عَنِ الْخَضْرَاوَاتِ وَهِيَ الْبُقُوْلُ فَقَالَ لَيْسَ فِيْهَا شَيْئٌ– (ترمذي ج۱ ص۱۳۸ باب زكوة الخضروات)

অর্থাৎ, ... মুআয (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি সবজি সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করে পত্র লিখেছিলেন। এর উত্তরে তিনি ইরশাদ করেছিলেন যে, তাতে কোন কিছু ওয়াজিব নয়।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নির্দিষ্ট কিছু কৃষিজ ফসলের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের উপর যাকাত ওয়াজিব। ঢালাওভাবে সকল ফসলের উপর ওয়াজিব নয়।

* ইমাম আবু হানিফা, উমর বিন আব্দুল আযীয, মুজাহিদ, ইবরাহীম নাখঈ এবং ইমাম যুহরী (রহ.) প্রমুখ বলেন, ভূমির উৎপাদিত ফসল ও ফলের পরিমাণ কম

হোক বা বেশি হোক, বছরের অধিকাংশ সময় স্থায়ী হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় সকল ফসল ও ফলের উপর যাকাত বা উশর দিতে হবে।

(تنظيم ج٢ ص١٠، درس مشكوة ج٢ ص١٧٠، درس ترمذي ج٢ ص٤٣٨)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الاَرْضِ-

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্যে ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর। (বাকারাঃ ২৬৭)

দলীল (২)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- وَاٰتُوْا حَقَّه يَوْمَ حَصَادِه

অর্থাৎ, ... এবং ফসল কাটার সময় উহার হক আদায় কর। (আনআমঃ ১৪১)

উপরোল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে আমভাবে উশর দিতে বলা হয়েছে। এতে নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ এবং নির্দিষ্ট কোন পণ্যও নির্ধারণ করা হয়নি। অতএব, ভূমিতে উৎপাদিত সকল প্রকার পণ্যের উপর, কম হোক আর বেশি হোক, উশর ওয়াজিব হবে।

দলীল (৩)ঃ ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَآءُ وَالْعُيُوْنُ اَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بَالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ-

(بخاري ج١ ص٢٠١، مسلم ج١ ص٣١٦، ترمذي ج١ ص١٣٩)

অর্থাৎ, আসমান তথা বৃষ্টি এবং খালের পানি অথবা নিজে নিজে শিকড় দ্বারা পানি চুষে নেয়া গাছে এক দশমাংশ উশর। আর হাউজ থেকে কৃত্রিম উপায়ে যা সিঞ্চন করা হয় তাতে বিশ ভাগের এক ভাগ উশর।

দলীল (৪)ঃ নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

مَا اَخْرَجَتْهُ الاَرْضُ فَفِيْهِ الْعُشْرُ- (نصب الراية ج٢ ص٣٨٤)

অর্থাৎ, জমিন যা উৎপন্ন করে তাতে রয়েছে উশর।

এই দুটি রেওয়ায়েতে ما হরফটি ব্যাপক। যা সর্বপ্রকার উৎপন্ন ফসলকে অন্তর্ভুক্ত করে।

দলীল (৫)ঃ ইবরাহীম নাখঈ (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে-

فِيْ كُلِّ شَيْئٍ اَخْرَجَتِ الاَرْضُ زَكٰوةٌ حَتّٰى فِيْ عُشْرِ دَسْتَجَاتِ بَقَلٍ- (مصنف ابن ابي شيبة ج٣ ص١٣٩)

অর্থাৎ, জমিনে উৎপাদিত সবকিছুতেই যাকাত রয়েছে। এমনকি তরকারির দশমাংশেও।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, কম-বেশি সব উৎপন্ন ফসলেই শর্তহীনভাবে উশর দেয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে।

ইজমাভিত্তিক দলীলঃ সাহাবায়ে কিরামের যুগে যদিও এই মাসআলায় কিছুটা মতভেদ ছিল, কিন্তু হযরত উমর ইবন আব্দুল আযীয (রহ.)-এর যুগে এর উপর তাবীঈনদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেননা, তিনি তাঁর খিলাফতের যুগে সকল আমলাদের নিকট শাহী ফরমান প্রেরণ করেন যে-

... عَنِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَنْ يُّؤْخَذَ مِنْ مَا اَنْبَتَتِ الاَرْضُ مِنْ قَلِيْلٍ اَوْ كَثِيْرٍ الْعُشْرُ– (مصنف عبد الرزاق ج٤ ص١٢١)

অর্থাৎ, .. ইবন ফজল (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবন আব্দুল আযীয (রহ.) চিঠি লিখেছেন যে, জমিনের উৎপন্ন ফসল কম বা বেশি হোক তা থেকে যেন উশর নেয়া হয়।

জবাবঃ আহনাফদের পক্ষ থেকে প্রথম দলীলের জবাবঃ

(১) হাদীসে উল্লিখিত সদকা দ্বারা উশর বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাত বুঝানো উদ্দেশ্য। আর তৎকালে এক ওয়াসাক পণ্য সাধারণত এক উকিয়া তথা ৪০ দিরহামে বিক্রি করা হত। অতএব, পাঁচ ওয়াসাকের মূল্য হয় ৫x৪০=২০০ দিরহাম। আর চান্দি বা রৌপ্যের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য প্রয়োজন ৫ ওয়াসাক বা ২০০ দিরহাম। এর কমে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

(২) হাদীসে বর্ণিত সদকা দ্বারা যদিও উশর মেনে নেয়া হয়, তখন ৫ ওয়াসাকের কম হলে উশর দিতে হবে না- এর অর্থ হল, বায়তুল মালে না দেয়া। অর্থাৎ, এত কম মালের উশর বায়তুল মালে দেয়ার দরকার নেই। কেননা এতে বায়তুল মালেরই খরচ উঠবে না। বরং মালিক নিজেই গরীবদেরকে দিয়ে দিবে। (درس مشكوة ج٢ ص١٧١)

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ উক্ত হাদীসে শাক-সবজির উশর বায়তুল মালে না দেয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা শাক-সবজি হল কাঁচা মাল। আর যাকাত আদায়কারীর অপেক্ষা করার দরুণ মাল নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং এ সমস্ত মালের যাকাত মালিক নিজেই আদায় করে দিবে। যাকাত আদায়কারী কর্মচারীর জন্য অপেক্ষা করবে না।

* কিয়াসের দ্বারাও ইমাম আবু হানিফার মাযহাব অগ্রাধিকারযোগ্য।

(১) উশর কর বা খাজনার অনুরূপ। আর খাজনা সকল উৎপাদিত দ্রব্য থেকেই নেয়া হয়। তা কম হোক বা বেশি হোক, কাঁচা হোক বা পাকা হোক। সুতরাং উশরের ক্ষেত্রেও এমন হুকুমই হওয়া উচিত।

(২) তাছাড়া ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাযহাব অনুযায়ী আমল করলে গরীবদের অধিক উপকার হয়। আর এটি হল সতর্কতামূলক বিধান।

(درس ترمذي ج۲ ص٤٤١)

(৩) ইমাম তাহাবী ও জাস্সাস (রহ.) বলেন, এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, উশরের মালের ক্ষেত্রে حولان حول তথা বছরপূর্তি ধর্তব্য নয়। সুতরাং গচ্ছিত ও গনীমতের মালের ন্যায় নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকার প্রয়োজন নেই। (معارف السنن ج٥ ص٢٠٨)

আর এ সকল কারণেই আল্লামা ইবন আরাবী মালিকী অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও ‘শরহে তিরমিযী’ তে লেখেন যে, উক্ত মাসআলায় কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে স্পষ্টভাবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

আবু সাঈদ খুদরী (রহ.) ও ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ে দ্বন্দ্বের সমাধান বা ইবন উমর (রাঃ)-এর হাদীসটি প্রাধান্য লাভের কারণঃ

১. খুদরীর (রাঃ) হাদীসটি খাস। কারণ ঐ হাদীস নির্দিষ্ট কয়েক প্রকারের উৎপন্ন ফসলের কথা বলা হয়েছে। আর ইবন উমরের হাদীসটি আম। খাস হাদীসের উপর আম হাদীস অবশ্যই প্রাধান্য পাবে। সুতরাং ইবন উমরের হাদীসই আমলযোগ্য।

২. কুরআনের কয়েকটি আয়াতে ইবন উমরের হাদীসের ব্যাপকতাকে সমর্থন করা হয়েছে। তাই খুদরীর হাদীসের উপর ইবন উমরের হাদীস প্রাধান্য পাবে।

৩. দু’টি হাদীসের মাঝে বৈপরীত্য দেখা দিলে বুখারী ও মুসলিমের হাদীস প্রাধান্য পায়। ইবন উমরের হাদীসটি দু’জনেই বর্ণনা করেছেন।

৪. যাহ্হাক বলেন, খুদরীর হাদীসটি পূর্বের, আর ইবন উমরের হাদীস পরের। সুতরাং ইবন উমরের হাদীস নাসিখ ও খুদরীর হাদিস মানসূখ।

৫. সবচেয়ে সুন্দর সমাধান এই যে, খুদরীর হাদীসে ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাতের কথা বলা হয়েছে। ৫ ওসাক পরিমাণ শস্যের যে মূল্য তা ব্যবসায়িক দ্রব্যের নিসাবের সমান। জমিতে উৎপন্ন শস্যের উশর বর্ণনা করা হয়নি।

৬. আবু সাঈদ খুদরীর হাদীস খবরে ওয়াহিদ আর ইবন উমরের হাদীস মাশহুর। সুতরাং ইবন উমরের হাদীস প্রাধান্য পাবে।

৭. আইনী বলেন, আবু সাঈদ খুদরীর হাদীসে উশরের বর্ণনা দেয়া হয়নি। বরং যাকাতের কথা বলা হয়েছে। আর ইবন উমরের হাদীসে উশরের কথা বলা হয়েছে।

(تنظيم الاشتات ج۲ ص١٠-١١)

পরিশেষে বলা যায় হাদীস দুটির মাঝে কোন দ্বন্দ্ব নেই। বাহ্যিকভাবে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হলেও গভীর পর্যালোচনার পর তা দূরীভূত হয়। খুদরীর হাদীস যাকাতের সাথে সংশ্লিষ্ট আর ইবন উমরের হাদীস উশরের সাথে সংশ্লিষ্ট।

* উল্লেখ্য যে, কোন ফসল যদি কিছুটা কৃত্রিম সেচ এবং কিছুটা বৃষ্টি বা নদীর পানি দ্বারা উৎপন্ন হয় তবে অনুমান করে দেখতে হবে কোনটির পরিমাণ বেশি। যদি বৃষ্টি বা নদীর পানি দ্বারা উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে এক দশমাংশ উশর ওয়াজিব হবে। আর যদি সেচের পানি দ্বারা উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে বিশ ভাগের এক ভাগ উশর ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, ক্ষেতে পানি সেচ ও আগাছা পরিষ্কার করার জন্য শ্রম খাটানো হলে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করতে হবে।

بَابُ زَكٰوةِ الْعَسَلِ ص٢٢٦ ঃ মধুর যাকাত

... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ جَاءَ هِلاَل اَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشُوْرِ نَحْلٍ لَهُ وَكَانَ سَأَلَهُ اَنْ يُّحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَةَ فَحَمٰى لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ الْوَادِيَ فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَكَتَبَ عُمَرُ اِنْ اَدّٰى اِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّيْ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشُوْرِ نَحْلِه فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ وَاِلاَّ فَاِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَّشَاءُ– (نسائي ج١ ص٣٤٦ باب زكٰوة النحل)

অনুবাদঃ ... আমর ইবন শুআইব (রাঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী মুতআন গোত্রের সদস্য হিলাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট তাঁর মধুর উশর নিয়ে উপস্থিত হন। তিনি (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট সালাবাহ নামক উপত্যকাটি জায়গীর চান। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উক্ত উপত্যকা তাকে জায়গীর দেন। অতঃপর হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) যখন খলীফা নির্বাচিত হন, তখন সুফিয়ান ইবন ওয়াহব তাঁর সম্পর্কে জানতে চেয়ে একখানি পত্র লেখেন। এর জবাবে উমর (রাঃ) তাঁকে লেখে জানান, সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মধুর যে উশর দিত তা যদি তোমাকে দিতে থাকে তবে সালাবাহ উপত্যকায় তার জায়গীর বহাল রাখ। অন্যথায় তা বনের মৌমাছি হিসেবে গণ্য হবে এবং যেকোন ব্যক্তি তার মধু খেতে পারবে।

বিশ্লেষণঃ মধুতে উশর আছে কিনা এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যথা-

* ইমাম মালিক ও শাফেঈ, সুফিয়ান, সাওরী, আবু সাওর ও উমর ইবন আব্দুল আযীয (রহ.)-এর মতে, মধুর উপর কোন উশর নেই। (معالم للخطابي ج٢ ص٢٠٩)

দলীল (১)ঃ তাউস থেকে বর্ণিত-

اَنَّ مُعَاذًا لَمَّا اَتَى الْيَمَنَ اُتِيَ الْعَسَلُ وَاَوْقَاصُ الْغَنَمِ فَقَالَ لَمْ اُوْمَرْ فِيْهَا بِشَيْئٍ–

(مصنف ابن ابي شيبة ج٣ ص١٤٣)

অর্থাৎ, মুআয (রাঃ) যখন ইয়ামানে এলেন, তখন তার নিকট মধু ও ছাগলের অনেক পাল হাজির করা হল। তখন তিনি বললেন, আমাকে এ সম্পর্কে কিছুই নির্দেশ দেয়া হয়নি।

দলীল (২)ঃ হযরত নাফি বলেন-

سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ الْعَسَلِ اَ فِيْهِ صَدَقَةٌ؟ فَقُلْتُ لَيْسَ بِاَرْضِنَا عَسَلٌ– وَلٰكِنْ سَأَلْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ حَكِيْمٍ عَنْهُ فَقَالَ لَيْسَ فِيْهِ شَيْئٌ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ هُوَ عَدْلٌ مَامُوْنٌ صَدَّقَ– فَكَتَبَ اِلَى النَّاسِ اَنْ تُوْضَعَ يَعْنِي عَنْهُمْ– (مصنف عبد الرزاق ج٤ ص٦١، مصنف ابن ابي شيبة ج٣ ص١٤٢)

অর্থাৎ, উমর ইবন আব্দুল আযীয (রহ.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মধুতে কি যাকাত আছে? আমি বললাম, আমাদের এলাকায় তো মধু নেই। তবে আমি মুগীরা ইবন হাকীমকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। এতদশ্রবণে তিনি বলেন, তাতে কোন যাকাত নেই। উমর ইবন আব্দুল আযীয (রহ.) বললেন, তিনি নির্ভরযোগ্য, ত্রুটিমুক্ত ও সত্য কথা বলেছেন। অতঃপর তিনি এর সদকা বাদ দিয়ে দেয়ার জন্য মানুষের নিকট পত্র লিখেন।

কিয়াসী দলীলঃ মধু হচ্ছে দুধের মত তরল পদার্থ। যেহেতু দুধে যাকাত নেই, সেহেতু মধুর ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে।
উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ ও যুক্তির ভিত্তিতে বলা যায় যে, মধুর ক্ষেত্রে কোন উশর নেই।

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, আহমদ ইবন হাম্বল, ইসহাক, যুহরী এবং আওযাঈ (রহ.) প্রমুখের মতে, মধুর উপর উশর প্রদান করা ওয়াজিব।

(حاشية الكوكب الدري ج١ ص٢٣٦، تنظيم ج٢ ص٢١)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً–

অর্থাৎ, আপনি তাদের মাল থেকে যাকাত গ্রহণ করুন। (তাওবাঃ ১০৩)
সুতরাং, মধুও মালের মধ্যে শামিল বিধায় মধুরও যাকাত দিতে হবে।

দলীল (২)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (৩)ঃ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ اَخَذَ مِنَ الْعَسْلِ الْعُشْرَ– (ابن ماجة ص١٣٢)

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) মধু থেকে উশর আদায় করেছেন।

দলীল (৪)ঃ হযরত আবু সায়ারাহ মুতাঈ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত। তিনি বলেন-

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! اِنَّ لِيْ نَحْلاً قَالَ اَدِّ الْعُشْرَ– (ابن ماجة ص١٣٢)

অর্থাৎ, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মধুর বাসা আছে। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি উশর আদায় কর।

দলীল (৫)ঃ ... عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ الْعَسَلِ فِيْ كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ– (ترمذي ج١ ص١٣٧ باب في زكوة العسل)

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, মধুতে প্রতি দশ মশকে এক মশক।

দলীল (৬)ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত-

كَتَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى اَهْلِ الْيَمَنِ اَنْ يُّؤْخَذَ مِنْ اَهْلِ الْعَسْلِ الْعُشُوْرُ– (مصنف عبد الرزاق ج٤ ص٦٣)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইয়ামানবাসীর নিকট পত্র লিখেন, যাতে মধুওয়ালাদের নিকট থেকে উশর আদায় করা হয়।

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মধুর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব।

জবাবঃ হানাফীদের পক্ষ থেকে মালিকী ও শাফেঈদের দলীলের জবাব-

প্রথম দলীল অর্থাৎ لَمْ اومر فيها شيئ-এর জবাবে বলা হয়- (১) কোন বিষয়ে নির্দেশ না দিলে তা ওয়াজিব না হওয়া সুনিশ্চিত নয়। কেননা, অনেক হাদীস দ্বারা একথা সুস্পষ্ট প্রমাণিত যে, মধুর উশর রয়েছে।

(২) হানাফীদের প্রদত্ত দলীলের হাদীসসমূহ হাঁ-বোধক (مثبت), পক্ষান্তরে হযরত মুআয (রাঃ)-এর হাদীস না-বোধক (نفي)। আর পরস্পরবিরোধী (تعارض)-এর ক্ষেত্রে না-বোধক হাদীসের উপর হাঁ-বোধক হাদীস অগ্রাধিকার লাভ করবে।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ (১) উমর ইবন আব্দুল আযীয হলেন তাবেঈ। তাই মারফু হাদীসের মোকাবেলায় তাঁর উক্তি দলীলযোগ্য নয়।

(২) তাছাড়া আল্লামা ইবন কুদামা উমর ইবন আব্দুল আযীযের এ মাযহাব বর্ণনা করেন যে, তিনি মধু হতে উশর নেয়ার প্রবক্তা ছিলেন। (المغني ج٢ ص٧١٣)

কিয়াসী দলীলের জবাবঃ দুধ উৎপাদনের মূল উৎস হল গাভী। আর গাভীর উপর যাকাতের বিধান ফরয। কিন্তু মধুর যে মূল উৎস তার কোন যাকাত নেই। সুতরাং মধু দুধের ন্যায় তরল পদার্থ হলেও মধুর উপর যাকাতের বিধান প্রযোজ্য হতে কোন বাধা নেই।

بَابُ زَكٰوةِ الْفِطْرِ ص٢٢٧ : সদকাতুল ফিতর (ফিতরা)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِّلصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفْثِ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِيْنَ مَنْ اَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَهِيَ زَكٰوة مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ اَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ– (ابن ماجة ص١٣٢)

অনুবাদঃ ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সদকাতুল ফিতর- রোযাকে বেহুদা বা অশ্লীল কথাবার্তা ও আচরণ থেকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে এবং মিসকীনদের খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য ধার্য করেছেন। যে ব্যক্তি তা (ঈদুল ফিতরের) নামাযের পূর্বে দান করে তা কবুল হওয়া যাকাত হিসেবে গণ্য। আর যে ব্যক্তি তা নামাযের পরে পরিশোধ করে তা অন্যান্য সাধারণ দান-খয়রাতের অনুরূপ হিসেবে গণ্য।

بَابُ مَتٰى تُؤَدّٰى ص٢٢٧ : সদকাতুল ফিতর প্রদানের সময়

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكٰوةِ الْفِطْرِ اَنْ تُؤَدِّيَ قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيْهَا قَبْلَ ذٰلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ– (بخاري ج١ ص٢٠٤ باب فرض صدقة الفطر، مسلم ج١ ص٣١٨ باب زكٰوة الفطر، ترمذي ج١ ص١٤٦ باب تقديمها قبل الصلٰوة، نسائي ج١ ص٣٤٦ فرض زكٰوة رمضان الخ/٣٤٨)

অনুবাদঃ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে সদকাতুল ফিতর লোকদের ঈদের নামাযের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বে প্রদানের

নির্দেশ দিয়েছেন। নাফে (রহ.) বলেন, ইবন উমর (রাঃ) ঈদুল ফিতরের এক বা দুই দিন পূর্বে সদকাতুল ফিতর প্রদান করতেন।

بَابُ كَمْ يُؤَدّى فِيْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ص٢٢٧

কি পরিমাণ সদকাতুল ফিতর দিতে হবে

... عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ قَالَ فِيْهِ فِيْمَا قَرَأَهُ عَلٰى مَالِكٍ زَكٰوةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعٌ مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعٌ مِّنْ شَعِيْرٍ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ– (بخاري ج١ ص٢٠٤، مسلم ج١ ص٣١٧، ترمذي ج١ ص١٤٦ باب صدقة الفطر، نسائي ج١ ص٣٤٦، ابن ماجة ص١٣٢)

অনুবাদঃ ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সদকাতুল ফিতর নির্ধারিত করেছেন (আব্দুল্লাহ ইবন মাসলামা এই হাদীস সম্পর্কে বলেন, মালিক আমাদের নিকট এরূপে বর্ণনা করেছেন- রমযানের সদকাতুল ফিতর) এক সা খেজুর কিংবা এক সা বার্লি প্রত্যেক স্বাধীন, ক্রীতদাস এবং নর-নারী নির্বিশেষে সকল মুসলমানের জন্য বিধেয়।

বিশ্লেষণঃ যে সকল বিষয় নিম্নে আলোচনা করা হবে-

(১) সদকাতুল ফিতরের সংজ্ঞা
(২) সদকাতুল ফিতরের হুকুম
(৩) সদকাতুল ফিতর কার (কি পরিমাণ মালের) উপর ওয়াজিব?
(৪) সদকাতুল ফিতর কখন ওয়াজিব হবে?
(৫) সদকাতুল ফিতর আদায়ের সময়কাল।
(৬) সদকাতুল ফিতর কোন্ কোন্ ব্যক্তির পক্ষ থেকে দেয়া ওয়াজিব?
(৭) কি পরিমাণ সদকাতুল ফিতর দিতে হবে?

(১) সদকাতুল ফিতরের সংজ্ঞাঃ আভিধানিক অর্থঃ "صدقة الفطر" দুটি শব্দযোগে গঠিত হয়েছে। ইহা একটি সম্বন্ধ পদ। যাকে আরবীতে বলা হয় مركب اضافي যার শাব্দিক বিশ্লেষণ হল- صدقة শব্দটি مضاف (সম্বন্ধকৃত বিশেষ্য) আর الفطر শব্দটি مضاف اليه (যে পদের সাথে অন্য বিশেষ্যের সম্বন্ধ করা হয়েছে)।

সুতরাং আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে صدقة শব্দের অর্থ হল দান, কৃপা, অনুগ্রহ, দয়া, অনুকম্পা, সদকা, খয়রাত, যাকাত ইত্যাদি। এর বহুবচন صدقات আর الفطر শব্দের অর্থ হল- ইফতার করা, ভঙ্গ করা, বিরতি দেয়া, অবসান ঘটানো, খুলে ফেলা ইত্যাদি। সুতরাং صدقة الفطر-এর অর্থ হল রোযা অবসানের সদকা। যা সাধারণত রোযার ফিতরা হিসেবে পরিচিত।

صدقة الفطر-কে আরো বেশ কয়েকটি নামে অভিহিত করা হয়। যথা-

১. زكاة الفطر ২. زكاة رمضان

৩. زكاة الصوم ৪. صدقة الصوم

৫. صدقة رمضان ৬. صدقة الرؤس

৭. زكاة الابدان (درس ترمذي ج٢ ص٤٩٦)

পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

(১) ইসলামী আইন শাস্ত্রের ভাষায়-

هُوَ اَنْ يُّعْطِيَ الْمُسْلِمُوْنَ الاَغْنِيَاءُ قَبْلَ صَلاَةِ الْفِطْرِ قَدْرَ صَاعٍ اَوْ نِصْفِ صَاعٍ اِلَى الْفُقَرَاءِ

অর্থাৎ, মুসলিম ধনবান ব্যক্তিগণ ঈদুল ফিতরের নামাযের পূর্বে এক সা' বা অর্ধ সা' পরিমাণ যে খাদ্য গরীবদেরকে দান করে থাকে, তাকে সদকাতুল ফিতর বলা হয়।

(২) কতিপয় ফিকহ শাস্ত্রবিদ বলেন, ঈদুল ফিতরের দিন মালদার ব্যক্তির উপর তার নিজের ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান-সন্ততির পক্ষ থেকে যে সদকা আদায় করতে হয়, তাকে সদকাতুল ফিতর বলা হয়।

(৩) ওকীঈ ইবনুল জাররাহ বলেন, সদকায়ে ফিতর হল নামাযের মধ্যে সাহু সিজদার ন্যায়। রোযায় যদি কোন লোকসান বা ঘাটতি হয়, তাহলে এর ক্ষতিপূরণ হল- সদকাতুল ফিতর। (تنظيم ج٢ ص٢٤)

(৪) فَاِنَّهَا اِسْمٌ لِّمَا يُعْطَى مِنَ الْمَالِ بِطَرِيْقِ الصِّلَةِ تَرَحُّمًا مُقَدَّرًا بِخِلاَفِ الْهِبَةِ . فَاِنَّهَا تُعْطَى صِلَةً تَكَرُّمًا لاَ تَرَحُّمًا- (بداية ج٩ ص١٠٧)

অর্থাৎ, সদকাতুল ফিতর হল যে মাল সম্পর্ক বজায়ের পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্ট আকারে দয়াপূর্বক দান করা হয়। ইহা হেবার পরিপন্থী। কেননা, এটি দেয়া হয় সম্পর্ক বজায়ের উদ্দেশ্যে সম্মানার্থে। কৃপাবশত নয়।

২. সদকাতুল ফিতরের হুকুমঃ সদকাতুল ফিতরের হুকুম সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, সদকাতুল ফিতর আদায় করা ফরয। (আব্দুল হাই আল-লখনভী বলেন, ইমাম মালিকের অভিমতও তাই।)

(شرح مسلم ج١ ص٣١٧)

দলীল (১)ঃ ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِّلصِّيَامِ الخ

(زكوة الفطر অনুচ্ছেদে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।)

দলীল (২)ঃ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ ...

(كم يؤدي في صدقة الفطر অনুচ্ছেদে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।)

উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে যেহেতু فرض (ফরয) শব্দ উল্লেখ রয়েছে, সুতরাং ইহা ফরয হওয়ার দলীল।

* ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, সদকাতুল ফিতর আদায় করা সুন্নতে মুআক্কাদা। তিনিও ইবন উমর (রাঃ)-এর হাদীসটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে বলেন, হাদীসে فرض শব্দের অর্থ হচ্ছে قَدَّرَ অর্থাৎ রাসূল (সাঃ) সদকাতুল ফিতর নির্ধারণ করেছেন, কাজেই ইহা দ্বারা ফরয সাব্যস্ত হয় না; বরং ইহা সুন্নতে মুআক্কাদা।

(تنظيم الاشتات ج٢ ص٢٤)

* কেউ কেউ বলেন, সদকাতুল ফিতর আদায় করা পূর্বে ফরয ছিল। কিন্তু যাকাত ফরয হওয়ার কারণে ইহা রহিত হয়ে গেছে। তবে এ মতটি খুবই দুর্বল।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং সাহেবাঈনের মতে, সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। (عمدة القاري ج٩ ص١٠٨)

দলীল (১)ঃ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا فِيْ فِجَاجِ مَكَّةَ اَلَا اِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ اَوْ سِوَاهُ صَاعٌ مِّنْ طَعَامٍ– (ترمذي ج١ ص١٤٦ باب في صدقة الفطر)

অর্থাৎ, ... আমর ইবন শুআইবের দাদা থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) মক্কার গিরিপথে একজন ঘোষককে (এই ঘোষণা দিয়ে) পাঠালেন, সাবধান! সদকাতুল ফিতর প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব। চাই নর হোক বা নারী, স্বাধীন হোক বা দাস, ছোট হোক বা বড় হোক, দুই মুদ গম। অথবা এছাড়া অন্য কিছু হলে এক সা' খাবার।

দলীল (২)ঃ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمَرَ صَارِخًا بِبَطْنِ مَكَّةَ يُنَادِيْ اَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ– (تنظيم ج۲ ص٢٤)

অর্থাৎ, ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) মক্কার উপকণ্ঠে এক আহবানকারীকে এই বলে ঘোষণা দিতে নির্দেশ দেন যে, সদকাতুল ফিতর প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব।

দলীল (৩)ঃ ... عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكٰوتِ الْفِطْرِ اَنْ تُؤَدِّيَ الخ (مَتٰى تُؤَدِّي অনুচ্ছেদে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।)

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়, ফরয বা সুন্নত সাব্যস্ত হয় না।

জবাবঃ আহনাফদের পক্ষ থেকে তিন ইমামের প্রদত্ত দলীলের জবাব- ইমাম শাফেঈ এবং আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) খবরে ওয়াহিদ দ্বারা ফরয সাব্যস্ত করেছেন। অথচ, ফরয কেবল কুরআন ও মুতাওয়াতির হাদীসের দ্বারাই সাব্যস্ত হয়। খবরে ওয়াহিদ দ্বারা সাব্যস্ত হয় না।

আর ইমাম মালিক (রহ.) যে فَرَضَ এর অর্থ قَدَّرَ নিয়েছেন, তার জবাবে আহনাফগণ বলেন, (১) মালিক (রহ.) একে যতটুকু হালকা মনে করেছেন আসলে সদকাতুল ফিতর ততটুকু গুরুত্বহীন নয়। কারণ, নবী করীম (সাঃ) এ ব্যাপারে حق واجب শব্দ ব্যবহার করেছেন। (درس مشكوة ج۲ ص١٨٤)

(২) দাকীকুল ঈদ বলেন, যদিও فرض-এর আভিধানিক অর্থ تقدير (নির্ধারণ), কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় এটি ওয়াজিব অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এখানেও ওয়াজিবের অর্থ গ্রহণ করাই উত্তম।

অবশেষে আল্লামা ইবন হুমাম (রহ.) বলেন, প্রকৃতপক্ষে এতে মৌলিক কোন বিবাদ ও বিরোধ নেই। বরং শাব্দিক এখতেলাফ রয়েছে। কেননা শাফিঈ ও আহমদ (রহ.) সদকাতুল ফিতরকে এই পর্যায়ের ফরয বলেন না যে, এর অস্বীকারকারী কাফের।

আর ইহাকেই আহনাফগণ ওয়াজিব বলে থাকেন। মূল বিষয় হল এই যে, তিন ইমামের নিকট ফরয এবং সুন্নতের মধ্যবর্তী অন্য কোন স্তর নেই। যার ফলে তাঁরা ইহাকে ওয়াজিব না বলে সুন্নত বলেন। কিন্তু আহনাফদের মতে ফরয এবং সুন্নতের মধ্যবর্তী আরো একটি স্তর রয়েছে। আর তা হল ওয়াজিব। সুতরাং ইহা কেবল বিশ্লেষণমূলক পার্থক্য, মৌলিক কোন পার্থক্য নয়। (تنظيم الاشتات ج٢ ص٢٤)

৩. সদকাতুল ফিতর কার উপর ওয়াজিবঃ কি পরিমাণ মাল থাকলে ব্যক্তির উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।
* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব, যার নিকট নিজের এবং পরিবারের এক দিন, এক রাতের খাবার রয়েছে। সুতরাং ইহা ওয়াজিব হওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট কোন নিসাব নেই। (درس ترمذي ج٢ ص٤٩٧، تنظيم ج٢ ص٢٥، درس مشكوة ج٢ ص١٨٥)

দলীলঃ নিজেদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তাঁরা বলেন যে, সদকাতুল ফিতরের ক্ষেত্রে যতগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাতে কোথাও এর নিসাবের পরিমাণের কথা উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, এতে নিসাবের কোন প্রয়োজন নেই।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, সদকাতুল ফিতর প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব, যার নিকট নিজের প্রয়োজন থেকে অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদ হবে, অর্থাৎ সদকাতুল ফিতরের ঐ নিসাব, যা যাকাতের নিসাব, তবে এতটুকু পার্থক্য যে, এতে যাকাতের মত বর্ধনশীল মাল হওয়া এবং বৎসর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়।
(درس ترمذي ج٢ ص٤٩٧، تنظيم ج٢ ص٢٥، درس مشكوة ج٢ ص١٨٥)

দলীল (১)ঃ সদকাতুল ফিতরের ব্যাপার যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে, এর অধিকাংশ ক্ষেত্রে সদকাতুল ফিতরকে যাকাতুল ফিতরের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন- ইবন আব্বাস, ইবন উমর, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) প্রমুখের হাদীসেও 'যাকাতুল ফিতর' শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং ইহা দ্বারা একথারই ইঙ্গিত বহন করে যে, যাকাতের নিসাব যা, সদকাতুল ফিতরের নিসাবও তা।

দলীল (২)ঃ পবিত্র কুরআনুল কারীমেও সদকাতুল ফিতরকে যাকাত শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন-

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى– অর্থাৎ, নিশ্চয় সাফল্য লাভ করে সে, যে (সদকাতুল ফিতর আদায় করে) নিজেকে শুদ্ধ করে করে নিয়েছে এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে (ঈদের দিন তাকবীর পড়ে), অতঃপর (ঈদের) নামায আদায় করে। (আলাঃ ১৪-১৫)

হযরত ইবন উমর, আবু সাঈদ খুদরী এবং আমর ইবন আউফ (রাঃ) বলেন, উক্ত আয়াতটি সদকাতুল ফিতরের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে এবং সালাত দ্বারা ঈদের নামায এবং تزكّى দ্বারা "সদকাতুল ফিতর" আদায় করাকে বুঝানো হয়েছে।

(معارف السنن ج٥ ص٣٠١-٣٠٢)

عَنْ عَلِيٍّ "تَزَكّٰى" أَيْ تَصَدَّقَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ الخ (روح المعاني ج١٥ ص١٢٦)

অর্থাৎ, হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, تزكّى মানে সদকাতুল ফিতর আদায় করেছে।

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ اَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ... (مسلم ج١ ص٣٣٢ باب بيان اليد العليا خير الخ، نسائي ج١ ص٣٥١ الصدقة عن ظهر غنى)

অর্থাৎ, ... হাকীম ইবন হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, ধনী অবস্থায় যে দান করা হয়, তাই উত্তম সদকা অথবা বলেছেন উৎকৃষ্ট সদকা।

কিয়াসী দলীলঃ তাছাড়া এমন প্রত্যেক ব্যক্তির উপর যদি সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব করে দেয়া হয়, যে একদিন, এক রাতের খাবারের মালিক, তাহলে দেখা যাবে যে, যদিও ঐ ব্যক্তি সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার কারণে আজ সদকা আদায় করবে বটে, কিন্তু পরদিন সে নিজেই দরিদ্রতার কারণে অন্যের নিকট ভিক্ষা করতে বাধ্য হবে। যা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়। (نور الانوار ٥٤-٥٥ مبحث الأمر)

৪. সদকাতুল ফিতর কোন্ সময় হতে ওয়াজিব হবেঃ সদকাতুল ফিতর কোন্ সময় হতে ওয়াজিব হবে এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ এবং ইসহাক (রহ.)-এর মতে, সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময় হল রমযানের শেষ দিনের সূর্য অস্ত যাওয়ার পরপরই অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের রাত্র আগমনের সাথে সাথে। অতএব, ঈদুল ফিতরের রাত্রে কোন শিশু জন্মগ্রহণ করলে কিংবা কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে অথবা সামর্থ্যবান হলে তাদের উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে না। (درس مشكوٰة ج٢ ص١٨٥)

দলীলঃ যেহেতু এ সদকা "ফিতর" (রোযা ভঙ্গ বা ইফতার)-এর কারণে হয়ে থাকে, আর ইফতারের সময় হল সূর্যাস্ত। সুতরাং এই সময় থেকেই সদকা ওয়াজিব হওয়া উচিত।

* ইমাম মালিক (রহ.) এ ব্যাপারে দুটি মত পোষণ করেন। একটি হল, ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মত (যা এইমাত্র বর্ণিত হল)। অপরটি হল, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত। (যা নিম্নে উপস্থাপন করা হল)।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময় হল ঈদের দিন সকাল বেলা অর্থাৎ সুবেহ সাদিক উদিত হওয়ার পর। অতএব, সুবেহ সাদিকের পূর্বে যে লোক মৃত্যুবরণ করবে কিংবা সম্পদ বিলুপ্তির কারণে অসহায় হয়ে যাবে তার উপর সদকাতুল ফিতর আদায়ের হুকুম বর্তাবে না। পক্ষান্তরে, যে শিশু সুবেহ সাদিকের পূর্বে জন্মগ্রহণ করবে কিংবা কোন লোক মুসলমান হবে অথবা দারিদ্রতার অবসান ঘটিয়ে সামর্থ্যবান হবে, তার উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে। (درس مشكوة ج٢ ص١٨٥)

দলীলঃ ... عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكٰوةِ الْفِطْرِ اَنْ تُؤَدِّيَ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ الخ

(متى تؤدي অনুচ্ছেদে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।)

জবাবঃ আহনাফগণ শাফিঈদের জবাবে বলেন, রমযানে সূর্যাস্তের পরে যে "ফিতর" হয়, এটা তো একটি রীতিসিদ্ধ স্বাভাবিক নিয়ম, যা প্রতিদিনই হয়ে থাকে। অতএব, সূত্রমতে এরকম 'ফিতর' হওয়া উচিত যা স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত হয়। আর এটা হল ঈদের দিনের ফযরের ওয়াক্ত। সুতরাং এসময় থেকে সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়া উচিত।

(৫) সদকাতুল ফিতর আদায়ের সময়কালঃ চার ইমাম এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ঈদুল ফিতরের নামাযে যাওয়ার পূর্বে সদকাতুল ফিতর আদায় করা মুস্তাহাব। (عمدة القاري ج٩ ص١٠٨، معالم السنن ج٢ ص٢١٥)

অতঃপর সদকাতুল ফিতর ঈদুল ফিতরের দিনের আগে বা পরে আদায় সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ অভিমত হল, পুরো রমযানের যে কোন দিন সদকাতুল ফিতর প্রদান করলে তা আদায় হয়ে যাবে। তবে তাঁর মতে সদকাতুল ফিতর আদায়ের ক্ষেত্রে ঈদের দিন থেকে বিলম্ব করা ঠিক নয়। কারণ বিলম্ব করা হলে তা আদায় হিসেবে গণ্য না হয়ে কাযা (দায়িত্ব থেকে মুক্তি) হিসেবে গণ্য হবে। এর দ্বারা সওয়াবের আশা করা যাবে না। (المعارف ج٥ ص٣١٤، شرح المهذب ج٦ ص٣٢٨)

* ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) বলেন, ঈদুল ফিতরের এক বা দু'দিন পূর্বে সদকাতুল ফিতর আদায় করা জায়েয। এর পূর্বে আদায় করা জায়েয নয়। (المغني ج٣ ص٦٨) তবে কোন কোন হাম্বলী বলেছেন, মাসের অর্ধাংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর ঈদের আগে আদায় করা জায়েয আছে। উল্লেখ্য যে, ঈদুল ফিতরের পরে আদায় করলে তাঁদের সবার নিকটই তা কাযা হিসেবে গণ্য হবে।

* হাসান বিন যিয়াদ বলেন, সদকাতুল ফিতর আদায় করার নির্ধারিত সময় হচ্ছে একমাত্র ঈদুল ফিতরের দিন। সুতরাং ঐ দিন আদায় না করলে তা রহিত হয়ে যাবে। কেননা এটা ঐ দিনের সাথেই খাস। (تنظيم الاشتات ج٢ ص٢٥)

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, সদকাতুল ফিতর আদায়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন সময়সীমা নেই। তাঁর মতে, এক অথবা দু' বছর পূর্বেও তা আদায় করা জায়েয। (العيني ج٩ ص١٠٨)

তবে ঈদের নামাযের পূর্বে আদায় করা মুস্তাহাব। ঈদের দিন আদায় করতে না পারলে তা কাযা বা রহিত হবে না। সারা জীবনে যেকোন সময় আদায় করলে তা আদায় হিসেবেই গণ্য হবে। বিলম্বের জন্য যতটুকু গোনাহ হবে, আদায়ের দ্বারা তাও মাফ হয়ে যাবে। (تنظيم الاشتات ج٢ ص٢٥)

৬. সদকাতুল ফিতর কোন্ কোন্ ব্যক্তির পক্ষ থেকে দেয়া ওয়াজিবঃ

* স্বাধীন হওয়া। সুতরাং গোলামের উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব নয়।
* মুসলমান হওয়া। সুতরাং অমুসলিমের উপর তা ওয়াজিব নয়।
* সামর্থ্যবান তথা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া। অতএব, কেউ যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হয়, তাহলে তার উপর তা ওয়াজিব হবে না। তবে এই নিসাব পরিমাণ সম্পদ সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে অতিরিক্ত হওয়া চাই।

আর এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, প্রত্যেক স্বাধীন সামর্থ্যবান মুসলমান নিজের এবং স্বীয় নাবালেগ সন্তান ও মুসলমান চাকর-চাকরানী তথা পরিবারের সদস্যদের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে। উল্লেখ্য যে, স্ত্রীর পক্ষ থেকে তার স্বামী যদি সদকাতুল ফিতর প্রদান করে তাহলে স্ত্রীর ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে এবং কোন স্ত্রী যদি নিজেই সামর্থ্যবান হয় তাহলে শুধুমাত্র তার নিজের সদকাতুল ফিতর তার উপর ওয়াজিব। এক্ষেত্রে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা তার উপর ওয়াজিব নয়। আর এমন সামর্থ্যবান সন্তান যাদের পিতামাতা দরিদ্র বা অসহায় হয়ে যায়, এক্ষেত্রে পিতা-মাতার সদকাতুল ফিতর আদায় করা সন্তানের প্রতি কর্তব্য।

দাদাঃ পরিবারের প্রধান হচ্ছে পিতা। এক্ষেত্রে পিতা যদি দাদা থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে ঐ পরিবারের সদকাতুল ফিতর আদায় করার দায়িত্ব দাদার উপর বর্তাবে।

* কাফের গোলামের জন্য তার মালিককে সদকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে কিনা এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।
* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ ইবন হাম্বল, আবু সাওর, হাসান বসরী (রহ.)-এর মতে, কাফের দাস-দাসীর জন্য মুসলিম মালিকের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব নয়। (تنظيم الاشتات ج٢ ص٢٧)

দলীল (১)ঃ ... عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ ... مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ–

("كم يؤدي في صدقة الفطر" অনুচ্ছেদে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।)

উক্ত হাদীসে من المسلمين-এর শর্ত দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, অমুসলিম গোলামের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব নয়।

* ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী এবং ইসহাস (রহ.)-এর মতে, কাফের গোলামের জন্যও মুসলিম মালিকের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। আতা, মুজাহিদ, উমর ইবন আব্দুল আযীয, ইবরাহীম নাখঈ (রহ.)-এর অভিমতও তাই। (عمدة القاري ج٩ ص١١٠)

দলীল (১)ঃ নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

... لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ عَبْدِه صَدْقَةٌ اِلاَّ صَدْقَةَ الْفِطْرِ (فتح الباري ج٣ ص٢٩٣)

অর্থাৎ, মুসলমানের গোলামে সদকাতুল ফিতর ছাড়া অন্য কোন সদকা নেই।
উক্ত হাদীসে গোলাম শব্দটি সাধারণভাবে বলা হয়েছে।

দলীল (২)ঃ হাফেয ইবন হাজার (রহ.) ফাতহুল বারী কিতাবে ইব্‌ন মুনযির (রহ.)-এর সূত্রে হযরত ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন-

... اِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَخْرُجُ عَنْ اَهْلِ بَيْتِه حُرِّهِمْ وَعَبْدِهِمْ صَغِيْرِهِمْ وَكَبِيْرِهِمْ مُسْلِمِهِمْ وَكَافِرِهِمْ مِنَ الرَّقِيْقِ– (فتح الباري ج٣ ص٢٩٤)

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) তাঁর পরিবারের স্বাধীন, গোলাম, ছোট-বড়, মুসলমান ও কাফির গোলামের পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করতেন।

দলীল (৩)ঃ হযরত ইবন আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত-

يَخْرُجُ الرَّجُلُ زَكٰوةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَمْلُوْكٍ لَهُ وَاِنْ كَانَ يَهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا– (نصب الراية ج٢ ص٤١٤، زيلعي ج٢ ص٤١٤)

অর্থাৎ, ... ব্যক্তি তার মালিকানাধীন প্রত্যেকটি গোলামের পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করত। চাই সে গোলাম ইয়াহুদী হোক কিংবা খৃষ্টান।

সুতরাং উপরোল্লিখিত হাদীস ও আছারের দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, কাফির গোলামের জন্যও মুসলমান মালিকের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব।

জবাবঃ উল্লিখিত তিন ইমামের দলীলের জবাবে হানাফীগণ বলেন-

(১) ইবন উমর (রাঃ)-এর হাদীসে যে "من المسلمين" শব্দটি উল্লেখ রয়েছে, তা ইমাম মালিক (রহ)-এর সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদে পাওয়া যায় না, বরং শর্তহীনভাবে শুধুমাত্র গোলামের কথা উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং অধিকাংশ সনদে যা উল্লেখ রয়েছে তাই প্রাধান্য পাবে।

এ ব্যাপারে ইবন বাযবাযা (রহ.) তো বলে ফেলেছেন-

"اِنَّهَا زِيَادَةَ مضطربة بلا شك من جهة الاسناد والمعني"– (حاشية الكوكب الدري ج١ ص٢٤٤-٢٤٥)

অর্থাৎ, এটি সনদ ও অর্থগত দিক দিয়ে নিঃসন্দেহে ইযতিরাব (অসঙ্গতি) বিশিষ্ট অতিরিক্ত অংশ।

(২) লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, তিন ইমাম ইবন উমর (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা কাফির দাসের উপর সদকাতুল ফিতর ফরয না হওয়ার দলীল পেশ করেছেন। অথচ ইবন উমর (রাঃ) নিজেই কাফের দাসের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করতেন। (দেখুন, হানাফীদের প্রদত্ত দ্বিতীয় দলীল।) সুতরাং এমন মতানৈক্য হাদীস এক্ষেত্রে দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। (درس ترمذي ج٢ ص٥٠٥)

(৩) ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, যদিও একথা মেনে নেয়া হয় যে, "من المسلمين" শব্দটি প্রকৃতপক্ষেই সহীহ সনদে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, এর পরেও আমরা বলব যে, "من المسلمين" শব্দটি মূলত গোলামের সাথে সম্পৃক্ত সাব্যস্ত করে না, বরং এর দ্বারা একথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, "على من تجب الصدقة" তথা সদকা কার উপর ওয়াজিব। আর এ হিসেবেই "من المسلمين" শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ,

সদকাতুল ফিতর মুসলমানের উপর ওয়াজিব, কাফিরের উপর নয়। আর এজন্যই হযরত ইবন উমর (রাঃ) নিজের পক্ষ থেকে প্রত্যেক প্রকার গোলামের সদকাতুল ফিতর আদায় করতেন। সুতরাং এই ব্যাখ্যা মেনে নিলে হাদীসের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব থাকে না। কেননা, তিনি হাদীসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত ছিলেন।

(فتح الباري ج٣ ص٢٩٤)

৭. কি পরিমাণ সদকাতুল ফিতর দিতে হবেঃ সদকাতুল ফিতর আদায়ের পরিমাণ নিয়ে ইমামদের মাঝে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে।

ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, সদকাতুল ফিতরে গম দেয়া হোক কিংবা যব, খেজুর বা কিসমিস সবগুলোর ক্ষেত্রে মাথাপিছু এক সা ওয়াজিব।

(درس ترمذي ج٢ ص٤٩٨، تنظيم ج٢ ص٢٥)

দলীল (১)ঃ ... عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ اِذَا كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ حُرٍّ وَمَمْلُوْكٍ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ اَقِطٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ زَبِيْبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتّٰى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ اَنْ قَالَ اِنِّيْ اَرٰى اَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ فَاَخَذَ النَّاسُ بِذٰلِكَ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَاَمَّا اَنَا فَلاَ اَزَالُ اُخْرِجُهُ اَبَدًا مَا عِشْتُ— (ابو داود ج١ ص٢٢٨ باب كم يودي في صدقة الفطر، بخاري ج١ ص٢٠٤ باب صاع من زبيب، مسلم ج١ ص٣١٨ باب زكٰوة الفطر، ترمذي ج١ ص١٤٥–١٤٦ باب صدقة الفطر، نسائي ج١ ص٣٤٧ باب التمر في زكٰوة، ابن ماجة ص١٣٢)

অর্থাৎ, ... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের মাঝে (জীবিত) ছিলেন, তখন আমরা সদকায়ে ফিতর আদায় করতাম প্রত্যেক ছোট, বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাসের পক্ষ থেকে এক সা পরিমাণ খাদ্য (খাদ্যশস্য) বা এক সা পরিমাণ পনির বা এক সা বার্লি বা এক সা খোরমা বা এক সা পরিমাণ কিসমিস। আমরা এই হিসাবে সদকায়ে ফিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম, এবং অবশেষে মুআবিয়া (রাঃ) হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে আগমন করেন। অতঃপর তিনি মিম্বরে আরোহণপূর্বক ভাষণ দেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন,

সিরিয়া থেকে আগত 'দুই মুদ্দ'* গম এক সা' খেজুরের সমপরিমাণ। তখন লোকেরা তাই গ্রহণ করেন। কিন্তু আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি যতদিন জীবিত আছি, সদকায়ে ফিতর এক সা হিসেবেই প্রদান করতে থাকব।

উপরোল্লিখিত হাদীসের আলোকে উল্লিখিত তিন ইমাম বলেন যে, উক্ত হাদীসে صَاعًا مِنْ طَعَامٍ (এক সা খাদ্য) শব্দ রয়েছে। আর তাঁদের মতে হাদীসে طعام (খাদ্য) দ্বারা গম বুঝানো হয়েছে। সুতরাং গমের ক্ষেত্রেও সদকাতুল ফিতর এক সা দেয়া ওয়াজিব হবে। তাছাড়া উল্লিখিত ইমাম আরো বলেন যে, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) গমের ক্ষেত্রে অর্ধ সা আদায়ের হুকুম করলে হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) তা গ্রহণ করেননি। অতএব বুঝা গেল যে, গমের ক্ষেত্রে সদকাতুল ফিতর 'অর্ধ সা' দেয়া যাবে না।

দলীল (২)ঃ আবু ইসহাকের সনদে বর্ণিত আছে-

زَكَاةُ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ تَمَرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ حِنْطَةٍ– (درس ترمذي ج٢ ص٤٩٨، تنظيم ج٢ ص٢٥)

অর্থাৎ, সদকাতুল ফিতরের পরিমাণ হল এক সা খেজুর অথবা এক সা গম।

দলীল (৩)ঃ ইবন উমর (রাঃ) ইরশাদ করেন- ... صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ بُرٍّ–

অর্থাৎ, গমের ক্ষেত্রে সদকাতুল ফিতর হল এক সা। (تنظيم الاشتات ج٢ ص٢٥)

তাঁরা বলেন, উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে স্পষ্টভাবে গমের কথা উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং বুঝা যায় যে, গমের ক্ষেত্রেও এক সা সদকাতুল ফিতর দিতে হবে।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.), খোলাফায়ে রাশেদীন, ইবন মাসউদ, মুআবিয়া ও জাবির (রাঃ) প্রমুখের মতে, গম বা আটা অর্ধ সা আর অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে এক সা প্রদান করা ওয়াজিব।

দলীল (১)ঃ ... عَنْ عَبْدِ اللهِ ثَعْلَبَةَ اَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِيْ صُعَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعٌ مِّنْ بُرٍّ اَوْ قَمْحٍ عَلٰى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ... (ابو داود ج١ ص٢٢٨ باب من روى نصف صاع من قمح)

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবন সালাবা অথবা ছা'লাবা ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আবী সুআয়র (রহ.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, ছোট বা বড়, স্বাধীন বা ক্রীতদাস, নর বা নারী তোমাদের প্রতি দুজনের পক্ষ থেকে এক সা গম নির্ধারিত করা হল।

---

* দুই মুদ হল অর্ধ সা। সুতরাং পূর্ণ ১ সা হয় ৩.৬ ছটাক, আর অর্ধ সা হয় দেড় সের তিন ছটাক।

উক্ত হাদীসে গমের ক্ষেত্রে যেহেতু প্রতি দু'জনের জন্য এক সা' প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সুতরাং প্রত্যেকের উপর অর্ধ সা' প্রদান করাই ওয়াজিব।

দলীল (২)ঃ ... عَنِ الْحَسَنِ قَالَ خَطَبَ بْنُ عَبَّاسٍ فِيْ اٰخِرِ رَمَضَانَ عَلٰى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ ... فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ اَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ قَمْحٍ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ اَوْ مَمْلُوْكٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ الخ (ابو داود ج١ ص٢٢٩ باب من روى نصف صاع من قمح، نسائي ج١ ص٣٤٧ مكيلة زكوة الفطر)

অর্থাৎ, ... আল-হাসান (আল-বসরী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) রমযানের শেষভাগে বসরার (মসজিদের) মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন এবং বলেনঃ ... রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই সদকা এক সা' পরিমাণ খেজুর বা বার্লি অথবা অর্ধ সা পরিমাণ গম প্রত্যেক স্বাধীন-ক্রীতদাস, নর-নারী, ছোট-বড় সকলের উপর ধার্য করেছেন।

দলীল (৩)ঃ হযরত সালাবা ইবন আবু সুআয়র তার পিতা সূত্রে বর্ণিত মারফূ হাদীস-

اَدُّوْا زَكٰوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ وَصَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ بُرٍّ عَنْ كُلِّ اِنْسَانٍ– (شرح معاني الآثار ج١ ص٢٧٠)

অর্থাৎ, তোমরা সদকাতুল ফিতর আদায় কর জনপ্রতি এক সা খেজুর এবং এক সা যব অথবা অর্ধ সা গম।

দলীল (৪)ঃ হযরত আসমা বিনত আবু বকর (রাঃ)-এর হাদীসে রয়েছে-

... قَالَتْ كُنَّا نُؤَدِّيْ زَكٰوةَ الْفِطْرِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ– (طحاوي ج١ ص٢٦٩)

অর্থাৎ, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে দুই মুদ্দ গম সদকাতুল ফিতর আদায় করতাম।

দলীল (৫)ঃ ... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا فِيْ فِجَاجِ مَكَّةَ اَلَا اِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ ... مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ اَوْ سِوَاهُ صَاعٌ مِّنْ طَعَامٍ– (ترمذي ج١ ص١٤٦ باب في صدقة الفطر)

অর্থাৎ, ... আমর ইবন শুআইবের দাদা সূত্রে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) মক্কার গিরিপথে একজন ঘোষককে (এই ঘোষণা দিয়ে) পাঠালেন, সাবধান! সদকাতুল ফিতর প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব ... দুই মুদ গম। অথবা এছাড়া অন্য কিছু হলে এক সা খাবার।

উপরোল্লিখিত হাদীস সমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, গমের সদকাতুল ফিতর অর্ধ সা প্রদান করা ওয়াজিব।

জবাবঃ উল্লিখিত তিন ইমাম হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন, এর জবাবে হানাফীগণ বলেন, হাদীসে উল্লিখিত **طعام** দ্বারা গম বুঝানো উদ্দেশ্য নয়, বরং এর দ্বারা খাদ্য জাতীয় প্রত্যেক বস্তুকে বুঝানো হয়েছে।

আল্লামা যুরকানী (রহ.) শরহে মুয়াত্তায় বলেন, **طعام** দ্বারা ভুট্টা, বাজরা শস্য বুঝানো উদ্দেশ্য। কেননা নবী করীম (সাঃ)-এর সময় গমের প্রচলন ছিল না। যেমন, হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ইবন খুযায়মা সূত্রে হযরত ইবন উমর (রাঃ)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন-

قَالَ لَمْ تَكُنِ الصَّدْقَةُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ التَّمْرُ وَالزَّبِيْبُ وَالْعَشِيْرُ وَلَمْ تَكُنِ الْحِنْطَةُ– (فتح الباري ج٣ ص٢٩٦)

অর্থাৎ, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে সদকা শুধু খেজুর, কিসমিস ও যব ছিল। গম ছিল না।

অতএব, **طعام** দ্বারা গম বুঝানো প্রচলন তখন থেকে শুরু হয়েছে, যখন থেকে নবী করীম (সাঃ)-এর পরে গমের ব্যবহার অধিক হারে বেড়েছে। তৎকালে খাদ্য জাতীয় প্রত্যেক বস্তুকেই **طعام** বলা হত। যেমন, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) নিজেই বলেন-

كَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيْرُ وَالزَّبِيْبُ وَالْاَقِطُ وَالتَّمْرُ– (بخاري ج١ ص٢٠٤–٢٠٥ باب الصدقة قبل العيد)

অর্থাৎ, আমাদের খাদ্য ছিল যব, কিসমিস, পনির ও খেজুর।

সুতরাং বুঝা গেল, **طعام** দ্বারা গম বুঝানো উদ্দেশ্য নয়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর উক্তি- "আমি যত দিন জীবিত আছি, সদকায়ে ফিতর এক সা হিসেবেই প্রদান করতে থাকব"-এর জবাবঃ

(১) এ বাক্যের উদ্দেশ্য এই নয় যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) প্রথম থেকেই গমের ফিতরা এক সা হিসেবে আদায় করতেন, বরং উদ্দেশ্য হল- প্রথম থেকেই

তিনি সদকাতুল ফিতর গমের দ্বারা আদায় না করে অন্যান্য শস্য দ্বারা এক সা করে আদায় করতেন। আর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) মদীনায় আসার পরেও খুদরী (রাঃ) নিজের আমলের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটাননি। যদিও অন্যান্য লোকেরা হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর হুকুমের উপর আমল করতে গিয়ে অন্যান্য শস্যের পরিবর্তে অর্ধ সা গমের দ্বারা ফিতরা আদায় করতেন। কিন্তু খুদরী (রাঃ) গমের পরিবর্তে সর্বদা অন্যান্য শস্যের দ্বারা এক সা' আদায় করতেন। এমন নয় যে, খুদরী (রাঃ) গমের সদকাতুল ফিতর যে অর্ধ সা' তা জানতেন না বা মেনে নেননি। (درس ترمذي ج٢ ص٥٠١)
নিম্নোক্ত হাদীসটি দ্বারা এ দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটে-
হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর রেওয়ায়েত-

اِنَّ مَرْوَانَ بَعَثَ إِلَى اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنْ إِبْعَثْ إِلَيَّ بِزَكَاةِ رَقِيْقِكَ، فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ لِلرَّسُوْلِ اِنَّ مَرْوَانَ لاَ يَعْلَمُ اِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُعْطِيَ لِكُلِّ رَأْسٍ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ صَاعًا مِّنْ تَمَرٍ اَوْ نِصْفِ صَاعٍ مِّنْ بُرٍّ– (طحاوي ج١ ص٢٦٩)

অর্থাৎ, মারওয়ান আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর কাছে লোক পাঠিয়ে বললেন, আপনি আপনার গোলামের যাকাত আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। তখন আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বার্তাবাহককে বললেন যে, মারওয়ান জানেন না, আমাদের উপর দায়িত্ব হল, প্রত্যেকের মাথাপিছু এক সা খেজুর অথবা অর্ধ সা গম।

* হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন, যদিও মেনে নেয়া হয় যে, হযরত খুদরী (রাঃ) প্রথম থেকেই গমের এক সা সদকা দিতেন। অতঃপর মুআবিয়া (রাঃ)-এর অর্ধ সা-এর আদেশ শুনেও তিনি এক সা দেয়ারই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন- এর জবাবে তিনি বলেন, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর প্রথমে একথা জানা ছিল না যে, গমে অর্ধ সা ফিতরা স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) নির্ধারণ করেছেন। বরং মুআবিয়া (রাঃ)-এর এই হুকুমকে খুদরী (রাঃ) তাঁর পক্ষ থেকে কিয়াস ভেবেছিলেন। তাই তিনি প্রথমে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু জানার পর হযরত খুদরী (রাঃ)-এর কর্মপন্থা ও মাযহাব এটাই ছিল যে, গম অর্ধ সা' ওয়াজিব। (الكوكب الدري ج١ ص٢٤٤)

তিন ইমামের প্রদত্ত অবশিষ্ট দুটি হাদীসের জবাবঃ ইসলামের প্রথম যুগে গমের ফিতরা এক সা দেয়া হত, অতঃপর অর্ধ সা-এর হুকুম দেয়া হয় এবং এর উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়।

... عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ ... صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ بُرٍّ الخ (بخاري ج١

ص٢٠٥ باب صدقة الفطر على الحر الخ، مسلم ج١ ص٣١٧، ترمذي ج١ ص١٤٦ باب صدقة الفطر، نسائي ج١ ص٣٤٦ باب فرض زكوٰة رمضان)

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) সদকাতুল ফিতর হিসেবে ... এক সা খেজুর বা এক সা যব আদায় করা ধার্য করেছেন। তারপর লোকেরা অর্ধ সা গমকে এক সা খেজুরের সমমান দিতে লাগল।

... عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ... قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةٍ مَكَانَ صَاعٍ مِّنْ تِلْكَ الْاَشْيَآءِ– (ابو داود ج١ ص٢٢٧ باب كم يودي في صدقة الفطر)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। ... আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, অতঃপর হযরত উমর (রাঃ)-এর সময় যখন গমের ফলন অধিক হতে থাকে, তখন তিনি আধা সা গমকে উল্লিখিত বস্তুর এক সা-এর সম পরিমাণ নির্ধারণ করেন।

উক্ত হাদীসের রাবী হযরত ইবন উমর (রাঃ) এবং তিন ইমামের পক্ষ থেকে প্রদত্ত তৃতীয় দলীলের রাবীও হলেন হযরত ইবন উমর (রাঃ)। যদিও মেনে নেয়া হয় কোন হাদীস দ্বারাই দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, তবুও দেখা যাচ্ছে, এ হাদীস ব্যতীত হানাফীদের এমন অনেক হাদীস রয়েছে, যার দ্বারা অকাট্য দলীল দেয়া সম্ভব। অতঃপর বলা যায়, তিন ইমামের হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে বায়হাকী গ্রন্থে। আর হানাফীদের সপক্ষে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে আবু দাউদ এবং নাসায়ী কিতাবে, যা হাদীসের বিশুদ্ধ ছয়খানা কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। এদিক থেকে বিচার করলেও হানাফীদের প্রদত্ত দলীল অগ্রগণ্য।

* সর্বোপরি বলা যায় যে, গমের ক্ষেত্রে অর্ধ সা দেয়া, এটা ওয়াজিব। আর অতিরিক্ত অর্ধ সা দেয়া ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব। যা হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)ও অতিরিক্ত হিসেবে প্রদান করতেন, ওয়াজিব হিসেবে নয়। (تنظيم الاشتات ج٢ ص٢٦)

بَابُ تَعْجِيْلِ الزَّكٰوةِ ص٢٢٩

অগ্রিম যাকাত প্রদান করা

عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ تَعْجِيْلِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ اَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِيْ ذٰلِكَ– (ترمذي ج١ ص١٤٦ باب في تعجيل الزكاة، ابن ماجة ص١٢٩)

অনুবাদঃ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আব্বাস (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট (সময়ের পূর্বে) দ্রুত যাকাত প্রদানের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি (সাঃ) তাঁকে এ ব্যাপারে অনুমতি দান করেন।

বিশ্লেষণঃ যাকাত অগ্রিম আদায় করা জায়েয কিনা?
এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত যে, নিসাব পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যদি কেউ যাকাত প্রদান করে, তাহলে তার যাকাত আদায় পরিশুদ্ধ হবে না, বরং পরে যখন ঐ ব্যক্তি নিসাবের মালিক হবে, পুনরায় যাকাত আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে। কেননা যাকাত ফরয হওয়ার জন্য শর্ত হল নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া। তবে পূর্বের প্রদত্ত সম্পদ নফল সদকা হিসেবে পরিগণিত হবে।
কিন্তু নিাসব পূর্ণ হওয়ার পর যদি কোন ব্যক্তি উক্ত সম্পদের উপর এক বছর সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই যাকাত প্রদান করে, তাহলে তার যাকাত আদায় হবে কিনা এক্ষেত্রে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়-
* ইমাম মালিক, সুফিয়ান সাওরী, লাইস এবং হাসান বসরী (রহ)-এর মতে, বছর পূর্তি হবার পূর্বে অগ্রিম যাকাত প্রদান করলে তা আদায় হবে না। কেননা, যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে বর্ষপূর্তি হওয়া। (معارف ج٥ ص١٦)

দলীলঃ নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-
... لَيْسَ فِيْ مَالٍ زَكٰوة حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ– (ابو داود ج١ ص٢٢١ باب في زكوة السائمة ، ترمذي ج١ ص١٣٨ باب لا زكٰوة على المال الخ، نسائي ج١ ص١٢٩)
অর্থাৎ, ... যে মালের উপর এক বছর পূর্ণ হয় না তার কোন যাকাত নেই।

কিয়াসী দলীলঃ নামায যেরূপ নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলেই ফরয হয়, সময়ের পূর্বে আদায় করলে তা আদায় হয় না, তদ্রূপ যাকাতও ফরয হয় বছর পূর্তি হলে। সুতরাং বছর পূর্তির পূর্বে যাকাত আদায় করলে তা আদায় হবে না।

(درس ترمذي ج٢ ص٥٠٨–٥٠٩)

এ ব্যাপারে হাসান বসরী (রহ.)-এর উক্তি হল-

مَنْ زَكّٰى قَبْلَ الْوَقْتِ أَعَادَ كَالصَّلٰوةِ– (عيني ج٩ ص٤٧)

অর্থাৎ, কেউ যদি সময় আসার পূর্বে যাকাত আদায় করে তবে তা নামাযের ন্যায় দোহরাবে। (পুনরায় পড়বে)

* ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল এবং ইসহাক (রহ.)-এর মতে, নিসাব পূর্ণ হওয়ার পর বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায় করা জায়েয আছে। (عيني ج٩ ص٤٧)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ اِنَّا قَدْ اَخَذْنَا زَكٰوةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الْاَوَّلِ لِلْعَامِ– (ترمذي ج١ ص١٤٧)

অর্থাৎ, ... নবী করীম (সাঃ) উমর (রাঃ) কে বললেন, আমরা আব্বাস (রাঃ)-এর যাকাত এ বছরের যাকাত বছরের প্রথমেই আদায় করে নিয়েছি।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবে বলা যায়, উক্ত হাদীসে এমন বলা হয়নি যে, এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত দিলে তা আদায় হবে না, বরং এর দ্বারা একথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, যে মালে এক বছর পূর্তি হয়নি, তার উপর যাকাত ফরয নয়। তবে যদি কেউ নিসাবের মালিক হওয়ার পর আদায় করে দেয়, তাহলে আদায় না হওয়ার কোন কারণ নেই। তাছাড়া অন্যান্য হাদীস দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়।

কিয়াসী দলীলের জবাবঃ ওয়াক্ত নামায ওয়াজিব হওয়ার কারণ। অথচ বছর অতিক্রান্ত হওয়া যাকাত আদায়ের জন্য শর্ত, ওয়াজিব হওয়ার কারণ নয়। সুতরাং বছর পূর্তিকে নামাযের ওয়াক্তের উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। (درس ترمذي ج٢ ص٥٠٩)

بَابُ فِيْ الزَّكٰوةِ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ اِلٰى بَلَدٍ ص٢٢٩

এক এলাকার যাকাত অন্য এলাকায় নিয়ে যাওয়া

... عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَطَاءٍ ... عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ زِيَادًا اَوْ بَعْضَ الْاُمَرَاءِ بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ اَيْ، الْمَالُ قَالَ وَلِلْمَالِ اَرْسَلْتَنِيْ اَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–

অনুবাদঃ ... ইবরাহীম ইবন আতা (রহ.) ... তাঁর পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যিয়াদ অথবা অন্য কোন শাসক ইমরান ইবন হুসায়েন (রাঃ)-কে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। অতঃপর ইমরান (রাঃ) ফিরে এলে তিনি (আমীর) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, যাকাতের মাল কোথায়? তিনি বলেন, আপনি আমাকে যাকাতের যে মাল আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন, তা আমরা সেই স্থান হতে আদায় করেছি, যেখান থেকে আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে আদায় করতাম, আর তা সেই সমস্ত স্থানে খরচ করেছি, যেখানে আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে ব্যয় করতাম। (অর্থাৎ যেখানে আদায় করা হত সেই এলাকার গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হত)

বিশ্লেষণঃ যাকাতের সম্পদ এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় স্থানান্তর করা জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়ঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে, এক এলাকা থেকে অন্য এলাকা বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাকাত স্থানান্তর করা জায়েয নয়।

(تنظيم الاشتات ج٢ ص٤)

দলীল (১)ঃ পূর্বোল্লিখিত হাদীস। উক্ত হাদীসে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর যুগেও যাকাত যেখান থেকে আদায় করা হত সেখানেই ব্যয় করা হত।

দলীল (২)ঃ হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস-

... اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ... اَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ اَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِيْ فُقَرَائِهِمْ الخ (ابو داود ج١ ص٢٢٣ باب في زكوة السائمة، بخاري ج١ ص٢٠٢-٢٠٣ باب اخذ الصدقة من الاغنياء، ترمذي ج١ ص١٣٦ باب في كراهية اخذ الخ، نسائي ج١ ص٣٤٨ اخراج الزكوة من بلاد الى بلد، ابن ماجة ص١٢٨-١٢٩)

অর্থাৎ, ... রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত মুআয (রাঃ)-কে য়ামানে প্রেরণের সময় বলেন, ... (তুমি তাদেরকে বলবে যে) আল্লাহ তাআলা তাদের মালের উপর যাকাত ফরয করেছেন। তুমি তাদের ধনীদের নিকট হতে তা গ্রহণ করে (তাদের) গরীবদের মধ্যে বিতরণ করবে।

সুতরাং উক্ত হাদীসে স্পষ্টভাবে হুকুম দেয়া হয়েছে যে, যে শহরে ধনীদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করা হবে, ঐ শহরেরই গরীবদের মধ্যে যাকাত বন্টন করা হবে।

* ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইন (রহ.)-এর মতে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাকাত স্থানান্তর করা জায়েয। তবে উত্তম হল, এক এলাকার যাকাত প্রয়োজন ব্যতীত অন্য এলাকায় স্থানান্তর না করা। অর্থাৎ, প্রয়োজন ব্যতীত স্থানান্তর করা মাকরূহ।

'দুররুল মুখতার' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, অন্য শহরে গরীবদের যদি বিশেষ প্রয়োজন হয় এবং তা প্রেরণ করলে ঐ শহর বা দেশের মুসলমানদের ব্যাপক উপকার লাভের সম্ভাবনা থাকে অথবা দুই স্থানের মধ্যে যদি বন্ধুপ্রতীম সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে অথবা ইলম অর্জনকারী ছাত্রের উদ্দেশ্যে পাঠায় অথবা যাকাতদাতার অসহায় আত্মীয় স্বজন যদি অন্য স্থানে বা অন্য শহরে বসবাস করে, তাহলে যাকাত স্থানান্তর করা মাকরূহ তো নয়ই, বরং উত্তম কাজ এবং সে দুটি সওয়াবের ভাগী হবে।

(تنظيم الاشتات ج٢ ص٤، درس ترمذي ج٢ ص٤٧٤)

যেমন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

... لَهَا اَجْرَانِ اَجْرُ الْقَرَابَةِ وَاَجْرُ الصَّدَقَةِ (بخاري ج١ ص١٩٨ باب الزكٰوة على الزوج الخ، مسلم ج١ ص٣٢٣ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين الخ، نسائي ج١ ص١٣٣)

তার জন্য রয়েছে দুটি সওয়াব- (ক) নিকটাত্মীয়ের সওয়াব (খ) সদকার সওয়াব।

দলীলঃ ... اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَدْعِيُ الزَّكَاةَ مِنَ الاَعْرَابِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَيَصْرِفُهَا فِيْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ– (درس مشكوٰة ج٢ ص١٦٥)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) বেদুঈনদের কাছ থেকে যাকাত এনে মদীনার দরিদ্র মুহাজিরদেরকে দিতেন।

যুক্তিভিত্তিক দলীলঃ আসলে ব্যাপারটা একটু বাস্তব দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে সহজেই বুঝা যায় যে, এরকম স্থানান্তরিত করায় কোন অসুবিধা থাকতে পারে না। বরং অনুমতিই দিতে হয়। কারণ সুসামঞ্জস্য ও ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্ব অর্থনীতি গড়ে তুলতে হলে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। যেমন, আমাদের দেশের অথবা বিশ্বের কোন এক প্রান্তে অধিক পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হল। আবার দেখা গেল অন্য কোন এক স্থানে কিছুই উৎপন্ন হল না, বরং সেখানে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, এক্ষেত্রে উৎপাদনশীল এলাকায় গরীব না থাকলে যাকাতের সম্পদ আদায় করে যেখানে কোন ফসলই উৎপন্ন হয়নি সেখানে স্থানান্তর করা উচিত। কারণ তারাও এতে হকদার। কিন্তু দেয়া না হলে এটা হবে অবিচার এবং ইসলামী নীতি-নৈতিকতার পরিপন্থী।

জবাবঃ হানাফীগণের পক্ষ থেকে প্রথম দলীলের জবাবঃ ইমরান বিন হুসাইন ছিলেন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানের যাকাত আদায়কারী। তিনি বিশেষ পরিস্থিতিতে ঐ কথা বলেছিলেন। গ্রহণযোগ্য দলীল তো হবে তাই যা স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) আমল করেছেন। (تنظيم الاشتات ج٢ ص٤، درس مشكوٰة ج٢ ص١٦٥)

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসে উল্লিখিত فقرائهم এর هم সর্বনামটি فقراء المسلمين-এর দিকে ফিরেছে, اهل اليمن-এর দিকে নয়। অর্থাৎ, চাই য়ামনবাসী গরীব হোক অথবা অন্য যে কোন শহরের মুসলিম গরীব হোক, সবাইকে দেয়া বৈধ হবে। (معارف ج٥ ص٢٥٦)

بَابُ مَنْ يُّعْطٰى مِنَ الصَّدَقَةِ وَحَدِّ الْغِنٰى ص٢٢٩

যাকাত কাকে দিতে হবে এবং কাকে ধনী বলা যায়

... عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوْش اَوْ خُدُوْش اَوْ كُدُوْح فِيْ وَجْهِه فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا الْغِنٰى قَالَ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا اَوْ قِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ– (ترمذي ج١ ص١٤١ باب من تحل له الزكٰوة، نسائي ج١ ص٣٦٣ حد الغنى، ابن ماجة ص١٣٣)

অনুবাদঃ ... আব্দুল্লাহ (ইবন মাসউদ রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি ভিক্ষা চায় অথচ তার নিকট যা আছে তা তার জন্য যথেষ্ট, সে কিয়ামতের দিন স্বীয় চেহারায় অসংখ্য জখম, নখের আঁচড় ও ক্ষতসহ আগমন করবে। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ধনী কে? তিনি বলেন, ৫০ দিরহাম অথবা ৫০ দিরহাম মূল্যের পরিমাণ স্বর্ণ (যার কাছে থাকবে সে ভিক্ষা করতে পারবে না।)

... عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ وَذَكَرَ حَدِيْثًا طَوِيْلاً فَاَتَاهُ رَجُل فَقَالَ اَعْطِنِيْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلاَ غَيْرِه فِيْ الصَّدَقَاتِ حَتّٰى حَكَمَ فِيْهَا هُوَ فَجَزَّاهَا ثَمَانِيَةَ اَجْزَاءٍ فَاِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الاَجْزَاءِ اَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ– (ابو داود ج١ ص٢٣٠)

অনুবাদঃ ... যিয়াদ ইবন হারিস আস-সুদায়ী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হয়ে তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করি। অতঃপর তিনি একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। তারপর বলেন, তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলে, আমাকে কিছু যাকাতের মাল দান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাতে বলেন, আল্লাহ তাআলা (সদকার মাল খরচের ব্যাপারে) তাঁর নবী ও অন্যের নির্দেশের উপর সন্তুষ্ট হননি, বরং তিনি এ ব্যাপারে স্বয়ং নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং তা আট শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিভক্ত করেছেন। যদি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে তোমার হক প্রদান করব।

বিশ্লেষণঃ مصارف زكٰوة বা যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহঃ যাকাত ব্যয়ের ৮টি খাত বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِيْ الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ– وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ–

অর্থাৎ, "যাকাত হল কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য- এই হল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (তাওবাঃ ৬০)

নিম্নে যাকাত বন্টনের খাতগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হল-

১। **ফকীর বা দরিদ্রঃ** ফকীর বা দরিদ্র বলতে ঐ সকল নারী-পুরুষকে বুঝায়, যারা পুরোপুরি সহায়-সম্বলহীন বা একেবারেই নিঃস্ব নয়। তথাপিও চাহিদা পূরণে যারা অন্যের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। তাছাড়া জীবন সংগ্রামে হেরে যাওয়া অক্ষম, দুর্বল, পঙ্গু, অভাবগ্রস্ত লোকদেরকেও সাময়িকভাবে দরিদ্রের অন্তর্ভুক্ত করে যাকাত দেয়া যেতে পারে।

২। **মিসকীন তথা নিঃস্ব বা সর্বহারাঃ** মিসকীন বলতে সহায় সম্বলহীন একেবারে নিঃস্ব ঐ ধরনের পুরুষ ও মহিলাদেরকে বুঝায়, যারা অপরের দয়া ও অনুগ্রহ ব্যতীত চলতে পারে না।

৩। **যাকাত আদায়কারী ও বন্টনকারীঃ** যাকাত বিভাগে কর্মরত যে সকল কর্মচারী রয়েছেন, যারা যাকাত-উশর আদায়, বন্টন ও সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত, এ সকল কর্মচারী যদি নিসাব পরিমাণ মালের মালিকও হয়, তবুও তাদেরকে যাকাতের অর্থ থেকে বেতন-ভাতা প্রদান করা যাবে।

৪। **মুআল্লাফাতুল কুলুব বা যাদের মন পাওয়া উদ্দেশ্যঃ** মুআল্লাফাতুল কুলুব বলতে সাধারণত সমস্যাগ্রস্ত নওমুসলিমকে বুঝায়। ইসলামের স্বার্থে নওমুসলিমদেরকে ইসলামের সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে এবং তার মন জয়ের উদ্দেশ্যে যাকাতের অর্থ খরচ করা যাবে। যদিও সে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়।

৫। **গোলাম আযাদ বা দাস মুক্তির ক্ষেত্রেঃ** মাকাতিব গোলামের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে গোলাম তার মালিকের সাথে চুক্তিতে শৃঙ্খলিত, এরূপ গোলাম আযাদের ক্ষেত্রে যাকাতের মাল ব্যয়িত হতে পারে। কিন্তু সাধারণ দাস-দাসীর বেলায় এই আইন প্রযোজ্য নয়।

৬। **ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রেঃ** ঐ সকল ঋণী, যারা ঋণভারে জর্জরিত অথচ ঋণ পরিশোধের জন্য আর্থিক কোন ক্ষমতাই তাদের অবশিষ্ট নেই। এ ধরনের ব্যক্তির ক্ষেত্রে যাকাতের অর্থ ব্যয় করে তাকে ঋণ থেকে মুক্ত করা যাবে।

৭। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদঃ আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য যারা প্রাণ-পণ প্রচেষ্টা চালায় তাদের আর্তিক অবস্থা স্বচ্ছল না থাকলে যুদ্ধাস্ত্র ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির ব্যবস্থাপনার জন্য যাকাতের টাকা ব্যয়িত হতে পারে।

৮। মুসাফির বা ভ্রমণকারীঃ মুসাফির বা ভ্রমণকারী বলতে বুঝানো হয়েছে যারা স্বস্থানে প্রচুর সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও ভ্রমণের অবস্থায় অর্থের অভাবে পথ চলা থেমে যায়। ঐ সম্পদশালী মুসাফির ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা বৈধ।

"মুআল্লাফাতুল কুলুব"-এর ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনাঃ সাধারণত তারা ছয় শ্রেণীর বলে উল্লেখ করা হয়। এদের কিছু মুসলমান, কিছু অমুসলমান। উলামাদের নিকট মুআল্লাফাতুল কুলুব তথা নও মুসলিম বা অমুসলিমকে দ্বীনের স্বার্থে চিত্তাকর্ষণের নিমিত্তে যাকাত দেয়ার হুকুম এখনও অবশিষ্ট আছে, নাকি এটা নবী করীম (সাঃ)-এর যুগের মধ্যেই সীমিত ছিল এবং তাঁর ইন্তিকালের সাথে সাথে তা রহিত হয়ে গেছে- এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে-

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল, যুহরী, কাযী আবদুল ওহাব (রহ.) প্রমুখের মতে, নও মুসলিম বা অমুসলিমকে মন জয়ের জন্য এবং ইসলামের সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করার জন্য যাকাত প্রদান করার হুকুম এখনও অবশিষ্ট আছে, তা রহিত হয়নি।

দলীল (১)ঃ পবিত্র কুরআনের আয়াত- ... إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ ... وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক ইবন আনাস, হাসান বসরী (রহ.) এবং হযরত উমর ফারূক (রাঃ)-এর মতে, নও মুসলিমকে মন জয়ের জন্য এবং ইসলামের সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করার জন্য যাকাত প্রদান করার হুকুম এখন আর অবশিষ্ট নেই; বরং রহিত হয়ে গেছে। (فتح القدير ج٢ ص١٥، معارف ج٥ ص٢٨٣)

দলীল (১)ঃ একদল বলেন, উক্ত হুকুম মানসুখ (রহিত) হওয়ার জন্য ঐ আয়াত নাসিখ (রহিতকারী) যা সূরা কাহাফে বর্ণিত হয়েছে-

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ-

অর্থাৎ, "সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক।" (কাহাফঃ ২৯)

* আল্লামা শামী (রহ.) বলেন, মুআল্লাফাতুল কুলুব-এর রহিতকারী আয়াত হল- فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ- অর্থাৎ, তোমরা মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও। (তাওবাহঃ ৫)

* অথবা, সূরা নিসার আয়াত- وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلاً--

অর্থাৎ, আল্লাহ বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীদের কোন পথ রাখবেন না। (নিসাঃ ১৪১)
উপরোল্লিখিত আয়াত সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'মুআল্লাফাতুল কুলুব'-এর হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে এবং বুঝা যায় যে, তাদেরকে প্রথম প্রথম এজন্য যাকাত দেয়া হত যাতে তাদের মন পরিতুষ্ট থাকে এবং ইসলামের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু অনেকেই বলেন, সাহাবায়ে কিরামের যুগে ইহা রহিত হওয়ার ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাপারে হযরত উমর (রাঃ)-এর সময়কালের একটি ঘটনা- নবী করীম (সাঃ) উয়ায়নাহ ইবন হিসনা নামক এক কাফিরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য উপহার দিতেন। কিন্তু নবী করীম (সাঃ)-এর ইন্তিকালের পর যখন ঐ ব্যক্তি হযরত উমর (রাঃ)-এর নিকট একই উদ্দেশ্যে আসে, তখন তিনি (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) তো তোমাকে মন জয়ের জন্য সম্পদ প্রদান করতেন। এখন আল্লাহ তাআলা ইসলামের বিজয় দান করেছেন। সুতরাং এখন আমাদের নিকট তোমাদের কোন অংশ নেই। চাই তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর বা না কর, তাতে কিছু আসে যায় না। (فتح القدير ج٢ ص١٥، فتح الملهم ج٣ ص٧٥) অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন- اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ–
কেউ কেউ বলেন, এ হুকুমটি নবী করীম (সাঃ)-এর যুগের সাথে খাস ছিল।

* আল্লামা কুরতুবী ও কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.) এ ব্যাপারে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব প্রদান করেন, "মুআল্লাফাতুল কুলুব"-এ কাফির কখনো অন্তর্ভুক্ত ছিল না; বরং এর দ্বারা একমাত্র উদ্দেশ্য হল ঐ সকল নও মুসলিম, যারা দরিদ্র। সুতরাং এ ব্যাখ্যাটি মেনে নিলে রহিতের প্রয়োজন হয় না। আর নবী করীম (সাঃ) কাফিরদের মনোরঞ্জনের জন্য যে মাল দিতেন, তা যাকাত থেকে নয়, গনীমতের মাল থেকে।
(تفسير قرطبي ج٨ ص١٧٩، تفسير مظهري ج٤ ص٢٣٤)

যাদেরকে যাকাত দেয়া বৈধ নয়ঃ যাকাতের অর্থ যাদেরকে প্রদান করা যাবে না এবং প্রদান করলেও যাকাত আদায় হবে না। ইসলামী চিন্তাবিদগণ তাদেরকে সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যেমন-

১। নিজের পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী এবং তাদের পিতামাতা।
২। নিজের সন্তান, নাতি-নাতনী
৩। স্বামী
৪। স্ত্রী

উল্লেখ্য যে, উপরোল্লিখিত ৪টি স্তর ব্যতীত অন্যান্য নিকটাত্মীয়দেরকে যাকাত প্রদান করা অধিক সওয়াবের কাজ। (درس مشكوة ج٢ ص١٨٨، درس ترمذي ج٢ ص٤٧٥-٤٧٦)

৫। নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিককে যাকাত প্রদান করা বৈধ নয়। আবার যাকাতের হকদার এমন কাউকে এত বেশি পরিমাণ যাকাত প্রদানও বৈধ নয় যা দিলে সে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে যায়।

৬। কোন অমুসলিমকে যাকাত প্রদান করা বৈধ নয়। (এ ব্যাপারে সামনে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে)

৭। বনু হাশিম (রাসূল সাঃ-এর বংশ) গোত্রের লোকদেরকে যাকাত দেয়া বৈধ নয়।

কাকে ধনী বলা যায় এবং কার জন্য সওয়াল করা জায়েযঃ কি পরিমাণ সম্পদ থাকলে ব্যক্তিকে ধনী বলা যাবে এবং অন্যের নিকট সওয়াল করা বৈধ হবে না, এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে-

উল্লেখ যে, ধনী তিন প্রকারঃ

(১) যার নিকট বর্ধনশীল মাল রয়েছে এবং পাশাপাশি সে সাহিবে নিসাব হবে। এমন ধনীর উপর যাকাত, কুরবানী এবং সদকাতুল ফিতর সবই আদায় করতে হবে। তার জন্য সর্বপ্রকার সদকা গ্রহণ করা হারাম।

(২) যার নিকট মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ মাল রয়েছে, তবে বর্ধনশীল মাল নয়, এমন ধনীর উপর যাকাত আদায় করতে হবে না। তবে তার জন্য যাকাত ও অন্যান্য সদকা গ্রহণ করা হারাম। কিন্তু কুরবানী করা, সদকাতুল ফিতর আদায় করা তার উপর ওয়াজিব।

(৩) যার নিকট মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত বর্ধনশীল এবং অবর্ধনশীল কোন মালই নেই, এমন ধনীর উপর যাকাত, কুরবানী এবং সদকাতুল ফিতর কোনটাই আদায় করতে হবে না। তবে এমন ব্যক্তি সওয়াল ব্যতীত যাকাত গ্রহণ করতে পারবে। (درس مشكوة ج٢ ص١٨٨، درس ترمذي ج٢ ص٤٧٥-٤٧٦)

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, যে ব্যক্তি ৫০ দিরহাম বা তৎসম মূল্যের সম্পদের মালিক হবে, সে-ই ধনী। তার জন্য অন্যের নিকট সওয়াল করা বৈধ হবে না। তিরমিযী (রহ.) বলেন, ইহা ইবন মুবারক, আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এরও উক্তি।

দলীলঃ ... فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا الْغِنٰى قَالَ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا اَوْ قِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ- (المغني ج٢ ص٦٦١-٦٦٢)

(পূর্ণ হাদীসটি অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে।)

* কেউ কেউ বলেন, আহমদ ইবন হাম্বল, ইবন মুবারক ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, যার সব সময় বা অধিকাংশ সময় সকাল-বিকালের খানা জোটে এবং অন্যের মুখাপেক্ষী নয়, সেই ধনী। তার জন্য অন্যের নিকট সওয়াল করা বৈধ হবে না।

* এ ব্যাপারে হানাফীদের অভিমত হল, যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট এক দিন এক রাতের খোরাক থাকে তার জন্য সওয়াল করা জায়েয নয়। তাছাড়া সুস্থ ও সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্যও সওয়াল করা জায়েয নয়। অবশ্য যার নিকট একদিন এক রাতের খাবারেরও ব্যবস্থা নেই, তার জন্য সওয়াল করা জায়েয আছে।

(درس ترمذي ج٢ ص٤٧٦)

দলীলঃ ... قَالَ النُّفَيْلِيُّ فِيْ مَوْضَعٍ اٰخَرَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا الْغَنِيُّ الَّذِيْ لاَ يَنْبَغِيْ مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ قَالَ قَدْرُ مَا يُغَدِّيْهِ وَيُعَشِّيْهِ وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِيْ مَوْضَعٍ اٰخَرَ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ شَبْعُ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ اَوْ لَيْلَةٍ وَ يَوْمٍ– (ابو داود ج١ ص٢٣٠)

অর্থাৎ, ... রাবী নুফায়লীর অন্য বর্ণনায় আছে, সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ধনী (অমুখাপেক্ষী) হওয়ার সীমা কি, যার কারণে অন্যের নিকট চাওয়া অনুচিত হয়? তিনি বলেন, কারো নিকট এমন কিছু সম্পদ থাকা, যা তার সকাল ও সন্ধ্যার প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট। অন্য বর্ণনায়, "যা তার রাত-দিন বা দিন-রাতের জন্য যথেষ্ট" উল্লেখ রয়েছে।

قَالَ عَطَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ اَنَّه لَقِيَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو فَقَالَ اِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِقَوِيٍّ وَلاَ لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ– (ابو داود ج١ ص٢٣١، ترمذي ج١ ص١٤١ باب من تحل له الصدقة)

অর্থাৎ, ... আতা ইবন যুহাইর বলেন যে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি বলেন, শক্ত, সবল ও সুঠাম দেহের অধিকারী লোকদের জন্য যাকাত গ্রহণ বৈধ নয়।

* ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন, যদি কারো পরিবার-পরিজন না থাকে, তাহলে তার জন্য এক দিন এক রাতের খাবার থাকলে সে সওয়াল করতে পারবে না। আর যদি পরিবার-পরিজন থাকে, তাহলে পঞ্চাশ দিরহাম থাকলে সওয়াল করতে পারবে না।

* অবশেষে শাহ ওয়ালীউল্লাহ ও তাহাবী (রহ.) এই এখতিলাফের সমাধানকল্পে বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিস্থিতি ধর্তব্য হবে। কারো পঞ্চাশ দিরহাম জরুরী, কারো এর থেকে বেশি জরুরী, কারো বা এর থেকে কম প্রয়োজন। সুতরাং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সওয়াল করা জায়েয বা হারাম ধর্তব্য হবে।

(تنظيم الاشتات ج٢ ص٣١، درس مشكوة ج٢ ص١٨٨)

بَابُ كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكٰوةِ ص٢٣١

এক ব্যক্তিকে যাকাতের মালের কি পরিমাণ দেয়া যেতে পারে

... عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ وَزَعَمَ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ اَبِي حَثْمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِّنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ يَعْنِيْ دِيَةَ الاَنْصَارِيِّ الَّذِيْ قُتِلَ بِخَيْبَرَ-

অনুবাদঃ ... বশীর ইবন ইয়াসার (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নাম সাহ্‌ল ইবন আবু হাসমাহ নামক জনৈক আনসারী তাঁকে বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) তাঁকে দিয়াতের (রক্তমূল্য) হিসেবে একশতটি যাকাতের উট দান করেন, অর্থাৎ সেই আনসারীর দিয়ত (রক্তমূল্য) যিনি খায়বরে নিহত হন।

বিশ্লেষণঃ একজনকে এত বেশি পরিমাণ যাকাত প্রদান করা বৈধ নয় যা দিলে সে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে যায় এবং এত কম পরিমাণ দেয়াও উচিত নয়, যার দ্বারা সে কিছুই করতে পারবে না।
উপরোল্লিখিত হাদীসে যাকাতের মাল থেকে যে একশতটি উট দেয়া হয়েছে তা মূলতঃ বায়তুল মাল থেকে দিয়াত বা রক্তমূল্য (হত্যাকারীর উপর ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ) হিসাবে দেয়া হয়েছে।

* তবে ইমামদের মধ্যে যে বিষয়ে এখতেলাফ রয়েছে তা হল- পবিত্র কুরআনে مصارف زكٰوة বা যাকাত ব্যয়ের খাত হিসেবে যে সকল প্রকার উল্লেখ রয়েছে তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক প্রকারকে যাকাত দিতে হবে কিনা-

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, পবিত্র কুরআনে যাকাত ব্যয়ের খাত হিসেবে যে আটটি খাত উল্লেখ করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকটি খাতে কমপক্ষে তিনজনকে যাকাত প্রদান করা জরুরী। তবে, কোন শহরে যদি প্রত্যেক প্রকারের লোক না পাওয়া যায়, তাহলে যে কয় প্রকারের লোক পাওয়া যাবে তাদেরকে যাকাত প্রদান করতে হবে। (المعارف ج٥ ص٢٠١، الام ج٢ ص٦٨)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- "اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ" ... (التوبة ٦٠)

আয়াতটিতে "ل" দ্বারা যে اضافت (সম্বন্ধকরণ) করা হয়েছে তা মূলতঃ অধিকারের বিবরণের জন্য।
সুতরাং আট প্রকারের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারকেই যাকাত প্রদান করা জরুরী। অতঃপর লক্ষণীয় যে, প্রকারসমূহ বর্ণনার ক্ষেত্রে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। আর

আরবী ভাষায় বহুবচনের সর্বনিম্ন সংখ্যা হল তিন। সুতরাং প্রতিটি প্রকারের কমপক্ষে তিনজনকে প্রদান করাও জরুরী।

* ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী, মালিক, আহমদ, ইবন জাওযী, ইবন হুমাম, হাসান, নাখঈ (রহ.), ইবন আব্বাস, হুযাইফা (রাঃ) প্রমুখের মতে, যাকাতের আট প্রকার ব্যয় খাতের থেকে যেকোন এক প্রকারের একজনকে প্রদান করলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। প্রত্যেক প্রকারকে প্রদান করা ওয়াজিব নয়।

(المغني ج٢ ص٢٦٨)

দলীল (১)ঃ পবিত্র কুরআনের আয়াত-

اِنْ تُبْدُو الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ-

অর্থাৎ, যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি দান-খয়রাত গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে আরও উত্তম। (বাকারাঃ ২৭১)

উক্ত আয়াতে **صدقات**-এর উপর **الف لام جنسي** (শ্রেণী বা জাতি বুঝাতে যে আলিফ লাম ব্যবহৃত হয়) প্রবিষ্ট হয়ে আমভাবে সকল সদকাকে বুঝানো হয়েছে। যার মধ্যে যাকাতও অন্তর্ভুক্ত এবং আট প্রকারের মধ্যে এক প্রকার শুধুমাত্র ফকীরকে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, এক প্রকারকে দেয়া যথেষ্ট হবে।

দলীল (২)ঃ ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا ... اِنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ اَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِيْ فُقَرَائِهِمْ الخ (ابو داود ج١ ص٢٢٣ باب في زكوة السائمة، بخاري ج١ ض١٩٦ باب لا تؤخذ كرائم، ترمذي ج١ ص١٣٦ باب في كراهية اخذ الخ، نسائي ج١ ص٣٣٠، ابن ماجة ص١٢٨-١٢٩)

অর্থাৎ, ... হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত মুআয (রাঃ)-কে ইয়ামানে প্রেরণের সময় বললেন, ... আল্লাহ তাআলা তাদের মালের উপর যাকাত ফরয করেছেন। তুমি তাদের ধনীদের নিকট হতে তা গ্রহণ করে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করবে।

উক্ত হাদীসেও এক প্রকারের (ফকীর) কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইজমাঃ হযরত উমর, ইবন উমরা, ইবন আব্বাস, হুযাইফা, সাঈদ ইবন যুবাইর (রাঃ) প্রমুখ থেকে এই রেওয়ায়েতই পাওয়া যায়। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, এ ব্যাপারে সাহাবাদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জবাবঃ হানাফীগণ বলেন, "انما الصدقت للفقراء" আয়াতে "ل"-এর দ্বারা যে "اضافت" করা হয়েছে, তা অধিকার প্রমাণের জন্য নয়, বরং নির্দিষ্ট ব্যয় খাতের বিবরণের জন্য। অর্থাৎ এ আট প্রকার ছাড়া অন্যদের দেয়া জায়েয নয়। আর اِنَّمَا তো আসে সীমাবদ্ধতা (حَصَر) বুঝানোর জন্য। (درس مشكوٰة ج٢ ص١٩٠)

* "للفقراء" সহ প্রত্যেক প্রকারে ব্যবহৃত "الف لام" দ্বারা استغراق (সামগ্রিকতা) উদ্দেশ্য নয়। কেননা, যদি তা উদ্দেশ্য হয়, তবে দুনিয়ার সকল ফকীর, মিসকীন, মুসাফিরকে দেয়া আবশ্যক হয়ে পড়বে, কাউকে বঞ্চিত করা জায়েয হবে না- যা কখনো সম্ভব নয়। সুতরাং এখানে "الف لام" দ্বারা الف لام جنسي (জাতিজ্ঞাপক) উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, ফকীর, মিসকীন, মুসাফির জাতি। অতএব, আট প্রকারের মধ্যে যে কোন এক প্রকারের একজনকে যাকাত দিলেও তা আদায় হয়ে যাবে।

(تنظيم ج٢ ص٣١، درس ترمذي ج٢ ص٤٣٣-٤٣٤، شرح وقاية ج١ ص٢٣٧)

بَابُ الصَّدَقَةِ عَلٰى اَهْلِ الذِّمَّةِ ص٢٣٥

অমুসলিমদের দান-খয়রাত করা

... عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ اُمِّيْ رَاغِبَةٌ فِيْ عَهْدِ قُرَيْشٍ وَهِيَ رَاغِمَةٌ مُّشْرِكَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ اُمِّيْ قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ اَفَاَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ فَصِلِيْ اُمَّكِ- (مسلم ج١ ص٣٢٤ باب فضل النفقة والصدقة الخ)

অনুবাদঃ ... আসমা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মাতা, যিনি ইসলামের বৈরী ও কুরাইশ ধর্মের অনুরাগী ছিলেন- (কুরাইশদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়) আমার নিকট আগমন করেন। আমি জিজ্ঞাসা করিঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতা আমার নিকট এসেছেন, কিন্তু তিনি ইসলাম বৈরী মুশরিক। এখন (আত্মীয়তার বন্ধন হেতু) আমি কি তাকে কিছু দান করব? তিনি বলেনঃ হাঁ, তুমি তোমার মাতার সাথে অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার কর।

বিশ্লেষণঃ এ ব্যাপারে সকল আলিম একমত যে, সাধারণ (নফল) দান সদকা অমুসলিমদের প্রদান করা বৈধ আছে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হল-

لَا يَنْهٰكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْ الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ-

অর্থাৎ, ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন। (মুমতাহিনাঃ ৮)

এমনকি ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ (রহ.) যিম্মীদেরকে (ইসলামী রাষ্ট্রে করদাতা অমুসলিম নাগরিক) সদকাতুল ফিতরও প্রদান করা জায়েয মনে করেন। তবে উত্তম হল মুসলমানদেরকেই প্রদান করা। (بدائع الصنائع ج٢ ص٤٩)

প্রশ্ন হল, অমুসলিমকে যাকাত প্রদান করা জায়েয কিনা- এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম যুফার, মুহাম্মদ ইবন সীরীন এবং যুহরী (রহ.)-এর মতে, অমুসলিমকে যাকাত দেয়া জায়েয। (كنز الدقائق ص٦٤)

দলীল (১)ঃ اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ...

উক্ত আয়াতটি ব্যাপক। আয়াতে মুসলমানের কোন শর্তারোপ করা হয়নি।

দলীল (২)ঃ নবী করীম (সাঃ) সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যাকে কাফির হওয়া সত্ত্বেও যাকাত (উপহার) প্রদান করেছেন।

* চার ইমাম ও জমহুর উলামাদের অভিমত হল, অমুসলিমদের যাকাত প্রদান করা বৈধ নয়। (درس ترمذي ج٢ ص٤٣٤)

জমহুরদের দলীল এবং ইমাম যুফার (রহ.)-এর প্রদত্ত দলীলের জবাবঃ

ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস- تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِيْ فُقَرَائِهِمْ-

(হাদীসটি ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে)

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে, "যাকাত উত্তোলন করবে তাদের ধনীদের পক্ষ থেকে"। এখানে তাদের বলতে তো মুসলমানকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ, কোন অমুসলিম তো আর যাকাত প্রদান করবে না। এবং দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে, "এবং তাদের গরীবদের মধ্যে বিতরণ করবে।" এখানেও তাদের বলতে মুসলমানকেই বুঝানো হয়েছে। আর এটাই যুক্তিযুক্ত।

প্রকৃত সত্য কথা হল এই যে, কোন যুগেই সদকা, যাকাত প্রভৃতি থেকে অমুসলিমদেরকে অংশ দেয়া হয়নি এবং তারা যাকাতের চতুর্থ ব্যয়খাত- "মুআল্লাফাতে কুলুবে" শামিল ছিল না।

ইমাম কুরতুবী (রহ.) স্বীয় তফসীরে রাসূলে করীম (সাঃ) যাদের চিত্তাকর্ষণের জন্য সদকার খাত থেকে দান করেছিলেন, সবিস্তারে তাদের নামধামসহ উল্লেখ করে বলেছেন- "وَبِالْجُمْلَةِ فَكُلُّهُمْ مُؤْمِنٌ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ كَافِرٌ" (تفسير قرطبي ج٨ ص١٨٩)

অর্থাৎ, মূলতঃ তারা সবাই ছিল মুসলমান, তাদের মধ্যে অমুসলমান বলতে কেউ ছিল না।

কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.) তাফসীরে মাযহারীতে বলেন-

"لَمْ يَثْبُتْ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطٰى اَحَدًا مِنَ الْكُفَّارِ لِلْاِيْلَافِ شَيْئًا مِنَ الزَّكٰوةِ"–

(تفسير مظهري ج٤ ص٢٣٤–٢٣٥)

অর্থাৎ, কোন রেওয়ায়েত থেকে একথা প্রমাণিত নেই যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কাফেরদেরকে মন জয়ের জন্য যাকাতের অংশ দিয়েছিলেন।

আর সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যাকে কাফির অবস্থায় নবী করীম (সাঃ) যে সম্পদ দান করেছিলেন, সে সম্পর্কে ইমাম নববী (রহ.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা হয়েছে যে, এসব দান যাকাতের মালের মধ্য থেকে ছিল না; বরং হুনাইন যুদ্ধের গনীমাতের মালের যে পঞ্চমাংশ বায়তুল মালের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সেখান থেকেই দেয়া হয়েছিল। আর একথা বলাই বাহুল্য যে, বায়তুল মালের এই খাত থেকে মুসলিম-অমুসলিম উভয়ের জন্য ব্যয় করা সমস্ত ফিকাহবিদগণের নিকট জায়েয।

সর্বোপরি বলা যায়, যদিও এ ব্যাপারে ইমাম যুফার (রহ.)-এর কিছু দলীল বেশ শক্তিশালী, কিন্তু এর বিপরীতে বিপুল সংখ্যক উম্মতের ইজমা এর থেকেও বেশি শক্তিশালী ও মজবুত। অবশেষে ইহাই প্রমাণিত হল যে, অমুসলিমদেরকে যাকাত প্রদান করা বৈধ নয়। (فتح الملهم ج٣ ص٧٤–٧٦)

كِتَابُ الْمَنَاسِكِ ঃ হজ্জ অধ্যায়

بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ ص٢٤١ ঃ হজ্জ ফরয হওয়ার বর্ণনা

... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ الاَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلْحَجُّ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ اَوْ مَرَّةً وَّاحِدَةً قَالَ بَلْ مَرَّةً وَّاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ– (مسلم ج١ ص٤٣٢ باب فرض الحج مرة في العمرة، نسائي ج٢ ص١ باب وجوب الحج، ابن ماجة ص٢١٣)

অনুবাদঃ ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। আকরা ইবন হাবিস (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হজ্জ কি প্রতি বছরই ফরয, না জীবনে একবার? তিনি বলেন, (জীবনে) একবার (হজ্জ করা ফরয)। এর অধিক যদি কেউ করে তবে তা তার জন্য অতিরিক্ত।

বিশ্লেষণঃ হুসাইন জুফী (রহ.) বলেন, الحج শব্দটিকে দু'ভাবে পড়া যায়। যেমন-

(১) اَلْحَجُّ (حاء-হরফ যবরযোগে)

(২) اَلْحِجُّ (حاء-হরফ যেরযোগে)

"ح" বর্ণে যবর যোগে اَلْحَجُّ শব্দটি اِسْم (বিশেষ্য)। যেমন, কুরআনে এসেছে-

–اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَعْلُوْمٰت অর্থাৎ, হজ্জের মাসসমূহ সুবিদিত। (বাকারাঃ ১৯৭)

আর "ح" বর্ণে যের যোগে اَلْحِجُّ শব্দটি مَصْدَر (ক্রিয়ামূল)। অন্যদের থেকে এর বিপরীতও বর্ণিত আছে। (معارف السنن ج٦ ص٢٣٧)

যেমন, কুরআনে এসেছে –وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً

অর্থাৎ, আর এ ঘরের হজ্জ করা হলো মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য; যে লোকের এ পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রয়েছে। (আলে ইমরানঃ ৯৭)

حج-এর আভিধানিক অর্থঃ

(১) اَلْقَصْدُ - ইচ্ছা

(২) اَلاِرَادَةُ - সংকল্প

(৩) اَلزِّيَارَةُ - পরিদর্শন

(৪) اَلْقَصْدُ اِلٰى مُعَظَّمٍ - মহৎ জিনিসের ইচ্ছা

(৫) পবিত্র স্থানসমূহ পরিদর্শন ইত্যাদি।

হজ্জের পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

زِيَارَةُ مَكَانٍ مَخْصُوْصٍ فِيْ زَمَانٍ مَخْصُوْصٍ بِفِعْلٍ مَخْصُوْصٍ (كنز الدقائق ص٧٢)

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কিছু কর্ম আদায় করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট স্থানে যিয়ারত করাকে হজ্জ বলা হয়।

اَلْقَصْدُ إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ بِأَعْمَالٍ مَخْصُوْصَةٍ– (فتح الباري ج٣ ص٢٩٩)

নির্দিষ্ট কতগুলো আমলসহ বাইতুল্লাহর উদ্দেশ্যে গমন করা।

احياء العلوم-এর গ্রন্থকার বলেন-

اَلْحَجُّ هُوَ الْقَصْدُ اِلٰى زِيَارَةِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ عَلٰى وَجْهِ التَّعْظِيْمِ بِاَفْعَالٍ مَخْصُوْصَةٍ فِيْ زَمَانٍ مَخْصُوْصٍ–

অর্থাৎ, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কার্যাবলীর মাধ্যমে পবিত্র কাবাঘর যিয়ারত করার ইচ্ছা পোষণ করাকে হজ্জ বলা হয়।

(৪) "القَامُوْس" গ্রন্থকার বলেন- اَلْحَجُّ هُوَ قَصْدُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ لِلتَّقَرُّبِ اِلَى اللهِ تَعَالٰى بِاَفْعَالٍ مَخْصُوْصَةٍ فِيْ زَمَانٍ مَخْصُوْصٍ–

অর্থাৎ, আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কার্যাবলীর মাধ্যমে বায়তুল হারামের উদ্দেশ্যে গমন করা।

(৫) কেউ কেউ বলেন-

اَلْحَجُّ هُوَ قَصْدُ الْبَيْتِ عَلٰى وَجْهِ التَّعْظِيْمِ لاَدَاءِ الرُّكْنِ الْعَظِيْمِ–

অর্থাৎ, হজ্জ হচ্ছে, একটি মহান রোকন আদায় করার জন্য পবিত্র কাবা ঘরের যিয়ারতের নিয়ত করা।

হজ্জ ফরয হওয়ার সময়কালঃ

হজ্জ কখন ফরয হয়েছিল, এ ব্যাপারে উলামাদের মাঝে ব্যাপক মতানৈক্য রয়েছে।

(১) কোন কোন আলিম বলেন, হিজরতের পূর্বে হজ্জ ফরয হয়। (তবে এই উক্তিটি দুর্বল)

(২) আল্লামা কুরতুবী (রহ.) উল্লেখ করেন যে, ৫ম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়।

(৩) ইমাম বায়হাকী (রহ.) বলেন, ৬ষ্ঠ হিজরীতে।

(৪) আল্লামা মাওয়ার্দী (রহ.) বলেন, ৮ম হিজরীতে।

(৫) কেউ কেউ বলেন, ৭ম হিজরীতে।

(৬) বিশুদ্ধ মত হলো, ইমামুল হারামাইন আবুল মাআলী আব্দুল মালিক ইবন আব্দুল্লাহ (মৃত্যুঃ ৪৭৮ হি.) বলেন, নবম হিজরীর শেষের দিকে হজ্জ ফরয হয়।

(عمدة القاري ج٩ ص١٢٢، فتح الباري ج٣ ص٣٠٠)

দলীলঃ পবিত্র কুরআনে এসেছে-

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً– (ال عمران– ٩٧)

আর এ আয়াতটি নবম হিজরীর শেষে অবতীর্ণ হয়েছিল।

فَرَائِضُ الْحَجِّ বা হজ্জের ফরযসমূহঃ হজ্জের ফরয তিনটি। যথাঃ

(১) ইহরাম বাঁধা। অর্থাৎ এমন কিছু কার্যাবলী নিজের উপর হারাম করে নেয়া, যা মূলতঃ হারাম নয়। কিন্তু হজ্জের সম্মানার্থে হাজীর জন্য হারাম ঘোষিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوْقَ وَلاَ جِدَالَ فِيْ الْحَجِّ–

অর্থাৎ, যে কেউ এ মাসগুলিতে হজ্জ করার ইচ্ছা করে, তার জন্য উক্ত সময়ে স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়। (বাকারাঃ ১৯৭)

ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন- রাসূল (সাঃ) বলেছেন-

لاَ يُجَاوِزُ اَحَدُ الْمِيْقَاتِ اِلاَّ مُحَرِّمًا–

অর্থাৎ, কেউ যেন ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম না করে।

(২) وَقُوْفُ عَرَفَةَ তথা যিলহজ্জ মাসের নবম তারিখে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে-

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ قُرَيْش وَّمَنْ دَانَ دِيْنَهَا يَقِفُوْنَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوْا يُسَمُّوْنَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرْبِ يَقِفُوْنَ بِعَرَفَةَ قَالَتْ فَلَمَّا جَاءَ الاِسْلاَمُ اَمَرَ اللهُ تَعَالٰى نَبِيَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّاْتِيَ عَرَفَاتِ فَيَقِفُ بِهَا ثُمَّ يَفِيْضُ مِنْهَا فَذٰلِكَ قَوْلُه تَعَالٰى ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ– (ابو داود ج١ ص٢٦٥ باب الوقوف بعرفة، بخاري ج١ ص٢٢٦ باب الوقوف بعرفة، ترمذي ج١ ص١٧٧ باب الوقوف بعرفات الخ، نسائي ج٢ ص٤٤ باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) বলেন, কুরায়েশরা তাদের ধর্মের অনুসরণ করে মুযদালিফাতে অবস্থান করত এবং একে বীরত্বের (প্রকাশ) হিসাবে আখ্যায়িত করত। আর আরবের অন্যান্য সমস্ত লোকেরা আরাফাতে অবস্থান করত। তিনি

(আয়িশা রাঃ) বলেন, ইসলামের আবির্ভাবের পর, আল্লাহ তাআলা নবী করীম (সাঃ)-কে আরাফাতে গমনের এবং সেখানে অবস্থানের নির্দেশ প্রদান করেন এবং সেখান হতে প্রত্যাবর্তনেরও নির্দেশ দেন। যেমন, আল্লাহ তাআলার বানী, "আর তোমরা সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন কর, যে স্থান হতে লোকেরা ফিরে আসে।"

* অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, এক লোক নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হজ্জ কিরূপ? তখন নবী করীম (সাঃ), জনৈক ব্যক্তিকে এতদসম্পর্কে ঘোষণা দিতে বললে, সে বলে-

... اَلْحَجُّ يَوْمَ عَرَفَةَ (ابو داود ج١ ص٢٦٩ باب من لم يدرك عرفة، ترمذي ج١ ص١٧٨، نسائي ج٢ ص٤٤-٤٥ فرض الوقوف العرفة، ابن ماجة ص٢٢٣)

অর্থাৎ, ... হজ্জ হল, আরাফাতে অবস্থান করা

(৩) طَوَافُ الزِّيَارَةِ তথা যিলহজ্জের ১০, ১১ অথবা ১২ তারিখ বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন- وَالْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ

অর্থাৎ, এবং তারা যেন প্রাচীন গৃহের তাওয়াফ করে। (হজ্জঃ ২৯)

* হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِيْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ عَلٰى بَعِيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ- (ابو داود ج١ ص٢٥٩ باب الطواف الواجب، مسلم ج١ ص٤١٣ باب جواز الطواف على بعير الخ، نسائي ج٢ ص٣٨ استلام الركن بالمحجن، ابن ماجة ص٢١٧)

অর্থাৎ, ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উটে সাওয়ার হয়ে (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ করেন এবং রুকনে ইয়ামানীকে (খানায়ে কাবার যে কোণায় হাজরে আসওয়াদ স্থাপিত তাকে রুকনে ইয়ামানী বলে) তাঁর হাতের লাঠির দ্বারা (ইশারায়) চুম্বন করেন।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে- •

... عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى يَعْنِيْ رَاجِعًا- (ابو داود ج١ ص٢٧٤ باب الافاضة في الحج، مسلم ج١ ص٤٢٢ باب استحباب طواف الافاضة يوم النحر)

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) তাওয়াফে ইফাদা (অর্থাৎ তাওয়াফে যিয়ারত) দশই যিল-হজ্জের দিন সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি (মক্কা হতে) প্রত্যাবর্তন করে মিনাতে যুহরের নামায আদায় করেন।

উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, মাথা মুণ্ডানো এবং সাঈ করাও ফরয।

وَاجِبَاتُ الْحَجِّ- **হজ্জের ওয়াজিবসমূহঃ** হজ্জের মধ্যে ওয়াজিব কাজ পাঁচটি। যথা-

(১) সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে ৭ বার সায়ী করা (سعي) বা দৌড়ানো। আল্লাহ তাআলা বলেন- اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ– فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا–

অর্থাৎ, নিশ্চয় সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যারা কাবা ঘরে হজ্জ বা উমরা পালন করে, তাদের পক্ষে এ দু'টিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই। (বাকারাঃ ১৫৮)

হাদীসে বর্ণিত আছে-

... عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ قَالَ ... ثُمَّ اَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَسَعٰى بَيْنَهُمَا سَبْعًا ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهٗ (ابو داود ج١ ص٢٦١ باب امر الصفا والمروة)

অর্থাৎ, ... ইসমাঈল ইবন আবু খালিদ থেকে বর্ণিত। ... অতঃপর তিনি (সাঃ) সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাতবার সাঈ করেন এবং পরে স্বীয় মস্তক মুণ্ডন করেন।

(২) মুযদালিফায় অবস্থান করা।

... عَنْ عَلِيٍّ قَالَ فَلَمَّا اَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَفَ عَلٰى قُزَحَ فَقَالَ هٰذَا قُزَحُ وَهُوَ الْمَوْقِفُ وَجَمْع كُلُّهَا مَوْقِف وَنَحَرْتُ هٰهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَر فَانْحَرُوْا فِيْ رِحَالِكُمْ– (ابو داود ج١ ص٢٦٧ باب الصلوة بجمع)

অর্থাৎ, ... আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) মুযদালিফাতে প্রভাতে কুযাহ্ নামক স্থানে অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি বলেন, এটাই 'কুযাহ' এবং এটাই অবস্থানের স্থান। আর মুযদালিফার সব স্থানই মাওকিফ (অবস্থানস্থল)। আর আমি এ স্থানে ও মিনার সর্বত্র কুরবানী করেছি, যা কুরবানীর স্থান। আর তোমরা তোমাদের কুরবানীর পশুকে মিনায় কুরবানী করবে।

(৩) জামরায় পাথর নিক্ষেপ করা।

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَفَاضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اٰخِرِ يَوْمِه حِيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ اَيَّام التَّشْرِيْق يَرْمِيْ الْجَمْرَةَ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ الخ (ابو داود ج١ ص٢٧١ باب في رمي الجمار)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কায় যুহরের নামায আদায়ের পর দিনের অর্ধাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর অতিরিক্ত তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি মিনাতে গমন করেন এবং সেখানে তাশরীকের দিনগুলো অতিবাহিত করেন। আর তিনি সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর কংকর নিক্ষেপ করেন। নবী করীম (সাঃ) প্রতি জামরাতে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর ধ্বনি (আল্লাহু আকবার) দেন।

(৪) মাথা মুন্ডন করা বা চুল কাটা। আল্লাহ তাআলার বাণী-

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ-

অর্থাৎ, আল্লাহ চান তো তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তকমুন্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়। (ফাতহঃ ২৭)

... عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ رَأْسَه فِيْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ- (ابو داود ج١ ص٢٧٢ باب الحلق والتقصير، بخاري ج١ ص٢٣٣ باب الحلق والتقصير عند الاحلال، مسلم ج١ ص٤٢١ باب تفضيل الحلق على التقصير الخ)

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিদায় হজ্জের সময় স্বীয় মস্তক মোবারক মুন্ডন করেন।

(৫) তাওয়াফে বিদা বা বহিরাগতদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ করা।

... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُوْنَ فِيْ كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْفِرَنَّ اَحَدٌ حَتّٰى يَكُوْنَ اٰخِرُ عَهْدِهٖ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ- (ابو داود ج١ ص٢٧٤ باب الوداع، ابن ماجة ص٢٢٧)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা (হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমনের পর তার হুকুম আহ্কাম সমাপনান্তে তাওয়াফে যিয়ারতের পর) প্রত্যাবর্তন করত। তখন নবী করীম (সাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ যেন শেষবারের মত তাওয়াফ (অর্থাৎ তাওয়াফে বিদা) পালন না করে প্রত্যাবর্তন না করে।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে-

. فَاَذَّنَ فِيْ اَصْحَابِه بِالرَّحِيْلِ فَارْتَحَلَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَطَافَ بِه حِيْنَ خَرَجَ ثُمَّ انْصَرَفَ مُتَوَجِّهًا اِلَى الْمَدِيْنَةِ- (ابو داود ج١ ص٢٧٥ باب طواف الوداع)

অর্থাৎ, ... তখন তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে গমনের জন্য প্রস্তুত হতে ঘোষণা দেন এবং তারা মদীনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। অতঃপর তিনি ফযরের নামাযের পূর্বে বায়তুল্লায় গমন করেন এবং মদীনার দিকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। পরে তিনি মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন।

بَاب فِي الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ ص٢٤١
মাহ্রাম* ব্যতীত মহিলাদের হজ্জে গমন

... اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُّسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ لَيْلَةٍ اِلاَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُوْ حُرْمَةٍ مِّنْهَا– (بخاري ج١ ص٢٥١ باب حج النساء، مسلم ج١ ص٤٣٣ باب سفر المرأة مع محرم الخ، ترمذي ج١ ص٢٢٠ باب كراهية ان تسافر المرأة وحدها)

অনুবাদঃ ... আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, কোন মুসলিম মহিলার জন্য কোন মাহ্রাম পুরুষ সঙ্গী ব্যতীত এক রাতের পরিমাণ দূরত্বও সফর করা বৈধ নয়।

বিশ্লেষণঃ বিত্তশালী মুসলিম মহিলা মাহ্রাম না থাকা অবস্থায় সে হজ্জ করবে কিনা- এ বিষয়ে ইমামগণের মতানৈক্য রয়েছে। যথা-
* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, মহিলার উপর হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার জন্য স্বামী অথবা মাহ্রাম সাথে থাকা শর্ত নয়। এছাড়াও হজ্জ আবশ্যক হবে। তবে শর্ত হল, পথ নিরাপদ হতে হবে এবং হজ্জের সফর এরূপ নির্ভরযোগ্য সাথীদের সাথে হতে হবে, যাদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য মহিলাও থাকবে।

(بداية المجتهد ج١ ص٢٣٥، فتح القدير ج٢ ص٣٣٠)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ্ তাআলার বাণী-

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً–

অর্থাৎ, আর এ ঘরের হজ্জ করা হলো মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য (ফরয); যে লোকের এ পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রয়েছে। (আলে-ইমরানঃ ৯৭)
উক্ত সম্বোধন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে শামিল করে। সুতরাং মহিলার যখন যাতায়াত খরচসহ অন্যান্য শর্ত পূরণ হবে, তখন তাকে সামর্থ্যবান বলে গণ্য করা হবে। আর তার সাথে যদি কোন নির্ভরযোগ্য মহিলা থাকে, যার পক্ষ থেকে ফেতনার আশংকা নেই, তখন সে মহিলা মাহ্রাম ছাড়াই হজ্জ আদায় করতে পারবে।

(تنظيم الاشتات ج٢ ص٧٣)

দলীল (২)ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন-
اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحَجُّوْا– (مسلم ج١ ص٤٣٢ باب فرض الحج مرة في العمر)

---

* শরীয়তের দৃষ্টিতে যার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম তাকে মাহ্রাম বলে। যেমনঃ পিতা, পুত্র, দাদা, চাচা, ভাই, ভাতিজা প্রভৃতি।

অর্থাৎ, হে লোক সকল! তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে, অতএব, তোমরা হজ্জ কর।

দলীল (৩)ঃ আদী ইবন হাতিম (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে প্রিয়নবী (সাঃ)-এর ইরশাদ রয়েছে-

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَيُتَمِّمُ اللهُ هٰذَا الْاَمْرَ حَتّٰى تَخْرُجَ الظَّعِيْنَةُ مِنَ الْحِيَرَةِ فَتَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فِيْ غَيْرِ جِوَارِ اَحَدٍ– (مسند احمد ج٤ ص٢٥٧)

অর্থাৎ, যার কুদরতের মুঠোয় আমার জীবন তাঁর (আল্লাহর) কসম, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই এ (দীনের) বিষয়টি পূর্ণ করে ছাড়বেন। এমনকি একজন মুসাফির মহিলা হিয়ারা থেকে বের হয়ে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করবে কারো সহযোগিতা ব্যতীত।

* ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী এবং আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী, মহিলা যদি মক্কা-মুকাররমা থেকে সফরের পরিমাণ দূরত্বে থাকে তাহলে হজ্জের সফরে স্বামী অথবা কোন মাহরাম সাথে থাকা জরুরী। আর এই শর্ত ছাড়া তাঁদের মতে হজ্জ ওয়াজিব হবে না। বরং হজ্জের সফরই জায়েয হবে না।

(بداية المجتهد ج١ ص٢٣٥، فتح القدير ج٢ ص٣٣٠، تنظيم الاشتات ج٢ ص٧٣)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ **... عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ اَنْ تُسَافِرَ فَوْقَ ثَلْثَةَ اَيَّامٍ فَصَاعِدًا اِلاَّ وَمَعَهَا اَبُوْهَا اَوْ اَخُوْهَا اَوْ زَوْجُهَا اَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ مِّنْهَا–** (ابو داود ج١ ص٢٤٢ باب في المرأة تحج بغير محرم، بخاري ج١ ص٢٥١، مسلم ج١ ص٤٣٤ باب سفر المرأة مع محرم الخ، ترمذي ج١ ص٢٢٠، ابن ماجة ص٢١٤)

অর্থাৎ, ... আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে তার তিন দিনের অধিক দূরত্ব সফর করা বৈধ নয়, যদি তার সাথে তার পিতা, তার ভাই, তার স্বামী, তার পুত্র বা কোন মাহরাম ব্যক্তি না থাকে।

দলীল (৩)ঃ **... عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا اِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ–**

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেন, কোন মহিলা যেন তিন দিনের পথ কোন মাহরাম সাথী ব্যতীত সফর না করে। (সূত্রঃ ঐ)

দলীল (৪)ঃ হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন- لاَ تَحُجَّنَّ اِمْرَأَةٌ اِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ– (دار قطني ج٢ ص٢٢٣) -
অর্থাৎ, মাহরাম ছাড়া যেন কোন মহিলা হজ্জ না করে।

দলীল (৫)ঃ যৌক্তিক প্রমাণ দ্বারাও হানাফীদের মতের সমর্থন হয়। কেননা, মাহরাম ছাড়া সফরে ফিতনার আশংকা রয়েছে। আর সাথে যদি অন্যান্য মহিলাকে তাহলে তো ফেতনার আশংকা আরো বেশি প্রবল হয়। এ কারণে পরনারীর সাথে নির্জনতা অবলম্বন করা হারাম যদিও অন্য কোন মহিলাও উপস্থিত থাকে। (فتح القدير ج٣ ص٣٣٣)

জবাবঃ প্রতিপক্ষের দলীলসমূহের জবাবে আহ্‌নাফগণ বলেন যে,
(১) আল্লাহ্ তাআলা হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেন, "مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً" তথা "যে سَبِيْل বা পাথেয়ের সামর্থ্য রাখে।" তার উপর হজ্জ ফরয। আর মহিলার জন্য সাথে মাহরাম পুরুষ থাকা সাবীল তথা পাথেয়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যখন কোন মহিলার মাহরাম থাকবে না, তখন সে হজ্জের পাথেয়ের উপর সামর্থ্যবান না হওয়ার কারণে তার উপর হজ্জ ফরয নয়।
(২) শাফেঈ ও মালিকীগণ দলীলের যে ব্যাপকতার কথা বলেছেন, তা আসলে ঠিক নয়। বরং সামগ্রিকভাবে তা কোন কোন শর্তের সাথে শর্তায়িত। যেমন, রাস্তা নিরাপদ হওয়া শর্ত। অতএব, উপরিউক্ত প্রমাণাদির ভিত্তিতে অতিরিক্ত শর্তারোপ করা হবে এবং খাস করা হবে এবং বলা হবে যে, স্বামী অথবা মাহরাম ব্যতীত মহিলার উপর হজ্জ আবশ্যক নয়। (درس ترمذي ج٣ ص٤٥٨، تنظيم الاشتات ج٢ ص٧٣)

بَاب ص٢٤٢ ঃ আরেকটি অনুচ্ছেদ (অবিলম্বে হজ্জ সম্পন্ন করা)

... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ– (ابن ماجة ص٢١٣)

অনুবাদঃ ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি হজ্জের ইচ্ছা করে সে যেন অবিলম্বে তা সম্পন্ন করে।

বিশ্লেষণঃ কারো উপর হজ্জ ফরয হওয়ার পর তা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ওয়াজিব, নাকি অবকাশের সাথে বিলম্বে আদায় করা যাবে- এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ, মুহাম্মদ, আওযায়ী এবং সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে- হজ্জ তাৎক্ষণিক আদায় করা ফরয নয়। বিলম্বে আদায় করার অবকাশ রয়েছে।

(تنظيم الاشتات ج٢ ص٦٩)

দলীল (১)ঃ হজ্জের নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও নবী করীম (সাঃ) দশম হিজরী পর্যন্ত বিলম্ব করেছেন। সুতরাং হজ্জ যদি তাৎক্ষণিকই ওয়াজিব হতো তাহলে রাসূল (সাঃ) একে দশম হিজরী পর্যন্ত বিলম্ব করতেন না।

দলীল (২)ঃ হজ্জ ফরয হওয়ার ব্যাপারে কুরআনে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, (اَتِمُّوا الْحَجَّ। অর্থাৎ তোমরা হজ্জ আদায় কর) তা اَمْر مُطْلَق (সাধারণ নির্দেশ) যা তাৎক্ষণিকভাবে পালনীয় নয়।

দলীল (৩)ঃ সালাতকে যেমন তার নির্ধারিত ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত বিলম্ব করা যায়, অনুরূপ হজ্জকেও সময়-সুযোগ পর্যন্ত বিলম্ব করা যাবে। কেননা, হজ্জ হচ্ছে সারা জীবনের একটি করণীয়। (تنظيم الاشتات ج٢ ص٦٩)

* ইমাম মালিক, আবু ইউসূফ ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হজ্জ তাৎক্ষণিক আদায় করা ওয়াজিব।
উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হতে বিলম্ব এবং তাৎক্ষণিক উভয় রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। তবে, তাৎক্ষণিকের রেওয়ায়েতটিই অধিক সহীহ।

(درس ترمذي ج٣ ص٤٤، معارف السنن ج٦ ص٢٣٨)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।
দলীল (২)ঃ হজ্জ পালন করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা কেবল সক্ষম মুসলমানদেরকেই নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর নির্দেশ তাৎক্ষণিকভাবে পালন করার মাঝেই সামগ্রিক কল্যাণ নিহিত।
দলীল (৩)ঃ হজ্জ বছরে একবার এক নির্দিষ্ট সময়ের সাথে খাস। আর এক বছরের মধ্যে মৃত্যু এসে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। সবসময় আশঙ্কা থাকে যে, বিলম্বকারী ব্যক্তিটি আগামী বছর জীবিত নাও থাকতে পারে। সুতরাং ফরয হওয়ার সাথে সাথেই তা আদায় করা উচিত। (تنظيم الاشتات ج٢ ص٦٩)

জবাবঃ প্রতিপক্ষের প্রথম দলীলের জবাবে আহনাফ ও অন্যান্য ইমামগণ বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) হজ্জকে দশম হিজরী পর্যন্ত বিলম্ব করার কয়েকটি কারণ থাকতে পারে- (১) হয়ত তখন রাসূল (সাঃ) নবুয়তের দায়িত্বে ব্যস্ত ছিলেন, (২) অথবা বিশেষ কোন ওযরের কারণে দশম হিজরী পর্যন্ত বিলম্ব করেছেন। অর্থাৎ বর্বরতার যুগে আরবের কাফিরদের মধ্যে হজ্জে নাসী তথা যুদ্ধ করার প্রয়োজনে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী হারাম মাসগুলোকে আগে-পিছে করার প্রচলন ছিল। যেহেতু ১০

হিজরীতে যিলহজ্জ মাস যথার্থ সময়ে এসেছিল, তাই তিনি দশম হিজরীর জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। (درس ترمذي ج٣ ص٤٤)

(৩) অথবা হজ্জ মৌসুমে তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন (যেমন- উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করা ইত্যাদি) সমাবেশকে নবী করীম (সাঃ) এড়িয়ে চলার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। আর তাই লক্ষ্য করা যায়, নবী করীম (সাঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন নিম্নোক্ত ঘোষণা দেয়ার জন্য যে, আগামী বছর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং কোন বিবস্ত্র ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করতে পারবে না। (৪) অথবা, অন্য কোন তাৎপর্যের কারণে আল্লাহ তাআলার নির্দেশে নবী করীম (সাঃ) দশম হিজরী পর্যন্ত হজ্জ বিলম্ব করেছিলেন। (المغني ج٣ ص٢٤٢)

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ আসলে দ্বিতীয় দলীলটি হানাফী ও অন্যান্য ইমামগণের দলীল। কেননা আয়াতে (اتموا الحج)-এ নির্দেশের (امر)-এর ছীগা আনা হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলার নির্দেশ যতদূর সম্ভব তাৎক্ষণিক আদায় করা উচিত। আর অবহেলা করতে গিয়ে কেউ যদি হজ্জ না করে মারা যায়, তবে ইজমা অনুযায়ী সে ব্যক্তি কবীরা গুনাহের দণ্ডে দণ্ডিত হবে। (التبيين ج٢ ص٣)

তৃতীয় দলীলের জবাবঃ হজ্জকে সালাতের সাথে কিয়াস করা যৌক্তিক নয়। কেননা, প্রতিটি সালাতের সময় সীমাবদ্ধ। ঐ সময়ের মধ্যে মৃত্যু ঘটলে সালাতের দায়িত্ব হতে মুক্তিলাভ ঘটবে। পক্ষান্তরে হজ্জের সীমাবদ্ধ কোন সময় নেই। সুতরাং, বিলম্বের ফলে মৃত্যুজনিত কারণে হজ্জ অসমাপ্ত থাকলে এর দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে। অতএব, সতর্কতা হিসেবে হজ্জ তাৎক্ষণিক আদায় করা ওয়াজিব হবে।

بَاب فِيْ الصَّبِيِّ يَحُجُّ ص٢٤٣ : অপ্রাপ্ত বয়স্কদের হজ্জ

... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّوْحَاءِ فَلَقِيَ رَكْبًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ فَقَالُوْا الْمُسْلِمُوْنَ فَقَالُوْا فَمَنْ اَنْتُمْ قَالُوْا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَزِعَتِ امْرَأَةٌ فَاَخَذَتْ بِعَضُدِ الصَّبِيِّ فَاَخْرَجَتْهُ مِنْ مِّحَفَّتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ لِّهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ— (مسلم ج١ ص٤٣١ باب صحة حج الصبي و اجر الخ، ترمذي ج١ ص١٨٥ حج الصبي، ابن ماجة ص٢١٤)

অনুবাদঃ ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রাওহা নামক স্থানে ছিলেন। ঐ সময় তাঁর সাথে একদল সাওয়ারীর সাক্ষাত হয়। তিনি

তাঁদের সালাম করেন এবং বলেন, তোমরা কারা? তাঁরা বলেন, আমরা মুসলিম। তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কারা? সাহাবীগণ বলেন, আল্লাহর রাসূল। তা শুনে এক মহিলা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তার ছোট বাচ্চার বাহু ধরে স্বীয় হাওদা হতে বাইরে আসেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ছেলে কি হজ্জ করতে পারে? তিনি বলেন হাঁ, এবং তোমারও সওয়াব হবে।

বিশ্লেষণঃ যাদের উপর হজ্জ ফরযঃ হজ্জ একটি শারীরিক ও আর্থিক ব্যয়বহুল ইবাদত। তাই সালাত ও সাওমের ন্যায় সার্বজনীনভাবে হজ্জ ফরয নয়; বরং কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে সামর্থ্যবান ধনাঢ্য মুমিন ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হয়ে থাকে। শর্তগুলো হলো-

১. মুসলমান হওয়া। যেহেতু ইহা ইসলামের মৌলিক একটি ইবাদত। সুতরাং অমুসলিমের উপর হজ্জ ওয়াজিব নয়।

২. স্বাধীন হওয়া। তাই দাস-দাসীর উপর ইহা ফরয নয়। কেননা নবী করীম (সাঃ) বলেন-

اَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ وَلَوْ عَشْرُ حُجَجٍ ثُمَّ عُتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْاِسْلَامِ– (تنظيم الاشتات ج٢ ص٧١)

অর্থাৎ, যদি কোন গোলাম দশবারও হজ্জ আদায় করে, অতঃপর আযাদ হয়, তবুও তাকে (সামর্থ্যবান হলে) পুনরায় ইসলামের হজ্জ আদায় করতে হবে।

৩. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া। সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা ছোট বাচ্চার উপর হজ্জ ফরয নয়। কেননা নবী করীম (সাঃ) বলেন-

اَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ اَنْ يَّحُجَّ اُخْرٰى (دار قطني، مستدرك حاكم)

অর্থাৎ, যে শিশু নাবালেগ অবস্থায় হজ্জ আদায় করেছে, বালেগ হওয়ার পর তাকে পুনরায় হজ্জ আদায় করতে হবে।

৪. জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া। সুতরাং পাগলের উপর হজ্জ ফরয নয়। কেননা নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيْرِ حَتّٰى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يَعْقِلَ اَوْ يَفِيْقَ– (ابن ماجة ص١٤٨)

অর্থাৎ, আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে, তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছেঃ ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়; নাবালেগ যতক্ষণ না সে বালেগ হয়; আর পাগল ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে জ্ঞান ফিরে পায়।

৫. সুস্থ হওয়া। তাই রুগ্ন ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয নয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِه اَذًى مِّنْ رَّأْسِه فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ

অর্থাৎ, যারা তোমাদের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়বে কিংবা মাথায় যদি কোন কষ্ট থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে রোযা রাখবে কিংবা খয়রাত দেবে অথবা কুরবানী করবে। (বাকারাঃ ১৯৬)

৬. আর্থিক সামর্থ্যবান হওয়া। অর্থাৎ, ঋণ থাকলে ঋণ পরিশোধের পর পরিবারের নিত্য প্রয়োজনীয় খরচ ব্যতীত হজ্জে রওয়ানা থেকে শুরু করে হজ্জের কাজ সম্পাদনপূর্বক বাড়ি ফেরা পর্যন্ত খরচপত্র বহন করার ক্ষমতা থাকা। কেননা, কুরআনে বলা হয়েছে- وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً

৭. হজ্জের রাস্তা নিরাপদ থাকা। সুতরাং রাস্তা নিরাপদ না থাকলে হজ্জ ফরয হবে না। যেমন, আল্লাহ তাআলার বাণী- فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ–

অর্থাৎ, আর যদি (তোমরা হজ্জ করতে) বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে কুরবানীর জন্য যা কিছু সহজলভ্য, তাই তোমাদের উপর ধার্য। (বাকারাঃ ১৯৬)

৮. মহিলাদের ক্ষেত্রে একটি অতিরিক্ত শর্ত হচ্ছে, হজ্জের সফরে স্বামী বা অন্য কোন মাহরাম পুরুষ তার সঙ্গে থাকা। (শরীয়তের দৃষ্টিতে যার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম তাকে মাহরাম বলে। যেমনঃ পিতা, পুত্র, দাদা, চাচা, ভাতিজা প্রভৃতি)। যেমন, ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন-

لاَ تَحُجَّنَّ اِمْرَأَةٌ اِلاَّ وَمَعَهَاذُوْ مَحْرَمٍ– (سنن دار قطني ج٢ ص٢٢٣)

অর্থাৎ, কোন মহিলা যেন মাহরাম ছাড়া হজ্জ না করে।

... اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُّسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ لَيْلَةٍ اِلاَّ وَمَعَهَا رَجُل ذُوْ حُرُمَةٍ مِّنْهَا– (ابو داود ج١ ص٢٤١ باب في المرأة تحج بغير محرم، بخاري ج١ ص٢٥١ باب حج النساء، مسلم ج١ ص٤٣٣ باب سفر المرأة مع محرم الخ، ترمذي ج١ ص٢٢٠ باب كراهية ان تسافر المرأة وحدها)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, কোন মুসলিম মহিলার জন্য কোন মাহরাম পুরুষ সঙ্গী ব্যতীত এক রাতের পরিমাণ দূরত্বও সফর করা বৈধ নয়।

নাবালেগ শিশুর হজ্জঃ দাউদ যাহেরী বলেন, শিশুর হজ্জ শুদ্ধ হবে এবং উক্ত হজ্জের মাধ্যমেই তার ফরয হজ্জ আদায় হয়ে যাবে, সুতরাং বালেগ হওয়ার পর নতুনভাবে তার যিম্মায় কোন হজ্জ ওয়াজিব হবে না।

(معارف السنن ج٦ ص٥٤٦، عمدة القاري ج١٠ ص٢١٦)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস। তথায় নবী করীম (সাঃ) শিশু হজ্জের প্রশ্নের উত্তরে نعم (হাঁ) বলেছেন।

* দাউদ যাহেরী ব্যতীত সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে, নাবালেগ শিশুর উপর হজ্জ ফরয নয়। অতএব, কোন নাবালেগ শিশু হজ্জ করার পর যদি বালেগ হয় এবং পরবর্তীতে তার মধ্যে হজ্জ ফরয হওয়ার অন্যান্য শর্ত পাওয়া যায়, তাহলে পুনরায় তার হজ্জ আদায় করা ফরয।

(درس ترمذي ج٣ ص١٩٨، درس مشكوة ج٢ ص٢٢٢)

দলীলঃ ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন-

اَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ عَشَرًا ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْاِسْلَامِ (مستدرك حاكم)

অর্থাৎ, যে বাচ্চা দশ বার হজ্জ করেছে, অতঃপর বালেগ হয়েছে, তাকে পুনরায় ইসলামের হজ্জ আদায় করতে হবে।

জবাবঃ (১) তাহাবী (রহ.) বলেন, স্বয়ং হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে এর বিরোধী বক্তব্য রয়েছে যে, শিশু অবস্থায় হজ্জ করার পর পুনরায় হজ্জ করতে হবে। (২) নবী করীম (সাঃ) "হাঁ" বলার দ্বারা তার ফরয আদায় হয়ে যাবে এমনটি বুঝাননি; বরং হাঁ বলে তিনি (সাঃ) শিশুকে প্রশিক্ষণের জন্য অনুমোদন দিয়েছেন।

(تنظيم الاشتات ج٢ ص٧١)

* আল্লামা নববী (রহ.) বলেন, জমহুর উলামা এবং ইমাম শাফেঈ, মালিক ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, শিশু যদি হজ্জ করে তবে তা দুরস্ত হয়ে যাবে এবং তা নফল হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু বালেগ হওয়ার পর যদি হজ্জ ফরয হয়, তাহলে এ হজ্জ যথেষ্ট নয়, বরং তাকে পুনরায় হজ্জ আদায় করতে হবে।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, শিশু যদি হজ্জ করে তবে তা শুদ্ধ হবে না; বরং এটি একটি বাড়তি ঝামেলা। তিনি আরো বলেন, নাবালেগ শিশুর উপর ইহরামের নিষিদ্ধ কাজসমূহের মধ্যে একটিও তার জন্য আবশ্যক নয়। অতএব, সে ইহরাম বাঁধার উপযোগী না হওয়ার কারণে তার ইহরামই শুদ্ধ হয়নি। তার হজ্জ শুধু এক ধরনের প্রশিক্ষণ। (شرح نووي ج١ ص٤٣٢)

কিন্তু আল্লামা বিন্নৌরী (রহ.) লিখেন, এই সম্বোধন সহীহ নয়; বরং ইমাম আবু হানিফা ও সমস্ত আহনাফ এ ব্যাপারে একমত যে, শিশুর হজ্জ গ্রহণযোগ্য এবং তার ইহরাম কার্যকর। অর্থাৎ, হানাফীদের মাযহাবও জমহুরের অনুরূপ। অবশ্য যদি সে ইহরামে নিষিদ্ধ কাজকর্ম থেকে কোনটিতে লিপ্ত হয়, তাহলে শিশু বা অভিভাবক কারো উপর দম (পশু) বা ফিদ্‌য়া ইত্যাদি দেয়া ওয়াজিব নয়। (معارف السنن ج٦ ص٥٤٦)

উল্লেখ্য যে, শিশুর যদি ভাল বুঝ জ্ঞান থাকে, তাহলে সে নিজেই হজ্জের আহ্‌কাম আদায় করবে, নতুবা অভিভাবক তার পক্ষ থেকে নিয়ত, তালবিয়া এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াবলী সম্পন্ন করবে।

তাছাড়া, কোন বাচ্চা যদি বালেগ হওয়ার পূর্বেই ইহরাম বাঁধে, অতঃপর তাওয়াফ করার পূর্বে অথবা আরাফায় অবস্থানের পূর্বে সে বালেগ হয়ে যায় এবং এমতাবস্থায় সে হজ্জ পরিপূর্ণ করে ফেলে, তাহলেও হানাফিদের মতানুসারে তাকে পুনরায় আলাদাভাবে ফরয হজ্জ আদায় করতে হবে। কিন্তু ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, উক্ত হজ্জের দ্বারা সে ফরযিয়াত থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সে পিছনের ইহরাম বাদ দিয়ে নতুন করে দ্বিতীয়বার ইহরাম বাঁধে এবং আরাফায় অবস্থান করে তাহলে হানাফিদের মতেও তার ফরয হজ্জ আদায় হয়ে যাবে।

(مبسوط سرخسي ج٤ ص١٧٣-١٧٤)

بَابُ فِيْ الْمَوَاقِيْتِ ص٢٤٣ ঃ মীকাত সমূহের বর্ণনা

... عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَالْحُلَيْفَتِ وَلاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلاَهْلِ نَجْدِ الْقَرْنَ وَبَلَغَنِي اَنَّهُ وَقَّتَ لاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمْ– (بخاري ج١ ص٢٠٦ باب ميقات اهل المدينة الخ، مسلم ج١ ص٣٧٤ باب مواقت الحج، ترمذي ج١ ص١٧١ باب مواقيت الاحرام الخ، نسائي ج٢ ص٥ المواقيت ميقات اهل المدينة،ابن ماجة ص٢١٥)

অনুবাদঃ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহফা, নাজদবাসীদের জন্য কারন্ নামক স্থানকে (হজ্জ ও উমরার) মীকাত নির্দিষ্ট করেন। রাবী বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তিনি ইয়ামনবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম নামক স্থানকে মীকাত নির্ধারণ করেন।

মীকাত (مِيْقَات) শব্দের আভিধানিক অর্থঃ

مِيْقَات শব্দটি مِفْعَال-এর ওজনে وقت মূলধাতু থেকে নির্গত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হলঃ

১. اَلْوَقْتُ - সময়

২. اَلْوَعْدُ - প্রতিশ্রুতি। যেমন- اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا

৩. اَلْمَكَانُ الْمُعَيَّنُ - নির্দিষ্ট স্থান। এর বহুবচন হল مَوَاقِيْت

শব্দটির প্রয়োগ পবিত্র কুরআনেও পাওয়া যায়- اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا

অর্থাৎ, নিশ্চয় বিচার দিবস নির্ধারিত রয়েছে। (নাবাঃ ১৭)

মীকাতের পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

১। শরীয়তের পরিভাষায় মীকাত বলা হয়-

هُوَ الْمَكَانُ الَّذِيْ يَحْرُمُ الْحُجَّاجُ وَالْمُعْتَمِرُوْنَ مِنْهُ وَلَا يَجُوْزُ التَّجَوُّزُ عَنْهَا بِغَيْرِ اِحْرَامٍ-

অর্থাৎ, মীকাত বলা হয় ঐ স্থানকে যে স্থান হতে হজ্জ ও উমরাকারীগণ ইহরাম বেঁধে থাকেন এবং যে স্থানটি ইহরাম ব্যতীত অতিক্রম করা যায় না।

২। কেউ কেউ বলেন, যে স্থান হতে হজ্জে গমনেচ্ছু লোকদেরকে ইহরাম বাঁধতে হয় সে স্থানকে মীকাত বলে।

৩। কারো কারো মতে, যে পাঁচটি স্থান ইহরাম বাঁধার জন্য নির্দিষ্ট, তাকেই মীকাত বলা হয়।

৪। হজ্জ ও উমরার জন্য ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থানকে মীকাত বলে।

মীকাতের সংখ্যাঃ যারা মক্কার বাইরে থেকে হজ্জ ও উমরা করার জন্য ইচ্ছা করবে তাদের জন্য নবী করীম (সাঃ) ৫টি স্থানকে মীকাত হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

১. যুল হুলাইফাঃ ইহা মদীনাবাসী এবং মদীনার পথে আগমনকারী লোকদের জন্য। ইহা সবচেয়ে দূরবর্তী মীকাত। মদীনা থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে অবস্থিত।

২. জুহ্‌ফাঃ সিরিয়াবাসী এবং সিরিয়ার পথে (যেমন মিসর) আগমনকারী লোকদের জন্য।

৩. কারনুল মানাযিলঃ ইহা নজদবাসী এবং নজদের পথে আগমনকারী লোকদের জন্য।

৪. ইয়ালামলামঃ ইহা ইয়ামান, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান তথা পূর্বাঞ্চলীয় লোকদের জন্য।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

৫. যাতে ইরাকঃ ইরাকবাসী এবং ইরাকের পথে আগমনকারী লোকদের জন্য।

দলীলঃ ... عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِاَهْلِ الْعِرَاقِ

ذَاتَ عِرْقٍ– (ابو داود ج١ ص٢٤٣، بخاري ج١ ص٢٠٧ باب ذات عرق لاهل العراق، مسلم ج١ ص٣٧٥، نسائي ج٢ ص٦ ميقات اهل العراق، ابن ماجة ص٢١٥)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরাকবাসীদের জন্য 'যাতু ইরক'কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন।

* তাছাড়া আরো দুই প্রকার মীকাত রয়েছে-

১. হিল্ল (حِلّ)ঃ যারা হারামের বাইরে অথচ মীকাতসমূহের ভিতরে বসবাস করে, তাদের মীকাত হচ্ছে "হিল্ল"।
২. হারাম শরীফঃ যারা মক্কাবাসী তথা হারামের অভ্যন্তরে বসবাস করে তাদের জন্য হজ্জের মীকাত হল হেরেম শরীফ। আর উমরার মীকাত হল হিল্ল।

* ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করে মক্কায় প্রবেশ করা যাবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছেঃ
ইমাম শাফেঈ, মালিক, যহুরী, হাসান বসরী এবং আহলে যাহিরের মতে, যে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরা করার নিয়ত করবে তার জন্য ইহরাম ব্যতীত প্রবেশ করা জায়েয নয়। কিন্তু যে হজ্জ ও উমরার নিয়ত করবে না তার জন্য ইহরাম বাঁধার প্রয়োজন নেই। বিনা ইহরামে প্রবেশ করা জায়েয। (تنظيم الاشتات ج٢ ص٧٣)

দলীল (১)ঃ হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত-
... قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ اَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ اَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ– (بخاري ج١ ص٢٠٦ باب مهل اهل الشام، مسلم ج١ ص٣٧٤ باب مواقيت الحج)
অর্থাৎ, ... রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, উল্লিখিত স্থানসমূহ হজ্জ ও উমরার নিয়তকারী সে স্থানের অধিবাসী এবং সে সীমারেখা দিয়ে অতিক্রমকারী অন্যান্য এলাকার অধিবাসীদের জন্য ইহরাম বাঁধার স্থান।
উক্ত হাদীস থেকে জানা যায় যে, যারা হজ্জ বা উমরা করার ইচ্ছা পোষণ করে না তাদের ক্ষেত্রে মীকাত প্রযোজ্য নয়। সুতরাং তাদের ইহরাম বাঁধারও প্রয়োজন নেই।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الاَنْصَارِي اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عَمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ– (مسلم ج١ ص٤٣٩ باب جواز دخول مكة بغير احرام، نسائي ج٢ ص٢٩ دخول مكة بغير احرام)
অর্থাৎ, ... জাবির ইবন আব্দুল্লাহ আল-আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। মহানবী (সাঃ) মক্কা বিজয়ের দিন বিনা ইহরামে কালো পাগড়ী মাথায় মক্কায় প্রবেশ করেন।
এতেও বুঝা যায় যে, সেদিন যেহেতু মহানবী (সাঃ) মক্কায় হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে নয় বরং মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেন এজন্য তিনি ইহরাম বাঁধেননি।
(تنظيم الاشتات ج٢ ص٧٤)

* ইমাম আবু হানিফা, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী, লাইস, আতা (রহ.) ও অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেঈগণের মতে, হজ্জ বা উমরার নিয়ত করুক বা না করুক সর্বাবস্থায়

ইহরাম বেঁধে মক্কায় প্রবেশ করা ওয়াজিব। ইহরাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করা জায়েয নয়। দলীল-

... عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا يُجَاوِزُ اَحَدُ الْمِيْقَاتِ اِلاَّ مُحْرِمًا–

(مصنف ابن ابي شيبت)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, কেউ যেন ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম না করে।

দলীল (২)ঃ –اَنَّهُ رَأَى اِبْنَ عَبَّاسٍ يَرُدُّ مَنْ جَاوَزَ الْمِيْقَاتِ غَيْرَ مُحْرِمٍ

অর্থাৎ, ইবন আব্বাস (রাঃ) আরো বলেন, যে ব্যক্তি ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করবে তাকে ফেরত পাঠানো হবে। (সূত্রঃ ঐ)

উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে ইহরামের কথা হজ্জ বা উমরাকারীকে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি।

দলীল (৩)ঃ তাছাড়া মীকাতের নির্দেশটি মূলতঃ কাবা ঘরের সম্মান প্রদর্শনে বলা হয়েছে। সুতরাং হজ্জ অথবা উমরা পালনের নিয়ত করুক বা না করুক সবার উচিত কাবা ঘরের সম্মান করা। (تنظيم الاشتات ج٢ ص٧٤)

জবাবঃ আহনাফগণ প্রতিপক্ষের জবাবে বলেন-

(১) لِمَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ -একথা দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা হজ্জ বা উমরা করতে চায় তাদের জন্য মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা ফরয। কিন্তু যারা হজ্জ বা উমরা করতে ইচ্ছা পোষণ করবে না তাদেরকে ইহরাম বাঁধতে হবে না এমন কোন কথাও হাদীসে উল্লেখ নেই। সুতরাং مَفْهُوْم مُخَالِف (বিপরীত অর্থ)-কে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা উচিত হবে না।

(২) দ্বিতীয় হাদীসের জবাবে বলা যায় যে, স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

اَنَّ مَكَّةَ حَرَام لَمْ تَحِلُّ لاَحَدٍ قَبْلِيْ وَلاَ لاَحَدٍ بَعْدِيْ اِنَّمَا حَلَّتْ لِيْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ عَادَتْ حَرَامًا يَعْنِيْ الدُّخُوْلَ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ– (درس مشكوة ج٢ ص٢٢٤)

অর্থাৎ, মক্কা হারাম নগরী। ইহা আমার পূর্বে কারও জন্য হালাল ছিল না। আমার পরেও কারো জন্য হালাল করা হবে না। কেবল মক্কা বিজয়ের দিনে কিছু সময়ের জন্য হালাল করা হয়েছে। আবার হারাম হয়ে গেল। অর্থাৎ ইহরাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করা হারাম।

অতএব ঐ দিনের উপর অনুমান করা সঠিক নয়। কেননা এটা ছিল নবী করীম (সাঃ)-এর জন্য খাস।

بَابُ فِيْ اِفْرَادِ الْحَجِّ ص٢٤٧ ঃ হজ্জে ইফরাদ

... عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوِدَاعِ فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَّمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ وَّعُمْرَةٍ وَّمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَاَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ وَاَمَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ اَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوْا حَتّٰى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ– (بخاري ج١ ص٢١٢ باب التمتع والاقران والافراد الخ)

অনুবাদঃ ... নবী করীম (সাঃ)-এর স্ত্রী আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে (মদীনা হতে) রওনা হলাম। আমাদের কেউ উমরার ইহরাম বাঁধে, কেউ হজ্জ ও উমরার একত্রে ইহরাম বাঁধে এবং কেউ হজ্জের ইহরাম বাঁধে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শুধু হজ্জের ইহরান বাঁধেন। আর যাঁরা শুধু হজ্জের অথবা একত্রে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধে তারা কুরবানীর দিন পর্যন্ত ইহরাম খুলতে পারেনি।

হজ্জের প্রকারভেদঃ ইসলামী শরীয়তে হজ্জ তিন প্রকার। যথা-

১। হজ্জে ইফরাদ (اَلْحَجُّ الاِفْرَاد)

২। হজ্জে তামাত্তো (اَلْحَجُّ التَّمَتُّع)

৩। হজ্জে কিরান (اَلْحَجُّ الْقِرَان)

ইফরাদ হজ্জের বর্ণনাঃ اِفْرَاد শব্দটি فرد থেকে বাবে اِفْعَال-এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- একাকী হওয়া, কোন শরীক না হওয়া, পৃথককরণ, চিহ্নিতকরণ, আলাদাকরণ ইত্যাদি। যেমন, পবিত্র কুরআনে এসেছে- رَبِّ لاَ تَذَرْنِيْ فَرْدًا অর্থাৎ, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একা রেখো না। (আম্বিয়াঃ ৭৯)

পরিভাষায় ইফরাদ হচ্ছে- هُوَ الاِهْلاَلُ بِالْحَجِّ وَحْدَه فِيْ اَشْهُرِه অর্থাৎ, হজ্জের মাসে মীকাত হতে শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধে এর কাজ সমাধা করাকে হজ্জে ইফরাদ বলা হয়।

اَلْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ هُوَ الَّذِيْ يَحْرُمُ بِالْحَجِّ لاَ غَيْرَ– (بدائع الصنائع ج٢ ص١٦٧)

অর্থাৎ, হজ্জে ইফরাদকারী হলেন, যিনি শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধেন, অন্য কিছুর নয়।

কিরান হজ্জের বর্ণনাঃ قِرَان শব্দটি قرن থেকে বাবে ضَرَبَ يَضْرِبُ -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ তথা দুটি বস্তুকে একত্রিত করা। মিলন, সংযোগ, সম্পৃক্ততা, যুক্ত করা ইত্যাদি। এজন্যই আরবীতে সঙ্গীকে قَرِيْن বলা হয়। যেমন, পবিত্র কুরআনে এসেছে- نُقَيِّضْ لَه شَيْطٰنًا فَهُوَ لَه قَرِيْن

অর্থাৎ, "আমি তার জন্যে এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই। অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী।" (যুখরুফঃ ৩৬)

পরিভাষায় কিরান হচ্ছে-

هُوَ اَنْ يُّحْرِمَ الْحَاجُّ مِنَ الْمِيْقَاتِ لِلْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ جَمِيْعًا– (بدائع الصنائع ج٢ ص١٦٧)

অর্থাৎ, মীকাত হতে হজ্জ ও উমরা উভয়টির নিয়তে ইহরাম বেঁধে মাঝখানে হালাল হওয়া ব্যতীত উভয়টির কাজ সম্পন্ন করা।

এর আরেকটি পদ্ধতি হলঃ মীকাত হতে শুধু উমরার ইহরাম বাঁধবে, কিন্তু উমরার কার্যাবলী হতে ফারেগ হওয়ার পূর্বেই যদি হজ্জের ইহরাম বেঁধে নেয়, তাহলে তাও হজ্জে কিরান হিসেবে পরিগণিত হবে।

তামাত্তু হজ্জের বর্ণনাঃ تَمَتُّع শব্দটি متع থেকে বাবে تَفَعُّل -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে উপকৃত হওয়া, উপভোগ করা, কোন বস্তু হতে ফায়দা গ্রহণ করা। যেমন, কুরআনে এসেছে- كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلاً অর্থাৎ, (কাফেরগণ!) তোমরা কিছুদিন খেয়ে নাও এবং ভোগ করে নাও। (মুরসালাতঃ ৪৬)

আর পরিভাষায় তামাত্তু হচ্ছে-

هُوَ اَنْ يُّهِلَّ مِنَ الْمِيْقَاتِ لِلْعُمْرَةِ اَوَّلاً ثُمَّ اَنْ يُّحِلَّ ثُمَّ اَنْ يُّحْرِمَ لِلْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ–

অর্থাৎ, মীকাত হতে প্রথমে উমরার ইহরাম বেঁধে উমরার কাজ সমাপ্ত করা। অতঃপর হালাল হয়ে যাওয়া এবং যিলহজ্জ মাসের ৮ম তারিখে হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জের কাজ সম্পন্ন করাকে হজ্জে তামাত্তু বলা হয়।

উত্তম হজ্জ সংক্রান্ত মতবিরোধঃ উল্লেখ্য যে, উপরোল্লিখিত তিন প্রকার হজ্জের মধ্যে সব কয়টিই জায়েয। তবে এগুলোর মধ্যে কোন্‌টি সর্বোত্তম, এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছেঃ

* ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে, তামাত্তু হজ্জ সর্বোত্তম, অতঃপর ইফরাদ, অতঃপর কিরান হজ্জ। (شرح المهذب ج٧ ص١٦٠)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা হজ্জ ও উমরা একত্রে পালন করতে চায়, তবে যা কিছু সহজলভ্য, তা দিয়ে কুরবানী করবে। (বাকারাঃ ১৯৬)

দলীল (২)ঃ ... عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ الخ (ابو داود ج١ ص٢٥١ باب في الاقران، بخاري ج١ ص٢٢٩ باب من سعق الهدن معه، مسلم ج١ ص٤٠٣ باب جواز الدم على المتمتع الخ، نسائي ج٢ ص١٤ التمتع)

অর্থাৎ, ... সালিম ইবন আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিদায় হজ্জে তামাত্তু হজ্জ করেন, অর্থাৎ হজ্জের পূর্বে উমরা করেন।

দলীল (৩)ঃ

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ تَمَتَّعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَمَتَّعْنَا مَعَه– (بخاري ج١ ص٢١٣ باب التمتع على عهد النبي، مسلم ج١ ص٤٠٣ باب جواز التمتع، نسائي ج٢ ص١٥)

অর্থাৎ, ইমরান ইবন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) তামাত্তু হজ্জ করেন এবং আমরাও তাঁর সাথে তামাত্তু হজ্জ করি।

সুতরাং নবী করীম (সাঃ) যেহেতু তামাত্তু হজ্জ আদায় করেন, অতএব, হুজুর (সাঃ) যা করেছেন তাই উত্তম।

দলীল (৪)ঃ ... عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ قَالَ مُحَمَّد اَحْسِبُه قَالَ وَلَحَلَلْتُ مَعَ الَّذِيْنَ اَحَلُّوْا مِنَ الْعُمْرَةِ ... وَفِيْ رِوَايَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ... قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلاَ هَدْيِ لَحَلَلْتُ الخ (ابو داود ج١ ص٢٤٩ باب في افراد الحج، بخاري ج١ ص٢٢٤، باب تقضي الحائض المناسك كلها، مسلم ج١ ص٣٩٢ باب بيان وجوه الاحرام الخ، نسائي ج٢ ص١٣)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যা আমি পরে জানতে পেরেছি যদি তা আগে জানতে পারতাম তবে আমার সাথে কুরবানীর পশু আনতাম না। রাবী মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া বলেন, আমার ধারণা (আমার শায়খ উসমান ইবন উমর) বলেছেন, যারা উমরা সমাপনের পর হালাল হয়েছে, আমিও তাদের সাথে হালাল হতাম ... অন্য রেওয়ায়েতে হযরত জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, ... নবী করীম (সাঃ) বলেন, যদি আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকত তবে আমিও হালাল হতাম।

সুতরাং উক্ত হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, নবী করীম (সাঃ) তামাত্তু হজ্জের আশা পোষণ করেছেন। সুতরাং, তাই উত্তম।

* ইমাম মালিক ও শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, ইফরাদ হজ্জ সর্বোত্তম। অতঃপর তামাত্তু, তারপর কিরান হজ্জ। (فتح الباري ج٣ ص٢٤٠)

দলীল (১)ঃ ... عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْرَدَ الْحَجَّ– (ابو داود ج١ ص٢٤٧ باب افراد الحج، مسلم ج١ ص٣٨٩ باب وجوه الاحرام وانه يجوز افراد الحج الخ، ترمذي ج١ ص١٦٩ باب افراد الحج، نسائي ج٢ ص١٢ افراد الحج، ابن ماجة ص٢١٩)

অর্থাৎ, আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হজ্জে ইফরাদ আদায় করেন।

দলীল (২)ঃ .. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ اَهْلَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا ... (ابو داود ج١ ص٢٤٩، مسلم ج١ ص٤٠٤ باب في الافراء والقران)

অর্থাৎ, ... জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে কেবলমাত্র হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।

দলীল (৩)ঃ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجٍّ لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ– (كنز العمال ج٥ ص٨٣)

অর্থাৎ, জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) হজ্জের ইহরাম বেঁধেছেন, এর সাথে উমরা ছিল না।
সুতরাং উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, ইফরাদ হজ্জ উত্তম।

* ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক ও ইবন মুনযির (রহ.)-এর মতে, হজ্জে কিরান সর্বোত্তম। অতঃপর তামাত্তু, তারপর ইফরাদ।

(المغني ج٣ ص٢٣٢، شرح المهذب ج٧ ص١٥٩، المعارف للبنوري ج٦ ص٢٧٣)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- اَتِمُّوْا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা সম্পন্ন পালন কর। (বাকারাঃ ১৯৬)

দলীল (২)ঃ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُمْ سَمِعُوْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيْعًا يَقُوْلُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَّحَجًّا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا– (ابو داود ج١ ص٢٥٠ باب في الاقران، بخاري ج١ ص٢٣١ باب نحر البدن قائمة، مسلم ج١ ص٤٠٤ باب في الافراد والتراه، ترمذي ج١ ص١٦٩ باب الجمع بين الحج والعمرة، نسائي ج٢ ص١٤ القران)

অর্থাৎ, ... আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁরা (ইয়াহইয়া, আব্দুল আযীয প্রমুখ) তাকে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে হজ্জ ও উমরার জন্য একত্রে তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি। তিনি বলতেন, لَبَّيْكَ - আমি হজ্জ ও উমরার জন্য (হে আল্লাহ) তোমার সমীপে হাজির।

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ الصُّبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ اَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا فَقَالَ عُمَرُ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– (ابو داود ج١ ص٢٥٠، نسائي ج٢ ص١٣، ابن ماجة ص٢١٩)

অর্থাৎ, ... আবু ওয়ায়েল (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল সুবাই ইবন মাবাদ বলেছেন, আমি একত্রে হজ্জ ও উমরার জন্য ইহরাম বাঁধি। উমর (রাঃ) আমাকে বলেন, তুমি তোমার নবীর সুন্নত পেয়ে গেছ।

দলীল (৪)ঃ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَهِلُّوْا يَا اٰلَ مُحَمَّدٍ بِعُمْرَةٍ فِيْ حَجٍّ– (شرح معاني الآثار ج١ ص٣٢١، مجمع الزوائد ج٣ ص٢٣٥)

অর্থাৎ, হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-কে ইরশাদ করতে শুনেছি, হে মুহাম্মদের পরিবার-পরিজন! তোমরা হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধ।

এতে বুঝা যায়, মহানবী (সাঃ) যেহেতু স্বীয় পরিবার-পরিজনকে কিরানের হুকুম দিয়েছেন, অতএব তিনি নিজেও কিরান হজ্জ আদায়কারী ছিলেন।

দলীল (৫)ঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত-

اَهْلَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُمْرَةٍ فِيْ حَجَّةٍ– (بخاري ج١ ص٢٢٩ باب من ساق الهدن معه، مسلم ج١ ص٤٠٤ باب وجوب الدم على المتمتع، ابن ماجة ص٢١٩)

অর্থাৎ, আমি নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধি।

দলীল (৬)ঃ হযরত বারা ইবন আযিব এবং আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেন- وَلٰكِنِّيْ سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ– (نسائي ج٢ ص١٣٢)

অর্থাৎ, তবে আমি কুরবানীর পশু নিয়ে এসেছি এবং কিরান করেছি।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং কিরান হজ্জ আদায়কারী ছিলেন। আর তিনি যা করেছেন, তা উত্তম হিসেবেই আদায় করেছেন। সুতরাং হানাফী মতানুযায়ী কিরান হজ্জ যে উত্তম তা প্রমাণিত হল। উল্লেখ্য যে, উদাহরণস্বরূপ এখানে মাত্র কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা নবী করীম (সাঃ) যে কিরান হজ্জ আদায়কারী ছিলেন তা বিশ জনেরও অধিক

সাহাবা (রাঃ) দ্বারা প্রমাণিত আছে। এমনকি হযরত আনাস (রাঃ) থেকে ১৬ জন রাবী রেওয়ায়েত করেছেন যে, বিদায় হজ্জে নবী করীম (সাঃ) কিরান হজ্জ আদায়কারী ছিলেন। (معارف السنن ج٦ ص٢٨٣-٢٨٤)

আকলী দলীলঃ ইবন কুদামা বলেন, হজ্জে কিরান পালন করা অধিক কষ্টকর। কেননা, এতে একই ইহরামে একই সফরে দুটি ইবাদত করা হয়- যা তামাত্তু বা ইফরাদে নেই। তাই বলা হয়, **اَفْضَلُ الاَعْمَالِ اَشَقُّهَا** অর্থাৎ, উত্তম আমল তাই, যা অধিক কষ্টকর। অপরদিকে নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন-

اَجْرُكُمْ عَلَى قَدْرِ نُصُبِكُمْ- (بخاري ج١ ص٢٤٠ باب أجر العمرة على قدر النصب)

অর্থাৎ, তোমাদের কষ্ট অনুপাতে তোমাদের সওয়াব হবে।

জবাবঃ ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের প্রদত্ত দলীলসমূহের জবাবঃ

(১) শায়খ ইবন হুমাম (রহ.) বলেন, পবিত্র কুরআন শরীফ ও সাহাবায়ে কিরামের পরিভাষায় তামাত্তু শব্দটি দ্বারা কিরানই উদ্দেশ্য। (تنظيم الاشتات ج٢ ص٨)

(২) আল্লামা তিব্বী (রহ.) বলেন, যে সকল হাদীসসমূহে তামাত্তু শব্দের উল্লেখ রয়েছে, তথায় তামাত্তু দ্বারা **تمتع لغوى** বা আভিধানিক তামাত্তু উদ্দেশ্য, **تمتع شرعي** উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ, উমরার সাথে হজ্জকে মিলিয়ে উভয়টিকে একই সফরে আদায় করে সুবিধা লাভ করা, যাতে প্রত্যেকটি আলাদাভাবে আদায় করতে না হয়। কেননা, তামাত্তু শব্দের অর্থই হল অন্য বস্তু থেকে সুবিধা পাওয়া। (درس مشكوة ج٢ ص٢٢٩)

ইমাম আহমদ (রহ.) যে আয়িশা (রাঃ) ও ইমরান বিন হুছাইন থেকে তামাত্তু-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, তাদের উভয় থেকেই কিরানের রেওয়ায়েতও বর্ণিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের রেওয়ায়েতে **تمتع**-এর যে শব্দ রয়েছে, এর দ্বারা কিরান হজ্জ বুঝানো হয়েছে। (تنظيم الاشتات ج٢ ص٨٠)

(৩) তাছাড়া আরো বলা যায় যে, রাবী নবী করীম (সাঃ)-কে "**يُلَبِّيْكَ بِعُمْرَةٍ**" বলতে শুনে এ ধারণা করে নিলেন যে, নবী করীম (সাঃ) তামাত্তু হজ্জ সম্পন্নকারী ছিলেন। অথচ **لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ** কিরান হজ্জ সম্পন্নকারীরও তালবিয়া। কেননা, কিরান হজ্জ আদায়কারীর জন্য তিন ধরনের তালবিয়া পাঠ করা জায়েয-

ক. لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ

খ. لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ

গ. لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ عُمْرَةٍ (معارف السنن ج٦ ص٢٨٣)

(৫) ইমাম আহমদ (রহ.)-এর ৪র্থ দলীলের জবাবে বলা যায়, জাহেলি যুগে হজ্জের মাসসমূহে উমরা করার প্রচলন ছিল না। তাই নবী করীম (সাঃ) তাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুপ্রথাকে ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে উপরিউক্ত প্রত্যাশাটি করেছেন। সুতরাং ইহা সর্বোত্তম হওয়ার দলীল হতে পারে না।

ইমাম মালিক ও শাফেঈ (রহ.)-এর প্রদত্ত দলীলসমূহের জবাবঃ

(১) আয়িশা (রাঃ) ও প্রমুখ রেওয়ায়েত হতে ইফরাদ হজ্জের যে বর্ণনা এসেছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল- হজ্জ ফরয হওয়ার পর নবী করীম (সাঃ) মাত্র একবার আদায় করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি (সাঃ) উমরা আদায় করেছেন চারবার।

(২) অথবা, হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল-

فَعَلَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ– (العرف ص٣١٤ والفتح ج٣ ص٢٦٠)

অর্থাৎ, উমরা ও হজ্জের মাঝখানে হালাল হওয়া ব্যতীত একই ইহরামে তিনি আদায় করেছেন, যা পবিত্র কুরআনের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে।

(৩) অথবা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, নবী করীম (সাঃ) ইফরাদ হজ্জের অনুমোদন দিয়েছেন এই উদ্দেশ্যে নয় যে, নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং ইফরাদ হজ্জ আদায় করেছেন।

(৪) অথবা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, فَعَلَ مَسَاسِكَ الْحَجِّ مُسْتَقِلاً অর্থাৎ, পৃথকভাবে তিনি হজ্জের কার্যাদি সম্পাদন করেছেন। এর অর্থ এটা নয় যে, হজ্জে ইফরাদ করেছেন।

(৫) অথবা, বর্ণনাকারী "لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ" শুনে ধারণা করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) ইফরাদের নিয়ত করেছেন। বাস্তবে এ তালবিয়া কিরান হজ্জ আদায়কারীর জন্যেও পড়া বৈধ। সুতরাং নবী করীম (সাঃ) কিরান হজ্জই আদায় করেছেন।

(৬) ইমাম শাফেঈ ও মালিক (রহ.) হযরত জাবির (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন, এর জবাবে আহনাফগণ বলেন, "উক্ত হাদীস দ্বারাও ইফরাদ প্রমাণিত হয় না। কারণ উক্ত হাদীসেই পরের অংশে বর্ণিত আছে, "যিলহজ্জের চার রাত অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা মক্কায় উপনীত হই এবং তাওয়াফ ও সায়ী করি। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে হালাল হওয়ার নির্দেশ দেন।"

(ابو داود ج١ ص٢٤٩)

কিরান হজ্জ উত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে আরো কতিপয় কারণ-

১. কিরান হজ্জের রেওয়ায়েত ইফরাদ ও তামাত্তু-এর তুলনায় অনেক বেশি।

২. যে সকল সাহাবী (রাঃ) হতে ইফরাদের রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। তাঁদের থেকে কিরানেরও রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। যেমন হযরত ইবন উমর, হযরত আয়িশা (রাঃ) প্রমুখ। কিন্তু এরূপ সাহাবীর সংখ্যা অনেক, যাদের থেকে শুধু কিরান বর্ণিত আছে। যেমন- হযরত আনাস, উম্মে সালামা (রাঃ) প্রমুখ।

৩. ইফরাদের সকল হাদীস فِعْلِيٌّ (কর্মমূলক), পক্ষান্তরে কিরানের হাদীসসমূহ فِعْلِيٌّ এবং قولي (বাচনিক) উভয়টি আছে। আর قولي হাদীস فِعْلِيٌّ হাদীসের মোকাবিলায় প্রাধান্য লাভ করে।

৪. ইফরাদ এবং তামাত্তুর ক্ষেত্রে সহজেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যায়। কিন্তু কিরানের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কোন সম্ভাবনা নেই।

৫. কোন রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) থেকে প্রমাণিত নেই যে, তিনি 'ইফরাদ করেছি' (افردتُ) অথবা 'তামাত্তু করেছি' (تمتعتُ) বলেছেন। কিন্তু হযরত বারা বিন আযেব ও আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে 'কিরান করেছি' (قرنتُ) শব্দ স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ রয়েছে।

৬. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, ইফরাদের হাদীস না-সূচক আর কিরানের হাদীস হাঁ-সূচক । অতএব পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সময় হাঁ-সূচক হাদীস অগ্রাধিকার পাবে। সুতরাং কিরান হজ্জ যে সর্বোত্তম তা প্রমাণিত হলো।

(درس ترمذي ج٣ ص٧٦، تنظيم الاشتات ج٢ ص٨٠)

بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِه– ص٢٥٢

যে ব্যক্তি অন্যের পক্ষে (বদলী) হজ্জ করে

... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاس قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاس رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِّنْ خَشْعَمَ تَسْتَفْتِيْهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا وَتَنْظُرُ اِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَرِّفُ وَجْهَ الْفَضْلِ اِلَى الشِّقِّ الآخَرِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِهِ فِيْ الْحَجِّ اَدْرَكَتْ اَبِيْ شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَّثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذٰلِكَ فِيْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ– (بخاري ج١ ص٢٥٠ باب الحج المرأة عن الرجل، مسلم ج١ ص٤٣١ باب الحج عن

العاجز الخ، ترمذي ج۱ ص۱۸۵ باب الحج عن الشيخ الكبير والميت، نسائي ج۲ ص۳ الحج عن الحي الذي لا يستمسك عن الرحل، ابن ماجة ص۲۱٤)

অনুবাদঃ ... আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ফাযল ইবন আব্বাস (রাঃ) একই বাহনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিলেন। এ সময় খাসআম গোত্রের জনৈক মহিলা তাঁর নিকট ফাতওয়া গ্রহণের জন্য আসে। তখন ফাযল (রাঃ) মহিলার প্রতি এবং মহিলা ফাযলের প্রতি তাকাতে থাকলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফাযলের মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেন। মহিলা জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তাআলার বান্দাদের উপর তাঁর ফরযকৃত হজ্জ আমার পিতার উপর এমন অবস্থায় ফরয হয়েছে যে, বার্ধক্যের কারণে তার পক্ষে বাহনে স্থির হয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। আমি কি তার পক্ষে (বদলী) হজ্জ করতে পারি? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আর এটা ছিল বিদায় হজ্জের সময়কার ঘটনা।

বিশ্লেষণঃ ইবাদত তিন প্রকার। যথা-

(১) عِبَادَت بَدَنِيَّة مَحْضَة শুধুমাত্র শারীরিক ইবাদত। যেমন- নামায, রোযা। সুস্থ বা অসুস্থ কোন অবস্থাতেই এতে نِيَابَة বা প্রতিনিধিত্ব জায়েয নয়।

(২) عِبَادَت مَالِيَة مَحْضَة শুধুমাত্র আর্থিক ইবাদত। যেমন, যাকাত। এতে সুস্থ ও অসুস্থ সর্বাবস্থায় প্রতিনিধি বানানো জায়েয আছে।

(৩) عِبَادَت بَدَنِيَة وَمَالِيَة শারীরিক এবং আর্থিক সংশ্লিষ্ট ইবাদত। যেমন, হজ্জ। শক্তি-সামর্থ থাকা অবস্থায় এতে প্রতিনিধিত্ব জায়েয নয়, কিন্তু আমৃত্যু অক্ষমতা বা অতিশয় বৃদ্ধের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব জায়েয আছে।

(درس ترمذي ج۲ ص٤۹۱–٤۹۳، الهداية ج۱ ص۲۹۷)

প্রথম আলোচনাঃ

বদলী হজ্জের বিধানঃ বদলী হজ্জ আদায় করা জায়েয কিনা, এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক ও লাইস (রহ.)-এর মতে, যদি মৃত ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে হজ্জের ওসিয়ত করে থাকে, তাহলে তার এই ওসিয়তকৃত হজ্জ এক তৃতীয়াংশ সম্পদে বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু কোন জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ আদায় করা জায়েয নয়। (عمدة القاري ج۱۰ ص۲۱۳)

দলীল (১)ঃ ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اِمْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَبِيْهَا مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَالَ حُجِّيْ عَنْ اَبِيْكِ– (نسائي ج۲ ص۳ ابحج عن الميت الذي لم يحج)

অর্থাৎ, ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে তার পিতা সম্পর্কে প্রশ্ন করল যে, তিনি হজ্জ না করেই ইন্তেকাল করেছেন। নবী করীম (সাঃ) বলেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় কর।

দলীল (২)ঃ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اِمْرَأَةً نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ فَاَتَى اَخُوْهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلٰى اُخْتِكَ دَيْنٌ اَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضُوْا اللّٰهَ فَهُوَ اَحَقُّ بِالْوَفَاءِ– (نسائي ج٢ ص٣ الحج عن الميت الذي نذر ان يحج)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একজন মহিলা হজ্জ মান্নত করেছিল, কিন্তু সে মৃত্যুবরণ করল (হজ্জ আদায় করতে পারল না)। এরপর তার ভাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এসে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, তুমি কি মনে কর, যদি তোমার বোনের দেনা থাকত তুমি তা আদায় করতে? সে বলল, হাঁ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তাহলে আল্লাহর হকও আদায় কর, কেননা তা আদায় করার অধিক দাবি রাখে।

* ইবরাহীম নাখঈ (রহ.)-এর মতে, হজ্জে কোন স্থলাভিষিক্ততা নেই। তিনি হজ্জকে নামায ও রোযার উপর কিয়াস করেছেন।

দলীলঃ হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত-

لاَ يُصَلِّي اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ وَلاَ يَصُوْمُ اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ– (البيهقي ج٤ ص٢٥٧)

অর্থাৎ, কেউ কারো পক্ষ থেকে নামায পড়বে না এবং কেউ কারো পক্ষ থেকে রোযা রাখবে না।

* ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ, আহমদ, ইসহাক ও সাওরী (রহ.)-এর মতে, অতিশয় বৃদ্ধ, আমৃত্যু অক্ষমতা (যেমন পক্ষাঘাত) অথবা মৃত লোকের পক্ষ থেকে অন্যের হজ্জ আদায় করা জায়েয। তবে সুস্থ ব্যক্তির পক্ষ থেকে অন্যের দ্বারা হজ্জ আদায় করা আদৌ জায়েয নয়।

এ ব্যাপারে তাঁদের বিস্তারিত বিবরণ হল- যদি মৃত ব্যক্তির যিম্মায় হজ্জ ফরয হয়ে থাকে এবং সে নিজের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায়ের ওসিয়ত না করে থাকে, তবে উত্তরাধিকারীগণের যিম্মায় তার পক্ষ থেকে হজ্জ করানো অপরিহার্য নয় এবং মৃত ব্যক্তি ফরয আদায় না করার এবং মৃত্যুর সময় ওসিয়ত না করার কারণে গুনাহগার হবে। অবশ্য যদি কোন উত্তরসূরী বা অন্য কেউ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করে, তাহলে এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন-

"وَأَرْجُوْ أَنْ يُّجْزِيْهِ ذٰلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى"

অর্থাৎ, আমি আশা করি ইনশাআল্লাহ সে এর ফল পাবে।

কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে হজ্জ করানোর ব্যাপারে ওসিয়ত করে থাকে, তাহলে তার ওসিয়ত এক তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা পুরা করতে হবে। এবং এই এক তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা ওসিয়ত পূরণ করা সম্ভব হলে তার ওসিয়তকে পুরা করা উত্তরসূরীর জন্য অপরিহার্য হবে। তখন মৃত ব্যক্তির দেশ থেকে কাউকে বদলী হজ্জের জন্য পাঠানো হবে। যদি এক তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা স্বীয় দেশ থেকে হজ্জ করানো সম্ভব না হয়, তাহলে কিয়াসের দাবী তো এই ছিল যে, ওসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে এবং এক তৃতীয়াংশ সম্পদ উত্তরসূরীদের মধ্যে বন্টিত হবে। কিন্তু ইসতিহসান তথা সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী মৃত ব্যক্তিকে এই ফরয থেকে নিষ্কৃতি দানের লক্ষ্যে এমন কোন এলাকা বা দেশ থেকে বদলী হজ্জে পাঠানো হবে, যেখান থেকে এক তৃতীয়াংশ সম্পদই হজ্জের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। (بدائع الصنائع ج٢ ص٢٢١-٢٢٢)

* ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, ওসিয়ত করুক বা না করুক সর্বাবস্থায় তার পক্ষ থেকে হজ্জ করানো ওয়ারিসদের জন্য আবশ্যক। এই হজ্জ করানোর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সম্পদ ব্যয় হয়ে গেলেও। (شرح نووي ج١ ص٤٣١)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ اَبِيْ رَزِيْنٍ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنْ اَبِيْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَّ يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعْنَ قَالَ احْجُجْ عَنْ اَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ- (ابو داود ج١ ص٢٥٢، ترمذي ج١ ص١٨٦ باب مله، نسائي ج٢ ص٣-٤ العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، ابن ماجة ص٢١٤)

অর্থাৎ, ... আবু রাযীন (রাঃ) হতে বর্ণিত। আমের গোত্রের এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ, আর তিনি হজ্জ ও উমরা আদায় করতে অসমর্থ এবং সওয়ার হতেও অপারগ। তিনি বলেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরা আদায় কর।

দলীল (৩)ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ আদায়ের দলীল। হযরত ইমাম মালিক (রহ.)-এর পক্ষ থেকে প্রদত্ত দলীল যথেষ্ট।

জবাবঃ

১. ইমাম মালিক (রহ.)-এর হাদীস দ্বারা কেবল نِيَابَتْ عَنِ الْمَيِّتِ তথা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্বের বৈধতার কথা বুঝানো হয়েছে। ইহা نِيَابَتْ عَنِ الْعَاجِزِ তথা অতিশয় বৃদ্ধ ও অপারগ ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্বকে নিষেধ করে না। নিয়ম

হল- ذِكْرُ الشَّيْئِ لاَ يَنْفِيْ غَيْرَهُ অর্থাৎ, নির্দিষ্ট কোন বস্তুর উল্লেখ ইহা অন্য বস্তুর অস্তিত্ব খণ্ডন করে না।

২. ইবরাহীম নাখঈর কিয়াস সহীহ এবং স্পষ্ট হাদীসসমূহের মোকাবিলায় গ্রহণযোগ্য নয়। (عيني ج٤ ص٤٨١، هداية ج١ ص٤٠٣، الفتح ج٣ ص٣٧)

* তাছাড়া, তাঁর কিয়াস যুক্তিসঙ্গত হয়নি। কেননা, নামায ও রোযা হচ্ছে শারীরিক ইবাদত, আর হজ্জে আর্থিক ভূমিকাও অন্যতম। সুতরাং এটা কিয়াসসঙ্গত নয়।

দ্বিতীয় আলোচনাঃ যে ব্যক্তি নিজে (কখনো) হজ্জ করেনি, সে অন্য ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

* ইমাম শাফেঈ, ইসহাক ও আওযায়ীর (রহ.) মতে, যে ব্যক্তি নিজে হজ্জ আদায় করেনি, অন্যের পক্ষ হতে তার হজ্জ করা জায়েয হবে না।

দলীলঃ ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَّقُوْلُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرَمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرَمَةَ قَالَ اَخٌ اَوْ قَرِيْبٌ لِّيْ قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَّفْسِكَ قَالَ لاَ قَالَ حُجَّ عَنْ نَّفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرَمَةَ– (ابو داود ج١ ص٢٥٢ باب الرجل يحج عن غيره، ابن ماجة ص٢١٤)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনেন, "লাব্বায়কা আন শুবরুমাতা (আমি শুবরামার পক্ষে হাজির)।" তিনি জিজ্ঞাসা করেন শুবরামা কে? সে ব্যক্তি বলে, আমার ভাই অথবা আমার বন্ধু। তিনি জিজ্ঞাসা করেনঃ আচ্ছা, তুমি কি হজ্জ করেছ? সে বলে, না। তিনি বলেন, প্রথমে তুমি নিজের হজ্জ আদায় কর, পরে শুবরামার হজ্জ সম্পন্ন কর।

উক্ত হাদীসে প্রথমে নিজে হজ্জ আদায়ের জন্য নির্দেশ (امر)-এর ছীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত যে ব্যক্তি নিজের হজ্জ আদায় না করবে, তার জন্য অন্যের পক্ষে হজ্জ আদায় করা জায়েয নয়।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, যে ব্যক্তি নিজে হজ্জ করেনি সে ব্যক্তি অন্যের হজ্জ করলে মাকরূহ তানযীহিসহ জায়েয হবে, তবে মোল্লা আলী কারী (রহ.) একে মাকরূহ তাহরিমী বলে আখ্যায়িত করেছেন। (شرح نقاية)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস। যেহেতু নবী করীম (সাঃ) ঐ মহিলাকে নিজের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করা এবং না

করার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করা ব্যতীতই বদলী হজ্জের অনুমতি দিয়েছেন। এতে বুঝা যায় যে, বদলী হজ্জ সহীহ হওয়ার জন্য প্রথমে নিজের হজ্জ জরুরী নয়।

দলীল (২)ঃ দারা কুতনীতে আছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهٗ سَمِعَ رَجُلاً يُلَبِّي عَنْ نُبَيْشَةَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَيُّهَا الْمُلَبِّيْ هٰذِهِ عَنْ نُبَيْشَةَ ثُمَّ عَنْ نَفْسِكَ-

অর্থাৎ, ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) এক ব্যক্তিকে নুবাইশার পক্ষ থেকে তালবিয়া পড়তে দেখে বললেন, হে তালবিয়া পাঠকারী! ইহা তো নুবাইশার পক্ষ থেকে। অতঃপর তুমি নিজের হজ্জ আদায় করে নেবে।
উক্ত হাদীসে নিজের পক্ষ থেকে প্রথমে হজ্জ আদায়ের পূর্বে, অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

জবাবঃ

১. ইমাম শাফেঈ ও ইসহাকের দলীলের জবাবে হানাফী মাযহাবের ইমাম তাহাবী বলেন, শুবরামার হাদীসটি মালুল (معلول) এবং ইবন হুমাম বলেন, উক্ত হাদীসটি মারফূ না মাওকূফ এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে।
২. অথবা, শুবরামার হাদীস দ্বারা উত্তম বুঝানো হয়েছে। আর খাসআমী মহিলার হাদীস দ্বারা বৈধ বুঝানো হয়েছে।
আহনাফরাও একথাই বলেন যে, যে পূর্বে নিজে হজ্জ আদায় করেছে, তার দ্বারা বদলী হজ্জ করানোই উত্তম। (تنظیم الاشتات ج۲ ص۷۲)

بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ ص۲۰۰ঃ মুহরিম ব্যক্তির বিবাহ করা

... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ-

(بخاري ج۱ ص۲٤۸ باب تزويج المحرم/ج۲ ص۷٦٦ باب نكاح المحرم، مسلم ج۱ ص٤٥٤ باب تحريم النكاح المحرم الخ، ترمذي ج۱ ص۱۷۲ باب الرخصة في ذلك، نسائي ج۲ ص۲٦ باب الرخصة في النكاح للمحرم، ابن ماجة ص۱٤۲ باب المحرم يتزوج)

অনুবাদঃ ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) মায়মূনা (রাঃ)-কে ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করেন।

বিশ্লেষণঃ মুহরিম ব্যক্তির ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করা জায়েয কিনা এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল, ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ, আওযাঈ এবং সাঈদ ইবন মুসাইয়্যিব (রহ.) প্রমুখের মতে, ইহ্রাম অবস্থায় বিবাহ করা বা কাউকে করানো অথবা বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া কোনটিই জায়েয নয়। যদি বিবাহ করে তবে বাতিল হয়ে যাবে। (المعارف ج٦ ص٣٤٥)

দলীল (১)ঃ ... عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ ... وَفِيْ رِوَايَةٍ وَلاَ يَخْطُبُ– (ابو داود ج١ ص٢٥٥، مسلم ج١ ص٤٥٣، ترمذي ج١ ص١٧١ باب كراهية تزويج المحرم، نسائي ج٢ ص٧٨ النهي عن النكاح المحرم/ج٢ ص٢٦، ابن ماجة ص١٤٢)

অর্থাৎ, ... হযরত উসমান ইবন আফ্ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, মুহরিম অবস্থায় কোন ব্যক্তি বিবাহ করতেও পারবে না এবং (কাউকে) বিবাহ দিতেও পারবে না। অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, মুহরিম ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাবও দিতে পারবে না। (পূর্বোক্ত হাদীসের সূত্র দ্রষ্টব্য।)

দলীল (২)ঃ ... عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الاَصَمِّ بْنِ اَخِيْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حَلاَلاَنِ بِسَرِفَ– (ابو داود ج١ ص٢٥٥، مسلم ج١ ص٤٥٤، ترمذي ج١ ص١٧٣، ابن ماجة ص١٤٢)

অর্থাৎ, ... ইয়াযিদ ইবন আসিম মায়মূনা (রাঃ) হতে বর্ণিত। মায়মূনা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে সারিফ নাম স্থানে বিবাহ করেন এবং এই সময় আমরা উভয়েই হালাল অবস্থায় ছিলাম।

দলীল (৩)ঃ

.. عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ حَلاَل وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلاَلٌ، وَكُنْتُ اَنَا الرَّسُوْلَ فِيْمَا بَيْنَهُمَا– (ترمذي ج١ ص١٧٢)

অর্থাৎ, ... আবু রাফি (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত মায়মূনা (রাঃ)-কে বিয়ে করেছেন হালাল অবস্থায়। তাঁর সাথে মধুরাত্রি যাপন করেছেন হালাল অবস্থায়। আর আমি ছিলাম তাদের উভয়ের মাঝে বার্তাবাহক।

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখঈ এবং আতা (রহ.) প্রমুখের মতে, মুহরিমের জন্য ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করা এবং করানো উভয়টিই জায়েয আছে। তবে ইহরাম অবস্থায় সহবাস বা সহবাস সংক্রান্ত কার্যাবলী জায়েয নয়। (معارف السنن ج٦ ص٣٤٦)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- فَانْكِحُوْ مَنْ طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ অর্থাৎ, তবে সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদেরকে ভাল লাগে তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে নাও। (নিসাঃ ৩) উক্ত আয়াতে বিয়ের কথা সাধারণভাবে বলা হয়েছে।

দলীল (২)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (৩)ঃ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ– (طحاوي ج١ ص٣٧٥، مجمع الزوائد ج٤ ص٢٦٧)

অর্থাৎ, হযরত আয়িশা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর কোন এক স্ত্রীকে মুহরিম অবস্থায় বিয়ে করেছেন।

দলীল (৪)ঃ হযরত ইবন মাসউদ সম্পর্কে ইবরাহীম নাখঈ (রহ.) বলেন,

كَانَ لاَ يَرٰى بَأْسًا اَنْ يَّتَزَوَّجَ الْمُحْرِمُ (طحاوي ج١ ص٣٧٦)

অর্থাৎ, ইবন মাসউদ (রাঃ) মুহরিমের বিয়েতে কোন অসুবিধা মনে করতেন না।

দলীল (৫)ঃ হযরত আনাস (রাঃ) সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবুবকর বলেন – سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ هَلْ هُوَ اِلاَّ كَالْبَيْعِ

(طحاوي ج١ ص٣٧٦)

অর্থাৎ, আমি আনাস ইবন মালিক (রাঃ)-কে মুহরিমের বিয়ে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তরে তিনি বলেন, এতে কোন অসুবিধা নেই। এতো কেবল ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায়।

উপরোল্লিখিত বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মুহরিমের জন্য বিবাহ করা বা করানো উভয়ই জায়েয। (যদিও এমতাবস্থায় বিবাহ করা সঙ্গত নয়, কিন্তু বিয়ে হয়ে যাবে।)

জবাবঃ ইমামত্রয়ের প্রথম দলীলের জবাবে আহনাফগণ বলেন-

(ক) উক্ত হাদীসে এই বিশ্লেষণ করা হবে যে, মুহরিম অবস্থায় বিবাহ করা এবং বিবাহ করানো তার শানের বিপরীত। কেননা, সে ইহরাম বেঁধে সৃষ্টিকর্তার ইশকে মহব্বতে নিবিষ্ট হওয়ার পরেও সৃষ্টির ইশকে লেগে যাওয়া আদৌ সমীচীন নয়। তাই নবী করীম (সাঃ) বিবাহ করা এবং করানোর ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করতে গিয়ে এ উক্তিটি করেছেন।

(খ) অথবা, এই নিষেধ মাকরূহ তানযিহীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তদুপরি ইহা ঐ ব্যক্তির জন্য, যে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে না এবং সহবাসে জড়িয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিয়ে সম্পাদিত হয়ে যাবে।

(المعارف ج٦ ص٣٤٨، إعلاء السنن ج١١ ص٤٩)

(গ) হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, হাদীসে মূলতঃ نِكَاح (বিবাহ) দ্বারা وَطِيْ (সঙ্গম) বুঝানো হয়েছে। তখন হাদীসটির অর্থ হবে মুহরিম ব্যক্তির ইহরাম অবস্থায় সঙ্গম করতে পারবে না। (هداية ج٢ ص٣١٠، البحر الرائق ج٣ ص١٠٤، لسان العرب ج٢ ص٦٢٦)

(ঘ) উল্লিখিত তিন ইমাম আবু রাফে এবং ইয়াযিদ বিন আসিম-এর হাদীস দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন, এর জবাব হল- আসর বিন দিনার বলেন, ইয়াযিদ বিন আসিম হলেন যঈফ রাবী। সুতরাং ইহা দলীলযোগ্য নয়। যদি ইহাকে সহীহ বলেও মেনে নেয়া হয়, তবুও এতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুযোগ রয়েছে। সুতরাং حَلَالَانِ এর অর্থ হল, ظَهَرَ اَمْرُ التَّزْوِيْجِ بَعْدَ حَلَالٍ অর্থাৎ, বিয়ে তো ইহরাম অবস্থাতেই হয়েছে, কিন্তু হালাল অবস্থায় বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। কেননা ইহরাম অবস্থায় তো আর কোন মধুরাত্রি উদযাপন করা যায় না এবং ওলীমাও করা যায় না। যার ফলে বিয়ে করা সত্ত্বেও তা প্রকাশ পায়নি। (درس مشكوة ج٢ ص٢٤٩، درس ترمذي ج٣ ص٩٨)

* আবু রাফে-এর হাদীসের জবাব হল, উক্ত হাদীসটি اتصال এবং انقطاع উভয় দিক দিয়ে সামঞ্জস্যহীন এবং মতবিরোধপূর্ণ। তাই এই হাদীস দলীলযোগ্য নয়।

* তাছাড়া, উক্ত হাদীসটির সনদে মাতারআল ওয়াররাক নামে একজন রাবী রয়েছেন। যার ব্যাপারে ইমাম নাসায়ী বলেন- لَيْسَ بِالْقَوِيِّ অর্থাৎ তিনি মজবুত রাবী নন এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন, كَانَ فِيْ حِفْظِهٖ سُوْءٌ অর্থাৎ তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল কম।

* ইয়াযিদ বিন আসিম-এর হাদীসের ব্যাপারে বলা যায় যে, কতক রেওয়ায়েতে ইয়াযিদের পর মায়মূনা (রাঃ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং কতক রেওয়ায়েতে মায়মূনা (রাঃ)-এর নাম উল্লেখ না করে মুরসাল নেয়া হয়েছে। তাই ইমাম তিরমিযী ইয়াযিদের রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলেন-هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ (এটা গরীব হাদীস)।

উল্লেখ্য যে, এই মাসআলাটির ব্যাপারে বড় বড় সাহাবা, ফুকাহা এবং তাবেঈনদের পক্ষ থেকে ইখতিলাফপূর্ণ মতামত রয়েছে। ফলে কোন এক পক্ষ অবলম্বন করে নির্দ্বিধায় একথা বলা যায় না যে, উক্ত মতটিই সহীহ। তাই সকলেই নিরলসভাবে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের দিকটি তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছেন।

* হানাফীরা ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসটিকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে বলেন-

(১) ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সকল ইমামগণ বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে তিন ইমামের হাদীসটি এমন নয়। তাই সিহাহ সিত্তার কিতাবগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, ইয়াযিদ ইবন আসিমের হাদীসটি বুখারী এবং নাসায়ীতে বর্ণিত হয়নি। এমনিভাবে আবু রাফের (রাঃ) হাদীসটি

বুখারী, মুসলিম এবং আবু দাউদে বর্ণিত হয়নি। সুতরাং যে হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সকল কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, তাই উহাই অগ্রাধিকারযোগ্য।

(২) ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর এই রেওয়ায়েতটি মুতাওয়াতির হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। বিশটিরও অধিক সূত্র পাওয়া যায়। (معارف السنن ج٦ ص٣٠٠-٣٠١)

(৩) ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতটি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ও হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা এর গ্রহণযোগ্যতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

(دار قطني ج٣ ص٢٦٣، مجمع الزوائد ج٤ ص٢٦٧، الفتح الباري ج٩ ص١٤٣)

(৪) ঐতিহাসিকগণ হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (السيرة النبوية لابن هشام ج٢ ص٢٥٥، طبقات ابن سعد ج٨ ص١٣٢)

(৫) ইয়াযিদ ইবন আসিম-এর একটি রেওয়ায়েত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতের মত। (طبقات ابن سعد ج٨ ص١٣٣)

(৬) বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহের জায়গাটির নাম ছিল সারিফ। এটি হল মক্কা থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে অবস্থিত, যা মীকাতের অন্তর্ভুক্ত।

(طبقات ابن سعد ج٨ ص١٣٢)

সুতরাং এমতাবস্থায় যদি নবী করীম (সাঃ)-কে মুহরিম না মানা হয় তাহলে তো একথাই ধরে নেয়া হবে যে, নবী করীম (সাঃ) ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করেছেন- যা জায়েয নয়।

(৭) ইবন আব্বাস (রাঃ) আবু রাফে এবং ইয়াযিদ বিন আসিম (রাঃ)-এর তুলনায় অধিক জ্ঞানী এবং অধিক সংরক্ষণকারী।

(৮) হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসটি কিয়াসের সাথেও সামঞ্জস্য রয়েছে। যেমন- ইহরাম অবস্থায় সেলাই করা কাপড় এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়েয নয়। কিন্তু এগুলো ক্রয় করে দেশে নিয়ে আসা নিঃসন্দেহে জায়েয আছে, ঠিক এমনিভাবে বিয়ে করে মহিলাকেও দেশে নিয়ে আসা জায়েয আছে। কারণ বিয়েও তো এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয় (যদিও কিছু পার্থক্য রয়েছে) কিন্তু তা ব্যবহার করা তথা যৌন সম্ভোগ বা যৌনকার্যে লিপ্ত হাওয়ার উদ্রেক করে এমন কোন কাজে লিপ্ত হওয়া যাবে না।

اَلْمَنْهِيَاتُ فِيْ حَالَةِ الْاِحْرَامِ ঃ ইহরাম অবস্থায় মুহরিমের জন্য যেসব কাজ নিষিদ্ধ -

১. যৌন সম্ভোগ করা
২. অশ্লীল বাক্যালাপ করা
৩. নারীর সামনে যৌন সম্ভোগ সংক্রান্ত বাক্যালাপ করা
৪. পাপাচারে লিপ্ত হওয়া
৫. কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوْقَ وَلاَ جِدَالَ فِيْ الْحَجِّ–

অর্থাৎ, এসব মাসে যে লোক হজ্জের নিয়ত করবে, সে স্ত্রী সম্ভোগ, পাপাচার এবং ঝগড়া-বিবাদ করবে না। (বাকারাঃ ১৯৭)

৬. স্থলচর কোন প্রাণী হত্যা বা শিকার করা। এমনকি মশা, মাছি, উকুন ও ছাড়পোকাও মারা নিষেধ। আল্লাহ তাআলা বলেন- "لاَ تَقْتُلُوْا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ"

অর্থাৎ, তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার বধ করো না। (মায়েদাঃ ৯৫)

৭. শিকার করার জন্য অন্যকে উদ্বুদ্ধ করা।

৮. শিকারের সন্ধান দেয়া।

৯. সুগন্ধি, সাবান, তেল, আতর ও স্নো-পাউডার ব্যবহার করা। রাসূল (সাঃ) জনৈক সুগন্ধি ব্যবহারকারীকে বলেছিলেন-

اَغْسِلْ عَنْكَ اَثَرَ الْخُلُوْقِ الخ (ابو داود ج١ ص٢٥٣ باب الرجل يحرم الخ)

অর্থাৎ, ... তুমি তোমার (শরীর ও কাপড়ের) সুগন্ধি ধুয়ে ফেল।

১০. নখ কাটা।

১১. পুরুষেরা মাথা ও মুখ ঢাকবে না। মহিলারা মাথা ঢাকবে কিন্তু পর্দা বজায় রেখে মুখ স্পর্শ করে এমন নেকাব লাগাতে পারবে না। তবে মুখ থেকে একটু দূরে থাকে এমন নেকাব দ্বারা পর্দা রক্ষা করতে হবে।

... عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمُحْرِمَةُ لاَ تَنْتَقِبُ–

(ابو داود ج١ ص٢٥٣ باب ما يلبس المحرم)

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, মুহরিম স্ত্রীলোকেরা যেন চেহারায় নেকাব না ঝুলায়।

১২. মাথার চুল বা দাঁড়ি খেতমী জাতীয় সুগন্ধি ঘাস দ্বারা ধৌত করা।

১৩. চুল, দাড়ি বা পশম ছাঁটা বা টেনে তোলা।

১৪. সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা। তবে মহিলাদের জন্য এ হুকুম নয়। ইবন উমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, মুহরিম ব্যক্তি কি ধরনের পোশাক পরিধান করবে?

قَالَ لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْبُرْنَسَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَلاَ الْعَمَامَةَ ... وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ النَّبِيُّ اخْلَعْ جُبَّتَكَ– (ابو داود ج١ ص٢٥٣ باب ما يلبس المحرم)

অর্থাৎ, তিনি বলেন, সে কামীজ (জামা), টুপি, পায়জামা এবং পাগড়ী পরিধান করবে না। ... অন্য আরেকটি হাদীসে বর্ণিত আছে, এক সাহাবীকে তিনি নির্দেশ দেন, তুমি তোমার জুব্বা খুলে ফেল।

১৫. সুগন্ধিযুক্ত কাপড় পরিধান করা। অবশ্য সুগন্ধি দূরীভূত হলে তা পরিধান করা জায়েয।

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ فِيْ اِحْرَامِهِنَّ الزَّعْفَرَانِ مِنَ الثِّيَابِ ... (ابو داود ج١ ص٢٥٣)

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) মুহরিম স্ত্রীলোকদেরকে জাফরান মিশ্রিত কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

১৬. চুল বা দাড়িতে চিরুনী বা আঙ্গুল চালানো।

১৭. গোঁফ কাটা ইত্যাদি। (ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৭, هداية ج١ ص٢٣٨-٢٣٩)

بَابُ الْاِحْصَارِ ص٢٥٧

হজ্জ বা উমরা করতে বাধাপ্রাপ্ত হলে

... عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْاَنْصَارِيَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كُسِرَ اَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ عِكْرِمَةُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَّاَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ صَدَقَ- وَفِيْ حَدِيْثٍ اٰخَرَ اَوْ مَرِضَ-

(ترمذي ج١ ص١٨٧ باب الذي يهل بالحج الخ، نسائي ج٢ ص١٩ ما يفعل من حبس عن الحج الخ، ابن ماجة ص٢٢٩)

অনুবাদঃ ... ইকরামা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজ ইবন আমর আনসারী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যদি কেউ শত্রুর কারণে বা চলনশক্তি রহিত হওয়ার কারণে (ইহরামের পর হজ্জ বা উমরা করতে) অক্ষম হয়, তবে তার জন্য হালাল হওয়া বৈধ। তবে তাকে পরবর্তী বছর হজ্জ করতে হবে। রাবী ইকরামা বলেন, অতঃপর আমি এ সম্পর্কে আব্বাস (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা উভয়ে এর সত্যতা স্বীকার করেন। (উক্ত অনুচ্ছেদেই অন্য একটি হাদীসে "অথবা রোগের কারণে" কথাটি উল্লেখ রয়েছে।)

বিশ্লেষণঃ اِحْصَار (বাধাগ্রস্ত হওয়া) হজ্জ বা উমরার ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ততা শুধুমাত্র দুশমনের সাথে সম্পৃক্ত নাকি অসুস্থ, চলনশক্তি রহিত হওয়া বা অন্য কোন কারণেও হতে পারে, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল, ইসহাক এবং লাইস (রহ.) প্রমুখের মতে, বাধাগ্রস্ত হওয়া কেবল দুশমনের সাথেই সম্পৃক্ত- অসুস্থ বা অন্য কোন কারণে হবে না। (عمدة القاري ج١٠ ص١٤٠)

দলীল (১)ঃ পবিত্র কুরআনের আয়াত- فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

অর্থাৎ, অতএব হজ্জ ও উমরা করতে গিয়ে যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে কোরবানীর জন্য যা কিছু সহজলভ্য, তাই তোমাদের উপর ধার্য। (বাকারাঃ ১৯৬) যখন নবী করীম (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কিরাম ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় দুশমনের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন, তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়। সুতরাং বুঝা গেল, অবরুদ্ধতা কেবল দুশমনের সাথেই খাস। (تفسير ابن كثير ج١ ص٢٣١)

দলীল (২)ঃ হযরত ইবন আব্বাস এবং হযরত ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত- لَا حَصْرَ إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ– অর্থাৎ, শত্রু ছাড়া কোন অবরুদ্ধতা নেই।

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখঈ, আতা (রহ.), আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ, যায়েদ বিন সাবেত (রাঃ) প্রমুখের মতে, যে জিনিসই ইহরাম কার্যকরণ বা সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাধাদানকারী হয়, তাই إِحْصَار (অবরুদ্ধতা)। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে দুশমন, অসুস্থতা, বন্দীদশা, খঞ্জত্ব, পাথেয় হারিয়ে ফেলা অথবা সাগরে জাহাজ আটকে যাওয়া প্রভৃতি অবরোধের কারণ হিসেবে গণ্য করা হবে। (عمدة القاري ج١٠ ص١٤٠)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

উক্ত আয়াতে احصار (বাধাগ্রস্ত হওয়া) শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ হচ্ছে বাধাগ্রস্ত হওয়া। সুতরাং তা যে কোন উপায়েই হতে পারে।

উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ অভিধানবিদদের মতে, إِحْصَار শব্দটি প্রকৃত অর্থে রোগের কারণে বাধাগ্রস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর আলোচ্য আয়াত সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। (التفسير الكبير للرازي ج٥ ص١٥٩–١٦٠)

দলীল (২)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (৩)ঃ কিয়াসের চাহিদাও এই যে, যে কারণ শত্রুর দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে পাওয়া যায়, তা অসুস্থতার কারণে অবরুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়। আর উভয়টিই হজ্জ পালনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। সুতরাং উভয়টির হুকুমও একই হওয়া উচিত।

জবাবঃ আহনাফগণ তিন ইমামের উল্লিখিত আয়াতের জবাবে বলেন, উসূলে ফিকহের নিয়ম হল- "اَلْعِبْرَةُ لِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لاَ لِخُصُوْصِ السَّبَبِ" অর্থাৎ, "শব্দের ব্যাপকতা অনুযায়ী হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়, নির্দিষ্ট কোন শানে নুযুলের সাথে তা সম্পৃক্ত নয়।" সুতরাং উক্ত আয়াতে احصار শব্দটি ব্যাপক। তাই ব্যাপকতার কারণে অসুস্থতা, বন্দীদশা ইত্যাদিও এতে শামিল রয়েছে।

ইবন উমর এবং ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তির জবাব হল-
১. কুরআনুল কারীম ও হাদীসের মোকাবিলায় ইহা দলীলযোগ্য নয়।
২. অথবা, এ উক্তি দ্বারা একথা বুঝানো হয়েছে যে, অবরুদ্ধতার পরিপূর্ণ এবং প্রকৃষ্ট রূপ হল শত্রু দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়া। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ইহা ছাড়া অবরুদ্ধতার আর কোন কারণ হতে পারবে না। (معارف السنن ج٦ ص٥٨٣، درس مشكوٰة ج٢ ص٢٥٣)

অবরোধের হুকুমঃ
* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, অবরোধের ফলে হালাল হওয়ার নিয়ম হল, কুরবানীর পশু সে স্থলেই জবাই করবে, যেখানে সে শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়েছে। কুরবানীর পশু হেরেমে পাঠানো জরুরী নয়। অতঃপর মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাঁটানোর কাজ করিয়ে নিবে।
* ইমাম আবু হানিফা (রহ.), হযরত ইবন মাসউদ ও ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, অবরোধের ফলে হালাল হওয়ার নিয়ম হল, অবরুদ্ধ ব্যক্তি একটি কুরবানীর পশু হারামে পাঠাবে এবং একটি সময় সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে নিবে যে, এই সময় ঐ কুরবানীর জন্তু হারামে জবাই করা হবে। যখন সে সময় এসে যাবে, তখন সে হালাল হয়ে যাবে। উক্ত ব্যক্তির মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাঁটা জরুরী নয়।

(درس ترمذي ج٣ ص٢١١، قرطبي ج٢ ص٣٨٠)

উল্লেখ্য যে, ফরয হজ্জ কারো মতেই অবরোধের কারণে বাতিল হয় না। সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর কাযা করা ওয়াজিব। (معارف السنن ج٢ ص٣٦٨)

بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ ص٢٦٠

আসরের পরে তাওয়াফ করা

.. عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَمْنَعُوْا اَحَدًا يَّطُوْفُ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَيُصَلِّيْ اَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنَ اللَّيْلِ اَوْ نَهَارٍ— (ترمذي ج١ ص١٧٥

باب الصلوٰة بعد العصر الخ، نسائي ج٢ ص٣٥ اباحة الطواف في كل الاوقات، ابن ماجة ص٩٠)

অনুবাদঃ ... জুবায়ের ইবন মুতঈম (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা কাউকে কোন সময় এই ঘর (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ করতে এবং দিন-রাতের যে কোন সময় এখানে নামায আদায় করতে নিষেধ করো না।

বিশ্লেষণঃ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, দিন-রাত ২৪ ঘন্টা তথা সবসময়ই তওয়াফ করা জায়েয আছে। তাওয়াফের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। প্রশ্ন হল, তাওয়াফের পরে যে দু' রাকাত নামায পড়তে হয়, তা মাকরূহ ওয়াক্তে আদায় করা জায়েয কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল, আতা, তাউস ও ইসহাক (রহ.) প্রমুখের মতে, তাওয়াফের পরে দু'রাকাত নামায মাকরূহ ওয়াক্তেও আদায় করা জায়েয আছে। (عمدة القاري ج٩ ص٢٧١)

দলীলঃ উপরিউক্ত হাদীস।

* ইমাম মালিক, আবু হানিফা, সাহেবাইন, সাঈদ ইবন যুবায়ের, হাসান বসরী এবং মুজাহিদ (রহ.)-এর মতে, তাওয়াফের পরে দু'রাকাত নামায মাকরূহ ওয়াক্তে আদায় করা জায়েয নয়; বরং সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্তের পর আদায় করতে হবে।

(عمدة القاري ج٩ ص٢٧١)

দলীল (১)ঃ

... عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ اِلاَّ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ– (ابو داود ج١ ص١٨١ باب من رخص فيهما النخ، بخاري ج١ ص٨٢، ترمذي ج١ ص٤٢٣ باب في كراهية الصلاوة النخ، نسائي ج١ ص٩٦)

অর্থাৎ, হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আসরের পর নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। তবে যদি সূর্য উপরে থাকে (ভিন্ন কথা)।

দলীল (২)ঃ হযরত উমর (রাঃ)-এর আছার-

... عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيْ أَخْبَرَهُ اَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضٰى عُمَرُ طَوَافَهُ نَظَرَ فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ فَرَكِبَ حَتّٰى أَنَاخَ بِذِيْ طُوًى، فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ– (اللفظ للموطا ص٣٨٧، بخاري ج١ ص٢٢٠ باب الطواف بعد الصبح والعصر)

অর্থাৎ, ... আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল কারী বলেছেন, তিনি ফজরের নামাযের পর হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ)-এর সাথে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন। তাওয়াফ শেষে উমর (রাঃ) তাকিয়ে সূর্য দেখতে পাননি। তাই তিনি আরোহণ করে চলে

আসলেন। যীতুয়া নামক স্থানে এসে সওয়ারী বসালেন, অতঃপর দুই রাকাত নামায আদায় করলেন।

দলীল (৩)ঃ মুসনাদে আহমাদে হযরত জাবির (রাঃ) হতে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে-

... لَمْ نَكُنْ نَطُوْفُ بَعْدَ صَلٰوةِ ا لصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ– (فتح الباري ج٣ ص٣٩١، مجمع الزوائد ج٣ ص٢٤٥)

অর্থাৎ, আমরা ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাওয়াফ করতাম না।

দলীল (৪)ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত-

انّه طَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَلَمَّا فَرَغَ جَلَسَ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ– (عمدة القاري ج٩ ص٢٧٢)

অর্থাৎ, তিনি ফজরের পর তাওয়াফ করেছেন। যখন তা থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন, তখন সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে ছিলেন।

জবাবঃ শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর প্রদত্ত দলীলের জবাবে হানাফীগণ বলেন যে, হাদীসে বর্ণিত "اَىُّ سَاعَةٍ" (যে কোন সময়) দ্বারা "মাকরূহ সময় ব্যতীত যে কোন সময় নামায আদায় করতে নিষেধ নয়" একথা বুঝানো হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এই নির্দেশের উদ্দেশ্য ছিল বনু আবদে মানাফকে এই হিদায়েত দেয়া যে, তারা যেন আসা-যাওয়ার জন্য হারামের রাস্তা সর্বদা খোলা রাখে। কেননা, আবদে মানাফের ঘর-বাড়ি বায়তুল্লাহ এবং হারাম শরীফকে বেষ্টন করে রেখেছিল। যখন এই দরওয়াজা বন্ধ করে দেয়া হত, তখন কোন মানুষ হারাম শরীফ পর্যন্ত পৌঁছতে পারত না। এইজন্য নবী করীম (সাঃ) এমন উক্তিটি করেছিলেন। সুতরাং এর অর্থ এই নয় যে, হারাম শরীফে নামায আদায়কারীদের জন্য কোন মাকরূহ সময় নেই। (الكوكب الدري ج١ ص٢٨٣)

بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ ص٢٦٠ ঃ হজ্জে কিরান আদায়কারীর তাওয়াফ

... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ لَمْ يَطِفُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ اَصْحَابُه بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اِلاَّ طَوَافًا وَّاحِدًا طَوَافَهُ الاَوَّلَ– (بخاري ج١ ص٢٢١ باب طواف القارن، مسلم ج١ ص٤٠٤ باب جواز التحلل بالاحصار الخ، ترمذي ج١ ص١٨٨ باب ان القارن يطوف طواف واحدا، نسائي ج٢ ص٣٦ طواف القران)

অনুবাদঃ ... জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ সাফা-মারওয়ার মধ্যে একবারের অধিক তাওয়াফ করেননি এবং এটাই ছিল তাঁর প্রথম তাওয়াফ।

কিরান হজ্জ আদায়কারীর তাওয়াফ সংখ্যাঃ কিরান হজ্জ আদায়কারী মোট কয়টি তাওয়াফ করবে এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, কিরান হজ্জ পালনকারী সর্বমোট তিনটি তাওয়াফ করবে। যথা-

(১) তাওয়াফে কুদুম, (২) তাওয়াফে যিয়ারত (অর্থাৎ উমরা ও হজ্জের জন্য তাওয়াফ), (৩) তাওয়াফ আল-বিদা।

অতএব, কিরান হজ্জ পালনকারীর জন্য তাওয়াফে উমরা আলাদাভাবে আদায় করার প্রয়োজন নেই, বরং এটা তাওয়াফে যিয়ারতের মধ্যেই গণ্য হবে। মোটকথা, হজ্জ ও উমরার জন্য পৃথক পৃথক তাওয়াফ করার প্রয়োজন নেই। উভয়ের জন্য একটি তাওয়াফই যথেষ্ট। (معارف السنن ج٦ ص٦٠٣، المغني ج٣ ص٤٦٥-٤٦٦)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কিরান হজ্জে উমরার জন্য আলাদাভাবে তাওয়াফ করার প্রয়োজন নেই।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا (اللفظ للترمذي)

অর্থাৎ, ... হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হজ্জ ও উমরা মিলিয়ে আদায় করেছেন। (হজ্জে কিরান করেছেন)। অতঃপর হজ্জ ও উমরার জন্য একটি তাওয়াফ করেছেন। (পূর্বের হাদীসের সূত্র দ্রষ্টব্য)

উপরোল্লিখিত রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় যে, উমরার জন্য আলাদা তাওয়াফ করা প্রয়োজন নেই।

* ইমাম আবু হানিফা, ইবরাহীম নাখঈ, আওযাঈ, সুফিয়ান সাওরী, শাবী (রহ.) এবং অধিকাংশ সাহাবীদের মতে, হজ্জ ও উমরার জন্য পৃথক পৃথক তাওয়াফসহ মোট চারটি তাওয়াফ করতে হবে। (عمدة القاري ج٩ ص١٨٤)

(১) সর্বপ্রথম তাওয়াফে উমরা, যার পরে সায়ীও করতে হয়। (هداية ج١ ص٢٥٨)

(২) তাওয়াফে কুদুম, যা সুন্নত। (المبسوط ج٤ ص٣٤)

(৩) তাওয়াফে যিয়ারত, যা হজ্জের রুকন।

(৪) তাওয়াফে আল-বিদা, যা ওয়াজিব। (المبسوط ج٤ ص٣٥)

দলীল (১)ঃ ... عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ طَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ وَسَعَى لَهُمَا سَعْيَيْنِ وَقَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ- (دار قطني ج٢ ص٢٦٣)

অর্থাৎ, ... হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি হজ্জ ও উমরার জন্য দু' তাওয়াফ ও দু' সাঈ করেছেন এবং বলেছেন, আমি রাসূলুললাহ (সাঃ)-কে অনুরূপ করতে দেখেছি।

দলীল (২)ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর হাদীস-

قَالَ طَافَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ لِعُمْرَتِهٖ وَحَجَّتِهٖ طَوَافَيْنِ وَسَعَى سَعْيَيْنِ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُوْدٍ- (دار قطني ج٢ ص٢٦٤)

অর্থাৎ, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাওয়াফ করেছেন। তিনি উমরা ও হজ্জের জন্য দুটি তাওয়াফ ও দু'সাঈ করেছেন। আবু বকর, উমর, আলী ও ইবন মাসউদ (রাঃ) অনুরূপ করেছেন।

দলীল (৩)ঃ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত-

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ طَوَافَيْنِ وَسَعَى سَعْيَيْنِ- (دار قطني ج٢ ص٢٦٤)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) দু'তাওয়াফ ও দু'সাঈ করেছেন।

এছাড়াও আরো অনেক হাদীস ও আছার রয়েছে, যা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, হজ্জের জন্য যেমন পৃথক পৃথক তাওয়াফ ও সাঈ রয়েছে, তেমনিভাবে উমরার জন্যও আলাদা তাওয়াফ ও আলাদা সাঈ রয়েছে।

(উল্লেখ্য যে, দারা কুতনী থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহে যদিও কতক রাবীদের যঈফ হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা বিতর্ক রয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করলে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন সংশয়ের উর্ধ্বে।)

(ميزان الاعتدال ج١ ص٥١٣-٥١٥، تهذيب الكمال ج٦ ص٢٦٨-٢٧٠)

জবাবঃ উল্লিখিত তিন ইমামের দলীলের জবাবে আহ্‌নাফগণ বলেন, হযরত জাবির ও আয়িশা (রাঃ)-এর থেকে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে, এর আলোচ্য বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করলে সকল হাদীসই বিশ্লেষণের দাবী রাখে, এবং এগুলোর বাহ্যিক অর্থ কারো নিকটই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, হাদীসের বাহ্যিক অর্থে দেখা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) শুধু একটি তাওয়াফ করেছেন অথচ সবাই একমত যে, তিনি (সাঃ) একাধিক তাওয়াফ করেছেন। আর এমতাবস্থায় তিন ইমাম এ সকল হাদীস দ্বারা নিম্নোক্ত বিশ্লেষণ করে থাকেন-

একটি তাওয়াফ দ্বারা উদ্দেশ্য হল তাওয়াফে যিয়ারত, যার মধ্যে তাওয়াফে উমরাও অন্তর্ভুক্ত।

আর হানাফীগণ বলেন যে, এ সকল হাদীসে বর্ণিত একটি তাওয়াফ দ্বারা তাওয়াফে উমরা বুঝানো উদ্দেশ্য, যার মধ্যে তাওয়াফে কুদুমও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাওয়াফে কুদুম আলাদাভাবে আদায় করার প্রয়োজন নেই। আর এক্ষেত্রে হানাফীদের মতামত অগ্রাধিকারের কারণ হল, এর দ্বারা রেওয়ায়েতের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন হয়।

(২) অথবা, বলা যায় যে, এক তাওয়াফ করা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মিনা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হজ্জের জন্য তিনি একটি তাওয়াফ করেছেন। এখানে এটিই উদ্দেশ্য, تداخل বা অন্তর্ভুক্ত করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা ইতিপূর্বে উমরার জন্যও তাওয়াফ করা হয়েছে। (فتح الملهم ج٣ ص٢٥١)

(৩) কাজী পানিপথী (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে, সহীহ হাদীসগুলো অধ্যয়ন করলে কোন কোন রেওয়ায়েতে দেখা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) পদব্রজে সাঈ করেছেন। (مسلم ج١ ص٣٩٦، نسائي ج٢، ص٤١)

আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে আরোহণ করে সাঈ করার উল্লেখ রয়েছে। (نسائي ج٢ ص٤١، البداية والنهاية ج٥ ص١٥٩-١٦٥)

সুতরাং এগুলোর অবসানের যৌক্তিক ব্যাখ্যা হল, তিনি (সাঃ) দু'বার সাঈ করেছেন। একবার পদব্রজে, আরেকবার আরোহণ করে। অতএব, যেসব রেওয়ায়েতে এক সাঈর কথা উল্লেখ রয়েছে। এগুলোর সামগ্রিক উত্তর হল, পরস্পর বিরোধের সময় অতিরিক্ত অংশ প্রমাণকারীর বিষয়ের প্রাধান্য হয়। (مظهري ج١ ص٢٣٠)

بَابُ الْحَلَقِ وَالتَّقْصِيْرِ ص٢٧١ : মাথার কেশ মুণ্ডন ও কর্তন করা

... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ الْمُقَصِّرِيْنَ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَالْمُقَصِّرِيْنَ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ– (بخاري ج١ ص٢٣٣ باب الحلق والتقصير عند الإحلال، مسلم ج١ ص٤٢٠ باب تفضيل الحلق على التقصير الخ، ابن ماجة ص٢٢٥)

অনুবাদঃ ... আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন যে, ইয়া আল্লাহ! আপনি মাথার কেশ মুণ্ডনকারীদের উপর রহম করুন। তখন সাহাবীরা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যারা চুল ছাঁটে তাদের কি হবে? তখন তিনি বলেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি মাথার কেশ মুণ্ডনকারীদের উপর রহম করুন। তখন তাঁরা (সাহাবীগণ) পুনরায় বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যারা চুল ছাঁটে

তাদের জন্য কি? তখন তিনি বলেন, মাথার চুল ছোট করে কর্তনকারীদের উপরও রহম করুন।

বিশ্লেষণঃ হজ্জে (কুরবানীর দিন কংকর নিক্ষেপের পর) কেশ মুন্ডন করা অথবা ছাঁটা ওয়াজিব। তবে চুল ছাঁটার চেয়ে মুণ্ডন করাই উত্তম।

প্রশ্ন হল পুরো মাথার কেশ মুন্ডানো অথবা ছাঁটা ওয়াজিব, নাকি কতক অংশের দ্বারাই তা আদায় হয়ে যাবে? এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, পূর্ণ মাথা মুন্ডানো অথবা ছাঁটা ওয়াজিব।

দলীলঃ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّقَ جَمِيْعَ رَأْسِهِ وَقَالَ خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ– (تنظيم الاشتات ج٢ ص٩٥، درس مشكوة ج٢ ص٢٤٣)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) তাঁর সমস্ত মাথা মুন্ডন করলেন এবং বললেন, তোমরা আমার থেকে হজ্জের বিধিবিধান শিখে নাও।

* ইমাম আবু হানিফা ও শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, মাথার কতক অংশ মুন্ডানো বা ছাঁটা ওয়াজিব। কিন্তু মাথার সব চুল মুন্ডানো অথবা ছাঁটা মুস্তাহাব এবং উত্তম, তবে ওয়াজিব নয়।

দলীল (১)ঃ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ لِيْ مُعَاوِيَةُ اَعَلِمْتَ اَنِّيْ قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مسلم ج١ ص٤٠٨ باب جواز تقصير الخ، بخاري ج١ ص٢٣٣)

অর্থাৎ, ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, মুআবিয়া আমাকে বললেন, তুমি কি জান, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাথার চুল ছেঁটে দিয়েছি।

হাদীসে উল্লিখিত مِن (মধ্য হতে, থেকে) হরফটিকে আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় حَرْف تبعيضية বলা হয়। অর্থাৎ مِن এমন একটি হরফ যা بعض (কতক) বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এতে বুঝা যায় যে, নবী করীম (সাঃ)-এর মাথার কতক অংশের চুল হতে ছোট করেছেন, সবটুকু নয়।

দলীল (২)ঃ عَنْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَ اَنَّهُ اَخَذَ مِنْ اَطْرَافِ شَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–

অর্থাৎ, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর কেশ মোবারকের পার্শ্ব ছাঁটেন।

উক্ত হাদীসের দ্বারাও মাথার কতক অংশের চুল ছাঁটার প্রমাণ মিলে। (تنظيم الاشتات ج٢ ص٩٥)

উল্লেখ্য যে, অযুর সময় মাথা মাসেহ নিয়ে ইমামদের মাঝে যেমন মতভেদ রয়েছে, এমনিভাবে এখানেও মাথা মুণ্ডানো বা ছাঁটার পরিমাণ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

* ইমাম শাফেঈর মতে, তিনটি চুল মুণ্ডানো অথবা কেটে ফেলা যথেষ্ট। শাফেঈ মাযহাবের কারো কারো মতে একটি চুলই যথেষ্ট।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, মাথার চার ভাগের এক অংশ মুণ্ডানো বা ছাঁটা ওয়াজিব। (عمدة القاري ج١٠ ص٦٣، فتح الباري ج٣ ص٤٥٠، شرح نووي ج١ ص٤٢٠)

জবাবঃ ইমাম মালিক ও আহমদ (রহ.)-এর জবাবে আহনাফ ও শাফেঈগণ বলেন, "পূর্ণ মাথার চুল মুণ্ডানো বা ছাঁটা উত্তম, আর কতক অংশ মুণ্ডানো বা ছাঁটা ওয়াজিব। এতে উভয় হাদীসের উপর আমল হয়ে যায়।"

উল্লেখ্য যে, চুল ছোট করার চেয়ে মুণ্ডানো উত্তম বলার কারণ হল,

(১) নবী করীম (সাঃ) মস্তক মুণ্ডনকারীদের জন্য পরপর দুইবার রহমতের দুআ করেছেন, আর চুল ছোট করে কর্তনকারীদের উপর মাত্র একবার দুআ করেছেন। হাদীসটি অনুচ্ছেদের শুরুতেই বর্ণিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআনেও মুণ্ডনকারী শব্দটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে-

مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে মস্তক মুণ্ডিত এবং কেশকর্তিত অবস্থায় প্রবেশ করবে। (ফাত্‌হঃ ২৭)

(২) ইবন হাজর (রহ.) বলেন, ইহার আরেকটি কারণ হল, মস্তক মুণ্ডনকারী ইবাদতের ক্ষেত্রে অধিক অগ্রবর্তী এবং এর দ্বারা আল্লাহর জন্য অধিক বিনয় প্রকাশ পায়। যার দ্বারা হাজীর নিয়তের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে চুল ছাঁটার মধ্যে সৌন্দর্যের কিছু অংশ রয়েই যায়। (فتح الملهم ج٣ ص٣٣٨)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ যদি কারো মাথায় চুল না থাকে তাহলে ঐ ব্যক্তির উচিত স্বীয় মাথার উপর ক্ষুর দিয়ে ছাঁচবে, যাতে অনুসরণের ক্ষেত্রে ওয়াজিবের হুকুম আদায় হয়ে যায়। (بدائع الصنائع ج٢ ص١٤٠)

* মহিলাদের জন্য মাথা মুণ্ডানোর হুকুম নেই, বরং মাথা মুণ্ডানো তাদের জন্যে মাকরূহ তাহরীমী। তারা এক আঙ্গুল পরিমাণ চুল কর্তন করবে। (بدائع الصنائع ج٢ ص١٤١)

দলীলঃ ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ اِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيْرُ- (ابو داود ج١ ص٢٧١ باب الحلق والتقصير، ترمذي ج١ ص١٨٢ باب كراهية الحلق للنساء)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন যে, মহিলাদের জন্য মস্তক মুণ্ডানোর দরকার নেই; বরং তারা (এক আঙ্গুল পরিমাণ চুল) কর্তন করবে।

بَابُ الْعُمْرَةِ ص٢٧٢ ঃ উমরা

... عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اَنْ يَّحُجَّ–

(بخاري ج١ ص٢٣٨ باب من اعتمر قبل الحج)

অনুবাদঃ ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হজ্জের পূর্বে উমরা আদায় করেন।

'উমরা'-এর আভিধানিক অর্থঃ عُمْرَةٌ শব্দটি فُعْلَةٌ-এর ওযনে একবচন। বহুবচনে عُمَر ও عُمَرَات, এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-

১. لَبْسُ الْعُمْرَةِ - মস্তকাবরণ পরিধান করা

২. আবাদ বা নির্মাণ করা। যেমন ইরশাদ হচ্ছে-

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ–

অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি। (তাওবাহঃ ১৮)

৩. اَلزِّيَارَةُ-যিয়ারত করা

৪. اَلْقَصْدُ اِلٰى مَكَانٍ هَامٍّ - গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যাওয়ার ইচ্ছা করা। শব্দটির ব্যবহার পবিত্র কুরআনেও পাওয়া যায়- وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ– (البقرة ١٩٦)

উমরা-এর পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

(১) আল্লামা আইনী বলেন,

اَلْعُمْرَةُ طَوَافُ الْبَيْتِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مُحْرِمًا–

অর্থাৎ, মীকাত হতে ইহরাম বেঁধে পবিত্র কাবা ঘর প্রদক্ষিণ করা এবং সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে দৌড়ানোকে উমরা বলা হয়।

(২) ফিকহুস সুন্নাহ-এর গ্রন্থকার বলেন-

اَلْعُمْرَةُ زِيَارَةُ الْكَعْبَةِ وَالطَّوَافُ حَوْلَهَا وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ–

অর্থাৎ, বায়তুল্লাহ শরীফের যিয়ারত ও তার চতুর্দিকে তাওয়াফ করা এবং সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সায়ী করাকে উমরা বলা হয়।

(৩) শরহে বেকায়াহ-এর গ্রন্থকার বলেন-

اَلْعُمْرَةُ هِيَ زِيَارَةُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ-

অর্থাৎ, উমরা হল নির্ধারিত পদ্ধতিতে বায়তুল্লাহ শরীফ যিয়ারত করা।

(৪) আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থে বলা হয়েছে-

هِيَ قَصْدُ الْكَعْبَةِ لِلنُّسُكِ الْمَعْرُوْفِ اَيْ الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ-

অর্থাৎ, উমরা হল সুপ্রসিদ্ধ আনুষ্ঠানিক ইবাদত তথা তাওয়াফ এবং সায়ীর উদ্দেশ্যে কাবার যিয়ারতের ইচ্ছা পোষণ করা।

(৫) মুনজিদ অভিধানে আছে- هِيَ اَفْعَالٌ مَخْصُوْصَةٌ تُسَمَّى بِالْحَجِّ الاَصْغَرِ

অর্থাৎ, এমন কিছু নির্দিষ্ট কাজ, যাকে হজ্জে আসগর (ছোট হজ্জ) বলা হয়।

اَرْكَانُ الْعُمْرَةِ (উমরার রুকনসমূহ)ঃ কোন বস্তুর রুকন বলা হয় مَا يَقُوْمُ بِهِ الشَّيْئُ তথা যার উপর ভিত্তি করে কোন কিছু দাঁড়ায়। উমরার রুকন তথা ফরয কয়টি সে সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক ও আহমদের (রহ.) মতে, উমরার রুকন তিনটি। যথা-

ক. ইহরাম বাঁধা খ. বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা

গ. সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সায়ী করা।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, চারটি। উপরোল্লিখিত তিনটিসহ চতুর্থটি হচ্ছে মাথা মুণ্ডানো বা চুল কাটা।

* জমহুরদের মতে, উমরার রুকন হচ্ছে দুটি। যথা-

ক. বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা,

খ. সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সায়ী করা

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে একটি। বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা।

হজ্জ ও উমরার মাঝে পার্থক্যঃ হজ্জ ও উমরা যদিও শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতের সমন্বয়ে একই শ্রেণীর ইবাদত এবং উভয়ই মক্কায় সম্পাদিত হয়। তবুও এ দুই প্রকারের ইবাদতের মাঝে কিছু পার্থক্য রয়েছে। যথা-

আভিধানিক পার্থক্যঃ ক. হজ্জ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ইচ্ছা করা, সাক্ষাৎ করা, ইরাদা করা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে উমরা শব্দের অর্থ হল যিয়ারত করা, আবাদ করা ইত্যাদি।

খ. হজ্জ শব্দটি মাসদার আর উমরা শব্দটি ইসমে মাসদার।

মাদ্দাহগত পার্থক্যঃ حج শব্দটির مادة হল ج – ج – ح জিনসে লাফীফ, عمرة শব্দটির مادة হল ر – م – ع জিনসে সহীহ।

পারিভাষিক পার্থক্যঃ হজ্জ বলা হয় নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে বায়তুল্লাহ যিয়ারত করা। উমরা হল যেকোন সময় নির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে বায়তুল্লাহ্ যিয়ারত করা।

হুকুমগত পার্থক্যঃ

ক. হজ্জ ফরয এবং উমরা সুন্নত।

খ. হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট মাস ও নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কিন্তু উমরার জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। বরং বছরের যেকোন সময় উহা আদায় করা যায়। (তবে হজ্জের পাঁচ দিন ব্যতীত- আরাফার দিন, কুরবানীর দিন, তাশরীফের দিন অর্থাৎ ১১, ১২, ১৩) (العمدة ج١ ص١٠٨)

গ. হজ্জে আরাফাত ও মুযদালিফায় অবস্থান করতে হয়। কিন্তু উমরায় কোন অবস্থান নেই।

ঘ. হজ্জের রুকন তিনটি আর উমরার রুকন দুইটি। (যদিও কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে।)

ঙ. জামরায় কংকর নিক্ষেপ হজ্জের ওয়াজিব। পক্ষান্তরে উমরায় কংকর নিক্ষেপের বিধান নেই।

চ. হজ্জে তিনবার তাওয়াফ করতে হয়। উমরায় মাত্র একবার তাওয়াফ করতে হয়।

ছ. হজ্জ করলে কবীরা (বড়) গুনাহ মাফ হয়ে যায়। উমরার মাধ্যমে কেবল সগীরা (ছোট) গুনাহ মাফ হয়।

জ. কারো কারো মতে, সাধারণত হজ্জকে বড় হজ্জ বলা হয়, পক্ষান্তরে উমরাকে ছোট হজ্জ বলা হয়। ইত্যাদি।

উমরা সুন্নত না ওয়াজিবঃ উমরা সুন্নত না ওয়াজিব, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল, আবু সাওর, সুফিয়ান সাওরী, আওযাঈ (রহ.) ও ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, জীবনে একবার উমরা আদায় করা ওয়াজিব তথা ফরয। (درس ترمذي ج٣ ص٢٠٢)

* বাদায়িউস সানায়ি-এর গ্রন্থকার বলেন যে, আহনাফদের মাযহাবও তাই। অর্থাৎ জীবনে একবার উমরা আদায় করা (সাদাকাতুল ফিতরের ন্যায়) ওয়াজিব। (بدائع الصنائع ج٢ ص٢٢٦)

ইমাম শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর দলীলঃ

দলীল (১)ঃ পবিত্র কুরআনের আয়াত- اَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ

অর্থাৎ, "তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরা সম্পাদন কর।" (বাকারাঃ ১৯৬)
উক্ত আয়াতে উমরা শব্দটিকে ফরয হজ্জের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং হুকুমের ক্ষেত্রেও উভয়টির হুকুম একই হবে। অর্থাৎ উমরাও হজ্জের মত অপরিহার্য বা ওয়াজিব। তাছাড়া, উভয়টির জন্যেই আমর-এর ছীগা ব্যবহার করা হয়েছে, যা ওয়াজিব।

দলীল (২)ঃ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ اِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَرِيْضَتَانِ– (تنظيم الاشتات ج٢ ص٧٥)

অর্থাৎ, যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেন, হজ্জ এবং উমরা দুই ফরয।

* ইমাম মালিক, মুহাম্মদ ইবন ফযল, ইবন হুমাম এবং আবু হানিফা (রহ.)-এর সুপ্রসিদ্ধ মাযহাব হল- জীবনে একবার উমরা আদায় করা সুন্নতে মুআক্কাদা এবং একাধিকবার উমরা করা মুস্তাহাব। (رد المحتار ج٢ ص١٥١، اوجز المسالك ج٣ ص٣٩٠)

দলীল (১)ঃ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ لاَ وَاَنْ يَّعْتَمِرُوْا هُوَ اَفْضَلُ (ترمذي ج١ ص١٨٦ باب في العمرة أواجبة هي ام لا)

অর্থাৎ, হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সাঃ)-কে উমরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এটি কি ওয়াজিব? উত্তরে তিনি বলেন, না। তবে উমরা করা উত্তম।

দলীল (২)ঃ عَنْ جَابِرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْعُمْرَةُ فَرِيْضَةٌ كَالْحَجِّ قَالَ لاَ وَاَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَّكَ– (دار قطني)

অর্থাৎ, ... জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! উমরা কি হজ্জের মত ফরয? উত্তরে তিনি বললেন, না। তবে উমরা করা, তা তোমার জন্য কল্যাণকর।

দলীল (৩)ঃ عَنْ طَلْحَةَ اَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَام يَقُوْلُ اَلْحَجُّ جِهَاد وَالْعُمْرَةُ تَطَوَّعٌ– (ابن ماجة ص٢٢١ باب العمرة)

অর্থাৎ, ... হযরত তালহা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, "হজ্জ জিহাদ তুল্য, আর উমরা নফল কাজের মত।"

দলীল (৪)ঃ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَلْحَجُّ فَرِيْضَةٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوَّعٌ– (تنظيم ج٢ ص٧٥–٧٦)
অর্থাৎ, ... ইবন মাসউদ (রাঃ) বলেন, হজ্জ ফরয এবং উমরা নফল কাজের মত।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উমরা ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নতে মুআক্কাদা।

জবাবঃ প্রতিপক্ষের প্রথম দলীলের জবাবে আহনাফগণ বলেন-
(১) আয়াতে যদিও হজ্জের সাথে উমরা শব্দটির উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু এর দ্বারা হুকুমের ক্ষেত্রেও হজ্জের সাথে সম্পৃক্ততা অপরিহার্য নয়।
(২) উক্ত আয়াতে লক্ষ্য করলে একথা প্রতীয়মান হয় যে, উমরা আরম্ভ করার পরে তা পূর্ণ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। কেননা, নফল আমল শুরু করার পর তা সম্পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়।
(৩) তাছাড়া, শাফেঈদের দলীল হিসেবে প্রদত্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছে ৬ষ্ঠ হিজরীতে। আর এ আয়াত দ্বারা হজ্জ ফরয হয়নি, বরং হজ্জ ফরয করা হয়েছে-

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً (ال عمران آية ٩٧)

আয়াত দ্বারা, যা নাযিল হয়েছে ৯ম হিজরীতে।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ হাদীসটি হিশাম ইবন সীরীন থেকে এবং ইবন সীরীন যায়েদ থেকে মাওকূফভাবে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং হাদীসটি মাওকূফ হওয়ার কারণে তা দলীলযোগ্য নয়। (تنظيم ج٢ ص٧٦)

بَابُ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الْاِفَاضَةِ ص٢٧٤

ঋতুবতী মহিলা যদি তাওয়াফুল বিদার পূর্বে তাওয়াফে ইফাদা সম্পন্ন করে

... عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ فَقِيْلَ اِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّهَا قَدْ اَفَاضَتْ فَقَالَ فَلاَ اِذًا (بخاري ج١ ص٢٣٧ باب اذا حاضت المرأة الخ، مسلم ج١ ص٤٢٧ باب بيان وجوه الاحرام الخ، ترمذي ج١ ص١٨٨ باب في المرأة تحيض بعد الافاضة)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাফিয়া বিনত হুয়াই (রাঃ)-এর কথা জিজ্ঞাসা করেন। তখন তাকে বলা হল, তিনি ঋতুবতী। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, সম্ভবত সে আমাদের আবদ্ধ করে ফেলেছে। (অর্থাৎ তিনি তাওয়াফে যিয়ারত না করা পর্যন্ত আমরা মদীনায় ফিরতে পারব না।) তখন তাঁরা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি তাওয়াফে ইফাদা সম্পন্ন করেছেন। এতদশ্রবণে তিনি বলেন, তবে তো এখনই (আমরা মদীনাতে প্রত্যাবর্তন করতে পারি এবং তার জন্য আর তাওয়াফে বিদার প্রয়োজন নেই।)

বিশ্লেষণঃ ঋতুবতী মহিলার হজ্জ আদায়ের পদ্ধতি। হজ্জ পালন করতে গিয়ে কোন মহিলা যদি হজ্জকালীন সময়ে ঋতুবতী হয়ে যায়, তাহলে সে বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের অন্যসব আহকাম আদায় করবে। যেমন হাদীসে এসেছে-

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حِضْتُ فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا اِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ– (ترمذي ج۱ ص۱۸۸ باب تقضي الحائض من المناسك، بخاري ج۱ ص۲۲۳ باب تقضي الحائض المناسك الخ)

অর্থাৎ, ... হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, আমি ঋতুবতী হয়ে পড়লে নবী করীম (সাঃ) আমাকে নির্দেশ দিলেন, যেন আমি বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের অন্যসব আহকাম আদায় করি।

এটি একটি সাধারণ হুকুম। উল্লেখ্য যে, হজ্জে দু'ধরনের তাওয়াফ আদায় করতে হয়। যথা-

(ক) তাওয়াফে ইফাদা বা তাওয়াফে যিয়ারত। (যা হজ্জের তিনটি ফরযের মধ্যে একটি)

(খ) তাওয়াফুল বিদা বা বিদায়ী তওয়াফ। (যা হজ্জের ওয়াজিবসমূহের একটি)

প্রশ্ন হল, যদি কোন মহিলার তাওয়াফে যিয়ারতের পর এবং বিদায়ী তাওয়াফের পূর্বে মাসিক আসতে শুরু করে, তাহলে সে কি করবে এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে।

* হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর মতে, ঋতুবতী মহিলা যেরূপভাবে তাওয়াফে যিয়ারতের জন্য পবিত্র হওয়ার অপেক্ষা করবে (এ বিষয়ে সামনে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে), অনুরূপভাবে বিদায়ী তাওয়াফের জন্যও অপেক্ষা করবে; অর্থাৎ ঋতুবতী হওয়ার কারণে বিদায়ী তওয়াফ বাতিল হবে না।

(عمدة القاري ج۱۰ ص۹٦)

দলীলঃ ... عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ اَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَاَلْتُهُ عَنِ الْمَرْاَةِ تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ تَحِيْضُ قَالَ لِيَكُنْ اٰخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ قَالَ فَقَالَ الْحَارِثُ كَذٰلِكَ اَفْتَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– (ابو داود ج۱ ص۲۷٤، ترمذي ج۱ ص۱۸۸)

অর্থাৎ, ... হারিস ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আওস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট এসে এমন মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যে ১০ যিলহজ্জ (তাওয়াফে ইফাদা) সম্পন্ন করে, অতঃপর ঋতুবতী হয়ে পড়ে। তিনি বলেন, তার সর্বশেষ উদ্দেশ্য যেন হয় বায়তুল্লাহ তথা তাওয়াফুল বিদা।

বর্ণনাকারী (ওয়ালীদ ইবন আব্দুর রহমান) বলেন, তখন হারিস (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে অনুরূপ ফাতওয়া দিয়েছেন।

* উমর (রাঃ) ব্যতীত অন্য সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, যদি মহিলার মাসিক আসতে শুরু করে, তাহলে তার থেকে বিদায়ী তাওয়াফ বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। প্রথমদিকে যায়েদ ইবন সাবিত ও ইবন উমর (রাঃ)-এর অভিমত হযরত উমর (রাঃ)-এর অনুরূপই ছিল। পরবর্তীতে তাঁদের এই মত পরিবর্তন প্রমাণিত হয়েছে। (عمدة القاري ج١٠ ص٩٦)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ ... عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ اِلاَّ الْحُيَّضَ وَرَخَّصَ لَهُنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (ترمذي ج١ ص١٨٨ باب في المرأة تحيض الخ)

অর্থাৎ, ... হযরত ইবন উমর (রাঃ) বলেন, যে বায়তুল্লাহ শরীফে হজ্জ করবে, সে সর্বশেষে বায়তুল্লাহ শরীফের নিকট যাবে। অর্থাৎ বিদায় হজ্জ করবে। তবে ব্যতিক্রম শুধু ঋতুবতীরা। তাদের জন্য নবী করীম (সাঃ) অবকাশ দিয়েছেন। তাদের জন্য ঋতু থেকে পবিত্র হয়ে বিদায়ী তাওয়াফের অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।

জবাবঃ হযরত উমর (রাঃ)-এর প্রদত্ত দলীলের জবাবে ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, (১) উক্ত হাদীসটি হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। (شرح معاني الآثار ج١ ص٣٥٩)

(২) আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) হযরত উমর (রাঃ)-এর মতের এই প্রয়োগ ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর মতে ঋতুবতী মহিলা থেকে বিদায়ী তাওয়াফ তখন বাদ পড়ে না, যখন প্রচুর সময় এবং অবকাশ থাকে। অর্থাৎ, যদি তার জন্য অবস্থান করা সম্ভব হয়, তাহলে অবস্থান করা জরুরী হবে। কিন্তু যদি সময়ের সংকীর্ণতা ও সফরের তাড়া থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় তাঁর মতেও আয়িশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করা হবে। (معالم السنن للخطابي ج٢ ص٤٢٩)

তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে যদি কোন মহিলার মাসিক আসতে শুরু হয়, তাহলে এর হুকুমঃ

পূর্বের হুকুমঃ এমন মহিলাকে তাওয়াফে যিয়ারত হতে বিরত থেকে পবিত্রতার অপেক্ষা করতে হবে। পবিত্র হওয়ার পর তাওয়াফে যিয়ারত আবশ্যক হবে। এ ব্যাপারে সমস্ত ইমাম একমত পোষণ করেন। (المغني ج٣ ص٤٤٠)

বর্তমান হুকুমঃ বর্তমান আধুনিক যুগে যেখানে হাজীদের যাতায়াত, অবস্থানের তারিখ এবং সময় সুনির্দিষ্ট হয়ে থাকে এবং ভিসার সীমিত তারিখ থাকে। কোন হাজীর জন্য সেসব তারিখ ও সময় পরিবর্তনের ইখতিয়ার থাকে না এবং আইনের দৃষ্টিতে তার জন্য অপেক্ষা করাও সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় হায়েয ও নিফাস বিশিষ্ট মহিলা স্বীয় পবিত্রতাকালে তাওয়াফে যিয়ারত করতে না পারলে সে কি করবে- এ প্রশ্নের জবাবে আল্লামা ইবন তাইমিয়া (রহ.) সমাধান দিতে গিয়ে বলেন, এরূপ মহিলা নাপাক অবস্থায়ই তাওয়াফ করে নিবে এবং ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাযহাব অনুযায়ী একটি দম (পশু কুরবানী) দিয়ে এর ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেবে। (فتاوى ابن تيمية ج٢٦ ص٢٤٢-٢٤٤)

তবে, যদি পবিত্র হওয়া ও তাওয়াফ করা পর্যন্ত মহিলার জন্য মক্কাতে অবস্থান করা সম্ভব হয়, তবে তাওয়াফ তার জন্য নিঃসন্দেহে ওয়াজিব হবে। (درس ترمذي ج٣ ص٢١٨)

بَابُ فِيْ مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْئٍ فِيْ حَجِّهٖ ص٢٧٥

হজ্জের সময় যদি কেউ আগের কাজ পরে বা পরের কাজ আগে করে

... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّهٗ قَالَ وَقَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ بِمِنًى يَسْأَلُوْنَهٗ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ لَمْ اَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ وَجَاءَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَمْ اَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلاَ حَرَجَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْئٍ قُدِّمَ اَوْ اُخِّرَ اِلاَّ قَالَ اصْنَعْ وَلاَ حَرَجَ-(بخاري ج١ ص٢٣٢ باب الذبح قبل الحلق، مسلم ج١ ص٤٢١ باب جواز تقديم الذبح على الرمي والحلق الخ، ترمذي ج١ ص١٨٢ باب من حلق قبل ان يذبح الخ، ابن ماجة ص٢٢٥)

অনুবাদঃ ... আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন; বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মিনাতে অবস্থান করেন। এ সময় লোকেরা তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে থাকে। এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জানতাম না, তাই কুরবানীর পূর্বে মস্তক মুন্ডন করে ফেলেছি। (এমতাবস্থায় কি করব?) তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তুমি এখন কুরবানী কর এবং এতে কোন ক্ষতি নেই। তখন অপর ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অবহিত ছিলাম না, তাই কংকর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করে ফেলেছি। তখন জবাবে তিনি বলেন, তুমি এখন কংকর নিক্ষেপ কর এবং এতে কোন দোষ নেই। আর এদিন

তাঁকে পূর্বে-পরে (হজ্জের কাজ) করা সম্পর্কে যত প্রশ্ন করা হয় তার জবাবে তিনি বলেন, তুমি এখন কর এবং এতে কোন দোষ নেই।

বিশ্লেষণঃ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, ইয়াওমুন নহর বা যিলহজ্জের ১০ তারিখে হাজীগণ চারটি কাজ করে থাকেন। যথা-

১. কংকর নিক্ষেপ করা
২. কুরবানী করা
৩. মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করা
৪. তাওয়াফে যিয়ারত করা।

(مسلم ج١ ص٣٩٩-٤٠٠، البحر الرائق ج٣ ص٢٤، بداية المجتهد ج١ ص٢٥٧)

প্রশ্ন হল, উপরোল্লিখিত চারটি কাজে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা আবশ্যক কিনা। এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ও সাহেবাইন (রহ.) সহ জমহুর ফকীহ সাহাবী ও আলিমদের মতে, এগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সুন্নত, ওয়াজিব নয়। তাই ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হলে দম (পশু কুরবানী) দিতে হবে না।

(المغني ج٣ ص٣٤٦-٣٤٨، الانصاف ج٤ ص٤٢)

দলীল (১)ঃ পূর্বোল্লিখিত হাদীস।
দলীল (২)ঃ ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত-

... فَسَأَلَه رَجُلٌ فَقَالَ اِنِّيْ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ قَالَ اِذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ الخ (ابو داود ج١ ص٢٧١ باب الحلق والتقصير، بخاري ج١ ص٢٣٤ باب اذا رمي بعدما الخ، مسلم ج١ ص٤٢١، ترمذي ج١ ص١٨٢، ابن ماجة ص٢٢٥)

অর্থাৎ, ... জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করে, আমি কুরবানীর পূর্বে মস্তক মুণ্ডন করেছি। (এমতাবস্থায় কি করব?) জবাবে তিনি বলেন, তুমি কুরবানী (এখন) কর। এতে কোন দোষ নেই।

উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে নবী করীম (সাঃ) لاَ حَرَجَ তথা "এতে কোন দোষ নেই" বলেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, ধারাবাহিকতা ওয়াজিব নয়, নতুবা তিনি (সাঃ) দমের কথা অবশ্যই উল্লেখ করতেন।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, এগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ওয়াজিব। তাই এই ধারাবাহিকতা ইচ্ছাকৃত বা ভুলে অথবা না জেনে তরক করে ফেললে দম দেয়া ওয়াজিব। ইবরাহীম নাখঈর অভিমতও তাই।

(معارف السنن ج٦ ص٤٤٥، مبسوط للسرخسي ج٤ ص٤١-٤٢)

দলীলঃ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا مِنْ حَجِّهٖ اَوْ اَخَّرَهٗ فَلْيُهْرِقْ لِذٰلِكَ دَمًا– (طحاوي ج١ ص٣٦٠، نصب الراية ج٣ ص١٢٩)

অর্থাৎ, ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে হজ্জের কোন কাজ আগে করে ফেলেছে কিংবা পরে করে ফেলেছে, সে যেন একটি দম (পশু) জবাই করে।

জবাবঃ ১। ইমাম হুমাম (রহ.) বলেন, হাদীসদ্বয়ে لَا حَرَجَ (কোন ক্ষতি নেই) দ্বারা "দম ওয়াজিব নয়" একথা বুঝানো হয়নি। বরং এর দ্বারা গুনাহ হবে না, এবং পরকালে পাকড়াও করা হবে না বুঝানো উদ্দেশ্য।

২। অথবা, হাদীসটি রাসূল (সাঃ)-এর বিদায় হজ্জের সাথে খাস। কেননা ইহা সাহাবাদের প্রথম হজ্জ ছিল বিধায়, অজ্ঞতাবশতঃ তাদের ধারাবাহিকতা লংঘিত হয়েছিল। তাই রাসূল (সাঃ) উদারতা প্রদর্শন করেছেন। পরবর্তীতে এই শিথিলতা রহিত হয়ে গেছে। এর সমর্থন তাহাবীতে বর্ণিত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতটি যথেষ্ট। (طحاوي ج١ ص٣٦٠)

৩। ইবন আব্বাস (রাঃ) لَا حَرَجَ বিশিষ্ট হাদীসের বর্ণনাকারী হওয়া সত্ত্বেও যখন দম ওয়াজিব হওয়ার ফাতওয়া দিচ্ছেন, এতে বুঝা যায় যে, لَا حَرَجَ দ্বারা গুনাহ হবে না বুঝানোই উদ্দেশ্য, দম ওয়াজিব হওয়াকে নিষেধ করা উদ্দেশ্য নয়।

(فتح الملهم ج٣ ص٣٤١)

بَابُ الصَّلٰوةِ فِي الْكَعْبَةِ ص٢٧٧ ঃ কাবা ঘরের মধ্যে নামায

... عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ وَبِلَالٌ فَاَغْلَقَهَا عَلَيْهِ فَمَكَثَ فِيْهَا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَسَاَلْتُ بِلَالًا حِيْنَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جَعَلَ عَمُوْدًا عَنْ يَّسَارِهٖ وَعَمُوْدَيْنِ عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَثَلٰثَةَ اَعْمِدَةٍ وَرَاءَهٗ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلٰى سِتَّةِ اَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلّٰى– (بخاري ج١ ص٢١٧ باب اغلاق البيت ويصلي الخ، مسلم ج١ ص٤٢٨ باب استحباب دخول الكعبة، نسائي ج١ ص١١٢ الصلوة في الكعبة)

অনুবাদঃ ... আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কাবার মধ্যে প্রবেশ করেন এবং এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন উসামা ইবন যায়িদ, উসমান ইবন তালহা আল-হাজবী (কাবার দারোয়ান) এবং বিলাল (রাঃ)। অতঃপর তিনি (ভীড়ের আশংকায়) এর দরজা বন্ধ করে দেন। পরে তিনি তন্মধ্যে অবস্থান করেন। রাবী আব্দুল্লাহ ইবন উমর বলেন, অতঃপর আমি বিলাল (রাঃ)-কে সেখান হতে বের হওয়ার পর জিজ্ঞাসা করি, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখানে কি করেন? জবাবে তিনি বলেন, তিনি একটি স্তম্ভকে বামদিকে, দুটি স্তম্ভকে ডানদিকে এবং তিনটি স্তম্ভকে পশ্চাতে রেখে নামায আদায় করেন এবং এ সময় বায়তুল্লাহ ছয়টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বিশ্লেষণঃ কাবা ঘরের ভিতরে নামায পড়া জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছেঃ

* হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, কাবা ঘরের ভিতরে কোন প্রকার নামায পড়া জায়েয নয়। কোন কোন মালিকী, তাবারী এবং আহলে যাহিরের অভিমতও তাই। (فتح الباري ج٣ ص٣٧٤)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ–

অর্থাৎ, অতএব, এখন আপনি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেদিকে মুখ কর। (বাকারাঃ ১৪৫)

উক্ত আয়াতে কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। অতএব, কেউ যদি কাবার ভিতরে নামায পড়ে, তাহলে পুরো কাবা সামনে থাকে না; বরং কাবার কতক অংশ নামাযীর পিছনে পড়ে যায়। যা আয়াতের পরিপন্থী।

দলীল (২)ঃ ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ اَبٰى اَنْ يَّدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيْهِ الْاٰلِهَةَ ... قَالَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِيْ نَوَاحِيْهِ وَفِيْ زَوَايَاهُ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ فِيْهِ– (ابو داود ج١ ص٢٧٧، بخاري ج١ ص٢١٨)

অর্থাৎ, ... (স্বয়ং) ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) যখন মক্কায় আগমন করেন, তখন তিনি বায়তুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করতে অস্বীকার করেন। কেননা সেখানে তখন অসংখ্য দেব-দেবী বিদ্যমান ছিল। ... ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, অতঃপর তিনি বায়তুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করেন এবং এর প্রতিটি কোণায় তাকবীর (আল্লাহু আকবার) উচ্চারণ করেন এবং এর প্রতিটি রুকনেও। অতঃপর তিনি সেখানে নামায আদায় না করে বের হয়ে আসেন।

দলীল (৩)ঃ ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন-

أَخْبَرَنِيْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِيْ نَوَاحِيْهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيْهِ حَتَّى خَرَجَ– (مسلم ج١ ص٤٢٩)

অর্থাৎ, আমাকে উসামা ইবন যায়েদ (রাঃ) সংবাদ দিয়েছেন যে, নবী করীম (সাঃ) যখন বাইতুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করেছেন, তখন তার সবদিকেই দুআ করেছেন। বের হওয়া পর্যন্ত তাতে নামায পড়েননি।

* ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, কাবা শরীফে নফল নামায পড়া জায়েয আছে। কিন্তু ফরয নামায পড়া মাকরূহ। (فتح الباري ج٣ ص٣٧٤)

কেননা, নবী করীম (সাঃ) হতে ইহাই প্রমাণিত আছে যে, তিনি কাবাগৃহে শুধু নফল নামায পড়েছেন। ফরয নামায পড়েননি।

* ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ (রহ.) সহ জমহূরের মতে, কাবাগৃহে ফরয এবং নফল উভয় প্রকার নামায আদায় করা জায়েয আছে। (تنظيم الاشتات ج١ ص٢٦١)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَيْفَ صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ– (ابو داود ج١ ص٢٧٧)

অর্থাৎ, আব্দুর রহমান ইবন সাফওয়ান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কাবার মধ্যে প্রবেশ করে কি করেন? তখন জবাবে তিনি বলেন, তিনি সেখানে দুই রাকাত নামায আদায় করেন।

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ بِلَالٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيْ جَوْفِ الْكَعْبَةِ– (ترمذي ج١ ص١٧٦ باب الصلوة في الكعبة)

অর্থাৎ, ... হযরত বিলাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাঃ) কাবার অভ্যন্তরে নামায পড়েছেন।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) যেহেতু কাবায় নামায পড়েছেন, তাই কাবার ভিতরে যেকোন নামায আদায় করা বৈধ।

জবাবঃ হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) আয়াত দ্বারা পুরো কাবা শরীফ নামাযীর সামনে থাকার যে যুক্তি পেশ করেছেন, এর জবাবে জমহূরগণ বলেন যে, নামায শুদ্ধ

হওয়ার জন্য পুরো কাবা সামনে থাকা শর্ত নয়; বরং কতক অংশ সামনে থাকাই যথেষ্ট। যা বেলাল (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস থেকে প্রমাণ মিলে যে, স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) কাবা শরীফের ভিতরে নামায পড়েছেন। সুতরাং পুরো কাবা নবী করীম (সাঃ)-এর সামনেও ছিল না। (تنظيم الاشتات ج١ ص٢٦١)

তাছাড়া আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) বলেন, যদিও আসল কিবলা বায়তুল্লাহ তথা কাবা; কিন্তু কাবার দিকে মুখ করা সেখান থেকেই সম্ভব, যেখান থেকে তা দৃষ্টিগোচর হয়। তাই দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে হুবহু কাবার দিকে মুখ করে বিশেষ যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রের মাধ্যমেও নির্ভুল দিক নির্ণয় করে নামায পড়া আদৌ সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের আয়াতে কাবার কথা উল্লেখ না করে 'মাসজিদুল হারাম' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এবং সংক্ষিপ্ত শব্দ إِلَى (দিক)-এর পরিবর্তে شَطَرَ শব্দটি ব্যবহার করায় কিবলার দিকে মুখ করার ব্যাপারটি আরো সহজ হয়ে গেছে। شَطَرَ দু' অর্থে ব্যবহৃত হয়- বস্তুর অর্ধাংশ ও বস্তুর দিক। আলোচ্য আয়াতে এর অর্থ হচ্ছে বস্তুর দিকে। এতে বুঝা যায় যে, (দূরবর্তী দেশসমূহে বা অঞ্চলে) বিশেষভাবে মসজিদে হারামের দিকে মুখ করাও জরুরী নয়। মসজিদে হারাম যেদিকে অবস্থিত সেদিকের প্রতি মুখ করাই যথেষ্ট। (معارف القرآن البقرة آية ١٤٥)

উপরোল্লিখিত আলোচনায় বুঝা গেল যে, নামায সহীহ হওয়ার জন্য পুরো কাবা সামনে থাকা জরুরী নয়; বরং কতক অংশ সামনে থাকলেই চলবে। আর কাবা শরীফে নামায পড়লে তো কাবার দিকেই মুখ ফেরানো হয়।

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) কাবায় নামায পড়েননি, বরং শুধুমাত্র তাকবীর বলেছেন। পক্ষান্তরে বিলাল (রাঃ)-এর উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) তথায় নামায আদায় করেছেন। আর বিলাল (রাঃ)-এর বাণীকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে জমহুরগণ বেশ কিছু যুক্তি ও বাস্তব প্রেক্ষাপট উল্লেখ করেছেন। যেমন-

১. নবী করীম (সাঃ) কাবা শরীফে মোট দুইবার প্রবেশ করেন, একবার নামায আদায় করেন এবং দ্বিতীয়বার নামায আদায় করেননি। আর ইবন আব্বাস (রাঃ) দ্বিতীয় অবস্থাটির বর্ণনা করেছেন। (معارف السنن ج٦ ص٤٠٥)

২. বিলাল (রাঃ)-এর হাদীসটি হল হাঁ-বোধক এবং ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসটি হল না-বোধক। আর নিয়ম অনুযায়ী বিলাল (রাঃ)-এর হাঁ-বোধক হাদীসটি প্রাধান্য লাভ করবে।

৩. অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে জানা গেল যে, কাবায় প্রবেশকালে নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে তিনজনের একজন হলেন বিলাল (রাঃ)। সেখানে ইবন আব্বাস (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন না।

* তৃতীয় দলীলের জবাবে জমহুরগণ বলেন-

(১) কাবা শরীফে প্রবেশের পর তাঁরা পৃথক হয়ে যান। আর এ সময় নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে বিলাল (রাঃ) এক কোণে থাকেন। এ সময় কাবার দরজাও বন্ধ করে দেয়া হয়। বুখারীতে উল্লেখ আছে-

فَأَغْلَقُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ– (بخاري ج١ ص٢١٧، مسلم ج١ ص٤٢٨) অর্থাৎ তাঁদের উপর কাবার দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে অধিক অন্ধকার হয়ে যায় এবং মাঝখানে স্তম্ভও প্রতিবন্ধক ছিল। তাই উসামা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-কে নামায পড়তে দেখতে পাননি।

(২) কেউ কেউ এর জবাব দিতে গিয়ে বলেন, নবী করীম (সাঃ) কাবার ভিতরের দেয়ালে অংকিত ছবি উঠিয়ে ফেলার জন্য হযরত উসামা ইবন যায়েদকে পানি আনতে পাঠান। আর এই ফাঁকে নবী করীম (সাঃ) দুই রাকাত নামায আদায় করে নেন। যার ফলে নবী করীম (সাঃ)-এর নামাযের ব্যাপারে তিনি অবহিত ছিলেন না।

(فتح الباري ج٣ ص٣٧٥)

(৩) সর্বোপরি বলা যায় যে, হযরত বিলাল (রাঃ) শুধু নবী করীম (সাঃ)-এর নামাযের বর্ণনাই দেননি; বরং হযরত ইবন উমর (রাঃ)-এর প্রশ্নের জবাবে তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর নামাযের পূর্ণ অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন। যা অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীসে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

* মালিকীগণ কাবায় ফরয নামায পড়ার ক্ষেত্রে যে মাকরূহ বলেছেন, এর জবাবে জমহুরগণ বলেন যে, কাবায় (যেকোন) নামায পড়ার ক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপন হওয়ার মূল কারণ এই যে, এতে কাবার কিছু অংশ নামাযীর পিছনে থাকে। অথচ নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং আমল করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ইহা নামায জায়েযের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই। যখন একথা সাধারণভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, কাবাগৃহে নামায পড়া বৈধ, সুতরাং ফরয নামায কাবাগৃহে কেন জায়েয হবে না? এবং মাকরূহই বা হবে কেন? নাজায়েয হওয়ার জন্য তো সুনির্দিষ্ট কোন দলীল পাওয়া যায় না। অথচ এ ব্যাপারে মালিকীগণ দলীল প্রদান করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। সুতরাং ফরয এবং নফলের মধ্যে মনগড়া কোন বৈষম্য করা যাবে না। কেননা, ফরয ও নফল নামাযের হুকুম পবিত্রতা ও কিবলার ক্ষেত্রে অভিন্ন। (درس ترمذي ج٣ ص١٣٠)

بَابُ فِيْ اِتْيَانِ الْمَدِيْنَةِ ص٢٧٨ ঃ মদীনায় আগমন

... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلٰى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِيْ هٰذَا وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى– (مسلم ج١ ص٤٤٧ باب فضل المساجد الثلاثة، ترمذي ج١ ص٧٥ باب اي المساجد افضل، نسائي ج١ ص١١٤ ما تشد الرحال اليه من المساجد، ابن ماجة ص١٠٣)

অনুবাদঃ ... আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, তোমরা তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও গমনের জন্য সফর করবে না- মাসজিদুল হারাম, আমার এ মসজিদ (নববী) এবং মাসজিদুল আকসা।

بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ ص٢٧٩ ঃ কবর যিয়ারত

... عَنْ رَبِيْعَةَ يَعْنِيْ ابْنَ الْهُدَيْرِ قَالَ مَا سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا قَطُّ غَيْرَ حَدِيْثٍ وَّاحِدٍ قَالَ قُلْتُ وَمَا هُوَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيْدُ قُبُوْرَ الشُّهَدَاءِ حَتّٰى اِذَا اَشْرَفْنَا حُرَّةِ وَاقِمٍ فَلَمَّا تَدَلَّيْنَا مِنْهَا فَاِذَا قُبُوْرٌ بِمَحْنِيَةٍ الخ

অনুবাদঃ ... রাবীআ অর্থাৎ ইব্ন আল হুদায়ের হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তালহা ইবন আব্দুল্লাহকে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে একটি হাদীস ব্যতীত আর কোন হাদীস বর্ণনা করতে শুনিনি। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি, সেটা কি? তখন জবাবে তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে শহীদদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হই। অতঃপর আমরা যখন 'হুররাতে ওয়াকিম' নামক স্থানে উপনীত হই, তখন সেখানে অবতরণ করি, যেখানে তাদের কবর ছিল।

বিশ্লেষণঃ কবর যিয়ারত জায়েয কিনা, এ নিয়ে ফকীহগণের নিকট মতানৈক্য রয়েছেঃ

* উপরোল্লিখিত হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীসের আলোকে আল্লামা ইবন তাইমিয়া, শায়খ আবু মুহাম্মদ আল-জাওনী, কাজী হুসাইন ও ইয়ায (রহ.)-এর মতে, হাদীসে বর্ণিত তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন জায়গায় সফরের জন্য যাওয়া জায়েয নয়। আর নিষিদ্ধতার এই ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা বলেন যে, কোন পীর, বুযুর্গ এমনকি নবী করীম (সাঃ)-এর কবরও যিয়ারত করা জায়েয নয়।

তবে কেউ যদি মসজিদে নববীর নিয়তে সফর করে, তাহলে নবী করীম (সাঃ)-এর কবর যিয়ারত করা জায়েয আছে।

(تنظيم الاشتات ج١ ص٢٦٤، مجمع البحار ج١ ص١٥٨، درس ترمذي ج٢ ص١١٢)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে রওজা মুবারকের কথা উল্লেখ নেই। তাঁরা আরো বলেন যে, যেহেতু হাদীসে **حرف استثناء** (ব্যতিক্রমের হরফ) **اِلاَّ** (ব্যতীত) এসেছে, সুতরাং এর একটি **مستثنى منه** (যা থেকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে) উহ্য রয়েছে। আর তা হল **مَوْضَعٍ** অর্থাৎ যে কোন স্থান, যা সাধারণ। সুতরাং মূল বাক্যটি হবে নিম্নরূপ- **لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلٰى مَوْضَعٍ اِلاَّ اِلٰى ثَلاَثَةَ مَسَاجِدَ**

অর্থাৎ, তোমরা তিনটি মসজিদ ব্যতীত কোথাও গমনের জন্য সফর করবে না। সুতরাং কারো কবর যিয়ারতের জন্য সফর করা জায়েয নয়। এমনকি নবী করীম (সাঃ)-এর রওজার উদ্দেশ্যেও নয়।

* ইবন হাযম (রহ.)-এর মতে, পুরুষদের জন্য কবর জীবনে একবার হলেও যিয়ারত করা ওয়াজিব। (فتح الباري ج٣ ص١٤٨، تنظيم الاشتات ج١ ص٥٢٩)

দলীলঃ ... **عَنْ بُرَيْدَةَ اَنَّه عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةُ الْقُبُوْرِ فَقَدْ اُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِيْ زِيَارَةِ قَبْرِ اُمِّه فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُوْ الْآخِرَةَ** – (ترمذي ج١ ص٢٠٣ باب في الرخصة في زيارة القبور، مسلم ج١ ص٣١٤ فصل في الذهاب إلى زيارة القبور، نسائي ج١ ص٢٨٥–٢٨٦ زيارة القبور)

অর্থাৎ, ... হযরত বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। মুহাম্মদকে তার মাতার কবর যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। অতএব, তোমরা কবর যিয়ারত কর। কারণ, ইহা আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

উক্ত হাদীসে কবর যিয়ারত করার জন্য নির্দেশের (আমর) ছীগা ব্যবহৃত হয়েছে। আর আমর আসে ওয়াজিবের জন্য। (نيل الاوطار ج٤ ص١١٧–١١٨)

* সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের ঐকমত্য রয়েছে যে, পুরুষের জন্য কবর যিয়ারত মাসনূন ও মুস্তাহাব, তবে ওয়াজিব নয়। এবং নবী করীম (সাঃ)-এর কবর যিয়ারত করা অনেক ফযীলতের কাজ। (شرح نووي ج١ ص٣١٤، فتاواي شامي ج١ ص٢٠٤)

দলীল (১)ঃ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِيْ بَعْدَ مَوْتِيْ كَمَنْ زَارَانِيْ فِيْ حَيَاتِيْ– (تنظيم الاشتات ج١ ص٢٦٥)

অর্থাৎ, ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, আমার ইন্তিকালের পর যে ব্যক্তি হজ্জ সম্পাদন করতঃ আমার কবর যিয়ারত করল, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার যিয়ারত করল।

দলীল (২)ঃ ... اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَ مَنْ زَارَنِيْ مُتَعَمِّدًا كَانَ فِيْ جَوَارِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– (تنظيم الاشتات ج١ ص٢٦٥)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার (রওজা) যিয়ারত করল, সে কিয়ামতের দিন আমার প্রতিবেশী হবে।

দলীল (৩)ঃ নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

مَنْ زَارَ قَبْرِيْ وَجَبَتْ لَه شَفَاعَتِيْ– (الجامع الصغير للسيوطي ج٢ ص١٧١)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করল, তার জন্য সুপারিশ করা আমার দায়িত্ব হয়ে গেল।

অন্যান্য কবর যিয়ারত বৈধতার দলীল-

(১) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হযরত রাবীআ অর্থাৎ ইবন আল-হুদায়েরের হাদীস।

(২) ইবন হাযম (রাঃ)-এর অভিমতের পক্ষে প্রদত্ত হাদীস। উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, ইসলামের প্রথম দিকে যখন লোকজনের আকীদা পরিপক্ক ছিল না, তখন নবী করীম (সাঃ) কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে যখন ধর্মবিশ্বাস পরিপক্ক হল, তখন কবর যিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন।

(৩) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِيْ قُبُوْرَ الشُّهَدَاءِ بِأَحَدِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ– (فتاواى شامي ج١ ص٢٠٤)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) শুহাদায়ে উহুদের কবরে প্রতি বছরের শুরু বা শেষে উপস্থিত হতেন।

জবাবঃ ইবন তাইমিয়াহ ও অন্যান্যদের দলীল হিসেবে পেশকৃত হাদীসের জবাবে জমহূরগণ বলেন যে, আসলে উক্ত হাদীসের দ্বারা উদ্দেশ্য হল শুধুমাত্র তিনটি মসজিদের ফযীলত বর্ণনা করা। সুতরাং উক্ত হাদীসে **مستثنى منه** কে ব্যাপকভাবে **موضع** শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা জায়েয নয় এবং যুক্তিযুক্তও নয়। কেননা তখন এর অর্থ

দাঁড়ায়, তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও যেমন, ইলম অন্বেষণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ, হালাল মাল উপার্জন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে কোথাও সফর করা জায়েয নয়। অথচ একথা কেউ মেনে নেবে না। বরং এগুলো করা হালাল এবং সওয়াবের কাজ।

সুতরাং **مستثنى منه** কে এভাবে ব্যাপক না মেনে মসজিদ (**مسجد**) শব্দ দ্বারা খাস মানা অধিক যুক্তিযুক্ত। যা উক্ত হাদীসের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তখন মূল বাক্যটি হবে- لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلٰى مَسْجِدٍ اِلاَّ اِلٰى ثَلٰثَةَ مَسَاجِدَ– (درس ترمذي ج٢ ص١١٣)
অর্থাৎ, তিনটি মসজিদ ব্যতীত তোমরা অন্য কোন মসজিদে গমনের জন্য সফর করবে না।

* তাছাড়া উপরিউক্ত বিষয়টি স্পষ্টভাবে হাদীসেই বর্ণিত আছে-

لَا يَنْبَغِيْ لِلْمُصَلِّيْ اَنْ يَّشُدَّ رِحَالَهُ اِلٰى مَسْجِدٍ يَبْتَغِيْ فِيْهِ الصَّلٰوةَ غَيْرَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى وَمَسْجِدِيْ هٰذَا– (مسند احمد)

অর্থাৎ, কোন সাওয়ারীর অধিকারীর জন্য মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও আমার এই মসজিদ তথা মসজিদে নববী ছাড়া অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে নামাযের জন্য সফর করা সমীচীন নয়।
সুতরাং, আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) ও আউলিয়াদের কবর যিয়ারত করা জায়েয এবং সওয়াবের কাজ।
* ইবন হাযমের দলীলের জবাবে আলিমগণ বলেন যে, হাদীসে যদিও কবর যিয়ারতের জন্য আমরের সীগা ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু উসূল হল- নিষেধের পর যখন কোন আমর আনা হয়, তখন তা ওয়াজিবের জন্য আসে না; বরং তখন ইহা আসে বৈধতা বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ পূর্বে কবর যিয়ারত নিষেধ ছিল, পরবর্তীতে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। (تنظيم الاشتات ج١ ص٥٢٩)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত জায়েয কিনা, এ নিয়ে ফকীহদের মাঝে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছেঃ
* কতক আলেমের মতে, মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত নাজায়েয তথা মাকরূহ।
(شرح المهذب ج٥ ص٣٠٩)

দলীলঃ ... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ– (ابن ماجة ص١١٤ باب في النهى عن زيارة الخ، ترمذي ج١ ص٢٠٣ باب زيارة القبور للنساء)
অর্থাৎ, ... হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বেশি বেশি কবর যিয়ারতকারীণীদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং অধিকাংশ আলেমের মতে, যদি ফেতনার আশংকা না থাকে, ধৈর্যশক্তি খুব বেশি হয় এবং কবরের পার্শ্বে কান্নাকাটি ও বিলাপ শুরু করার আশংকা না থাকে, এমন মহিলার জন্য কবর যিয়ারত করা জায়েয আছে।

(المغني ج٢ ص٥٧٠، الفقه الاسلامي وادلته ج٢ ص٥٣٩-٥٤٢، مبسوط ج٢٤ ص١٠، فتاوى عالمكيري ج٥ ص٣٥٠)

দলীল (১)ঃ হযরত বুরাইদা (রাঃ)-এর হাদীস। (হাদীসটি উক্ত অনুচ্ছেদে ইবন হাযামের দলীল হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।) তাতে নিষেধের পর فزوروها তথা 'তোমরা কবর যিয়ারত কর' নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যা নারী-পুরুষকে অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ মহিলারা সমস্ত আহ্কামে পুরুষদের অধীন হয়।

দলীল (২)ঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছেন-

كَيْفَ اَقُوْلُ لَهُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ (تَعْنِيْ اِذَا زَارَاتِ الْقُبُوْرَ)

অর্থাৎ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাতে কিরূপ বলব? (অর্থাৎ, যখন মহিলারা কবর যিয়ারত করে।) উত্তরে নবী করীম (সাঃ) বললেন, তুমি বল-

اَلسَّلَامُ عَلٰى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ وَاَنَا اِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ- (مسلم ج١ ص٣١٤)

অর্থাৎ, কবরবাসী মুমিন-মুসলমানদের প্রতি সালাম। আল্লাহ তাআলা আমাদের মধ্য থেকে অগ্রগামী ও পশ্চাৎগামী সবার প্রতি দয়া করুন। আমরাও ইনশাআল্লাহ অবশ্যই তোমাদের সাথে মিলিত হব।

দলীল (৩)ঃ মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত জায়েয হওয়ার আরেকটি প্রমাণ হল, আত-তামহীদে আব্দুল্লাহ ইবন আবু মুলাইকা (রহ.)-এর রেওয়ায়েতে- হযরত আয়িশা (রাঃ) একদিন কবরস্থান থেকে এগিয়ে এলেন। আমি তাকে বললাম, উম্মুল মুমিনীন! আপনি কোত্থেকে এলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমার ভাই আব্দুর রহমানের কবর থেকে। আমি তাঁকে বললাম, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কি কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেননি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। প্রথমে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করতেন, অতঃপর কবর যিয়ারত করার অনুমতি দিয়েছেন। (عمدة القاري ج٨ ص٦٩)

তাছাড়া মহিলাদের জন্য যে কবর যিয়ারত জায়েয, এ ব্যাপারে আরো অনেক হাদীস রয়েছে।

জবাবঃ (১) অভিসম্পাতের হাদীসটি ছিল নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রদানের পূর্বেকার। যখন তিনি অনুমতি দিয়েছেন, তখন এতে নারী এবং পুরুষ সবাই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

(২) কুরতুবী (রহ.) বলেন, উক্ত হাদীসে মূলত ঐ সকল মহিলাদের উপর অভিসম্পাত করা হয়েছে, যে খুব বেশি বেশি কবর যিয়ারত করে। কেননা, এর দ্বারা অনেকাংশে স্বামীর হক নষ্ট হয় এবং বাধাহীনভাবে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করে থাকে। (تنظيم الاشتات ج١ ص٥٢٩)

সতর্কীকরণঃ আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) বলেন, অবস্থার পরিবর্তনে বর্তমানে হুকুম পরিবর্তিত হবে। অর্থাৎ, যদি মহিলাদের থেকে বেশি অস্থিরতা অথবা বেপর্দেগী, পুরুষের সাথে মেলামেশা অথবা বিদআতে লিপ্ত বা অন্য কোন ফিতনার আশঙ্কা হয়, তবে নিষেধই প্রাধান্য পাবে। (العرف الشذى ج١ ص٢٠٢)

তিনি আরো বলেন, যেহেতু ফিতনার যুগে আউলিয়াদের মাযারে গিয়ে মানুষ বহু গর্হিত, বিদআতী এবং প্রচলিত বিভিন্ন কুপ্রথামূলক এমন এমন শিরকী কাজ করে যা কুফরীর সমপর্যায়। তাই তাদের কবর যিয়ারত করার জন্য সফর করা জায়েয নয়।

(فتاوى رشيدية ج٣ ص٣٣)

كِتَابُ النِّكَاحِ ঃ বিবাহ অধ্যায়

بَابُ التَّحْرِيْضِ عَلَى النِّكَاحِ ص٢٧٩
বিবাহে উৎসাহ প্রদান

... عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنِّي لأَمْشِيْ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ بِمِنًى إِذَا لَقِيَهُ عُثْمَانُ فَاسْتَخْلاَهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ اَنْ لَّيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِيْ تَعَالَى يَا عَلْقَمَةُ فَجِئْتُ فَقَالَ لَه عُثْمَانُ اَلاَ تُزَوِّجُكَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ جَارِيَةً بِكْرًا لَعَلَّهُ يَرْجِعُ اِلَيْكَ مِنْ نَّفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَئِنْ قُلْتُ ذَاكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّه اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرَجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّه لَهٗ وِجَاءٌ– (بخاري ج٢ ص٧٥٨ باب قول النبي صلعم من استطاع منكم الخ، مسلم ج١ ص٤٤٨–٤٤٩ باب استحباب النكاح لمن الخ، نسائي ج٢ ص٦٨ الحث على النكاح)

অনুবাদঃ ... আলকামা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর সাথে মিনাতে গমনকালে উসমানের সাথে সাক্ষাত হলে তিনি তাঁর নিকট হতে দূরে সরে নির্জন আলাপের জন্য অনুমতি চান। অতঃপর যখন আব্দুল্লাহ দেখতে পান যে, তাঁর (বিবাহের) কোন প্রয়োজন নাই, তিনি আমাকে বলেন, হে আলকামা! আমার নিকট এসো! আমি তার নিকট এলে উসমান তাকে বলেন, হে আবু আবদুর রহমান! আমি কি তোমাকে একটি কুমারী নারীর সাথে বিবাহ দেব না? যাতে তুমি তোমার শারীরিক শক্তি-সামর্থ ও বলবীর্য ফিরে পাও? আব্দুল্লাহ বলেন, আমি তা এজন্য বলছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহে সক্ষম, সে যেন অবশ্যই বিবাহ করে। কেননা তা দৃষ্টিকে সম্বরণকারী এবং লজ্জাস্থাকে সংরক্ষণকারী। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহে অসমর্থ, সে যেন রোযা রাখে। কেননা তা তার জন্য কামস্পৃহা দমনকারী।

বিশ্লেষণঃ نِكَاح-এর আভিধানিক অর্থঃ نِكَاح শব্দটি نكح মূল ধাতু হতে নির্গত, ইহা বাবে فَتَحَ يَفْتَحُ/ضَرَبَ يَضْرِبُ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-

১. اَلضَّمُّ - মিলন

২. اَلْجَمْعُ - একত্রীকরণ

৩. اَلْوَطْيُ - সহবাস করা। যেমন, আল্লাহ তাআলার বাণী-

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ-

অর্থাৎ, তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়া হয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে (সহবাস) করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। (বাকারাঃ ২৩০)

৪. اَلْعَقْدُ - বন্ধন। যেমন, আল্লাহ তাআলার বাণী-

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ

অর্থাৎ, তবে সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদেরকে ভাল লাগে তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে নাও, দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। (নিসাঃ ৩)

৫. اَلرُّشْدُ - ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান। যেমন, আল্লাহর বাণী-

وَابْتَلُوْا الْيَتَامٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوْا النِّكَاحَ-

অর্থাৎ, আর এতীমদের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখবে, যে পর্যন্ত না তারা ভাল-মন্দ বুঝতে পারে। (নিসাঃ ৬)

মতপার্থক্যঃ ইমাম আবু হানিফা ও শাফেঈ (রহ.)-এর মাঝে নিকাহ শব্দটির حَقِيْقِيٌّ (প্রকৃত) ও مَجَازِيٌّ (রূপক) অর্থ নিয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, نكاح-এর حَقِيْقِيْ অর্থ হল عَقْد বা বন্ধন, আর مَجَازِيٌّ অর্থ হল وَطْي বা সহবাস।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, نكاح-এর حقيقي অর্থ হল وَطْي বা সহবাস এবং مجازي অর্থ হল عَقْد বা বন্ধন।

* আবার, কেউ কেউ نِكَاح শব্দটিকে যৌথ (مُشْتَرِكْ) অর্থবোধক বলেছেন।

(تاج العروس بتحقيق عبد السلام محمد هارون ج٧ ص١٩٥، البحر الرائق ج٣ ص٧٦، بذل المجهود ج١٠ ص٣-٤)

نكاح-এর পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

১. শরহে বেকায়া প্রণেতার ভাষায়- اَلنِّكَاحُ عَقْدٌ مَوْضُوْعٌ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ

অর্থাৎ, যৌনাঙ্গ উপভোগ করার উদ্দেশ্যে নারী ও পুরুষের মাঝে সংঘটিত বন্ধনকে বিবাহ বলা হয়।

২. فِقْهُ السُّنَةِ গ্রন্থকার বলেন- اَلنِّكَاحُ هُوَ عَقْدُ التَّزْوِيْجِ

অর্থাৎ, নিকাহ হল বিবাহ বন্ধন।

৩. فَتْحِ الْقَدِيْرِ গ্রন্থকার বলেন- هُوَ عَقْد وُضِعَ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ بِالْأُنْثٰى قَصْدًا

অর্থাৎ, বিবাহ হল এমন একটি বন্ধন, যা স্বেচ্ছায় মহিলার উপভোগের মালিক হওয়ার জন্য প্রবর্তিত হয়েছে।

৪. আল্লামা শাওকানী বলেন- هُوَ عَقْد بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ يَحِلُّ بِهِ الْوَطْيُ

অর্থাৎ, বিবাহ হল স্বামী-স্ত্রীর এমন এক বন্ধন, যার দ্বারা সহবাস বৈধ হয়।

৫. কতিপয় উলামা বলেন-

هُوَ عَقْد بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْءَةِ يَسْتَحِلُّ بِهِ اسْتَمْتَاعُ الْاَحَدِ مِنَ الْآخَرِ-

অর্থাৎ, বিবাহ হল নারী ও পুরুষের এমন বন্ধন, যার দ্বারা একজন অপরজন থেকে উপভোগ গ্রহণ করা বৈধ হয়।

حُكْمُ النِّكَاحِঃ বিবাহের হুকুম নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে-

* আহলে যাওয়াহেরের মতে, বিবাহ ফরযে আইন। যে ব্যক্তি মহর ও ভরণ-পোষণ প্রদানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিবাহ করবে না, সে গুনাহগার হবে।

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ- (النساء آية ٣)

দলীল (২)ঃ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ...

দলীল (৩)ঃ عَنْ مَّعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ... قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمْ- (ابو داود ج١ ص٢٨٠ باب في تزويج الابكار، نسائي ج٢ ص٧٠ كراهية تجويج العقيم)

অর্থাৎ, ... মাআকাল ইবন ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত। ... নবী করীম (সাঃ) বলেন, "তোমরা বিয়ে করো এমন স্ত্রীলোকদের, যারা স্বামীদের অধিক মহব্বত করে এবং অধিক সন্তান প্রসব করে। কেননা, আমি (কিয়ামতের দিন) তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে (পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর) গর্ব প্রকাশ করব।

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীসদ্বয়ে امر (নির্দেশ)-এর صِيْغَة (শব্দরূপ) ব্যবহৃত হয়েছে। আর উসূলের কায়দা হচ্ছে- اَلْاَمْرُ لِلْوُجُوْبِ অর্থাৎ, اَمْر ওয়াজিবের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং বিবাহ করা নামায-রোযার ন্যায় ফরযে আইন।

(تنظيم الاشتات ج٢ ص١٦٤)

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, عِنْدَ التَّوْقَانِ তথা আত্মসংযমের ক্ষমতা থাকা অবস্থায় বিয়ে করার চেয়ে নফল ইবাদতে লিপ্ত হওয়া উত্তম। তাঁর মতে, বিবাহ কোন ইবাদতের কাজ নয়; বরং ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায় বিবাহ একটি মুবাহ (অনুমোদিত) বিষয়। (فتح الباري ج٩ ص١٠٤)

এমতাবস্থায়- (المغني ج٦ ص٤٤٧) اَلتَّخَلِّي بِالْعِبَادَاتِ اَفْضَلُ مِنَ النِّكَاحِ

অর্থাৎ বিবাহের চেয়ে নির্জনে ইবাদতে মশগুল থাকা উত্তম।

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী وَاُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ- অর্থাৎ, এদেরকে (যাদেরকে বিবাহ করা হারাম) ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী হালাল করা হয়েছে। (নিসাঃ ২৪)

উক্ত আয়াতে বিবাহ হালাল হওয়ার খবর দেয়া হয়েছে। আর হালাল এবং মুবাহ সম পর্যায়ের শব্দ।

সুতরাং ইহা ক্রয়-বিক্রয়ের মত একটি হালাল বিষয়। বলাবাহুল্য, ক্রয়-বিক্রয়ের চেয়ে নির্জনে নফল ইবাদত করা উত্তম।

দলীল (২)ঃ আল্লাহ তাআলা হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর প্রশংসা করে বলেন- وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ- অর্থাৎ, যিনি নেতা হবেন এবং নারীদের সংস্পর্শে যাবেন না, তিনি অত্যন্ত সৎকর্মশীল নবী হবেন। (ইমরানঃ ৩৯)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা বিয়ে না করার কারণে ইয়াহইয়া (আঃ)-এর প্রশংসা করেছেন।

* বাদায়ে গ্রন্থকার বলেন, জমহুর উলামায়ে কিরামের মতে, যদি যৌন ক্ষুধার তীব্রতার ফলে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে এবং স্ত্রীর মোহর ও ভরণ-পোষণ দানের ক্ষমতা থাকে, তবে বিবাহ করা ওয়াজিব। অন্যথায় সে গুনাহগার হবে। (بدائع الصنائع ج٢ ص٢٢٨)

* আল্লামা ইমাম কারখী-এর মতে বিবাহ করা মুস্তাহাব।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, ব্যক্তির অবস্থানুসারে বিয়ের হুকুম বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

(ক) যদি যৌন উত্তেজনা খুব বেশি হয় যে, বিয়ে না করলে যিনায় লিপ্ত হওয়ার আশংকা আছে এবং মহর ও ভরণ-পোষণ প্রদানে ক্ষমতাবান হয়, তাহলে বিয়ে করা ফরয। কেননা, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন- مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

(অনুচ্ছেদের শুরুতে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।)

তবে এ অবস্থায় অর্থ-সামর্থ্য না থাকলে রোযা রাখবে। যেমন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-... فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ-

(খ) যৌন পিপাসা তীব্রতর হলে এবং সংযম ক্ষমতা ক্ষীণ হলে বিবাহ করা ওয়াজিব।

(গ) যৌন ক্ষমতা না থাকলে বিবাহ করা হারাম।

(ঘ) স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ বিবাহ না করলে যিনায় লিপ্ত হওয়ার আশংকা না থাকলে এবং বিবাহের পর স্ত্রীর মহর, ভরণ-পোষণ এবং সহবাস করতে সক্ষম হলে ও স্ত্রীর উপর যুলুম-নির্যাতনের আশঙ্কা না থাকলে বিয়ে করা সুন্নত এবং নফল ইবাদতের জন্য নির্জনতার চেয়ে বিবাহ করা উত্তম ও সওয়াবের কাজ।

(فتح الباري ج٩ ص١٠٤، عمدة القاري ج٢٠ ص٦٦، فتح القدير ج٣ ص١٠١، بدائع الصنائع ج٢ ص٢٢٨)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ্ তাআলার বাণী-

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً-

অর্থাৎ, আপনার পূর্বে আমি অনেক রসূল প্রেরণ করেছি এবং তাঁদেরকে পত্নী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। (রাদঃ ৩৮)

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, অধিকাংশ নবী-রাসূল বিবাহের উপর আমল করেছেন। যদি বিবাহ না করাই উত্তম হত, তাহলে তারা বিবাহ করতেন না।

দলীল (২)ঃ সবচেয়ে বড় দলীল হল, স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) নিজেও বিবাহ করেছেন এবং অন্যকেও বিবাহ করার জন্য ব্যাপক উৎসাহিত করেছেন। সুতরাং বিয়ে যদি উত্তম না হত তাহলে তিনি আজীবন বিয়ে না করে নির্জনে ইবাদত করেই কাটিয়ে দিতেন।

দলীল (৩)ঃ হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস-

... قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَع مِّنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ اَلْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ- (التلخيص الحبير ج١ ص٦٦)

অর্থাৎ, ... রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, চারটি জিনিস রাসূলগণের সুন্নত বা আদর্শ। লজ্জা, আতর বা সুগন্ধি ব্যবহার, মিসওয়াক ও বিয়ে।

দলীল (৪)ঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস-

... قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ، فَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِسُنَّتِيْ (وَفِيْ رِوَايَةِ بُخَارِيْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ) فَلَيْسَ مِنِّيْ، وَتَزَوَّجُوْا فَإِنِّيْ مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمِ، وَمَنْ كَانَ ذَاطَوْلٍ فَلْيَنْكَحْ الخ (اللفظ لابن ماجة ص١٣٤، ابو داود ج١ ص٢٨٠ باب في تزويج الابكار، بخاري ج٢ ص٧٥٧-٧٥٨ الترغيب في النكاح، مسلم ج١ ص٤٤٩)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, বিয়ে আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নতের উপর আমল করবে না, (বুখারীতে আছে, যে আমার সুন্নত থেকে বিমুখ হবে) সে আমার দলভুক্ত নয়। তোমরা বিয়ে কর। কারণ, আমি তোমাদের আধিক্য দ্বারা অন্যান্য উম্মতের উপর গর্ব করব। যে সামর্থ্যবান হয়, সে যেন বিয়ে করে।

দলীল (৫)ঃ হযরত বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস-

... قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ صَرُوْرَةَ فِيْ الْإِسْلَامِ– (ابو داود ج١ ص٢٤٢ كتاب المناسك باب لا صرورة في الاسلام)

অর্থাৎ, ... নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, ইসলামে কোন বৈরাগ্য নেই।

এবং পবিত্র কুরআনেও বর্ণিত আছে- وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ, আর বৈরাগ্য, সে তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে, আমি এটা তাদের উপর ফরয করিনি। (হাদীদঃ ২৭)

আহনাফের পক্ষ থেকে জবাবঃ ১. আহলে যাহিরের দলীলগুলোর জবাবে বলা যায় যে, তারা যে اَمْر-এর ছীগা দ্বারা অপরিহার্যতা সাব্যস্ত করেছেন, তা সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য নয় বরং সেগুলো যৌবনের চরম উত্তেজনার উপর প্রযোজ্য।

২. ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর দলীলদ্বয়ের জবাবে বলা যায় যে, খোদ বিবাহ ব্যাপারটি মুবাহ কাজ। তবে আনুষঙ্গিক কারণে তা ওয়াজিব হয়ে থাকে। যেমন খোদ ক্রয়-বিক্রয় বিষয়টি একটা মুবাহ কাজ। কিন্তু সন্তান ও পরিবার-পরিজনের জন্য প্রয়োজনের তাগিদে কখনো কখনো তা ফরয এবং ওয়াজিব হয়ে থাকে।

৩. হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর বিবাহ না করা, এটি উম্মতে মুহাম্মদী (সাঃ)-এর জন্য দলীল হতে পারে না। কেননা, হতে পারে তাঁর শরীয়তে বিয়ে না করা উত্তম ছিল, কিন্তু আমাদের শরীয়তে لا رهبانية في الإسلام দ্বারা তা রহিত হয়ে গেছে।

৪. হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) ব্যতীত স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) সহ সকল নবী বিবাহ করেছেন। সুতরাং একজন নবী বিয়ে না করা আমাদের জন্য দলীল হতে পারে না।

(درس ترمذي ج٣ ص٣٤٩)

কোন্ কোন্ শব্দ দ্বারা বিয়ে সংঘটিত হবে, এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, মাত্র দুটি শব্দ দ্বারা বিয়ে সংঘটিত হয়-

(ক) نِكَاح যেমন, কুরআনের বাণী- فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ

(খ) تَزْوِيْج যেমন, কুরআনের বাণী- زَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ

অর্থাৎ, আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হুরদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেব। (তূরঃ ২০)

প্রণিধানযোগ্য যে, তাঁর মতে, هِبَة (প্রদান) শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না। তিনি বলেন, هِبَة শব্দ দ্বারা বিবাহ হওয়া একমাত্র রাসূলের (সাঃ) জন্য নির্দিষ্ট। যেমন, কুরআনে বলা হয়েছে- "خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ"

অর্থাৎ, ইহা আপনার জন্য খাস, (অন্যান্য) মুমিনদের জন্য নয়। (আহযাবঃ ৫০)

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এ বিষয়ে একটি মূলনীতি পেশ করেছেন। তা হচ্ছে-

يَصِحُّ بِلَفْظِ نِكَاحٍ وَتَزْوِيْجٍ وَمَا وُضِعَ لِتَمْلِيْكِ الْعَيْنِ حَالاً–

অর্থাৎ, বিবাহ সহীহ হবে نِكَاح ও تَزْوِيْج শব্দ এবং এমন প্রতিটি শব্দ দ্বারা যার দ্বারা তাৎক্ষণিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব, নিম্নোক্ত শব্দাবলী দ্বারা বিবাহ সহীহ হবে। যেমন-

(ক) نِكَاح (খ) تَزْوِيْج (গ) هِبَة (ঘ) بَيْع

(ঙ) تَمْلِيْك (চ) صَدْقَة (ছ) شَرَاء (জ) اَلْعَطِيَّة

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, هِبَة শব্দটি যেহেতু তাৎক্ষণিক মালিকানার অর্থ দেয়, সেহেতু উহা দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন- وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا

অর্থাৎ, কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করে, নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল হবে। (আহযাবঃ ৫০)

আহনাফের পক্ষ থেকে জবাবঃ ইমাম শাফেঈ (রহ.) যে দলীল পেশ করেছেন, তার জবাবে আহনাফগণ বলেন যে, ইহার দ্বারা মহর ওয়াজিব না হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, মহর ব্যতীত বিবাহ করা রাসূল (সাঃ)-এর জন্য খাস। এটাই হচ্ছে- خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ -এর মর্মার্থ। অথবা, উক্ত আয়াতটি اُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِيْنَ

خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ বুঝানোর জন্য নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ, হে নবী, আপনার বিবিগণ আপনার জন্য হালাল। অন্য কারো পক্ষে এদেরকে বিবাহ করা হালাল হবে না।

বিবাহের রুকনসমূহঃ

مَا يَقُوْمُ بِهِ الشَّيْئُ তথা যে উপকরণ দ্বারা বস্তু অস্তিত্বে আসে তাকে ركن (রুকন) বলা হয়। এ মূলনীতি হিসেবে বিবাহের রুকন দুটি।

১. اَلْاِيْجَابُ বা প্রস্তাব। বিবাহ বন্ধনে ইচ্ছুক নারী-পুরুষের মাঝে যার উক্তি আগে হয় তাকেই ইজাব বা প্রস্তাব বলা হয়।

২. اَلْقَبُوْلُ - গ্রহণ বা মেনে নেয়া। যার সম্মতিমূলক উক্তি পরে হয়, তার সম্মতিকেই কবুল বলা হয়।

বিবাহের শর্তসমূহঃ اَلْمَوَادُّ الَّتِيْ هِيَ خَارِجَةٌ عَنِ الشَّيْئِ الْمَوْقُوْفِ عَلَيْهَا তথা বস্তুর বহির্গত নির্ভরশীল উপাদানসমূহকে শর্ত বলা হয়। এ মূলনীতি হিসেবে বিবাহের শর্ত দুটি।

১. اَلشَّرْطُ الْعَامُّ (সাধারণ শর্ত)ঃ পাত্র-পাত্রী এমন হওয়া, যাতে শরীয়তের পক্ষ থেকে কোন বাধা না থাকে। যেমন, যাদেরকে বিয়ে করা হারাম (মাহরাম) এমন না হওয়া, স্ত্রীর বর্তমানে তার সহোদরা বোন না হওয়া, কাফির না হওয়া ইত্যাদি। কেননা এদেরকে বিবাহ করা হারাম। এগুলো হল সাধারণ শর্ত।

২. اَلشَّرْطُ الْخَاصُّ (বিশেষ শর্ত)ঃ দু'জন স্বাধীন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দু'জন নারী উপস্থিত থাকা (ইমাম আবু হানিফার মতানুযায়ী) যেমন ইরশাদ হচ্ছে-

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَأَتَانِ–

অর্থাৎ, দু'জন সাক্ষী কর তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে। যদি দু'জন পুরুষ না হয় তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। (বাকারাঃ ২৮২)

* ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন যে, এক্ষেত্রে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

* ইমাম মালিক (রহ.) বলেন যে, বিয়ের সাক্ষীর কোন প্রয়োজন নেই। বিয়ের সংবাদ প্রচার করে দিলেই হবে। তিনি দলিল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীসটি পেশ করেন-

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْلِنُوْا هٰذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوْهُ فِيْ الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ– (ترمذي ج١ ص٢٠٧ باب اعلان النكاح، ابن ماجة)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, তোমরা বিবাহের ঘোষণা দিবে এবং তা মসজিদে সম্পন্ন করবে। আর এ উপলক্ষে দফ* বাজাবে।

বিবাহ এবং ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্যঃ

ইমাম শাফেঈ (রহ.) সহ অনেকেই বলে থাকেন যে, বিবাহ ক্রয়-বিক্রয়ের মতই একটি মুবাহ বিষয়। কারণ উভয়টি اِيْجَاب (প্রস্তাব) ও قُبُوْل (কবুল) শব্দদ্বয় দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে।

কিন্তু বিবাহ ও ক্রয়-বিক্রয় উভয়টি কবুল ও ইজাব শব্দদ্বয় দ্বারা সম্পাদিত হলেও উভয়ের মাঝে বেশ পার্থক্য রয়েছে-

১. ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে ইজাব ও কবুলের উভয় শব্দ অতীতকালীন হওয়া আবশ্যক। যেমন, بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ অর্থাৎ একজন বলবে আমি বিক্রি করেছি এবং অপরজন বলবে আমি ক্রয় করেছি। কিন্তু বিবাহের মধ্যে একটি অতীতকাল (فعل ماضي) এবং অপরটি নির্দেশ (اَمْرٌ)-এর শব্দ হলেও চলবে। যেমন- زَوِّجْنِي এবং زَوَّجْتُ অর্থাৎ একজন প্রস্তাব করবে আমাকে বিয়ে কর এবং অপরজন বলবে, আমি বিয়ে করলাম।

২. বিয়ের ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি প্রস্তাবক ও গ্রহণকারী উভয়টি হতে পারে। তবে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পারবে না।

৩. ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে সব ধরনের কার্যক্রম প্রয়োগ করা জায়েয। কিন্তু স্ত্রীর মধ্যে শরঈ কার্যক্রম ছাড়া অন্য কোন কার্যক্রম প্রয়োগ করা জায়েয নয়।

৪. ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে লাভ-ক্ষতি উকিলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে লাভ-ক্ষতি উকিলের দিকে যায় না।

৫. বিবাহের মধ্যে অভিভাবকের ভূমিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। পক্ষান্তরে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অলীর ভূমিকার কোন গুরুত্ব নেই।

৬. ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে مِلْكُ عَيْنٍ তথা বস্তুটির উপর একচ্ছত্র মালিকানা অর্জিত হয়, কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে শুধু مِلْكُ اِسْتِمْتَاعٍ তথা সম্ভোগের মালিকানা অর্জিত হয়।

৭. বিবাহের মধ্যে কমপক্ষে দু'জন সাক্ষী লাগবে, কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে সাক্ষী শর্ত নয়।

---

* একপ্রকারের বাদ্যযন্ত্র। আমাদের দেশে প্রচলিত তবলার ন্যায়।

৮. বিবাহের মধ্যে كُفُو (সমতা)-এর গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে এর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।
৯. সব লোকের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করা যায়, কিন্তু বিবাহ তার বিপরীত। কারণ, সব নারীর সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়া যায় না।
১০. অমুসলিমের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করা যায়। কিন্তু মুসলিম-অমুসলিমের মধ্যে বিবাহ জায়েয নয়।
১১. ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে খুতবা পড়তে হয় না, কিন্তু বিবাহের মধ্যে খুতবা পড়তে হয়।
১২. ক্রয়-বিক্রয়ে কয়েক ধরনের خِيَارْ (পছন্দের স্বাধীনতা) থাকে। তবে বিবাহের মধ্যে কোন خِيَارْ নেই।

بَابُ فِيْ رِضَاعَةِ الْكَبِيْرِ ص٢٨١ ঃ বয়স্ক ব্যক্তির দুধপান

... عَنْ عَاشِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ قَالَ حَفْصُ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّهُ اَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ اُنْظُرْنَ مَنْ اِخْوَانُكُنَّ فَاِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ– (بخاري ج٢ ص٧٦٤ باب من قال لا رضاع بعد حولين، مسلم ج١ ص٤٧٠ فضل رضاعة الكبير، نسائي ج٢ ص٨٢ القدر الذي يحرم من الرضاعة)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর নিকট এমন সময় হাজির হন, যখন তাঁর নিকট একজন পুরুষ লোক উপস্থিত ছিল। রাবী হাফস বলেন, এটা তাঁর নিকট খুবই অপছন্দনীয় মনে হয় এবং তাঁর চেহারা মোবারক (রাগের কারণে) পরিবর্তিত হয়। অতঃপর রাবী (হাফস ও মুহাম্মদ ইবন কাসীর) একমত হয়ে বর্ণনা করেন যে, তখন তিনি (আয়িশা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইনি আমার দুধ ভাই। তিনি (সাঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের দুধ ভাইদেরকে সুযোগ দিবে। বস্তুত ক্ষুধা নিবারণের জন্য শিশুর দুধপানে দুধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

رَضَاعَةٌ-এর আভিধানিক অর্থঃ اَلرَّضَاعَةُ শব্দটি বাবে ضَرَبَ يَضْرِبُ অথবা فَتَحَ يَفْتَحُ-এর মাসদার। মূল শব্দ رضع জিন্‌সে সহীহ। আভিধানিক অর্থ হচ্ছে شُرْبُ اللَّبَنِ مِنْ ثَدْيِ الْاِمْرَاْةِ। অর্থাৎ, নারীর স্তন হতে দুধ পান করা, স্তন্যদান, স্তন্যপানকাল। এভাবে

দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বলা হয় رضيع এবং দুধ দানকারিণীকে বলা হয় مُرْضِع বা مُرْضِعَة, শব্দটির প্রয়োগ পবিত্র কুরআনেও পাওয়া যায়-

"اَلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ–

অর্থাৎ, আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়। (বাকারাঃ ২৩৩)

رَضَاعَةٌ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

১। শরীয়তের পরিভাষায় اَلرَّضَاعَة বলা হয়-

هُوَ مَصٌّ مِنْ ثَدْيِ اِمْرَأَةٍ فِيْ وَقْتٍ مَخْصُوْصٍ–

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট এক সময়কালে নারীর স্তন থেকে দুগ্ধ চুষে পান করাকে বলা হয়।
২। কেউ কেউ বলেন-

اِسْمٌ لِحُصُوْلِ لَبَنِ اِمْرَأَةٍ اَوْمَا حَصَلَ مِنْهُ فِيْ مُدَّةِ طِفْلٍ اَوْ رَضَاعَةٍ–

অর্থাৎ, রাজাআত হল শিশুর স্তন্যপানের সময়কালে কোন মহিলার দুধপান করার নাম।

* সকল ইমাম একথার উপর একমত পোষণ করেন যে, বংশের কারণে যা হারাম, তা (ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে) দুগ্ধ পানের কারণেও হারাম হয়।
যেমন, হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ (ابو داود ج١ ص٢٨٠ باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، بخاري ج٢ ص٧٦٤ باب وامهاتكم اللاتي الخ، مسلم ج١ ص٤٦٦ كتاب الرضاع، ترمذي ج١ ص٢١٨ باب يحرم من الرضاع الخ، نسائي ج٢ ص٨١ ما يحرم من الرضاع، ابن ماجة ص١٤٠)

অর্থাৎ, আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, বংশের কারণে যা হারাম হয়, তা দুগ্ধপানের কারণেও হারাম হয়।

প্রশ্ন হল, কোন নারী যদি বয়স্ক কোন পুরুষকে দুধ পান করায়, তবে حُرْمَتِ رَضَاعَتْ (দুধ সম্পর্কের কারণে হারাম হওয়া) সাব্যস্ত হবে কিনা। এ ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে।

* হযরত আলী, আয়িশা (রাঃ), আতা ও দাউদ যাহেরী (রহ.)-এর মতে, এক্ষেত্রে حُرْمَت رَضَاعَت সাব্যস্ত হবে। আল্লামা ইবন হুযম (রহ.)ও উক্ত মত পোষণ করে

বলেন, রাজাআতের জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। বয়স্ক হোক অথবা বাচ্চা থাকুক, সর্বাবস্থায় হুরমাত সাব্যস্ত হবে। (المحلّى ج١٠ ص١٧-١٩)

দলীলঃ ... عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا حُذَيْفَةَ ... كَانَ تَبَنَّى سَالِمًا ... فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ ابْنِ عَمْرٍو اَلْقُرَشِيُّ ثُمَّ الْعَامِرِيُّ وَهِيَ اِمْرَأَةُ اَبِيْ حُذَيْفَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا نَرٰى سَالِمًا وَّلَدًا وَّكَانَ يَأْوِيْ مَعِيْ وَمَعَ اَبِيْ حُذَيْفَةَ فِيْ بَيْتٍ وَّاحِدٍ وَّيَرَانِيْ فَضْلاً وَّقَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرٰى فِيْهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْضِعِيْهِ فَاَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ الخ (ابو داود ج١ ص٢٨١ باب من حرم به، مسلم ج١ ص٤٦٩ فصل رضاعة الكبير، نسائي ج٢ ص٨٢-٨٣ باب رضاع الكبير)

অর্থাৎ, ... নবী করীম (সাঃ)-এর স্ত্রী আয়িশা (রাঃ) ও উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। আবু হুযায়ফা ... সালেমকে পালক পুত্র হিসেবে লালন-পালন করেন। ... অতঃপর সাহলা বিনত সুহায়েল ইবন উমর আল-কুরায়েশী, পরে আল-আমিরী যিনি আবু হুযায়ফার স্ত্রী ছিলেন, আগমন করেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সালেমকে পুত্র হিসেবে গণ্য করি। আর সে আমার সাথে এবং আবু হুযায়ফার সাথে আমাদের ঘরে (আমাদের সন্তান হিসাবে) লালিত-পালিত হয়েছে। আর সে আমাকে একই বস্ত্রের মধ্যে দেখেছে। আর আল্লাহ তাআলা এদের সম্পর্কে যা নাযিল করেছেন, তা আপনি বিশেষভাবে অবগত। এখন তার সম্পর্কে আপনি কি নির্দেশ দেন? নবী করীম (সাঃ) তাকে বলেন, তাকে পাঁচবার তোমার দুধপান করাও তাতে তুমি তার দুধ-মাতা হিসেবে পরিগণিত হবে। অতঃপর তিনি তাকে পাঁচবার দুধ পান করান এবং তিনি তার দুধমা হিসেবে গণ্য হন।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত সাহলা সালেমকে যখন দুধ পান করিয়েছেন, তখন তিনি বালেগ এবং বয়স্ক ছিলেন।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেঈ ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) সহ জমহুর ফকীহদের অভিমত হল- বয়স্ক পুরুষকে দুধপান করানো হলে حُرْمَت رَضَاعَت সাব্যস্ত হবে না। হুরমাত শুধুমাত্র ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। তবে, বয়স্কদের দুধপান করানো হারাম। (تنظيم الاشتات ج٢ ص١٧٨)

দলীল (১)ঃ পবিত্র কুরআনের বাণী-

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ- (بقرة ٢٣٣)

দলীল (২)ঃ পবিত্র কুরআনের বাণী- حَمْلُهٗ وَ فِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا অর্থাৎ, তাকে (সন্তানকে) গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়তে সময় হল ত্রিশ মাস। (আহ্কাফঃ ১৫)
উপরোল্লিখিত আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, رَضَاعَتْ শিশুকালেই সাব্যস্ত হয়ে থাকে। অপরদিকে হাদীসে বর্ণিত আছে-

দলীল (ক)ঃ عَنْ عَائِشَةَ .. قَالَتْ ... الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ
(অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীসের শেষাংশ)

দলীল (খ)ঃ ... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لاَ رِضَاعَ اِلاَّ مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَاَنْبَتَ اللَّحْمَ الخ (ابو داود ج١ ص٢٨١ باب في رضاعة الكبير)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুধপান করানোর অর্থই হল (পানকারীর) অস্থি মজবুত করানো এবং গোশ্‌ত বৃদ্ধি করা।

দলীল (গ)ঃ হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন- لاَ رَضَاعَةَ اِلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ– (دار قطني ج٤ ص١٧٤) -
অর্থাৎ, শুধুমাত্র দু'বছরের মধ্যেই রাজাআত ধর্তব্য হবে।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ (১) তাঁরা যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন, এর জবাবে ইবন হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, এই ঘটনাটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের ছিল, পরে তা রহিত হয়ে গেছে। (২) অথবা, এটি আবু হুযায়ফা (রাঃ)-এর স্ত্রী এবং সালেমের জন্য একটি খাস ঘটনা। যা তাঁদেরই প্রদত্ত দলীলের শেষাংশে উল্লেখ রয়েছে-

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاُمِّ سَلَمَةَ ... وَاَبَتْ اُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ اَحَدًا مِّنَ النَّاسِ حَتّٰى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللهِ مَا نَدْرِيْ لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِّنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَالِمٍ دُوْنَ سَائِرِ النَّاسِ– (ابو داود ج١ ص٢٨١ باب في من حرم به)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ)-এর স্ত্রী আয়িশা ও উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। ... কিন্তু উম্মে সালামা (রাঃ) ও নবী করীম (সাঃ)-এর অন্যান্য স্ত্রীগণ এ (প্রাপ্ত) বয়সে দুগ্ধ পানকারীগণকে নিজেদের নিকট উপস্থিত হতে বাধা দিতেন, বরং তারা ছোটবেলায় দুধপান করাকেই প্রাধান্য দিতেন (বয়স্ক ব্যক্তির নয়)। আর আমরা আয়িশা (রাঃ) সম্পর্কে বলতাম, আল্লাহর শপথ! আমাদের জানা নাই, সম্ভবতঃ এটা (সালেমের ব্যাপারটি) নবী করীম (সাঃ)-এর তরফ হতে বিশেষভাবে অনুমোদিত ছিল, যা অন্যদের জন্য বৈধ নয়।

بَابُ هَلْ يَحْرُمُ مَادُوْنَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ ص٢٨١

পাঁচবারের কম দুধপানে হুরমাত (হারাম) প্রতিষ্ঠিত হবে কি?

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ حِيْنَمَا اَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسْخِنَ بِخَمْسٍ مَّعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ فَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ مِمَّا يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ– (مسلم ج١ ص٤٦٩ فصل لا تحرم المصة الخ، ترمذي ج١ ص٢١٨ باب لا تحرم المصة ولا المصتان، نسائي ج٢ ص٨١ القدر الذي يحرم من الرضاعة، ابن ماجة ص١٤١)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে যা অবতীর্ণ করেছেন, তাতে দশবার দুগ্ধ পান করা হলে হুরমাত প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর পাঁচবার দুধপান করানো হুরমাতের জন্য নির্ধারিত হয় এবং পূর্বোক্ত নির্দেশে মানসূখ (রহিত) হয়। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) ইনতিকাল করেন এবং এর কিরআত (পঠন) অবশিষ্ট থাকে।

বিশ্লেষণঃ কি পরিমাণ দুধ পান করলে رَضَاعَت সাব্যস্ত হবে, এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছেঃ

* দাউদ যাহেরী, আবু সাওর, আবু উবায়েদ, ইসহাক, ইবন মুনযির (রহ.)-এর মতে, কমপক্ষে তিন চোষণ দুধপান করলে حُرْمَت رَضَاعَت সাব্যস্ত হবে। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আহমদ (রহ.)-এর অভিমতও অনুরূপ। (عمدة القاري ج٢٠ ص٩٦)

দলীল (১)ঃ ... عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ– (ابو داود ج١ ص٢٨٢، مسلم ج١ ص٤٦٨، ترمذي ج١ ص٢١٨ لا تحرم المصة ولا مصتان، نسائي ج١ ص٨١، ابن ماجة ص١٤١)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, একবার বা দু'বার দুধ চোষার কারণে হুরমাত প্রতিষ্ঠিত হয় না।

দলীল (২)ঃ হযরত উম্মে ফযল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেন-

وَلاَ تُحَرِّمُ الاِمْلاَجَةُ وَ الاِمْلاَجَتَانِ (مسلم ج١ ص٤٦٩ فصل لا تحرم المصة، نسائي ج٢ ص٨١)

অর্থাৎ, ... একবার অথবা দু'বার স্তন শিশুর মুখে প্রবিষ্ট করানো হারাম নয়।

দলীল (৩)ঃ উম্মে ফযল (রাঃ) হতে আরো বর্ণিত আছে যে-

... قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ– (مسلم ج١ ص٤٦٩، ابن ماجة ص١٤١)

অর্থাৎ, ... এক-দু'বার স্তন চোষা হারাম নয়। উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হল যে, যেহেতু এক-দু'বার দুধ চোষার দ্বারা হুরমাত সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং এর বিপরীত অর্থ হল, তিনবার চুষলে হারাম সাব্যস্ত হবে।

* ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে, পাঁচবার বা এর চেয়ে বেশি চুষলে حُرْمَت رَضَاعَت সাব্যস্ত হবে। আর এই পাঁচবারও বিভিন্ন সময়ে হতে হবে। তন্মধ্য থেকে প্রতিবার তৃপ্তিদায়ক পান জরুরী। (فتح القدير ج٣ ص٣٠٥)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীস। উক্ত হাদীসে যেহেতু বর্ণিত হয়েছে যে, পাঁচবার দুধপান করানোর দ্বারা দশবার দুধপান করানোর নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং এর উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, পাঁচবারের কম চোষণের দ্বারা حُرْمَت رَضَاعَت সাব্যস্ত হবে না।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, সাহেবাইন (আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ), সুফিয়ান সাওরী, আওযাঈ, আতা, হাসান বসরী এবং ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মতসহ হযরত আলী, ইবন মাসউদ, ইবন উমর, ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, দুগ্ধপানের যেকোন পরিমাণই হারাম সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট, কম হোক অথবা বেশি। (عمدة القاري ج٢٠ ص٩٦، تنظيم الاشتات ج٢ ص١٧٧)

দলীল (১)ঃ যে সমস্ত নারীদের বিয়ে করা হারাম, এর তালিকা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন- وَأُمَّهٰتُكُمُ اللّٰتِيْ أَرْضَعْنَكُمْ অর্থাৎ, তোমাদের সে মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্য পান করিয়েছে। (নিসাঃ ২৩)

উক্ত আয়াতে শর্তহীনভাবে رضاعت (দুগ্ধপান)-কে হারাম হওয়ার কারণে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কম-বেশির কোন পার্থক্য করা হয়নি। (احكام القرآن للجصاص ج٢ ص١٢٤–١٢٦)

দলীল (২)ঃ ... عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ/ مِنَ النَّسَبِ– (ابو داود ج١ ص٢٨٠ باب يحرم من الرضاعة الخ، بخاري ج٢ ص٧٦٤، مسلم ج١ ص٤٦٦–٤٦٧، ترمذي ج١ ص٢١٨ باب يحرم من الرضاع الخ، نسائي ج٢ ص٨١ باب ما يحرم من الرضاع، ابن ماجة ص١٤٠)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, বংশের কারণে যা হারাম হয়, তা দুগ্ধপানের কারণেও হারাম হয়।

উক্ত হাদীসেও শর্তহীনভাবে দুগ্ধপানের কথা বলা হয়েছে। কম বা বেশি এমন কোন শর্তারোপ করা হয়নি।

দলীল (৩)ঃ অন্য একটি মারফু হাদীসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে-

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ قَلِيْلُهٗ وَكَثِيْرُهٗ– (جامع المسانيد للخوارزمي ج٢ ص٩٧، عقود الجواهر المنفية ج١ ص١٥٩، نسائي ج٢ ص٨٢ ا لقدر الذي يحرم من الرضاعة)

অর্থাৎ, ... নবী করীম (সাঃ) বলেন, বংশের কারণে যা হারাম হয়, তা দুগ্ধপানের কারণেও হারাম হয়। দুধের পরিমাণ কম হোক বা বেশি হোক।

দলীল (৪)ঃ হযরত আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস-

مَا كَانَ مِنَ الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ مَصَّةً وَاحِدَةً فَهِيَ تَحْرُمُ– (مؤطا امام محمد ص٢٧٦، مصنف عبد الرزاق ج٧ ص٤٦٦)

অর্থাৎ, দু'বছরের মধ্যে যদি একবারও দুধ চুষে তা হারাম সাব্যস্ত হবে।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দুধ কম পান করুক বা বেশি পান করুক সর্বাবস্থায় حُرْمَت رَضَاعَت সাব্যস্ত হবে।

যুক্তির নিরীখেও একথা প্রমাণিত হয় যে, দুধপান করানোর অর্থই হল অস্থি মজবুত করানো। আর তা তিনবার অথবা পাঁচবারে যেমন হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তা একবার পানের দ্বারাও সম্ভব।

আহনাফদের পক্ষ থেকে জবাবঃ

(১) আহলে যাহিরের প্রদত্ত দলীলসমূহের জবাবে আহনাফরা বলেন যে, এই ধরনের হাদীসসমূহ কুরআনের আয়াত এবং ইবন আব্বাসের হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। যেমন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর সামনে একদা কেউ "لا تحرم الرضعت والرضعتان" হাদীসটি উল্লেখ করলে, তিনি (রাঃ) বলেন-

"قَدْ كَانَ ذٰلِكَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَالرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ تَحْرُمُ"– (احكام القرآن للجصاص ج٢ ص١٢٥)

অর্থাৎ, "ইহা পূর্বে ছিল। এখন একবার দুধ চুষলেও হারাম সাব্যস্ত হবে।"

(২) অথবা, বলা যায় যে, তিন বা পাঁচ বার বলার উদ্দেশ্য হল পেটের মধ্যে দুধ প্রবেশ করা। এক-দু'বার চোষার দ্বারা যেহেতু সাধারণত পেটে দুধ প্রবেশ করার সম্ভাবনা কম, তাই তিনি তিন বা পাঁচবারের কথা উল্লেখ করেছেন। নতুবা একবার

চোষার দ্বারাও যদি নিশ্চিত জানা যায় যে, পেটে দুধ প্রবেশ করেছে, তাহলে এর দ্বারাও হুরমাতে রাজাআত সাব্যস্ত হবে। (درس مشكوة ج٣ ص١٩)

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীসের জবাবে আহনাফগণ বলেন যে, উক্ত হাদীসে বর্ণিত- وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَءُ مِنَ الْقُرْآنِ অর্থাৎ, "এবং এর কিরআত অবশিষ্ট থাকে" যে অংশটি বর্ণিত হয়েছে, তা মূলত ঐ সকল লোকদের কিরআত, যাদের নিকট ইহার রহিত হওয়ার খবর পৌঁছেনি। কেননা ইহা নবী করীম (সাঃ)-এর ইনতিকালের অল্প কয়দিন পূর্বে রহিত হয়েছিল। অতঃপর এ ব্যাপারে তাঁরা (যখন) অবগত হলেন, তখন তারা তা মেনে নেন। অন্যথায় স্পষ্ট বিষয় হল যে, হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর উদ্দেশ্য যদি এই হত যে, এসব শব্দ মানসূখ হয়নি, বরং রয়ে গেছে, তাহলে এগুলোকে মাসহাফে (কুরআনের কপিতে) অন্তর্ভুক্ত করানোর চেষ্টা করবেন না- এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? (شرح نووي ج١ ص٤٦٨، انوار ج٢ ص٩)

* হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- "اَلْاَحَادِيْثُ فِيْ هٰذَا لْاَمْرِ لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ بِمُقَابَلَةِ الْقُرْآنِ" অর্থাৎ, এ ব্যাপারে যত হাদীস রয়েছে (সবই খবরে ওয়াহেদ), সেগুলো কুরআনের মুকাবিলায় দলীল হতে পারে না। (تنظيم الاشتات ج٢ ص١٧٧)

* আহনাফরা শাফেঈদের উপর উল্টা অভিযোগ করে বলেন যে, পাঁচবার চোষণের আয়াত পবিত্র কুরআনে কোথায় রয়েছে? তা আমাদেরকে দেখিয়ে দিন। কেননা উসমানী মাসহাফে خمس رضعات তথা "পাঁচবার চোষণ"-এর কথা কোথাও উল্লেখ নেই। এর দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এই শব্দগুলোও পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে, যা নববী যুগের একদম শেষের দিকে রহিত হওয়ার কারণে স্বয়ং আয়িশা (রাঃ)ও এ সম্পর্কে জানতে পারেননি। আর এটা কোন অযৌক্তিক বিষয় নয়।

(درس ترمذي ج٣ ص٤٤٤)

দুধপানের সময়সীমাঃ শিশুকে দুগ্ধ পান করানোর সময়সীমা কতটুকু, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.)-সহ জমহুরের মতে, শিশুকে দুগ্ধপানের সর্বোচ্চ সময়সীমা হল দু'বছর।

(تنظيم الاشتات ج٢ ص١٧٨، فتح القدير ج٣ ص٣٠٧)

দলীল (১)ঃ পবিত্র কুরআনের আয়াত-

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ-

অর্থাৎ, আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়। (বাকারাঃ ২৩৩)

দলীল (২)ঃ –عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَاَ رَضَاعَةَ اِلاَّ مَا كَانَ فِيْ الْحَوْلَيْنِ

অর্থাৎ, ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেন, শুধুমাত্র দু'বছরের মধ্যেই রাজাআত ধর্তব্য হবে। (دار قطني ج٤ ص١٧٤)

সুতরাং কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দুগ্ধপানের সর্বোচ্চ সময়সীমা হল দু'বছর।

* ইমাম যুফার (রহ.)-এর মতে, দুগ্ধপানের সময়সীমা তিন বছর। (فتح القدير ج٣ ص٣٠٧)

* দাউদ যাহেরীর মতে, দুগ্ধপান করানোর নির্দিষ্ট কোন সময়সীমা নেই।

দলীলঃ ''হুযায়ফার (রাঃ) পালিত পুত্র সালেমকে পরিণত বয়সেও দুধপান করানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। সুতরাং এতে বুঝা যায় যে, এখানে কোন সময়সীমা নেই।'' (পুরো হাদীসটি পূর্বে অর্থসহ বর্ণিত হয়েছে।)

* ইমাম মালিক (রহ.)-এর পক্ষ থেকে বেশ কয়েকটি মত পাওয়া যায়, তবে প্রসিদ্ধ মত হল দু'বছর দু'মাস। (فتح القدير ج٣ ص٣٠٧، فتح الباري ج٩ ص١٤٦)

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, দুগ্ধপান করানোর নিম্নতম সময় সীমা হচ্ছে দু'বছর তথা ২৪ মাস। আর ঊর্ধ্বতম সময়সীমা হচ্ছে আড়াই বছর তথা ৩০ মাস।

(فتح القدير ج٣ ص٣٠٧، فتح الباري ج٩ ص١٤٦، تنظيم الاشتات ج٢ ص١٧٨)

দলীলঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- وَحَمْلُهٗ وَفِصَالُهٗ ثَلَاثُوْنَ شَهْرًا

অর্থাৎ, আর তার গর্ভধারণ ও তার স্তন্য ছাড়ার সময় হল ত্রিশ মাস। (আহকাফঃ ১৫)

আয়াতটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে একথা বুঝা যায় যে, গর্ভধারণ ও দুগ্ধপান প্রত্যেকটির জন্য আলাদাভাবে ত্রিশ মাস সময় প্রয়োজন। মূলত আয়াতটির উদ্দেশ্য তা নয়। বরং উক্ত আয়াতে ثلاثون شهرا-এর সাথে حَمْلُهٗ (সন্তান গর্ভধারণ) সংযুক্ত নয়। আর فِصَالُهٗ (মায়ের দুধ ছাড়ানো) বাক্যটি স্বতন্ত্র একটি বাক্য। কেননা, حَمْل-এর নিম্নতম সময় হল ছয়মাস এবং এর ঊর্ধ্বতম সময় হল দু'বছর। যেমন, হাদীসে এসেছে –عَنْ عَائِشَةَ لَا يَكُوْنُ الْحَمْلُ اَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ قَدْرَ مَا يَتَحَوَّلُ ظِلُّ الْمِغْزَلِ

(دار قطني ج٣ ص٣٢٢، سنن كبرى بيهقي ج٧ ص٤٤٣، فتح القدير ج٣ ص٣٠٨)

অর্থাৎ, হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, গর্ভধারণকাল দু'বছরের বেশি হয় না, যদিও চরকার ছায়া পরিবর্তিত হওয়ার পরিমাণ সময়ও হোক না কেন।

সুতরাং رَضَاعَت-এর সময়কাল আড়াই বছর রয়ে গেল। নতুবা আয়াতে প্রত্যেকটির জন্য যদি ত্রিশ মাস ধরে নেয়া হয়, তাহলে এর মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। কারণ উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল, একটি সন্তান গর্ভে ত্রিশ মাস থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে, গর্ভধারণ এবং দুগ্ধ পান উভয়টির সময় যদি একত্রে ত্রিশ মাস ধরা হয়, তাহলেও মুশকিল। কেননা একটি সন্তান যদি দুই বছর (২৪ মাস) গর্বে থাকে, তাহলে ত্রিশ মাস পুরা করতে হলে তাকে মাত্র ছয় মাস (২৪+৬=৩০ মাস) দুগ্ধ পান করানো যাবে। যা কেউই স্বীকার করেন না।
সুতরাং এর সঠিক জবাব দিতে গিয়ে আল্লামা নাসাফী (রহ.) বলেন, উক্ত আয়াতে حَمَل (গর্ভধারণ) দ্বারা حَمْل فِيْ الْبَطْن তথা পেটে গর্ভধারণ বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হল حَمْل فِيْ الْيَد তথা জন্মের পর মাতৃক্রোড়ে লালন-পালন বুঝানো উদ্দেশ্য। অতএব, উক্ত আয়াত দ্বারা শুধুমাত্র রাজাআতের সময় উল্লেখ করা হয়েছে।
(تفسير مدارك ج٥ ص٢٥، فيض الباري ج٤ ص٢٧٨)

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ ইমাম শাফেঈ ও সাহেবাইন সহ প্রমুখের দলীলের উত্তরে আহনাফগণ বলেন-
১। আল্লামা ইবন হুমাম (রহ.) বলেন, আয়াতের বর্ণনা প্রসঙ্গ লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, এখানে مَسْئَلَة اِسْتِجَار (আশ্রয় প্রার্থনার বিষয়) বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কেননা, আয়াতে اَلْوَالِدَاتُ (সন্তানসমূহ) দ্বারা তালাকপ্রাপ্তা নারীদের সন্তানদেরকে বুঝানো হয়েছে। তাই আয়াতের পরের অংশে বলা হয়েছে-
وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ অর্থাৎ, আর সন্তানদের অধিকারী অর্থাৎ পিতার উপর হলো সে সমস্ত (তালাকপ্রাপ্তা) নারীর খোরপোষের দায়িত্ব বহন করা।
তাই বলা যায়-
فَالْحَوْلَيْنِ مُدَّةُ اِسْتِحْقَاقِ الْاُجْرَة لَا مُدَّةُ الرَّضَاعَةِ– (تنظيم الاشتات ج٢ ص١٧٨)
"দু'বছর হলো দুধপান করানোর পারিশ্রমিকের অধিকারের সময়, দুধপান করানোর সময় নয়," সুতরাং ঐ তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যদি স্বীয় সন্তানকে দুগ্ধপান করায়, তাহলে সে দু'বছরের পারিশ্রমিক পাবে, এর বেশি নয়।
আহনাফগণ আরো বলেন যে, শাফেঈদের আয়াতে حَوْلَيْن (দু'বছর) উল্লেখের দ্বারা ইহা অপরিহার্য নয় যে, দু'বছর পর দুধপান করানো যাবে না। কেননা, আয়াতের পরবর্তী অংশে দেখা যায়-

... فَاِنْ اَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا-

অর্থাৎ, ... আর যদি মাতা-পিতা ইচ্ছা করে যে, তাহলে নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়িয়ে দিতে পারে, তাতে তাদের কোন পাপ নেই।

উক্ত আয়াতে فَاِنْ-এ ف হরফটি تَعْقِيْب বা পরে আসার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ দু'বছরের পরে যদি ইচ্ছা করে, তাহলে পরামর্শক্রমে আরো সময় বাড়াতে পারে (তবে ছয় মাসের উর্ধ্বে নয়)। সুতরাং বুঝা গেল, আয়াতটি মূলত দুধপানের মেয়াদের সীমা নির্ধারণের জন্য আসেনি। (فتح القدير ج٣ ص٣٠٩، فتح الملهم ج١ ص٥٣-٥٤)

হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসটির ক্ষেত্রেও অনুরূপ উত্তর প্রযোজ্য। অর্থাৎ দু'বছর রাজাআতের ক্ষেত্রে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে পারিশ্রমিক দেয়া হবে। অথবা বলা যায় যে, হাদীসে দুগ্ধপানের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সময়সীমার কথা উল্লেখ রয়েছে, সর্বাধিক সময়সীমার কথা নয়।

দাউদ যাহেরীর প্রদত্ত দলীলের উত্তরে বলা যায় যে, এ ব্যতিক্রমধর্মী নির্দেশটি শুধু সালেম (রাঃ)-এর জন্য খাস ছিল। এটা ব্যাপক নির্দেশ ছিল না। যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। (الانوار ج٢ ص٨، تنظيم الاشتات ج٢ ص١٧٨)

بَابُ فِيْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ص٢٨٣ ঃ মুতআ বা ভোগ বিবাহ

... عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ يُّقَالُ لَهٗ رَبِيْعَةُ بْنُ سَبُرَةَ اَشْهَدُ عَلٰى اَبِيْ اَنَّهٗ حَدَّثَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْهَا فِيْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ- (مسلم ج١ ص٤٥٢ باب نكاح المتعة، ابن ماجة ص١٤٢)

অনুবাদঃ ... যুহরী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উমর ইবন আব্দুল আযীযের নিকট উপস্থিত ছিলাম। এই সময় আমরা মুতআ বিবাহ সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করতে থাকাকালে রাবীআ ইবন সাবুরা নামক জনৈক ব্যক্তি বলেন, আমি যখন আমার পিতার নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিদায় হজ্জের সময় এরূপ (মুতআ বিবাহ) করতে নিষেধ করেন।

বিশ্লেষণঃ مُتْعَة-এর আভিধানিক অর্থঃ اَلْمُتْعَةُ শব্দটি اَلْمَتَاعِ থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ হল (১) هُوَ مَا يُتَمَتَّعُ بِهٖ অর্থাৎ, যার দ্বারা উপভোগ করা যায়।

(২) هُوَ مَا يَسْتَمْتَعُ بِهٖ - যার দ্বারা উপকার লাভ করা যায়।
(৩) স্বাদগ্রহণ
(৪) সম্ভোগ
(৫) বিনোদ, প্রমোদ ইত্যাদি।
পবিত্র কুরআনেও শব্দটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়-

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ–

অর্থাৎ, পার্থিব জীবন প্রতারণার ভোগ্য-সামগ্রী বৈ কিছু নয়। (হাদীদঃ ২০)

مُتْعَةٌ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

১. হিদায়া গ্রন্থকার বলেন-

اَلْمُتْعَةُ هِيَ اَنْ يَّقُوْلَ لِاِمْرَأَةٍ أَتَمَتَّعُ بِكِ كَذَا مُدَّةً بِكَذَا مِنَ الْمَالِ– (هداية ج٢ ص٣١٢)

অর্থাৎ, মুতআ হচ্ছে কোন নারীকে একথা বলা যে, আমি তোমাকে এই পরিমাণ সম্পদের বিনিময়ে এত সময় ধরে উপভোগ করব। (উল্লেখ্য যে, ঐ মহিলা তা কবুল করতে হবে।)

২. ইবনুল ফারাহের মতে- هِيَ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ اِلٰى أَجَلٍ بِعِوَضٍ مَخْصُوْصٍ–
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট কিছুর বিনিময়ে নারীকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিয়ে করা।
৩. আল্লামা দাকীকুল ঈদ বলেন-

نِكَاحُ الْمُتْعَةِ هِيَ تَزَوُّجُ الْمَرْأَةِ اِلٰى اَجَلٍ– (تنظيم الاشتات ج٢ ص١٧٤)

অর্থাৎ, কোন মহিলাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ করাকে মুত্আ বলে।
৪. কেউ কেউ বলেন, "যদি কোন লোক কোন স্ত্রীলোককে ক্ষণস্থায়ী ভোগের জন্য বিবাহ করে এরূপ বিবাহকে মুতআ বা ভোগ বিবাহ বলে।"
৫. কতিপয় আলেম বলেন-

هِيَ اَنْ يَّتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ اِلٰى مُدَّةٍ سَوَاء كَانَتِ الْمُدَّةُ مَعْلُوْمَةً اَوْ مَجْهُوْلَةً–

অর্থাৎ, মুতআ বিবাহ হল, মহিলাকে কিছু সময়ের জন্য বিয়ে করা, উক্ত সময় নির্দিষ্ট হোক বা অনির্দিষ্ট হোক।

মোটকথা, কোন নারীর সাথে অস্থায়ী ভিত্তিতে যৌন আচরণ করার লক্ষ্যে টাকা বা কোন সম্পদের বিনিময়ে সাময়িকভাবে চুক্তি ও শর্ত সাপেক্ষে বিবাহ করার নাম হলো মুত্আ বিবাহ। এতে 'নিকাহ' শব্দটি উল্লেখ থাকবে না এবং দু'জন সাক্ষীরও প্রয়োজন হয় না।

মুতআর হুকুমঃ মুতআ বিবাহের হুকুমের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। নিম্নে তা দলীলসহ উপস্থাপন করা হল-

* রাফেযী এবং শিয়াদের মতে, প্রয়োজনে মুতআ বিবাহ জায়েয। তারা বলে, কেউ যদি স্বীয় গৃহে স্ত্রীর নিকট থাকে তার জন্য মুতআ নিষিদ্ধ। তবে সে যদি দীর্ঘদিনের জন্য সফরে থাকে, তাহলে স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তার জন্য মুতআ বৈধ হবে। (তারা আরো এক ধাপ এগিয়ে বলে যে, কেউ যদি একবার মুতআ বিবাহ করে, তাহলে সে হযরত হুসাইন রাঃ-এর শাহাদাতের সাওয়াব পাবে এবং যদি দ্বিতীয়বার করে তাহলে হযরত আলী রাঃ-এর শাহাদাতের সওয়াব পাবে। ইত্যাদি।) (منهج الصادقين)

তারা তাদের আকীদার উপর দলীল পেশ করতে গিয়ে বলেন-

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً

অর্থাৎ, অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দান কর। (নিসাঃ ২৪)

উল্লেখ্য যে, উক্ত আয়াতে اِسْتِمْتَاعٌ (ভোগ করা) শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে। نِكَاح (বিবাহ) শব্দের উল্লেখ করা হয়নি। আর اِسْتِمْتَاعٌ-ই হল مُتْعَة (মুত্আ) এবং আয়াতে اَجْر (মজুরি, প্রতিদান, পারিশ্রমিক, ভাড়া) শব্দের উল্লেখ রয়েছে। আর ইহা মুত্আর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেননা বিয়ের ক্ষেত্রে তো মহর প্রদান করা হয়।

(درس مشكوٰة ج٣ ص١٥، تنظيم الاشتات ج٢ ص١٧٤)

তাছাড়া, উবাই ইবন কাব এবং আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর কিরআতে উল্লেখ আছে যে- فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ اِلٰى اَجَلِ الْمُسَمّٰى

অর্থাৎ, অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভোগ করবে।

উক্ত কিরআতে স্পষ্টভাবে اجل المسمى বা 'নির্দিষ্ট সময়ের' কথা উল্লেখ রয়েছে। আর নির্দিষ্ট সময় তো মুতআর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুতরাং মুতআ বিবাহ জায়েয।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الاَكْوَعِ قَالَ كُنَّا فِيْ جَيْشٍ فَاَتَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ اُذِنَ لَكُمْ اَنْ تَسْتَمْتَعُوْا (نصب الراية ج٣ ص١٧٦–١٨١)

অর্থাৎ, ... সালামা ইবন আল আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা সেনাদলে থাকাবস্থায় নবী করীম (সাঃ) আমাদের নিকট এসে বললেন, তোমাদেরকে মুতআ বিবাহের অনুমতি দেয়া হল।

দলীল (৩)ঃ حَدِيْثُ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَنَا اَنْ نَسْتَمْتِعَ فَكَانَ اَحَدُنَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ اِلَى اَجَلٍ (نصب الراية ج٣ ص١٧٦-١٨١)

অর্থাৎ, ইবন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) আমাদেরকে মুতআর অনুমতি দিলে আমাদের কোন একজন একটি মহিলাকে কাপড়ের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিয়ে করেন।

* চার ইমামসহ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মতে, মুতআ বিবাহ সম্পূর্ণরূপে হারাম। (فتح القدير ج٣ ص١٥١-١٥٢ ، تنظيم الاشتات ج٢ ص١٧٤)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ- فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ-

অর্থাৎ, এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে, তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালংঘনকারী হবে। (মুমিনূনঃ ৫-৬, মাআরিজঃ ২৯-৩০)

উল্লিখিত আয়াতে বিবাহিত স্বীয় স্ত্রী এবং মালিকানাভুক্ত দাসী ব্যতীত অন্য যে কোন অবস্থায় সঙ্গমকে হারাম আখ্যায়িত করা হয়েছে। এবং এমন ব্যক্তিকে সীমালংঘনকারী, যালেম বলা হয়েছে। আর মুতআ না মালিকানাধীন দাসী এবং না বিবাহিতা স্ত্রী। সুতরাং মুত্আ যে হারাম, এই আয়াতগুলোই তা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

দলীল (২)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ رَبِيْعِ بْنِ سَبُرَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ- (ابو داود ج١ ص٢٨٣ باب في نكاح المتعة)

অর্থাৎ, ... রাবীআ ইবন সাবুরা তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুতআ বিবাহ হারাম করেছেন।

দলীল (৪)ঃ ... عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ الخ (بخاري ج٢ ص٦٠٦ كتاب المغازي باب غزوة خيبر/ص٧٦٧، مسلم ج١ ص٤٥٢، ترمذي ج٢ ص٢١٣ باب نكاح المتعة، نسائي ج٢ ص٨٩ تحريم المتعة، ابن ماجة ص١٤٢)

অর্থাৎ, ... আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) খায়বর যুদ্ধের সময় মুতআ হারাম করেছেন।

দলীল (৫)ঃ হযরত রাবীআ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস-

قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ قَدْ كُنْتُ اَذِنْتُ لَكُمْ فِيْ الْاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَاِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذٰلِكَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ الخ (مسلم ج١ ص٤٥٢ باب نكاح المتعة، ابن ماجة ص١٤٢)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) বলেন, হে মানব মণ্ডলী! আমি তোমাদের মুতআ বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ইহা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম সাব্যস্ত করেছেন।

দলীল (৬)ঃ **... عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبُرَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَآءِ**– (مسلم ج١ ص٤٥٢، كنز العمال ج١٦ ص٥٢٥)

অর্থাৎ, রাবীআ ইবন সাবুরা (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) মক্কা বিজয়ের দিন মুতআ বিবাহ নিষেধ করেন।

দলীল (৭)ঃ **عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ اَوْطَاسٍ فِيْ الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهٰى عَنْهَا**– (مسلم ج١ ص٤٥١، ابن ماجة ص١٤٢)

অর্থাৎ, ... সালামা ইবন আল-আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) আওতাসের যুদ্ধের বছর মুতআ সম্পর্কে তিন দিন অবকাশ দিয়েছিলেন। অতঃপর তা নিষেধ করে দেন।

সুতরাং কুরআন ও হাদীস দ্বারা মজবুতভাবে প্রমাণিত হয় যে, বর্তমানে মুতআ বিবাহ হারাম।

আকলী দলীলঃ মানুষের বিবাহ শুধু কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যই নয়; বরং এতে আরো অনেক উপকার নিহিত রয়েছে। কিন্তু মুতআ বিবাহের উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। কাজেই কোন মহিলা মুতআ করতে করতে রূপ-লাবণ্য হারিয়ে বয়স্কা হয়ে গেলে তার সাথে আর কেউই মুতআ করতে চাইবে না। অতঃপর তার জীবন যে কি এক নরকপুরীতে পরিণত হবে, তা একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়। তাছাড়া মুতআর মাধ্যমে জন্ম নেয়া সন্তানের কোন বংশ পরিচয় মিলবে না। তাই সুস্থ বিবেকের দাবী হচ্ছে মুতআ বিবাহ হারাম হওয়া। সুতরাং হক্কানী সকল আলিম মুতআ বিবাহ হারাম হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

(تنظيم الاشتات ج٢ ص١٧٥)

রাফেযী ও শিয়াদের দলীলের জবাবঃ (১) আয়াতে اِسْتِمْتَاع (ভোগ করা) দ্বারা مُتْعَة উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল اِسْتِمْتَاع بِالنِّكَاح তথা বিবাহের মাধ্যমে ভোগ করা। আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাসমূহের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়। (روح المعاني ج٣ ص٧)
আর উক্ত আয়াতে اُجُوْرَهُنَّ দ্বারা اَجْر তথা মজুরি, পারিশ্রমিক, ভাড়া বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল مُهُوْرَهُنَّ বা তাদের মহর আদায় করা। যেমন, অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ (اَيْ مُهُوْرَهُنَّ)
অর্থাৎ, অতএব তাদেরকে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর এবং তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর। (নিসাঃ ২৫)
উক্ত আয়াতে اجر শব্দ দ্বারা মহর বুঝানো হয়েছে। সুতরাং মোহরের জন্য اجر শব্দ ব্যবহার করা কোন দোষণীয় নয়।
(২) আর উবাই ইবন কাব এবং আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর কিরআতের উত্তর হল, উক্ত আয়াতে اَجَل مُسَمًّى (নির্দিষ্ট সময়) দ্বারা উদ্দেশ্য হল মৃত্যু। বিয়ের মধ্যবর্তী সময় বুঝানো উদ্দেশ্য নয়।
(৩) হযরত সালামা (রাঃ)-এর হাদীসের ব্যাপারে বলা যায় যে, হাদীসটি হযরত আলী (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। অপরদিকে হযরত সালামা (রাঃ) নিজেই এর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাই তাঁর হাদীসটি বর্জনীয়। ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর হাদীসের ক্ষেত্রে একথাই বলা যায় যে, হারাম সংক্রান্ত হাদীস দ্বারা জায়েয সংক্রান্ত হাদীস মানসূখ হয়ে গেছে।

প্রাধান্য লাভের কারণঃ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মত প্রাধান্য লাভের কারণ হল-
(১) মুতআ বিবাহ জায়েয সংক্রান্ত হাদীসের সংখ্যা খুবই নগণ্য। অথচ মুতআ বিবাহের হারাম সংক্রান্ত হাদীসের সংখ্যা অসংখ্য। সুতরাং অসংখ্য হাদীসের উপর আমল করতে হবে।
(২) যে সকল সাহাবী জায়েয সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁরা পরবর্তীতে তাঁদের কথা থেকে ফিরে এসেছেন।
(৩) মুতআ বিবাহ জায়েয হওয়ার পক্ষে যে দলীল পাওয়া যায়, সেগুলোর উপর হারাম হওয়ার হাদীসসমূহ নিয়ম অনুযায়ী প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য।
(৪) অথবা, অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয়েছে যে, রাসূল (সাঃ) تَمَتُّعٌ শব্দের দ্বারা তামাত্তু হজ্জের কথা বলেছেন, কিন্তু রাবী হয়ত মনে করেছেন, এটা মুতআ বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা। তাই বর্ণনায় ভুল হয়ে গেছে।

(৫) প্রয়োজনের তাগিদে নবী করীম (সাঃ) তা জায়েয ফাতওয়া দিয়েছিলেন। অতঃপর যখন প্রয়োজন মিটে গেছে, তখন তিনি নিজেই তা হারাম ঘোষণা করেছেন।

অধিকন্তু বলা যায়, শাহ আব্দুল আযীয (রহ.) বলেন, মুতআ বিবাহকে ইসলাম কখনো সমর্থন করেনি। বরং বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে নবী করীম (সাঃ) বিশেষ প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইহার অনুমতি দিয়েছিলেন, যাকে نِكَاح مُؤَقَّت (সাময়িক বিবাহ) বলা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তাও নিষেধ করে দেন। আর نِكَاح مُتْعَة এবং نِكَاح مُؤَقَّتْ এক নয়। (فتاوى عزيزية ج٢ ص٣٩)

আল্লামা তকী উসমানীর মতে, বিভিন্ন যুদ্ধে বিশেষ প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যে অনুমতি দেয়া হত তা رُخْصَتْ (অনুমতি) হিসেবে দেয়া হত, حِلَّتْ (বৈধতা) প্রদানের জন্য নয়। যেমন, অতি ক্ষুধার্ত অবস্থায় শূকরের গোশত খাওয়ার অনুমতি রয়েছে।
(درس ترمذي ج٣ ص٤٠٤، جامع الاصول ج١١ ص٤٤٤-٤٥١، مجمع الزوائد ج٤ ص٢٦٤-٢٦٦، كنز العمال ج١٦ ص٣٢٨)

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, ইসলামে কখনো মুতআ বিবাহ বৈধ ছিল না। বরং জাহেলী যুগে যেমন বিভিন্ন ধরনের বিবাহের প্রচলন ছিল, ঠিক মুতআও এগুলোর মধ্যে একটি ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যেহেতু হুকুম-আহ্কাম নাযিল হচ্ছিল না, তাই জাহেলিয়াতের অভ্যাস অনুযায়ী তাঁরা আমল করছিল। অতঃপর আস্তে আস্তে হুকুম নাযিল হতে লাগল এবং অন্যান্য বিবাহের ন্যায় মুতআ বিবাহকেও আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা হারাম ঘোষণা করা হয়। অবশেষে হযরত উমর (রাঃ)-এর খেলাফতের যুগে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, মুতআ বিবাহ হারাম। (فيض الباري ج٤ ص١٣٧-١٣٨)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ অনেকেই বলে থাকেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকেও মুতআ বিবাহ জায়েয হওয়ার উক্তি পাওয়া যায়। (شرح معاني الآثار ج٢ ص١٤)
কিন্তু, ফিক্‌হের কিতাবসমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে একথা প্রতীয়মান হয় যে, খায়বর এবং আওতাস যুদ্ধে (যে সময় মুতআ নিষিদ্ধ হয়) হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস উপস্থিত না থাকার কারণে যৌনশক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না শুধু এমন নিরুপায় ব্যক্তির জন্য মুতআ বিবাহকে জায়েয মনে করতেন। অতঃপর যখন তিনি (রাঃ) তা নিষিদ্ধ হওয়ার খবর জানতে পান, তখন তিনি নিজের মত থেকে ফিরে আসেন। (نصب الراية ج٣ ص١٨١)

ইমাম তিরমিযী (রহ.) বর্ণনা করেন- ... إِنَّمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْئٌ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي الْمُتْعَةِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلِه حَيْثُ أُخْبِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ (ترمذي ج١ ص٢١٣ باب نكاح المتعة)

অর্থাৎ, ... মুতআ বিষয়ে ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে কিছুটা অবকাশ ছিল বলে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিত এইসব হাদীসের প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে তিনি স্বীয় মত প্রত্যাহার করে নেন।

সুতরাং বুঝা গেল, মুতআ বিবাহ যে হারাম, এর উপর সাহাবাগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তাছাড়া হিদায়া গ্রন্থকার ইমাম মালিক (রহ.)-এর পক্ষ থেকে যে মুতআ বিবাহ জায়েয হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, মূলত তা সহীহ নয়। কেননা, হিদায়া গ্রন্থের ভাষ্যকারের মতে, আসলে ইহা গ্রন্থকারের পক্ষ থেকে ভুল হয়ে গেছে। কেননা মালিকিয়াদের কোন কিতাবে মুতআ জায়েয হওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায় না। তাছাড়া স্বয়ং ইমাম মালিক (রহ.) মুয়াত্তায় হযরত আলী (রাঃ) হতে মুতআ নিষিদ্ধের হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথচ ইমাম মালিক (রহ.)-এর অভ্যাস ছিল, স্বীয় গ্রন্থ মুয়াত্তায় ঐ সকল রেওয়ায়েতই উল্লেখ করতেন, যা তাঁর মাযহাবের অনুকূলে ছিল। (هداية ج٢ ص٣١٢)

মুতআ বিবাহ হারাম ঘোষণা হওয়ার সময়কালঃ উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ সহ বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থ অধ্যয়নের ফলে দেখা যায় যে, মুতআ বিবাহ হারাম হওয়ার সময়কাল নিয়ে বেশ অসামঞ্জস্য রয়েছে। যেমন- (১) হযরত আলী (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী ইহা ৭ম হিজরীতে খায়বর যুদ্ধে হারাম ঘোষিত হয়।

(২) সাবুরা (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী ইহা মক্কা বিজয়ের দিন হারাম ঘোষিত হয়। (مسلم ج٢ ص٤٥١ باب نكاح المتعة، كنز العمال ج١٦ ص٥٢٥)

(৩) হযরত আলী (রাঃ)-এর অন্য এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হুনাইন যুদ্ধে হারাম ঘোষিত হয়। (نسائي ص٨٩ تحريم المتعة)

(৪) সালামা ইবন আকওয়া (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী, আওতাস যুদ্ধে তিন দিনের জন্য হালাল ঘোষণা হওয়ার পর তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম ঘোষিত হয়। (مسلم ج٢ ص٤٥١)

(৫) জাবির ইবন আব্দুল্লাহ আনসারী (রাঃ)-এর এক বর্ণনা অনুযায়ী, তাবুক যুদ্ধের সময় মুতআ বিবাহ হারাম করা হয়। (نصب الراية ج٣ ص١٧٩)

বর্ণনাগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধানঃ (১) কাযী আয়ায (রহ.) বলেন, মুতআ বিবাহ খায়বরের সময়ই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে এবং এ ঘোষণা তাকীদ হিসেবে বিভিন্ন

যুদ্ধে বারবার দেয়া হয়েছিল। সুতরাং যিনি যে যুদ্ধে এই হুকুম প্রথমে শুনেছেন, তিনি তাই বর্ণনা করেছেন। (شرح نووي ج١ ص٤٥٠)

(২) হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, মক্কা বিজয়, হুনাইন এবং আওতাস যুদ্ধ যেহেতু একই সফরে হয়েছিল, এজন্য কেউ একে মক্কা বিজয়, কেউ হুনায়ন যুদ্ধে আবার কেউবা আওতাস যুদ্ধের কথা বলেছেন।

(فيض الباري ج٤ ص١٣٥-١٣٦)

(৩) এ ব্যাপারে অধিক নির্ভরযোগ্য মত প্রকাশ করেছেন, হযরত আল্লামা তিব্বী (রহ.)। তিনি বলেন, প্রথমত একবার খায়বর যুদ্ধের সময় (৭ম হিঃ) মুতআ বিবাহকে হারাম ঘোষণা করা হয়। অতঃপর মক্কা বিজয়ের পর আওতাস যুদ্ধের সময় একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দ্বিতীয়বার অনুমতি দেয়া হয়। অতঃপর চিরকালের জন্য এ ধরনের বিবাহ হারাম ঘোষণা দেয়া হয়। ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সহ জমহুরের অভিমতও তাই।

(حاشية سنن الترمذي للشيخ أحمد على السهارنفوري ج١ ص١٦٦)

بَابُ فِيْ التَّحْلِيْلِ ص٢٨٣ ঃ তাহলীল বা হালাল করা

... عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لُعِنَ الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ-

(ترمذي ج١ ص٢١٣ باب المحل والمحلل له، ابن ماجة ص١٤٠)

অনুবাদঃ ... আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তালাক দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিবাহ্ করে সে, আর যে ব্যক্তি স্বামী তালাক দেওয়ার পর পুনরায় গ্রহণের ইচ্ছায় তাকে অন্যের নিকট বিবাহ দিয়ে তার জন্য হালাল করে নেয়, তারা উভয়েই অভিশপ্ত।

বিশ্লেষণঃ مُحَلِّلْ বলা হয়, দ্বিতীয় স্বামীকে, আর مُحَلَّلْ لَه বলা হয় প্রথম স্বামীকে।

(مرقات ج٦ ص٢٩٧)

তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে যদি প্রথম স্বামী ফিরিয়ে আনতে চায়, আর এক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্বামী যদি এই শর্তে ঐ তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে বিয়ে করে যে, সহবাসের পর তাকে তালাক দিয়ে দেবে, তাহলে এই বিয়ে কতটুকু কার্যকরী হবে এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ, ইসহাক, নাখঈ, কাতাদা, লাইস (রহ.)সহ জমহুরের মতে, যদি দ্বিতীয় স্বামী এই শর্তের উপর বিবাহ করে যে, সহবাসের পর স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেবে, অথবা কেবল প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে

বিয়ে করে থাকে, তাহলে উক্ত বিয়ে শুদ্ধ হবে না এবং প্রথম স্বামীর জন্যও হালাল হবে না। (المغني ج٦ ص٦٤٦)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে হযরত ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে তার উপর অভিশাপের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং ইহা যে একটি কত বড় মন্দ বিষয় তা সহজেই অনুমেয়। আর বিবাহ হালাল হওয়া একটি বিশাল নেয়ামত। সুতরাং এর কোন নির্দিষ্ট শর্ত থাকতে পারে না।

দলীল (২)ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস-

عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَسْأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَهَا اَخٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ مُؤَامِرَةٍ مِنْهُ لِيُحِلَّهَ لِاَخِيْهِ هَلْ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ لاَ اِلاَّ نِكَاحَ رُغْبَةٍ كُنَّا نَعُدُّ هٰذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (مستدرك حاكم ج٢ ص١٩٩)

অর্থাৎ, হযরত নাফি (রহ.) বলেন, এক ব্যক্তি ইবন উমর (রাঃ)-এর কাছে এসে এরূপ এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। অতঃপর এ মহিলাকে তার সাথে পরামর্শ ব্যতীত তার ভাই বিয়ে করে ফেলেছে, যাতে সে এই মহিলাকে তার ভাইয়ের জন্য হালাল করে দিতে পারে। এই মহিলা কি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে? উত্তরে তিনি বললেন, না। তবে আগ্রহের বিয়ে ব্যতিক্রম। আমরা তো এটাকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে যিনা গণ্য করতাম।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মত হল, যে কোন শর্তের ভিত্তিতে বিয়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং প্রথম স্বামীর জন্যও হালাল হবে। তবে শর্ত হল, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে তার সঙ্গম হতে হবে। [কিন্তু এমন শর্ত সাপেক্ষে বিবাহ মাকরূহ তাহরীমী।]

(البحر الرائق ج٤ ص٥٨)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

অর্থাৎ, তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়া হয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। (বাকারাঃ ২৩০) উক্ত আয়াতে সাধারণ বিয়ের উল্লেখ রয়েছে। হালাল করার শর্তে হোক, অথবা না হোক, এমন কোন শর্তারোপ করা হয়নি।

দলীল (২)ঃ عَنِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ اَرْسَلَتْ اِمْرَأَةٌ اِلَى رَجُلٍ فَزَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا لِتُحِلَّهَا

لِزَوْجِهَا، فَأَمَرَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنْ يُّقِيْمَ عَلَيْهَا وَلاَ يُطَلِّقَهَا وَأَوْعَدَهُ بِعَاقِبَةٍ اِنْ طَلَّقَهَا– (مصنف عبد الرزاق ج٦ ص٢٦٧)

অর্থাৎ, ইবন সীরীন (রহ.) বলেন, এক মহিলা এক লোকের কাছে খবর পাঠাল, অতঃপর মহিলাটি সে পুরুষটিকে বিয়ে করে ফেলল, যাতে নিজেকে তার স্বামীর জন্য হালাল করে নিতে পারে। তখন উমর (রাঃ) সে লোকটিকে নির্দেশ দিলেন, সে যেন তার বিয়ে ঠিক রাখে, এ মহিলাকে তালাক না দেয় এবং তিনি তাকে শাস্তির ভয়ও দেখালেন, যদি তাকে তালাক দেয়।

উক্ত হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, বিয়ে হালাল করার শর্তে নাজায়েয হওয়া সত্ত্বেও আকদ সম্পাদিত হয়ে যায়। তাই হযরত উমর (রাঃ) উক্ত বিয়েকে ভেঙ্গে দেননি। হযরত আবু হানিফা (রহ.) বলেন, শর্তে ফাসেদের দ্বারা বিবাহ ফাসেদ হয় না, বরং শর্ত বাতিল হয়ে যায় এবং বিবাহ সহীহ হবে।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ হযরত ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর হাদীসের জবাব দিতে গিয়ে আহনাফগণ বলেন, লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, উক্ত হাদীসে محلل এবং محلل له শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর শব্দ দু'টি حلال (হালাল) ধাতু থেকে উৎকলিত হয়েছে। সুতরাং মূল হাদীসটিই একথার দলীল যে, এ মহিলার বিয়ে হালাল হবে এবং প্রথম স্বামীর জন্যও হালাল হবে। নতুবা হাদীসে محلل এবং محلل له শব্দের উল্লেখ করা হত না; বরং অন্য শব্দ উল্লেখ করা হত। তবে একথা সত্য যে, তাদের উপর যেহেতু লানত করা হয়েছে, তাই এমন কাজ করা মাকরূহ তাহরীমী। যার প্রবক্তা আহনাফগণও। (درس مشكوة ج٣ ص٣٨)

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ (১) হযরত ইবন উমর (রাঃ)-এর উক্তিতে যিনার সাথে এই আমলটির উপমা শুধু হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে, বিয়ে সম্পাদিত হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে নয়। এর সমর্থন এর দ্বারাও হয় যে, হযরত ইবন উমর (রাঃ) এই ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছেদের কোন হুকুম দেননি।

(২) হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ। আর হানাফীগণের দলীল হল কুরআন। সুতরাং কুরআনের মুকাবিলায় খবরে ওয়াহিদ দলীলযোগ্য নয়। (درس ترمذي ج٣ ص٤٠١)

بَابُ الرَّجُلِ يَنْظُرُ اِلَى الْمَرْاَةِ وَهُوَ يُرِيْدُ تَزْوِيْجَهَا ص٢٨٤

বিবাহের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির পাত্রী দেখা

... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرْاَةَ فَاِنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى مَا يَدْعُوْهُ اِلٰى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ اَتَخَبَّأُ لَهَا حَتّٰى رَاَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِيْ اِلٰى نِكَاحِهَا وَتَزْوِيْجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا– (ابن ماجة ص١٣٥)

অনুবাদঃ ... জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোন স্ত্রীলোককে বিবাহের উদ্দেশ্যে পয়গাম পাঠাবে, তখন যদি তার পক্ষে সম্ভব হয় তবে সে যেন তার ব্যাপারে সবকিছু দেখে নেয়, যা তাকে বিবাহে উৎসাহ দেয়। রাবী বলেন, অতঃপর আমি জনৈকা কুমারীকে বিবাহের জন্য প্রস্তাব দেই এবং আমি গোপনে তার চেহারা দর্শন করি, যা আমাকে তার সাথে বিবাহে প্রলুব্ধ করে। অতঃপর আমি তাকে বিবাহ করি।

বিশ্লেষণঃ বিবাহের উদ্দেশ্যে পাত্রীকে দেখা জায়েয কিনা- এ ব্যাপারে সামান্য মতানৈক্য রয়েছেঃ

কতিপয় আহলে যাহেরের মতে, পাত্রের জন্য পাত্রীকে দেখা জায়েয নয়। কেননা, তাদের মতে, বিবাহের পূর্বে পাত্রী এবং অন্যান্য বেগানা মহিলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ইমাম মালিক (রহ.)-এরও একটি অভিমত অনুরূপ।

(شرح معاني الآثار ج٢ ص٩، مرقاة ج٦ ص١٩٥)

দলীলঃ নবী করীম (সাঃ)-এর বাণী-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ فَاِنَّ لَكَ الْاُوْلٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ– (ابو داود ج١ ص٢٩٢ باب ما يومر به من غض البصر)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আলী (রাঃ)-কে বলেন, হে আলী! তোমার প্রথম দৃষ্টিপাত (বেগানা স্ত্রীলোকের প্রতি যা অনিচ্ছাকৃত হয়েছে), তোমার দ্বিতীয় দৃষ্টি যেন তার অনুসরণ না করে। কেননা, প্রথমবার দৃষ্টিপাত তোমার জন্য জায়েয, আর দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করা তোমার জন্য বৈধ নয়।

উক্ত হাদীসে مطلقا (শর্তহীনভাবে) নিষেধ করা হয়েছে। বিবাহের পাত্রী হোক বা না হোক এমন কোন নির্দিষ্ট করা হয়নি।

* ইমাম মালিক (রহ.) হতে আরেকটি অভিমত পাওয়া যায় যে, পাত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে দেখা জায়েয আছে। (مرقاة ج٦ ص١٩٥)

* ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ, আহমদ, ইসহাক, হাসান বসরী, আওযাঈ, সুফিয়ান সাওরী (রহ.) প্রমুখের মতে, প্রস্তাবিত কনেকে তার অনুমতি সাপেক্ষে অথবা অনুমতি ব্যতীতই দেখা জায়েয। শুধু জায়েযই নয়; বরং দেখা মুস্তাহাব এবং উত্তম। আল্লামা নববী (রহ.) বর্ণনা করেন, হযরত ইমাম মালিক (রহ.)-এর অভিমতও জমহুরের অনুরূপ, অর্থাৎ কনের অনুমতি ছাড়াও দেখা জায়েয আছে।

(مرقاة ج٦ ص١٩٥–١٩٨، شرح نووي ج١ ص٤٥٦)

উল্লেখ্য যে, পাত্রীর চেহারা এবং উভয় হাতের তালুদ্বয় দেখার অনুমতি রয়েছে। অন্য কোন অঙ্গ দেখা জায়েয নয়। যদি অন্য কোন অঙ্গের ব্যাপারে সন্দেহ হয়, তাহলে কোন বিশ্বস্ত মহিলা পাঠানো যেতে পারে। (درس مشكوة ج٣ ص٩)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে হযরত জাবির (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَاَخْبَرَهُ اَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَ نَظَرْتَ اِلَيْهَا قَالَ لاَ قَالَ فَاذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا الخ (مسلم ج١ ص٤٥٦ باب ندب من اراد نكاح امرأة الخ)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট ছিলাম। এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট এসে জানাল যে, সে আনসারী এক মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। নবী (সাঃ) লোকটিকে বললেন, তুমি কি তাকে দেখেছ? লোকটি বলল, না। নবী করীম (সাঃ) বললেন, যাও, তুমি তাকে দেখে নাও।

উক্ত হাদীসে নবী করীম (সাঃ) দেখার জন্য নির্দেশসূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন।

দলীল (৩)ঃ ... عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّهُ خَطَبَ اِمْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهُ اَحْرٰى اَنْ يُّؤْدَمَ بَيْنَكُمَا– (ترمذي ج١ ص٢٠٧ باب النظر إلى المخطوبة، نسائي ج٢ ص٧٢ باب اباحة النظر قبل التزويج، ابن ماجة ص١٣٥)

অর্থাৎ, ... মুগীরা ইবন শুবা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি এক রমণীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তখন নবী করীম (সাঃ) তাকে বললেন, তুমি তাকে দেখে নাও। কারণ, ইহা তোমাদের উভয়ের মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টির জন্য অধিক সহায়ক হবে।

দলীল (৪)ঃ মুহাম্মদ ইবন সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত-

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا اَلْقَى اللهُ فِيْ قَلْبِ امْرَئٍ مِنْكُمْ خِطْبَةَ اِمْرَأَةٍ فَلاَ بَأْسَ (وفي رواية فلا جُنَاحَ) اَنْ يَّنْظُرَ اِلَيْهَا– (وَفِيْ رِوَايَةٍ وَاِنْ كَانَتْ لاَ تَعْلَمْ) (مستدرك حاكم ج٣ ص٤٣٤، نصب الراية ج٤ ص٢٤١، ابن ماجة ص١٣٥)

অর্থাৎ, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ইরশাদ করতে শুনেছি, যখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের কারো অন্তরে কোন মহিলাকে বিয়ে করার বিষয় জাগ্রত করেন, তখন তাকে দেখাতে কোন অসুবিধা নেই। (এক রেওয়ায়েতে আছে, যদিও তা কনের অজান্তে হোক না কেন)

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহের উদ্দেশ্যে পাত্রীকে দেখা নাজায়েয নয়; বরং দেখা জায়েয ও মুস্তাহাব।

জবাবঃ আহলে যাহেররা দলীল হিসেবে হযরত আলী (রাঃ)-এর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন, এর জবাব হল- উক্ত হাদীসে মূলত বেগানা অপরিচিতা মহিলাদের প্রতি দৃষ্টি দিতে নিষেধ করা হয়েছে, যাকে বিবাহ প্রস্তাব অথবা বিবাহ করার কোন ইচ্ছা নেই। কিন্তু যদি কোন নির্দিষ্ট মহিলাকে বিবাহ করার পরিপূর্ণ ইচ্ছা থাকে, তাহলে তাকে দেখতে নিষেধ নেই। হাদীসসমূহ দ্বারা তাই প্রমাণিত হয়। (অন্তরের খবর আল্লাহই অধিক জ্ঞাত)

بَابُ فِيْ الْوَلِيِّ ص٢٨٤ ঃ ওলী বা অভিভাবক

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا امْرَاَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَاِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا اَصَابَ مِنْهَا فَاِنْ تَشَاجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ– (ترمذي ج١ ص٢٠٨ باب لا نكاح الا بولي، ابن ماجة ص١٣٦)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যদি কোন স্ত্রীলোক তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কাউকে বিবাহ করে তবে তার বিবাহ বাতিল হবে। আর তিনি এই উক্তিটি তিনবার উচ্চারণ করেন। আর সে যদি তার সাথে সহবাস করে তবে ঐ সহবাসের কারণে তাকে পূর্ণ মহর প্রদান করতে হবে। আর উভয় পক্ষের অভিভাবকরা যদি এ সম্পর্কে মতবিরোধ করে তখন দেশের সরকার তার অভিভাবক হবে। কেননা, যার কোন অভিভাবক নেই, দেশের সরকারই তার অভিভাবক।

বিশ্লেষণঃ ওলী (وَلِيٌّ)-এর আভিধানিক অর্থঃ

وَلِيٌّ শব্দটি একবচন। এটি ছিফাতের সীগা। এর বহুবচন হচ্ছে اولياء । শব্দটি اَلْوِلَايَةُ মাসদার থেকে উদ্ভূত। অভিধানে এটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

১. اَلصَّدِيْقُ-বন্ধু। যেমন, আল্লাহর বাণী- فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَه عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ
অর্থাৎ, তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

২. اَلنَّاصِرُ-সাহায্যকারী। যেমন, ইরশাদ হচ্ছে- لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيْعٌ
অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী নেই।

৩. رَبٌّ-প্রতিপালক। যেমন, ইরশাদ হচ্ছে- قُلْ اَغَيْرَ اللهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا
অর্থাৎ, আপনি বলে দিন, আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অপরকে প্রতিপালক স্থির করব? (আনআমঃ ১৪)

৪. اَلْعَاشِقُ-প্রেমিক। যেমন, আল্লাহর বাণী- اَلاَ اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
অর্থাৎ, জেনে রেখো, যারা আল্লাহর প্রেমিক (আশেক), তাদের কোন ভয়ভীতি নেই। (ইউনুসঃ ৬২)

৫. মালিক হওয়া। যেমন বলা হয়- فُلاَنٌ وَلِيُّ الاَرْضِ অর্থাৎ, অমুক ব্যক্তি জমির মালিক।

তবে ওলী শব্দের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ অর্থ হল অভিভাবক। যেমন, ইরশাদ হচ্ছে- اَللهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا অর্থাৎ, আল্লাহ হলেন ঈমানদারদের অভিভাবক।

ওলীর পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

১। دُرُّ الْمُخْتَارِ নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে- اَلْوَلِيُّ هُوَ الَّذِيْ يَنْفُذُ قَوْلَه عَلَى الْغَيْرِ شَاءَ اَوْ اَبى
অর্থাৎ, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যার কথা অন্যের উপর কার্যকর করা হয়, তাকেই ওলী বলা হয়।

২। عُمْدَةُ الرِّعَايَةِ কিতাবে বলা হয়েছে- هُوَ الَّذِيْ يَنْفُذُ قَوْلَه عَلٰى اِنْسَانٍ رَضِيَ اَوْ اَبى
অর্থাৎ, যার কথা মানুষের উপর বাস্তবায়িত হয়। এতে সে রাজি থাকুক বা অস্বীকার করুক।

৩। كِتَابُ الْفِقْهِ গ্রন্থকার বলেন- اَلْوَلِيُّ هُوَ الَّذِيْ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةَ الْعَقْدِ فَلاَ يَصِحُّ بِدُوْنِه
অর্থাৎ, ওলী হলেন ঐ ব্যক্তি যার উপর কোন বন্ধন বা লেনদেনের বিশুদ্ধতা স্থিরকৃত হয়, ফলে তাকে ছাড়া ঐ বন্ধনটি শুদ্ধ হয় না।

৪। আল্লামা ইবনুল হুমাম বলেন- اَلْوَلِيُّ هُوَ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ الْوَارِثُ (تنظيم الاشتات ج٢ ص١٦٧)
অর্থাৎ, ওলী বলা হয় যিনি বোধশক্তিসম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক এবং উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

اَقْسَامُ الْوِلَايَةِ বা ওলীর প্রকারভেদঃ বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকত্ব দু'প্রকার। যথা-

১। وِلَايَةُ الْاِجْبَارِ - বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে অভিভাবকত্ব।

২। وِلَايَةُ الْمَذْهَبِ - ধর্মীয় অভিভাবকত্ব।

উল্লেখ্য যে, وِلَايَةُ الْاِجْبَارِ - বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে অভিভাবকত্ব চারটি উপায়ে সাব্যস্ত হয়। যেমন-

(১) আত্মীয়তা দ্বারা (২) মালিকানা দ্বারা
(৩) প্রভুত্ব দ্বারা (৪) নেতৃত্ব দ্বারা

বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকের অনুমতিঃ

এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে যে, وِلَايَةُ الْاِجْبَارِ তথা বলপ্রয়োগের অভিভাবকত্ব কোন্ ধরনের নারীর উপর প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে মহিলাদের চারটি প্রকার রয়েছে-

(১) ثَيِّبَةٌ بَالِغَةٌ তথা বালেগা অকুমারী। এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, বিয়ের ক্ষেত্রে তার অভিভাবকের প্রয়োজন নেই।

(২) بَاكِرَةٌ صَغِيْرَةٌ তথা নাবালেগা কুমারী। এ ব্যাপারেও সকলেই একমত যে, বিয়ের ক্ষেত্রে তার অভিভাবকের প্রয়োজন রয়েছে।

(৩) بَاكِرَةٌ بَالِغَةٌ তথা বালেগা কুমারী। ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে এমন মহিলার অভিভাবক প্রয়োজন এবং ইমাম আবু হানিফার (রহ.) মতে প্রয়োজন নেই।

(৪) ثَيِّبَةٌ صَغِيْرَةٌ তথা নাবালেগা অকুমারী। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে এমন মহিলার অভিভাবক প্রয়োজন এবং ইমাম শাফেঈ (রহ)-এর মতে প্রয়োজন নেই। (درس مشكوة ج٣ ص١٢)

উল্লেখ্য যে, এখানে কুমারী (باكرة) বলতে এমন মহিলাকে বুঝানো হয়েছে, যে নারী কোন দিন যেকোন উপায়ে সহবাসে লিপ্ত হয়নি এবং তার যৌনাঙ্গের এক ধরনের পাতলা পর্দা ক্ষুণ্ন হয়নি। সে বালেগা হোক অথবা নাবালেগা হোক। আর অকুমারী (ثيبة) বলতে এর বিপরীত দিকটি বুঝানো হয়েছে।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, وِلَايَةُ الإِجْبَار তথা বলপ্রয়োগের দ্বারা অভিভাবক প্রয়োজন হওয়ার মাপকাঠি হল بكارت বা কুমারীত্ব। অতএব, মহিলা যদি কুমারী হয়, সে বালেগা হোক অথবা নাবালেগা হোক, অভিভাবক ইচ্ছা করলে মহিলার অনুমতি ব্যতীত তাকে বিবাহ দিতে পারবে। আর যদি ثيبة তথা অকুমারী হয় তাহলে মহিলার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দিতে পারবে না। সে বালেগা হোক অথবা নাবালেগা।

* পক্ষান্তরে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, অভিভাবকত্বের মাপকাঠি হল صغر বা অল্পবয়স্কতা। অতএব মহিলা যদি অপ্রাপ্তবয়স্কা হয়, সে কুমারী থাকুক বা অকুমারী থাকুক, অভিভাবক ইচ্ছা করলে তার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দিতে পারবে। আর যদি মহিলা বয়স্কা তথা বালেগা হয়, চাই সে কুমারী থাকুক বা না থাকুক, তার উপর অভিভাবকের কোন বল প্রয়োগ চলবে না। এমন মহিলা যদি অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত নিজে নিজে বিয়ে করে ফেলে তাহলে তা কার্যকরী হবে। (بدائع الصنائع ج٢ ص٢٤١، فتح القدير ج٣ ص١٦١)

অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ের হুকুম (حُكْمُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ)ঃ
সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে, অপ্রাপ্তবয়স্কা, জ্ঞান-বুদ্ধিহীনা ও দাসীর বিবাহ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত শুদ্ধ হবে না।
তবে স্বাধীনা, প্রাপ্তবয়স্কা ও বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন মহিলার বিবাহ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত শুদ্ধ হবে কিনা- এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-
* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল, ইসহাক, ইবন হুযম (রহ.) ও জমহুরের মতে, এ স্তরের মহিলাদের বিবাহ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত শুদ্ধ হবে না। (بداية المجتهد ج٢ ص٧، المغني ج٦ ص٤٤٩، المحلّى ج٩ ص٤٥١)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- وَأَنْكِحُوا الأَيَامٰى مِنْكُمْ অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও। (নূরঃ ৩২)
উক্ত আয়াতটিতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অভিভাবকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যেন মহিলাদেরকে বিবাহ দিয়ে দেয়। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, বিবাহের ক্ষেত্রে মহিলাদের নিজেদের কোন অধিকার নেই, বরং এর যিম্মাদার হচ্ছে অভিভাবকগণ।

দলীল (২)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- فَانْكِحُوْهُنَّ بِإِذْنِ اَهْلِهِنَّ অর্থাৎ, অতএব, তোমরা তাদেরকে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর। (নিসাঃ ২৫)
উক্ত আয়াতেও বিয়ের জন্য পুরুষদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। যদি মহিলাদের অধিকার থাকত, তাহলে তাদের কথাও উল্লেখ থাকত।

দলীল (৩)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (৪)ঃ ... عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ– (ابو داود ج١ ص٢٨٤، ترمذي ج١ ص٢٠٨، ابن ماجة ص١٣٦)
অর্থাৎ, ... আবু মূসা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ওলী ব্যতীত কোন বিবাহ হতে পারে না।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, স্বাধীনা, প্রাপ্তবয়স্কা ও বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন মহিলার বিবাহ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত শুদ্ধ হবে। তবে এক্ষেত্রে অভিভাবক হওয়া মুস্তাহাব এবং উত্তম। [উল্লেখ্য যে, ইমাম আযম ও সাহেবাইনের পক্ষ থেকে এক্ষেত্রে কুফূ (স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সমতা) হওয়ার ব্যাপারে অনেক রেওয়ায়েত বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও ফিকহের কিতাবাদি অধ্যয়নের ফলে অবশেষে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে, সমতা না হলেও বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে।] (فتح القدير ج٣ ص١٥٧، تبيين الحقائق ج٢ ص١١٧، بدائع الصنائع ج٢ ص٢٤٨، المبسوط للسرخسي ج٥ ص١٠)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-
فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ
অর্থাৎ, অতঃপর তারা (মহিলারা) যখন ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতিসঙ্গত ব্যবস্থা নিলে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। (বাকারাঃ ২৩৪)
উক্ত আয়াতে "فَعَلْنَ فِيْ اَنْفُسِهِنَّ" শব্দসমূহ উল্লেখের দ্বারা একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ মূলত মহিলাদের কাজ এবং তাদের নিজেদের বিবাহ নিজেরাই করতে সক্ষম।

দলীল (২)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه'
অর্থাৎ, তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়, তবে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামী বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। (বাকারাঃ ২৩০)
উক্ত আয়াতেও বিবাহের সম্পর্ক মহিলার দিকে করা হয়েছে। অভিভাবকের দিকে নয়।

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِيْ لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيْلاً فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ زَوِّجْنِيْهَا اِنْ لَّمْ تَكُنْ لَّكَ بِهَا حَاجَةٌ ... فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ–

(ابو داود ج۱ ص۲۸۷ باب في التزويج على العمل يعمل، بخاري ج۲ ص۷٦۷ باب عرض المرأة نفسها الخ/ص۷٦۱، مسلم ج۱ ص٤٥۷ باب الصداق وجواز كونه الخ، ترمذي ج۱ ص۲۱۱ باب مهور النساء، نسائي ج۲ ص۸۸ باب هبة المرأة نفسها الخ، ابن ماجة ص۱۳۷)

অর্থাৎ, ... সাহ্ল ইবন সাদ আল সাঈদী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে জনৈকা মহিলা উপস্থিত হয়ে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমাকে আপনার নিকট বিবাহের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করছি। এরপর সে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। জনৈক (আনসার) ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন, যদি তাতে আপনার কোন প্রয়োজন না থাকে। ... রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বলেন, আমি কুরআনের ঐ অংশের বিনিময়ে তোমাকে তার সাথে বিবাহ দিলাম।

উক্ত হাদীসে দেখা যায় যে, এই ঘটনায় মহিলার কোন অভিভাবক উপস্থিত ছিল না।

দলীল (৪)ঃ ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَيِّمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَّلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَامَرُ فِيْ نَفْسِهَا وَاِذْنُهَا صُمَاتُهَا– (ابو داو ج۱ ص۲۸٦ باب في الثيب، مسلم ج۱ ص٤٥٥ باب استيذان الثيب في النكاح، ترمذي ج۱ ص۲۱۰ باب استمار البكر والثيب، نسائي ج۲ ص۷٦ استيذان البكر في نفسها، ابن ماجة ص۱۳٦)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, সায়্যেবা স্ত্রীলোক (নিজের বিবাহের ব্যাপারে) ওলীর চাইতে নিজেই বেশি হকদার। আর বালিগা কুমারী মেয়েদের (বিবাহের সময়) অনুমতির প্রয়োজন এবং তার অনুমতি হল চুপ করে থাকা।

উক্ত হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বাধীনা, প্রাপ্তবয়স্কা ও বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন মহিলার বিবাহ অভিভাবক ব্যতীত শুদ্ধ হবে।

দলীল (৫)ঃ ... عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِيْ بَكْرٍ مَعَ مُنْذِرِ بْنِ زُبَيْرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ غَائِبٌ– (طحاوي ج۲ ص٦)

অর্থাৎ, হযরত আয়িশা (রাঃ) স্বীয় ভাতিজি হাফসা বিনত আব্দুর রহমান ইবন আবু বকরের বিয়ে তার পিতার অবর্তমানে মুনযির ইবন যুবায়ের (রাঃ)-এর সাথে দিয়েছিলেন।
উক্ত হাদীসেও পরিলক্ষিত হয় যে, এ বিয়েটিও হয়েছিল অভিভাবক ছাড়া।

যুক্তিভিত্তিক দলীলঃ যুক্তিও বলে যে, নারী একজন স্বাধীন মানুষ। তাই তার স্বীয় সম্পদ ও ব্যক্তিত্বে কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেয়া উচিত। নতুবা তার ব্যক্তি স্বাধীনতার হক নষ্ট করা হয়।
সুতরাং কুরআনের বাণী, বিভিন্ন হাদীস ও যুক্তি দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, বালেগা মেয়ের বিবাহ অভিভাবক ব্যতীতও শুদ্ধ হয়ে যাবে। যদিও ফেতনা থেকে পরহেজ করার জন্য অতি উত্তম হল অভিভাবক উপস্থিত থাকা।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ

(১) وَانْكِحُوْا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ - **আয়াতের জবাবঃ** আয়াতে বর্ণিত "اَيَامٰى" শব্দটি "ايم"-এর বহুবচন। এর অর্থ হল مَنْ لاَ زَوْجَ لَهُ অর্থাৎ, যার কোন জীবনসঙ্গী নেই। পুরুষ হোক অথবা মহিলা। সুতরাং এমতাবস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য হল- পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের জন্য উত্তম পন্থা হল এই যে, তারা যেন অভিভাবকের মাধ্যম ব্যতীত অগ্রসর না হয়। কিন্তু যদি অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ করে ফেলে তাহলে কি হবে, এ ব্যাপারে আয়াতে কিছুই বলা হয়নি। অতঃপর "اَيَامٰى" দ্বারা যেহেতু বালেগ পুরুষ-মহিলা উভয়ই শামিল। আর বালেগ পুরুষের বিবাহ যেহেতু অভিভাবকের মাধ্যম ছাড়াই সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয আছে, সুতরাং বালেগা মহিলার বিবাহও অভিভাবকের মাধ্যম ব্যতীত জায়েয। আয়াতের উদ্দেশ্যও তাই। যদিও সুন্নতের পরিপন্থী কাজ করার কারণে মেয়ে হিসেবে একটু বেশি তিরস্কৃত হবে। এটা ভিন্ন কথা। (معارف القرآن ج٦ ص٤٠٩)

(২) "فَانْكِحُوْهُنَّ بِإِذْنِ اَهْلِهِنَّ" **আয়াতের জবাবঃ** এই আয়াতটি মূলত স্বাধীনা মহিলাদের বিবাহের ক্ষেত্রে দলীল হিসেবে উপস্থাপিত হতে পারে না। বরং স্বাধীনা মহিলাদের বিবাহের জন্য অন্য সুস্পষ্ট আয়াত রয়েছে। যা হানাফীগণ প্রথম দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। বরং উক্ত আয়াতটি (فانكحوهن) দ্বারা তো হানাফীগণের অভিমত প্রমাণিত হয়। কেননা, উক্ত আয়াতে প্রমাণ রয়েছে যে, একজন মহিলা তার বাঁদীকে বিয়ে দেয়ার অধিকার রাখে। কারণ, আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতে اَهْلِهِنَّ শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর اَهْل শব্দটি عام (ব্যাপক), পুরুষ মালিক হোক অথবা মহিলা মালিক হোক। (أحكام القرآن للتهانوي ج٢ ص٢٣٩)

(৩) হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসের জবাবঃ

ক. উক্ত হাদীসে হয়ত ছোট নাবালেগা মেয়ে অথবা দাসীর কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ যদি কোন ছোট মেয়ে অথবা দাসী অভিভাবক ছাড়া বিয়ে করে ফেলে, তাহলে সে বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। একথা তো আহনাফরাও বলে থাকেন।

খ. অথবা, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই বিবাহ বেশিদিন স্থায়ী থাকবে না, বরং আস্তে আস্তে তা বাতিলের দিকে গড়াবে।

গ. অথবা, বিবাহ হয়ে যাবে সত্য, তবে এমন বিবাহ ফায়েদাযুক্ত নয়। যেমন, পবিত্র কুরআনে بَاطِل বলতে তাই বুঝানো হয়েছে- رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً অর্থাৎ, হে আমাদের রব! এসব তুমি নিরর্থক সৃষ্টি করনি। (আলে ইমরানঃ ১৯১)

ঘ. আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীতও বিবাহ হয়ে যায়। যেমন, হাদীসে উল্লেখ রয়েছে- فَاِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ অর্থাৎ, "আর সে যদি তার সাথে সহবাস করে তবে ঐ সহবাসের কারণে তাকে মহর দিতে হবে।" সুতরাং বিবাহ যদি শুদ্ধই না হয়, তাহলে মহর কেন ওয়াজিব হবে?

ঙ. অথবা, অভিভাবক দ্বারা عام (ব্যাপক) উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ, মহিলা নিজের সত্তার অভিভাবক। তখন হাদীসের অর্থ হবে, যদি মহিলা স্বয়ং রাজি না থাকে, তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হবে না; বরং বাতিল হয়ে যাবে।

চ. তাছাড়া হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসটি সনদের ভিত্তিতে অধিক শক্তিশালী হওয়ার কারণে আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসের উপর অগ্রাধিকার পাবে। কেননা, ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে উল্লেখ রয়েছে। অথচ আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসটি তাতে উল্লেখ নেই।

ছ. কোন বর্ণনাকারী যদি স্বীয় রেওয়ায়েতের বিপরীত আমল করে, এতে প্রমাণিত হয় যে, তার রেওয়ায়েত আমল করার আর যোগ্যতা রাখে না, বরং তা রহিত হওয়ার দলীল। সুতরাং স্বয়ং আয়িশা (রাঃ) যেহেতু আপন ভাতিজীকে অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দিয়েছেন, অতএব উক্ত হাদীসটি দ্বারা কোন দলীল গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

জ. সর্বোপরি, আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসটি সনদের দিক থেকে মতানৈক্য রয়েছে। যা তিরমিযী এবং তাহাবীতে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। (ترمذي ج۱ ص۲۰۹، طحاوي ج۲ ص٦)

(৪) আবু মূসা (রাঃ)-এর হাদীসের জবাবঃ

ক. উক্ত হাদীসটি মুত্তাসিল এবং মুরসাল হওয়ার ব্যাপারে বেশ মতানৈক্য রয়েছে। সুতরাং এ হাদীসটি দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। (ترمذي ج۱ ص۲۰۹)

খ. অথবা, "لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ" হাদীসটিতে لاَ (না) হরফটি দ্বারা نفي كامل তথা অপরিপূর্ণ বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ বিয়ে তো হয়ে যাবে, তবে অভিভাবকের অনুপস্থিতির কারণে তা অপূর্ণাঙ্গ রয়ে গেল। যেমন বলা হয় لاَ اِيْمَانَ لِمَنْ لاَ اَمَانَةَ لَه অর্থাৎ, "যার নিকট আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই।" এখানে মূলত পরিপূর্ণ ঈমান বুঝানো উদ্দেশ্য।

গ. আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী- উক্ত হাদীসে وَلِيٌّ (যেকোন অভিভাবক) শব্দটি نَكِرَة (অনির্দিষ্ট বিশেষ্য), যা تَحْتَ النَّفِيِّ বা না-সূচক (لاَ نِكَاحَ) শব্দের অধীনে পতিত হয়ে عُمُوْم (ব্যাপকতা)-এর ফায়েদা দিবে। সুতরাং এর অর্থ হবে, বিয়েতে যদি কোন প্রকার অভিভাবকই না থাকে, তাহলে বিবাহ সহীহ হবে না। অথচ স্বাধীনা, বয়স্কা ও বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মহিলা নিজেই নিজ সত্ত্বার অভিভাবক। অতএব, বিয়েতে মহিলা স্বয়ং রাজি না থাকলে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। (تنظيم الاشتات ج٢ ص١٦٩)

بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ– ص٢٨٧ ঃ স্বল্প পরিমাণ মহর

... عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَيَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَّعَلَيْهِ رِدْعُ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْيَمْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ تَزَوَّجْتُ امْرَاَةً قَالَ مَا اَصْدَقْتَهَا قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ–

(بخاري ج٢ ص٧٧٧ باب الوليمة ولو بشاة، مسلم ج١ ص٤٥٨ باب الصداق وجواز كونه الخ، ترمذي ج١ ص٢٠٨ باب الوليمة، نسائي ج٢ ص٨٧ التزويج على نواة من ذهب، ابن ماجة ص١٣٨)

অনুবাদঃ ... আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আব্দুর রহমান ইবন আওফ (রাঃ)-কে একটি হলুদ রংবিশিষ্ট চাদর পরিহিত দেখেন। এরপর নবী করীম (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ব্যাপার কি? তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এক মহিলাকে বিবাহ করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি তার জন্য কি পরিমাণ মহর ধার্য করেছ? তিনি বলেন, এক নাওয়া পরিমাণ স্বর্ণ। তিনি বলেন, তুমি ওয়ালিমা কর, যদি একটি বকরীর দ্বারাও হয়।

মহরের আভিধানিক অর্থঃ "اَلْمَهْرُ" শব্দটি বাবে فَتَحَ يَفْتَحُ বা نَصَرَ يَنْصُرُ-এর মাসদার। ইহা ر – ه – م মূলধাতু হতে নির্গত। বহুবচনে مهور বা مهورة । এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-

(১) المعجم الوسيط প্রণেতা বলেন- اَلْمَهْرُ لُغَةً صَدَاقُ الْمَرْأَةِ বা মহিলার মোহরানা।

(২) القاموس الفقهي বলেন, ইহার অর্থ اَلاِعْطَاءُ বা দান করা।

(৩) কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ اَلْمَنْحُ - প্রদান করা।

(৪) لِسَان العرب গ্রন্থকার বলেন, মহর শব্দের অর্থ হল المنحة

(৪) ইহা প্রতিদান, বিনিময় ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।
(৫) ইসলামী বিশ্বকোষে বলা হয়েছে, মহর হিব্রু ভাষায় মোহর এবং সিরীয় ভাষায় মাহর। এর অর্থ হল, বিবাহে কনের প্রাপ্য উপহার।

* পবিত্র কুরআনে শব্দটি বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। যথা-

ক. اُجْرَة অর্থে। যেমন, ইরশাদ হচ্ছে- وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ (النساء ٢٥)

খ. صَدَقَة অর্থে। যেমন, ইরশাদ হচ্ছে- وَاٰتُوْا النِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ (النساء ٤)

গ. طَوْل অর্থে। যেমন, ইরশাদ হচ্ছে- وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً (النساء ٢٥)

ঘ. فرض অর্থে। যেমন, ইরশাদ হচ্ছে- قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَ (الأحزاب ٥٠)

ঙ. نِكَاح ، عَطِيَّة প্রভৃতি অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে।

মহরের পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

১। شرح وقاية-এর হাশিয়ায় উল্লেখ আছে-

هُوَ عِبَارَةٌ عَمَّا يُسَاقُ إِلَى الزَّوْجَةِ مِنَ الزَّوْجِ عِوَاضًا لِمَنَافِعِ بُضْعِهَا–

অর্থাৎ, স্ত্রীর যৌনাঙ্গ উপভোগ করার বিনিময়ে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে যে সম্পদ দান করা হয়, তাই মহর।

২। قواعد الفقة কিতাবে বর্ণিত আছে- اَلْمَهْرُ مَا يُقَابِلُ الْبُضْعُ مِنَ الْمَالِ حَلاَلاً

অর্থাৎ, যে সম্পদের বিনিময়ে মহিলার যৌনাঙ্গ হালাল হয় তাই মহর।
৩। কতিপয় আলিমের মতে, কোন মেয়ের সাথে বৈধ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যে বিনিময় বা প্রতিদান দেওয়া হয়, তাকে মহর বলা হয়।

৪। কেউ কেউ বলেন- مَا يُعْطَى إِلَى الزَّوْجَةِ عِوَضًا لِمَنَافِعِ بُضْعِهَا مُعَجَّلاً اَوْ مُؤَجَّلاً

অর্থাৎ, স্ত্রীর যৌনাঙ্গ উপভোগের বিনিময়ে নগদে বা বাকিতে যে সম্পদ স্ত্রীকে প্রদান করা হয়, তাই মহর।

৫। المعجم الوسيط প্রণেতা বলেন- مَا يَدْفَعُهُ الزَّوْجُ اِلَى زَوْجَتِه بِعَقْدِ الزَّوَاجِ

- ৩১

অর্থাৎ, বিবাহ বন্ধনের সময় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে যা প্রদান করা হয় তাই মহর। মোটকথা হল, বৈবাহিক সম্পর্কের সময় স্বামী স্ত্রীর বিশেষ অঙ্গ থেকে স্বাদ উপভোগ করার বিনিময়ে স্ত্রীকে যে অর্থ প্রদান করা হয়, তাকেই মহর বলে।

মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণঃ মহরের সর্বোচ্চ পরিমাণ নিয়ে উলামাদের মাঝে কোন মতবিরোধ নেই। তা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মতির উপর নির্ভরশীল। তবে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সামাজিক মর্যাদা বজায় রাখতে গিয়ে অথবা মানুষকে দেখানোর নিয়তে প্রতিযোগিতামূলক, অহংকারবশত অথবা প্রতারণার লক্ষ্যে এত বেশি মহর ধার্য করা ঠিক হবে না, যা আদায় করতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক। কিন্তু মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক (রহ.) প্রমুখের মতে, মহরের সর্বনিম্ন কোন পরিমাণ নেই। তাঁদের নিকট বিবাহ হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায়। তাই স্বামী-স্ত্রী একত্রে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তা নির্ধারণ করবে। উভয়ের সন্তুষ্টির দ্বারা এর পরিমাণ কম হোক অথবা বেশি হোক এটা তাদের ব্যাপার। এমনকি তাদের নিকট প্রত্যেক ঐ সকল মাল ও সম্পদ মহর নির্ধারণ করা যাবে, যা ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে। (شرح المهذب ج١٥ ص٤٨٢، المغني ج٦ ص٦٨٠)

উল্লেখ্য যে, আল্লামা ইবন হুযম (রহ.)-এর মতে, প্রায় প্রত্যেক জিনিসই মহর হতে পারে। এমনকি পানি, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি। এগুলো বিক্রি জায়েয হোক অথবা না হোক। (المحلّى ج٩ ص٤٩٤)

ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর দলীলঃ

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে দেখা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) আব্দুর রহমান ইবন আওফকে মহরের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি (রাঃ) উত্তরে বলেন, এক নাওয়া পরিমাণ স্বর্ণ। এতে বুঝা যায় যে, মহরের নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নির্ধারিত নেই।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَعْطٰى فِيْ الصَّدَاقِ امْرَأَةً مَلأَ كَفَّيْهِ سَوِيْقًا اَوْ تَمرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ عَلٰى مَعْنَى الْمُتْعَةِ– (ابو داود ج١ ص٢٨٧)

অর্থাৎ, ... জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেনঃ যদি কেউ তার স্ত্রীর মহর হিসেবে দুই অঞ্জলি আটা বা খেজুর প্রদান করে, তবে তাই তার জন্য যথেষ্ট। জাবির (রাঃ) অপর একটি হাদীসে

বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে বিবাহের মহর হিসেবে খাদ্যের সামান্য অংশ প্রদান করে তাকে উপভোগ করতাম।
উক্ত হাদীসেও প্রমাণিত হয় যে, মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারিত নেই।

দলীল (৩)ঃ হযরত আমের ইবন রবীআ (রাঃ)-এর হাদীস-

"اِنَّ امْرَأَةً مِّنْ بَنِيْ فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلٰى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ رَضِيْتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ" – (ترمذي ج١ ص٢١١ باب ما جاء في مهور النساء، ابن ماجة ص١٣٧ باب صداق النساء)

অর্থাৎ, "বনু ফাযারার এক মহিলা এক জোড়া স্যান্ডেলের বিনিময়ে বিয়ে করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, এক জোড়া স্যান্ডেলের বিনিময়ে তোমার ব্যক্তিত্ব ও মালের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছ? উত্তরে তিনি বললেন, হাঁ। তখন নবী করীম (সাঃ) এর অনুমতি দিলেন।"

দলীল (৪)ঃ ... عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَاَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِيْ لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيْلاً فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ زَوِّجْنِيْهَا اِنْ لَمْ تَكُنْ لَّكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْئٍ تُصَدِّقُهَا اِيَّاهُ فَقَالَ مَا عِنْدِيْ اِلاَّ اِزَارِيْ هٰذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ اِنْ اَعْطَيْتَهَا اِزَارَكَ جَلَسْتَ لاَ اِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا قَالَ لاَ اَجِدُ شَيْئًا قَالَ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيْدٍ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَيْئٌ قَالَ نَعَمْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ – (ابو داود ج١ ص٢٨٧ باب في التزويج على العمل يعمل، بخاري ج٢ ص٧٦١ باب تزويج المعسر/ج٢ ص٧٦٧، مسلم ج١ ص٤٥٧، ترمذي ج١ ص٢١١، نسائي ج٢ ص٨٨ باب هبة المرأة نفسها الخ، ابن ماجة ص١٣٧)

অর্থাৎ, ... সাহল ইবন সাদ আল সাঈদী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে জনৈকা নারী উপস্থিত হয়ে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমাকে আপনার নিকট বিবাহের (উদ্দেশ্যে) সমর্পণ করছি। এরপর সে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। জনৈক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন, যদি তাতে আপনার কোন প্রয়োজন না থাকে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)

বলেন, তোমার নিকট এমন কিছু আছে কি, যার দ্বারা তুমি তার মহর আদায় করতে পার? সাহাবী (রাঃ) বলেন, আমার কাছে এই ইজার (পায়জামা) ব্যতীত দেওয়ার মত কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যখন তোমার নিকট ইজার ব্যতীত দেওয়ার মত আর কিছুই নেই, তখন অন্য কিছু দেওয়ার জন্য অনুসন্ধান কর। সাহাবী (রাঃ) বলেন, আমি দেওয়ার মত কিছুই পাচ্ছি না। তিনি বলেন, যদি একটি লোহার আংটিও হয়, তবুও তা দেওয়ার জন্য চেষ্টা কর। এরপর এর অনুসন্ধান করে ব্যর্থ হন, কিছুই পাননি। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তোমার নিকট কুরআনের কোন অংশ আছে কি? তিনি বলেন, হাঁ, কুরআনের অমুক সূরাদ্বয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বলেন, আমি কুরআনের ঐ অংশের বিনিময়ে তোমাকে তার সাথে বিবাহ দিলাম।
উক্ত হাদীসেও দেখা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) মহর হিসেবে লোহার আংটি এবং কুরআনের আয়াত নির্ধারিত করেছেন। সুতরাং মহরের নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই।

* ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল, তিন দিরহাম বা এক দিনারের চারভাগের এক ভাগ। (بداية المجتهد ج٢ ص١٤)

দলীল (১)ঃ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِيْ مِجَنٍّ ثَمَنُه ثَلٰثَةُ دَرَاهِمَ– (ابو داود ج٢ ص٦٠٢ كتاب الحدود باب ما يقطع فيه السارق، ترمذي ج١ ص٢٦٧ باب ما جاء في كم يقطع السارق)

অর্থাৎ, ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) তিন দিরহাম পরিমাণ মূল্যের ঢাল চুরির কারণে হাত কেটে দেন।

দলীল (২)ঃ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا– (ابو داود ج٢ ص٦٠٢ باب ما يقطع فيه السارق، ترمذي ج١ ص٢٦٧ باب كم يقطع السارق)

অর্থাৎ, আয়িশা (রাঃ) হতে নবী করীম (সাঃ)-এর বাণী বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, এক দীনারের এক চতুর্থাংশ বা এর অধিক মাল চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে।
তিনি এটাকে চোরের হাত যে পরিমাণ মাল চুরির কারণে কাটা যায়, তার ন্যূনতম পরিমাণের উপর কিয়াস করেন। কারণ সেখানেও তার মতে এক চতুর্থাংশ দিনারের পরিবর্তে একটি অঙ্গ কর্তন করা হয়। আর এখানে এর বিনিময়ে একটি অঙ্গের মালিকানা অর্জিত হয়। যা স্বামী ব্যবহার ব্যবহার করে অন্যের ব্যবহারের অযোগ্য (নষ্ট) করে দেয়। তাই এই গুপ্তাঙ্গের মূল্যও তিন দিরহাম হওয়া উচিত।

(المجموع ج١٥ ص٤٨٢)

* ইবরাহীম নাখঈর মতে, মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ ৪০ দিরহাম।
* আল্লামা ইবন শুবরামার মতে, মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ ৫ দিরহাম।
* সাঈদ ইবন যুবায়েরের মতে, ৫০ দিরহাম।
* কতিপয় আলিমের মতে, ২০ দিরহাম।
* কেউ কেউ বলেন, ১ দিনার।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল ১০ দিরহাম।

দলীল (১)ঃ পবিত্র কুরআনের আয়াত-"قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ اَزْوَاجِهِمْ"

অর্থাৎ, তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে পুরুষদের উপর আমি (আল্লাহ) যা নির্ধারণ করেছি আমার জানা আছে। (আহযাবঃ ৫০)

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে মহর নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু আয়াতটি مُجْمَلٌ তথা সংক্ষিপ্ত। তাই নবী করীম (সাঃ) এর তাফসীরে বলেন-

... عَنْ عَلِيٍّ اَنَّه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ مَهْرَ اَقَلُّ مِنْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ– (دار قطني ج٣ ص٢٤٥، بيهقي ج٧ ص٢٤٠)

অর্থাৎ, ... আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেন, দশ দিরহামের কম কোন মহর নেই।

দলীল (২)ঃ বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ থেকে আরো বলা যায় যে, কুরআনে যেহেতু বলা হয়েছে মহর নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু সমস্ত কুরআন ও হাদীস তালাশ করলে নিম্নবর্ণিত হযরত জাবির (রাঃ)-এর হাদীস ব্যতীত আর কোথাও এর নির্ধারিত অংশ খুঁজে পাওয়া যায় না। হাদীসটি হল-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُنْكَحُ النِّسَاءُ اِلاَّ كُفُوًا وَلاَ يُزَوِّجُهُنَّ اِلاَّ الاَوْلِيَاءَ وَلاَ مَهْرَ دُوْنَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ– (بيهقي ج٧ ص٢٤٠، دار قطني ج٣ ص٢٤٥، فتح القدير ج٣ ص١٨٦)

অর্থাৎ, জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ কুফু ছাড়া মহিলাদের বিয়ে দেয়া যাবে না এবং তাদেরকে অভিভাবক ছাড়া অন্য কেউ বিয়ে দেবে না। আর দশ দিরহামের কম কোন মহর নেই। যদিও কতক মুহাদ্দিস উপরোল্লিখিত হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হাদীসটি যঈফ নয়। যেমন, হাফিজ ইবন হাজার (রহ.) বলেন-

اِنَّه بِهٰذَا الاِسْنَادِ حَسَنٌ وَلاَ اَقَلَّ مِنْهُ– (شرح النقاية ج١ ص٥٧٩، اعلاء السنن ج١١ ص٨٠-٨١، فتح الملهم ج٣ ص٤٨٠)

অর্থাৎ, এটি এই সনদে হাসান-এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের নয়।

তাছাড়া যুক্তির নিরীখেও বলা যায় যে, বিয়েতে মহরকে মূলত এই ভিত্তিতেই مَشْرُوْع (আইনসম্মত) করা হয়েছে, যাতে মহরবাবদ মহিলার নিকট এতটুকু মাল হস্তগত হয়, যা ন্যূনতমও গুরুত্ব রাখে। আর ইহা হযরত জাবির (রাঃ)-এর হাদীসের ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়, যা দশ দিরহাম। কেননা, শাফিঈর (রহ.) নিকট তো বলতে গেলে এর কোন অস্তিত্বই নেই। (যেমন, এক জোড়া জুতা, কয়েকটা খেজুর, এক দণ্ড লোহা, কুরআন শিক্ষাদান ইত্যাদি।) আর মালিকীদের মতে, তিন দিরহাম। ইহাও তো একটা মেয়ের জীবনে একেবারেই নগণ্য পরিমাণ সম্পদ। (درس ترمذي ج۳ ص۳۹۲)

জবাবঃ হযরত শাফেঈ (রহ.)-এর প্রথম দলীলের জবাবে আহ্নাফগণ বলেন যে, হযরত আব্দুর রহমান ইবন আওফ (রাঃ) মহরের পরিমাণ نَوَاة مِنْ ذَهَبٍ-এর কথা উল্লেখ করেছেন। আভিধানিক অর্থে نَوَاة বলা হয় খেজুরের বীচি বা আঁটিকে। হতে পারে ঐ পরিমাণ স্বর্ণের মূল্য দশ দিরহামের সমান ছিল। (درس ترمذي ج۳ ص۳۹۲)

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত হাদীসের রেওয়ায়েতে ইসহাক ইবন জিবরাঈল এবং মুসলিম ইবন রূমান যঈফ। সুতরাং এর দ্বারা প্রদত্ত দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (فتح القدير ج۳ ص۲۰۷)

তৃতীয় দলীলের জবাবঃ উক্ত হাদীসে আসিম ইবন উবায়দুল্লাহ্ নামক একজন রাবী রয়েছে। ফলে হাদীসটি যঈফ। কেননা, ইমাম আহমদ, ইবন উয়াইনা, আবু যুরআ, ইয়াহইয়া, আবু হাতেম, ইবন খুযাইমা, ইমাম দারা কুতনী ও ইমাম নাসায়ী (রহ.) প্রমুখের মতে, তিনি যঈফ রাবী। তাই তাঁর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

(ميزان الاعتدال ج۲ ص۳۵۳-۳۵٤)

চতুর্থ দলীলের জবাবঃ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ তথা যদি একটি লোহার আংটিও হয়, (তবু এর দ্বারা মহর আদায় কর) এ জাতীয় হাদীসগুলো ঐ সময়ের, যখন শরীয়তে মহরের বিধান প্রবর্তিত হয়নি।

অথবা, বলা যায় যে, এ হাদীসগুলো لاَ مَهْرَ لاَقَلَّ مِنْ عَشَرَة دَرَاهِمْ হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

অথবা, কুরআনের আয়াতের মোকাবিলায় খবরে ওয়াহেদ দলীলযোগ্য নয়।

অথবা, হাদীসগুলো مَهْر مُعَجَّل বা নগদ মহরের উপর প্রযোজ্য। পূর্ণ মহরের ব্যাপারে বলা হয়নি। (درس مشكوة ج٣ ص٢٦)

কেননা, বিভিন্ন হাদীসের আলোকে দেখা যায় যে, আরবরা স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বে مَهْر مُعَجَّل হিসেবে কিছু প্রদান করা তাদের কাছে একটা মামুলী ব্যাপার ছিল। مَهْر مُعَجَّل ছাড়া স্ত্রীর সাথে সহবাসকারীকে তারা খারাপ দৃষ্টিতে দেখত। যেমন হাদীসে এসেছে-

حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدِ الْحِلْصِيُّ ... عَنْ رَّجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ عَلِيًّا رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَرَادَ اَنْ يَّدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَه رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى يُعْطِيْهَا شَيْئًا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَيْسَ لِيْ شَيْئٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلعم اَعْطِهَا دِرْعَكَ فَاَعْطَهَا دِرْعَه ثُمَّ دَخَلَ بِهَا- (ابو داود ج١ ص٢٨٩-٢٩٠ باب في الرجل يدخل بامراته قبل الخ)

অর্থাৎ, কাসীর ইবন উবায়েদ আল-হিলসী ... রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আলী (রাঃ), ফাতিমা বিনত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বিবাহ করেন, তখন তিনি নগদ কিছু দেওয়ার আগে তাঁর (ফাতিমার) সাথে সহবাস করতে ইচ্ছা করেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এতে বাধা দান করেন এবং আলী (রাঃ)-কে কিছু নগদ মহর আদায় করতে বলেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দেওয়ার মত কিছুই নেই। নবী করীম (সাঃ) তাঁকে বলেন, তুমি তাকে তোমার লৌহবর্মটি প্রদান কর। তখন তিনি তাঁকে তা প্রদানের পর তাঁর (ফাতিমা) সাথে সহবাস করেন।

উক্ত হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, ফাতিমা (রাঃ)-কে যে লৌহবর্মটি দেয়া হয়েছে, তা مهر معجل হিসেবে। কেননা সবাই জানে যে, তাঁর মহর ধার্য করা হয়েছিল এর চেয়ে অনেক বেশি। (فتح القدير ج٣ ص٢٠٦)

ইমাম মালিক (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ চোরের হাত কাটার ক্ষেত্রে সম্পদের পরিমাণ নিয়ে হাদীসে বিভিন্নতা আছে। কেননা বিভিন্ন হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, এর পরিমাণ হল দশ দিরহাম। যেমন-

... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَطَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلٍ فِيْ مِجَنٍّ قِيْمَتُه دِيْنَارٌ اَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ– (ابو داود ج٢ ص٦٠٢ باب ما يقطع فيه السارق)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি ঢাল চুরির অপরাধে এক ব্যক্তির হাত কেটে দেন যার মূল্য ছিল এক দীনার অথবা দশ দিরহাম।

তাছাড়া হযরত উমর (রাঃ)-এর সময় সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) মধ্যে দশ দিরহামের উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রেও হানাফীদের অভিমতই অগ্রাধিকার পাবে। (درس مشكوة ج٣ ص٢٦)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ কুরআন শিক্ষাদানকে মহর হিসেবে গণ্য করা যাবে কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যথা- ইমাম শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, "تَعْلِيْمُ الْقُرْاٰنِ" বা কুরআন শিক্ষা মহর হতে পারে। কেননা, তাঁদের নিকট মহরের জন্য মাল হওয়া শর্ত নয়। (شرح المهذب ج١٥ ص٤٨٦)

দলীলঃ ... فَقَالَ لَه رَسُوْلُ اللهِ صلعم قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ–

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, লাইস, মাকহুল এবং ইসহাক (রহ.)-এর মতে, "تَعْلِيْمُ الْقُرْاٰنِ" বা কুরআন শিক্ষা মহর হতে পারে না। কেননা তাঁদের নিকট মহরের জন্য সম্পদ হওয়া শর্ত। (المغني ج٦ ص٦٨٣–٦٨٤)

দলীল (১)ঃ পবিত্র কুরআনের আয়াত- "وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ"–

অর্থাৎ, এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী হালাল করা হয়েছে। শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে সম্পদের বিনিময়ে তলব করবে। (নিসাঃ ২৪)

উক্ত আয়াতে সম্পদ তলবের হুকুম দেয়া হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, যা মাল নয় তা মহর হতে পারে না। আর কুরআন শিক্ষা যেহেতু মাল নয়, তাই তা মহর হতে পারে না।

জবাবঃ ১। তালীমে কুরআনকে মহর বানানো ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের হুকুম। তখন ছিল মুসলমানদের আর্থিক অসচ্ছলতা। যখন মুসলমানগণ আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন করলেন, তখন এ হুকুম রহিত হয়ে যায়।

২। অথবা, খবরে ওয়াহেদ আয়াতের মোকাবেলায় দলীল হতে পারে না।

৩। অথবা, বলা যায় যে, হাদীসে বর্ণিত قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ বাক্যে ب হরফটি سَبَبْ বা কারণ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে, عِوَض বা বিনিময় বুঝাতে ব্যবহৃত হয়নি। অতএব এর অর্থ হবে- قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِسَبَبِ كَوْنِ الْقُرْآنِ عِنْدَكَ

অর্থাৎ, তোমার কাছে কুরআনের শিক্ষা থাকার কারণে তাকে বিবাহ দিলাম।

৪। অথবা, বলা যায় যে, এটি ছিল নবী করীম (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে ঐ সাহাবীর জন্য খাস। তাই ইহা অন্যের জন্য দলীল হতে পারে না। (المغني ج٦ ص٦٨٤)

যেমন, হাদীসে উল্লেখ আছে-

حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدٍ ... وَكَانَ مَكْحُوْل يَّقُوْلُ لَيْسَ ذٰلِكَ لاَحَدٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ صلعم. (ابو داود ج١ ص٢٨٧ باب في التزويج على العمل بعمل)

অর্থাৎ, হারূন ইবন যায়িদ ... বর্ণনা করেছেন, ... রাবী বলেন, মাকহূল বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরে এরূপ বিবাহ (মহর ব্যতীত) আর বৈধ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ মহর উল্লেখ ব্যতীত বিবাহের হুকুমঃ

বিবাহের সময় মহর উল্লেখ না করলে অথবা মহর না দেয়ার শর্তে বিবাহ করলে, তাহলেও বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় মহরে মিসাল ওয়াজিব হবে। কেননা, বিবাহ সম্পাদনের জন্য ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল শর্ত। মহর উল্লেখ করা শর্ত নয়। যদি শর্ত হত, তাহলে মহর উল্লেখ করা ছাড়া বিবাহই সহীহ হত না। যদি বিবাহের সময় মহরের পরিমাণ উল্লেখ করে, তাহলে সেই উল্লিখিত পরিমাণ মহর দেয়া ওয়াজিব। আর উল্লেখ না করলে মহরে মিসাল ওয়াজিব হবে। মহর উল্লেখ করা ব্যতীত বিবাহ সহীহ হওয়ার দলীল হচ্ছে এই-

لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً–

অর্থাৎ, তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে অথবা কোন মহর সাব্যস্ত করার পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। (বাকারাঃ ২৩৬)

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, মহর উল্লেখ না করলেও বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা মহর উল্লেখ ছাড়া যদি বিবাহই শুদ্ধ না হয়, তাহলে তালাক হয় কিভাবে?

ওয়ালিমার হুকুমঃ নবী করীম (সাঃ) বলেন- "اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" অর্থাৎ, তুমি ওয়ালিমা কর যদি একটি বকরীর দ্বারাও হয়। (পূর্ণ হাদীসটি অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে।)

অভিধানবেত্তা এবং ফকীহগণ বলেন যে, ওয়ালিমা ঐ ভোজসভাকে বলা হয়, যা বাসর রাতের পর খাওয়ানো হয়। আর وَلِيْمَة (ওয়ালিমা) শব্দটি নির্গত হয়েছে وَلْم

থেকে যার অর্থ হচ্ছে মিলন বা একত্র হওয়া। যেহেতু এই রাতে স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটে, তাই একে ওয়ালিমা বলা হয়।

আবার অনেকেই বলেন, ولم শব্দের অর্থ জমা করা। অতঃপর এর প্রয়োগ সেসব খানার উপর হতে লাগল, যার জন্য লোকজনকে জমা করা হয়। পরবর্তীতে ওলীমা বলতে বৌ-ভাতকে বুঝানো হয়। (درس ترمذي ج٣ ص٣٦٧)

* ওয়ালিমা করা সুন্নত না ওয়াজিব, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। আহলে যাহিরের মতে, ওয়ালিমা করা ওয়াজিব এবং আল্লামা ইবন হাযম (রহ.) লিখেন, যে বিয়ে করবে, কম হোক বেশি হোক, তার উপর ওয়ালিমা করা ফরয। (المحلى ج٩ ص٤٥٠)

তবে ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতাবলম্বীর কেউ কেউ বলেন ওয়ালিমা ওয়াজিব, আবার কারো কারো মতে ইহা সুন্নত বা মুস্তাহাব। তবে এ ব্যাপারে অনেক অভিমত রয়েছে। (شرح المهذب ج١٥ ص٥٤٨-٥٥٠)

দলীল (১)ঃ হাদীসে বর্ণিত নবী করীম (সাঃ)-এর বাণী- أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ উক্ত হাদীসে أَمْر (নির্দেশ)-এর সীগা আনা হয়েছে, যা দ্বারা ওয়াজিব বুঝায়।

দলীল (২)ঃ আল্লামা তিবরানী (রহ.) বর্ণনা করেন- اَلْوَلِيْمَةُ حَقٌّ তথা ওয়ালিমা একটি হক। উক্ত হাদীসে حق শব্দের উল্লেখ রয়েছে, যার দ্বারা ওয়াজিব বুঝায়।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সহ অধিকাংশ আলিমের মত হল, ওয়ালিমা করা সুন্নত, ওয়াজিব নয়। (اوجز المسالك ج٩ ص٤٣٥)

দলীলঃ নবী করীম (সাঃ) আব্দুর রহমান ইবন আওফ (রাঃ) ব্যতীত আর কাউকে ওয়ালিমার আদেশ করেননি। যদি তা ওয়াজিবই হত, তাহলে তিনি অন্যান্য সাহাবীদেরকেও ওয়ালিমা করার হুকুম দিতেন। এতে বুঝা যায় যে, তা ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নত।

জবাবঃ (১) আহনাফগণ বলেন, প্রথমোক্ত হাদীসে امر-এর যে সীগা ব্যবহার করা হয়েছে তা الامر للإستحباب তথা আমর সুন্নত ও মুস্তাহাবের উপর প্রযোজ্য হবে, ইহা ওয়াজিবের জন্য নয়।

(২) দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেছেন, হাদীসে বর্ণিত حق (হক) শব্দটি দ্বারা ওয়াজিব উদ্দেশ্য নয়; বরং এটি বাতিলের মোকাবেলায় ব্যবহৃত হয়েছে।

অর্থাৎ ওয়ালিমা করা নাজায়েয বা বাতিল নয়; বরং জায়েয ও সুন্নত। সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। (فتح الباري ج٩ ص٢٣٠، اعلاء السلن ج١١ ص١٠)

ওয়ালীমার সময়সীমাঃ ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, ওয়ালিমা সাত দিন পর্যন্ত করা জায়েয তথা মুস্তাহাব। (مرقاة ج٦ ص٢٥٦)

দলীলঃ ... عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ لَمَّا تَزَوَّجَ أَبِيْ سِيْرِيْنَ دَعَا اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةَ اَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَنْصَارِ دَعَاهُمْ وَدَعَا اُبَيَّ بْنَ كَعَبٍ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ– (مصنف ابن ابي شيبة ج٢ ص٣١٣، سنن كبرى بيهقي ج٧ ص٢٦١)

অর্থাৎ, ... হাফসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমার পিতা সীরীন (দ্বিতীয়) বিয়ে করেছেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবীগণকে সাত দিন পর্যন্ত দাওয়াত দিয়েছেন। যখন আনসারীদের দিবস এল, তখন তাদেরকে দাওয়াত দিলেন এবং দাওয়াত দিলেন উবাই ইবন কাব ও যায়েদ ইবন সাবিত (রাঃ)-কে।

ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, প্রথম দিন ওয়ালিমা করা উত্তম। দ্বিতীয় দিন করা জায়েয এবং এর পরেও করা জায়েয, তবে অপছন্দনীয়। এবং এর উপকারিতা আশা করা যায় না। (المغني ج٧ ص٣، اعلاء السلن ج١١ ص١٣)

দলীলঃ ... اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلِيْمَةُ اَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ وَالثَّانِيْ مَعْرُوْفٌ وَالْيَوْمُ الثَّالِثُ سَمْعَةٌ وَرِيَاءٌ– (ابو داود ج٢ ص٥٢٦ كتاب الاطعمة باب في كم تستحب الوليمة، ترمذي ج١ ص٢٠٨ باب ما جاء في الوليمة، ابن ماجة ص١٣٩)

অর্থাৎ, ... নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, প্রথম দিনে ওয়ালিমা যথাযথ। দ্বিতীয় দিন ভাল। আর তৃতীয় দিন লোক দেখানো, খ্যাতি ও রিয়া।

জবাবঃ এসব ঘটনা তখনকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন দাওয়াতী মেহমান বেশি হওয়ার কারণে প্রতিদিন আলাদা দলকে দাওয়াত দেয়া হয়। (فتح الباري ج٩ ص٢٤٣) অথবা, এও হতে পারে যে, ইহা ছিল কতক সাহাবীর ইজতিহাদ, যা রেওয়ায়েতের মোকাবিলায় দলীলযোগ্য নয়।

উল্লেখ্য যে, ওয়ালিমা যে বকরী দ্বারাই হতে হবে, তা জরুরী নয়; বরং ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যবস্থা করবে। তবে অতিরঞ্জিত যাতে না হয়, সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন- خَيْرُ النِّكَاحِ اَيْسَرُه (ابو داود ج١ ص٢٨٨ باب فيمن تزوج الخ) অর্থাৎ, উত্তম বিবাহ তাই, যা সহজে সম্পন্ন হয়।

بَابُ فِيْ الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ ص٢٨٩
কুমারী স্ত্রীর সাথে অবস্থানকাল

... عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ اَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَّاِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ اَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا– (بخاري ج٢ ص٧٨٥ باب اذا تزوج البكر على الثيب، مسلم ج١ ص٤٧٢ باب قد رما تستحقه البكر والثيب الخ، ترمذي ج١ ص٢١٦ باب القسمة للبكر الثيب، ابن ماجة ص١٣٩)

অনুবাদঃ ... আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন কুমারী স্ত্রীলোককে সায়্যেবা (অকুমারী) মহিলার বর্তমানে বিবাহ করে, তখন তার সাথে সাত রজনী যাপন করবে। আর যখন কুমারীর বর্তমানে সায়্যেবাকে বিবাহ করবে, তখন তার সাথে তিনরাত যাপন করবে।

বিশ্লেষণঃ যদি কারো একাধিক স্ত্রী হয়, তাহলে তাদের সাথে রাত্রিযাপন করা, পানাহার এবং কাপড়-চোপড় ইত্যাদি প্রদানের ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখা ওয়াজিব। তবে সহবাস ও মহব্বতের ক্ষেত্রে সমতা হওয়া ওয়াজিব নয়। কেননা ইহা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে-

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِيْ فِيْمَا اَمْلِكُ فَلاَ تُلُمْنِيْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ اَمْلِكُ يَعْنِيْ الْقَلْبَ– (ابو داود ج١ ص٢٩٠ باب القسم بين النساء، ترمذي ج١ ص٢١٦–٢١٧ باب التسوية بين الضرائر، نسائي ج٢ ص٩٤ ميل الرجل الى بعض نسائه، ابن ماجة ص١٤٣)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফভিত্তিক (সবকিছুই) বন্টন করতেন এবং বলতেন, ইয়া আল্লাহ! আমার পক্ষে যা সম্ভব, আমি তা করেছি। আর যার মালিক আপনি, আমি নই, অর্থাৎ অন্তর; সে ব্যাপারে আমাকে দোষারোপ করবেন না।

* একথার উপর সবাই একমত, যে মহিলাকে বিবাহ করবে সে হয়ত কুমারী (باكرة) হবে অথবা অকুমারী (ثيبة) হবে। যদি সে নববিবাহিতা মহিলা কুমারী হয়, তাহলে তার সাথে সাত রাত অবস্থান করবে। আর যদি অকুমারী হয়, তাহলে তার সাথে তিন রাত অবস্থান করবে। যা অনুচ্ছেদের শুরুতে হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। এবং এতে কারো কোন দ্বিমত নেই।

প্রশ্ন হল, ঐ সাত অথবা তিন রাত অন্য স্ত্রীর সাথে রাতযাপনের ক্ষেত্রে পালার অন্তর্ভুক্ত হবে, নাকি ইহা পালার বহির্ভুত থাকবে, বন্টনের মধ্যে পরিগণিত হবে না, এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ, ইসহাক ও আবু সওর (রহ.) প্রমুখের মতে, উল্লিখিত সাত অথবা তিন রাত পালার মধ্যে পরিগণিত হবে না; বরং ইহা নববিবাহিতা স্ত্রীর জন্য অতিরিক্ত। এরপর থেকে ভাগ শুরু হবে। (شرح نووي ج١ ص٤٧٢)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে নবী করীম (সাঃ) এ ব্যাপারে এক বিধান বর্ণনা করেছেন যে, নবাগত কুমারী স্ত্রীর জন্য সাত এবং নবপরিণীত অকুমারী স্ত্রীর জন্য তিন রাত। সুতরাং বুঝা যায় যে, ইহা তাদের জন্য অতিরিক্ত একটি স্বতন্ত্র অধিকার। অন্যরা তাতে শরীক নয়।

* ইমাম আবু হানিফা, হাম্মাদ (রহ.) প্রমুখের মতে, এ দিনগুলো ভাগের দিন থেকে বাদ পড়বে না, বরং এগুলোও পালার ভিতরে ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ যদি নববিবাহিতা কুমারী স্ত্রীর সাথে সাত রাত যাপন করে, তাহলে পূর্বের স্ত্রীর সাথেও সাত রাত যাপন করতে হবে। আর অকুমারী নববধূর সাথে যদি তিন রাত যাপন করে, তাহলে পূর্বের স্ত্রীর সাথেও তিন রাত অতিবাহিত করতে হবে। (فتح القدير ج٣ ص٣٠٠)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً

অর্থাৎ, আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই। (নিসাঃ ৩)

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে- اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ

অর্থাৎ, তোমরা নারীদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখ। (নিসাঃ ১২৯)

উপরোল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে ইনসাফভিত্তিক বন্টনকে ওয়াজিব হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা আয়াতদ্বয় مطلقا (শর্তহীন) উল্লেখ করা হয়েছে। পুরাতন বা নবাগত এমন কোন বিশ্লেষণ নেই।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ اُمَّ سَلَمَةَ اَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَثًا ثُمَّ قَالَ لَيْسَ بِكِ عَلَى اَهْلِكِ هَوَانٌ اِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَاِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِلنِّسَائِي– (ابو داود ج١ ص٢٨٩ باب في المقام عند البكر، مسلم ج١ ص٤٧٢ باب قدرما تستحقه البكر الخ، ابن ماجة ص١٣٩)

অর্থাৎ, ... উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন উম্মে সালামাকে বিবাহ করেন, তখন তিনি তার নিকট তিন রাত অবস্থান করেন।

এরপর তিনি (সাঃ) বলেন, এটা তোমার জন্য আমার পক্ষ হতে কম নয়, অবশ্য যদি তুমি চাও তবে আমি তোমার সাথে সাত রাত যাপন করব। আর আমি যদি তোমার সাথে সাত রাত যাপন করি, তখন আমার অন্যান্য স্ত্রীদের সাথেও আমাকে (সমতা রক্ষার্থে) সাত রাত অতিবাহিত করতে হবে।

দলীল (৩)ঃ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَه امْرَأَتَانِ فَمَالَ اِلٰى اِحْدٰهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَشِقُّه مَائِلٌ– (ابو داود ج١ ص٢٩٠ باب القسم بين النساء، ترمذي ج١ ص٢١٧ باب التسوية بين الضرائر، نسائي ج٢ ص٩٤، ابن ماجة ص١٤٣)

অর্থাৎ, আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যার দু'জন স্ত্রী আছে, আর সে তার মধ্যে একজনের প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন অর্ধাঙ্গ অবশ অবস্থায় আসবে।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, রাত যাপনের ক্ষেত্রে স্ত্রীদের মাঝে সমতা বজায় রাখা অত্যাবশ্যক। নববধূ হোক অথবা পূর্বের স্ত্রী হোক।

জবাবঃ (১) হযরত আনাস (রাঃ)-এর হাদীসে তো কুমারী নববধূর সাথে সাত রাত এবং অকুমারী নববধূর সাথে তিন রাত যাপনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পরে কি করবে, অর্থাৎ পূর্ববর্তী স্ত্রীর সাথে কয়দিন থাকতে হবে, এ ব্যাপারে উক্ত হাদীসে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং বলা যায়, হাদীসটি সংক্ষিপ্ত (**مجمل**)। আর উম্মে সালামা (রাঃ)-এর হাদীসে এ ব্যাপারে বিস্তারিত (**تفصيلي**) বর্ণিত হয়েছে। (যা হানাফীরা নিজেদের দ্বিতীয় দলীল হিসেবে পেশ করেছেন।) সুতরাং সংক্ষিপ্ত হাদীসটি থেকে বিস্তারিত হাদীসের দিকে প্রত্যাগমন করা হবে।

(২) অথবা, হযরত আনাস (রাঃ)-এর হাদীসে যে কুমারী নববধূর সাথে সাত রাত এবং অকুমারী নববধূর সাথে তিন রাত যাপনের হুকুম এসেছে, এই অগ্রাধিকার প্রদান মূলত অতিরিক্ত হিসেবে নয়, বরং এই অগ্রাধিকার প্রদান মূলত শুরু করার হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, যখন কুমারী বা অকুমারীকে বিবাহ করা হবে, তখন বন্টনের পদ্ধতি বদলে দিয়ে সাত অথবা তিন রাতের পালা তাদের থেকে শুরু হবে।

(اعلاء السنن ج١١ ص١١٤–١١٥، كتاب الحجة على اهل المدينة ج٣ ص٢٤٩–٢٥٣)

بَابُ فِيْ جَامِعِ النِّكَاحِ ص٢٩٣ ঃ সহবাস সম্পর্কীয় অন্যান্য হাদীস

... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ ابْنَ عُمَرَ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَه اُوْهِمَ اِنَّمَا كَانَ هٰذَا الْحَيُّ مِنَ الاَنْصَارِ وَهُمْ اَهْلُ وَثَنٍ مَّعَ هٰذَا الْحَيِّ مِنْ يَّهُوْدَ وَهُمْ اَهْلُ كِتَابٍ وَّكَانُوْا يَرَوْنَ لَهُمْ

فَضْلاً عَلَيْهِمْ فِيْ الْعِلْمِ فَكَانُوْا يَقْتَدُوْنَ بِكَثِيْرٍ مِّنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ مِنْ اَمْرِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَنْ لاَّ يَأْتُوْنَ النِّسَاءَ اِلاَّ عَلٰى حَرْفٍ وَّذٰلِكَ اَسْتَرُ مَا تَكُوْنُ الْمَرْأَةُ فَكَانَ هٰذَا الْحَيُّ مِنَ الاَنْصَارِ قَدْ اَخَذُوْا بِذٰلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ هٰذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَّشْرَحُوْنَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا وَّيَتَلَذَّذُوْنَ مِنْهُنَّ مُقْبِلاَتٍ وَّمُدْبِرَاتٍ وَّمُسْتَلْقِيَاتٍ فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْمَدِيْنَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ اِمْرَاَةً مِّنَ الاَنْصَارِ فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذٰلِكَ فَاَنْكَرَ عَلَيْهِ وَقَالَتْ اِنَّمَا كُنَّا نُؤْتٰى عَلٰى حَرْفٍ فَاصْنَعْ ذٰلِكَ وَاِلاَّ فَاجْتَنِبْنِيْ حَتّٰى سَرٰى اَمْرُهُمَا فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ اَيْ مُقْبِلاَتٍ وَّمُدْبِرَاتٍ وَّمُسْتَلْقِيَاتٍ يَّعْنِيْ بِذٰلِكَ مَوْضَعَ الْوَلَدِ–

অনুবাদঃ ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন উমর (আল্লাহ তাঁকে বা তাঁদেরকে মার্জনা করুন) বলেছেন, জাহেলিয়াতের যুগে আনসারগণ দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করত এবং ইয়াহুদীদের সাথে অবস্থান করত। তারা (ইয়াহুদীরা) আহলে কিতাব ছিল এবং সেই জন্য তারা (ইয়াহুদীরা) আনসারদের উপর জ্ঞানের দিক দিয়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাত। আর তাঁরা (আনসারগণ) অনেক ব্যাপারে তাদের (ইয়াহুদীদের) অনুসরণ করত। আর আহলে কিতাবদের নিয়ম ছিল যে, তারা তাদের স্ত্রীদের সাথে চিৎ হয়ে শায়িত অবস্থায় সহবাস করত। আর এটাই ছিল স্ত্রীদের সাথে সহবাসের নিয়ম। আর আনসারদের এই গোত্রটি তাদের নিকট হতে এই নিয়মটি গ্রহণ করে। আর কুরাইশদের এই গোত্রটি তাদের স্ত্রীদের সাথে বিভিন্ন অবস্থায় সহবাস করত, এমনকি তারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সামনাসামনি, পশ্চাদদিক দিয়ে ও চিৎ হয়ে শায়িত অবস্থায় সহবাস করত। অতঃপর তারা যখন মুহাজির অবস্থায় মদীনাতে আগমন করে, তখন তাদের কোন এক ব্যক্তি আনসারদের জনৈকা মহিলাকে বিবাহ করে। তখন সে তার সাথে ঐ প্রক্রিয়ায় সহবাস করতে গেলে উক্ত মহিলা তাকে বাধা দেয় এবং বলে, আমাদের এখানকার সহবাসের একটিই নিয়ম, কাজেই তুমি সেই নিয়মে আমার সাথে সঙ্গম কর, অন্যথায় আমার নিকট হতে দূরে সরে যাও। অতঃপর তাদের এই ব্যাপারটি জটিলতর হলে এতদসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অবহিত করা হয়। তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াতটি নাযিল করেন, "তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্রস্বরূপ। কাজেই তোমরা তোমাদের ক্ষেত্রে যেরূপে ইচ্ছা গমন কর।" তা

সম্মুখ দিয়ে হোক, পশ্চাদ দিক থেকে হোক, কিংবা চিৎ হয়ে শায়িত অবস্থায় হোক, অর্থাৎ যে কোন অবস্থাতেই হোক না কেন, সহবাস করবে।

বিশ্লেষণঃ রাফেযীদের মতে, স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে (دُبُر) সহবাস করা জায়েয আছে।

দলীল (১)ঃ পবিত্র কুরআনের আয়াত- نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ–
অর্থাৎ, তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেতস্বরূপ। কাজেই, তোমরা তোমাদের ক্ষেত্রে যেরূপ ইচ্ছা গমন কর। (বাকারাঃ ২২৩)

রাফেযীরা এই আয়াতের বিশ্লেষণ করে বলে যে, উক্ত আয়াতে اَنّٰى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর اَنّٰى শব্দটি দুটি অর্থে আসে। যেমন- (১) مِنْ اَيْنَ তথা যেকোন জায়গা দিয়ে (عُمُوْمُ مَكَان), যৌনাঙ্গের দ্বারে হোক অথবা গুহ্যদ্বারে হোক। (২) كَيْفَ তথা যেকোন অবস্থায় (عُمُوْمُ حَال), সম্মুখ দিয়ে, চিৎ হয়ে শায়িত অবস্থায় হোক কিংবা পশ্চাদদিক থেকে হোক। সুতরাং তারা উভয় অর্থ গ্রহণ করে বলে যে, স্ত্রীর সামনের রাস্তা (قُبُل) এবং পিছনের রাস্তা (دُبُر) তথা উভয় রাস্তা দিয়েই সহবাস করা জায়েয।

(درس مشكوة ج۳ ص۲۳ ، تنظيم الاشتات ج۲ ص۱۸۲)

দলীল (২)ঃ হযরত নাফে (রাঃ) হযরত ইবন উমর (রাঃ) হতে একটি সংক্ষিপ্ত (مُجْمَل) রেওয়ায়েত উল্লেখ করে বলেন যে, হযরত ইবন উমর (রাঃ) বলেন-
اَنّٰى شِئْتُمْ اَيْ فِيْ دُبُرِهَا তথা তোমরা যেরূপে চাও, অর্থাৎ মহিলার গুহ্যদ্বারে।

* চার ইমামসহ সকল ইমাম ও উম্মতের মতে, গুহ্যদ্বারে সহবাস করা সরাসরি হারাম। ইবনুল মালিক বলেন, ইহা শুধু মুহাম্মদ (সাঃ)-এ উম্মতের জন্য নয়, বরং পূর্ববর্তী সমস্ত ধর্মে তা হারাম ছিল।

দলীলঃ পবিত্র কুরআনের আয়াত- نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ
উক্ত আয়াতে লক্ষণীয় যে, স্ত্রীগণকে ক্ষেতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেননা, ক্ষেতে যেমন বীজ বপন করা হয় এবং তা থেকে ফসল উৎপন্ন হয়, ঠিক তদ্রূপ এক্ষেত্রে স্ত্রী হল ক্ষেত আর এর বীজ হল বীর্য এবং ফসল হল সন্তান। সুতরাং এ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, ফসল তথা সন্তান পেতে হলে বীজ তথা বীর্যকে অবশ্যই ক্ষেতে বপন করতে হবে। আর ইহা হল স্ত্রীর যৌনাঙ্গ। সুতরাং পশ্চাদদ্বারে (دبر) বীজ (বীর্য) ঢাললে ফসল তথা সন্তানের আশা করা যাবে না। সুতরাং আয়াতে اَنّٰى দ্বারা

عُمُوْمُ مَكَان তথা 'যে কোন জায়গা' (دُبُر-قُبُل) বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা عُمُوْمُ حَال তথা যে কোন অবস্থায় বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, স্ত্রীর সামনের রাস্তায় যেকোন অবস্থায়ই তোমরা চাও সহবাস করতে পার, সম্মুখ দিয়ে হোক, চিৎ হয়ে শায়িত অবস্থায় হোক, দাঁড়িয়ে হোক, বসে হোক অথবা পুরুষ স্ত্রীর পিছন দিক থেকে তার যৌনাঙ্গে সহবাস করুক, সবই জায়েয।

(درس مشكوة ج٣ ص٢٣، تنظيم الاشتات ج٢ ص١٨٣)

দলীল (২)ঃ পবিত্র কুরআনের আয়াত-

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ-

অর্থাৎ, তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে হায়েয অবস্থায় সহবাসের বিধান সম্পর্কে। বলে দিন এটা অশুচি (কষ্টকর বিষয়)। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক। (বাকারাঃ ২২২)

উক্ত আয়াতে লক্ষণীয় যে, হায়েয অবস্থায় সহবাস করা হারাম হওয়ার কারণ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে অশুচি বা কষ্টকে (اذًى) । সুতরাং এ আয়াত দ্বারাও গুহ্যদ্বারে সহবাস করা হারাম প্রমাণিত হয়। কেননা, অশুচি বা কষ্টের কারণ এতেও পাওয়া যায়। অর্থাৎ, হায়েয অবস্থায় সহবাসে স্ত্রী যেমন কষ্ট পায়, তদ্রূপ গুহ্যদ্বারে সহবাস করলেও স্ত্রী কষ্ট পায়। সুতরাং উভয়টি হারাম।

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُوْنٌ مَّنْ اَتَى امْرَأَةً فِيْ دُبُرِهَا- (ابو داود ج١ ص٢٩٤ باب في جامع النكاح)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পশ্চাদদ্বারে সহবাস করে সে অভিশপ্ত।

সুতরাং উপরোল্লিখিত কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হল যে, স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করা হারাম।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ রাফেযীরা اَنّٰى শব্দের দ্বারা যে ব্যাপক অর্থ নিয়েছে- "যেকোন জায়গা দিয়ে" (عموم مكان) আসলে অত্র আয়াতে তা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। কেননা, আয়াতের পূর্বাপর বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, সহবাসের জায়গা নির্দিষ্ট হতে হবে। অতঃপর সহবাসের ধরণ যাই হোক। কেননা আয়াতে শস্যক্ষেত্রে আসার কথা বলা হয়েছে। আর একথা তো স্পষ্ট যে, গুহ্যদ্বার কারো নিকট مَوْضع حَرْث তথা শস্যক্ষেত্র নয়। সুতরাং ইহা কোনভাবে জায়েয নয়।

* তাছাড়া আয়াতের শানে নুযুলের দ্বারাও বুঝা যায় যে, ইয়াহুদীদের আকীদা ছিল যে, স্ত্রীর সাথে পশ্চাদদিক হতে তার যৌনাঙ্গে সহবাস করার ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে টেরা হয়। তাদের এ আকীদাকে শোধরানোর জন্য এ আয়াত নাযিল হয়। যেমন, হাদীসে এসেছে-

... عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَّقُوْلُ اِنَّ الْيَهُوْدَ يَقُوْلُوْنَ اِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ اَهْلَه فِيْ فَرْجِهَا مِنْ وَّرَائِهَا كَانَ وَلَدُه اَحْوَلَ فَاَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ– (ابوا داود ج١ ص٢٩٤ باب في جامع النكاح، مسلم ج١ ص٤٦٣ جواز جماعه امراته في قبلها الخ، ابن ماجة ص١٣٩–١٤٠)

অর্থাৎ, ... মুহাম্মদ ইবন আল-মুনকাদির (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, ইয়াহুদীরা বলত, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে পশ্চাদ দিক হতে তার যৌনাঙ্গে সহবাস করে তখন যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে টেরা হয়। তখন আল্লাহ তা আলা এই আয়াত নাযিল করেন, "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য ক্ষেত স্বরূপ। কাজেই তোমরা তোমাদের ক্ষেত্রে যেরূপ ইচ্ছা সেরূপে গিয়ে ফসল উৎপাদন কর।"

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ

(১) ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, হযরত ইবন উমর (রাঃ)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি (রাঃ) বলেন- هَلْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ اَحَد مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ؟

অর্থাৎ, এমন কর্ম কি কোন মুসলমান করতে পারে?

সুতরাং হযরত ইবন উমর (রাঃ) নিজেই যখন ইহাকে অস্বীকার করেছেন, অতএব তা দলীল হতে পারে না।

(২) অথবা, ইবন উমর (রাঃ)-এর دُبُر দ্বারা উদ্দেশ্য হল-مِنْ جَانِبِ دُبُرِهَا فِيْ قُبُلِهَا

অর্থাৎ, "স্ত্রীর পশ্চাদ দিক হতে তার যৌনাঙ্গে সহবাস করা।" আর এটা তো সবার নিকটই জায়েয।

(৩) অথবা, মায়মুন বলেন, নাফে (রাঃ) বৃদ্ধ হওয়ার কারণে তাঁর স্মৃতিশক্তি কিছুটা কমে যাওয়ার পর এই রেওয়ায়েত করেন। তাই ইহা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

(تنظيم الاشتات ج٢ ص١٨٣، درس مشكوة ج٣ ص٢٤–٢٣)

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الْعَزْلِ ص٢٩٥ ঃ আযল সম্পর্কে

... عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ لِيْ جَارِيَةً وَّاَنَا اَعْزِلُ عَنْهَا وَاَنَا اَكْرَهُ اَنْ تَحْمِلَ وَاَنَا اُرِيْدُ مَا يُرِيْدُ الرِّجَالُ وَاِنَّ الْيَهُوْدَ تُحَدِّثُ اِنَّ الْعَزْلَ الْمَوْؤُوْدَةُ الصُّغْرٰى قَالَ كَذَبَتْ يَهُوْدُ لَوْ اَرَادَ اللهُ اَنْ يَّخْلُقَهٗ مَا اسْتَطَعْتَ اَنْ تُصْرِفَهٗ– (بخاري ج٢ ص٧٨٤ باب العزل، مسلم ج١ ص٤٦٥ باب حكم العزل)

অনুবাদঃ ... আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটি দাসী আছে। আর আমি তার সাথে সহবাসের সময় 'আযল' করি। আর আমি এটা অপছন্দ করি যে, সে গর্ভবতী হোক এবং আমি তাই চাই যা অন্য লোকেরা চায়। আর ইয়াহুদীরা বলে যে, আযল হল ছোট শিশুহত্যা। এতদশ্রবণে তিনি বলেন, ইয়াহুদীরা মিথ্যা বলেছে, বরং আল্লাহ তাআলা যাকে সৃষ্টি করতে চান, কেউই তার আগমনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না।

আযল (عزل)-এর আভিধানিক অর্থঃ عزل শব্দটি بَاب ضَرَبَ يَضْرِبُ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হল- (১) আলাদা করা, (২) অপসারণ করা, (৩) বরখাস্ত করা, (৪) দূর করা, (৫) বের করা, (৬) প্রত্যাহার করা, (৭) বিচ্ছিন্ন করা, (৮) পৃথক করা, (৯) সরিয়ে ফেলা, (১০) বিরত রাখা ইত্যাদি।

عَزْل (আযল)-এর পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ ইমাম নববী (রহ.) বলেন-

هُوَ اَنْ يُّسْقِطَ الْمَنِيَّ بِاَنْ يُّخْرِجَ الذَّكَرَ مِنْ فَرْجِ الْمَرْاَةِ حِيْنَ قُرْبِ الْاِنْزَالِ وَقْتَ الْجِمَاعِ–

অর্থাৎ, সহবাসের সময় চরম উত্তেজনার মুহূর্তে স্ত্রী যৌনাঙ্গে বীর্যপাত না করে বাইরে বীর্যপাত করাকে আযল বলে।

(২) عون المعبود গ্রন্থকার বলেন-

اَلْعَزْلُ هُوَ أَنْ يُّجَامِعَ فَإِذَا قَارَبَ الْاِنْزَالَ نَزَعَ وَأَنْزَلَ خَارِجَ الْفَرْجِ– (عون المعبود ج٦ ص١٦٩)

অর্থাৎ, আযল হল স্ত্রী সঙ্গম করার সময় বীর্যপাতের পূর্ব মুহূর্তে পুরুষাঙ্গকে যোনী থেকে বের করে এনে বাইরে বীর্যপাত করা।

(৩) মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন العزل هو اخرج ذكره من الفرج قبل ان ينزل المني

অর্থাৎ, সহবাসকালে বীর্যপাতের পূর্ব মুহূর্তে পুরুষের যৌনাঙ্গ নারীর যৌনাঙ্গ হতে বের করে নিয়ে আসা।

(৪) فقه الاسلامي-এর হাশিয়ায় বলা হয়েছে-

هُوَ النَّزْعُ بَعْدَ الْاِيْلَاجِ لِيَنْزِلَ الْمَاءَ خَارِجَ الْفَرْجِ–

মোটকথা, সহবাসকালে বীর্যপাতের সময় নারীর যৌনাঙ্গে বীর্যপাত না করে বাইরে নিক্ষেপ করা।

পরিবার পরিকল্পনাঃ এটি একটি স্পর্শকাতর বিষয়। এ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। পুরো কুরআন হাদীস চষে কোথাও এর পক্ষে বা বিপক্ষে সুস্পষ্ট কোন দলীল পাওয়া মুশকিল। এ বিষয়ে রচিত হয়েছে অনেক বড় বড় বই-পুস্তক এবং আজো লেখা হচ্ছে। অনুষ্ঠিত হয়েছে অনেক সভা, সেমিনার ও কনফারেন্স। কিন্তু এ বিষয়ে একক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হয়নি ফকীহগণ। ফলে মুসলিম উম্মাহ একটি বিভ্রান্তিতে নিপতিত। এবং এ বিষয়টি অনেকের কাছে খুব একটা স্পষ্টও নয়। কেননা পরিবার পরিকল্পনার কিছু দিক এমন রয়েছে যেগুলো জায়েয। কিন্তু এ ব্যাপারে জ্ঞান না থাকায় অনেকে গুনাহে লিপ্ত হচ্ছে। আবার অনেকে পতিত হচ্ছে সীমাহীন কষ্টে। তাই এ ব্যাপারে নিম্নে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপন করা হলো-

আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) ও অন্যান্য হক্কানী আলিমগণ মনে করেন যে, "জন্ম-নিয়ন্ত্রণ" শব্দটাই ব্যবহার করা জায়েয নয়। কেননা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ তো মানুষের কাজ নয়। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ঘোষিত হয়েছে- هُوَ يُحْيِ وَيُمِيْتُ

অর্থাৎ, আল্লাহই একমাত্র জীবন ও মৃত্যু দান করেন। (ইউনুসঃ ৫৬)

সুতরাং এ শব্দটি অবশ্যই বর্জনীয়। কেননা, এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যে, তথাকথিত জন্ম-নিয়ন্ত্রণের সকল পদ্ধতি গ্রহণ করার পরেও সন্তান জন্ম লাভ করেছে। এমন একটি উদাহরণ হাদীসেও পাওয়া যায়-

... عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ لِيْ جَارِيَةً اَطُوْفُ عَلَيْهَا وَاَنَا اَكْرَهُ اَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ اَعْزِلْ عَنْهَا اِنْ شِئْتَ فَاِنَّهٗ سَيَاتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا قَالَ فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ اَتَاهُ فَقَالَ اِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ قَالَ قَدْ اَخْبَرْتُكَ اَنَّهٗ سَيَاْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا– (ابو داود ج١ ص٢٩٥)

অর্থাৎ, ... জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করে, আমার একটি দাসী আছে, যার সাথে আমি সহবাসও করি। কিন্তু সে গর্ভবতী হোক আমি তা পছন্দ করি

না। তিনি বলেনঃ তুমি ইচ্ছা করলে তার সাথে আযল করতে পার। তবে জেনে রাখ! তার ভাগ্যে যা নির্ধারিত আছে, তা হবেই। রাবী বলেন, উক্ত ব্যক্তি কিছুদিন পর পুনরায় তাঁর নিকট এসে বলে, আমার দাসী গর্ভবতী হয়েছে। তখন তিনি বলেন, আমি তো এ ব্যাপারে তোমাকে পূর্বেই বলেছিলাম যে, তার জন্য আল্লাহ তাআলা যা নির্ধারিত করেছেন, তা অবশ্যই প্রকাশ পাবে।

হ্যাঁ, মানুষ যৌনকার্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বটে। কিন্তু একে কোনক্রমেই সরাসরি জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বলা যায় না। তাই তাঁরা মনে করেন, ইহার নাম সরাসরি জন্ম নিয়ন্ত্রণ না রেখে "গর্ভনিরোধ" রাখা যেতে পারে।

আল্লামা তকী উসমানী বলেন, আমাদের যুগে পরিবার পরিকল্পনা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ নামে যে কর্মকাণ্ড চলছে, এর অবৈধতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। প্রথমত, পরিবার পরিকল্পনার অনুমতি যেসব স্থানে প্রমাণিত সেগুলোর সারকথা হল, ব্যক্তিগত পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা করা। কিন্তু এটিকে একটি সার্বজনীন কর্মসূচীতে পরিণত করা এবং এ কাজের জন্য ব্যাপক প্রচারণা ও উৎসাহ প্রদান মোটেই জায়েয নয়। দ্বিতীয়ত, এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্যও হারাম। কারণ, এর উদ্দেশ্য হল দরিদ্রতার ভয়। আর এই কারণ, কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারাও ফাসিদ। মুবাহ (জায়িয) কাজও খারাপ নিয়তের কারণে হারাম হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ– অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না। কারণ তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই রিযিকের ব্যবস্থা করি। (বনী ইসরাইলঃ ৩১)

অতএব, এই কর্মকাণ্ড সৃষ্টিকর্তার রবূবীয়ত ও রায্যাকীয়ত ব্যবস্থাকে নিজের হাতে তুলে নেয়ার নামান্তর। অথচ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِيْ الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا– অর্থাৎ, আর পৃথিবীতে এমন কোন বিচরণশীল প্রাণী নেই, যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ নেননি। (হূদঃ ৬)

আর কুদরতের বিধান হল, সর্বযুগে উৎপাদনের পরিমাণ সে যুগের চাহিদা অনুযায়ীই হয়ে থাকে। যেমন, অতীতে সমস্ত সফর হত ঘোড়া ইত্যাদির উপর চড়ে। সে যুগে এ ধরনের সফরে কাজে আসার মত জন্তুর সংখ্যাও হত বহুল পরিমাণে। এখন যেহেতু সফর অন্যান্য গাড়িতেও হয়, ফলে ঘোড়া ইত্যাদির বংশও কমে গেছে। পক্ষান্তরে বর্তমানে গোটা জীবনই পেট্রোল ও তেলের সাথে ঘূর্ণায়মান। অতএব, ভূমিও তার ভাণ্ডারগুলো অকৃপণভাবে খুলে দিচ্ছে। এই বাস্তব সত্যটিকেই আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন-

وَاِنْ مِّنْ شَيْئٍ اِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗ اِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ– অর্থাৎ, আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার রয়েছে, আমি নির্দিষ্ট পরিমাণেই তা অবতরণ করি। (হিজরঃ ২১)

তৃতীয়ত, তিনি আরো মনে করেন, দরিদ্রতার ভয় দেখিয়ে মুসলমানদের মাঝে পরিবার পরিকল্পনার মনোভাব গড়ে তোলা, এটি ইসলামের চির দুশমন ইহুদী ও খৃষ্টানদের একটি রাজনৈতিক প্রতারণামাত্র। এর দ্বারা তাদের মূল উদ্দেশ্য হল, মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে রোধ করা। মুসলমানদের বিচার-বিশ্লেষণ না করেই এর ফাঁদে পড়া উচিত নয়। কেননা, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمْ– (ابو داود ج١ ص٢٨٠ باب في تزويج الابكار، نسائي ج٢ ص٧٠ كراهية تزويج العقيم)

অর্থাৎ, তোমরা এমন স্ত্রীলোকদের বিবাহ কর, যারা স্বামীদের অধিক মহব্বত করে এবং অধিক সন্তান প্রসব করে। কেননা, আমি (কিয়ামতের দিন) তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে (পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর) গর্ব প্রকাশ করব।

অধুনা অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞগণও বলেন যে, পরিবার পরিকল্পনার এই কর্মকাণ্ড নেহায়েত ক্ষতিকর। প্রয়োজন শুধু প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার ও ইনসাফভিত্তিক সুষ্ঠু বন্টন এবং মানব সম্পদকে কাজে লাগানো। অতএব, মাথায় টুপি না লাগলে মাথা কেটে ছোট করবে নাকি টুপি বড় করতে হবে? এর জবাবে সবাই বলবে টুপি বড় করতে হবে। ঠিক তেমনি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে জনগণকে মারার ব্যবস্থা না করে বরং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে জনশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। আর এটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। অথচ সে কাজটিই আজ ব্যাহত হচ্ছে।

প্রচলিত পরিবার পরিকল্পনার (জন্ম নিয়ন্ত্রণ) কিছু পদ্ধতিসমূহ এবং এর হুকুমঃ

(১) আই.ইউ.সি.ডি.ঃ বীর্য যাতে ডিম্বানুকে নিষিক্ত করতে না পারে অথবা পারলেও নিষিক্ত ডিম্বানু (জাইগোট) যাতে জরায়ুর মধ্যে প্রতিস্থাপিত হতে না পারে এজন্য নারীর জরায়ুর মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকল্পে একটি প্লাষ্টিক কয়েল (কপার-টি) সংযোজন করে দেয়া হয়।

হুকুমঃ হক্কানী আলিমদের মতে, পরিবার পরিকল্পনার জন্য জরায়ুতে প্লাস্টিক কয়েল স্থাপন করা ঠিক নয়। কেননা, প্লাস্টিক কয়েল যেহেতু অন্যের সাহায্য ছাড়া সংযোজন করা যায় না। আর স্ত্রীলোকদের অন্যের সম্মুখে সতর খোলা হারাম। তাছাড়া কোন সময় তা সম্পূর্ণ ভিতরে ঢুকে গেলে অসুবিধার কারণে ছতর খোলা ছাড়া অপারেশন করাও সম্ভব নয়। (উল্লেখ্য যে, যদি এমন অবস্থা হয় যে, অপারেশন ছাড়া রোগীর বা সন্তানের জীবন বাঁচানোর কোন পথ না থাকে অথবা অঙ্গহানির আশংকা হয়, তাহলে অপারেশন করা যাবে।)

(২) পুরুষ বন্ধ্যাকরণ (ভ্যাসেক্টমি)ঃ পুরুষের বন্ধ্যাকরণের জন্য সহজ অস্ত্রপচার বিশেষ। এতে অণ্ডকোষ থেকে বের হয়ে আসা দুটি শুক্রকীটবাহী নালিকা অংশত বা

সম্পূর্ণ কেটে ফেলা হয় অথবা বেঁধে দেয়া হয়, ফলে বীর্যের কার্যক্ষমতা থাকে না। তবে ভ্যাসেক্টমীর ফলে স্বাভাবিক যৌন প্রক্রিয়া এবং সঙ্গমের আনন্দ হ্রাস পায় না।

(৩) নারী বন্ধ্যাকরণ (টিউবেক্টমি)ঃ নারীর পেট অপারেশন করে ডিম্বাকোষের সাথে জরায়ুর সংযোগের যে দুটি ফেলোপিয়ান টিউব রয়েছে, তা কেটে প্রান্তে বেঁধে দেয়া। ফলে ডিম্বের সঙ্গে শুক্রকীটের মিলন হতে পারে না বলে সন্তান ধারণের কোন সম্ভাবনাও থাকে না। একে লাইগেশনও বলা হয়। এই প্রক্রিয়াতেও সহবাসের আনন্দানুভূতি ব্যাহত হয় না।

বন্ধ্যাকরণের হুকুমঃ শায়খ ড. সাঈদ রামাদান আল বুত্তী সহ হক্কানী ফকীহগণ বলেন, ইসলামে বন্ধ্যাকরণ হারাম। কেননা, এর দ্বারা আল্লাহর প্রদত্ত আমানতের খিয়ানত করা হয় এবং আল্লাহর কুদরতে সরাসরি আঘাত হানা হয়। এটা আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তনের সমতুল্য। কারণ, এতে পুরুষের সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা এবং নারীর সন্তান ধারণ ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করা হয়, যা ইসলাম কখনো অনুমোদন করে না। (বার্থ কন্ট্রোলঃ প্রিভেন্টিভ এন্ড কিওরেটিভ আসপেক্ট- প্রকাশকাল ১৯৭৬ ইং)

(৪) নিরাপদ সময়ে স্ত্রী সম্ভোগঃ গবেষণা করে দেখা গেছে, ঋতু আরম্ভ হওয়ার দিন হতে হিসাব করে পবিত্র হওয়ার প্রথম তিন দিন এবং ঋতু আরম্ভ হতে হিসাব করে বিশ দিন পরে আট দিন অর্থাৎ বিশতম দিবস হতে আটাশতম দিবস পর্যন্ত আট দিন। প্রতি মাসে এই এগার দিন স্ত্রী সহবাসে সাধারণত সন্তান ধারণ হয় না। এটাকেই নিরাপদ সময় বলা হয়। (নিরাপদ সময়ের হিসাব যেহেতু মহিলাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়ে থাকে তাই এর সঠিক হিসাব অভিজ্ঞ ডাক্তারের কাছ থেকে জেনে নেয়া যেতে পারে।)

হুকুমঃ পরিবার পরিকল্পনার যত পদ্ধতি রয়েছে এগুলোর মধ্যে উত্তম পদ্ধতি হল "নিরাপদ সময়ে স্ত্রী সহবাস"। একটু সংযমী হয়ে এই পদ্ধতি গ্রহণ করলে কৃত্রিম পন্থা অবলম্বনের কোন প্রয়োজন হয় না। ফলে পাপবোধ থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যায় এবং আত্মিক প্রশান্তিও অর্জিত হয়।

(৫) ডায়েফ্রাম বা পেশরীঃ বীর্য জরায়ুতে না পৌঁছার লক্ষ্যে স্ত্রীর জননেন্দ্রিয়ে ব্যবহার করার জন্য এক ধরনের খাপবিশেষ, যা ক্ষণস্থায়ী।

(৬) কনডমঃ এটাও বীর্য জরায়ুতে না পৌঁছার লক্ষ্যে পুংজননেন্দ্রিয়ে ব্যবহারের জন্য এক ধরনের খাপ। অভিজ্ঞদের থেকে জানা গেছে, এ পদ্ধতিতে যৌন কার্যে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ হতে বঞ্চিত হতে হয়।

(৭) গর্ভনিরোধক ইনজেকশন, বটিকা, নরপ্ল্যান্ট বা পিল সেবনঃ এগুলোর দ্বারাও সাময়িকভাবে গর্ভনিরোধ করা সম্ভব। তবে অনেক চিকিৎসক মনে করেন যে,

এগুলোর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াও রয়েছে। অধিক সেবনের ফলে মহিলাদের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে, হার্ট অ্যাটাক, উচ্চ রক্তচাপ, পিত্তথলিতে পাথর এবং শরীরে মারাত্মক জ্বালা-পোড়া শুরু হতে পারে।

হুকুমঃ ৫ নং, ৬ নং এবং ৭ নং পদ্ধতি "আযল"-এর হুকুমের ন্যায়। অর্থাৎ, এসব পদ্ধতি আযল কার্যের উদ্দেশ্যে অবলম্বন করা যেতে পারে। নিম্নে আযল সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

(৮) আযলঃ পরিবার পরিকল্পনা বা গর্ভনিরোধের আরেকটি পদ্ধতি হল আযল। ইসলামের প্রথম দিকে গর্ভনিরোধের ক্ষেত্রে আযলই ছিল একমাত্র পদ্ধতি।

তবে, আযল জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে বিতর্ক রয়েছে। যথা-

ক. বিরোধীগণের অভিমতঃ ইবনে হাজম, শায়খ মোহাম্মদ আবু জাহরা, আবুল আলা মওদূদী ও শায়খ আহমেদ শাহনুন প্রমুখ আযল অথবা গর্ভনিরোধক যে কোন প্রক্রিয়াকে শিশুহত্যা বলে অভিহিত করেন।

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ

দলীল (২)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

অর্থাৎ, যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। (তাকভীরঃ ৮-৯)

উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে সন্তানকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং হত্যার প্রতি নিন্দা জানানো হয়েছে। আর আযল অথবা গর্ভ নিরোধক যে কোন পদ্ধতিই হল শিশুহত্যা।

দলীল (৩)ঃ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهَبٍ اُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اُنَاسٍ وَهُوَ يَقُوْلُ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَنْهٰى عَنِ الْغَيْلَةِ فَنَظَرْتُ فِيْ الرُّوْمِ وَفَارِسَ فَاِذَا هُمْ يُغَيِّلُوْنَ اَوْلاَدَهُمْ فَلاَ يَضُرُّ اَوْلاَدَهُمْ ذٰلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَاَلُوْهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ الْوَادُ الْخَفِيُّ- (مسلم ج١ ص٤٦٦ باب جواز الغيلة الخ، ابن ماجة ص١٤٦)

অর্থাৎ, জুদামা বিনত ওহাব আল আসাদিয়া (উক্কাছ-এর ভগ্নী) বর্ণনা করেছেন, আমি অন্যদের সহ আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর সম্মুখে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বলেছেন, "আমি আল ঘায়লা (দুগ্ধপোষ্য বাচ্চার মায়ের সাথে সহবাস করা) প্রায় নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলাম। অতঃপর আমি রোমান ও পারস্যবাসীদের সম্বন্ধে চিন্তা করলাম এবং জানলাম যে, তাদের গর্ভবতী মায়েরাও সন্তানদের স্তন্যদান করাতো এবং তাতে তাদের ক্ষতি হতো না।" অতঃপর সাহাবীরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আযল

সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, এটা "আল ওয়াদ আল খাফী" অর্থাৎ গুপ্ত শিশুহত্যা।
উক্ত হাদীসটি দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, আযল জায়েয নয়। কেননা, নবী করীম (সাঃ) এটাকে "গুপ্ত শিশুহত্যা" বলে আখ্যা দিয়েছেন।

খ. সমর্থকদের অভিমতঃ চার ইমামসহ জমহুর উলামায়ে কিরামের অভিমত হল, গর্ভ নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া হিসেবে আযল বৈধ। তবে তা স্ত্রীর সম্মতিক্রমে হওয়া চাই। কেননা, যোনীতে বীর্যপাতের দ্বারা স্ত্রীর আনন্দ লাভ করা, এটা তার ন্যায্য অধিকার। অধিকাংশ ফকীহ মনে করেন, স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত আযল করলে তা মাকরূহ তানযীহী হবে। আর এর উপর কিয়াস করেই পরবর্তী ফকীহগণ বলেন যে, আযলের ন্যায় ডায়েফ্রাম, কনডম, গর্ভনিরোধক ইনজেকশন, বটিকা বা পিল সেবনও জায়েয আছে। তবে উদ্দেশ্য যেন খারাপ না হয়।

দলীল (১)ঃ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ– (بخاري ج٢ ص٧٨٤، مسلم ج١ ص٤٦٥، ترمذي ، ابن ماجة ص١٤٠)

অর্থাৎ, হযরত জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সময়ে আমরা (সাহাবীগণ) আযল করতাম। অথচ ঐ সময়ে কুরআন নাযিল হচ্ছিল।

দলীল (২)ঃ হযরত জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে আরো একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন-
كُنَّا نَعْزِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ– (مسلم ج١ ص٤٦٥)

অর্থাৎ, ... আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সময় আযল করতাম। এ খবর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট পৌঁছেছে, কিন্তু তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেননি।
এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের একজন বর্ণনাকারী সুফিয়ান এ হাদীসের সাথে আরো যোগ করেছেন, "এটা যদি নিষিদ্ধ হতো, তাহলে কুরআনে তা নিষেধ করা হতো।"

দলীল (৩)ঃ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْعَزْلِ عَنِ الْحُرَّةِ اِلاَّ بِدُوْنِ اِذْنِهَا– (ابن ماجة ص١٣٨)

অর্থাৎ, হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) হতে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বাধীনা স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া আযল করতে নিষেধ করেছেন।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারাও বুঝা যায় যে, স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে আযল বৈধ।

দলীল (৪)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসেও নবী করীম (সাঃ) পরোক্ষভাবে আযলের অনুমতি প্রদান করেছেন।

দলীল (৫)ঃ আযলকারী বা আযল অনুমোদনকারী সাহাবীদের নামঃ

ক. হযরত আলী ইবন আবী তালিব (রাঃ)
খ. হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)
গ. হযরত আবু আইউব আল আনছারী (রাঃ)
ঘ. হযরত যায়েদ ইবন সাবিত (রাঃ)
ঙ. হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ)
চ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রাঃ)
ছ. হযরত আল হাসান ইবনে আলী (রাঃ)
জ. হযরত খাব্বাব (রাঃ)
ঝ. হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ)
ঞ. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসুদ (রাঃ)।
(ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা, পৃ. ১৬১)

জবাবঃ প্রথম দুই আয়াতের জবাবঃ ফকীহগণ বলেন, যদি দারিদ্র্য ভয়ে আযল বা গর্ভনিরোধক যে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করে তাহলে তা ভিন্ন কথা। নতুবা, এ দুটি আয়াত দ্বারা আযল নাজায়েয সাব্যস্ত করা কোনক্রমেই সঠিক নয়। শায়খ ড. মোহাম্মদ সাল্লাম মাফকূর-এর মতে, আল-কুরআনের হত্যা সংক্রান্ত দুটি আয়াতের মধ্যে আযল ও গর্ভপাতকে অন্তর্ভুক্ত করা ভুল। কেননা, আয়াত দুটিতে 'ওয়াদ' শব্দ নয়, বরং 'কাতাল' (হত্যা) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর হত্যা তখনি সম্ভব যখন তাতে জীবন বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এ বিশ্বে এমন কোন ডাক্তার বা জ্ঞানী পাওয়া যাবে না, যিনি বীর্যে রূহ আছে বলে মন্তব্য করবেন।

অতএব, إِذَا فَاتَ الشَّرْطُ فَاتَ الْمَشْرُوْطُ অর্থাৎ, শর্ত পাওয়া না গেলে শর্তের ফলাফল বাতিল হবে।

তাছাড়া আয়াতদ্বয়ের শানে নুযূল পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় যে, জাহেলিয়াত যুগের আরবরা কন্যা সন্তানকে লজ্জাকর মনে করত এবং তাদেরকে জীবন্তই মাটিতে প্রোথিত করে দিত। আর এমন জীবন্ত হত্যা তো সবার নিকটই হারাম।

জুদামা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের জবাবঃ (১) কোন কোন আলিম এ হাদীসটিকে যঈফ মনে করেছেন। (২) কোন বিষয়কে নিষিদ্ধ করতে হলে 'নস' (কুরআন ও হাদীস)

দ্বারা বা তার উপর কিয়াস করে নিষিদ্ধ করতে হয়। এছাড়া কোন বিষয়কে নিষিদ্ধ করা যায় না। অথচ আযল সম্পর্কে কোন নস বা কিয়াসের কোন বিধান নেই।

(৩) ইমাম তাহাবী (রহ.)-এর মতে, সূরা মুমিনুন-এর ১২-১৪ নং আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে আযলকে গুপ্ত শিশু হত্যা মনে করা হত। কিন্তু উক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার পর এ ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। আয়াতগুলো হলো-

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ– ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ– ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ– فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ–

অর্থাৎ, আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি উহাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্ত (আলাক) রূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে (মুদগাহ) পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি (ইযাম) সৃষ্টি করেছি। অতঃপর অস্থিকে ঢেকে দেই গোশত (লাহম) দ্বারা। অতঃপর উহাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়। (মুমিনূনঃ ১২-১৪)

(৪) হযরত ইবন আব্বাস ও আলী (রাঃ) আযলকে শিশুহত্যা মনে করেননি। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, শিশুহত্যা তখনই হতে পারে, যখন ৭ম স্তরে উন্নীত হয়। কোন কোন সাহাবায়ে কিরাম আযল করতেন। এটা যদি শিশুহত্যা হতো বা কবীরা গুনাহ হতো, পবিত্র কুরআনে তা নিষিদ্ধ হত অথবা নবী করীম (সাঃ) তা সরাসরি নিষেধ করতেন।

(৫) যারা পরিবার পরিকল্পনার বিরোধিতা করে থাকেন তাঁরাও বলে থাকেন যে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে আযল করা যেতে পারে। কিন্তু জাতীয় নীতি হিসেবে তা প্রচলন করা যায় না। এতেও বুঝা যায় যে, আযল বা গর্ভনিরোধ শিশুহত্যা নয়।

(৬) জুদামা বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে আযলকে মাকরূহ তানযীহী বলা যায়। যেমন মনে করেছেন ইমাম নববী ও ইমাম তাহাবী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কোন কোন ফিকহের গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, নিম্নবর্ণিত কারণে গর্ভধারণের ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও গর্ভনিরোধ জায়েয-

ক. যদি মহিলা গর্ভধারণের বোঝা বহন করতে অপারগ হয়।

খ. মহিলা যদি নিজ বাসস্থান থেকে এত দূরে থাকে, যেখানে তার স্থায়ীভাবে অবস্থানের ইচ্ছে নেই। আর এমন বাহনে সফর করতে হবে যার দ্বারা গন্তব্যে পৌঁছতে কয়েক মাস লেগে যেতে পারে।

গ. স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্বাভাবিক না থাকায় সম্পর্ক বিচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে।

ঘ. পূর্বের যে সন্তান মায়ের কোলে রয়েছে, তার স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার প্রবল আশংকা থাকলে।

ঙ. যুগের প্রতিকূল অবস্থার কারণে সন্তান অসচ্চরিত্র এবং পিতা-মাতার অপমানের কারণ হওয়ার আশংকা থাকলে।

চ. গর্ভধারণের কারণে মহিলার দুধ শুকিয়ে যাওয়া এবং কোলের সন্তানকে লালন-পালন করার মতো অন্য ব্যবস্থা না থাকা বা কঠিন হওয়া।

ছ. কোন দীনদার ডাক্তার যদি বলে যে, গর্ভধারণ করলে মহিলার প্রাণহানি কিংবা কোন অঙ্গহানি হওয়ার প্রবল আশংকা রয়েছে।

জ. মহিলা যদি অসচ্চরিত্র হয় এবং স্বামী তার সাথে বিচ্ছেদের ইচ্ছাও রাখে।

(আহসানুল ফাতাওয়া খণ্ড ৮, পৃ. ৩৪৭, ইন্ডিয়ান সংস্করণ, শামী খণ্ড ৩, পৃ. ১৭৬, করাচী সংস্করণ)

উপরোল্লিখিত কারণসমূহ ছাড়াও ইমাম গাযালী (রহ.) থেকে আরো দুটি অভিমত পাওয়া যায়-

(ক) সুখতর দাম্পত্য জীবন এবং স্বামীর নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের জন্য স্ত্রীর শারীরিক স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষণের উদ্দেশ্যে।

(খ) বৃহৎ পরিবার প্রতিপালনের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক দৈন্যতা-ক্লেশ পরিহার করার উদ্দেশ্যে। বহুসংখ্যক সন্তানের কারণে পিতা-মাতা অসৎ জীবন-যাপনে বাধ্য হতে পারে এবং জীবিকা সংগ্রহে অতিমাত্রায় ক্লান্ত হয়ে যেতে পারে।

* হানাফী ও হাম্বলী মাযহাব মতে, শত্রু এলাকায় জন্ম হলে সন্তানের ইসলাম বিচ্যুত হতে বাধ্য হবার সম্ভাবনা থাকলে।

৯। গর্ভপাত (এবরশন)ঃ যদি কোন মহিলা গর্ভবতী হয়ে যায় এবং তার কোলের বাচ্চার জন্য তা ক্ষতিকর হয়, যেমন গর্ভবতী হওয়াতে দুধ শুকিয়ে যাওয়া, দুধ নষ্ট হয়ে যাওয়া, যা কোলের শিশুকে খাওয়ানো যায় না, এমতাবস্থায় গর্ভ চারমাস পূর্ণ হওয়ার আগে ওয়াশ করে বা অন্য পদ্ধতিতে গর্ভপাত করানো যেতে পারে। যদি কোলের শিশুকে বাঁচানোর কোন ব্যবস্থা না থাকে।

(ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী খণ্ড ৫, পৃ. ৩৫৬ পাকিস্তানী সংস্করণ, শামী খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৭৬ করাচী সংস্করণ)

উল্লেখ্য যে, মালিকী মাযহাবে গর্ভসঞ্চার হওয়ার পর গর্ভপাত বা ভ্রূণপাত বৈধ নয়। এমনকি ৪০ দিনের পূর্বেও নয়।

শাফেঈ মাযহাবের ফকীহগণ ১২০ দিনের পূর্বে গর্ভপাত সম্পর্কে দ্বিধাবিভক্ত। একদল নিষিদ্ধ মনে করেন। আরেকদল বৈধ মনে করেন।

হাম্বলী মাযহাবের মতে, ঔষধ সেবন করে ৪০ দিনের পূর্বে গর্ভপাত বৈধ। তবে ৪০ দিনের পরে অবৈধ।
তবে সকল মাযহাবের সর্বসম্মত অভিমত হলো এই যে, গর্ভসঞ্চারের ১২০ দিন পর গর্ভপাত হারাম। অবশ্য যদি গর্ভধারিণীর জীবন রক্ষার কারণে প্রয়োজন হয়, সেটা ভিন্ন কথা। (ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা, পৃ. ২৬৮-২৬৯)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ- (ابو داود ج١ ص٧١ باب متى يؤمر الغلام بالصلوة)

অর্থাৎ, ... আমর ইবন শুআয়েব (রহ.) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের সন্তানরা সাত বছরে উপনীত হয়, তখন তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও এবং তাদের বয়স যখন দশ বছর হবে তখন (নামায না পড়লে) এজন্য তাদেরকে মারপিট কর এবং তাদের (ছেলে-মেয়েদের) বিছানা পৃথক করে দাও।
সমকালীন ফকীহগণ উপরোল্লিখিত সন্তানদের পৃথক শয্যা ব্যবস্থা সংক্রান্ত হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, প্রত্যেক পুত্র-কন্যার জন্য পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত দম্পতি সন্তান জন্মদান সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। (ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা, পৃ. ২৩৭-২৩৮)
এক্ষেত্রে তাঁদের বিপক্ষে নবী করীম (সাঃ)-এর বাণী, "তোমরা এমন স্ত্রীলোকদের বিবাহ কর, যারা অধিক সন্তান প্রসব করে" উপস্থাপন করলে এর উত্তরে বলেন, পূর্ণ হাদীসটি অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলে, আমি এক সুন্দরী ও সদ্বংশীয়া রমণীর সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু সে কোন সন্তান প্রসব করে না (বন্ধ্যা)। আমি কি তাকে বিবাহ করব? তিনি বলেন, না। অতঃপর সে ব্যক্তি দ্বিতীয়বার এসে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে নিষেধ করেন। অতঃপর তৃতীয়বার সে ব্যক্তি একই কথা বললে, নবী করীম (সাঃ) উক্ত উক্তিটি করেন। (ابو داود ج١ ص٢٨٠، نسائي ج٢ ص٧٠)
অতএব, এ উক্তিটির সাথে পরিবার পরিকল্পনার কোন বিরোধ নেই। উক্ত হাদীসটির দ্বারা উদ্দেশ্য হল, বন্ধ্যা নারীদের বিয়ে না করা; বরং প্রজনন সক্ষম নারীকেই বিয়ে করা। সুতরাং সন্তান জন্ম দেয়া যদি নিজ ও জাতির জন্য আপদ না হয়ে সম্পদে পরিণত হয়, এদের ভরণ-পোষণ ও লালন-পালনের ক্ষেত্রে হারাম ও অবৈধ পন্থা অবলম্বন না করে যথাযথ দায়িত্বের সাথে উপযুক্ত শিক্ষা, চরিত্র গঠন,

আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)-এর আনুগত্য করা তথা প্রকৃত মুসলমান হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে তা হবে অবশ্যই প্রশংসনীয়। কেননা, ইসলাম কেবল লোক বৃদ্ধির পক্ষে নয়; বরং প্রকৃত মুসলিম জনসংখ্যা বাড়ানোর পক্ষে। আর তাঁদেরকে নিয়েই নবী করীম (সাঃ) কিয়ামতের দিন গর্ব প্রকাশ করবেন।

كِتَابُ الطَّلَاقِ ঃ তালাক অধ্যায়

بَابُ فِيْ طَلَاقِ السُّنَّةِ ص٢٩٦ ঃ সুন্নত তরীকায় তালাক

... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّه طَلَّقَ امْرَاَتَه وَهِيَ حَائِضٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ اَمْسَكَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ اَنْ يَّمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ اَمَرَ اللهُ اَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءَ– (بخاري ج٢ ص٧٩٠ كتاب الطلاق، مسلم ج١ ص٤٧٥–٤٧٦ باب تحريم طلاق الحائض الخ، ترمذي ج١ ص٢٢٢ باب طلاق السنة، نسائي ج٢ ص٩٨ باب وقت الطلاق للعدة، ابن ماجة ص١٤٦)

অনুবাদঃ ... আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক প্রদান করেন। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তুমি তাকে বল তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে এবং হায়েয হতে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাকে নিজের কাছে রাখতে বল। এরপর সে (মহিলা) পুনরায় হায়েয হতে পবিত্র হলে সে তাকে চাইলে রাখতেও পারে এবং যদি চায় তালাকও দিতে পারে। এই তালাক অবশ্য তার সাথে সহবাসের পূর্বে পবিত্রাবস্থায় দিতে হবে। আর এ ইদ্দত (সময়সীমা) আল্লাহ তাআলা মহিলাদের তালাক প্রদানের জন্য নির্ধারিত করেছেন।

বিশ্লেষণঃ তালাকের আভিধানিক অর্থঃ

طَلَاق (তালাক) শব্দটি **فَعَال**-এর ওযনে বাবে **تَفْعِيْل**-এর মাসদার, যা **تَطْلِيْق**-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-

(১) اِزَالَةُ الْقَيْدِ - বন্ধন মুক্ত করা

(২) اَلتَّخْلِيَةُ - খালি করা

(৩) اَلتَّفْرِيْقُ - বিচ্ছেদ করা

(৪) اَلرَّفْعُ الْقَيْد - বন্ধন উঠিয়ে ফেলা

(৫) পরিত্যাগ বা বর্জন করা (قواعد الفقه ص٣٦٢)

শব্দটির ব্যবহার পবিত্র কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায়-

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ-

অর্থাৎ, তালাকে 'রাজঈ' হল দু'বার পর্যন্ত, তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় উত্তম পদ্ধতিতে বর্জন করবে। (বাকারাঃ ২২৯)

হাদীসে বর্ণিত আছে-

... عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ- (ابو داود ج١ ص٢٩٦ باب في كراهية الطلاق، ابن ماجة ص١٤٦)

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলার নিকট নিকৃষ্টতম হালাল বস্তু হল তালাক।

তালাকের পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

(১) আল্লামা কিরমানী (রহ.) বলেন-

هُوَ رَفْعُ الْقَيْدِ الثَّابِتِ بِالنِّكَاحِ بِالْاَلْفَاظِ الْمَخْصُوْصَةِ-

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট কতগুলো শব্দ দ্বারা বিয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বন্ধনকে বিচ্ছিন্ন করার নামই তালাক।

(২) হেদায়া গ্রন্থের হাশিয়াতে রয়েছে-

هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ يَرْفَعُ الْقَيْدَ النِّكَاحِ بِاَلْفَاظٍ مَخْصُوْصَةٍ-

অর্থাৎ, তালাক হচ্ছে এমন একটি শরঈ হুকুম, যা নির্দিষ্ট শব্দসমূহের মাধ্যমে বৈবাহিক বন্ধনকে উঠিয়ে দেয়।

(৩) কেউ কেউ বলেন, هُوَا التَّفْرِيْقُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ لَا يَجُوْزُ بَعْدَهُ اِسْتِمْتَاعٌ اِلَّا بِالرُّجْعَةِ اَوْ بِتَجْدِيْدِ النِّكَاحِ اَوْ بِالْحِيْلَةِ-

অর্থাৎ, তালাক হল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন এক বিচ্ছেদ, যার পর হিলা, নতুন বিবাহ অথবা প্রত্যাবর্তন ব্যতীত উপভোগের সুযোগ থাকে না।

(৪) বৈবাহিক সম্পর্কের বিচ্ছেদকে তালাক বলে। (قواعد الفقه ص٣٦٢)

তালাকের প্রকারভেদ ও সংজ্ঞাঃ

صِفَات (গুণগত)-এর দিক দিয়ে তালাক তিন প্রকার। যথা-

(১) اَحْسَنُ الطَّلَاقِ **(উৎকৃষ্টতম তালাক)ঃ**

هُوَ اَنْ يُّطَلِّقَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ طَلَقَةً فِيْ طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيْهِ وَيَتْرُكْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا– (فتح القدير ج٣ ص٣٢٧–٣٢٨، البحر الرائق ج٣ ص٢٣٨)

অর্থাৎ, যে তুহুরে (মহিলাদের ঋতু মুক্তিকাল) সহবাস করা হয়নি, এমন তুহুরে স্বামী স্ত্রীকে এক তালাক প্রদান করা এবং ইদ্দত (সময়সীমা) পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাকে এ অবস্থায় রেখে দেয়া, (যাতে এক তালাক বায়েন হয়ে যায়।)

উল্লেখ্য যে, طَلَاق اَحْسَن কে অনেকেই তালাকে সুন্নত দ্বারা ব্যাখ্যা করে থাকেন।

* আল্লামা আলুসী (রহ.) বলেন, তালাকে সুন্নত দ্বারা ইহা বুঝানো উদ্দেশ্য নয় যে, এই পন্থায় তালাক দেয়া পছন্দনীয় এবং সওয়াবের কাজ তথা সুন্নত। বরং একে সুন্নত এই ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, যত পদ্ধতিতে তালাক দেয়া যায় তার মধ্যে এটিই উত্তম। (روح المعاني ج٢ ص١٣٦)

(২) حَسَنُ الطَّلَاق **(উত্তম তালাক)ঃ** স্ত্রীর অবস্থা ভেদে এর সংজ্ঞা কয়েক রকম। সঙ্গমকৃতা স্ত্রীর ক্ষেত্রে حَسَن বা উত্তম তালাকের নিয়ম হচ্ছে-

"تَفْرِيْقُ الثَّلٰثِ فِيْ الطَّهَارَةِ لاَ وُطِيَ فِيْهِ"–

অর্থাৎ, পৃথক পৃথকভাবে তিন তুহুরে তিন তালাক দেয়া, যার মধ্যে সহবাস করা হয়নি।

* غَيْرُ مَوْطُوْءَة তথা অসঙ্গমকৃতা স্ত্রীর ক্ষেত্রে হাসান তালাকের নিয়ম হচ্ছে-

طَلَقَة لِغَيْرِ الْمَوْطُوْءَة وَلَوْ فِيْ حَيْضٍ–

অর্থাৎ, এক তালাক প্রদান করা যদিও তা হায়েযের মধ্যে হোক না কেন।

* اٰيِسَة – صَغِيْرَة – حَامِل তথা বৃদ্ধা, অপ্রাপ্ত বয়স্কা ও গর্ভবতী মহিলার ক্ষেত্রে প্রত্যেক মাসে এক তালাক দেয়াকে তালাকে হাসান বলা হয়।

(৩) بِدْعَةُ الطَّلَاق **(বিদআত তালাক)ঃ** একই সঙ্গে একই তুহুরে তিন বা দুই তালাক প্রদান করা, যার মধ্যে رَجْعَت (স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা) হয় না। কিংবা ঐ তুহুরে তালাক দেয়া, যাতে সহবাস করা হয়েছে। অথবা مَوْطُوْءَة (সঙ্গমকৃতা) স্ত্রীকে হায়েযের মধ্যে তালাক দেয়াকে বিদআত তালাক বলা হয়। মূলত বিদআত তালাক হল- وَهُوَ مَا خَالَفَ قِسْمَيِ السُّنَّةِ অর্থাৎ, "সুন্নতের দুই প্রকার তথা আহসান ও হাসানের পরিপন্থী তালাকই হল বিদআত তালাক।" (البحر الرائق ج٣ ص٢٣٩ القواعد الفقة ص٣٦٣)

* حُكْمًا (হুকুম) হিসেবে তালাক তিন প্রকার। যথা-

(১) اَلطَّلَاقُ الرَّجْعِي (রাজঈ তালাক)ঃ هُوَ الَّذِيْ يَمْلِكُ فِيْهِ الزَّوْجُ رَجْعَتَهَا অর্থাৎ, যে তালাকের মধ্যে স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকে। ইচ্ছা করলে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। যেমন এক তালাক ও দুই তালাকের পর ফিরিয়ে আনা যায়।

(২) الطَّلَاقُ البَائِنَة (বায়েন তালাক)ঃ

هُوَ مَا لاَ رَجعَةَ فِيْهِ لِلزَّوْجِ عَلٰى زَوْجَتِه لِكَوْنِهَا مُطَلَّقَةً مَبْتُوْتَةً

অর্থাৎ, এটা এমন তালাক, যা প্রদান করলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর رجعت করার অধিকার থাকে না। তবে উভয়ের সম্মতিতে বিয়ে নবায়ন করার সুযোগ থাকে। [যেমন- كِنَايَة (ইঙ্গিত-সূচক) শব্দ দ্বারা তালাক দিলে। আর তা এক অথবা দুই তালাকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে।]

(৩) الطَّلَاقُ المُغَلَّظَة (মুগাল্লাযা তালাক)ঃ তালাকে মুগাল্লাযা হচ্ছে এমন তালাক, যার পর স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার এবং বিয়ে নবায়ন করার কোন অধিকার ও সুযোগ থাকে না। তবে অন্য স্বামী স্বাভাবিকভাবে বিয়ে করে স্বেচ্ছায় তালাক দিলে ইদ্দত পালনের পর পূর্ববর্তী স্বামীর জন্য বিয়ে করা বৈধ হবে।
যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه-

অর্থাৎ, তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়া হয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। (বাকারাঃ ২৩০)

* لَفْظًا (শব্দগত) তালাক দু'প্রকার। যথা-

(১) اَلطَّلَاقَ الصَّرِيْح (সুস্পষ্ট তালাক)ঃ هُوَ الطَّلَاقُ بِلَفْظٍ اُسْتُعْمِلَ فِيْهِ دُوْنَ غَيْرِهٖ
অর্থাৎ, এমন শব্দ দ্বারা তালাক দেয়া, যে শব্দ তালাকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, অন্য কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না।
বিধানঃ এ সমস্ত শব্দ দ্বারা এক তালাকে রাজঈ কার্যকর হবে। নিয়ত থাকুক বা না থাকুক। যেমন, اَنْتِ طَالِق (তুমি তালাক)

(২) اَلطَّلَاقُ الْكِنَايَة (ইঙ্গিত-সূচক তালাক)ঃ

هُوَ الطَّلَاقُ بِلَفْظٍ لَا يُسْتَعْمَلُ فِيْهِ اَوْ يُسْتَعْمَلُ فِيْهِ قَلِيْلاً–

অর্থাৎ, এমন শব্দ দ্বারা তালাক দেয়া, যা তালাকের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না অথবা কম ব্যবহার হয়। এক কথায় বলা যায়, ইঙ্গিতার্থবোধক শব্দযোগে যে তালাক প্রদান করা হয় তাকেই طَلَاق كِنَايَة বলা হয়।

বিধানঃ এ সমস্ত শব্দের মধ্যে তালাকের নিয়ত থাকলে অথবা دَلَالَتُ حَال (অবস্থার নির্দেশনা) পাওয়া গেলে তালাক কার্যকর হবে। মূলতঃ তালাকে কিনায়ার ক্ষেত্রে নিয়ত শর্ত। অথবা, অন্ততঃ পূর্বে এ সংক্রান্ত আলোচনা কিংবা অবস্থা থাকতে হবে, যা তালাকের দিকে ইঙ্গিত বহন করে। যেমন, কোন ব্যক্তি বলল, اَنْتِ حَرَام، اَنْتِ بَائِن (তুমি হারাম, তুমি বিচ্ছিন্ন)। এক্ষেত্রে ব্যক্তির যদি তালাকের নিয়ত থাকে তাহলে তালাক পতিত হবে।

اَلْفَاظُ الطَّلَاقِ বা তালাকের শব্দসমূহঃ

সরীহ তালাকের শব্দ একটি। তাহলো طَلَاق, অতএব এ শব্দ হতে নির্গত সকল শব্দ সরীহ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন-

(১) اَنْتِ طَالِق (তুমি তালাকপ্রাপ্তা)

(২) اَنْتِ مُطَلَّقَة (তুমি তালাকপ্রাপ্তা)

(৩) طَلَّقْتُكِ (তোমাকে তালাক দিলাম)

উল্লেখ্য যে, শাফেঈ ও হাম্বলীদের মতে, সরীহ শব্দ তিনটি। যেমন- طَلَاق – فِرَاح – سَرَاح

কিনায়া তালাকের শব্দাবলী দু'প্রকার। যথা-

১। প্রথম প্রকারের শব্দগুলো হচ্ছে-

(ক) اِعْتَدِيْ (তুমি ইদ্দত পালন কর)

(খ) اِسْتَبْرِئِيْ رِحْمَكِ (তোমার জরায়ু পবিত্র কর)

(গ) اَنْتِ وَاحِدَة (তুমি নিঃসঙ্গিনী)

এগুলোর দ্বারা এক তালাকে রাজঈ পতিত হবে, যদিও কিনায়া শব্দ হোক না কেন। কেননা, এগুলির আগে সরীহ শব্দ উল্লেখ রয়েছে। আর সরীহ শব্দ দ্বারা এক তালাক রাজঈ পতিত হয়।

যেমন- اِعْتَدِّيْ-এর মূলে হল-"طَلَّقْتُكِ فَاعْتَدِّيْ" অর্থাৎ, আমি তোমাকে তালাক দিয়েছি, তাই তুমি ইদ্দত পালন কর।

২। দ্বিতীয় প্রকারের শব্দগুলো হচ্ছে-

(ক) اَنْتِ بَائِنٌ - তুমি পৃথক

(খ) اَنْتِ حَرَامٌ - তুমি হারাম

(গ) اَنْتِ خَالِيَةٌ - তুমি শূন্য

(ঘ) اِبْتَغِي الْاَزْوَاجَ - তুমি স্বামী খোঁজ কর

(ঙ) اَنْتِ بَرِيَّةٌ - তুমি দায়মুক্ত

(চ) حَبْلُكِ عَلٰى غَارِبِكِ - তোমার রশি তোমার ঘাড়ে

(ছ) اِلْحَقِيْ بِاَهْلِكِ - তোমার পরিজনের সাথে মিলিত হও

(জ) سَرَحْتُكِ - আমি তোমাকে মুক্ত করেছি

(ঝ) اَنْتِ حُرَّةٌ - তুমি স্বাধীনা

(ঞ) فَارَقْتُكِ - আমি তোমাকে পৃথক করেছি

(ট) اَمْرُكِ بِيَدِكِ - তোমার সিদ্ধান্ত তোমার হাতে

(ঠ) وَهَبْتُكِ لاَهْلِكِ - তোমার পরিবারের জন্য তোমাকে দান করেছি

(ড) تَخَمَّرِيْ-চাদর দ্বারা তোমার মাথা ঢাক। এ ধরনের আরো অনেক শব্দ রয়েছে।

ঋতুবতী অবস্থায় তালাক প্রদানের হুকুমঃ

* আল্লামা ইবন হযম, ইবন তাইমিয়া এবং হাফেয ইবন কায়্যিম (রহ.)-এর মতে, ঋতুবতী অবস্থায় তালাক অনুষ্ঠিত হবে না।

(المحلى ج۱۰ ص۱٦۱، فيض الباري ج٤ ص۳۱۰، زاد المعاد ج٥ ص۲۲۱)

দলীলঃ হযরত ইবন উমর (রাঃ) তাঁর স্ত্রীকে ঋতু চলাকালীন অবস্থায় তালাক প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে-

... قَالَ قُلْتُ فَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيْقَةِ؟ قَالَ فَمَهْ أَ رَاَيْتَ اِنْ عَجِزَ وَاسْتَحْمَقَ؟ (بخاري ج۲ ص۷۹۰ باب اذا طلقت الحائض، مسلم ج۱ ص٤۷۷، ترمذي ج۱ ص۲۲۲ باب طلاق السنة، نسائي ج۲ ص۹۹ باب الطلاق لغير العدة، ابن ماجة ص۱٤٦)

অর্থাৎ, ... রাবী বলেন, আমি বললাম, সে তালাক ধর্তব্য হবে? উত্তরে তিনি বললেন, থাম। তুমি কি মনে কর? যদি সে অক্ষম হয় ও বোকামি করে?

ইবন তাইমিয়া (রহ.) فَمَهْ-এর এই অর্থ বর্ণনা করেছেন, তুমি তালাক কার্যকর হওয়ার যে ধারণা পোষণ করছ তা থেকে বিরত হও। আর اِنْ عَجِزَ وَاسْتَحْمَقَ-এর অর্থ বর্ণনা করেন যে, শরীয়ত তার পরিবর্তন সাধনের কারণে পরিবর্তিত হবে না। যেহেতু শরীয়তের হুকুম রয়েছে যে, হায়েয অবস্থায় তালাক গ্রহণযোগ্য হবে না। অতএব তা কি পরিবর্তন করা এবং এক তালাক ও তার বোকামি ধর্তব্যে আনা সম্ভব? (درس ترمذي ج٣ ص٤٦٦)

* চার ইমাম সহ জমহুর আলিমগণের মতে, ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দিলে তা কার্যকর হবে। যদিও তা হারাম এবং অপছন্দনীয়।

(بدائع الصنائع ج٣ ص٩٦، المجموع شرح المذهب ج١٦ ص٧٨)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে নবী করীম (সাঃ) হযরত উমর (রাঃ)-কে বললেন- مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا অর্থাৎ, "তুমি তাকে বল তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে।"

উক্ত বাক্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার (رُجُوْع) হুকুম দেয়া হয়েছে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, رُجُوْع (ফিরিয়ে আনা) তখনই সম্ভব, যখন তালাক সংঘটিত হয়। নতুবা ফিরিয়ে আনার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

তাছাড়া তালাক এমন একটা ব্যবস্থা তা যেকোন অবস্থায়, যেকোন সময়ে বলুক না কেন, তা সংঘটিত হবেই।

জবাবঃ ইমাম তাইমিয়া (রহ.)-এর দলীলের জবাবে হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) বলেন, কোন কোন রেওয়ায়েত এ ব্যাপারে স্পষ্ট যে, ইহা তালাক হিসেবে ধরা হয়েছিল। এজন্য হযরত সালিম ইবন আব্দুল্লাহ বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) তাকে এক তালাক দিয়েছিলেন। অতঃপর তার এই তালাক ধর্তব্য হয়েছে। তাছাড়া হযরত ইবন উমর (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি সেই স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি এবং আমি তাকে যে তালাক দিয়েছি, সে তালাক ধর্তব্যে এনেছি।

(مسلم ج١ ص٤٧٦ باب تحريم طلاق الحائض، فيض الباري ج٤ ص٣١٠)

بَابُ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ ص٢٩٨

বিবাহের পূর্বে তালাক

... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّه اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ طَلاَقَ اِلاَّ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ عِتْقَ اِلاَّ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ بَيْعَ اِلاَّ فِيْمَا تَمْلِكُ زَادَبْنُ الصَّبَاحِ وَلاَ وَفَاءَ نَذْرٍ اِلاَّ فِيْمَا تَمْلِكُ– (بخاري ج٢ ص٧٩٣ لا طلاق قبل النكاح، ترمذي ج١ ص٢٢٣ باب لا طلاق قبل النكاح)

অনুবাদঃ ... আমর ইবন শুআয়েব (রহ.) তাঁর পিতা হতে ও পিতা তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, স্ত্রী অধিকারী হওয়া ব্যতীত তালাক হয় না। কোন দাস-দাসীর মালিক হওয়া ব্যতীত তাদের আযাদ করা যায় না। আর কোন জিনিস-পত্রের মালিক হওয়া ছাড়া, উহা বিক্রি করা যায় না। রাবী ইবন আস সাব্বাহ্ অতিরিক্ত বর্ণনা করেন, কোন মালের মালিক হওয়া ব্যতীত উহার মানত করা যায় না।

বিশ্লেষণঃ বিবাহের পূর্বে তালাক দিলে তা কার্যকরী হবে কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ। তথা 'বিবাহের পূর্বে তালাক নেই', এর দুটি অবস্থা রয়েছে।

এক, যদি কোন ব্যক্তি বিবাহের পূর্বে কোন মহিলাকে তাৎক্ষণিকভাবে বলে যে, اَنْتِ طَالِق (তুমি তালাক) তাহলে এ কথার উপর সবাই একমত পোষণ করেন যে, তার উপর তালাক প্রযোজ্য হবে না, ঐ লোক পরে ঐ মহিলাকে বিবাহ করুক বা না করুক। কেননা, যখন সে তালাক দিয়েছিল, তখন সে তার মালিক ছিল না।

দুই, কিন্তু তালাকের সম্পর্ক যদি বিবাহ বা মালিকানার দিকে করা হয়, (যেমন, কেউ বলল, اِنْ نَكَحْتُكِ فَاَنْتِ طَالِق অর্থাৎ "আমি যদি তোমাকে বিয়ে করি, তবে তুমি তালাক") তাহলে এ ব্যাপারে ইমামদের মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম শাফেঈ ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, এমতাবস্থায়ও তালাক হবে না। কেননা, এ ধরনের ঝুলন্ত বাক্য মূল্যহীন ও বাতিল।

দলীলঃ উপরোল্লিখিত হাদীস- "... لاَ طَلاَقَ اِلاَّ فِيْمَا تَمْلِكُ"

উক্ত বাক্যে সাধারণত স্ত্রীর মালিক না হওয়া অবস্থায় তালাক না হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

* ইমাম মালিক, আওযাঈ ও ইবন আবু লায়লা (রহ.)-এর মতে, যদি নির্দিষ্ট কোন মহিলা বা কোন নির্দিষ্ট এলাকা অথবা কোন নির্দিষ্ট গোত্র বা কোন বিশেষ সময়ের উল্লেখ করে, তাহলে ঐ মহিলাকে বিবাহ করলে তালাক হয়ে যাবে। যেমন- কেউ বলল- "اِنْ نَكَحْتُ فُلَانَةً" يَا "اِنْ نَكَحْتُ مِنْ بَلَدَةِ كَذَا أَوْ مِنْ قَبِيْلَةِ كَذَا" يَا "اِنْ نَكَحْتُ فِيْ هٰذَا الشَّهْرِ"–

অর্থাৎ, "আমি যদি অমুককে বিয়ে করি", অথবা "আমি যদি ঐ শহরে বা ঐ গোত্রে বিয়ে করি" অথবা "আমি যদি এই মাসে বিয়ে করি", তাহলে তালাক- এমতাবস্থায় তালাক সংঘটিত হবে। যেহেতু সে নির্দিষ্ট করেছে।

কিন্তু কেউ যদি ব্যাপক আকারে বলে যে, "كُلَّمَا نَكَحْتُ اِمْرَأَةً فَهِيَ طَلَاقٌ"

অর্থাৎ, "যখনই আমি কোন মহিলাকে বিয়ে করব, সেই তালাক"।

তাহলে তালাক পতিত হবে না। কেননা এতে তো বিবাহের দরজাই বন্ধ হয়ে যায়। এর পরে তো কোন মহিলার সঙ্গেই বিয়ের সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে না। তাই তা বাতিলও অগ্রহণযোগ্য। (بذل المجهود ج١٠ ص٢٧٢–٢٧٣)

দলীল (১)ঃ ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, ব্যাপকভাবে এমন উক্তি এই জন্য জায়েয নয়, কারণ বিবাহ হল একটি হালাল বিষয়। তাই ইহা উক্ত বাক্যের দ্বারা পরিপূর্ণভাবে হারাম করে দেয়ার শামিল। আর এ অধিকার কোন মানুষের নেই। তাছাড়া ইবরাহীম নাখঈ (রহ.)-এর একটি আছারও তাঁদের প্রমাণঃ

إِذَا وَقَّتَ اِمْرَأَةً أَوْ قَبِيْلَةً جَازَ وَإِذَا عَمَّ كُلَّ اِمْرَأَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْئٍ– (مصنف عبد الرزاق ج٦ ص٤٢١)

অর্থাৎ, যখন কোন মহিলা অথবা কোন গোত্রকে নির্ধারিত করে, তবে এটা জায়েয। আর যখন সব মহিলাকে ব্যাপকভাবে বলে, তবে সেটা ধর্তব্য নয়।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, শর্ত ব্যাপক আকারে করুক অথবা নির্দিষ্ট কোন মহিলাকে করুক, সর্বাবস্থায় তালাক হয়ে যাবে। (درس مشكوٰة ج٣ ص٣٥)

দলীলঃ ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, কোন উক্তি শর্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত অবস্থায়, যেন শর্ত বাস্তবায়নের পর উক্তিটি করা হয়েছে। তাই কেউ শর্তের সাথে তালাক দিলে তালাক হয়ে যাবে। কেননা, ধরে নেয়া হবে ইহা বিয়ের আগে তালাক নয়, যেন বিয়ের পর এইমাত্র তালাক দেয়া হয়েছে। তিনি এ ব্যাপারে বলেন, যেমন

কেউ বলল- إِنْ مَلَكْتُكِ فَأَنْتِ حُرٌّ অর্থাৎ "আমি যদি তোমার মালিক হই তবে তুমি আযাদ"। অথবা বলল- إِنْ اِشْتَرَيْتُكِ فَأَنْتِ حُرٌّ অর্থাৎ "আমি যদি তোমাকে ক্রয় করি তবে তুমি আযাদ"। তাহলে এরূপ শর্তায়ন জায়েয হবে। (نور الانوار ص١٥٧)

দলীল (২)ঃ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ رَجُلاً أَتٰى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ كُلُّ اِمْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلاَثًا – فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَهُوَ كَمَا قُلْتَ– (مصنف عبد الرزاق ج٦ ص٤٢١)

অর্থাৎ, আবু সালামা ইবন আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর কাছে এসে বলল; আমি যে কোন মেয়েকে বিয়ে করব, সেই তিন তালাক। তখন উমর (রাঃ) তাকে বললেন, এটি তুমি যেমন বলেছ তেমনি।

দলীল (৩)ঃ যদি কেউ মৃত্যুর পূর্বে নিজের সম্পদের এক তৃতীয়াংশ অসীয়ত করে তাহলে এর কার্যকারিতা মৃত্যুর পরেই হবে, অসীয়তের সময় হবে না।

(تنظيم الاشتات ج٢ ص١٩٨)

জবাবঃ হানাফীদের পক্ষ থেকে উল্লিখিত তিন ইমামের দলীলের উত্তর হল, মালিকানার দিকে সম্বন্ধযুক্ত তালাককে অমালিকানার তালাক বলা যায় না। কারণ, তালাক পতিত হবে মালিকানা অর্জনের পর। অতএব, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা হানাফীদের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করা ঠিক নয়। হানাফীদের মতে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসের প্রয়োগ ক্ষেত্র হচ্ছে তাৎক্ষণিক তালাক অথবা এরূপ তালাক যা মালিকানার সাথে ঝুলন্ত। (درس ترمذي ج٣ ص٤٩٢)

এই ব্যাখ্যার সমর্থন একটি আছর দ্বারাও হয়-

"عَنْ مُعْمَّرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيْ رَجُلٍ قَالَ كُلُّ اِمْرَأَةٍ اَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَكُلُّ اَمَةٍ اَشْتَرِيْهَا فَهِيَ حُرَّةٌ قَالَ هُوَ كَمَا قَالَ قَالَ مُعَمَّرٌ فَقُلْتُ اَوَلَيْسَ قَدْ جَاءَ عَنْ بَعْضِهِمْ اَنَّهُ قَالَ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَلاَ عِتَاقَةَ اِلاَّ بَعْدَ الْمِلْكِ قَالَ اِنَّمَا ذٰلِكَ اَنْ يَّقُوْلَ الرَّجُلُ اِمْرَأَةُ فُلاَنٍ طَالِقٌ وَعَبْدُ فُلاَنٍ حُرٌّ"– (مصنف عبد الرزاق ج٦ ص٤٢١)

অর্থাৎ, যুহরী (রহ.) থেকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যে বলেছিল, যত মহিলাকে আমি বিয়ে করব, তারা সবাই তালাক। আর যত বাঁদী আমি ক্রয় করব সবাই আযাদ। যুহরী (রহ.) বললেন, সে যা বলেছে অনুরূপই। মা'মার বলেন, আমি বললাম, কারো কারো থেকে কি বর্ণিত নেই যে, তিনি (রাসূল সঃ) বলেছেন, বিয়ের পূর্বে তালাক নেই এবং মালিকানার পূর্বে আযাদী নেই? উত্তরে তিনি বললেন, এটা তো হল তখন, যখন কোন পুরুষ বলবে, অমুকের স্ত্রী তালাক এবং অমুকের গোলাম আযাদ।

بَابُ فِيْ الطَّلاَقِ عَلٰى غَيْظٍ ص٢٩٨

রাগান্বিত অবস্থায় তালাক দেয়া

... قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ طَلاَقَ وَلاَ عِتَاقَ فِيْ غِلاَقٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْغِلاَقُ اَظُنُّهُ فِيْ الْغَضَبِ– (ابن ماجة ص١٤٨)

অনুবাদঃ ... রাবী (সাফিয়া বিনত শায়বা) বলেন, আমি আয়িশা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, গিলাক অবস্থায় কোন তালাক হয় না বা দাস মুক্ত করা যায় না। ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন, আমার ধারণা 'গিলাক' অর্থ হল রাগান্বিত অবস্থায় তালাক প্রদান করা।

বিশ্লেষণঃ غِلاَق (গিলাক) শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) اِكْرَاه তথা বাধ্যকরণ, বলপ্রয়োগ, বাধ্যবাধকতা, জবরদস্তি, বন্ধকরণ, তালাবদ্ধকরণ ইত্যাদি।

(২) غَضَب তথা রাগান্বিত, ক্রোধান্বিত ইত্যাদি।

প্রশ্ন হল, যদি কোন ব্যক্তিকে বলপ্রয়োগের (غِلاَق) মাধ্যমে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য বাধ্য করা হয়, তাহলে স্ত্রীর উপর তালাক কার্যকর হবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল, হাসান বসরী, আতা ও মুজাহিদ (রহ.)-এর মতে, জবরদস্তির (اِكْرَاه) মাধ্যমে যে তালাক দেয়া হয়, তা সংঘটিত হবে না।

দলীল (১)ঃ উপরোল্লিখিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ নবী করীম (সাঃ) বলেন-

عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِيْ عَنْ اُمَّتِيْ الْخَطَاءَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ– (ابن ماجة ص١٤٨ باب طلاق المكره والناسي)

অর্থাৎ, আবু যর গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ আমার উম্মতের ভুল-বিস্মৃতি ও জোরপূর্বক কোন কাজ বাধ্য করা হলে তা ক্ষমা করে দিয়েছেন।

* ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখঈ (রহ.)-এর মতে, জবরদস্তির মাধ্যমে প্রদত্ত তালাক সংঘটিত হবে।

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- "فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ"
অর্থাৎ, তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের ইদ্দতের মধ্যে তালাক দাও। (তালাকঃ ১)
উক্ত আয়াতে তালাকের ক্ষেত্রে যে হুকুম প্রদান করা হয়েছে তা ব্যাপক ও শর্তহীন। জবরদস্তি অবস্থায় হোক বা না হোক। এমন কোন শর্তারোপ করা হয়নি।

দলীল (২)ঃ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ اِلاَّ طَلَاقَ الْمَعْتُوْهِ الْمَغْلُوْبِ عَلٰى عَقْلِهٖ— (بخاري ج٢ ص٧٩٤ باب الطلاق في الاغلاق الخ، ترمذي ج١ ص٢٢٦ باب طلاق المعتوه)
অর্থাৎ, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, সব তালাকই জায়েয (তথা সংঘটিত হয়)। শুধুমাত্র মাতূহ তথা পাগলের তালাক ব্যতীত।
আল্লামা ইবন হুমাম বলেন, জবরদস্তি অবস্থায় প্রদত্ত তালাক কার্যকর হবে। কেননা, জবরদস্তি অবস্থায় মুখ থেকে তালাকের যে সকল শব্দ বের হয় তা নিজের ইচ্ছায়ই (اخْتِيَار) বের হয়। (এমন নয় যে, তার কণ্ঠনালীতে তলোয়ার বা অন্য কোন জিনিস রাখতেই তার ইচ্ছা ব্যতীত তালাকের শব্দ বের হয়ে যায়। যেমনটি আমরা দেখি খেলনা জাতীয় জিনিসপত্রে। সেখানে সুইচ বা তার সংযোগ দিলেই যন্ত্রের ইচ্ছা ব্যতীতই গান বাজতে থাকে, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এমনটি নয়।) যদিও সে এতে রাজি থাকে না। আর তালাকের ক্ষেত্রে اِخْتِيَار (ইচ্ছা) শর্ত, স্বাচ্ছন্দ্য বা সন্তুষ্ট থাকা শর্ত নয়। কেননা مُكْرَه (বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তি)-এর ইচ্ছা কখনো سَلْب (বিলুপ্ত) হয় না। কিন্তু نَائِم، مَجْنُوْن، صَبِيّ বা ঘুমন্ত ব্যক্তি, পাগল ও ছোট শিশুর কথা ভিন্ন। কেননা তাদের ইচ্ছাই নেই। (تنظيم الاشتات ج٢ ص٢٠٠-٢٠١، درس مشكوٰة ج٣ ص٣٦)

প্রতিপক্ষের দলিলের জবাবঃ ১। উল্লিখিত তিন ইমাম যে হাদীস পেশ করেছেন তা খবরে ওয়াহেদ, যা কুরআনের আয়াতের মোকাবিলায় দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।
২। অথবা, উক্ত হাদীসে এই কথা বলা হয়েছে যে, তালাক প্রদান ও দাসমুক্তির ব্যাপারে যেন জবরদস্তি করা না হয়। কিন্তু যদি জবরদস্তি করা হয়, তবে এর বিধান কি হবে, তা উক্ত হাদীসে বলা হয়নি।
৩। অথবা "لَا طَلَاقَ فِيْ غِلَاقٍ"-এর অর্থ হল-

لَا يُغْلَقُ التَّطْلِيْقَاتُ دَفْعَةً وَاحِدَةً حَتّٰى لَا يَبْقٰى شَيْئٌ

অর্থাৎ, "তিন তালাককে একই সাথে বন্ধ করিও না (বা দিয়ে দিও না) যে, কিছুই বাকি থাকল না।" বরং সুন্নত তরীকায় তালাক প্রদান কর। আর তা হল, তিন তুহুরে তিন তালাক প্রদান করা। (تنظيم الاشتات ج٢ ص٢٠١، درس مشكوة ج٣ ص٣٦)

* দ্বিতীয় দলিলে উম্মত থেকে জবরদস্তি উঠিয়ে নেয়ার কথা যে বলা হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, إِكْرَاه عَلَى الْكُفْر অর্থাৎ কোন মুসলমানকে যদি জবরদস্তির মাধ্যমে কুফরী বা শিরকী বাক্য উচ্চারণ করানো হয়, কিন্তু তার অন্তরে যদি তাওহীদের বিশ্বাস থাকে, তাহলে ঐ জবরদস্তিমূলক কুফরী বাক ধর্তব্য হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ পাগল, মাতাল, অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু, ঘুমন্ত ব্যক্তি ও নেশাগ্রস্ত বেহুঁশ ব্যক্তির তালাক।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ اِلاَّ طَلَاقَ الْمَعْتُوْهِ الْمَغْلُوْبِ عَلٰى عَقْلِهٖ– [পূর্বে হাদীসটির অর্থ দেয়া হয়েছে]

হাদীসে উল্লিখিত "كُلُّ طَلَاقٍ" (প্রত্যেক তালাকই)-তে সীমাবদ্ধতা আপেক্ষিক। অন্যথায় যদি সীমাবদ্ধতা যৌক্তিক মেনে নেয়া হয়, তাহলে শিশুর তালাকও পতিত হওয়া আবশ্যক হবে। অথচ ব্যাপারটি তা নয়। এজন্য এখানে সীমাবদ্ধতা আপেক্ষিক সাব্যস্ত করা হবে। যেমন, জ্ঞানবান লোকের দিকে লক্ষ্য করে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। (تشريح المسك الذكى ج١ ص٣٣٠)

* আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, পাগল এবং অনভিজ্ঞ অবুঝ লোকের তালাক না হওয়ার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। অতঃপর তালাক না হওয়ার হুকুম ঘুমন্ত ও বেহুঁশ ব্যক্তি ইত্যাদিকেও অন্তর্ভুক্ত করে। (عمدة القاري ج٢٠ ص٢٥١)

* এখানে একটি ধারণা হতে পারে যে, উপরিউক্ত মাজুরগণ ও নেশ্রাগ্রস্ত বেহুঁশের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কারণ, তাদের কারো মধ্যেই তখন হুঁশ-জ্ঞান ও অনুভব শক্তি থাকে না। সুতরাং যেরূপভাবে তাদের তালাক সংঘটিত হয় না, এরূপভাবে নেশাগ্রস্ত বেহুঁশেরও তালাক সংঘটিত না হওয়া উচিত। অথচ ইমাম আবু হানীফা, মালিক, হাসান বসরী, ইবরাহীম নাখঈ, আওযাঈ, সুফিয়ান সাওরী ও ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এ উক্তি অনুযায়ী তার তালাক হয়ে যাবে। কারণ, পাগল ও অনভিজ্ঞ অবুঝ লোকের জ্ঞান পরাভূত ও দুর্বল হওয়ার কারণ কুদরতী ও অনৈচ্ছিক। এরূপভাবে ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুম যদিও বাহ্যত ঐচ্ছিক বুঝা যায়, কিন্তু বাস্তবতা হল এটাও অনৈচ্ছিক। চিন্তা-ফিকির করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। (فتح الباري ج٩ ص٣٩١)

পক্ষান্তরে, নেশাগ্রস্ত বেহুঁশ ব্যক্তির বিবেক যদিও পরাস্ত, কিন্তু যেহেতু তার বিবেক পরাস্ত হয়েছে নিজের ইচ্ছা ও স্বউপার্জিত। অতএব, তার তালাক কার্যকর হবে।

(الكوكب الدري ج٢ ص٢٦٩–٢٧٠، درس ترمذي ج٣ ص٥٠٧–٥٠٨)

بَابُ بَقِيَّةِ نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيْقَاتِ الثَّلاَثِ ص٢٩٨

তিন তালাক প্রদানের পর, পুনঃগ্রহণ বাতিল হওয়া সম্পর্কে অবশিষ্ট হাদীস

... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيْدَ اَبُوْ رُكَانَةَ وَ اِخْوَتِهِ اُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا يُغْنِي عَنِّيْ اِلاَّ كَمَا يُغْنِي هٰذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ اَخَذَتْهَا مِنْ رَّأْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَاِخْوَتِهِ ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِهِ اَ تَرَوْنَ فُلاَنًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا قَالُوْا نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيْدَ طَلِّقْهَا فَفَعَلَ قَالَ رَاجِعْ اِمْرَأَتَكَ اُمَّ رُكَانَةَ وَاِخْوَتِهِ فَقَالَ اِنِّيْ طَلَّقْتُهَا ثَلٰثًا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ رَاجِعْهَا وَتَلاَ- يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ ... اَنَّ رُكَانَةَ اِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً-

অনুবাদঃ ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রুকানার পিতা আবদ ইয়াযীদ, উম্মে রুকানাকে তালাক প্রদান করেন এবং মুযায়না গোত্রের জনৈক স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন। সেই মহিলা নবী করীম (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলে, সে সহবাসে অক্ষম, যেমন আমার মাথার চুল অন্যচুলের কোন উপকারে আসে না। কাজেই আপনি তার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিন। এতদশ্রবণে নবী করীম (সাঃ) রাগান্বিত হন এবং তিনি রুকানা ও তার ভাইদেরকে আহবান করেন। এরপর তিনি সেখানে উপস্থিত তার সাথীদের সম্বোধন করে বলেন, তোমরা লক্ষ্য করে দেখ যে, এদের মধ্যে অমুক অমুকের বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের পিতা আবদ ইয়াযিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে মিল খাচ্ছে না? তখন তারা বলেন, হাঁ। নবী করীম (সাঃ) আব্‌দ ইয়াযীদকে বলেন, তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও। তিনি তাকে তালাক দিলেন। এরপর তিনি তাঁকে নির্দেশ দেন যে, তুমি উম্মে রুকানাকে পুনরায় গ্রহণ কর। তখন তিনি বলেন, আমি তো তাকে তিন তালাক প্রদান করেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বলেন, আমি তোমার তালাক প্রদানের কথা অবগত আছি। তুমি তাকে পুনরায় গ্রহণ কর। এরপর তিনি কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করেন, “হে নবী! যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক প্রদান করবে, তখন তাদেরকে ইদ্দত পালনের জন্য তালাক দিবে।” আবু দাউদ (রহ.) বলেন, ... রুকানা তার স্ত্রীকে ‘আলবাত্তা’ (নিশ্চিত) তালাক দেয় এবং নবী করীম (সাঃ) একে এক তালাক হিসেবে গণ্য করেন।

বিশ্লেষণঃ যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একই কথা দ্বারা বা একই মজলিশে তিন তালাক দেয়, তাহলে এর হুকুম কি হবে- এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ
(১) শিয়ায়ে জাফরিয়াদের মতে, এভাবে তালাক দিলে কোন তালাক হবে না। (শিয়ায়ে হিল্লী এ ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন।)

(شرائع الإسلام ج٢ ص٥٧، فتح الملهم ج١ ص١٥٣)

হাজ্জাজ ইবন আরতাত, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক এবং ইবন মুকাতিনের দিকেও এই উক্তিটি সম্বন্ধযুক্ত। (شرح مسلم ج١ ص٤٧٨)

(২) কতক আহলে যাহির, আল্লামা ইবন তাইমিয়া, আল্লামা ইবনুল কায়্যিম, ইকরামা (রহ.) প্রমুখের মতে, এভাবে তিন তালাক দিলে কেবল এক তালাক কার্যকর হবে এবং স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে পারবে।
অনেকেই বলেন যে, স্ত্রীর সাথে যদি সহবাস হয়ে থাকে, তবে তিন তালাক, আর যদি সহবাস না হয়ে থাকে, তবে এক তালাক কার্যকর হবে।

(فتح القدير ج٣ ص٣٢٩، المغني ج٧ ص١٠٤، شرح مسلم ج١ ص٤٧٨، زاد المعاد ج٥ ص٢٤٨)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত উম্মে রুকানার হাদীস বা ঘটনা।
উক্ত হাদীসে লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হয় যে, রুকানার পিতা রুকানার মাতাকে তিন তালাক প্রদান করা সত্ত্বেও নবী করীম (সাঃ) তাকে ফিরিয়ে নেয়ার হুকুম দেন। সুতরাং বুঝা যায় যে, এক সাথে তিন তালাক দিলে তা এক তালাকে রাজঈ হয়। নতুবা নবী করীম (সাঃ) এমন হুকুম দিতেন না।

দলীল (২)ঃ ... اَنَّ اَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ اَ تَعْلَمُ اِنَّمَا كَانَتِ الثَّلٰثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِيْ بَكْرٍ وَّثَلاَثًا مِّنْ اِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ– (ابو داؤد ج١ ص٢٩٩ باب بقية نسخ المراجعة، مسلم ج١ ص٤٧٨ باب صلاق الثلاث، نسائي ج٢ ص١٠٠ باب طلاق الثلث المتفرقة الخ)

অর্থাৎ, ... একদা আবু সাহবা (রহ.) ইবন আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি অবগত আছেন যে, নবী করীম (সাঃ)-এর যুগে এবং উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের তিন বছর তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হত? ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, হাঁ।

* চার ইমাম এবং সকল মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণের মতে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে একই কথায় বা একই মজলিশে তিন তালাক দেয়, তাহলে তা তিন তালাকে বায়েনা মুগাল্লাযা হিসেবে গণ্য হবে। যদিও সে ভীষণ গোনাহগার হবে, তবুও সে উক্ত স্ত্রীকে হিলা (حِيْلَة) ব্যতীত গ্রহণ করতে পারবে না।

[উল্লেখ্য যে, উক্ত হুকুমটি مَدْخُوْل بِهَا (সঙ্গমকৃতা) স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু স্ত্রী যদি غَيْرُ مَدْخُوْل بِهَا (অসঙ্গমকৃতা) হয়, তাহলে এমতাবস্থায় হানাফীদের নিকট বিশ্লেষণ হল, যদি এক সঙ্গে তিনতালাক দেয়, যেমন বলল- "اَنْتِ طَالِق ثَلاثًا" তুমি তিন তালাক) এমতাবস্থায়ও একসাথে তিন তালাক কার্যকর হবে। কিন্তু যদি পৃথক শব্দ দ্বারা তিন তালাক দেয়, যদিও তা একই মজলিশে হোক না কেন। যেমন, বলল- اَنْتِ طَلاَق طَالِق طَالِق (তুমি তালাক,তালাক, তালাক) তাহলে এক তালাকে বায়েন হবে, কেননা অন্য দুই তালাকের জন্য তো ক্ষেত্রই অবশিষ্ট থাকবে না।]

(هداية ج٢ ص٣٧١)

দলীল (১)ঃ হযরত সাহল ইবন সাদ আস-সা'দী (রাঃ) হতে এক দীর্ঘ রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, উয়ামির নবী করীম (সাঃ)-কে বলেন-

... كَذَّبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَّأْمُرَه رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– (بخاري ج٢ ص٧٩١ بَابُ مَنْ اَجَازَ الطَّلاَق الثَّلاَث)

অর্থাৎ, "... ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি তাকে রেখে দেই, তাহলে তার প্রতি আমি মিথ্যা আরোপ করলাম। অতঃপর তিনি তাকে তিন তালাক দিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে নির্দেশ দেয়ার পূর্বেই।"

উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, যদি এক শব্দ দ্বারা তিন তালাক দেয়া হয়, তাহলে তা কার্যকর হবে।

উল্লেখ্য যে, হাদীস শাস্ত্রের ইমাম, হযরত বুখারী (রহ.) সরাসরি জমহুরের মাযহাব অনুযায়ী এ ব্যাপারে بَابُ مَنْ اَجَازَ الطَّلاَق الثَّلاَث নামে একটি আলাদা অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত করেছেন।

দলীল (২)ঃ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اَنَا بِنْتُ اٰل خَالِدٍ وَاِنَّ زَوْجِيْ فُلاَنًا أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلاَقِيْ، وَإِنِّيْ سَأَلْتُ أَهْلَه النَّفَقَةَ وَالسُّكْنٰى فَأَبَوْا عَلَيَّ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّه أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلاَثِ تَطْلِيْقَاتٍ، فَقَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنٰى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ– (نسائي ج٢ ص١٠٠ باب الرخصة في ذٰلك)

অর্থাৎ, "ফাতিমা বিনত কায়েস আমাকে (শাবী) হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে এসে বললাম, আমি খালিদ পরিবারের

মেয়ে। আমার স্বামী আমার নিকট আমার তালাকের সংবাদ প্রেরণ করেছেন। আমি তার পরিবারের নিকট খোরপোষের আবেদন করেছি। তারা আমাকে তা দিতে অস্বীকার করেছে। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার স্বামী তার কাছে তিন তালাকের সংবাদ পাঠিয়েছেন। তখন ফাতিমা (রাঃ) বললেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, খোরপোষ ও বাসস্থান মহিলার জন্য হবে কেবল তখন, যখন তার স্বামীর জন্য তাকে ফিরিয়ে আনার অধিকার থাকে।"

এতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নবী করীম (সাঃ) তিন তালাকের অবস্থায় স্বামীকে ফিরিয়ে আনার অধিকার দেননি।

দলীল (৩)ঃ তাবারানী হযরত ইবন উমর (রাঃ) কর্তৃক হায়েয অবস্থায় তালাকের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যার শেষাংশটুকু হল-

... فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ طَلَّقْتُهَا ثَلاَثًا كَانَ لِيْ أَنْ أُرَاجِعَهَا قَالَ إِذًا بَانَتْ مِنْكَ وَكَانَتْ مَعْصِيَةً– (مجمع الزوائد ج٤ ص٢٣٦ باب طلاق السنة وكيف الطلاق)

অর্থাৎ, ... অতঃপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি তাকে তিন তালাক দিতাম, তবে কি আমি তাকে ফিরিয়ে আনার অধিকার রাখতাম? তিনি বললেন, তখন সে তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত এবং এটা তোমার জন্য হত গুনাহের কাজ।

দলীল (৪)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدِ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ–

অর্থাৎ, তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়া হয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। (বাকারাঃ ২৩০)

তাফসীরে ইবন কাসীরসহ অন্যান্য তাফসীরে এই আয়াতের তাফসীর এভাবে করা হয়েছে যে, দুই তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার অধিকার স্বামীর রয়েছে। এই দুই তালাক একসাথে প্রদান করুক অথবা পৃথক পৃথক ভাবে। পক্ষান্তরে তিন তালাকের পর (এই তিন তালাক একসাথে দিক অথবা পৃথক পৃথক ভাবে) স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার অধিকার স্বামীর নেই। ইসলামের ঊষালগ্নে মানুষের এ অবস্থা ছিল যে, স্ত্রীকে অসংখ্য তালাক প্রদান করত, এমনকি শত শত হাজার হাজার তালাক দিত এবং ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার সময় নিকটবর্তী হলে তাকে ফিরিয়ে আনত। এমতাবস্থায় উল্লিখিত আয়াতটি নাযিল হয় যে, তিন তালাকের পর ফিরিয়ে আনার আর অধিকার নেই। (ابن كثير ج١ ص٢٧١)

উল্লেখ্য যে, উক্ত আয়াতে হুকুম দেয়া হয়েছে যে, তিন তালাকের পর আরেকটি বিবাহ ব্যতীত স্ত্রী গ্রহণ করা হারাম। একসাথে তিন তালাক দেয়া হোক অথবা পৃথকভাবে তিন তালাক দেয়া হোক এমন কোন শর্ত বা বিশ্লেষণ করা হয়নি।
যেমন, যায়েদ ইবন ওহাবের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রাঃ)-এর খেদমতে এরূপ এক ব্যক্তিকে পেশ করা হয়েছিল, যে তার স্ত্রীকে এক হাজার তালাক দিয়েছিল। জিজ্ঞাসাবাদ করলে লোকটি ওযর পেশ করে বলল, "اِنَّمَا كُنْتُ اَلْعَبُ" অর্থাৎ, আমি কেবল ক্রীড়া-কৌতুক করেছিলাম। এরপর হযরত উমর (রাঃ) তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন এবং বলেছিলেন-
"اِنَّمَا يَكْفِيْكَ مِنْ ذٰلِكَ ثَلَاثَةٌ" অর্থাৎ, তোমার জন্য তো তিন তালাকই যথেষ্ট ছিল।
সুতরাং, একসাথে তিন তালাক দিলে তা অবশ্যই পতিত হবে। যদিও এমনটি করা ভীষণ গুনাহের কাজ। (مصنف عبد الرزاق ج٦ ص٣٩٣)

দলীল (৫)ঃ সাহাবায়ে কিরামের এ ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, তিন তালাক প্রদানের দ্বারা তিন তালাকই পতিত হবে। (এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- شرح معاني الآثار ج٢ ص٢٩، فتح الباري ج٩ ص٣٢٥، فتح القدير ج٣ ص٣٣٠)

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ হযরত রুকানা (রাঃ)-এর তালাকের ঘটনার ব্যাপারে বিপরীতমুখী (مُخْتَلِف) রেওয়ায়েত রয়েছে। কতক রেওয়ায়েতে তিন তালাকের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন- ... فَقَالَ اِنِّيْ طَلَّقْتُهَا ثَلٰثًا يَا رَسُوْلَ اللهِ ...
(অনুচ্ছেদের শুরুতে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।)
আবার, অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীসের শেষাংশসহ কতক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে- اَنَّ رُكَانَةَ اِنَّمَا طَلَّقَ امْرَاَتَهُ الْبَتَّةَ فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً
সুতরাং রেওয়ায়েত ভিন্ন হওয়ার কারণে হাদীসটি দলীলযোগ্য নয়।
এতদ্ব্যতীত হাদীসে উল্লেখ আছে যে-
... عَنْ نَافِعِ ابْنِ جُبَيْرِ ابْنِ عَبْدِ يَزِيْدَ بْنِ رُكَانَةَ اَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيْدَ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ فَاَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذٰلِكَ وَقَالَ وَاللهِ مَا اَرَدْتُّ اِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَا اَرَدْتَّ اِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رُكَانَةُ وَاللهِ مَا اَرَدْتُّ اِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِيْ زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّالِثَةِ فِيْ زَمَانِ عُثْمَانَ– (ابو داود ج١ ص٣٠٠ باب في البتة، ترمذي ج١ ص٢٢٢ باب الرجل طلق امراته البتت، ابن ماجة ص١٤٩)

অর্থাৎ, ... নাফি ইবন জুবায়ের ইবন আবদ ইয়াযীদ ইবন রুকানা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রুকানা ইবন আবদ ইয়াযীদ তাঁর স্ত্রী সুহায়মাকে 'আলবাত্তাতা' শব্দের দ্বারা তালাক প্রদান করে। তখন এতদসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অবহিত করা হয়। তখন তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি এর দ্বারা এক তালাকের ইচ্ছা করি। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহর শপথ, তুমি কি এর দ্বারা এক তালাকের ইচ্ছা করেছ? তখন জবাবে রুকানা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি এর দ্বারা এক তালাকের ইচ্ছা করি। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে স্বীয় স্ত্রী পুনরায় গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি উমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে তাকে দ্বিতীয় তালাক দেন এবং তৃতীয় তালাক প্রদান করেন উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে।

আবু দাউদ (রহ.) উক্ত হাদীসটিকে দুটি কারণে অগ্রাধিকার (تَرْجِيْح) দিয়েছেন-

(১) এই রেওয়ায়েতটি রুকানা (রাঃ)-এর বংশের লোক থেকে বর্ণিত। যাঁরা এ ব্যাপারে অন্যের তুলনায় অধিক জ্ঞাত।

(২) তিন তালাক বিশিষ্ট হাদীসের রেওয়ায়েতটি مُضْطَرِب (অসঙ্গতিপূর্ণ)। কেননা কতক রেওয়ায়েতে তালাক প্রদানকারীর নাম রুকানা উল্লেখ করা হয়েছে। (مسند احمد ج١ ص٢٦٥) কতক রেওয়ায়েতে আবু রুকানা উল্লেখ করা হয়েছে। (ابو داود ج١ ص٢٩٨)

অথচ উক্ত (اَلْبَتَّة-বিশিষ্ট) হাদীসটি এমন অসঙ্গতি হতে মুক্ত। বরং এখানে ঘটনার নায়ক সুনির্দিষ্ট। আর তিনি হলেন হযরত রুকানা (রাঃ)।

মূল কথা হল, রুকানা স্বীয় স্ত্রীকে তিন তালাক দেননি, বরং বলেছিলেন-

اَنْتِ طَالِقٌ اَلْبَتَّة অর্থাৎ, তুমি নিশ্চিত (আলবাত্তা) তালাক।

কিন্তু কতক বর্ণনাকারী এর শাব্দিক অর্থ করতে গিয়ে আলবাত্তা তালাককে তিন তালাক দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তাঁরা এ ব্যাপারটি লক্ষ্য করেননি যে, আলবাত্তা শব্দ দ্বারা রুকানা (রাঃ) এক তালাকের নিয়ত করেছেন। কেননা, এর দ্বারা যদি তিনি তিন তালাকের উদ্দেশ্য নিতেন, তাহলে নবী করীম (সাঃ)-এর বারবার এক তালাকের উপর কসম নেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। (درس ترمذي ج٣ ص٤٧٩)

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ (১) ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসটি মানসূখ হয়ে গেছে। আর এর রহিতকারী হল সাহাবাদের ইজমা। হযরত উমর (রাঃ)-এর যুগে তিনি যখন দেখলেন যে, নবী করীম (সাঃ) ও আবুবকর (রাঃ)-এর সময়ে মানুষের মাঝে

স্বীয় স্বার্থের চেয়ে ধার্মিকতা ছিল অধিক প্রাধান্য বিস্তারকারী এবং সাধারণভাবে তখন এক তালাকেরই রেওয়াজ ছিল। তাই কোন লোক যদি তিন তালাকের শব্দ ব্যবহার করত, তাহলে তা মূলতঃ এক তালাকের তাকীদ বুঝানোর জন্য বলত এবং পরে তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে সত্য সত্য বলে দিত যে, সে মূলত এক তালাকেরই নিয়ত করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে হযরত উমর (রাঃ) লক্ষ্য করলেন যে, মানুষ মিথ্যা বলে হারামে লিপ্ত হচ্ছে এবং তিন তালাক দিয়ে বলত যে, সে এক তালাক দিয়েছে। তাই উমর (রাঃ) মানুষকে হারাম থেকে বাঁচানোর জন্য ঘোষণা করলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি তিনবার তালাকের শব্দ ব্যবহার করে, তাহলে তাকীদের ওযর গ্রহণযোগ্য হবে না এবং বাহ্যিক শব্দসমূহের উপরই ফায়সালা হবে এবং তা তিন তালাকে পরিণত হবে। এ ব্যাপারে সাহাবাদের থেকে পরামর্শ নিয়েছেন এবং কেউ এতে কোনপ্রকার ইখতিলাফ করেননি। সুতরাং এতে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বয়ং ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন-

بَلٰى كَانَ الرَّجُلُ اِذَا طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ ثَلَاثًا اَنْ يَّدْخُلَ بِهَا جَعَلُوْهَا وَاحِدَةً عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِيْ بَكْرٍ وَّصَدْرًا مِّنْ اِمَارَةِ عُمَرَ فَلَمَّا رَاَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوْا فِيْهَا قَالَ اَجِيْزُوْهُنَّ عَلَيْهِمْ– (ابو داود ج١ ص٢٩٩ باب بقية نسخ المراجعة الخ)

অর্থাৎ, হাঁ, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বে তাকে তিন তালাক দান করত, তাঁরা একে রাসূলুল্লাহ (সাঃ), আবুবকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের প্রথম দিকে এক তালাক গণ্য করত। অতঃপর তিনি (উমর) যখন দেখেন যে, মানুষ অধিক হারে তিন তালাক দিচ্ছে তখন তিনি বললেন, এতে তাদের উপর তিন তালাক বর্তাবে।

ইবন আব্বাস (রাঃ) এর হাদীস সরাসরি জমহুরদের অনুরূপ। সুতরাং বর্ণনাকারীর স্বীয় রেওয়ায়েতের বিপরীত হাদীস দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, ঐ হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে।

(২) অথবা, তাঁরা দলীল হিসেবে ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর যে রেওয়ায়েতটি উপস্থাপন করেছেন তা বিরল (شَاذ) যা কুরআনের আয়াত, সহীহ হাদীসসমূহ এবং সাহাবাদের ইজমার বিপরীত। সুতরাং ইহা দলীলযোগ্য নয়।

(৩) অথবা, রেওয়ায়েতে উল্লিখিত সকল বিশ্লেষণ غَيْر مَدْخُوْل بِهَا (অসঙ্গমকৃতা স্ত্রী)-এর ব্যাপারে। মূলতঃ নবী করীম (সাঃ)-এর যুগে লোকেরা অসঙ্গমকৃতা স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে বলত- أَنْتِ طَالِق، أَنْتِ طَالِق، أَنْتِ طَالِق (তুমি তালাক, তুমি তালাক, তুমি তালাক); আর এমতাবস্থায় যেহেতু প্রথম তালাক বলাতেই

অসঙ্গমকৃতা স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়ে যেত, তাই বাকি তালাকের সুযোগই ছিল না। তাই তা এক তালাকে বায়েন হিসেবে গণ্য হত।
পক্ষান্তরে হযরত উমর (রাঃ)-এর যুগে লোকেরা অসঙ্গমকৃতা স্ত্রীর তালাকের ক্ষেত্রে বলত- أَنْتِ طَالِق ثَلاَثًا (তুমি তিন তালাক)। ফলে হযরত উমর (রাঃ) তিন তালাক সংঘটিত হওয়ার হুকুম দেন এবং এর উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়।
(نسائي ج٢ ص١٠٠ باب طلاق الثلاث المتفرقة الخ)

بَابُ فِيْ الظِّهَارِ ص٣٠١ ঃ যিহার

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ الْبَيَاضِيُّ قَالَ كُنْتُ امْرَأً اُصِيْبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لاَ يُصِيْبُ غَيْرِيْ فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْتُ اَنْ اُصِيْبَ مِنْ اِمْرَاَتِيْ شَيْئًا يُّتَابِعُ بِيْ حَتّٰى اُصْبِحَ فَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتّٰى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَبَيْنَمَا هِيَ تَخْدِمُنِيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ اِذَا تَكَشَّفَ لِيْ مِنْهَا شَيْئٌ فَلَمْ اَلْهَثْ اَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا فَلَمَّا اَصْبَحْتُ خَرَجْتُ اِلٰى قَوْمِيْ فَاَخْبَرْتُهُمُ الْخَبَرَ وَقُلْتُ امْشُوْا مَعِيَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا لاَ وَاللهِ فَانْطَلَقْتُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرْتُه فَقَالَ اَنْتَ بِذٰكَ يَا سَلَمَةُ قُلْتُ اَنَا بِذٰكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَرَّتَيْنِ وَاَنَا صَابِرٌ لاَمْرِ اللهِ فَاحْكُمْ فِيْ بِمَا اَرَاكَ اللهُ قَالَ حَرِّرْ رَقَبَةً قُلْتُ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا وَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِيْ قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ هَلْ اَصَبْتُ الَّذِيْ اَصَبْتُ اِلاَّ مِنَ الصِّيَامِ قَالَ فَاَطْعِمْ وَسَقًا مِّنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا وَحْشَيْنِ مَا لَنَا مِنْ اِطْعَامٍ قَالَ فَانْطَلِقْ اِلٰى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِيْ زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا اِلَيْكَ فَاَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا وَّسَقًا مِّنْ تَمْرٍ وَكُلْ اَنْتَ وَعِيَالُكَ بَقِيَّتَهَا فَرَجَعْتُ اِلٰى قَوْمِيْ فَقُلْتُ وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّيْقَ وَسُوْءَ الرَّأْيِ وَوَجَدْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَةَ وَحُسْنَ الرَّأْيِ وَقَدْ اَمَرَنِيْ بِصَدَقَتِكُمْ- (ترمذي ج١ ص٢٧٧ باب كفارة الظهار، ابن ماجة ص١٥٠)

অনুবাদঃ ... সালামা ইবন সাখার হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনুল আলা আল-বায়াদী বলেছেন, স্ত্রীদের সাথে সহবাসে আমি খুবই সফল ছিলাম। আর আমার মত সহবাসে সামর্থবান ব্যক্তি আর কেউ ছিল না। এরপর মাহে রমযান সমাগত হওয়াতে আমার আশংকা হয় যে, হয়ত আমি সকাল বেলাতেও আমার স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হতে পারি। তখন আমি তার সাথে যিহার করি এবং এমতাবস্থায় মাহে রমযান প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে। কিন্তু একদা রাতে সে আমার খিদমতের সময়, তার সৌন্দর্য আমার সম্মুখে উন্মোচিত হওয়ায়, আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে অসমর্থ হই এবং তার সাথে সহবাস করি। এরপর সকাল বেলা আমি আমার গোত্রের লোকদের নিকট গমন করি এবং তাদের নিকট এ ঘটনা ব্যক্ত করি এবং তাদেরকে বলি, তোমরা আমার সাথে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট চল। তারা বলে, আল্লাহর শপথ! আমরা তোমার সাথে গমন করব না। তখন আমি একাই নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট গমন করি এবং তাকে সব খুলে বলি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে সালামা! তুমি কি এরূপ কাণ্ড করেছ? আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এরূপই করেছি এবং তা দুবার বলি। আর এমতাবস্থায় আমি আল্লাহ তাআলার নির্দেশের প্রতি ধৈর্যধারণকারী। এখন আল্লাহ যা বলেছেন, সে হিসেবে আমার উপর হুকুম জারী করুন। তিনি বলেন, তুমি একজন দাসী মুক্ত কর। আমি বলি, ঐ আল্লাহর শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, এ ব্যতীত আমার আর কোন দাসী নেই এবং এই বলে আমি তার শরীর স্পর্শ করি। তিনি বলেন, তবে তুমি দু'মাস রোযা রাখ। তিনি (সালামা) বলেন, রোযার মধ্যে আমি যে মুসীবতে পড়েছি, হয়ত সেরূপ মুসীবতে আবার পড়তে পারি। তিনি বলেন, এমতাবস্থায় তুমি ষাটজন মিসকীনকে তৃপ্তি সহকারে এক ওয়াসাক খুরমা খাওয়াও। তিনি বলেন, ঐ আল্লাহর শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আমরা (স্ত্রী, পরিবার) তো রাতে অনাহারে থাকি, আর আমাদের কোন খাবারই নেই। তিনি বলেন, তুমি বনী যরীক গোত্রের সদকা আদায়কারী ব্যক্তির নিকট গমন কর, সে তোমাকে খুরমা প্রদান করবে। আর তদ্দারা তুমি ষাটজন মিসকীনকে তৃপ্তি সহকারে এক ওয়াসাক খুরমা খাওয়াবে এবং তুমি ও তোমার পরিজনবর্গও বাকী অংশ খাবে। তখন আমি আমার কওমের নিকট ফিরে এসে বলি, আমি তোমাদের নিকট সংকীর্ণতা ও দুর্ব্যবহার পেয়েছি এবং আমি নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট উদারতা ও উত্তম পরামর্শ পেয়েছি। তিনি আমাকে তোমাদের সদকার মাল গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

ظِهَار (যিহার)-এর আভিধানিক অর্থঃ

ظِهَار শব্দটি فِعَال-এর ওযনে বাবে مُفَاعَلَة-এর মাসদার। শব্দটি ظَهْر থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হল-

(১) পিঠের সাথে তুলনা দেয়া, (২) প্রকাশ করা, (৩) পৃষ্ঠ, (৪) পিছনের দিক, পশ্চাভাগ, (৫) এক কাপড়ের উপর অন্য কাপড় পরা ইত্যাদি।

যিহারের পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

(১) ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান বলেন, যিহার হল মায়ের সাথে স্ত্রীর উপমা।

(المعجم الوافي ص٥٥٠)

(২) ড. আ.ফ.ম. আবুবকর সিদ্দীক বলেন, যিহার হল, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার নিকট আমার মায়ের (পিঠের) মত অর্থাৎ স্ত্রীকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করাকে যিহার বলে।

(৩) وقاية প্রণেতার ভাষায়- هُوَ تَشْبِيْهُ زَوْجَتِهٖ اَوْمَا يُعَبَّرُ بِهٖ عَنْهَا اَوْ جُزْءٍ شَائِعٍ مِنْهَا بِعَضْوٍ يَحْرُمُ نَظْرُهٗ اِلَيْهِ مِنْ اَعْضَاءِ مَحَارِمِهٖ نَسَبًا اَوْ رَضَاعًا-

অর্থাৎ, স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে অথবা স্ত্রীর ঐ অঙ্গকে যা দ্বারা স্ত্রীর সম্পূর্ণ অঙ্গ বুঝায় অথবা স্ত্রীর কোন অনির্দিষ্ট অঙ্গকে স্বামীর বংশগত অথবা দুধ পান সম্পর্কিত কোন মাহরাম মহিলার এমন অঙ্গের সাথে তুলনা দেওয়া, যে অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করা তার জন্য হারাম।

(৪) মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) বলেন, স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করে নেয়ার বিশেষ একটি পদ্ধতিকে যিহার বলা হয়। পদ্ধতিটি এইঃ স্বামী স্ত্রীকে বলবে- اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ অর্থাৎ, তুমি আমার নিকট আমার মায়ের পিঠের ন্যায়।

(معارف القرآن سورة المجادلة)

(৫) عناية গ্রন্থকার বলেছেন -هُوَ تَشْبِيْهُ الْمَنْكُوْحَةِ بِالْمُحَرَّمَةِ عَلٰى سَبِيْلِ التَّابِيْدِ-

অর্থাৎ, বিবাহিতা স্ত্রীকে চিরস্থায়ী মাহরাম নারীর সাথে তুলনা দেয়া।

পবিত্র কুরআনেও শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন-

... اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَائِهِمْ অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, ... (মুজাদালাঃ ২)

উল্লেখ্য যে, যে সকল শব্দ দ্বারা যিহার হয়, তা দু' প্রকার। যথা-

(১) صَرِيْح তথা স্পষ্ট শব্দে যিহার। যেমন কেউ বলল, اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ অর্থাৎ, তুমি আমার কাছে আমার মায়ের পিঠের মত। এতে যিহার হয়ে যায়।

(২) كِنَايَة তথা ইঙ্গিতসূচক যিহার। যেমন কেউ বলল-

أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي وَمِثْلِ أُمِّي অর্থাৎ, তুমি আমার নিকট আমার মায়ের মত। এমতাবস্থায় নিয়ত ধর্তব্য হবে। যদি যিহারের নিয়ত করে, তাহলে যিহার হবে। আর যদি বলে এর দ্বারা স্ত্রীকে আমার মায়ের মত সম্মানিত বুঝানো উদ্দেশ্য, তাহলে তার কথাই ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ, যিহার হবে না। (تنظيم الاشتات ج٢ ص٢٠٥)

যিহারের কাফফারাঃ যদি কোন মূর্খ অর্বাচীন ব্যক্তি এরূপ করেই বসে, তবে এই বাক্যের কারণে ইসলামী শরীয়তে স্ত্রী চিরতরে হারাম হবে না। কিন্তু এই বাক্য বলার পর স্ত্রীকে পূর্ববৎ ভোগ করার অধিকারও তাকে দেয়া হবে না। বরং তাকে জরিমানাস্বরূপ কাফফারা আদায় করতে হবে। সে যদি এই উক্তি প্রত্যাহার করতে চায় এবং পূর্বের ন্যায় স্ত্রীকে ব্যবহার করতে চায়, তবে কাফফারা আদায় করে পাপের প্রায়শ্চিত্য করবে। কাফফারা আদায় না করে স্ত্রীর নিকট গমন করা যাবে না। (معارف القرآن سورة المجادلة)

যিহারের কাফফারার ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ... فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا– فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا–

অর্থাৎ, যারা তাদের স্ত্রীগণকে যিহার করে ফেলে, অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে নেয়, তাদের কাফফারা এই যে, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দেবে। ... যার এ সামর্থ নেই, সে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একাধারে দু'মাস রোযা রাখবে। যে এতেও (রোগ-ব্যাধি কিংবা দুর্বলতাবশতঃ এতগুলো রোযা রাখতে) অক্ষম হলে সে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাবে। (মুজাদালাঃ ৩-৪)

হাদীসে বর্ণিত আছে-

... عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ رَجُلاً ظَاهَرَ مِنْ اِمْرَأَتِه ثُمَّ وَاقَعَهَا قَبْلَ اَنْ يُّكَفِّرَ فَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَه فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلٰى صَنَعْتَ قَالَ رَاَيْتُ بَيَاضَ سَاقَيْهَا فِيْ الْقَمَرِ قَالَ فَاعْتَزِلْهَا حَتّٰى تُكَفِّرَ عَنْكَ– (ابو داود ج١ ص٣٠٢ باب في الظهار، نسائي ج٢ ص١٠٧ باب الظهار، ابن ماجة ص١٥٠)

অর্থাৎ, ... ইকরামা হতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যিহার করার পর, কাফফারা দেওয়ার পূর্বে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে। সে ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-

এর খিদমতে হাযির হয়ে তাঁকে এতদসম্পর্কে অবহিত করে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাকে এরূপ করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করে? সে ব্যক্তি বলে, চন্দ্রলোকে তার স্ত্রীর উজ্জ্বল পায়ের গোছাদ্বয়। তিনি বলেন, তুমি (যিহারের) কাফফারা না দেওয়া পর্যন্ত তার নিকট হতে দূরে অবস্থান কর।

এখন প্রশ্ন হল, কেউ যদি আহার করানোর পরিবর্তে ষাটজন মিসকীনকে সদকা দিয়ে দেয়, তাহলে জনপ্রতি কতটুকু পরিমাণ দিতে হবে? এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে, জনপ্রতি এক মুদ* গম দিতে হবে।

দলীলঃ ... عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَأَعْطَاهُ اِيَّاهُ وَهُوَ قَرِيْبٌ مِّنْ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا قَالَ تَصَدَّقْ بِهٰذَا (وَفِي رِوَايَةِ تِرْمِذِيْ ... اَعْطِهِ ذٰلِكَ الْعَرَقَ وَهُوَ مِكْتَل يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا اَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا)– (ابو داود ج١ ص٣٠٢ باب في الظهار، ترمذي ج١ ص٢٢٧ باب ما جاء في كفارة الظهار، ابن ماجة ص١٤٥ باب الظهار بتغير)

অর্থাৎ, ... সুলায়মান ইবন ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে কিছু খেজুর এলে তিনি তা তাকে দান করেন, যার পরিমাণ ছিল পনের সা'-এর মত। তিনি বলেন, তুমি এটা সদকা করে দাও। ... [তিরমিযীর রেওয়ায়েতে ... ঐ থলেটি তাকে দিয়ে দাও। আরাক (عرق) হল এমন থলে যাতে পনের অথবা ষোল সা' জিনিস ধরে।]

উক্ত হাদীসে ১৫ সা'-এর কথা উল্লেখ রয়েছে। আর এক সা'= ৪ মুদ। সুতরাং ১৫ সা'= ১৫ x ৪ = ৬০ মুদ। অতএব, প্রত্যেক মিসকীনের ভাগে এক মুদ হয়।

আল-মুগনী কিতাবে ইমাম মালিক (রহ.)-এর মাযহাব নিম্নোল্লিখিতভাবে বর্ণিত হয়েছে-

لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ مُدَّانِ مِنْ جَمِيْعِ الْأَنْوَاعِ (المغني ج٧ ص٣٦٩–٣٧٠)

অর্থাৎ, প্রত্যেক মিসকীনের জন্য সকল প্রকার থেকে দু'মুদ দিতে হবে। খেজুর হোক বা গম হোক।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, প্রত্যেক মিসকীনকে এক সা' খেজুর বা যব অথবা অর্ধ সা গম দিতে হবে, যেমনটি সদকাতুল ফিতরে দেয়া হয়।

---

* মুদ- এটি ইমাম শাফেঈ ও হিজাযবাসীর মতে, ইরাকী এক রতল ও এক তৃতীয়াংশ। আর ইমাম আবু হানিফা ও ইরাকবাসীর মতে, দুই রতল। (النهاية ج٤ ص٣٠٨)

(المغني ج٧ ص٣٦٩-٣٧٠)

উল্লেখ্য যে, তার মূল্য দিলেও চলবে। আমাদের প্রচলিত ওযনে একজনের ফিতরার পরিমাণ হচ্ছে পৌনে দু'সের গম। (معارف القرآن سورة المجادلة)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস-

... قَالَ النَّبِيُّ صلعم فَاَطْعِمْ وَسَقًا مِنْ تَمرٍ بَيْنَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ...

আর এক ওয়াসাক হয় ৬০ সা'তে। এ হিসেবে প্রত্যেক মিসকীনের ভাগে আসে এক সা'। (النهاية ج٥ ص١٨٥)

জবাবঃ (১) হানাফীগণ বলেন যে, আবু দাউদের হাদীসের বিবরণ অনুযায়ী আসল হুকুম তো এক ওয়াসাকই ছিল। অতঃপর লোকটি যখন ইহা প্রদানে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করেন, তখন প্রিয় নবী (সাঃ) যা কিছু মওজুদ ছিল তাকে তা দিয়ে দেন। এতে বুঝা যায় যে, পনের সা যথেষ্ট হয়ে যাওয়া, ইহা ছিল তার জন্য খাস।

(درس ترمذي ج٣ ص٥١٨-٥١٩)

(২) এটাও সম্ভব যে, নবী করীম (সাঃ) তাকে একের পর এক চারবার থলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। আর এভাবে ১৫ x ৪ = ৬০ সা' পূর্ণ হয়ে যায়। আর বর্ণনাকারীর তা না জানার কারণে ইহা উল্লেখ করেননি।

(৩) ইমাম শাফেঈ ও হাম্বলী (রহ.)-এর প্রদত্ত দলীলে عَرَق শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর এটি থলের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এতে কি পরিমাণ ধরে সে সম্পর্কে রাবীদের মতবিরোধ রয়েছে। যদিও রাবী এখানে عَرَق-এর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন-

"وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا او ستة عشر صاعا"

কিন্তু আবু দাউদের এক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে-

... عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ ... وَالْعَرَقُ مِكْتَلٌ يَّسَعُ ثَلٰثِيْنَ صَاعًا- (ابو داود ج١ ص٣٠٢ باب في الظهار)

অর্থাৎ, ... ইবন ইসহাক (রহ.) হতে বর্ণিত। ... আরাক হল ত্রিশ সা'-এর সমান।

... عَنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ... قَالَ وَالْعَرَقُ سِتُّوْنَ صَاعًا- (ابو داود ج١ ص٣٠٢ باب في الظهار)

অর্থাৎ, ... খুওয়াইলা বিনত মালিক ইবন সালাবা (রাঃ) হতে বর্ণিত। .. রাবী বলেন, এক আরাক হল ষাট সা-এর সমান।

পক্ষান্তরে, এ ব্যাপারে হানাফীগণ যে দলীল পেশ করেছেন, তাতে ওয়াসাক (وَسَق) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর ওয়াসাকের পরিমাণ হল ৬০ সা'। সুতরাং এতে কোন এখতেলাফ না থাকার কারণে উক্ত রেওয়ায়েত দলীল হিসেবে অধিক গ্রহণযোগ্য হবে।

(৪) আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, শস্যের যে পরিমাণ তখন প্রস্তুত ছিল, সেটা সাময়িকভাবে সদকা করার জন্য দিয়ে দেয়া হয়েছিল। অবশিষ্ট পরিমাণ ঋণ হিসেবে দায়িত্বে ওয়াজিব গণ্য করা হয়েছে। পরে অবকাশ হলে তা দিয়ে দেয়া হবে। এমতাবস্থায় স্পষ্ট বিষয় হল যে, পনের সা-এর উপর সীমাবদ্ধ করা হয়নি।

(درس ترمذي ج٣ ص٥١٩)

بَابُ فِيْ الْخُلْعِ ص٣٠٣ ঃ খুলআ তালাক

... عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ نَغْضَهَا فَاَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَاشْتَكَتْهُ اِلَيْهِ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتًا فَقَالَ خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا فَقَالَ وَيَصْلُحُ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنِّيْ اَصْدَقْتُهَا حَدِقَتَيْنِ وَهُمَا بِيَدِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُمَا فَفَارِقْهَا فَفَعَلَ– (ترمذي ج١ ص٢٢٥ باب الخلع، نسائي ج٢ ص١٠٧ باب في الخلع)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাবীবা বিনত সাহ্ল (রাঃ) সাবিত ইবন কায়েস ইবন শাম্মাসের স্ত্রী ছিল। সে তাকে মারধর করলে, তার শরীরের কোন একটি অঙ্গ ভেঙ্গে যায়, সে (হাবীবা) ফজরের নামাযের পর নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট আসে এবং সাবিতের বিরুদ্ধে তাঁর নিকট অভিযোগ করে। নবী করীম (সাঃ) সাবিতকে ডাকেন এবং বলেন, তুমি তোমার প্রদত্ত মহরের মাল গ্রহণ কর এবং তাকে ত্যাগ কর। সে জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা কি উত্তম হবে? তিনি বলেন, হাঁ। তখন সে বলে, আমি তাকে তার মহর স্বরূপ দু'টি বাগান প্রদান করেছিলাম এবং সে এখন এগুলোর মালিক। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) বললেন, তুমি তা গ্রহণ কর এবং তাকে ত্যাগ কর। সে (সাবিত) এরূপই করে।

خلع (খুলআ)-এর আভিধানিক অর্থঃ خلع শব্দটি خَلْعٌ থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হল- খুলে ফেলা, বিচ্যুত করা, বিচ্ছিন্ন করা, তুলে ফেলা ইত্যাদি।

সুতরাং خلع-এর সাথে এ সকল অর্থগুলোর সঙ্গতি খুঁজতে গেল দেখা যায়- পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা স্বামী-স্ত্রীকে একজন অপর জনের পোশাক (لِبَاس) বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- "هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ"–
অর্থাৎ, তারা (মহিলারা) তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা (পুরুষরা) তাদের পরিচ্ছদ। (বাকারাঃ ১৮৭)
সুতরাং 'খুলআ'-এর দ্বারা একজন অপরজন থেকে যেন তাদের পরিচ্ছদ খুলে ফেলার অনুরূপ।

خلع-এর পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

إِزَالَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ الْمُتَوَقِّفَةِ قَبُوْلُهَا بِلَفْظِ الْخُلْعِ أَوْ مَا فِيْ مَعْنَاهُ كَالْمُبَارَاةِ– (قواعد الفقه ص٢٨١)

অর্থাৎ, খুলআ অথবা এর সমার্থক কোন শব্দ দ্বারা বিয়ের মালিকানা দূরীভূত করা, যা মহিলা কর্তৃক গ্রহণের উপর নির্ভরশীল। যেমন, মুবারাত (পারস্পরিক সম্মতিতে তালাক) শব্দ।

(২) فِرَاقُ الرَّجُلِ اِمْرَأَتَه عَلٰى عِوَضٍ يَحْصِلُ لَه–(تنظيم الاشتات ج٢ ص١٩٣)
অর্থাৎ, স্বামী থেকে স্ত্রীর প্রাপ্ত সম্পদের বিনিময়ে বিচ্ছিন্নতাই হল খুলআ।
(৩) ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক বলেন, স্বামী স্বীয় স্ত্রী থেকে নির্দিষ্ট মালের বিনিময়ে বিবাহ বিচ্যুত করাকে খুলআ বলে।
(৪) ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান বলেন, স্ত্রীর আগ্রহে ক্ষতিপূরণ নিয়ে প্রদত্ত তালাকই হল খুলআ তালাক। (القاموس الوجيز ص٣٢١)
(৫) আবু দাউদ-এর পার্শ্বটীকায় খুলআর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

فِرَاقُ الزَّوْجَةِ عَلٰى مَالٍ– (ابو داود ج١ ص٣٠٣)

অর্থাৎ, মালের বিনিময়ে স্ত্রীর বিচ্ছিন্নতা।

* খুলআ فَسْخُ نِكَاح (বিবাহ বিচ্ছেদ), নাকি طَلَاق (তালাক)- এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ
* ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, ইসহাক, আবু সাওরা (রহ.)-এর মতে, খুলআ হচ্ছে فَسْخُ نِكَاح (বিবাহ বিচ্ছেদ), তালাক নয়। ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ অভিমতও তাই। (درس مشكوة ج٣ ص٣١)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

اَلطَّلاَقُ مَرَّتٰنِ ... فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِه ... فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه–

অর্থাৎ, তালাক হল দু'বার ... অতঃপর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময়ে দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন পাপ নেই। ... তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীকে বিয়ে না করবে, তার জন্য হালাল নয়। (বাকারাঃ ২২৯-২৩০)

উক্ত আয়াতদ্বয়ে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তাআলা খুলআ ব্যাপারটির আলোচনা দু'তালাকের পরে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিন তালাক দিলে এর বিধান কি হবে তা বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং খুলআ যদি তালাকই হয়, তাহলে তালাকের সংখ্যা হয়ে যায় চারটি, যার প্রবক্তা কেউ নয়। কেননা, তালাকের সীমা হচ্ছে তিনটি। অতএব খুলআ তালাক নয়, বরং বিবাহ বিচ্ছেদ।

দলীল (২)ঃ ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَاَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً– (ابو داود ج١ ص٣٠٣ باب في الخلع، ترمذي ج١ ص٢٢٥، نسائي ج٢ ص١١٢ عدة المختلعة، ابن ماجة ص١٤٩)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাবিত ইবন কায়েসের স্ত্রী তার নিকট হতে খুলআ তালাক গ্রহণ করে। নবী করীম (সাঃ) তার ইদ্দতের সময় একটি হায়েয নির্ধারণ করেন।

একথা স্বীকৃত যে, তালাকের ইদ্দত হচ্ছে তিন হায়েয। অথচ উক্ত হাদীসে নবী করীম (সাঃ) খুলআর ইদ্দত এক হায়েয সাব্যস্ত করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, খুলআ আসলে তালাক নয়; বরং বিবাহ বিচ্ছেদ।

* ইমাম আবু হানিফা ও মালিক (রহ.) সহ জমহুরের অভিমত হল, খুলআও তালাক, বিবাহ বিচ্ছেদ নয়। হযরত উসমান, আলী এবং ইবন মাসউদ (রহ.)-এর অভিমতও তাই। (المغني ج٧ ص٥٦، تنظيم الاشتات ج٢ ص١٩٣)

দলীল (১)ঃ হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস-

اِنَّ امْرَاَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اِخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَاَعْطَاهُ حَدِيْقَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ فَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً– (بخاري ج٢ ص٧٩٤ باب الخلع وكيف الطلاق فيه، نسائي ج٢ ص١٠٧، ابن ماجة ص١٤٩)

অর্থাৎ, সাবিত ইবন কায়েস (রাঃ)-এর স্ত্রী তার স্বামীর নিকট খুলআর দাবী করলেন এবং স্বামীকে একটি বাগান প্রদান করলেন। নবী করীম (সাঃ) সাবিত ইবন কায়েস (রাঃ)-কে বললেন, তুমি বাগানটি গ্রহণ কর, আর তাকে এক তালাক দিয়ে দাও।

দলীল (২)ঃ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রাঃ)-এর মুরসাল হাদীস-

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيْقَةً بَائِنَةً– (درس مشكوة ج٣ ص٣١)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) খুলআকে বায়েন তালাক হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ

ইমাম আহমদ ও ইসহাক (রহ.) কুরআনের আয়াত দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন, এর উত্তরে হানাফীগণ বলেন যে, খুলআ প্রথম দু'তালাকেরই অন্তর্ভুক্ত এবং উদ্দেশ্য হল, দু' তালাক পর্যন্ত প্রত্যাবর্তনের সুযোগ থাকে। আর প্রত্যাবর্তনের সুযোগ শেষ হয়ে যায়, যখন তালাকে মুগাল্লাযা বা তিন তালাক দেয়া হয়। আর প্রথম দু' তালাক দু'ভাবে সম্পন্ন হতে পারে। যথা-

(১) সম্পদের বিনিময়ে তালাক, (২) সম্পদ ছাড়া তালাক। সুতরাং اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ (তালাক দু'প্রকার)-এর ক্ষেত্রে সম্পদ ছাড়া তালাকের কথা উল্লেখ রয়েছে। আর খুলআর ক্ষেত্রে সম্পদের বিনিময়ে তালাকের কথা উল্লেখ রয়েছে। অতএব খুলআ اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ বা দু'প্রকারের তালাকের বহির্ভূত নয়। আর فَاِنْ طَلَّقَهَا আয়াত দ্বারা তৃতীয় তালাকের কথাই বলা হয়েছে। সুতরাং তালাকের সংখ্যা চারটি হয়ে যায়, এমনটি বলা ঠিক নয়। (نور الانوار ص٢١–٢٢، معارف القرآن ج١ ص٥٦١–٥٦٢)

হাদীস দ্বারা যে তাঁরা দলীল পেশ করেছেন, এর জবাবে হানাফীগণ বলেন-

(ক) হাদীসে যে حَيْضَةً (হায়েয) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এর দ্বারা মূলতঃ উদ্দেশ্য হল একথা বুঝানো যে ইদ্দত হিসেবে তাকে হায়েয জাতীয় (جلس حيض) সময় অতিবাহিত করতে হবে। এতে এক হায়েয বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। কেননা حَيْضَةً শব্দটি কম অথবা বেশি উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যায়। তাছাড়া এর দ্বারা তিন হায়েযকে নিষেধ (نفي) করা হয়নি।

তবে কেউ বলতে পারেন যে, নাসায়ী শরীফের ২য় খন্ড ১১২ পৃষ্ঠায় حَيْضَةً وَاحِدَةً তথা একটি হায়েযকে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে। এর জবাব হল- এখানে মূলতঃ বর্ণনাকারীর হস্তক্ষেপ হয়েছে। কেননা বর্ণনাকারী حَيْضَةً-এর মধ্যে যে "ة" রয়েছে,

তিনি উক্ত "تاء" কে এককের (وحدت) জন্য মনে করেছেন। তাই তিনি স্বীয় ধারণা অনুযায়ী حَيْضَةً وَاحِدَةً-এর দ্বারা রেওয়ায়েত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে "حَيْضَةً"-এর মধ্যে যে "ة" রয়েছে তা এককের নয়, বরং بيان جنس (শ্রেণী বা প্রকারের বর্ণনা)-এর জন্য নেয়া হয়েছে। (بذل المجهود ج١٠ ص٣٣٢، الكوكب الدري ج٢ ص٢٦٧)

(খ) তাছাড়া আরো বলা যায় যে, রেওয়ায়েতটি খবরে ওয়াহেদ, যা কুরআনের মোকাবিলায় দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআনে বর্ণিত আয়াতটি হল –"وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ" অর্থাৎ, আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েয পর্যন্ত। (বাকারাঃ ২২৮)

খুলআর ক্ষেত্রে সম্পদের পরিমাণঃ

কতটুকু পরিমাণ সম্পদের বিনিময়ে খুলআ করা জায়েয, তা নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, লাইছ, নাখঈ, মুজাহিদ, ইকরামা (রহ.), ইবন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখের মতে, মহর পরিমাণ অথবা এর চেয়ে বেশি পরিমাণ সম্পদ নিয়েও খুলআ করা জায়েয।

দলীলঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ–

অর্থাৎ, অতঃপর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন পাপ হবে না। (বাকারাঃ ২২৯)

উক্ত আয়াতে ما হরফটি ব্যাপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে; মহর পরিমাণ হোক অথবা এর থেকে বেশি হোক সবই এতে অন্তর্ভুক্ত।

এতে বুঝা যায় যে, মহরের অতিরিক্ত পরিমাণ নেয়া জায়েয আছে।

* ইমাম আহমদ, ইসহাক, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব ও আতা (রহ.)-এর মতে, মহর পরিমাণ সম্পদ নেয়া জায়েয, কিন্তু এর চেয়ে বেশি নেয়া জায়েয নয়।

দলীলঃ হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস-

اِنَّ جَمِيْلَةَ اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا اَعْتِبُ عَلٰى ثَابِتٍ فِيْ خُلُقٍ وَلاَ دِيْنٍ وَلٰكِنِّيْ اَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْاِسْلاَمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم اَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ قُلْتُ نَعَمْ وَ زِيَادَةً– فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا الزِّيَادَةُ فَلاَ–(دار قطني)

অর্থাৎ, জামীলা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, (আমার স্বামী) সাবিতের ধার্মিকতা ও চারিত্রিক দিক থেকে কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু আমি ইসলামে কুফরীকে অপছন্দ করি। নবী করীম (সাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি তার বাগান তাকে ফিরিয়ে দিতে চাও? আমি বললাম, হাঁ, এবং আরো অতিরিক্ত। নবী করীম (সাঃ) বললেন, অতিরিক্ত দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।
এ থেকে বুঝা যায় যে, বাগানটি যা মহর ছিল, এর থেকে বেশি প্রদানকে নবী করীম (সাঃ) নিষেধ করেছেন। সুতরাং খুলআর ক্ষেত্রে মহরের চেয়ে অতিরিক্ত সম্পদ নেয়া জায়েয নয়।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, অপরাধ এবং দোষ যদি পুরুষের পক্ষ থেকে হয়, তাহলে খুলআর জন্য মহিলার নিকট হতে কোন কিছু নেয়া জায়েয হবে না। কিন্তু অপরাধ এবং দোষ যদি মহিলার পক্ষ থেকে হয়, তাহলে মহরের চেয়ে অতিরিক্ত সম্পদ নেয়া জায়েয নয়।
দলীলঃ পবিত্র কুরআনের আয়াত-

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا اَ تَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا–

অর্থাৎ, আর তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহণ করো না। তোমরা কি তা অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য পাপাচার করে গ্রহণ করবে? (নিসাঃ ২০)
উক্ত আয়াতে পুরুষের দোষের ক্ষেত্রে মহিলার পক্ষ থেকে কোন কিছু নিতে নিষেধ করা হয়েছে।

দলীলঃ মহরের অতিরিক্ত সম্পদ নেয়া যে নাজায়েয, এর দলীল জামিলার (ঘটনার) হাদীস, যা ইমাম আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর প্রদত্ত দলীলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর হাদীসটি পাঠান্তে বুঝা যায় যে, অপরাধ মহিলার পক্ষ থেকে হয়েছিল।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ ইমাম মালিক ও শাফেঈ (রহ.)-এর দলীল হিসেবে প্রদত্ত আয়াতের জবাব হল- উক্ত আয়াতে মহরের পরিমাণই বুঝানো উদ্দেশ্য। কেননা আয়াতে ইতিপূর্বে মহরের কথা উল্লেখ রয়েছে।
* ইমাম আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর প্রদত্ত দলীলের জবাব হল, উক্ত হাদীসটি বিবেচিত হবে স্ত্রীর দুর্ব্যবহারের ক্ষেত্রে। যা আমরা (হানাফীগণ)ও বলে থাকি।

(تنظيم الاشتات ج۲ ص۲۰۲ درس مشكوة ج۳ ص۳۷)

بَابُ فِيْمَنْ اَسْلَمَ وَعِنْدَهٗ نِسَاء اَكْثَرُ مِنْ اَرْبَعٍ ص٣٠٤

ইসলাম গ্রহণের পর যদি কারো নিকট চারের অধিক স্ত্রী থাকে

... عَنْ وَهَبِ الاَسَدِيِّ قَالَ اَسْلَمْتُ وَعِنْدِيْ ثَمَانُ نِسْوَةٍ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اخْتَرْ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا– (ترمذي ج١ ص٢١٤ باب الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، ابن ماجة ص١٤١)

অনুবাদঃ ... ওহাব আল-আসাদী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন ইসলাম কবুল করি, তখন আমার আটজন স্ত্রী ছিল। তিনি বলেন, আমি এ সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ)-কে অবহিত করলে তিনি বলেন, তুমি এদের মধ্যে চারজনকে বেছে নাও।

বিশ্লেষণঃ স্ত্রীদের সাথে পূর্ণ সমতা ও ইনসাফ কায়েম করতে পারলে, এমন শর্তে ইসলাম স্বামীকে একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়েছে। তবে একই সময়ে চারের অধিক স্ত্রী রাখাকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। ইরশাদ হচ্ছে-

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ– فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً

অর্থাৎ, তবে সেসব (হালাল) মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশংকা কর যে, তাদের মধ্যে ইনসাফ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই। (নিসাঃ ৩)

এখন প্রশ্ন হল, যে লোকের নিকট কুফরী অবস্থায় চারের অধিক স্ত্রী ছিল, ঐ লোক যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে কোন্ চারজনকে তার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবে? এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, অনেক স্ত্রীর অধিকারী কাফের যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে স্বামী তাদের মধ্য থেকে যে কোন চারজনকে গ্রহণ করে অবশিষ্টদেরকে পৃথক করে দেবে। [এই হুকুমটি তখন প্রযোজ্য হবে যখন এসব স্ত্রী স্বীয় ইদ্দতকালে ইসলাম গ্রহণ করে। অথবা এসব স্ত্রী আহলে কিতাব হয়, অন্যথায় দীন আলাদা হওয়ার কারণে বিয়ে নিজে নিজেই বাতিল হয়ে যাবে। (المغني ج٦ ص٦٢٠)]

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে مُطْلَقًا (নিঃশর্তভাবে) চারজনের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং স্বামী যেকোন চারজনকে ইচ্ছা গ্রহণ করবে এবং অবশিষ্টদেরকে পৃথক করে দিবে।

দলীল (২)ঃ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ اَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاَسْلَمْنَ مَعَه فَاَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَتَخَيَّرَ اَرْبَعًا مِّنْهُنَّ– (ترمذي ج١ ص٢١٤ باب الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، ابن ماجة ص١٤١)

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, গায়লান ইবন সালামা সাকাফী (রাঃ) এমন সময় মুসলমান হয়েছেন, যখন তাঁর বিয়েতে জাহেলী যুগের ১০ জন স্ত্রী ছিল। তারাও তার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তখন নবী করীম (সাঃ) তাঁকে তাদের মধ্য হতে যে কোন চারজন স্ত্রীকে মনোনীত করে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

দলীল (৩)ঃ ... عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ فَيْرُوْزٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَسْلَمْتُ وَتَحْتِيَ اخْتَانِ قَالَ طَلِّقْ اَيَّتَهُمَا شِئْتَ– (ابو داود ج١ ص٣٠٥، باب فيمن اسلم الخ، ترمذي ج١ ص٢١٤ الرجل يسلم وعنده اختان، ابن ماجة ص١٤١)

অর্থাৎ, ... আল যাহাক ইবন ফায়রূয তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইসলাম কবুল করেছি এবং দুই বোন একই সঙ্গে আমার স্ত্রী হিসাবে আছে। তিনি বলেন, এদের মধ্যে যাকে খুশী তুমি তালাক প্রদান কর।

উক্ত হাদীসেও দেখা যাচ্ছে যে, স্বামীর এখতিয়ার রয়েছে।

* ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে, যদি একই আক্‌দে তাদের সকলের বিয়ে হয়ে থাকে, তবে তাদের সকলের মাঝে বিচ্ছিন্নতা (تَفْرِيْق) ওয়াজিব। কেউ কারো উপর অগ্রাধিকার পাবে না। কিন্তু যদি বিভিন্ন আক্‌দে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তবে এক্ষেত্রে প্রথম চার মহিলার বিবাহ শুদ্ধ হবে, আর অবশিষ্টগুলো নিজে নিজেই বাতিল হয়ে যাবে। মনোনয়নের কোন অধিকার নেই।

(المغني ج٦ ص٦٢٠، المبسوط للشرخسي ج٥ ص٥٣–٥٤)

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর এই মাসআলার ভিত্তি হল ইবরাহীম নাখঈ (রহ.)-এর উক্তি-(موطاء محمد ص٢٤٥) –نِكَاحُ الْاَرْبَعِ الْاَوَّلِ جَازَ وَنِكَاحُ مَنْ بَقِيَ مِنْهُنَّ بَاطِلٌ

অর্থাৎ, প্রথম চারজনের বিবাহ জায়েয এবং তাদের ছাড়া অন্যদের বিয়ে বাতিল।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ উল্লিখিত তিন ইমাম দলীল হিসেবে যে সকল হাদীস পেশ করেছেন, এর জবাবে হানাফী মাযহাবের অনুসারী ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, যে সকল হাদীসে স্বামীর ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোন চারজনকে এবং দুই বোনের ক্ষেত্রে যেকোন একজনকে গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুমোদন দেয়া হয়েছে, তা ঐ সময়ের

বিবাহসমূহের ব্যাপারে, যখন চারজনের অতিরিক্ত এবং আপন দু'বোনকে একত্রে বিবাহ করা জায়েয ছিল। (طحاوي ج٢ ص١٢١)
আর এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, যে বিবাহ শরীয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা শরীয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পরেও অবশিষ্ট থাকবে।
তাই নবী করীম (সাঃ) সাহাবীকে লক্ষ্য করে বললেন- طَلِّقْ اَيَّتَهُمَا شِئْتَ
অর্থাৎ, দু'বোনের মধ্যে যাকে খুশী তুমি তালাক প্রদান কর।

উল্লেখ্য যে, তালাক তো পতিত হয় ঐ বিবাহে, যে বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, দু'বোনের একত্রে বিবাহ শরীয়ত অবতীর্ণের পূর্বে সহীহ ছিল এবং পরেও সহীহ রয়েছে, আর তাই নবী করীম (সাঃ) তালাক দিতে বলেছেন। নতুবা বিয়ে যদি সহীহই না হত, তাহলে তালাকের প্রশ্নই ওঠে না।
সুতরাং বুঝা যায় যে, যেসব বিবাহ নিষেধ আসার পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেসব বিবাহের ক্ষেত্রে কোন মতানৈক্য নেই। কিন্তু যেসব বিবাহ শরীয়ত আসার পরে অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আর তিন ইমাম যে সকল হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেছেন, সে সকল হাদীসে বর্ণিত বিবাহসমূহ ছিল শরীয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

بَابٌ فِيْ اللِّعَانِ ص٣٠٥ ঃ লিআন

... عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَاَتَهٗ فِيْ زَمَان رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفٰى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ بَيْنَهُمَا وَالْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْاَةِ– (ابو داؤد ج١ ص٣٠٨، بخاري ج٢ ص٨٠١ باب يلحق الولد بالملاعنة، مسلم ج١ ص٤٩٠ كتاب اللعان، ترمذي ج١ ص٢٢٩ باب اللعان، نسائي ج٢ ص١٠٩ باب نفي الولد باللعان الخ، ابن ماجة ص١٥١)

অনুবাদঃ ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রী সম্পর্কে লিআন করে এবং স্ত্রীর গর্ভস্থিত সন্তানকে তার ঔরসজাত নয় বলে, তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন এবং সন্তানের সম্পর্ক মায়ের সাথে স্থির করেন।

লিআন (لِعَان)-এর আভিধানিক অর্থঃ

لِعَان বা مُلاَعَنَة শব্দ দুটি (বাবে مُفَاعَلَة-এর ওযনে) لاَعَنَ يُلاَعِنُ-এর মাসদার। এর ক্রিয়ামূল হচ্ছে ل–ع–ن । এই শব্দটি মূলত লানত হতে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ

হচ্ছে- পরস্পর অভিসম্পাদ দেয়া, বদদোয়া করা, অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা, প্রতিশোধ নেয়া, অপবাদ দেয়া ইত্যাদি। (القاموس الوجيز ص١٢٩)

تنظيم الاشتات গ্রন্থে এর অর্থ করা হয়েছে- اَلطَّرْدُ وَالْاِبْعَادُ অর্থাৎ বিতাড়িত করা, অপসারিত করা, দূর করা। কেননা, লিআনের ফলে স্বামী-স্ত্রী একে অপর থেকে আজীবনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। (تنظيم ج٢ ص٢٠٧)

পবিত্র কুরআনে শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়- وَاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ অর্থাৎ, নিশ্চয়ই কিয়ামত পর্যন্ত তোমার উপর আমার অভিসম্পাত। (সোয়াদঃ ৭৮)

লিআনের পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

১। মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) বলেন, শরীয়তের পরিভাষায় স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বিশেষ পদ্ধতিতে কয়েকটি শপথ দেয়াকে লিআন বলা হয়। (معارف القرآن سورة النور)

২। ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক বলেন, স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ আনে এবং এর অনুকূলে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে আদালতের সামনে সূরা নূর-এ বর্ণিত বিশেষ পন্থায় পাঁচবার হলফ করতে হয়। আইনের পরিভাষায় একে লিআন বলে।

৩। শরহে বেকায়ার ভাষ্যকার বলেন-

هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ شَهَادَاتٍ مُؤَكَّدَةٍ بِالْاَيْمَانِ مَقْرُوْنَةٍ بِاللَّعْنِ قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذَفِ فِيْ حَقِّهٖ وَحَدِّ الزِّنَا فِيْ حَقِّهَا-

অর্থাৎ, লিআন হচ্ছে শপথ দ্বারা সুদৃঢ় এমন কতিপয় সাক্ষ্য যেগুলো অভিসম্পাত যুক্ত এবং স্বামীর ক্ষেত্রে অপবাদের শাস্তি ও স্ত্রীর ক্ষেত্রে যিনার শাস্তির স্থলাভিষিক্ত হয়, তথা স্বামী হতে অপবাদের শাস্তি এবং স্ত্রী হতে যিনার শাস্তি রহিত হয়ে যাবে।

৪। কতিপয় আলেম বলেন, স্বামী যদি স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় অথবা স্ত্রী যদি স্বামীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় অতঃপর তা প্রমাণ করার জন্য চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তাহলে কুরআনের বিধান অনুযায়ী চারজন সাক্ষীর স্থলে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে যে, নিজে সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে যে, আমি যদি মিথ্যাবাদী হই, তবে যেন আমার উপর আল্লাহর লানত (অভিসম্পাত) নাযিল হয়, অপরজনও অনুরূপভাবে পাঁচবার শপথ করবে। এরূপে কাযীর মাধ্যমে উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর নামই হল লিআন।

৫। ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান অতি সংক্ষেপে এর পরিচয় দানে বলেন, শপথ সহকারে ব্যভিচারের অপবাদই হল লিআন। (المعجم الوافي ص٦٨٩)

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে-

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ بِاللهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ- وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ- وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍ بِاللهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ- وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ-

অর্থাৎ, এবং যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী নেই, এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহর লানত এবং স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী। এবং পঞ্চমবার বলে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসবে। (নূরঃ ৬-৯)

বিশ্লেষণঃ লিআনের জন্য اَهْلِيَّت شَهَادَت (সাক্ষ্য দানে যোগ্যতা) শর্ত কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, লিআনের জন্য اَهْلِيَّت شَهَادَت হওয়া শর্ত নয়। বরং লিআনের জন্য اَهْلِيَّت يَمِيْن (শপথের যোগ্যতা) হওয়া যথেষ্ট। কেননা, তাদের নিকট লিআন شَهَادَت (সাক্ষ্য)-এর নাম নয়, বরং লিআন হল أَيْمَان বা শপথসমূহের নাম। তাঁরা বলেন, লিআন হল- الأَيْمَانُ الْمُؤَكَّدَاتُ بِالشَّهَادَتِ অর্থাৎ, এরূপ কতগুলো কসম যেগুলো সাক্ষ্য দ্বারা তাকীদপূর্ণ।

এজন্য মুসলিম স্বামী ও তার কাফের স্ত্রীর মধ্যে এবং গোলাম ও তার স্ত্রীর মধ্যে লিআন হতে পারে। (هداية مع حاشية ج٢ ص٤١٦-٤١٧، درس مشكوة ج٣ ص٤٠)

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, লিআনের জন্য اَهْلِيَّت شَهَادَت হওয়া শর্ত। কেননা তাঁর নিকট লিআন হচ্ছে شَهَادَت (সাক্ষ্য)-এর নাম। اَيْمَان (শপথ)-এর নাম নয়। তাই স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য اَهْلِيَّت شَهَادَت হওয়া জরুরী। সুতরাং মুসলিম স্বামী ও তার কাফের স্ত্রীর মধ্যে এবং গোলামও তার স্ত্রীর মধ্যে লিআন জায়েয নয়।

কেননা, তিনি বলেন, লিআন হলঃ اَلشَّهَادَةُ الْمُؤَكَّدَاتُ بِالْأَيْمَانِ অর্থাৎ, এরূপ কতগুলো সাক্ষ্যের নাম যেগুলো কসম দ্বারা তাকীদপূর্ণ। (هداية مع حاشية ج٢ ص٤١٦-٤١٨)
পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটিতে হানাফী মতের জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়-
وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ-

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা লিআনকে شَهَادَت (সাক্ষ্য) বলেছেন। সুতরাং লিআনের জন্য اهليت شهادت হওয়া শর্ত।

লিআন সম্পর্কে দ্বিতীয় আলোচনাঃ

কেবল লিআনের দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন (تَفْرِيْق) হয়ে যাবে, নাকি বিচারকের বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজন আছে, এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল ও যুফার (রহ.)-এর মতে, লিআনের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে, বিচারকের বিচ্ছেদ করার কোন প্রয়োজন নেই। (درس مشكوة ج٣ ص٤٠)

দলীলঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস-
اَلْمُتَلاَعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا- (ابو داود ج١ ص٣٠٦ باب في اللعان، دار قطني ج٣ ص٢٧٦)
অর্থাৎ, দুই লিআনকারীর মাঝে যখন বিচ্ছেদ ঘটে যায়, তখন তারা আর কোনদিন একত্রিত হতে পারবে না।
উল্লেখ্য যে, যদি লিআনের পর বিবাহ বিচ্ছিন্ন না হয়ে অবশিষ্ট থাকত, তাহলে নিশ্চিন্তে উভয়ে একত্রিত হতে পারত। অথচ হাদীসে তা নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং লিআনের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচারকের বিচ্ছেদ ঘটানোর কোন প্রয়োজন নেই।

* ইমাম আবু হানিফা ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে, স্বয়ং লিআনকারী যদি মহিলাকে তালাক দেয়, তাহলে এটাই উত্তম, আর যদি তালাক না দেয়, তবে শুধু লিআনের দ্বারা উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ হবে না; বরং এক্ষেত্রে বিচারকের মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে। (درس مشكوة ج٣ ص٤٠)

দলীল (১)ঃ ... عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّعْدِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُوَيْمَرَ بْنَ اَشْقَرَ الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ اِلٰى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَالَ لَهٗ يَا عَاصِمُ اَرَاَيْتَ رَجُلاً وَّجَدَ مَعَ

امْرَاَتِهِ رَجُلاً يَقْتُلُه فَتَقْتُلُوْنَه اَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِّيْ يَا عَاصِمُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتّٰى كَبُرَ عَلٰى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ اِلٰى اَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمٌ لَّمْ تَاتِنِيْ بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْئَلَةَ الَّتِيْ سَاَلْتُه عَنْهَا فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللهِ لاَ اَنْتَهِيْ حَتّٰى اَسْاَلَه عَنْهَا فَاَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتّٰى اَتٰى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَسَطُ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَرَاَيْتَ رَجُلاً وَّجَدَ مَعَ امْرَاَتِهِ رَجُلاً اَيَقْتُلُه فَتَقْتُلُوْنَه اَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اُنْزِلَ فِيْكَ وَفِيْ صَاحِبَتِكَ قُرْاٰنٌ فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلاَعَنَا وَاَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنْ اَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا عُوَيْمِرٌ ثَلاَثًا قَبْلَ اَنْ يَّأْمُرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– (ابو داود ج١ ص٣٠٥ باب في اللعان، بخاري ج٢ ص٧٩٩–٨٠٠ باب يبدأ الرجل بالتلاعن، مسلم ج١ ص٤٨٨، ترمذي ج١ ص٢٢٨، نسائي ج٢ ص٩٩–١٠٠ باب الرخصة في ذٰلك، ابن ماجة ص١٥٠)

অর্থাৎ, ... ইবন শিহাব (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহল ইবন সাদ আল-সাঈদী তাকে খবর দিয়েছেন যে, উওয়াইমের ইবন আশকার আল আজলানী আসিম ইবন আদীর নিকট আগমন করেন এবং বলেন, হে আসিম! আমাকে বলুন, যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে কোন অপরিচিত লোককে এক বিছানায় দেখে সে কি তাকে হত্যা করবে? আর কিসাস (বদলা) হিসাবে কি তোমরা তাকে হত্যা করবে, নাকি করবে না? তুমি এ সম্পর্কে আমার জন্য হে আসিম! রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একটু জিজ্ঞাসা কর। আসিম এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তা শুনে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং তাকে দোষারোপ করেন। এমনকি আসিম রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে যা শ্রবণ করেন তা তার জন্য খুবই ভয়ানক মনে হয়। এরপর আসিম তার পরিবার-পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তন করলে উওয়াইমের তাঁর নিকট গমন করে বলেন, হে আসিম! রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাকে কি বলেছেন? আসিম বলেন, তুমি আমার নিকট কোন ভাল বিষয় নিয়ে আগমন করনি। আমি ঐ

মহিলা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে যে প্রশ্ন করেছিলাম তাতে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এতদশ্রবণে উওয়াইমের বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি তার (মহিলার) সম্পর্কে এ প্রশ্নটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নিজে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হব না। উওয়াইমের এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট গমন করেন, যখন তিনি মানুষের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে অপরিচিত কোন মানুষ পায়, তবে এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? সে কি তাকে হত্যা করবে? আর এজন্য আপনারা কি তাকে কিসাস হিসাবে হত্যা করবেন? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে কুরআন (আয়াত) নাযিল করেছেন। তুমি যাও এবং তাকে (স্ত্রী) নিয়ে এস। রাবী সাহল বলেন, তারা উভয়ে একে অপরের প্রতি শপথ করে ব্যভিচারের দোষারোপ করতে থাকে এবং আমিও তখন অন্যান্য লোকদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট ছিলাম। তারপর তারা যখন অভিসম্পাত ও দোষারোপ করা হতে বিরত হয়, তখন উওয়াইমের বলে, যদি এখন আমি তাকে আমার নিকট রাখি, তবে ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার ব্যাপারে আমি লোকদের নিকট মিথ্যুক প্রতিপন্ন হব। উওয়াইমের নবী করীম (সাঃ)-এর অনুমতি প্রদানের পূর্বে তাকে (স্ত্রীকে) তিন তালাক প্রদান করেন।

হাদীসটির শেষ পর্যায়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, যদি কেবল লিআনের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত, তাহলে নবী করীম (সাঃ) তার তালাকের উপর অস্বীকৃতি প্রদান করতেন। অথচ বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি তা বাস্তবায়ন করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, শুধু লিআনের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হবে না; বরং কাযী বিচ্ছিন্ন করবে, নতুবা স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দিবে।

দলীল (২)ঃ ... اَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَه فِيْ زَمَان رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا–

অর্থাৎ, ... নবী করীম (সাঃ)-এর যুগে এক ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর সম্পর্কে লিআন করলে নবী করীম (সাঃ) তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন।

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ شَهِدْتُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشَرَةَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تَلاَعَنَا الخ (ابو داود ج١ ص٣٠٦ باب في اللعان)

অর্থাৎ, ... সাহ্‌ল ইবন সাদ হতে বর্ণিত। রাবী মুসাদ্দাদ তার হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সাহ্‌ল) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে দু'জন পরস্পর অভিসম্পাত ও দোষারোপকারীর ব্যাপারটা যখন উপস্থাপিত হয়, তখন আমি সেখানে উপস্থিত

ছিলাম এবং এ সময় আমার বয়স ছিল পনের বছর। এরপর তারা শপথ করে পরস্পর অভিসম্পাত ও যিনার দোষারোপ করার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন।

উক্ত হাদীসদ্বয়ে প্রতীয়মান হয় যে, লিআনের পরেও নবী করীম (সাঃ) কাযী হিসেবে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছেন। শুধু লিআনের দ্বারাই যদি বিচ্ছেদ হয়ে যেত, তাহলে নবী করীম (সাঃ)-এর বিচ্ছেদ করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ

১। উল্লিখিত তিন ইমাম দলীল হিসেবে যে হাদীস পেশ করেছেন তা মাওকূফ হাদীস। সুতরাং মাওকূফ হাদীস মারফূ হাদীসের মোকাবেলায় দলীলযোগ্য নয়।

২। অথবা, হাদীসের দ্বারা উদ্দেশ্য হল- تَفْرِيْق বা বিচ্ছেদ ঘটে যাওয়ার পর একত্রিত হতে পারবে না। যাতে মারফূ হাদীসের সাথে অসামঞ্জস্য না হয়। (درس مشكوة ج٣ ص٤٠)

লিআন সম্পর্কে তৃতীয় আলোচনাঃ

লিআনের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে বিচ্ছেদ হয়, তা কি চিরকালের জন্য, নাকি কোন শর্তসাপেক্ষে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে- এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম আবু ইউসুফ, যুফার ও হাসান ইবন যিয়াদ (রহ.)-এর মতে- লিআনের দ্বারা যে تَفْرِيْق (বিচ্ছেদ) হয়, এতে তালাক হয় না এবং এর দ্বারা [দুগ্ধপোষ্য ও বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা (حُرْمَت مُصَاهَرَة)-এর হারামের ন্যায়] আজীবনের জন্য স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে। কখনো তার জন্য বৈধ হবে না। (تنظيم الاشتات ج٢ ص٢٠٧)

দলীলঃ اَلْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا (دار قطني ج٣ ص٢٧٦، ابو داود ج١ ص٣٠٦ باب في اللعان)

* ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, লিআনের দ্বারা যে বিচ্ছেদ হয়, তা তালাকে বায়েন-এর পর্যায়। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই নিজেদের লিআনের অবস্থায় থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে দ্বিতীয়বার বিয়ে সহীহ হবে না। কিন্তু স্বামী যদি স্বীয় স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের যে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল তা স্বীকার করে নেয় এবং তার উপর মিথ্যা অপবাদের যে শাস্তি শরীয়তে নির্ধারিত রয়েছে (৮০টি বেত্রাঘাত) তা কার্যকর করা হয়, তাহলে তাদের মধ্যে পুনরায় বিবাহ জায়েয হবে। সুতরাং একথা বলা যাবে না যে, লিআনের দ্বারা যে বিচ্ছেদ হয়, তা আজীবনের জন্য। (فتح القدير ج٤ ص١٢٠)

দলীলঃ পবিত্র কুরআনে যে সকল নারীকে বিয়ে করা চিরদিনের জন্য হারাম (مُحَرَّمَات)-এর তালিকা রয়েছে, তাতে লিআনকারীদের উল্লেখ নেই। অতএব তা কিভাবে চিরদিনের জন্য হারাম হবে?

তাছাড়া বিচারক যখন স্বামীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্ন করে দিবে, তখন তা তালাকের হুকুমে গণ্য হবে। আর স্বামীর পক্ষ থেকে যে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন তাও তালাক হবে। অতএব, তালাকের দ্বারা যে বিচ্ছিন্নতা ঘটে, এর দ্বারা চিরদিনের জন্য বিয়ে হারাম হতে পারে না।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ

দলীল হিসেবে তাঁদের প্রদত্ত হাদীসের দ্বারা উদ্দেশ্য হল এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই লিআন অবস্থায় থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কখনও একত্রিত হতে পারবে না। আর একথা তো সবাই বলে থাকেন। সুতরাং হানাফীরাও উক্ত হাদীসের বিরোধী নন। অতএব, যখন মিথ্যা অপবাদের দরুণ স্বামীকে শাস্তি দেয়া হবে, তখন আর লিআন থাকবে না। কেননা তখন লিআনের মূল কারণই থাকে না। আর যখন লিআনই থাকল না, তখন তো একত্রিত হওয়ার অবৈধতাও অবশিষ্ট রইল না। কারণ এটা তো দুই লিআনকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। (بدائع الصنائع ج٣ ص٢٤٥-٢٤٦)

কেননা متلاعنين প্রকৃতপক্ষে স্বামী-স্ত্রীকে ঐ সময় পর্যন্ত বলা যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত লিআনের কার্যক্রম চলতে থাকে। যখনই উভয়ে লিআন থেকে ফারেগ হয়ে যাবে, প্রকৃত অর্থে তখন আর متلاعنين থাকে না, বরং তালাকে পরিণত হয়ে যায়।

<u>নিম্নে লিআনের কতিপয় বিধি-বিধান বর্ণিত হলঃ (হানাফী মাযহাব অনুসারে)</u>

(১) লিআন গৃহে গ্রহণযোগ্য নয়। বরং লিআনের জন্য আদালত জরুরী।
(২) লিআনের অধিকার স্বামী-স্ত্রী উভয়ের রয়েছে।
(৩) পূর্ণ বয়স্ক ও সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিই লিআন করতে পারে, অন্যরা নয়।
(৪) লিআন শুধুমাত্র স্বাধীন মুসলমান স্বামী ও স্ত্রীর ক্ষেত্রে কার্যকর হবে। কাফের, গোলাম ও কাযাফের অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্তের জন্য কার্যকর হবে না।
(৫) নিছক ইশারা-ইঙ্গিত কিংবা রূপক উপমা বা সংশয়-সন্দেহ করলেই লিআন কার্যকর হবে না, বরং স্পষ্ট ভাষায় যিনার অপবাদ দিতে হবে।
(৬) লিআনের পর এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে সে স্বামীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না; বরং তাকে তার মায়ের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হবে। তবে সন্তানকে জারজ বলা যাবে না।
(৭) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর বিরুদ্ধে অপবাদ দিলে লিআন কার্যকর হবে না। কেননা নারীটি এখন তার স্ত্রী নয়। অবশ্য যদি রাজঈ তালাক হয়, তবে ভিন্ন কথা।

(৮) স্বামী তার মহরের অর্থ স্ত্রীর কাছে ফেরত চাইতে পারবে না।
(৯) স্বামী যদি যিনার অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে কাযাফ-এর শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে।
(১০) স্ত্রী যদি স্বামী কর্তৃক আরোপিত অভিযোগ সত্য বলে স্বীকার করে অর্থাৎ লিআনে অবতীর্ণ হতে রাজি না হয়, তাহলে তাকে ব্যভিচারের শাস্তিস্বরূপ প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে হবে।
(১১) স্বামী যদি কসম খেতে ইতস্তত করে বা ছলনার আশ্রয় নেয়, তবে তাকে বন্দী করতে হবে, যতক্ষণ না সে শপথ করবে বা অভিযোগটি যে মিথ্যা একথা স্বীকার করবে। এ বিধান স্ত্রীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।
(১২) ইদ্দতের সময় স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে খরচ ও বাসস্থান পাবে না। কেননা সে তালাক কিংবা মৃত্যু ছাড়াই স্বামীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।
(১৩) লিআন সংঘটিত হওয়ার পর আদালত স্বামী এবং স্ত্রী উভয়কে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে, যাতে কেউ কারো উপর প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারে।

بَابٌ فِيْ الْقَافَةِ ص٣٠٩ ঃ নিদর্শন অনুসরণবিদ্যা

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُسَدَّدٌ وَابْنُ السَّرْحِ يَوْمًا مَّسْرُوْرًا وَّقَالَ عُثْمَانُ تُعْرَفُ اَسَارِيْرُ وَجْهِهِ فَقَالَ اَيْ عَائِشَةُ اَلَمْ تَرَى اِنَّ مُجْزِزَ الْمُدْلَجِيَّ رَئَ زَيْدًا وَّاُسَامَةَ قَدْ غَطَّيَا رُؤُوْسَهُمَا بِقَطِيْفَةٍ وَّبَدَتْ اَقْدَامُهُمَا فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَانَ اُسَامَةُ اَسْوَدَ وَزَيْدٌ اَبْيَضَ— (مسلم ج١ ص٤٧١ باب العمل بالحاق القائف الولد، نسائي ج٢ ص١١١ باب القافة، ابن ماجة ص١٧١)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার নিকট প্রবেশ করেন, রাবী মুসাদ্দাদ ও ইবন সারাহ্ বলেন, সন্তুষ্টচিত্তে। রাবী উসমান বলেন, তাঁর চেহারায় সন্তুষ্টির আভা প্রকাশ পেয়েছিল। এরপর তিনি বলেনঃ হে আয়িশা! তুমি কি দেখনি, মুজাযযায মুদলাজী দেখতে পেল যে, যায়িদ ও উসামা (রাঃ) তাদের মস্তক চাদর দিয়ে আবৃত করে রেখেছে; আর তাদের উভয়ের পা ছিল খোলা। তখন সে বলল, নিশ্চয়ই এ পাগুলি একে অপরের থেকে। (অর্থাৎ এদের মধ্যে রক্ত সম্পর্ক রয়েছে।) ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন, উসামা (রাঃ) ছিলেন কাল আর যায়িদ (রাঃ) ছিলেন ফর্সা।

বিশ্লেষণঃ قِيَافَة শব্দের আভিধানিক অর্থ হল- চিহ্ন ধরে অনুসরণ, হাবভাব, চিহ্ন দেখে মূল বস্তু নির্ধারণ করার জ্ঞান ইত্যাদি। এর মাদ্দাহ হল ق-و-ف
আর পারিভাষিক অর্থে قَائِف হল-

الذي يعرف النسب بفراسته ونظره الى أعضاء المولود- (المنجد الابجدي ص٧٧٧)
অর্থাৎ, স্বীয় দূরদর্শিতার সাহায্যে এবং শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখে যে বংশ চিনতে পারে।
* দরসে মিশকাত গ্রন্থের প্রণেতা বলেন, عِلْمُ الْقِيَافَة হল এমন একটি ইলম, যা চিহ্ন ও নিদর্শনের দ্বারা একজন অপরজনের সাদৃশ্যে পৌঁছানো হয়। এবং এর দ্বারা প্রশাখা (فُرُوْع- সন্তান)-কে মূল (أُصُوْل-পিতা)-এর সাথে সম্পৃক্ত করানো হয়।

(تنظيم الاشتات ج٢ ص٢٠٩، در س مشكوة ج٣ ص٤١)

এর আরেকটি সংজ্ঞা হল-هُوَ مَنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْآثَارِ وَمَعْرِفَةٌ شِبْهُ الرَّجُلِ بِالْحُيِّهِ وَأَبِيْهِ

(ابو داود حا شية ج١ ص٣٠٩ باب في القافة)

প্রশ্ন হল, قِيَافَة শরীয়তে গ্রহণযোগ্য কিনা। এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ
* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল, আওযাঈ এবং আতা (রহ.)-এর মতে শরীয়তে قِيَافَة-এর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। অতএব, বংশ প্রতিষ্ঠায় অনুমানকারীর উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে। (تنظيم الاشتات ج٢ ص٢٠٩)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।
উক্ত হাদীসে প্রতীয়মান হয় যে, মুজরায মুদলাজী যায়েদ ও উসামা (পিতা ও সন্তান) উভয়ের পা দেখে যখন তাদের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পেলেন, তখন মুনাফিকরা তাদের অপবাদ থেকে চুপ হয়ে যায় এবং নবী করীম (সাঃ)ও খুশী হয়ে আয়িশা (রাঃ)-কে এ ব্যাপারে খবর দেন। এতে বুঝা যায় যে, অনুমানকারীর উক্তি বংশ প্রতিষ্ঠায় গ্রহণযোগ্য। নতুবা নবী করীম (সাঃ) তার উক্তিতে খুশী হতেন না।

* ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে- শরীয়তে قِيَافَة -এর কোন মূল্যায়ন বা গ্রহণযোগ্যতা নেই। অতএব বংশ প্রতিষ্ঠায় অনুমানকারী قَائِف-এর কোন উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। (تنظيم الاشتات ج٢ ص٢٠٩)

দলীলঃ "ইলমুল কিয়াফাহ" একটি ধারণা ও আন্দাজমূলক বিষয়। এর দ্বারা একীনী ইলম ও প্রকৃত বিষয় অর্জন হয় না। আর শরীয়তের কোন হুকুম আন্দাজের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ–

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ। (হুজরাতঃ ১২)

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ দলীল হিসেবে তাঁরা যে হাদীসটি পেশ করেছেন, এর জবাব হল এই যে, হযরত উসামা (রাঃ)-এর বংশ তো শরীয়তের হুকুম দ্বারা প্রথমেই প্রমাণিত ছিল। কেবল মুনাফিকরাই সন্দেহ পোষণ করত। অতঃপর তাদের নিকট যেহেতু "ইলমুল কিয়াফাহ"-এর গ্রহণযোগ্যতা ছিল, এবং মুজরায মুদলাজীর উক্তি দ্বারা তাদের মুখ বন্ধ হয়ে গেল, এতে হযরত উসামা (রাঃ)-এর প্রমাণিত বংশের আরো বেশি দৃঢ়তা প্রকাশ পেল। আর এর ভিত্তিতেই নবী করীম (সাঃ) খুশি হয়েছিলেন। নবী করীম (সাঃ) قِيَافَة দ্বারা বংশ প্রমাণিত হওয়াতে খুশি হননি। কেননা, আন্দাজের দ্বারা বংশ প্রমাণিত হতে পারে না; বরং বংশ তো প্রমাণিত হবে শরীয়তের হুকুম দ্বারা। (درس مشكوٰة ج٣ ص٤١) আর তাহল-

... عَنْ عَائِشَةَ ... فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ– (ابو داود ج١ ص٣١٠ باب الولد للفراش، مسلم ج١ ص٤٧٠ باب الولد للفراش الخ، ترمذي ج١ ص٢١٩ باب الولد للفراش، نسائي ج٢ ص١١٠ الحاق الولد بالفراش الخ، ابن ماجة ص١٤٥)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। ... নবী করীম (সাঃ) বলেন, সন্তান হল যার বিছানায় জন্ম নিয়েছে তার এবং যিনাকারীর জন্য প্রস্তর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ উক্ত অনুচ্ছেদে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে-

... عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْيَمَنِ فَقَالَ اِنَّ ثَلٰثَةَ نَفَرٍ مِّنْ اَهْلِ الْيَمَنِ اَتَوْا عَلِيًّا يَخْتَصِمُوْنَ اِلَيْهِ فِيْ وَلَدٍ وَقَدْ وَقَعُوْا عَلَى امْرَأَةٍ فِيْ طُهْرٍ وَّاحِدٍ فَقَالَ لِاثْنَيْنِ مِنْهُمْ طِيْبَا بِالْوَلَدِ لِهٰذَا فَغَلَيَا ثُمَّ قَالَ لِاثْنَيْنِ طِيْبَا بِالْوَلَدِ لِهٰذَا فَغَلَيَا فَقَالَ اَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُوْنَ اِنِّيْ مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ فَاَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَه لِمَنْ قَرَعَ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدَتْ اَضْرَاسُه وَنَوَاجِذُه– (ابو داود ج١ ص٣٠٩ باب من قال بالقرعة اذا تنازعوا في الولد، نسائي ج٢ ص١١١ باب القرعة في الولد الخ)

অনুবাদঃ ... যায়িদ ইবন আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম (সাঃ)-এর খিদমতে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন ইয়ামন হতে জনৈক ব্যক্তি

আগমন করে বলেন, ইয়ামনের তিন ব্যক্তি আলী (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে একটি সন্তানের (মালিকানা) সম্পর্কে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, যারা একটি স্ত্রীলোকের সাথে একই তুহুরে উপগত হয়। তিনি (আলী রাঃ) তাদের মধ্যে দু'জনকে বলেন, এ সন্তানটি এ (তৃতীয়) ব্যক্তির। তারা উভয়ে চীৎকার করে উঠে। এরপর তিনি বলেন, বেশ তা হলে সন্তানটি তোমাদের দুজনের। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণেও তারা অস্বীকৃতি জানায়। আলী (রাঃ) বলেন, তোমরা পরস্পর ঝগড়াকারী, কাজেই আমি তোমাদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা করব। আর লটারীতে যার নাম উঠবে, সে সন্তানের পিতা হবে। আর সে ব্যক্তিকে অপর দু'ব্যক্তির জন্য দু'তৃতীয়াংশ ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করতে হবে। এর উপর তিনি তাদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা করেন এবং লটারীতে যার নাম আসে, তাকে তিনি সন্তান প্রদান করেন। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এত জোরে হেসে উঠেন যে, তাঁর সম্মুখের ও এর পার্শ্ববর্তী দন্ত মোবারক প্রকাশিত হয়। হাদীসটি পাঠান্তে কেউ হয়ত একথা মনে করতে পারেন যে, শরীয়তে লটারী জায়েয। কিন্তু আসলে বিষয়টি এমন নয়। এর ব্যাখ্যায় আহনাফরা বলেন যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে লটারীর হুকুম জায়েয ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে যায়। যেমন ইসলামের সূচনালগ্নে শরাব পান জায়েয ছিল। তাঁরা আরো বলেন যে, এই লটারী **حجت مثبتة** তথা কোন হককে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে নয়, বরং **حجت مرجحة** বা প্রতিষ্ঠিত হককে অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে। আর এই বৈধতা এখনো জায়েয রয়েছে। যেমন, কোন পিতা যদি দুটি ছেলে রেখে মারা যায় তবে মৃত পিতার জমি উভয়ে প্রাপ্ত হবে। কিন্তু কে কোন্ অংশ নেবে, দক্ষিণ অংশ কে নেবে এবং উত্তর অংশ কে নেবে এমতাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হককে অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে লটারীর মাধ্যমে তা নিশ্চিত করা জায়েয আছে। মোটকথা হল- লটারীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত হক-এ অগ্রাধিকার কায়েম করা জায়েয আছে। কিন্তু লটারীর মাধ্যমে হককে প্রতিষ্ঠা করা জায়েয নয়।

জবাবঃ উল্লিখিত হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, লটারীর মাধ্যমে হককে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর উত্তর হল এই যে, ইহা ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুআমেলা ছিল। কিন্তু পরে তা নিম্নে বর্ণিত হাদীসের দ্বারা রহিত হয়ে গেছে-

... عَنْ عَائِشَةَ ... فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوَلَدُ لِلْفَرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ – (ابو داود ج١ ص٣١٠، مسلم ج١ ص٤٧٠، ترمذي ج١ ص٢١٩، نسائي ج٢ ص١١٠، ابن ماجة ص١٤٥)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। ... নবী করীম (সাঃ) বলেন, সন্তান হল যার বিছানায় জন্ম নিয়েছে তার এবং যিনাকারীর জন্য প্রস্তর।

بَابُ مَنْ اَحَقُّ بِالْوَلَدِ ص٣١٠ ঃ সন্তানের অধিক হকদার কে?

...عَنْ هِلاَلِ بْنِ اُسَامَةَ اَنَّ اَبَا مَيْمُوْنَةَ سَلْمٰى مَوْلٰى مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ رَجُلِ صِدْقٍ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا جَالِسٌ مَّعَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ جَائَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَّهَا فَادَّعَيَاهُ قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَقَالَتْ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ رَطَنَتْ بِالْفَارِسِيَّةِ زَوْجِيْ يُرِيْدُ اَنْ يَّذْهَبَ بِابْنِيْ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهَا بِذٰلِكَ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ مَنْ يُّحَاقُّنِيْ فِيْ وَلَدِيْ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اللّٰهُمَّ اِنِّيْ لاَ اَقُوْلُ هٰذَا اِلاَّ اِنِّيْ سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ زَوْجِيْ يُرِيْدُ اَنْ يَّذْهَبَ بِابْنِيْ وَقَدْ سَقَانِيْ مِنْ بِيْرِ اَبِيْ عُقْبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُّحَاقُّنِيْ فِيْ وَلَدِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا اَبُوْكَ وَهٰذِهِ اُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ اَيِّهِمَا شِئْتَ فَاَخَذَ بِيَدِ اُمِّهٖ فَانْطَلَقَتْ بِهٖ– (نسائي ج٢ ص١١٢ باب القافة)

অনুবাদঃ ... হিলাল ইবন উসামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মায়মূনা সালমা যিনি মদীনার কোন এক সত্যবাদী ব্যক্তির আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি বলেন, একদা আমি যখন আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন সেখানে পারস্য দেশীয় জনৈক স্ত্রীলোক, তার সাথে একটি পুত্র নিয়ে আগমন করে; যাকে (পুত্র সন্তানকে) সে এবং তার স্বামী, যে তাকে তালাক দিয়েছিল সন্তান হিসাবে দাবী করতে থাকে। এরপর সে (মহিলা) ফার্সী ভাষায় বলে, হে আবু হুরায়রা! আমার স্বামী আমার পুত্রকে নিয়ে যেতে চায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, তোমরা উভয়ে (সন্তানের) ব্যাপারে লটারী কর। এরপর তিনি (আবু হুরায়রা) যখন তার নিকট জবাবের প্রত্যাশায় ছিলেন, তখন তার স্বামী সেখানে আগমন করে এবং বলে, আমার পুত্রের ব্যাপারে কে আমার সাথে ঝগড়া করতে চায়? আবু হুরায়রা বলেন, ইয়া আল্লাহ! আমি এ সম্পর্কে যা শুনেছি, তা ব্যতীত অধিক কিছু বলব না। একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট থাকাকালে জনৈকা মহিলাকে তাঁর নিকট এসে বলতে শুনি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্বামী আমার সন্তানকে নিয়ে যেতে চায়। আর অবস্থা এই যে, সে (সন্তান) আমাকে আবু উকবার কূপ হতে (পানি) এনে পান করায় এবং সে আমার খিদমতও করে। নবী করীম (সাঃ) বলেন, এদের উভয়ের মধ্যে সন্তানের ব্যাপারে লটারীর ব্যবস্থা কর। তখন তার স্বামী বলেন,

আমার থেকে আমার সন্তানকে কে ছিনিয়ে নিতে চায়? নবী করীম (সাঃ) সে সন্তানকে সম্বোধন করে বলেন, এ তোমার পিতা এবং এ তোমার মাতা। তুমি এদের মধ্যে যার খুশী হস্ত ধারণ কর। তখন সে (সন্তান) তার মাতার হস্ত ধারণ করলে তাকে নিয়ে সে (মাতা) চলে যায়।

বিশ্লেষণঃ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যদি কোন কারণে বিচ্ছেদ হয়ে যায়, তাহলে সন্তানের হকদার কে হবে- এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, এক্ষেত্রে সন্তানকে ইচ্ছা স্বাধীনতা দেয়া হবে। ঐ সন্তান যাকে নির্বাচন করবে, সে তার কাছেই থাকবে। (تنظيم الاشتات ج۲ ص۲۱۷)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসের শেষ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে- ... فَخُذْ بِيَدِ اَيِّهِمَا شِئْتَ فَاَخَذَ بِيَدِ اُمِّهٖ فَانْطَلَقَتْ بِهٖ

দলীল (২)ঃ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ غُلاَمًا بَيْنَ اَبِيْهِ وَاُمِّهٖ– (ترمذي ج۱ ص۲۵۲ باب ما جاء في تخيير الغلام الخ)

অর্থাৎ, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) এক সন্তানকে তার মা-বাপ নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেন।

উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সাঃ) পিতা-মাতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সন্তানকে ইচ্ছা স্বাধীনতা দিয়েছেন।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, যখন একটি সন্তান سَنَّ شُعُوْر বা উপলব্ধির বয়স পর্যন্ত পৌঁছে, যেমন নিজে নিজেই পানাহার, প্রস্রাব-পায়খানা, কাপড় পরিধান ও অযু করতে পারে, তাহলে এমতাবস্থায় পিতা বেশি হকদার হবে।

* ইমাম খাস্‌সাফ (রহ.) বলেন, উপলব্ধির বয়স হল সাত বছর। এবং এর উপরই ফাতওয়া। কেননা, এ সময় শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন হয় এবং এ কাজটি পিতার দ্বারাই সম্পাদিত হয়। এর পূর্বে ছেলে সন্তানের ক্ষেত্রে সাত বছর পর্যন্ত এবং মেয়ে সন্তানের ক্ষেত্রে নয় বছর পর্যন্ত মায়ের তত্ত্বাবধানে থাকবে, কেননা এ সময়ের লালন-পালন পিতার দ্বারা হতে পারে না। (درس مشكوة ج۳ ص۶٧، تنظيم الاشتات ج۲ ص۲۱۷)

দলীল (১)ঃ মালিক এবং বায়হাকী (রহ.) হতে বর্ণিত-

عَنْ اَبِيْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ اَنَّهٗ قَضٰى فِيْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لِاُمِّهٖ وَلَمْ يُخَيِّرْهُ وَكَانَ هٰذَا بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ اَحَدٌ–

অর্থাৎ, হযরত আবু বকর (রাঃ) আসেম ইবন উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ)-কে তার মায়ের অধীনে দিয়ে দেন এবং তাকে কোন ইচ্ছা স্বাধীনতা দেয়া হয়নি, আর এ ঘটনাটি সাহাবাগণের সামনেই ঘটেছিল। কিন্তু কেউ অপছন্দ করেননি।
এতে প্রমাণিত হয় যে, ছোট সন্তানকে ইচ্ছা স্বাধীনতা না দেয়ার ব্যাপারে সাহাবাগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দলীল (২)ঃ ছোট্ট বাচ্চাদেরকে তাদের ইচ্ছা স্বাধীনতার উপর ছেড়ে দেয়া আদৌ ঠিক নয়। কেননা, স্বল্প বুদ্ধির কারণে সে সঠিক নির্বাচন করতে পারবে না। দেখা যাবে সে এমন কোন অনুপযোগীকে নির্বাচন করে বসে আছে যার নিকট গেলে সে খেলাধুলার অধিক সুযোগ পাবে, যা ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে আদৌ কাম্য নয়।
(تنظيم الاشتات ج٢ ص٢١٧)

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ ইমাম শাফেঈ (রহ.) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে যে হাদীসদ্বয় উল্লেখ করেছেন, এর উত্তরে হানাফীগণ বলেন যে, এটি ছিল নবী করীম (সাঃ)-এর একটি খাস ঘটনা। সুতরাং এর দ্বারা প্রদত্ত দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। যার বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নের হাদীসে পাওয়া যায়-

... عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّيْ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ اَنَّهٗ اَسْلَمَ وَاَبَتِ امْرَاَتُهٗ اَنْ تُسْلِمَ فَاَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتِ ابْنَتِيْ وَهِيَ فَطِيْمٌ اَوْ شِبْهُهٗ وَقَالَ رَافِعٌ ابْنَتِيْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْعُدْ نَاحِيَةً وَقَالَ لَهَا اقْعُدِيْ نَاحِيَةً وَاَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ ادْعُوْهَا فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ اِلٰى اُمِّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتْ اِلٰى اَبِيْهَا فَاَخَذَهَا – (ابو داود ج١ ص٣٠٥ باب اذا اسلم احد الابوين الخ، نسائي ج٢ ص١١٢)

অর্থাৎ, ... আব্দুল হামীদ ইবন জাফর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার দাদা রাফি ইবন সিনান (রহ.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেও তাঁর স্ত্রী ইসলাম কবুল করতে অস্বীকার করে। তখন সে (তার স্ত্রী) নবী করীম (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হয়ে বলে, এ আমার কন্যা সন্তান। আর সে আমারই মত। অপরপক্ষে রাফি দাবী করেন, এ আমার কন্যা। নবী করীম (সাঃ) তাকে এক পার্শ্বে এবং তার স্ত্রীকে অপর পার্শ্বে বসতে বলেন এবং কন্যা সন্তানটিকে তাদের মাঝখানে বসিয়ে দেন। এরপর তিনি বলেন, এখন তোমরা উভয়ে তাকে আহবান কর। কন্যাটি তার মাতার দিকে আকৃষ্ট হলে, নবী করীম (সাঃ) বলেন, ইয়া আল্লাহ! তুমি একে (কন্যাকে) হেদায়েত দান কর। তখন সে তার পিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং সে (রাফি) তাকে গ্রহণ করেন।

মূলতঃ এটা ছিল নবী করীম (সাঃ)-এর জন্য একটি বিশেষ ঘটনা। কেননা, নবী করীম (সাঃ) তার জন্য অতি মঙ্গলের (হেদায়েত) দোয়া করেছিলেন। যা কবুলও হয়েছিল। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) ব্যতীত অন্যদের দোয়া কবুল হওয়ার কোন গ্যারান্টি নেই। তাই হতে পারে ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রাপ্ত সন্তানটি অকল্যাণের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে। যা আদৌ কাম্য নয়।

দ্বিতীয় জবাবঃ অথবা, নবী করীম (সাঃ) ইচ্ছা স্বাধীনতা এজন্য দিয়েছিলেন যে, নবী করীম (সাঃ) যদি স্বাধীনতা প্রদান ব্যতীত সন্তানকে পিতার নিকট হস্তান্তর করতেন, তাহলে তাঁকে এই বলে দোষারোপ করা হত যে, নবীজী মুআমিলাতের ক্ষেত্রে মুসলমানদের পক্ষপাতিত্ব করেছেন। (تنظيم الاشتات ج۲ ص۲۱۷)

بَابٌ فِيْ عِدَّةِ الْمَطَلَّقَةِ ص۳۱۱ ঃ তালাকপ্রাপ্তা রমনীর ইদ্দত

... عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ بْنِ السَّكَنِ الْاَنْصَارِيَّةِ اَنَّهَا طُلِّقَتْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ فَاَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ حِيْنَ طُلِّقَتْ اَسْمَاءُ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ فَكَانَتْ اَوَّلَ مَنْ اُنْزِلَتْ فِيْهَا الْعِدَّةُ لِلْمُطَلَّقَاتِ–

অনুবাদঃ ... আসমা বিনত ইয়াযীদ ইবন আস্ সাকান আল-আনসারীয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে তালাকপ্রাপ্তা হন। আর সে সময় তালাকপ্রাপ্তা রমণীর জন্য ইদ্দত পালনের কোন প্রয়োজন ছিল না। এরপর আল্লাহ তাআলা আসমার তালাকপ্রাপ্তির পর ইদ্দত সম্পর্কীয় আয়াত নাযিল করেন। আর তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম মহিলা, যার সম্পর্কে তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের জন্য ইদ্দত পালনের বিধান দিয়ে আয়াত নাযিল হয়।

বিশ্লেষণঃ ইদ্দত (عِدَّة)-এর আভিধানিক অর্থঃ عِدَّة শব্দটি বাবে نَصَرَ يَنْصُرُ-এর মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ হলো-

১. اَلْاِحْصَاءُ- গণনা করা

২. اَلْحِسَابُ- হিসাব করা

৩. সংখ্যা, কতিপয়, কতক ইত্যাদি।

ইদ্দত-এর পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

هِيَ الْوَقْتُ الَّذِيْ يَتَرَبَّصْنَ النِّسَاءُ بِاَنْفُسِهِنَّ مِنَ النِّكَاحِ بَعْدَ اِفْتِرَاقِ الْعَقْدِ–

অর্থাৎ, বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হবার পর মহিলাগণ যে সময়টুকু নিজেদেরকে বিবাহ হতে বিরত রাখে তাকে ইদ্দত বলা হয়।

* তানযীমুল আশতাত প্রণেতা বলেন, ইদ্দত বলা হয় ঐ সময়কালকে, যা স্ত্রীলোক স্বীয় স্বামীর মৃত্যু অথবা তালাক প্রদানের পর সন্তান প্রসবের মাধ্যমে অথবা হায়েয কিংবা মাসসমূহের মাধ্যমে গণনা করে থাকে। (تَنْظِيْمُ الاَشْتَات ج٢ ص٢١٠)

সংক্ষেপে বলা যায়- তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের শরীয়ত নির্ধারিত অতিবাহিত সময়কালকে ইদ্দত বলা হয়।

ইদ্দতের প্রকারভেদঃ ইদ্দত দু'ভাগে বিভক্ত-

১। বিবাহ বিচ্ছেদের কারণে ইদ্দতঃ তালাক বা খুলআর কারণে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ইদ্দত পালন করা।

২। স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইদ্দতঃ স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে স্ত্রীর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ইদ্দত পালন করা।

তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবা মহিলার ইদ্দতের পার্থক্যঃ

১। তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দতঃ যদি অপ্রাপ্ত বয়স্কা ও বৃদ্ধা (যার হায়েয বন্ধ হয়ে গেছে এমন মহিলা) হয়, তবে তালাকের অবস্থায় তিন মাস ইদ্দত পালন করতে হবে। যেমন, আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَالّٰئِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ ... فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ اَشْهُرٍ وَالّٰئِيْ لَمْ يَحِضْنَ

অর্থাৎ, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ঋতুবতী হওয়ার আশা নেই, ... তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস। আর যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি, তাদেরও অনুরূপ ইদ্দতকাল হবে। (তালাকঃ ৪)

আর যে নারীর হায়েয আসে এমন প্রাপ্ত বয়স্কা নারী তালাকপ্রাপ্তা হলে, সে ইদ্দত হিসেবে তিন হায়েয পালন করবে, নাকি তিন তুহুর পালন করবে, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوْءٍ-

অর্থাৎ, আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন কুরু (হায়েয) পর্যন্ত। (বাকারাঃ ২২৮)

উক্ত আয়াতে তিন قُرُوْءٍ পর্যন্ত অপেক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। আর অভিধানে قُرُوْءٍ শব্দটি হায়েয এবং তুহুর (পবিত্রতা) উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

* ইমাম মালিক ও শাফেঈ (রহ.), আয়িশা ও যায়িদ ইবন সাবেত (রাঃ) قُرُوْءٌ এর অর্থ তুহুর (পবিত্রকাল) গ্রহণ করে বলেন, এমন মহিলাকে ইদ্দত হিসেবে তিন তুহুর সময় অতিবাহিত করতে হবে। ইমাম আহমদ (রহ.)-এর একটি মতও তাই।

দলীলঃ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ... فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ اَمَرَ اللهُ اَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (مشكوة)
অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ... ইদ্দত হল সেই সময়, যখন আল্লাহ মহিলার তালাক দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।
উক্ত হাদীসে যে তুহুরে মহিলাকে তালাক দেয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে, একেই ইদ্দত বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, তুহুর দ্বারা ইদ্দত বুঝানো হবে। আর পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত তিন قُرُوْءٌ দ্বারা তিন পবিত্রকাল উদ্দেশ্য।

(تنظيم الاشتات ج٢ ص١٩٦، درس مشكوة ج٣ ص٣٤)

* ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী, আওযাঈ, নাখঈ, মুজাহিদ, আতা (রহ.) চার খলিফা (রাঃ) এবং আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী, তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে ইদ্দত হিসেবে তিন হায়েয সময় অতিবাহিত করতে হবে। কেননা, তাঁরা বলেন, পবিত্র কুরআনে তিন কুরু দ্বারা তিন হায়েয বুঝানো উদ্দেশ্য।
(تنظيم الاشتات ج٢ ص١٩٦، درس مشكوة ج٣ ص٣٤)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-
وَالّٰئِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ-
অর্থাৎ, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ঋতুবতী হওয়ার আশা নেই, তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস। (তালাকঃ ৪)
উক্ত আয়াতে লক্ষণীয় বিষয় হল- যদি কোন মহিলার হায়েয না আসে, এমতাবস্থায় তার জন্য তিন মাসকে ইদ্দত হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আর ইহাই হায়েযের স্থলাভিষিক্ত। এতে বুঝা যায় যে, হায়েযসম্পন্না মহিলার ইদ্দত হায়েয দ্বারাই হওয়া উচিত। কেননা, মূল ইদ্দত তো হায়েয। যেমন, আল্লাহ তাআলার বাণী-
فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا অর্থাৎ, যদি তোমরা পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও। (নিসাঃ ৪৩)
উক্ত আয়াতে মাটিকে পানির স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। মূল হল পানি। পানি থাকা অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয নয়। (تنظيم الاشتات ج٢ ص١٩٦)

দলীল (২)ঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস-

... اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْ سَبَايَا اَوْطَاسٍ لاَ تُوْطَأُ حَامِل حَتّٰى تَضَعَ وَلاَ حَائِض حَتّٰى تَسْتَبْرِئَ بِحَيْضَتِهَا– (مشكوة)

অর্থাৎ, আওতাসের বন্দীদের সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত গর্ভবতীর সাথে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত ঋতুবতীর সাথে সহবাস করবে না।

উক্ত হাদীসে اِسْتِبْرَاء رِحْم (জরায়ুর পবিত্রতা)-কে হায়েযের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আর ইদ্দতের উদ্দেশ্যই হল জরায়ু পবিত্রতা। সুতরাং বুঝা গেল যে, ইদ্দত হায়েযের দ্বারা হবে, তুহুর দ্বারা নয়।

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَلاَقُ الاَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَقُرُوْءُهَا حَيْضَتَانِ– (ابو داود ج١ ص٢٩٨ باب في سنة طلاق العبد، ترمذي ج١ ص٢٢٤ باب ان طلاق الامة لطليقتان، ابن ماجة ص١٥١)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, দাসীর জন্য তালাক হল দু'টি এবং তার ইদ্দতের সময় হল দু'হায়েয পর্যন্ত।

উক্ত হাদীসে দ্বারাও প্রমাণিত হল যে, ইদ্দত হায়েয দ্বারাই পালন করতে হবে।

তাছাড়া আয়াতে কারীমায় قروء শব্দটি উল্লেখ রয়েছে। যদিও قروء শব্দটি হায়েয ও তুহুর উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে হায়েযের অর্থটি গ্রহণ করাই উত্তম। হেদায়া গ্রন্থকার তাই বলেন। কেননা, قروء শব্দটি قَرْء-এর বহুবচন। যা কমপক্ষে তিনের উপর প্রয়োগ হয়। ঠিক তেমনিভাবে আয়াতে বর্ণিত ثلاثة (তিন) শব্দটিও নির্দিষ্ট। সুতরাং তিনের চেয়ে কম অথবা বেশি আমল করা ঠিক হবে না। অতএব, যে তুহুরে তালাক প্রদান করা হয়েছে, ইহাকে যদি ইদ্দতের মধ্যে গণ্য না করে ইহা ব্যতীত পরবর্তী তিন তুহুর আদায় করা হয়, তাহলে ফল দাঁড়ায় এই যে, তিন তুহুর এবং যে তুহুরে তালাক দিয়েছে এর কিছু অংশ তুহুর আদায় করা হবে। পক্ষান্তরে, যে তুহুরে তালাক প্রদান করা হয়েছে, তা যদি ইদ্দতের মধ্যে গণ্য করে আরো দু'তুহুর ইদ্দত পালন করা হয়, তাহলেও তা পুরোপুরি তিন তুহুর আদায় হচ্ছে না। বরং তিনের থেকে কিছু না কিছু কম হবেই। অর্থাৎ, قروء দ্বারা তুহুর উদ্দেশ্য হলে কোনক্রমেই পুরোপুরি তিন তুহুর আদায় করা সম্ভব নয়। অল্পক্ষণের জন্য হলেও কম-বেশি হবেই। সুতরাং قروء দ্বারা হায়েয অর্থ নিলে তিন সংখ্যাটির উপর পুরোপুরি আমল করা সম্ভব। আর ইহাই যুক্তিসঙ্গত। (تنظيم الاشتات ج٢ ص١٩٧، التوضيح ص٩٠)

জবাবঃ হাদীসে উল্লিখিত ইদ্দত দ্বারা তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং এতে তালাকের সময় বুঝানো উদ্দেশ্য।

আর একথার ইঙ্গিত (قَرِيْنَة) হল এই যে, এই কথার সম্বোধিত (مُخَاطَبْ) ব্যক্তি হলেন হযরত উমর (রাঃ)। আর তাঁর নিকট ইদ্দত হায়েয দ্বারা পালন করতে হবে, তুহুর দ্বারা নয়। সুতরাং قُرُوْء-এর অর্থ তুহুর নয় বরং হায়েয। অতএব, উক্ত হাদীস দ্বারা এক্ষেত্রে দলীল উপস্থাপন করা সহীহ নয়। (تنظيم الاشتات ج٢ ص١٩٧، درس مشكوة ج٣ ص٣٥)

বিধবা মহিলার ইদ্দতঃ

ক. গর্ভবতী নয় এমন মহিলার স্বামী মারা গেলে তার ইদ্দত হলো চার মাস দশ দিন।

দলীল (১)ঃ আল্লাহ্ তাআলার বাণী-

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا–

অর্থাৎ, আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেদের চারমাস দশদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা। (বাকারাঃ ২৩৪)

দলীল (২)ঃ ... عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ حَبِيْبَةَ حِيْنَ تُوُفِّيَ اَبُوْهَا اَبُوْ سُفْيَانَ فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فِيْهِ سُفْرَةُ خَلُوْقٍ اَوْ غَيْرِهٖ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا لِيْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ اَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ لِاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا الخ

(ابو داود ج١ ص٣١٤ باب احداد المتوفي عنها زوجها، بخاري ج٢ ص٨٠٣ باب تحد المتوفى عنها اربعة اشهر وعشرًا / ج١ ص١٧٠ باب احداد المرأة على غير زوجها، مسلم ج١ ص٤٨٦ باب وجوب الاحداد في عدة الوفاة الخ، ترمذي ج١ ص٢٢٧ باب عدة المتوفي عنها زوجها، نسائي ج٢ ص١١٧ ترك الزينة للحادة الخ)

অর্থাৎ, ... যায়নাব বিনত আবু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। যায়নাব (রাঃ) বলেন, একদা আমি উম্মে হাবীবার নিকট গমন করি। আর এই সময় তার পিতা আবু সুফিয়ান (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এ সময় তিনি হলুদ রংবিশিষ্ট সুগন্ধি তৈল অথবা অন্য কিছুর জন্য আহবান করেন। তদ্বারা একজন দাসী তাঁর কেশে তৈল

মেখে দেয়। এরপর তিনি চেহারায় তৈল মর্দন করেন। অবশেষে তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহারের আমার কোন প্রয়োজন নেই; তবে আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ইরশাদ করতে শুনেছিঃ যে সমস্ত মহিলা আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তাদের জন্য কোন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তিনরাতের অধিক শোক প্রকাশ করা হালাল নয়। <u>তবে স্বামীদের জন্য চারমাস দশদিন শোক প্রকাশ করবে।</u>

খ. গর্ভবতী মহিলার তালাকের ইদ্দত হল সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত, যতদিনই লাগুক না কেন।

দলীলঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- وَأُوْلَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

অর্থাৎ, আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। (সূরা তালাকঃ ৪)

গ. গর্ভবতী মহিলার স্বামী মারা গেলে তার ইদ্দত কী হবে, এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কেননা, প্রথম আয়াতের চাহিদা অনুযায়ী তার ইদ্দত চারমাস দশদিন হওয়া উচিত, পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আয়াতের মর্মানুযায়ী বুঝা যায়, তার ইদ্দত সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত হোক।

* হযরত আলী (রাঃ)-এর মতে, এমন মহিলার জন্য সন্তান প্রসব এবং চারমাস দশদিন উভয় ইদ্দতই পূর্ণ করা জরুরী। তাঁর অভিমতকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলা হয় যে, এমন মহিলার ইদ্দত হল দুটি সময়ের মধ্য থেকে অধিকতর দূরবর্তী সময় (أبعد الأجلين)। যেমন কারো সন্তান প্রসব স্বামীর মৃত্যুর ছয়মাস পরে হবে, এমতাবস্থায় চারমাস দশদিনকে ইদ্দত না ধরে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত ধরতে হবে। আবার কারো সন্তান প্রসব স্বামীর মৃত্যুর এক দু'মাস পরে হয়, এমতাবস্থায় সন্তান প্রসবকে ইদ্দত না ধরে চারমাস দশদিন ধরতে হবে। কেননা এতে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। প্রথমদিকে হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর অভিমতও এটাই ছিল।

* অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম ও চার ইমামের মতে, এমন মহিলার নির্ধারিত ইদ্দত হল, সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত, তা যত কম বা বেশি সময়ই হোক না কেন।

(درس ترمذي ج۳ ص۵۱۰)

দলীলঃ সুবাইয়াহ (রাঃ) যখন সন্তান প্রসবের পর বিবাহের পয়গাম প্রেরণের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন, তখন আবু সানাবিল ইবন বাকা এসে তাকে লক্ষ্য করে বললেন-

... مَا لِيْ أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْتَجِيْنَ النِّكَاحَ إِنَّكِ وَاللهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّ قَالَ لِيْ ذٰلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِيْ حِيْنَ

اَمْسَيْتُ فَاتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَافْتَانِيْ بِاَنْ قَدْ حَلَلْتُ حِيْنَ وَضَعْتُ حَمْلِيْ وَاَمَرَنِيْ بِالتَّزْوِيْجِ اِنْ بَدَالِيْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلاَ اَرٰى بَأْسًا اَنْ تَتَزَوَّجَ حِيْنَ وَضَعَتْ وَاِنْ كَانَتْ فِيْ دَمِهَا غَيْرَ اَنْ لاَّ يَقْرَبَهَا زَوْجُهَا حَتّٰى تَطْهُرَ- (ابو داود ج١ ص٣١٥ باب في عدة الحامل، بخاري ج٢ ص٨٠٢ باب واولات الاحمال اجلهن الخ، مسلم ج١ ص٤٨٦ باب انقضاء العدة المتوفي عنها الخ، ترمذي ج١ ص٢٢٦ باب في الحامل المتوفى عنها الخ، نسائي ج٢ ص١١٣ باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، ابن ماجة ص١٤٧)

অর্থাৎ, ... আমি তোমাকে সাজ-গোজ করতে দেখছি, মনে হয় তুমি পুনঃবিবাহ করতে চাচ্ছ। আল্লাহর শপথ! তুমি ততক্ষণ পুনরায় বিবাহ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি তোমার (মৃত স্বামীর) ইদ্দতকাল চারমাস দশদিন পূর্ণ না কর। সুবাইয়াহ বলেন, তার এরূপ উক্তি শ্রবণের পর, আমি রাতে কাপড়-চোপড় পরিধান করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট গমন করি এবং এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি এরূপ ফাতওয়া দেন যে, আমি তখনই হালাল হয়েছি, যখন আমি সন্তান প্রসব করেছি। এরপর তিনি আমাকে প্রয়োজনে বিবাহ করার নির্দেশ দেন। রাবী ইবন শিহাব (রহ.) বলেন, যদি সে এখন বিবাহ করে, তবে আমি এতে দোষের কিছু দেখছি না; যখন সে তার সন্তান প্রসব করেছে। আর এখনও যদি তার নিফাসের রক্ত থাকে, এতেও বিবাহ বন্ধনে কোন আপত্তি নেই। অবশ্য সে তা হতে পবিত্রতা হাসিলের পর তার স্বামীর সাথে সহবাস করতে পারবে।

উক্ত হাদীসের দ্বারা জমহুরের জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) উক্ত রেওয়ায়েত শোনার পর জমহুরের মাযহাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ মূল ব্যাপার হল এই যে, দ্বিতীয় আয়াত (وَاُوْلاَتُ الاَحْمَالُ) প্রথম আয়াত (وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ)-এর জন্য পারস্পরিক বিরোধের ক্ষেত্রে নাসেখ। আর যে সকল ফুকাহা اَبْعَدُ الأَجْلَيْن (দুটি সময়ের মধ্যে অধিকতর দূরবর্তী সময়)-এর উক্তিকে গ্রহণ করেছেন, এর একটি কারণ ছিল এই যে, তাঁদের নিকট সুবাইয়াহ আসলামী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতটি পৌঁছেনি, ফলে তা গ্রহণ করা ছিল অধিক সতর্কতামূলক।

দ্বিতীয় কারণ ছিল যে, কোন্ আয়াতটি প্রথমে নাযিল হয়ে মানসূখ হয়েছে এবং কোন্ আয়াতটি পরে নাযিল হয়ে নাসেখ হয়েছে, তা তাঁদের জানা ছিল না।

এ ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) বলেন-

مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَنَّ سُوْرَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرٰى (سورة الطلاق) نُزِلَتْ بَعْدَ الَّتِيْ فِيْ الْبَقَرَةِ–
অর্থাৎ, কেউ ইচ্ছা করলে আমি তার সাথে এই অর্থে মুবাহালা করব যে, মহিলাদের ছোট সূরা তথা সূরা তালাক সূরা বাকারার আয়াতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে।
তাছাড়া, হযরত উমর (রাঃ) বলেন-

لَوْ وَضَعَتْ وَ زَوْجُهَا عَلٰى سَرِيْرِهِ لاَنْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَيَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ–
অর্থাৎ, যদি স্বামী খাটিয়ার উপর থাকা অবস্থায়ও স্ত্রী সন্তান প্রসব করে তবুও তার জন্য ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। এবং তার জন্য অন্যত্র বিয়ে বসা জায়েয হবে।

(فتح القدير ج٤ ص١٤٢، البحر الرائق ج٤ ص١٣٣–١٣٤، الكوكب الدري ج٢ ص٢٧٠–٢٧١)

بَابُ فِيْ نَفَقَةِ الْمَبْتُوْتَةِ ص٣١١

তালাকে বায়েনপ্রাপ্তা মহিলার খোরপোষ

... عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اَنَّ اَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِب اَرْسَلَ اِلَيْهَا وَكِيْلَهُ بِشَعِيْرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْهَا مِنْ شَيْئٍ فَجَاءَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَه فَقَالَ لَهَا لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَة وَاَمَرَهَا اَنْ تَعْتَدَّ فِيْ بَيْتِ اُمِّ شَرِيْكٍ ثُمَّ قَالَ اِنَّ تِلْكَ امْرَأَة يَّغْشَاهَا اَصْحَابِيْ اعْتَدِّيْ فِيْ بَيْتِ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَاِنَّه رَجُلٌ اَعْمٰى تَضَعِيْنَ ثِيَابَكِ وَاِذَا حَلَلْتِ فَاٰذِنِيْنِيْ قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ اَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِيْ سُفْيَانَ وَاَبَا جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَاَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوْك لاَّ مَالَ لَه اِنْكِحِيْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَتْ فَكَرِهْتُه ثُمَّ قَالَ اِنْكِحِيْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَنَكَحْتُه فَجَعَلَ اللهُ تَعَالٰى فِيْهِ خَيْرًا وَاغْتُبِطْتُ– (مسلم ج١ ص٤٨٣–٤٨٤ باب المطلقة البائن لا نفقة لها، ترمذي ج١ ص٢٢٣ باب المطلقة ثلاثا الخ، نسائي ج٢ ص١١٩ باب الرخصة في خروج المبتوتة الخ)

অনুবাদঃ ... ফাতিমা বিনত কায়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আবু আমর ইবন হাফস তাকে তিন তালাক বায়েন প্রদান করেন, এমতাবস্থায় যে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। এরপর তার উকিল মারফত তার (ফাতিমার) নিকট কিছু আটা প্রেরণ করেন, যার ফলে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! এর অধিক কিছুই আমার নিকট তোমার পাওনা নেই। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে এ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি বলেনঃ তার নিকট

তোমার খোরপোষ পাওনা নেই। এরপর তিনি তাকে উম্মে শুরায়কের ঘরে অবস্থানপূর্বক তার ইদ্দত পূর্ণ করার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি বলেন, এ স্ত্রীলোকটি তার অধিক খরচের দ্বারা আমার সাহাবীকে ঢেকে ফেলেছে। তুমি উম্মে মাকতুমের ঘরে অবস্থান কর, আর সে হল একজন অন্ধ লোক, কাজেই (তুমি তোমার কাপড় খুলে রাখলেও) সে তোমাকে দেখবে না। এরপর তুমি যখন তোমার ইদ্দত পূর্ণ করবে, তখন আমাকে এ সম্পর্কে খবর দেবে। তিনি বলেন, এরপর আমি আমার ইদ্দত পূর্ণ করে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করি এবং বলি যে, মুআবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান ও আবু জাহাম উভয়ে আমার নিকট আমাকে বিবাহের উদ্দেশ্যে পয়গাম পাঠিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আবু জাহাম তো তার কাঁধ হতে তার লাঠি সরায় না, (অর্থাৎ অধিক মারধরকারী)। আর মুআবিয়া, সে তো ফকীর এবং তার কোন মাল নেই। তুমি বরং উসামা ইবন যায়িদকে বিবাহ কর। তিনি বলেন, তা আমার নিকট অপছন্দনীয় মনে হয়। তিনি পুনরায় বলেন, তুমি উসামা ইবন যায়িদকে বিবাহ কর। এরপর আমি তাকে বিবাহ করি। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এতে এত মঙ্গল প্রদান করেন, যার ফলে আমি অন্যের জন্য ঈর্ষার বস্তুতে পরিণত হই।

বিশ্লেষণঃ ফুকাহায়ে কিরামগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, রাজঈ তালাকপ্রাপ্তা এবং নিশ্চিত তালাকপ্রাপ্তা অন্তঃসত্ত্বা মহিলা ইদ্দত পালনকালে স্বামীর পক্ষ থেকে খোরপোষ ও বাসস্থান পাবে। এতে কোন মতানৈক্য নেই।

(درس ترمذي ج٣ ص٤٨٤، درس مشكوة ج٣ ص٤٢)

যেমন, আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَإِنْ كُنَّ أُوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ– (سورة الطلاق آية ٦)

অর্থাৎ, যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে। (তালাকঃ ৬)

প্রশ্ন হল, গর্ভবতী নয়, এমন মহিলাকে যদি নিশ্চিত তালাক প্রদান করা হয়, তাহলে ইদ্দত পালনের দিনগুলোতে স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রী খোরপোষ ও বাসস্থান পাবে কিনা- এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক ও শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, এমন মহিলাকে বাসস্থান দেয়া ওয়াজিব, খোরপোষ প্রদান করা ওয়াজিব নয়।

(احكام القرآن للجصاص ج٣ ص٤٥٩، عمدة القاري ج٢٠ ص٣٠٧)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন- اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ

অর্থাৎ, তোমরা সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্য সেরূপ গৃহ দাও। (তালাকঃ ৬)

উক্ত আয়াতে তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে বাসস্থান দেয়ার আদেশ প্রদান করা হয়েছে। তাই তাকে বাসস্থান দিতে হবে। পক্ষান্তরে, আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَاِنْ كُنَّ اُوْلاَتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ-

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, খোরপোষও প্রদান করা ওয়াজিব। তবে খোরপোষের ওয়াজিব হওয়াটা গর্ভবতী মহিলার সাথে শর্তারোপ করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট হল যে, গর্ভবতী নয় এমন মহিলার ক্ষেত্রে খোরপোষ প্রদান করা ওয়াজিব নয়। এমতাবস্থায় তাদের প্রমাণ হবে, **مفهوم مخالف** তথা বিপরীত অর্থ দ্বারা। নতুবা আয়াতে গর্ভবতী মহিলাকে নির্দিষ্ট করার কোন সার্থকতা থাকে না। (فتح الباري ج٩ ص٤٨٠)

দলীল (২)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। নবী করীম (সাঃ) বলেন-

لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অন্তঃসত্ত্বা নয় এমন নিশ্চিত তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ইদ্দত পালনকালে খোরপোষ পাবে না।

* ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, ইসহাক, আহ্লে যাহের, শাবী, হাসান বসরী, তাউস ও আতা (রহ.)-এর মতে, এমন মহিলার খোরপোষ এবং বাসস্থান কোনটিই নেই।

(ابو داود حاشية ج١ ص٣١٢، تنظيم الاشتات ج٢ ص٢١٠)

দলীলঃ ... عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلٰثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلاَ سُكْنٰى- **(ابو داود ج١ ص٣١٢ باب في نفقة المبتوتة، مسلم ج١ ص٤٨٥ ، ترمذي ج١ ص٢٢٣، نسائي ج٢ ص١١٩ باب نفقة البائنة، ابن ماجة ص١٤٨)**

অর্থাৎ, ... ফাতিমা বিনত কায়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার স্বামী তাকে তিন তালাক প্রদান করে। তখন নবী করীম (সাঃ) তার থাকার ও খোরপোষের জন্য কিছুই নির্ধারিত করেননি।

এতে প্রমাণিত হয় যে, অন্তঃসত্ত্বাহীন বায়েন তালাক অথবা তিন তালাকপ্রাপ্তা খোরপোষ ও বাসস্থান কিছুই পাবে না।

* ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসূফ ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, উল্লিখিত মহিলা ইদ্দতের সময়ে খোরপোষ ও বাসস্থান উভয়টিই পাবে। সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখঈ, ইবন শুবরামা, ইবন আবী লায়লা (রহ.) এবং হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব ও আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) প্রমুখের মাযহাব এটাই।

(عمدة القاري ج٢٠ ص٣٠٧-٣٠٨، احكام القرآن للجصاص ج٣ ص٤٥٩)

দলীল (১)ঃ পবিত্র কুরআনের আয়াত- وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ
অর্থাৎ, আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খরচ দেয়া পরহেযগারদের উপর কর্তব্য। (বাকারাঃ ২৪১)

উক্ত আয়াতে مَتَاع দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে খোরপোষ এবং বাসস্থান উভয়টি উদ্দেশ্য। আয়াতের যোগসূত্র পর্যালোচনা করলে তাই বুঝা যায়। কেননা, আয়াতে مُطَلَّقٰت শব্দটি ব্যাপক, যা রাজঈ তালাক ও তিন তালাক বা বায়েন তালাক উভয়টিকেই শামিল করে।

দলীল (২)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- .... اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ
উক্ত আয়াতটি দ্বারা বাসস্থান প্রদানের কথা প্রমাণিত হয়।
এবং ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর এক কিরআতে উল্লেখ আছে-

وَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ مِنْ وُّجْدِكُمْ (روح المعاني ج٢٨ ص١٣٩)

অর্থাৎ, এবং তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের জন্য ব্যয় কর।

উক্ত কিরআতটি দ্বারা খোরপোষের কথাও প্রমাণিত হয়। আর বিরল (شاذ) কিরআত খবরে ওয়াহিদের চেয়ে নিম্নপর্যায়ের নয়। (فتح الملهم ج١ ص٢٠٤)

দলীল (৩)ঃ তাহাবীতে হযরত ফাতিমা বিনত কায়েস (রাঃ)-এর ঘটনা উল্লেখ আছে যে, হযরত উমর (রাঃ) এ ব্যাপারে বলেন-

... سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَهَا السُّكْنٰى وَالنَّفَقَةُ– (مسلم ج١ ص٤٨٥، شرح معاني الآثار ج٢ ص٣٥)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, এ মহিলার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ রয়েছে।

দলীল (৪)ঃ ... عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنٰى وَالنَّفَقَةُ– (دار قطني ج٤ ص٢١)

অর্থাৎ, ... জাবির (রাঃ) সূত্রে নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য খোরপোষ এবং বাসস্থান রয়েছে।

দলীল (৫)ঃ ইজমা দ্বারাও হানাফীদের অভিমত প্রমাণিত হয়। নিম্নোক্ত হাদীসটিই এর প্রমাণ-

... عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ قَالَ كُنْتُ فِيْ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ مَعَ الاَسْوَدِ فَقَالَ اَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لاَ نَدْرِيْ اَ حَفِظَتْ اَمْ لاَ- وَفِيْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ لاَ نَدْرِيْ لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ لَهَا السُّكْنٰى وَالنَّفْقَةُ- (ابو داود ج١ ص٣١٣ باب من انكر ذٰلك على فاطمة، مسلم ج١ ص٤٨٥، ترمذي ج١ ص٢٢٣)

অর্থাৎ, ... আবু ইসহাক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা (কুফার) জামে মসজিদে আস্‌ওয়াদের সাথে (উপবিষ্ট) ছিলাম। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনত কায়েস উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি বলেন, আমরা আমাদের রবের কিতাব (কুরআন) ও আমাদের রাসূলের সুন্নতকে একজন মহিলার বক্তব্য অনুসারে পরিত্যাগ করতে পারি না। যে সম্পর্কে আমি জ্ঞাত নই যে, সে সঠিকভাবে উহা (হাদীস) হিফাযত করেছে কিনা।

হযরত উমর (রাঃ)-এর উক্ত বাণীকে কোন সাহাবী প্রত্যাখ্যান করেননি। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ ব্যাপারে সাহাবাদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দলীল (৬)ঃ কিয়াসের দ্বারাও হানাফীদের অভিমত প্রমাণিত হয়। কেননা, ইদ্দত পালনকারী নারী ইদ্দতের সময়ে (স্বামীর অধীনে) উপার্জনের দিক থেকে বন্দী। আর যার অধীনে বন্দী, খোরপোষ তার উপরই বর্তাবে। সুতরাং খোরপোষ ও বাসস্থান স্বামীর উপরই বর্তাবে।

তাছাড়া ইমাম জাস্‌সাস (রহ.) নিম্নোক্ত আয়াতটি দ্বারা তিনভাবে হানাফীদের অভিমত প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

اَسْكِنُوْاهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلاَ تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ-

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বসবাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্য সেরূপ গৃহ দাও। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন করো না। (তালাকঃ ৬)

(ক) যেরূপভাবে বাসস্থান একটি আর্থিক অধিকার তেমনিভাবে খোরপোষও অর্থনৈতিক অধিকার হওয়ার কারণে তা ওয়াজিব।

(খ) وَلاَ تُضَآرُّوْهُنَّ দ্বারা তালাকপ্রাপ্তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর ক্ষতি যেভাবে বাসস্থান না দিলে হয়, অনুরূপভাবে খোরপোষ না দিলেও হয়ে থাকে।

(গ) আয়াতে উল্লেখ আছে لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ অস্বচ্ছলতা এবং সংকীর্ণতা যেরূপভাবে বাসস্থান না দেয়ার কারণে হয়ে থাকে, তদ্রূপ খোরপোষ না দিলেও হয়।

সুতরাং তালাকপ্রাপ্তা নারী খোরপোষ ও বাসস্থান উভয়টিই পাবে।

জবাবঃ ইমাম মালিক ও শাফেঈ (রহ.) দলীল হিসেবে যে আয়াত পেশ করেছেন, এর জবাবে হানাফীগণ বলেন যে, উল্লিখিত প্রথম আয়াত দ্বারা তো তাদের কথামতই বাসস্থানের প্রমাণ মিলে। আর দ্বিতীয় আয়াতের ক্ষেত্রে তাঁরা যে مَفْهُوْمُ مُخَالِف বা বিপরীত অর্থ নিয়েছেন, আহনাফগণ তা গ্রহণ করেন না। কেননা, পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত আয়াতসমূহ দ্বারা যেখানে খোরপোষ ও বাসস্থান ওয়াজিব প্রমাণিত হয়, সেক্ষেত্রে বিপরীত অর্থ নেয়া কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য ও দলীলযোগ্য হতে পারে না।

তবে, আয়াতে স্বতন্ত্রভাবে গর্ভবতী তালাকপ্রাপ্তা মহিলার কথা উল্লেখ করার ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা হল এই যে, গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত অধিকাংশ সময় দীর্ঘায়িত হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় স্বামীর পক্ষে খোরপোষের ভার বহনে অনীহা চলে আসার সম্ভাবনা আছে বিধায় তাকে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, খোরপোষ সন্তান জন্মের পূর্ব পর্যন্ত দেয়া ওয়াজিব, চাই যত সময়ই অতিবাহিত হোক না কেন।

(احكام القرآن للجصاص ج٣ ص٤٥٩-٤٦٠، فتح الملهم ج١ ص٢٠٢-٢٠٣)

* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর প্রদত্ত হাদীসসমূহের (একত্রে) জবাব হলঃ

(১) হযরত ফাতিমা বিনত কায়েস (রাঃ)-এর হাদীসটিকে হযরত উমর (রাঃ) সাহাবায়ে কিরামের সামনে খণ্ডন করে দিয়েছেন, সুতরাং তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

(২) ফাতিমা বিনত কায়েস স্বীয় স্বামী ও ঘরওয়ালাদের সাথে ঝগড়া করতো। এজন্য নবী করীম (সাঃ) তাকে ঘর হতে বহিষ্কার করেছেন। সুতরাং এ হুকুম সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

... عَنْ مَيْمُوْنَ بْنِ مَهْرَانَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَدَفَعْتُ اِلٰى سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقُلْتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طُلِّقَتْ فَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا فَقَالَ سَعِيْدٌ تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ النَّاسَ اِنَّهَا كَانَتْ لَسِنَةً فَوُضِعَتْ عَلٰى يَدَيْ اُمِّ مَكْتُوْمِ الْاَعْمٰى- (ابو داود ج١ ص٣١٣ باب من انكر ذلك على فاطمة)

অর্থাৎ, ... মায়মূন ইবন মাহরান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (রিক্কা হতে) মদীনায় আগমন করি এবং সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের নিকট উপস্থিত হয়ে বলি, ফাতিমা বিনত কায়েসকে তালাক দেওয়া হয়েছে এবং তাকে তার ঘর হতে বহিষ্কার

করা হয়েছে। সাঈদ বলেন, সে মহিলা তো মানুষকে বিপদে ফেলেছে, আর সে তো মুখোরা রমণী। এরপর তাকে অন্ধ ইবন মাকতূমের হস্তে সোপর্দ করা হয়েছে।

(৩) হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, ফাতিমা বিনত কায়েস স্বীয় স্বামীর ঘরে একাকীত্বের কারণে নিঃসঙ্গতা অনুভব করত। তাই নবী করীম (সাঃ) তাঁকে অন্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতূম (রাঃ)-এর ঘরে ইদ্দত পালন করার অনুমতি দেন। তাই এটা ছিল তাঁর জন্য খাস।

... قَالَتْ عَائِشَةُ اِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِيْ مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيْفَ عَلٰى نَاحِيَتِهَا فَلِذٰلِكَ اَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– (بخاري ج٢ ص٨٠٢ باب المطلقة إذا خشي عليها النخ، ابن ماجة ص١٤٧)

অর্থাৎ, ... হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ফাতিমা স্বীয় স্বামীর ঘরে একাকি হওয়ার কারণে ভয় অনুভব করতেন। এজন্য প্রিয় নবী (সাঃ) তাকে আব্দুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম (রাঃ)-এর ঘরে ইদ্দত পালনের অনুমতি দিয়েছেন।

(৪) কতক আহনাফ জবাব দিতে গিয়ে বলেন, তাঁর স্বামী উকিল মারফত তাঁর জন্য খোরপোষ বাবদ কিছু আটা (তিরমিযীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী দশ সা') প্রেরণ করলে তিনি তা কম মনে করে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এবং এর চেয়ে অতিরিক্ত পাওয়ার নিমিত্তে নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট অভিযোগ করলে, তিনি (সাঃ) বলেন-

لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَة অর্থাৎ, (এর অতিরিক্ত) তোমাকে খোরপোষ দেয়া হবে না।

সুতরাং উক্ত বাক্য দ্বারা নবী করীম (সাঃ) সাধারণ খোরপোষ প্রদানকে নিষেধ করেননি; বরং এর দ্বারা তাঁর কাংক্ষিত অতিরিক্ত খোরপোষকে নিষেধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিম্নের কিতাবসমূহের হাদীস দ্রষ্টব্য।

(ابو داود ج١ ص٣١١ باب في نفقتي المبتوتة، مسلم ج١ ص٤٨٣ باب المطلقة الهائن النخ)

(৫) ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, হাদীসের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, ফাতেমা বিনত কায়েস ছিলেন একজন অবাধ্য ও কলহপ্রিয় স্ত্রীলোক। আর এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের হুকুম হল-

لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ–

অর্থাৎ, তোমরা তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয় যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়।

উক্ত আয়াতে লক্ষণীয় বিষয় হল, فَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ (সুস্পষ্ট নির্লজ্জ) শব্দটিকে হুকুম হতে ব্যতিক্রম (اِسْتِثْنَاء) হিসেবে আনা হয়েছে। আর কটুভাষা ও কলহপ্রিয়তাও فَاحِشَةٍ

مُبَيِّنَةٍ (সুস্পষ্ট নির্লজ্জ)-এর অন্তর্ভুক্ত। আর এর ভিত্তিতেই ফাতেমা বিনত কায়েস নিজের অপরাধের কারণে বাসস্থান হতে বঞ্চিত হয়েছেন।

(شرح معالني الآثار ج٢ ص٣٦-٣٧، احكام القرآن للجصاص ج٣ ص٤٦٢)

হাদীসে বর্ণিত আছে-

... عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِيْ خُرُوْجِ فَاطِمَةَ قَالَ اِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ مِنْ سُوْءِ الْخُلُقِ–

(ابو داود ج١ ص٣١٣ باب من انكر ذٰلك على فاطمة)

অর্থাৎ, ... সুলায়মান ইবন ইয়াসার হতে ফাতিমার বহিষ্কৃত হওয়ার হাদীস সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, তার এ বহিষ্কার ছিল তার বদ অভ্যাসের পরিণতি স্বরূপ। আলোচনার শেষ প্রান্তে বলা যায় যে, সর্বপ্রকার তালাকপ্রাপ্তা মহিলাই স্বামীর পক্ষ থেকে ইদ্দতের সময়ে বাসস্থান ও খোরপোষ পাবে। আর এ ব্যাপারে হযরত ফাতিমা বিনত কায়েসের হাদীস দ্বারা দলীল প্রদান করা সহীহ নয় এবং গ্রহণযোগ্যও নয়।

بَابُ فِيْ الْمَبْتُوْتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ ص٣١٣

বায়েন তালাকপ্রাপ্তা রমণীর ইদ্দতকালীন সময়ে দিনের বেলায় বাইরে যাওয়া

... عَنْ جَابِرٍ قَالَ طُلِّقَتْ خَالَتِيْ ثَلاَثًا فَخَرَجَتْ تَجِدُ نَخْلاً لَّهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا فَاَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَه فَقَالَ لَهَا اُخْرُجِيْ فَجُدِّيْ نَخْلَكِ لَعَلَّكِ اَنْ تُصَدِّقِيْ مِنْهُ اَوْ تَفْعَلِيْ خَيْرًا– (مسلم ج١ ص٤٨٦ باب جواز خروج المعتدة البائن الخ، نسائي ج٢ ص١١٩ باب خروج المتوفى عنها بالنهار)

অনুবাদঃ ... জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালাকে তিন তালাক (বায়েন) প্রদান করা হয়। এরপর তিনি খেজুর কর্তনের জন্য গমন করলে জনৈক ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাত হয়, যিনি তাকে (ইদ্দতকালীন সময়ে) ঘর হতে বের হতে নিষেধ করেন। তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাকে বলেন, তুমি বের হও এবং খেজুর কর্তন কর। যেন তুমি তা হতে কিছু সদকা কর অথবা ভাল কাজ কর।

বিশ্লেষণঃ তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ইদ্দতের সময় যে ঘরের মধ্যে থাকে, সে ঘর থেকে যদি বের হতে বাধ্য হয়, যেমন ঘর ভেঙ্গে যায় অথবা নিজ সত্ত্বা ও সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার আশংকা হয় অথবা গৃহকর্তা তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়, এমতাবস্থায় উক্ত তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ঘর থেকে বের হতে পারবে। এতে কোন মতানৈক্য নেই।

(تنظيم الاشتات ج٢ ص٢١١)

প্রশ্ন হল, উপরোল্লিখিত কারণ ছাড়া তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ইদ্দত চলাকালীন সময়ে ঘর হতে বের হতে পারবে কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বাল ও লাইস (রহ.)-এর মতে, দিনের বেলায় নিঃশর্তে বের হতে পারবে, কোন প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক এবং রাতের বেলায় খুব বেশি প্রয়োজন ব্যতীত বের হওয়ার অনুমতি নেই। (درس مشكوة ج٣ ص٤٣)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। فَقَالَ لَهَا اُخْرُجِي فَجُدِّيْ نَخْلَكِ

অর্থাৎ, তিনি (সাঃ) তাকে বলেন, তুমি বের হও এবং খেজুর কর্তন কর।

উক্ত হাদীসে খুব বেশি প্রয়োজনের কথা উল্লেখ নেই। বরং শুধু খেজুর কর্তনের জন্য বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাই সাধারণ কাজেও দিনে বের হতে পারবে।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, দিনে ও রাত্রে কোন সময়ই খুব বেশি প্রয়োজন ব্যতীত ঘর থেকে বের হতে পারবে না।

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَلَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلاَّ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ–

অর্থাৎ, তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয় যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। (তালাকঃ ১)

আল্লামা নাখঈ (রহ.) আয়াতে বর্ণিত فَاحِشَة (নির্লজ্জ) শব্দের অর্থ করেছেন نفس الخروج তথা প্রয়োজন ব্যতীত নিজ থেকেই বের হয়ে আসা। (تنظيم الاشتات ج٢ ص٢١١)

দলীল (২)ঃ আর প্রয়োজনে যে বাইরে বের হতে পারবে, এর দলীল অনুচ্ছেদের শুরুতেই বর্ণিত হয়েছে। যেমন- ... لَعَلَّكِ اَنْ تُصَدَّقِيْ مِنْهُ اَوْ تَفْعَلِيْ خَيْرًا–

অর্থাৎ, ... যেন তুমি তা হতে কিছু সদকা কর অথবা ভাল কাজ কর।

উক্ত বাক্যাংশে সদকা ও ভাল কাজকে বের হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করায় একথা বুঝা যায় যে, কোন দীনী ও দুনিয়াবী প্রয়োজনের জন্য বের হওয়া জায়েয। নতুবা জায়েয নয়।

জবাবঃ হানাফীগণ বলেন, উপরোল্লিখিত দলীলের মাধ্যমে জবাবও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যেখানে কুরআন-হাদীসে এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে, সেক্ষেত্রে তা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বাধাহীনভাবে ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া আদৌ সমীচীন নয়। (تنظيم الاشتات ج٢ ص٢١٢)

بَابُ فِيْ الْمُتَوَفّى عَنْهَا تُنْقَلُ ص٣١٤

যার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে তার ঘর হতে বের হওয়া

... عَنْ سَعَدِ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ كَعَبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِه زَيْنَبَ بِنْتِ كَعَبِ بْنِ عُجْرَةَ اَنَّ الْفَرِيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ وَهِيَ اُخْتُ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَخْبَرَتْهَا اَنَّهَا جَاءَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْاَلُهُ اَنْ تَرْجِعَ اِلٰى اَهْلِهَا فِيْ بَنِيْ خِدْرَةَ فَاِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِيْ طَلَبِ اَعْبُدٍ اَبِقُوْا حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِطَرَفِ الْقَدُوْمِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوْهُ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَرْجِعَ اِلٰى اَهْلِيْ فَاِنِّيْ لَمْ يَتْرُكْنِيْ فِيْ مَسْكَنٍ يَمْلِكَه وَلاَ نَفَقَةَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَتْ فَخَرَجْتُ حَتّٰى اِذَا كُنْتُ فِيْ الْحُجْرَةِ اَوْ فِيْ الْمَسْجِدِ دَعَانِيْ اَوْ اَمَرَنِيْ فَدُعِيْتُ لَه فَقَالَ كَيْفَ قُلْتِ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِيْ ذَكَرْتُ مِنْ شَانِ زَوْجِيْ قَالَتْ فَقَالَ امْكُثِيْ فِيْ بَيْتِكِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَه قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ اَرْسَلَ اِلَيَّ فَسَأَلَنِيْ عَنْ ذٰلِكَ فَاَخْبَرْتُه فَاتَّبَعَه فَقَضٰى بِه– (ترمذي ج١ ص٢٢٩ باب اين تعتد المتوفي الخ، نسائي ج٢ ص١١٦ عدة المتوفى عنها الخ)

অনুবাদঃ ... সাদ ইবন ইসহাক ইবন কাব ইবন উজরা তার ফুফু যায়নাব বিনত কাব উজরা হতে বর্ণনা করেছেন যে, ফারীআ বিনত মালিক ইবন সিনান, যিনি আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ)-এর ভগ্নি ছিলেন, তাকে বলেছেন যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তার গোত্র বনী খিদরাতে প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। কেননা, তাঁর স্বামী পলায়নপর গোলামদের অনুসন্ধানে বের হলে, তিনি তাদেরকে কুদুম নামক স্থানে দেখতে পান। এরপর তারা (গোলামেরা) তাকে হত্যা করে। কেননা, সে তার ঘরে আমার জন্য খোরপোষের কোন ব্যবস্থা রেখে যায়নি। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ হাঁ। রাবী বলেন, এরপর আমি তাঁর দরবার হতে নির্গত হয়ে, হুজরা অথবা (রাবীর সন্দেহ) মসজিদের মধ্যেই ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি আমাকে ডাকেন অথবা (রাবীর সন্দেহ) ডাকার জন্য নির্দেশ দেন। এরপর আমি তাঁর নিকট ফিরে গেলে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি বলেছিলে? আমি পুনরায় তাঁর নিকট আমার স্বামীর ব্যাপারটি বর্ণনা করি। রাবী বলেন, এতদশ্রবণে তিনি বলেনঃ তোমার ইদ্দত শেষ না

হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার (স্বামীর) ঘরে অবস্থান করবে। রাবী বলেন, এরপর আমি সেখানে চার মাস দশদিন অতিবাহিত করি। রাবী বলেন, উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে, তিনি এ হাদীসটি আমার নিকট হতে শ্রবণের উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তিকে পাঠান। সে আমার নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমি তাকে সে সম্পর্কে অবহিত করি। আর তিনি (উসমান রাঃ) এর অনুসরণ করেন এবং ঐ অনুসারে ফয়সালাও দিতেন।

বিশ্লেষণঃ স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী কোথায় ইদ্দত পালন করবে- এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* হযরত আলী, ইবন আব্বাস এবং আয়িশা (রাঃ)-এর মতে, স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর গৃহে ইদ্দত পালন করা স্ত্রীর জন্য জরুরী নয়; বরং সে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ইদ্দত পালন করতে পারবে এবং স্বীয় স্বামীর বাড়ি থেকেও স্থানান্তরিত হতে পারবে। এই মতের স্বপক্ষে ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর একটি উক্তি রয়েছে।

(تنظیم الاشتات ج۲ ص۲۱۲، درس مشکوۃ ج۳ ص۴۳)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস-

فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ أَرْجِعَ اِلٰى اَهْلِيْ فَاِنِّيْ لَمْ يَتْرُكْنِيْ فِيْ مَسْكَنٍ يَمْلِكُهٗ وَلاَ نَفَقَةَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ-

এতে বুঝা যায় যে, স্ত্রীর জন্য স্বামীর গৃহে ইদ্দত পালন করা জরুরী নয়। কেননা, বর্ণিত হাদীসের প্রথমাংশে স্ত্রীকে পরিবারে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। যদিও হাদীসের শেষাংশে ইরশাদ হচ্ছে- اُمْكُثِيْ فِيْ بَيْتِكِ অর্থাৎ, "তুমি তোমার (স্বামীর) ঘরে অবস্থান করবে।" আর এটি হচ্ছে একটি মুস্তাহাব হুকুম।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, আহমদ ইবন হাম্বল ও আওযাঈ (রহ.) সহ জমহুর সাহাবী ও তাবেঈগণের মতে, স্বামীর মৃত্যুর ঘর থেকে বের হওয়া জায়েয নয়; বরং তাতেই ইদ্দত পালন করা জরুরী। হাঁ, ঘর যদি aŸংস বা ভেঙ্গে যায় অথবা উত্তরসূরীরা তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়, তাহলে স্থানান্তরিত হতে পারবে। ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মতও তাই। (تنظیم الاشتات ج۲ ص۲۱۳، درس مشکوۃ ج۳ ص۴۳)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস- ... فَقَالَ امْكُثِيْ فِيْ بَيْتِكِ ...

অর্থাৎ, ... নবী করীম (সাঃ) বলেন, তুমি তোমার (স্বামীর) ঘরে অবস্থান করবে। উক্ত বাক্যাংশে নির্দেশের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। যা ওয়াজিব। বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (সাঃ) ফারিয়াকে প্রথমে তার পরিবারে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।

অতঃপর তৎক্ষণাৎ স্বামীর গৃহে অবস্থানের নির্দেশ দেন। সুতরাং স্বামীর ঘর ব্যতীত অন্য কোথাও ইদ্দত পালন করা জায়েয নয়।

জবাবঃ তাঁরা নবী করীম (সাঃ)-এর হাঁ সূচক (نَعَمْ) উক্তি দ্বারা যে দলীল পেশ করেন, এর জবাবে চার ইমাম বলেন যে, তিনি (সাঃ) প্রথমে তো হাঁ বলে অনুমতি দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই اُمْكُثِيْ فِيْ بَيْتِكِ বলে ঐ হুকুমকে রহিত করে দেন। অর্থাৎ শেষের বাক্যাংশ দ্বারা প্রথম বাক্যাংশ রহিত হয়ে গেছে। আর তাঁরা নির্দেশকে যে মুস্তাহাব হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন, এর উপর কোন ইঙ্গিত নেই, বরং প্রথমে হাঁ (نَعَمْ) বলে অনুমতি দিয়ে পরবর্তীতে اُمْكُثِيْ فِيْ بَيْتِكِ বলার দ্বারা একথা প্রমাণ করে যে, পূর্বের হাঁ-সূচক উক্তিটি রহিত হয়ে গেছে।

* উল্লেখ্য যে, বিধবা মহিলা যেহেতু ইদ্দত পালনকালীন অবস্থায় খোরপোষ পাবে না, তাই জীবিকা অন্বেষণের প্রয়োজনে দিনে এবং রাতের কিছু অংশে বাইরে বের হওয়া জায়েয আছে। তবে অনর্থক ঘোরাফেরা ও নিছক আনন্দের জন্য বের হওয়া জায়েয নয়। (تنظيم الاشتات ج٢ ص٢١٣)

بَابُ الْمَبْتُوْتَةِ لاَ يَرْجِعُ اِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ص٣١٦

তালাকে বায়েন (তিন তালাক) প্রাপ্তা রমণী ততক্ষণ তার স্বামীর নিকট ফিরে যেতে পারবে না; যতক্ষণ না সে অন্য স্বামী গ্রহণ করবে

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهٗ يَعْنِيْ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَه فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ اَنْ يُّوَاقِعَهَا اَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْاَوَّلِ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَحِلُّ لِلْاَوَّلِ حَتّٰى تَذُوْقَ عُسَيْلَةَ الْآخِرِ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَهَا- (بخاري ج٢ ص٨٠١ باب اذا طلقها ثلاثا الخ، مسلم ج١ ص٤٦٣ باب لا تحل المطلقة ثلثا الخ، ترمذي ج١ ص٢١٣ باب ما يطلق امرأته ثلاثا الخ، نسائي ج٢ ص٧٩ النكاح الذي تحل به الخ، ابن ماجة ص١٤٠)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে। এরপর সে (মহিলা) অপর একজনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তার সাথে নির্জন বাসও করে। এরপর তার সাথে সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক

প্রদান করে। এ মহিলা কি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে? তিনি (আয়িশা) বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, ঐ মহিলা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম স্বামীর জন্য (পুনর্বার গ্রহণ করা) হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় স্বামীর সহবাস সুখভোগ করে এবং সে ব্যক্তিও (দ্বিতীয় স্বামী) তার সাথে দৈহিক মিলনের সুখানুভব করে।

বিশ্লেষণঃ (১) প্রথম স্বামীর ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস শর্ত কিনা- এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছেঃ
* হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রাঃ)-এর মতে, তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা পুনরায় প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ বা হালাল হওয়ার জন্য দ্বিতীয় স্বামীর সাথে শুধু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া শর্ত, সহবাস শর্ত নয়।

দলীলঃ পবিত্র কুরআনের আয়াত-

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه–

অর্থাৎ, তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়া হয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীকে বিয়ে না করবে, তার জন্য হালাল নয়। (বাকারাঃ ২৩০)

উক্ত আয়াতে সহবাস (وطى)-এর কোন উল্লেখ নেই। যদি সহবাসের শর্ত হত, তাহলে আয়াতে তা উল্লেখ থাকত।

* চার ইমামসহ জমহুর উম্মতের মতে, তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা পুনরায় প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হওয়ার জন্য দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস করা শর্ত। শুধু عقد বা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই যথেষ্ট নয়।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

উক্ত হাদীসে পুনর্বার হালাল হওয়ার জন্য ذُوْقُ عُسَيْلَةَ-কে শর্ত করা হয়েছে। আর ذُوْقُ عُسَيْلَةَ বলা হয় সঙ্গম সুখ ভোগ করাকে। সুতরাং শুধু আক্‌দ যথেষ্ট নয়; বরং সহবাস করা শর্ত।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ

(১) আয়াতে যদিও সহবাসের কথা উল্লেখ নেই, কিন্তু حَدِيْث عُسَيْلَةَ (সঙ্গম সুখ হাদীসটি) মশহুর, সুতরাং এর দ্বারা শর্তযুক্ত করা জায়েয।

(২) অথবা, আয়াতে উল্লিখিত تَنْكِحَ (বিবাহ করা) শব্দটি আসলে تَوْطِيَ (সহবাস করা)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং সহবাসের শর্ত খোদ কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত। কেননা, আয়াতের দ্বারা যদি শুধু দ্বিতীয় বিবাহই উদ্দেশ্য হত, তাহলে তো

زَوْجًا غَيْرَهُ (দ্বিতীয় স্বামী) শব্দটি উল্লেখ করার দ্বারাই উদ্দেশ্য হাসিল হত। تَنْكِحَ শব্দটির উল্লেখের প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং সহবাস জরুরী।

(৩) অথবা, হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রাঃ)-এর নিকট হয়ত حَدِيْث عُسَيْلَة পৌঁছেনি। এবং আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, পরবর্তীতে হযরত সাঈদ (রাঃ) জমহুরের অভিমতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। অতএব, বিষয়টি নিয়ে কোন মতানৈক্যই নেই। (درس مشكوة ج٣ ص٣٧-٣٨)

كِتَابُ الصِّيَامِ ঃ রোযা অধ্যায়

بَابُ نَسْخِ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ ص٣١٧

"যারা রোযার সামর্থ্য রাখে অথচ রোযা রাখে না তারা ফিদ্‌য়া দিবে" আল্লাহ তাআলার এ বাণী মানসূখ (রহিত) হওয়া

... عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلاَكْوَعِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ، كَانَ مَنْ اَرَادَ مِنَّا اَنْ يُّفْطِرَ وَيَفْتَدِيْ فَعَلَ حَتّٰى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِيْ بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا— (بخاري ج١ ص٢٦١ باب وعلى الذين يطيقونه الخ، مسلم ج١ ص٣٦١ باب نسخ قول الله وعلى الذين الخ، ترمذي ج١ ص١٦٤ باب على الذين يطيقونه، نسائي ج١ ص٣١٨ تاويل قول الله وعلى الذين يطيقونه)

অনুবাদঃ ... সালামা ইবন আল-আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয়, "যারা সামর্থবান (অথচ রোযা রাখে না বা রোযা রাখার ক্ষমতা রাখে না) তারা মিসকীনদের ফিদ্‌য়া দিবে"- আমাদের মধ্যে যারা রোযা না রেখে ফিদ্‌য়া দেওয়ার ইচ্ছা করত, তারা তা করত। এরপর পরবর্তী আয়াত (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) নাযিল হওয়ায় পূর্ববর্তী আয়াতের হুকুম মানসূখ (রহিত) হয়ে যায়।

صوم বা রোযার আভিধানিক অর্থঃ শব্দগত দিক থেকে صَوْمٌ এবং صِيَامٌ উভয়টিই نَصَرَ يَنْصُرُ বাবে-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- اَلاِمْسَاكُ الْمُطْلَقُ عَنْ اَيِّ شَيْئٍ كَانَ অর্থাৎ, যেকোন কাজ থেকে বিরত থাকার নাম صوم বা রোযা। এজন্য সফর থেকে বিরত ঘোড়াকে আরবরা صَائِمٌ বলে থাকে এবং যে কথা বলা থেকে বিরত থাকে, তাকেও صَائِمٌ বলা হয়। (الفقه على المذاهب الاربعة ج١ ص٥٤١)

পবিত্র কুরআনে এ শব্দটির প্রয়োগ পাওয়া যায়-

اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا

অর্থাৎ, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে রোযা মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলব না। (মারইয়ামঃ ২৬)

المعجم الوسيط গ্রন্থে উল্লেখ আছে- (المعجم الوسيط ص٥٢٩) اَلاِمْسَاكُ عَنْ أَيِّ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ كَانَ

অর্থাৎ, যেকোন কথা বা কাজ থেকে বিরত থাকা।

* কেউ কেউ বলেন- صَوْم শব্দটি صَامَ يَصُوْمُ صَوْمًا থেকে বাবে نَصَرَ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- বিরত থাকা, নিবৃত্ত থাকা, রোযা রাখা, উপবাস থাকা ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, صَوْم তথা রোযাকে رَمَضَان (রামাযান)ও বলা হয়ে থাকে। এর কারণ হিসেবে বলা হয়, رَمَضَان শব্দটি رَمِضَ يَرْمَضُ رَمَضًا থেকে বাবে سمع হতে নিষ্পন্ন। আর رمض শব্দের অর্থ হচ্ছে- অধিক গরম, ভীষণ তাপ, অধিক তৃষ্ণা। আর যে বছর এই মাসের নামকরণ করা হয়, ঐ বছর এই মাসটি অধিক গরম ছিল বিধায় এর নাম رَمَضَان (রামাযান) রাখা হয়।

* আবার অনেকেই বলেন, رمض শব্দের অর্থ দগ্ধ হওয়া, পুড়ে যাওয়া, উত্তপ্ত হওয়া, জ্বলে যাওয়া। সুতরাং রোযা রাখার কারণে গোনাহসমূহ যেহেতু জ্বলে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এজন্য একে رَمَضَان বলে।

* আবার কেউ কেউ বলেন, رَمَضَان আল্লাহ তাআলার সুমহান নামসমূহের একটি। সুতরাং "شَهْرُ رَمَضَان" এর অর্থ হল "شَهْرُ الله" অর্থাৎ আল্লাহর মাস।

(فتح الباري ج٤ ص٩٦، عمدة القاري ج١٠ ص٢٦٥)

কিন্তু আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.) বলেন, এ রেওয়ায়েতটি দুর্বল। (فتح الملهم ج٣ ص١٠٦) পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ। অর্থাৎ রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন। (বাকারাঃ ১৮৫)

* কাশশাফ গ্রন্থকার লেখেন, রমযানের আসল অর্থ হল, প্রচণ্ড গরমে জ্বালা করা এবং কষ্ট বরদাশত করা। এই নামকরণের কারণ হল, এই মাসে রোযা রাখতে হয় এবং ক্ষুধার গরম বরদাশত করতে হয়। যা ছিল একটি পুরানো ইবাদত।

(قاموس القرآن ص٢٥٥)

সাওমের পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

১. আল্লামা জুরযানী (রহ.) সাওমের সংজ্ঞায় বলেন-

هُوَ الْاِمْسَاكُ عَنِ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ مِنَ الصُّبْحِ اِلَى الْمَغْرِبِ مَعَ النِّيَّةِ

অর্থাৎ, নিয়ত সহকারে সুবহে সাদিক হতে মাগরিব পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে দূরে থাকাকে সাওম বলা হয়।

২. আল্লামা আবুল হাসান সহ জমহুর উলামায়ে কিরাম বলেন-

الصَّوْمُ اِمْسَاكٌ مَخْصُوْص فِيْ زَمَان مَخْصُوْص عَنْ شَيْئٍ مَخْصُوْص بِشَرَائِطِ مَخْصُوْصَةٍ

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট শর্তাবলীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কতিপয় কার্য থেকে বিরত থাকার নাম সাওম।

৩. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْط অভিধানে বলা হয়েছে- هُوَ اِمْسَاكٌ عَنِ الْمُفَطِّرَات مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ اِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ مَعَ النِّيَّةِ (اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْط ص٥٢٩)

অর্থাৎ, নিয়ত সহকারে ফজর উদয় থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযা ভঙ্গকারী জিনিস থেকে বিরত থাকার নাম সাওম।

৪. হিদায়া গ্রন্থকার বলেন-

اَلصَّوْمُ اِمْسَاكٌ عَنِ الجِمَاعِ وَعَنْ اِدْخَالِ شَيْئٍ بَطْنًا لَهٗ مِن الفَجْرِ اِلَى الْغُرُوبِ عَن نِيَّةٍ

অর্থাৎ, ফজর থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়ত সহকারে সহবাস ও উদরে কোন বস্তু প্রবেশ করানো থেকে বিরত থাকার নাম হল সওম।

৫. اَلْاِمْسَاكُ عَنِ الْمُفَطِّرَاتِ حَقِيْقَةً اَوْ حُكْمًا فِيْ وَقْتٍ مَخْصُوْص بِنِيَّةٍ مِنْ اَهْلِهَا

(اللباب ج١ ص١٦٢ و الجوهرة ر ج١ ص١٦٦)

অর্থাৎ, নিয়তের যোগ্য ব্যক্তির নিয়ত সহকারে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রকৃত অথবা হুকমী রোযা ভঙ্গকারী জিনিস থেকে বিরত থাকা।

৬. اَلْاِمْسَاكُ عَنِ الْمُفَطِّرَاتِ يَوْمًا كَامِلاً مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ اِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ بِالشُّرُوْطِ– (الفقه على مذاهب الاربعة ج١ ص٥٤١)

রোযা ফরয হওয়ার সময়কালঃ রমযানের রোযা ফরয হয়েছিল হিজরতের দেড় বছর পর শাবান মাসের দশ তারিখে। (البداية والنهاية ج٣ ص٢٥٤-٢٤٧)

যেমন আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন-

"فُرِضَ الصَّوْمُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ فَصَامَ النَّبِيُّ تِسْعَ رَمَضَانَاتٍ" (فتح الباري ج٤ ص٨٧)

অর্থাৎ, রোযা দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়েছে। রাসূল (সাঃ) মোট নয়টি রমযানে রোযা রেখেছেন।

* আল্লামা ইবন কাসীর প্রমুখ বলেন, দ্বিতীয় বছরে রোযার পূর্বে কিবলা পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছে। এই বছরেই সাদকায়ে ফিতর ও সদকার (যাকাতের) পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। (معارف السنن ج٦ ص١)

এখানে উল্লেখ্য যে, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম আশুরা (দশই মহররম) ও اَيَّام الْبِيْض (চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫)- এর রোযা রাখতেন।
অতঃপর এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, এই রোযা তখন ফরয ছিল কিনা।
* শাফেঈদের অভিমত হল, রমযানের রোযার পূর্বে কোন রোযা ফরয ছিল না। বরং আশুরা ইত্যাদির রোযা প্রথমেও সুন্নত ছিল এখনও সুন্নত।
* হানাফীরা বলেন যে, রমযানের রোযার পূর্বে আশুরা ইত্যাদির রোযা ফরয ছিল। অতঃপর যখন নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন তা মানসূখ হয়ে যায়। আয়াতটি হল- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ অর্থাৎ, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার। (বাকারাঃ ১৮৩)

দলীল (১)ঃ ... عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ اَنَّ اَسْلَمَ اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هٰذَا قَالُوْا لاَ قَالَ فَاَتِمُّوْا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوْهُ قَالَ اَبُو دَاوُدَ يَعْنِي يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ– (ابو داود ج١ ص٣٣٢ باب في فضل صومه، البخاري ج١ ص٢٦٨–٢٦٩ باب صيام يوم عاشوراء، مسلم ج١ ص٣٦٠ باب صوم يوم عاشوراء)

অর্থাৎ, ... আব্দুর রহ্‌মান ইবন মাসলামা তাঁর চাচা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা (১০ই মুহাররম তারিখে) আসলাম গোত্রের লোকেরা নবী করীম (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি এদিন (আশুরার) রোযা রেখেছ? তারা বললেন, না। এতদশ্রবণে নবী করীম (সাঃ) বললেন, তোমরা অবশিষ্ট দিন আর কিছু না খেয়ে পূর্ণ কর। আর এটা কাযা করে নাও।
আবু দাউদ (রহ.) বলেছেন, অর্থাৎ আশুরার দিন।
উক্ত হাদীসে নবী করীম (সাঃ) আশুরার রোযা কাযা করার নির্দেশ দিয়েছেন। বস্তুতঃ কাযা হয় ফরয অথবা ওয়াজিবের ক্ষেত্রে।

দলীল (২)ঃ তাছাড়া মুআয ইবন জাবাল (রাঃ) থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে-

... قَالَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُوْمُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَاَنْزَلَ اللهُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ الخ (ابو داود ج١ ص٧٥ كتاب الصلوٰة باب كيف الاذان، مسند احمد ج٥ ص٢٤٦)

অর্থাৎ, ... তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রতি মাসে তিন দিন করে এবং আশুরার রোযা রাখতেন। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়, ‘‘তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা খোদাভীরু হও।’’ (বাকারাঃ ১৮৫)

এসব হাদীস রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে আশুরা ও اَيَّام بِيْض-এর রোযা ফরয হওয়া প্রমাণ করে।

যেহেতু রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পর আশুরার রোযা ফরয না হওয়ার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে, সেহেতু এখন আর উপরিউক্ত ইখতিলাফের কোন গুরুত্ব নেই।

(درس ترمذي ج٢ ص٥١٢–٥١٣)

রোযার প্রকারভেদ ও হুকুমঃ রোযা সাধারণত ৬ প্রকার-

(১) صَوْم مَفْرُوْض - ফরয রোযা। রমযানের এক মাস রোযা রাখা ফরয। যে রমযানের রোযা ফরয হওয়া অস্বীকার করবে, সে কাফের বলে গণ্য হবে। তাছাড়া রমযানের কাযা রোযাও ফরয। আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ... فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে .... কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। (বাকারাঃ ১৮৩-১৮৫)

(২) صَوْم وَاجِب - ওয়াজিব রোযা। যেমন- মান্নতের রোযা, কাফফারার রোযা।

(৩) صَوْم مَسْنُوْن - সুন্নত রোযা। ফরয কিংবা ওয়াজিব রোযা নয়, কিন্তু যে রোযা নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং রেখেছেন এবং উম্মতকে রাখতে বলেছেন, তা সুন্নত। এ ধরনের রোযা রাখলে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়। তবে না রাখলে গোনাহ হবে না। যেমন- আশুরার রোযা (মহররম মাসের ৯ এবং ১০ তারিখের দুটি রোযা), আরাফাতের দিনের রোযা (যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখের রোযা), আইয়ামে বীযের রোযা (প্রতি চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখের রোযা)

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ يَوْمًا تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَصُوْمُهُ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيْضَةَ وَتَرَكَ عَاشُوْرَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ– (ابو داود ج١ ص٣٣١ باب في صوم يوم عاشوراء، بخاري ج١ ص٢٦٨ باب صيام يوم عاشوراء/٢٥٤، مسلم ج١ ص٣٥٧-٣٥٨ باب صوم يوم عاشراء، ترمذي ج١ ص١٥٦ باب الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশগণ জাহেলিয়াতের যুগে আশুরার (১০ই মুহাররামের দিন) রোযা পালন করত। আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ও জাহেলিয়াতের যুগে (মদীনায় হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত মক্কায় অবস্থানকালে) ঐদিন রোযা রাখতেন। তিনি মদীনাতে আগমনের পর ঐদিন নিজে রোযা রাখেন এবং অন্যদেরকেও রোযা রাখতে নির্দেশ দেন। অতঃপর রমযানের রোযা ফরয করা হলে আশুরার রোযার আবশ্যকতা পরিত্যক্ত হয়। ইচ্ছা করলে কেউ তা রাখতে পারে এবং নাও রাখতে পারে।

(৪) صَوْم نَفْل - নফল বা মুস্তাহাব রোযা। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত বাদে সব রোযা সুন্নত বা মুস্তাহাব। যেমন- নিষিদ্ধ ৫ দিন (দু'ঈদের দিন এবং কুরবানী ঈদের পর আরো তিন দিন) ব্যতীত যে কোন দিন আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে রোযা রাখা।

(৫) صَوْم مَكْرُوه - মাকরূহ রোযা। যেমন- يَوْمُ الشَّكِّ বা সন্দেহের দিনে রোযা রাখা। (এ ব্যাপারে সামনে আলোচনা করা হবে।)

(৬) صَوْم حَرَام বা হারাম রোযা। বছরে পাঁচ দিন রোযা রাখা সম্পূর্ণরূপে হারাম। যেমন দু'ঈদের দিন ও আইয়ামে তাশরীকের তিন দিন (কুরবানীর ঈদের পরের তিন দিন) রোযা রাখা। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে-

... عَنْ اَبِيْ عُبَيْدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عُمَرَ فَبَدَاَ بِالصَّلٰوةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ صِيَامِ هٰذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ اَمَّا يَوْمُ الْاَضْحٰى فَتَاْكُلُوْنَ مِنْ لَّحْمِ نُسُكِكُمْ وَاَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِّنْ صِيَامِكُمْ– (ابو داود ج١ ص٣٢٨ باب في صوم العيدين، بخاري ج١ ص٢٦٧ باب صوم يوم الفطر، مسلم ج١ ص٣٦٠ باب تحريم صوم يوم العيدين، ترمذي ج١ ص١٦٠ باب كراهية الصوم يوم الفطر ويوم النحر، ابن ماجة ص١٢٤)

অর্থাৎ, ... আবূ উবায়েদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমরের (রাঃ) সাথে ঈদের নামায আদায় করি। এরপর তিনি খুতবার পূর্বে নামায আদায় করেন। পরে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ দু'দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন আর ঈদুল

আযহার দিন, তোমরা যে দিন কুরবানী করে থাক তার গোশত তোমরা ভক্ষণ করে থাক। আর ঈদুল ফিতরের দিন, তা তোমাদের রোযার ইফতারের দিন।

... عَنْ اَبِيْ مُرَّةَ مَوْلٰى اُمِّ هَانِئٍ اَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَلٰى اَبِيْهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ اِلَيْهِمَا طَعَامًا فَقَالَ كُلْ قَالَ اِنِّيْ صَائِمٌ فَقَالَ عَمْرٌو كُلْ فَهٰذِهِ الاَيَّامُ الَّتِيْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاْمُرُنَا بِاِفْطَارِهَا وَيَنْهٰى عَنْ صِيَامِهَا قَالَ مَالِكٌ وَّهِيَ اَيَّامُ التَّشْرِيْقِ– (ابو داود ج١ ص٣٢٨ باب صيام ايام التشريق)

অর্থাৎ, ... উম্মে হানীর আযাদকৃত গোলাম আবূ মুররা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি আব্দুল্লাহ ইবন আমরের সাথে তাঁর পিতা আমর ইবনুল আসের (রাঃ) নিকট গমন করেন। তিনি উভয়ের সম্মুখে কিছু খাদ্যদ্রব্য রেখে বলেন, খাও। আব্দুল্লাহ ইবন আমর বলেন, আমি তো রোযাদার। আমর (রাঃ) বলেন, তুমি খাদ্য গ্রহণ কর, কেননা এই দিনগুলোতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে ইফতার করতে নির্দেশ দিতেন এবং রোযা রাখতে নিষেধ করতেন। রাবী মালিক বলেন, তা ছিল তাশরীকের দিনসমূহ।

বর্তমানেও কি সক্ষম ব্যক্তি রোযা না রেখে ফিদয়া দিতে পারবে?

পবিত্র কুরআনের আয়াত- وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ

অর্থাৎ, আর যারা রোযা রাখতে সক্ষম, তারা এর পরিবর্তে ফিদয়া (একজন মিসকীনকে খাদ্য) প্রদান করবে। (বাকারাঃ ১৮৪)

উপরিউক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, রোগজনিত কিংবা সফরের কারণে নয়, বরং রোযা রাখার পূর্ণ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মনে না চাইলে অথবা অতি সাধারণ কোন সমস্যার কারণে রোযা না রেখে ঐ রোযার পরিবর্তে ফিদয়া প্রদান করার সুযোগ রয়েছে। প্রশ্ন হল, বর্তমানেও কি কোন সক্ষম ব্যক্তি রোযা না রেখে ফিদয়া দিতে পারবে?

প্রকৃত কথা হল- এ নির্দেশটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের, যখন লক্ষ্য ছিল লোকজনকে ধীরে ধীরে রোযা রাখতে অভ্যস্ত করে তোলা। অতঃপর فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ। অর্থাৎ অতএব তোমাদের মধ্যে যে এ মাসটি পাবে, সে এ মাসে রোযা রাখবে- উক্ত আয়াত দ্বারা প্রাথমিক নির্দেশটি সুস্থ সবল লোকদের ক্ষেত্রে রহিত করা হয়েছে। এখন রোযা রাখাই ফরয, ফিদয়া দেয়া চলবে না। হযরত সালামা ইবন আল আকওয়া (রাঃ)-এর হাদীসে তাই বলা হয়েছে।

হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) বলেন, তবে যে সব লোক অতিরিক্ত বার্ধক্যজনিত কারণে রোযা রাখতে অপারগ কিংবা দীর্ঘকাল রোগ ভোগের দরুণ

অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে, অথবা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছে, সেসব লোকের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত নির্দেশটি এখনো প্রযোজ্য রয়েছে। সাহাবী ও তাবেঈগণের সর্বসম্মত অভিমতও তাই। (معارف القرآن ج١ ص٤٤٥)

* এ ব্যাপারে হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) العرف الشذي গ্রন্থে নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, "রোযার পরিবর্তে ফিদয়া প্রদান করা প্রকৃতপক্ষে ইহা রমযানের রোযার ক্ষেত্রে বলা হয়নি। বরং প্রাথমিক অবস্থায় যখন كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে) আয়াত নাযিল হয়, তখন উক্ত আয়াত দ্বারা আশুরা এবং ايام بيض তথা প্রতি চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ রোযা রাখা ফরয করা হয়েছিল। আর এ সকল রোযার ক্ষেত্রে وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ আয়াতের দ্বারা ফিদয়া দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে যখন مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন তা রহিত হয়ে যায় এবং রমযানের রোযা ফরয করে দেয়া হয়।" (معارف السنن ج٦ ص٢٠٦-٢٠٧)

* আর একদল উলামা বলেন, হযরত হাফসা (রাঃ)-এর কিরআতে وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَه-এর স্থলে وَعَلَى الَّذِيْنَ لَا يُطِيْقُوْنَه উল্লেখ রয়েছে, যদি উক্ত আয়াতটি গ্রহণ করা হয়, তাহলে রহিতেরও প্রয়োজন হয় না, বরং আয়াতটি মুহকাম (محكم) মানতে হবে। তখন উক্ত আয়াতে যারা রোযা রাখতে একেবারেই অক্ষম কেবল তাদেরকেই ফিদয়া দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। (روح المعاني ج٢ ص٥٩)
যেমন হাদীসে এসেছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَه فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيْرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيْرَةِ الخ (ابو داود ج١ ص٣١٧ باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর বাণীঃ (অর্থ) "যারা সামর্থ্যবান তারা মিসকীনদের ফিদ্‌য়া প্রদান করবে। তিনি বলেন, এ আয়াতটি অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা লোকের জন্য ঐচ্ছিক ব্যবস্থা স্বরূপ।

ফিদইয়ার পরিমাণ ও আনুষঙ্গিক মাসআলাঃ একটি রোযার ফিদয়া অর্ধ সা (صاع) গম অথবা তার মূল্য। আমাদের দেশে প্রচলিত আশি তোলার সের হিসাবে অর্ধ সা

সমান এক সের সাড়ে বার ছটাক। এই পরিমাণ গম অথবা নিকটবর্তী প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী তার মূল্য কোন মিসকীনকে দান করে দিলেই একটি রোযার ফিদয়া আদায় হয়ে যাবে। ফিদয়া কোন মসজিদ বা মাদ্রাসায় কার্যরত কোন লোকের খিদমতের পারিশ্রমিক হিসেবে দেয়া জায়েয নয়। (معارف القرآن ج١ ص٤٤٥)

উল্লেখ্য যে, এক রোযার ফিদয়া দুই ব্যক্তিকে বন্টন করে দেয়া অথবা কয়েক রোযার ফিদয়া একই ব্যক্তিকে একই তারিখে প্রদান করা জায়েয নয়। এবং যদি কোন ব্যক্তি ফিদয়া প্রদানের সামর্থ্য না রাখে, তাহলে সে কেবল এস্তেগফার পড়বে এবং মনে মনে এ নিয়ত করবে যে, যখন সম্ভব হবে আদায় করে দিব।

(معارف القرآن ج١ ص٤٤٥)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারিণী সম্পর্কে সবাই একমত যে, তাদের জীবনের ব্যাপারে কোন প্রকার আশংকা হলে তাদের জন্য রোযা না রাখা জায়েয আছে। এমতাবস্থায় তারা পরবর্তীতে রোযা কাযা হিসেবে আদায় করে নেবে। নিজের জীবনের উপর আশংকাকারী রোগীর ন্যায় তাদেরকে ফিদয়া দিতে হবে না। এতটুকু পর্যন্ত ঐকমত্য রয়েছে। যদি রোযা রাখার ফলে অন্তঃসত্ত্বা মহিলার পেটের বাচ্চার এবং দুগ্ধদানকারিণী মহিলার স্বীয় দুগ্ধপোষ্য বাচ্চার ব্যাপারে কোনপ্রকার আশংকা হয় এমতাবস্থায়ও তাদের জন্য রোযা না রাখা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। তবে তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য হল-

* ইমাম শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, এমতাবস্থায় তারা উভয়ে কাযাও করবে এবং ফিদয়াও দিবে। হযরত ইবন উমর (রাঃ) ও মুজাহিদ (রহ.) থেকে ইহাই বর্ণিত আছে। ইমাম মালিক (রহ.)-এরও এক রেওয়ায়েত তাই।

তবে ইমাম মালিক (রহ.)-এর দ্বিতীয় রেওয়ায়েত ও লাইছ (রহ.)-এর মাযহাব হল, অন্তঃসত্ত্বা মহিলা কাযা করবে, কিন্তু তার দায়িত্বে ফিদয়া নেই। তবে দুগ্ধদানকারিণীর দায়িত্বে কাযা এবং ফিদয়া উভয়ই আছে।

* ইমাম ইসহাক (রহ.)-এর মতে, তাদের দায়িত্বে ফিদয়া আছে কিন্তু কাযা নেই। হযরত ইবন উমর ও ইবন আব্বাস (রাঃ) এবং ইবন যুবাইর (রাঃ) থেকেও এটিই বর্ণিত আছে।

* ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও তার সাথীদের মতে, এমতাবস্থায় তাদের দায়িত্বে শুধু কাযা আবশ্যক হবে। ইমাম আওযাঈ, সুফিয়ান, আবু উবায়দা, আবু সাওর, নাখঈ, যাহ্‌হাক এবং সাঈদ ইবন যুবাইর (রহ.)-এর মাযহাবও তাই।

(معارف السنن ج٦ ص٦٠)

দলীলঃ ... عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَّجُلِ مِّنْ بَنِيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعَبٍ اِخْوَة بْنِ قُشَيْرِ قَالَ اَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ لِرَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَيْتُ اَوْ قَالَ فَانْطَلَقْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ اجْلِسْ فَاَصِبْ مِنْ طَعَامِنَا هٰذَا فَقُلْتُ اِنِّيْ صَائِمٌ قَالَ اجْلِسْ اُحَدِّثُكَ عَنِ الصَّلٰوةِ وَعَنِ الصِّيَامِ اِنَّ اللهَ وَضَعَ شَطْرَ الصَّلٰوةِ اَوْ نِصْفَ الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ اَوِ الْحُبْلٰى الخ (ابو داود ج١ ص٣٢٧ باب من اختار الفطر، ترمذي ج١ ص١٥٢ باب الرخصة في الافطار للحبلى والمرضع، نسائي ج١ ص٣١٨ وضع الصيام عن الحبلى والمرضع، ابن ماجة ص١٢١)

অর্থাৎ, ... আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। কুশায়ের গোত্রস্থিত বনী আব্দুল্লাহ ইবন কাব সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি বলেন, আমাদের কওমের উপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অশ্বারোহী বাহিনী শেষ রাতে হামলা করলে আমি তাঁর নিকট গমন করি, অথবা (রাবীর সন্দেহ) আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে আহার করতে দেখি। তিনি আমাকে বলেন, তুমি বস এবং আমাদের সাথে এই খাদ্য ভক্ষণ কর। আমি বলি, আমি রোযাদার। এরপর তিনি বলেন, তুমি বস, আমি তোমার নিকট নামায ও রোযা সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করব। নিশ্চয় আল্লাহ মুসাফিরের জন্য নামাযের অর্ধেক উঠিয়ে দিয়েছেন এবং দুগ্ধদানকারিণী মাতা ও গর্ভবর্তী স্ত্রীলোকের উপর হতে রোযা সরিয়ে দিয়েছেন।

بَابُ مَنْ قَالَ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُوْمُوْا ثَلٰثِيْنَ ص٣١٨

যদি রমযানের উনত্রিশ তারিখে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে তোমরা ত্রিশ রোযা পূর্ণ করবে

... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُقَدِّمُوْا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَّلاَ يَوْمَيْنِ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ شَيْئٌ يَّصُوْمُهُ اَحَدُكُمْ وَلاَ تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ ثُمَّ صُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ حَالَ دُوْنَه غَمَامَةٌ فَاَتِمُّوْا الْعِدَّةَ ثَلٰثِيْنَ ثُمَّ اَفْطِرُوْا وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ– (بخاري ج١ ص٢٥٦ باب قول النبي صلعم اذا رأيتم الهلال الخ، مسلم ج١ ص٣٤٧–٣٤٨ باب وجوب صوم رمضان الخ، ترمذي ج١ ص١٤٧ باب لا تتقدموا الشهر بصوم، نسائي ج١ ص٣٠١ اكمال شعبان ثلٰثين الخ، ابن ماجة ص١٢٠)

অনুবাদঃ ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা রমযানের মাস আগমনের এক বা দু'দিন পূর্বে রোযা রাখবে না, অবশ্য যদি কেউ এরূপ রোযা রাখায় অভ্যস্ত থাকে, তবে স্বতন্ত্র ব্যাপার। আর রমযানের চাঁদ দেখার পূর্বে তোমরা রোযা রাখবে না এবং শাওয়ালের চাঁদ দেখার পূর্ব পর্যন্ত রমযানের রোযা রাখবে। আর যদি এর মধ্যে মেঘাচ্ছন্নতা থাকে, তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে এবং পরে ইফতার করবে। আর চন্দ্রমাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়।

চাঁদ দেখার হুকুমঃ নতুন চাঁদ দেখা মুসলমানদের জন্য একটি অপরিহার্য কাজ। কারণ চাঁদ দেখার উপর ইসলামের অনেক আহ্‌কাম নির্ভর করে। অনেকের মতে, চাঁদ দেখা 'ওয়াজিবে কিফায়া'। অর্থাৎ সমাজের সবার উপরই চাঁদ দেখার দায়িত্ব। যদি একজনও এ দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে সবাই গোনাহগার হবে।

চাঁদের অস্তিত্ব গণ্য হবে, নাকি দর্শন?

সকল উলামা ও ফুকাহা এ মাসআলায় একমত পোষণ করেন যে, চাঁদের দর্শন গণ্য হবে, এর অস্তিত্ব গণ্য হবে না। কেননা চাঁদের দর্শন অনুযায়ী রোযা রাখার জন্য কুরআন ও হাদীসে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ অর্থাৎ, অতএব তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসে রোযা রাখবে। (বাকারাঃ ১৮৫)

এবং হাদীসে এসেছে, وَلَا تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ ثُمَّ صُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ

(পূর্ণ হাদীসটি অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে)

অপর এক হাদীসে এসেছে,

... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ-

(بخاري ج١ ص٢٥٦، مسلم ج١ ص٣٤٧، نسائي ج١ ص٣٠١، ابن ماجة ص١٢٠)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) রমযানের কথা আলোচনা করে বললেন, তোমরা চাঁদ দেখার পূর্বে রোযা রেখ না। আর চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা ঈদের জন্য রোযা ভেঙ্গ না এবং যদি তোমাদের নিকট চাঁদ গোপন থাকে তাহলে হিসাব করে নাও।

মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.)-এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে হাদীসে رؤيت শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর আরবী ভাষায় এ শব্দটি প্রসিদ্ধ। যার অর্থ হল, কোন জিনিসকে চোখে দেখা। এছাড়া অন্য কোন অর্থে যদি ব্যবহার করা হয়, তবে তা প্রকৃত অর্থ নয়, বরং রূপক অর্থ হবে। অতএব, ইরশাদে নববীর সারনির্যাস

হল এই যে, সমস্ত শরঈ বিধি বিধান যেগুলো চাঁদ উঠা না উঠার সাথে সংশ্লিষ্ট, সেগুলোতে চাঁদ উঠার অর্থ হল, সাধারণ চোখে পরিদৃষ্ট হওয়া। এতে বুঝা গেল আহ্কামের নির্ভরশীলতা দিগন্তে চাঁদের অস্তিত্বের উপর নয়, বরং দেখার উপর। যদি দিগন্তে চাঁদ বিদ্যমান থাকে কিন্তু কোন কারণে দর্শনযোগ্য না হয়, তাহলে শরঈ আহ্কামে এই অস্তিত্ব ধর্তব্য হবে না।

হাদীসের এই অর্থটিকে এই হাদীসের শেষ বাক্যটি আরো বেশি স্পষ্ট করে তুলেছে। যাতে ইরশাদ হয়েছে, যদি চাঁদ তোমাদের থেকে গোপন থাকে অর্থাৎ, তোমাদের চোখগুলো তা দেখতে না পায় তাহলে তোমাদের উপর এই দায়িত্ব চাপানো হয়নি যে, অংকের হিসাব লাগিয়ে চাঁদের অস্তিত্ব ও জন্ম জেনে নাও এবং এর উপর আমল কর। অথবা দূরবীনের মাধ্যমে সূর্য রশ্মি থেকে অথবা উড়োজাহাজে উড্ডয়ন করে মেঘের উপর যেয়ে চাঁদের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ কর। বরং তিনি বলেছেন, "যদি তোমাদের কাছে চাঁদ গোপন থাকে তবে ৩০ দিন পূর্ণ করে মাস শেষ মনে কর।"

এখানে غُمَّ শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই শব্দটির আভিধানিক অর্থ আরবী বাগধারায় কামূস ও শরহে কামূস সূত্রে এই-

غَمَّ، غَمُّ الْهِلاَلِ عَلَى النَّاسِ غَمًّا اِذَا حَالَ دُوْنَ الْهِلاَلِ غَيْمٌ رَقِيْقٌ اَوْ غَيْرُهٗ فَلَمْ يُرَ الْهِلاَلُ عَلَى النَّاسِ- (تاج العروس شرح قاموس)

অর্থাৎ, غم তখন বলা হয়, যখন নতুন চাঁদের উপর মেঘ অথবা অন্য কোন বস্তু প্রতিবন্ধক হয়, আর চাঁদ দেখা না যায়। যদ্বারা বোঝা গেল, চাঁদের অস্তিত্ব স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বীকার করে এই হুকুম দিয়েছেন। কারণ, গোপন হওয়ার জন্য মওজুদ থাকা আবশ্যক। যে জিনিস অস্তিত্ববানই নয়, সেটাকে বলা হয় অস্তিত্বহীন।

(رؤيت هلال ص١٥-٣٠)

তিরমিযীতে বর্ণিত আছে-

... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فَاِنْ حَالَتْ دُوْنَهٗ غَيَابَةٌ فَاَكْمِلُوْا ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا- (ترمذي ج١ ص١٤٨ باب الصوم لرؤية الهلال والافطار له)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেন, ... যদি চাঁদের সামনে মেঘখণ্ড প্রতিবন্ধক হয় তাহলে ৩০ দিন পূর্ণ কর।

যদ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটা তখনকার বিবরণ যখন চাঁদ দিগন্তে মওজুদ থাকে, কিন্তু কোন কারণবশতঃ যদি দৃষ্টিগোচর না হয়- এমতাবস্থায়ও ত্রিশ দিন পূর্ণ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। (درس ترمذي ج٢ ص٥٢١)

অংকের প্রসিদ্ধ ইমাম আবু রায়হান আল-বেরুনী স্বীয় গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, প্রথম তারিখের চাঁদ সম্পর্কে অকাট্য হিসাব করা সম্ভব নয়। কারণ হিসাবের পদ্ধতি যতই উন্নত হোক তা সত্ত্বেও এগুলোতে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা সর্বাবস্থায় বিদ্যমান।

(الاثار الباقية ص١٩٨)

সুতরাং কুরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, শুধুমাত্র দিন পঞ্জিকা বা ক্যালেন্ডার হিসাব করে চাঁদ আকাশে হওয়া বা না হওয়ার ফয়সালা করে মাস প্রমাণিত হতে পারে না।

بَابُ اِذَا رَاَى الْهِلاَلَ فِيْ بَلَدٍ قَبْلَ الْآخَرِيْنَ بِلَيْلَةٍ ص٣١٩

যদি কোন অঞ্চলে অন্যান্য অঞ্চলের এক রাত পূর্বে চাঁদ দেখা যায়।

... عَنْ كُرَيْبٍ اَنَّ اُمَّ الْفَضَلِ ابْنَةَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ اِلٰى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا فَاسْتَهَلَّ رَمَضَانُ وَاَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْنَا الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فِيْ آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِيْ بْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ مَتٰى رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ قُلْتُ رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قَالَ اَنْتَ رَأَيْتَهُ قُلْتُ نَعَمْ وَ رَاهُ النَّاسُ وَصَامُوْا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ قَالَ لٰكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُوْمُه حَتّٰى نَكْمُلَ الثَّلاَثِيْنَ اَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ اَفَلاَ تَكْتَفِيْ بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهٖ قَالَ لاَ هٰكَذَا اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– (مسلم ج١ ص٣٤٨ باب بيان ان كل بلد رؤية الخ، ترمذي ج١ ص١٤٨ باب لكل اهل بلد رؤيتهم، نسائي ج١ ص٣٠٠ اختلاف اهل الافاق في الرؤية)

অনুবাদঃ ... কুরায়েব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে ফাযল বিনত আল-হারিস তাঁকে মুআবিয়ার নিকট শাম (সিরিয়া) দেশে প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, আমি সিরিয়া পৌঁছে তার প্রয়োজন পূর্ণ করি। আমি সিরিয়া থাকাবস্থায় রমযানের চাঁদ উঠে এবং আমরা উহা জুমুআর রাত্রিতে অবলোকন করি। এরপর আমি রমযানের শেষের দিকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি। ইবন আব্বাস (রাঃ) আমাকে সফর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন এবং বিশেষ করে চাঁদ দেখা সম্পর্কে বলেন, তোমরা রমযানের চাঁদ কখন দেখেছিলে? আমি বলি, আমি তা জুমুআর রাতে দেখেছি। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি নিজেও কি তা দেখেছিলে? আমি বলি, হ্যাঁ এবং লোকেরাও দেখে এবং তারা রোযা রাখে, এমনকি মুআবিয়াও রোযা রাখেন। তিনি বলেন, আমরা তো তা শনিবারে দেখেছি। কাজেই আমরা ত্রিশ দিন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত

রোযা রাখব অথবা শাওয়ালের চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রেখে যাব। আমি জিজ্ঞাসা করি, মুআবিয়ার দর্শন ও রোযা রাখা কি এ ব্যাপারে যথেষ্ট নয়? তিনি বলেন, না। আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

বিশ্লেষণঃ اِخْتِلاَف المَطَالِع। তথা চন্দ্রের উদয়স্থলের যে ভিন্নতা রয়েছে এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। দেশসমূহের দূরত্বের পার্থক্যের কারণেই এ ভিন্নতা ঘটে থাকে। যেমন কোন দেশে দেখা যায়, যে চাঁদ এক রাতে উদয় হয়েছে অন্য দেশে পরের রাতে উদয় হয়েছে, এমনিভাবে একই চাঁদ এক জায়গায় উদয় হচ্ছে, অন্য দেশে অস্ত যাচ্ছে। কোথাও রাত হচ্ছে, আবার কোথাও দিন হচ্ছে। অতএব, চন্দ্রের উদয়স্থলের ভিন্নতার কারণে এক দেশের অধিবাসীদের চাঁদ দেখা দ্বারা অন্য দেশের অধিবাসীদের জন্য এটি ধর্তব্য হবে কিনা, এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, উদয়স্থলের বিভিন্নতার কারণে এক দেশে চাঁদ দেখা অন্য দেশের অধিবাসীদের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং প্রত্যেক অঞ্চলের লোক নিজস্ব চাঁদ দেখার আলাদা হিসাব করবে।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

উক্ত হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, হযরত আব্বাস (রাঃ) কুরায়েব থেকে বর্ণিত শামবাসীদের চাঁদ দেখা এবং মুআবিয়া (রাঃ)-এর রোযা রাখার কথাটিকে গ্রহণ করেননি।

দলীল (২)ঃ ... عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لاَ تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ الخ (بخاري ج١ ص٢٥٦، مسلم ج١ ص٣٤٧، نسائي ج١ ص٣٠١)

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) সূত্রে নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রমযান সম্পর্কে আলোচনা করে বলেন, তোমরা চাঁদ না দেখে সওম পালন করো না এবং চাঁদ না দেখা পর্যন্ত ইফতারও করো না।

দলীল (৩)ঃ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَاَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَافْطِرُوْا (البخاري ج١ ص٢٥٥، مسلم ج١ ص٣٤٨، نسائي ج١ ص٣٠١)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেন, তোমরা চাঁদ দেখে সাওম পালন করবে এবং চাঁদ দেখে ইফতার করবে।

উক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চাঁদ দেখেই যেহেতু রোযা রাখা বা ভঙ্গ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সুতরাং প্রত্যেক অঞ্চলবাসীকেই পৃথকভাবে চাঁদ দেখতে হবে।

* ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে, উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়। অতএব যদি কোন এক অঞ্চলে চাঁদ দেখা যায় এবং অন্য অঞ্চলে চাঁদ দেখা নাও যায়, তাহলে অন্য অঞ্চলের লোক তদনুযায়ী রমযান অথবা ঈদ পালন করতে পারবে। তবে শর্ত হল, ঐ অঞ্চলে নতুন চাঁদ দেখার প্রমাণ শরঈ পদ্ধতিতে হতে হবে। অর্থাৎ, দ্রাঘিমা সীমার যে কোন প্রান্তে চাঁদ দেখা গেলেই যথেষ্ট। এই ভিত্তিতে যদি পাশ্চাত্যের লোকেরা চাঁদ দেখে তবে প্রাচ্যবাসীর উপর তা আবশ্যক হবে।

(فتح الملهم ج٣ ص١١٣)

দলীল (১)ঃ ... عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لاَ تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ ... (بخاري ج١ ص٢٥٦، مسلم ج١ ص٣٤٧، نسائي ج١ ص٣٠١)

(ইতিপূর্বে হাদীসটি উক্ত অনুচ্ছেদে ইমামত্রয়ের দ্বিতীয় দলীল হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে।)

দলীল (২)ঃ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا (بخاري ج١ ص٢٥٥، مسلم ج١ ص٣٤٨، نسائي ج١ ص٣٠١)

(ইতিপূর্বে হাদীসটি উক্ত অনুচ্ছেদে ইমামত্রয়ের তৃতীয় দলীল হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে।)

দলীল (৩)ঃ ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّيْ رَأَيْتُ الْهِلاَلَ ... قَالَ النَّبِيُّ صلعم يَا بِلاَلُ اَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُوْمُوْا غَدًا– (ابو داود ج١ ص٣٢٠ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، نسائي ج١ ص٣٠٠ باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان، ابن ماجة ص١٢٠)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক বেদুঈন নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে, আমি চাঁদ দেখেছি।... নবী করীম (সাঃ) বিলালকে বলেন, হে বিলাল! তুমি লোকদের জানিয়ে দাও, যেন তারা আগামী দিন রোযা রাখে।

অতএব, উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহে رُؤْيَةُ الْهِلاَلِ বা চাঁদ দেখা বিষয়টি শর্তহীনভাবে (مُطْلَقًا) বলা হয়েছে। অর্থাৎ হাদীস সমূহে কোন্ জায়গা থেকে চাঁদ দেখতে হবে কিংবা বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদেরকে পৃথক পৃথকভাবে চাঁদ দেখতে হবে কিনা, এমন কোন শর্তারোপ করা হয়নি। সুতরাং যে কোন জায়গা থেকে চাঁদ দেখা গেলেই এর উপর আমল করতে হবে।

* অবশ্য পরবর্তী আহনাফদের মধ্য থেকে হাফিয যায়লাঈ (রহ.) [মৃত্যুঃ ৭৪৩ হিঃ] كَنْز-এর ব্যাখ্যামূলক কিতাব "تَبْيِيْنُ الْحَقَائِق" গ্রন্থের ১ম খণ্ড ৩২১ পৃষ্ঠায় লিখেন যে, দূরবর্তী দেশগুলোতে উদয়স্থলের পার্থক্য আমাদের (আহনাফদের) নিকটও গ্রহণযোগ্য। সুতরাং দূরবর্তী অঞ্চলগুলোর চাঁদ দেখা যথেষ্ট নয়। পরবর্তী আহনাফগণ ইহার উপরই ফাতওয়া দিয়েছেন। (بدائع الصنائع ج٢ ص٨٣، رؤيت هلال ص٥٨)

কিন্তু দূরবর্তী দেশ ও নিকটবর্তী দেশের পার্থক্য বুঝানোর মাপকাঠি কি? এ ব্যাপারে আল্লামা শিব্বির আহমদ উসমানী (রহ.) লিখেন- যেসব অঞ্চল এতটুকু দূরবর্তী হয় যে, এর উদয়াস্থলের পার্থক্য গণ্য না করলে দু'দিনের ব্যবধান হয়ে যাবে, সেসব উদয়স্থলের ব্যবধান গ্রহণযোগ্য হবে। অর্থাৎ, তখন এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য দেশের জন্য যথেষ্ট হবে না। কেননা যদি এমন দূরবর্তী অঞ্চলের ক্ষেত্রে উদয়স্থলের পার্থক্য গণ্য করা না হয়, তাহলে মাস ২৮ অথবা ৩১ দিনে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়, যা শরীয়তে অনুমোদিত নয়। (فتح الملهم ج٣ ص١١٣)

যেমন, হযরত ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস-

... اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ فَلاَ تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ– (ابو داود ج١ ص٣١٧ باب الشهر يكون تسعاو عشرين، مسلم ج١ ص٣٤٧)

অর্থাৎ, ... ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন; রোযার মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়। কাজেই তোমরা চাঁদ না দেখে রোযা রাখবে না এবং চাঁদ না দেখে রোযা ভাঙ্গবে না।

... عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّا اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسِبُ الشَّهْرَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَخَنَسَ سُلَيْمَانُ اِصْبَعَهُ فِيْ الثَّالِثَةِ يَعْنِيْ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ وَثَلٰثِيْنَ– (ابو داود ج١ ص٣١٧ باب الشهر يكون تسعا وعشرين، بخاري ج١ ص٢٥٦ باب قول النبي صلعم لا نكتب ولا نحسب، مسلم ج١ص٣٤٧)

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ আমরা উম্মী জাতির অন্তর্ভুক্ত। আমরা লিখতে জানি না এবং মাসের হিসাবও করতে পারি না। এরপর তিনি এরূপ, এরূপ ও এরূপ বলে (তিনবার) নিজের (দশ) অঙ্গুলি প্রসারিত করেন। রাবী সুলায়মান তৃতীয়বারে তাঁর একটি আঙ্গুল সংকুচিত করেন, অর্থাৎ রোযার মাস ঊনত্রিশ ও ত্রিশ দিনে হয় (এর প্রতি ইশারা করেন)

সুতরাং উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন মাস ২৮ বা ৩১ দিনে হয় না।

* কিন্তু নিকটবর্তী ও দূরবর্তীর ব্যবধানের মানদণ্ড কি হবে এর বিশদ বিবরণ ইসলামী আইনের গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ নেই। তবে-

* কেউ কেউ বলেন, কোন্ অঞ্চলকে দূরবর্তী এবং কোন্‌টিকে নিকটবর্তী বলা হবে, তা عرف বা ঐ সময়ের প্রচলনের উপর নির্ভর করবে।

* কারো মতে, একজন শাসকের শাসনাধীন একটি দেশের যেকোন অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে ঐ দেশের অধিবাসীদের সকলের উপর রোযা ফরয হবে।

* কেউ কেউ বলেন, এক মাসের দূরত্বকে দূরবর্তী অঞ্চল এবং এর চেয়ে কম দূরত্বকে নিকটবর্তী অঞ্চল বলা হবে। ইহা ঐ সময়ের হিসাব, যখন যাতায়াতের যানবাহন ছিল উট এবং ঘোড়া।

* বিশুদ্ধতম কথা হল এই যে, চাঁদের مطالع যদি এমন দূরত্ব হয় যে একই দিনে চাঁদ দেখা সম্ভব নয় অর্থাৎ তারিখ পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে তা দূরবর্তী অঞ্চল, আর যদি তারিখ পরিবর্তন না হয়, তাহলে তা নিকটবর্তী অঞ্চল।

(درس مشكوٰة ج٢ ص١٩٨) যেমন- সৌদী আরবে যে দিন চাঁদ দেখা যায়- বাংলাদেশে সেদিন চাঁদ দেখা আদৌ সম্ভব নয়; চাঁদের مطالع তথা উদয়াচলের দূরত্ব বেশি হওয়াতে বাংলাদেশে সেই চাঁদ এক দিন পরে দেখা যাবে। কাজেই সৌদী আরবের চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের অধিবাসীদের রোযা রাখা বা ভঙ্গ করা যাবে না।

* কতিপয় আলিম বলেন- আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে চাঁদের উদয়াচল নির্ণীত হওয়ায় এ দূরত্ব নির্ণয় করা সহজ হয়ে গেছে। ফলে পৃথিবীর যতটুকু অংশ জুড়ে একই সময়ে চাঁদ দেখা সম্ভব, এমন অংশের কোন স্থানে চাঁদ দেখা গেলে ঐ অংশের সকলের উপর রোযা রাখা বা ভঙ্গ করা আবশ্যক হবে। এক্ষেত্রে দূরত্বের পরিমাণ যাই হোক।

* আল্লামা উসমানী (রহ.) দূরত্বের মাপকাঠি নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন, যেসব শহর এতটুকু দূরবর্তী যে, এগুলোর উদয়াচলের বিভিন্নতা ধর্তব্যে না আনলে দু'দিনের পার্থক্য হয়ে যায় সেখানে উদয়স্থলের বিভিন্নতা গ্রহণযোগ্য হবে।(فتح الملهم ج٣ ص١١٣)

জবাবঃ উল্লিখিত তিন ইমাম কুরায়েব-এর বর্ণিত হাদীসে হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর ফায়সালার উপর ভিত্তি করে বলেন- প্রত্যেক অঞ্চল ও দেশবাসীকেই চাঁদ দেখতে হবে, এর জবাবে আহনাফরা এর বিভিন্ন ব্যাখ্যায় বলেন যে-

(১) হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) শাম এবং মদীনাকে بلاد بعيدة তথা দূরবর্তী দেশের মধ্যে গণ্য করেছেন। এজন্যই তাঁর (কুরায়েব) কথাকে গ্রহণ করেননি। আর অঞ্চল নিকটবর্তী ও দূরবর্তী হওয়া একটি ইজতিহাদী বিষয়। আহনাফরাও একথা বলেন যে, দূরবর্তী দেশের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক চাঁদ দেখতে হবে। সুতরাং কোন মতানৈক্য নেই। (فتح الملهم ج٣ ص١١٣)

(২) অথবা, খবরদাতা শুধু একা কুরায়েব ছিলেন। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, সাক্ষীর সংখ্যা (তথা কমপক্ষে দু'জন সাক্ষী হওয়া) পুরা হচ্ছে না। আর এ কারণেই ইবন আব্বাস (রাঃ) তাঁর একথা গ্রহণ করেননি। (المعارق للبدري ج٦ ص٣١)

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলীলের জবাবঃ যদিও হাদীসদ্বয়ে বলা হয়েছে যে, চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং ভঙ্গ কর; কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক অঞ্চল বা দেশবাসীকে চাঁদ দেখতে হবে। যদি একথা মেনে নেয়া হয়, তাহলে তো একথাও মানতে হবে যে, কেবল ঐ ব্যক্তিই রোযা রাখতে বা ভাঙতে পারবে, যে কেবল নিজ চোখেই চাঁদ দেখবে। অন্যের চাঁদ দেখা তার জন্য যথেষ্ট নয়। আর এমনটি কখনো সম্ভব নয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, রোযা রাখা বা ঈদ পালনার্থে রোযা ভাঙ্গার জন্য প্রত্যেক অঞ্চল বা দেশবাসীকে চাঁদ দেখা জরুরী নয়; বরং যে অঞ্চল বা দেশের মধ্যে সময়ের ব্যবধান একেবারেই নগণ্য রয়েছে (যেমন, এক দুই ঘন্টা) এক্ষেত্রে এসব দেশ বা অঞ্চল একে অপরের চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি করে রোযা রাখতে বা ভাঙতে পারবে। আর যদি ব্যবধান বেশি হয়, তাহলে পারবে না। মোট কথা, দূরবর্তী অঞ্চলের ক্ষেত্রে পরবর্তী হানাফীগণের অভিমত হল, এমতাবস্থায় উদয়াচলের বিভিন্নতা ধর্তব্য।

উল্লেখ্য যে, মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) বলেন, আমার ধারণা ইমাম আবু হানীফা এবং অন্যান্য ইমাম যাঁরা উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য সাব্যস্ত করেন না, তার আরেকটি কারণ এটিও ছিল যে, যেসব অঞ্চলে মাশরিক-মাগরিবের (পূর্ব-পশ্চিমের) ব্যবধান আছে, সেখানে এক জায়গার সাক্ষ্য অপর জায়গায় পৌঁছা তাদের জন্য শুধু একটি কাল্পনিক ও মেনে নেয়ার বিষয় ছিল। শুধু কল্পনা ছাড়া এর অতিরিক্ত কোন মর্যাদা ছিল না। এরূপ মেনে নেয়া কাল্পনিক বিষয় দ্বারা বিধি-বিধানের উপর কোন প্রভাব পড়ে না। আর নগণ্যকে অস্তিত্বহীনের পর্যায়ভুক্ত সাব্যস্ত করা ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে প্রসিদ্ধ। এজন্য উদয়াস্থলের বিভিন্নতা ব্যাপক আকারে ধর্তব্য নয় বলেছেন।

কিন্তু বর্তমানে উড়োজাহাজ, টেলিফোন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট প্রভৃতি যোগাযোগ মাধ্যম গোটা দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিমকে এক করে ফেলেছে। এক জায়গার সাক্ষ্য অপর

জায়গায় পৌঁছা এখন আর শুধু কাল্পনিক ব্যাপার নয়, বরং নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে যায়। এর ফলে যদি পূর্বের সাক্ষ্য পশ্চিমে আর পশ্চিমের সাক্ষ্য পূর্বে প্রমাণ মেনে নেয়া হয়, তাহলে কোন জায়গায় মাস ২৮ দিনে আর কোন জায়গায় ৩১ দিনে হওয়া আবশ্যক হবে। এজন্য এরূপ দূরবর্তী এলাকায় যেখানে মাসের দিনগুলোতে বেশকমের সম্ভাবনা থাকবে সেখানে উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্যে আনা আবশ্যক হয়ে পড়বে এবং হানাফী মাযহাবের হুবহু অনুকূল হবে। (رويت هلال ص٦٠-٦١)

بَابُ كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ ص٣١٩

সন্দেহজনক দিবসে রোযা রাখা মাকরূহ

... عَنْ صِلَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ يُشَكُّ فِيْهِ فَأُتِيَ بِشَاةٍ فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ عَمَّارٌ مَّنْ صَامَ هٰذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– (بخاري ج١ ص٢٥٦ باب قول النبي صلعم اذا رأيتم الهلال الخ، ترمذي ج١ ص١٤٧-١٤٨ باب كراهية صوم يوم الشك، نسائي ج١ ص٣٠٦ صيام يوم الشك، ابن ماجة ص١٢٠)

অনুবাদঃ ... সিলা (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা সন্দেহজনক দিবসে আম্মার (রাঃ)-এর নিকট ছিলাম। সেখানে একটি ভুনা বকরী পেশ করা হলে সেখানকার কিছু লোক (রোযা থাকার কারণে) তা খাওয়া হতে বিরত থাকে। আম্মার (রাঃ) জিজ্ঞাসা করেন, আজ (এ সন্দেহজনক দিবসে) যে রোযা রেখেছে, সে তো আবুল কাসিম [নবী করীম (সাঃ)]-এর নাফরমানি করেছে।

বিশ্লেষণঃ يَوْمُ الشَّكِّ-এর পরিচয় এবং এ দিনে রোযা রাখার বিধানঃ

আভিধানিক অর্থঃ يَوْم শব্দের অর্থ দিন এবং اَلشَّكُّ শব্দের অর্থ সন্দেহ-সংশয়। অতএব, يَوْمُ الشَّكِّ-এর অর্থ হল ''সন্দেহের দিন''।

পারিভাষিক অর্থঃ ফিকহ্ শাস্ত্রের পরিভাষায়-

يَوْمُ الشَّكِّ هُوَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ احْتَمَلَ اَنْ يَّكُوْنَ مِنْ رَمَضَانَ وَذٰلِكَ بِاَنْ لَّمْ يَرَى الْهِلَالَ بِسَبَبِ غَيْمٍ بَعْدَ غُرُوْبِ يَوْمِ التَّاسِعِ وَّالْعِشْرِيْنَ مِنْ شَعْبَانَ، فَوَقَعَ الشَّكُّ فِيْ الْيَوْمِ التَّالِيْ لَهُ هَلْ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ اَوْ مِنْ رَمَضَانَ– (الفقه على مذاهب الاربعة ج١ ص٥٥٣)

অর্থাৎ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে শাবান মাসের ২৯ তারিখ দিবাগত রাত্রে চাঁদ দেখা না গেলে পরের দিনকে يَوْمُ الشَّكِّ বা সন্দেহের দিন বলা হয়। কেননা, ঐ দিনের মধ্যে এ সংশয় রয়েছে যে, ইহা কি শাবানের শেষ তারিখ, নাকি রমযানের প্রথম তারিখ?

يَوْمُ الشَّكِّ هُوَ الْيَوْمُ الْاٰخِيْرُ مِنْ شَعْبَانَ الَّذِيْ يَحْتَمِلُ اَنْ يَّكُوْنَ آخِرُ شَعْبَانَ اَوْ اَوَّلُ رَمَضَانَ– (عناية بهامش فتح القدير ج٢ ص٥٣)

অর্থাৎ, সন্দেহের দিন হল, শাবানের শেষ দিন, যাতে শাবানের শেষ অথবা রমযানের শুরু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

* يَوْمُ الشَّكِّ বা সন্দেহের দিনে রোযা রাখার হুকুম নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* কেউ কেউ বলেন, সন্দেহের দিনে রোযা রাখা ইমাম তথা রাষ্ট্রপ্রধানের রায়ের উপর নির্ভর করবে।

* কেউ কেউ বলেন, রমযানের নিয়তে ঐ দিন রোযা রাখা ওয়াজিব।

* ইমাম মালিক, আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, রমযানের নিয়তে রোযা রাখা জায়েয নয়। ইহা ব্যতীত সবই জায়েয আছে।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, এ দিনে ফরয কিংবা নফল কোন রোযাই জায়েয নয়। (درس مشكوة ج٢ ص١٩٧)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হযরত আম্মার ইবন ইয়াসিরের (রাঃ) হাদীস। উক্ত হাদীসে শর্তহীন (مطلقا) ভাবে রোযা রাখাকে নবী করীম (সাঃ)-এর নাফরমানীর কথা বলা হয়েছে।

* এইদিনে কেউ যদি এই মনে করে রোযা রাখে যে, হতে পারে এটা রমযানের দিন, আমরা হয়ত চাঁদ দেখিনি। তবে এই নিয়তে রোযা রাখা সমস্ত ইমামগণের সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহ তাহরীমী। (درس ترمذي ج٢ ص٥١٧)

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এ দিনে রোযা রাখার ব্যাপারে বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করেছেন। যেমন-

(১) এ দিনে রমযানের রোযার নিয়তে রোযা রাখা মাকরূহ।

(২) রমযান ব্যতীত অন্য কোন ফরয বা ওয়াজিবের নিয়তে রোযা রাখা (যেমন রমযানের কাযা, মান্নত অথবা কাফ্ফারার রোযা) এটাও মাকরূহ। তবে এটা মাকরূহ তানযীহী।

(৩) কেউ এরূপ নিয়ত করল যে, যদি আগামীকাল রমযান হয় তবে তা রমযানের রোযা, আর যদি রমযান না হয় তাহলে রোযা রাখবে না। এমতাবস্থায় তার রোযা হবে না। কেননা, কোন ইবাদত দোদুল্যমান (تردد) অবস্থায় গ্রহণযোগ্য নয়।

(عمدة القاري ج١٠ ص٢٨٠)

* আর একটি অভিমত হল- যদি কেউ কোন বিশেষ দিনে নফল রোযা রাখায় অভ্যস্ত হয় আর সে দিনটি ঘটনাচক্রে সংশয়ের দিন হয় তবে তার জন্য নফলের নিয়তে রোযা রাখা সর্বসম্মতক্রমে জায়েয।

দলীলঃ ... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُقَدِّمُوْا صَوْمَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَّلاَ يَوْمَيْنِ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ صَوْمٌ يَّصُوْمُهُ رَجُلٌ فَلْيَصُمْ ذٰلِكَ الصَّوْمَ– (ابو داود ج١ ص٣١٩ باب في من يصل شعبان برمضان، بخاري ج١ ص٢٥٦ باب قول النبي صلعم لا نكتب ولا نحسب، مسلم ج١ ص٣٤٨، ترمذي ج١ ص١٤٧ باب لا تقدموا الشهر بصوم، نسائي ج١ ص٣٠٧ باب التسهيل في صيام يوم الشك، ابن ماجة ص١٢٠)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা রমযান আগমনের পূর্বে তার রোযাকে একদিন বা দু'দিন এগিয়ে নিও না। অবশ্য যদি কেউ ঐ দিন (শাবানের শেষ তারিখে) রোযা রাখতে অভ্যস্ত থাকে তবে সে যেন ঐ রোযা রাখে।

আর যদি অভ্যাস ছাড়া কোন ব্যক্তি এই সন্দেহের দিনে নফলের নিয়তে রোযা রাখতে চায় তবে ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে এটি সাধারণতঃ নাজায়েয।

হানাফীদের মতে, সাধারণ মানুষের জন্য নাজায়েয, কিন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য জায়িয।

তিন ইমামের দলীলঃ উপরোল্লিখিত হাদীসে অভ্যস্ত ব্যক্তি ছাড়া নিঃশর্ত ভাবে নিষেধ করা হয়েছে। عام ও خاص-এর কোন পার্থক্য নেই।

হানাফীদের দলীলঃ এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হল, রমযানের সন্দেহ। এ কারণেই যে ব্যক্তি পূর্ব থেকেই কোন বিশেষ দিনে রোযা রাখায় অভ্যস্ত আর সে দিনটি সন্দেহের দিনে এসে যায়, তার জন্য আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে রোযা রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কারণ, সেখানে রমযানের সন্দেহের কোন সম্ভাবনা নেই। এর উপর বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকেও কিয়াস করা হবে। যারা স্বীয় ইলম ও ফিকহের ভিত্তিতে সন্দেহ সংশয় ও ওয়াসওয়াসায় পড়বেন না। বরং খালেস নিয়তে রোযা রাখবেন। অবশ্য সাধারণ

জনগণ যেহেতু এসব ওয়াসওয়াসা দূর করতে সক্ষম হয় না, সেহেতু তাদেরকে রোযা রাখতে নিষেধ করা হবে। (عمدة القاري ج١٠ ص٢٨٠ درس مشكوة ج٢ ص١٩٨)

* মুহীত গ্রন্থে উল্লেখ আছে, সাধারণ মানুষ সূর্য হেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে তথা খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি থেকে নিজেকে বিরত রাখবে, অতঃপর যদি রমযান স্পষ্ট হয় তাহলে রোযার নিয়ত করবে। অন্যথায় ভেঙ্গে ফেলবে। (عمدة القاري ج١٠ ص٢٨٠)

بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلٰى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ ص٣١٩
শাওয়ালের চাঁদ দর্শনে দু'ব্যক্তির সাক্ষ্যদান

... عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ جَدِيْلَةَ قَيْسٍ اَنَّ اَمِيْرَ مَكَّةَ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ عَهِدَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَّنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ فَاِنْ لَمْ نَرَهُ وَ شَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا الخ (نسائي ج١ ص٣٠٠-٣٠١ باب قبول شهادة الرجل الخ)

অনুবাদঃ ... হুসায়েল ইবন আল-হারিস আল জাদলী থেকে বর্ণিত যে, একদা মক্কার আমীর খুতবা প্রদানের সময় বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন যে, আমরা যেন শাওয়ালের চাঁদ দেখাকে ইবাদত হিসেবে গুরুত্ব দেই। আর আমরা স্বচক্ষে যদি তা না দেখি তবে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোক এ ব্যাপারে সাক্ষ্যপ্রদান করলে তখন আমরা যেন তাদের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করি।

বিশ্লেষণঃ একজন ব্যক্তির সাক্ষ্যে রোযা রাখা বা রোযা ভাঙ্গা যাবে কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা রোযা রাখা এবং ভঙ্গ করা যাবে না। বরং দু'জন বিশ্বস্ত পুরুষের চাঁদ দেখা শর্ত।

কেননা, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ ফরমান –وَاِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُوْمُوْا وَافْطِرُوْا

অর্থাৎ, যদি দু'জন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তোমরা রোযা রাখ এবং ভঙ্গ কর।

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল ও ইবন মুবারক (রহ.) প্রমুখ আলিমের মতে, চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার জন্য একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্যই যথেষ্ট। রমজানের চাঁদ হোক অথবা শাওয়ালের চাঁদ হোক। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকুক কিংবা পরিষ্কার থাকুক।

দলীলঃ ... عَنْ عِكْرَمَةَ اَنَّهُمْ شَكُّوْا فِيْ هِلاَلِ رَمَضَانَ مَرَّةً فَاَرَادُوْا اَنْ لاَّ يَقُوْمُوْا وَلاَ يَصُوْمُوْا فَجَاءَ اِعْرَابِيٌّ مِّنَ الْحُرَّةِ فَشَهِدَ اَنَّه رَأَيَ الْهِلاَلَ فَاُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَ تَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ وَ شَهِدَ اَنَّه رَأَيَ الْهِلاَلَ فَاَمَرَ بِلاَلٌ فَنَادٰى فِيْ النَّاسِ اَنْ يَّقُوْمُوْا وَاَنْ يَّصُوْمُوْا— (ابو داود ج١ ص٣٢٠ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان)

অর্থাৎ, ... ইকরামা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সাহাবীগণ রমযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে সন্দিহান হন। তাঁরা তারাবীর নামায আদায় না করার এবং (পরদিন) রোযা না রাখার ইরাদা করেন। এমতাবস্থায় হুররা নামক স্থান হতে জনৈক বেদুঈন আগমন করে সাক্ষ্য দেয় যে, সে চাঁদ দেখেছে। তাকে নবী করীম (সাঃ)-এর খিদমতে আনা হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল? সে বলে, হাঁ এবং আরও সাক্ষ্য দেয় যে, সে নতুন চাঁদ দেখেছে। তিনি বিলালকে নির্দেশ দেন, সে যেন লোকদের জানিয়ে দেয়, যাতে তারা তারাবীহ নামায আদায় করে এবং পরদিন রোযা রাখে।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, যদি আকাশ পরিষ্কার না হয় অর্থাৎ কোন মেঘ ধুলোবালি অথবা ধোঁয়া থাকে, তাহলে রমযানের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে একজন বিশ্বস্ত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির চাঁদ দেখা যথেষ্ট হবে। কিন্তু আকাশ যদি পরিষ্কার হয়, তাহলে একটি বড় দলের সাক্ষ্য আবশ্যক হবে।

পক্ষান্তরে, শাওয়াল বা ঈদের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন হয়, তাহলে দু'জন বিশ্বস্ত পুরুষ কিংবা একজন বিশ্বস্ত পুরুষ ও দু'জন বিশ্বস্ত মহিলার সাক্ষ্য প্রদান জরুরী। তবে শর্ত হল সাক্ষীর গুণাবলী তার মধ্যে বিদ্যমান থাকতে হবে। আর আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে তাহলে এমন একটি বড় দলের সাক্ষ্য আবশ্যক, যা আধিক্যের কারণে এটা যুক্তিগতভাবে বিশ্বাস করা যায় না যে, এই বিরাট দলটি মিথ্যা বলতে পারে। (درس مشكوة ج٢ ص١٩٥)

উল্লেখ্য যে, এই দলের সংখ্যা সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ ৫০ জনের কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সহীহ হল, কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা শরঈভাবে নির্ধারিত নয়। যতটুকু সংখ্যা দ্বারা ইয়াকীন হয়ে যাবে যে সবাই মিলে মিথ্যা বলতে পারে না সে সংখ্যাই যথেষ্ট। ৫০ জন হোক বা এর চেয়ে কম হোক।

(درس ترمذي ج٢ ص٥٢٦)

ইমাম আবু হানিফার দলীলঃ

দলীল (১)ঃ ... عَنْ رِّبْعِيٍّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَّجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيْ آخِرِ يَوْمٍ مِّنْ رَّمَضَانَ فَقَدِمَ اَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللّٰهِ لَاَ هَلاَّ الْهِلاَلَ اَمْسِ عَشِيَّةً فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ اَنْ يُّفْطِرُوْا زَادَ خَلَفٌ فِيْ حَدِيْثِهِ وَاَنْ يَّغْدُوْا اِلٰى مُصَلاَّهُمْ–

(ابو داود ج١ ص٣١٩ باب شهادو رجلين على رؤية هلال شوال)

অর্থাৎ, ... রিবঈ ইবন হিরাশ নবী করীম (সাঃ)-এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, একদা লোকেরা রমযানের শেষে শাওয়ালের চাঁদ দেখা সম্পর্কে মতভেদ করেন। তখন দু'জন বেদুঈন নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আল্লাহর শপথ করে সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, গত সন্ধ্যায় তারা শাওয়ালের চাঁদ দেখেছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) লোকদেরকে রোযা ভাঙ্গার নির্দেশ দেন। রাবী খালফ তাঁর হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন আগামীকাল ঈদের নামায আদায়ের জন্য ঈদগাহে গমন করে।

দলীল (২)ঃ ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّيْ رَاَيْتُ الْهِلاَلَ قَالَ الْحَسَنُ فِيْ حَدِيْثِهِ يَعْنِيْ رَمَضَانَ فَقَالَ اَ تَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَ تَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلاَلُ اَذِّنْ فِيْ النَّاسِ فَلْيَصُوْمُوْا غَدًا– (ابو داود ج١ ص٣٢٠ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان،

ترمذي ج١ ص١٤٨ باب في الصوم بالشهادة، نسائي ج١ ص٣٠٠، ابن ماجة ص١٢٠)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক বেদুঈন নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে, আমি চাঁদ দেখেছি। রাবী হাসান তাঁর হাদীসে বলেন, অর্থাৎ রমযানের চাঁদ। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি এরূপ সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই? সে বলে, হাঁ। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি এরূপ সাক্ষ্য প্রদান কর যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল? সে বলে, হাঁ। তিনি (সাঃ) বিলালকে বলেন, হে বিলাল! তুমি লোকদের জানিয়ে দাও, যেন তারা আগামী দিন রোযা রাখে।

অবশ্য রমযান ও দুই ঈদের নতুন চাঁদ ছাড়া অবশিষ্ট নয় মাসের চাঁদের ব্যাপারে মেঘ থাকুক অথবা উদয়স্থল পরিষ্কার হোক, দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও

দু'জন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। কারণ এসব মাসের চাঁদ দেখার প্রতি সাধারণত গুরুত্বারোপ করা হয় না। (شامي ج٦ ص١٥٦)

রেডিও ও টেলিভিশনের খবর দ্বারা রোযা রাখা ও না রাখার বিধানঃ আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন হয় এবং একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি রেডিও বা টেলিভিশন অফিসে এসে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে রেডিও ও টেলিভিশনের খবর পেয়ে রোযা রাখতে হবে। যদি তা সঠিকভাবে প্রচার করা হয়। এই মাসআলাকে حَدِيث اِعْرَابِي তথা বেদুঈন হাদীসের উপর কিয়াস করা হয়েছে। কেননা, নবী করীম (সাঃ) জনৈক বেদুঈনের চাঁদ দেখার সংবাদ বিশ্বাস করে হযরত বিলাল (রাঃ)-কে বলেছেন –اَذِّنْ فِيْ النَّاسِ اَنْ يَّصُوْمُوْا غَدًا (ইতিপূর্বে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।)

আর আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন হয়, তাহলে শাওয়ালের চাঁদের ক্ষেত্রে রেডিও বা টেলিভিশন অফিসে দু'জন সাক্ষ্য দিতে হবে। জনগণের সম্মুখে দু'জন সাক্ষীর পরিচয় তুলে ধরতে হবে। অন্যথায় প্রচার মাধ্যমের সংবাদ শুনে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয হবে না। আকাশ পরিষ্কার থাকলে রেডিও ও টিভির সংবাদ গ্রহণীয় হবে না।

এখানে উল্লেখ্য যে, "বাংলাদেশে আল-হেলাল কমিটি আছে এবং তার মধ্যে কতক আলিম-উলামাও আছেন। তাদের লিখিত ঘোষণাটি হুবহু রেডিও ও টিভিতে প্রচার করা উচিত। তাহলে সে সংবাদ গ্রহণ করে বাংলাদেশের সকল মুসলমানের জন্য রোযা, ঈদ করা জরুরী হবে। কিন্তু দুঃখজনক যে, রেডিও-টিভিতে সঠিক নিয়ম মত প্রচার করা হয় না। গোজামিল ধরনের খবর প্রচার হয়। যেমন বলা হয়- বাংলাদেশের আকাশে শাওয়ালের চাঁদ দেখা গেছে। কে দেখলো? চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার খবরটি কাদের সিদ্ধান্ত? এসব বিষয়ের উপর কোনরকম আলোকপাত করা হয় না। হাত-পা বিহীন একটা খবর দায়সারাভাবে শুনিয়ে দেয়া হয় মাত্র। শরীয়তের দৃষ্টিতে এরূপ গোলমেলে ঘোষণা গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে রোযা বা ঈদ করা জরুরী নয়। বরং এরূপ পরিস্থিতিতে প্রত্যেক এলাকার লোক নিজেদের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে রোযা, ঈদ করতে পারে।" (ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া, খণ্ড ১, পৃঃ ৪৪৪)

بَابُ الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّدَاءَ وَالْاِنَاءُ عَلٰى يَدِهٖ ص٣٢١

(সাহরীর) খাবার গ্রহণরত অবস্থায় আযান শুনতে পেলে

... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَمِعَ اَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْاِنَاءُ عَلٰى يَدِه فَلَا يَضَعْهُ حَتّٰى يَقْضِيَ حَاجَتَهٗ مِنْهُ–

অনুবাদঃ ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন আযান শ্রবণ করে, আর এ সময় তার হাতে খাদ্যের পাত্র থাকে সে যেন তা রেখে না দেয়, যতক্ষণ না সে তদ্দারা স্বীয় প্রয়োজন পূর্ণ করে নেয়।

বিশ্লেষণঃ উপরোল্লিখিত হাদীসের বাহ্যিক অর্থের উপর ভিত্তি করে আবুল আলা মওদূদীসহ কেউ কেউ বলেন যে, ফজর আবির্ভাবের (طلوع فجر) পরে তথা সুবহে সাদিকের পরও খাওয়া-পান করা জায়েয আছে।

* চার ইমামসহ জমহুর উম্মতের মতে, طُلُوْع فَجر বা ফজর আবির্ভাবের পরে পানাহার করা জায়েয নয়। ইচ্ছাকৃত খাওয়ার দ্বারা কাযা এবং কাফ্ফারা উভয়টিই অত্যাবশ্যক হবে।

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

অর্থাৎ, তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। (বাকারাঃ ১৮৭)

উপরোল্লিখিত আয়াতে আহার ও পান করার শেষ সীমা طُلُوْع فَجر (ফজর উদয়) পর্যন্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে।

তাছাড়া উপরোল্লিখিত হাদীসের দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, ফজর উদয় হওয়া মূলতঃ ইয়াকীনের উপর নির্ভর করে। মুআয্যিনের আযানের উপর নির্ভর করে না। কেননা তার ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং মুআয্যিন যদি আযান দিয়েও দেয়, কিন্তু নিজের কাছে যদি ফজর উদয় হয়নি বলে দৃঢ়ভাবে মনে হয়, তাহলে পানাহার বন্ধ করবে না।

ইবনুল মালিক এবং আল্লামা খাত্তাবী বলেন, উক্ত আযানের দ্বারা ফযরের আযান উদ্দেশ্য নয়, বরং তাহাজ্জুদের আযান উদ্দেশ্য। যেমন অন্য হাদীসে এসেছে-

... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَمْنَعَنَّ اَحَدَكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ مِّنْ سَحُوْرِهٖ فَاِنَّهٗ يُؤَذِّنُ اَوْ قَالَ يُنَادِيْ لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ اَنْ يَّقُوْلَ هٰكَذَا وَجَمَعَ يَحْيٰى كَفَّهٗ حَتّٰى يَقُوْلَ هٰكَذَا وَمَدَّ يَحْيٰى بِاَصْبَعَيْهِ السَّبَابَتَيْنِ– (ابو داود ج١ ص٣٢٠ باب وقت السحور، بخاري ج١ ص٢٥٧. باب

قول النبي صلعم لا يمنعكم، مسلم ج١ ص٣٥٠ باب بيان ان الدخول في الصوم الخ، نسائي ج١ ص٣٠٥ كيف الفجر، ابن ماجة ص١٢٣)

অর্থাৎ, ... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, বিলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে সাহ্‌রী খাওয়া হতে বিরত না রাখে, কেননা সে আযান দেয় অথবা (রাবীর সন্দেহ) আহবান করে তাদের যারা তাহাজ্জুদ নামাযে রত থাকে, তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য এবং তোমাদের মধ্যে যারা নিদ্রিত থাকে তাদের জাগাবার জন্য। আর ততক্ষণ ফজর হয় না, যতক্ষণ না এরূপ হয়, এ বলে ইয়াহ্ইয়া তাঁর হাতের তালুকে মুষ্টিবদ্ধ করে প্রসারিত করেন, পরে তাঁর হাতের অঙ্গুলি প্রসারিত করে দেন।

* আবার কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা মাগরিবের আযান উদ্দেশ্য। এবং উদ্দেশ্য হল এই যে, যদি খাদ্যের পাত্র তোমাদের হাতে থাকে অথবা অন্য কোন কাজে মশগুল থাক এবং মাগরিবের আযান হয়ে যায়, তাহলে জলদি ইফতার করে নাও, দেরী করো না। কেননা ইফতারে তাড়াতাড়ি করা সুন্নত। সুতরাং হাদীস দ্বারা ইফতার জলদি করার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। (درس مشكوٰة ج٢ ص٢٠١)

যেমন হাদীসে এসেছে-

... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لاَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى يُؤَخِّرُوْنَ- (ابو داود ج١ ص٣٢١ باب ما يستحب من تعجيل الفطر، ترمذي ج١ ص١٥٠ باب تعجيل الافطار، ابن ماجة ص١٢٣)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, দীন ততদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা জলদি ইফতার করবে। কেননা, ইয়াহুদী ও নাসারারা ইফতার অধিক বিলম্বে করে।

بَابٌ فِيْ الْوِصَال ص٣٢٢ ঃ সাওমে বিসাল

... عَنْ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْوِصَال قَالُوْا فَاِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اِنِّيْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ كَهَيْئَتِكُمْ اَنِّيْ اُطْعَمُ وَاُسْقٰى-

(البخاري ج١ ص٢٦٣ باب الوصال، مسلم ج١ ص٣٥١ باب النهي عن الوصال، ترمذي ج١ ص١٦٣ باب كراهية الوصال في الصيام)

অনুবাদঃ ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাওমে বিসাল রাখতে নিষেধ করেছেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

আপনি তো ক্রমাগত রোযা রেখে থাকেন। তিনি ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের মত নই। তোমাদের মত নই, আমাকে পানাহার করানো হয়ে থাকে।

সাওমে বিসাল এর পরিচয়ঃ صَوْم শব্দের অর্থ রোযা, আর وِصَال শব্দটি فِعَال-এর ওযনে বাবে مُفَاعَلَة-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে اَلضَّمُّ وَالاِلْتِحَاقُ তথা মিলিত হওয়া ও একাধারে কোন কাজ করা, تَتَابُعُ الشَّيْئَيْنِ بِلاَ اِنْقِطَاع অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে দু'টি বস্তুর পারস্পরিক ধারাবাহিকতা, নিরবচ্ছিন্নতা, মিলন, মেলামেশা, সংসর্গ, সংযোগ, যোগাযোগ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং সাওমে বিসালের শাব্দিক অর্থ হল- নিরবচ্ছিন্নভাবে রোযা রাখা।

পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

১। بذل المجهود গ্রন্থে বলা হয়েছে-

هُوَ تَتَابُعُ الصِّيَامِ فِيْ يَوْمَيْنِ اَوْ اَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ اِفْطَارٍ بِاللَّيْلِ– (بذل المجهود ج١١ ص١٦٣)

অর্থাৎ, দুই বা ততোধিক দিন মাঝখানে রাত্রে পানাহার না করে একাধারে রোযা রাখাকে সাওমে বিসাল বলা হয়।

২। মিরকাত গ্রন্থকার বলেন- هُوَ تَتَابُعُ الصَّوْمِ مِنْ غَيْرِ اِفْطَارٍ بِاللَّيْلِ

অর্থাৎ, রাত্রে পানাহার না করে লাগাতার রোযা রাখাকে সাওমে বিসাল বলা হয়।

৩। আল্লামা আইনী বলেন-

مَنْ صَامَ يَوْمَيْنِ اَوْ اَكْثَرَ وَلَمْ يُفْطِرْ لَيْلَتَهُمَا فَهُوَ مُوَاصِلٌ (عمدة القاري ج١١ ص٩٠)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দুই অথবা ততোধিক দিন রোযা রাখে, রাত্রে ইফতার করে না, সে সাওমে বিসাল পালনকারী।

৪। فقه السنة-এর পাদটীকায় বলা হয়েছে-

وَصْلُ الصَّوْمِ مُتَابِعَةً بَعْضَهُ بَعْضًا دُوْنَ فِطْرٍ اَوْ سُحُوْرٍ– (فقه السنة ج١ ص٣٧٩، معارف السنن ج٦ ص١٧٥)

অর্থাৎ, ইফতার অথবা সেহেরী না খেয়ে এক রোযার সাথে আরেক রোযা মিলানোকে সাওমে বিসাল বলে।

৫। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.) বলেন- هُوَ صَوْمُ يَوْمَيْنِ لاَ فِطْرَ بَيْنَهُمَا–

অর্থাৎ, মাঝখানে কিছু না খেয়ে লাগাতার দুই দিন রোযা রাখাকে সাওমে বিসাল বলা হয়।

* রোযা পালনের ক্ষেত্রে وِصَال (লাগাতার) করা জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছেঃ

১। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, সাওমে বিসাল না রাখাই উত্তম। তবে কেউ যদি রাখে, তাহলে তা জায়েয। (درس مشكوة ج٢ ص١٩٩)

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَّهُمْ الخ (بخاري ج١ ص٢٦٣)

অর্থাৎ, হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) তাদেরকে করুণাস্বরূপ রোযায় বিসাল করতে নিষেধ করেছেন।

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই নিষেধ স্নেহপরবশ হিসেবে, আবশ্যক হিসেবে নয়। সুতরাং রোযা রাখা জায়েয। (درس مشكوة ج٢ ص١٩٩)

* ইমাম শাফেঈ (রহ.) থেকে এ ব্যাপারে দু'টি মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি মতানুযায়ী সাওমে বিসাল হারাম। মালিকীদের মধ্য হতে ইবন আরাবী এবং আহলে যাহিরও এরই প্রবক্তা। অপর মতানুযায়ী সাওমে বিসাল মাকরূহ। (درس ترمذي ج٢ ص٦١٧)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। নবী করীম (সাঃ) উক্ত হাদীসে نَهٰى (নিষেধসূচক) ছিগাহ (শব্দরূপ) দ্বারা সাওমে বিসাল নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, لاَ تُوَاصِلُوْا (তোমরা ক্রমাগত রাতে না খেয়ে রোযা রাখবে না।) আর নাহীর (نهي) ঊর্ধ্বতম সীমা হচ্ছে হারাম হওয়া এবং নিম্নতম সীমা হচ্ছে মাকরূহ হওয়া।

* ইবন খুযাইমা ও ইবনুল মুনযির (রহ.) শেষ রাত পর্যন্ত وِصَال জায়েয বলেছেন।

... عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تُوَاصِلُوْا فَاَيُّكُمْ اَرَادَ أَنْ يُّوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتّٰى السَّحَرِ الخ (ابو داود ج١ ص٣٢٢ باب في الوصال، بخاري ج١ ص٢٦٣)

অর্থাৎ, ... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, তোমরা ক্রমাগত না খেয়ে রোযা রাখবে না। অবশ্য তোমাদের কেউ যদি ক্রমাগত রোযা রাখতে চায়, সে যেন সাহ্‌রী পর্যন্ত এরূপ করে।

* কেউ কেউ বলেন, যে ব্যক্তি সাওমে বিসালের ক্ষমতা রাখে তার জন্য এটা জায়েয। নতুবা হারাম। ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ এবং মালিকীদের মধ্য থেকে ইমাম ওয়ায্‌যাহ (রহ.)-এরই প্রবক্তা। ইমাম আহমদ (রহ.) থেকেও এ মাযহাবটি বর্ণিত আছে।

(العمدة ج١١ ص٧١-٧٢، الفتح للحافظ ج٤ ص١٧٧-١٧٨، المغني ج٣ ص١٧١-١٧٢)

* ইমাম আবু হানিফা ও জমহুর উলামা বলেন, সাওমে বিসাল জায়েয নয়, বরং মাকরূহ। কারণ এটা শুধুমাত্র রাসূল (সাঃ)-এর জন্য খাস হতে পারে, অন্য কারো জন্য নয়। ফাতওয়ায়ে আলমগীরীতেও উল্লেখ আছে যে, সাওমে বিসাল মাকরূহ।
(فتاوى عالكيري ج١ ص٢٠١، بدائع الصنائع ج٢ ص٧٩)

দলীল (১)ঃ ইবন উমর (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস-

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلعم نَهٰى عَنِ الْوِصَالِ ...

(পূর্ণ হাদীসটি অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে।) উক্ত হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় সাওমে বিসাল নিষেধ করা হয়েছে। আর نهى দ্বারা মাকরূহ প্রমাণিত হয়। (درس مشكوة ج٢ ص١٩٩)

দলীল (২)ঃ ... عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هٰهُنَا وَذَهَبَ النَّهَارُ مِنْ هٰهُنَا فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ– (ابو داود ج١

ص٣٢١ باب وقت فطر الصائم، بخاري ج١ ص٢٦٢ باب متى يحل فطر الصائم)

অর্থাৎ, ... আসিম ইবন উমর (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যখন পূর্বাকাশে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে এবং সূর্য পশ্চিম আকাশে অস্তমিত হয়, তখন যেন রোযাদার ইফতার করে।
উক্ত হাদীসে রোযাদারের ইফতারের সময় হিসেবে রাতকে (সন্ধ্যা) নির্ধারিত করা হয়েছে। আর সাওমে বিসালের অবস্থায় রাত্রেও রোযা রাখতে হবে। যা হাদীসের বিপরীত আমল।

দলীল (৩)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا–

অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকে সাধ্যাতীত কাজের ভার দেন না। (বাকারাঃ ২৮৬)

জবাবঃ হযরত ইমাম আহমদ (রহ.) দলীল হিসেবে হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর যে হাদীস পেশ করেছেন, এর উত্তরে আহনাফগণ বলেন যে, উক্ত হাদীস আমাদের বিপরীত নয়, বরং আমাদের সমর্থক। কেননা, নবী (সাঃ) উম্মতের রহমত ও কল্যাণের জন্যই তা নিষেধ করেছেন।

* শাফেঈ (রহ.) হাদীস দ্বারা সাওমে বিসালকে যে হারাম সাব্যস্ত করতে চাচ্ছেন এর জবাবে হানাফীগণ বলেন-
"আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাওমে বিসাল নিষেধ করেছেন। ... অতঃপর তারা যখন সওমে বিসাল থেকে ক্ষান্ত হল না, তখন তাদের সাথে তিনি একদিন সওমে বিসাল করলেন। পরের দিন আবার বিসাল করলেন। অতঃপর লোকজন (প্রথম তারিখের) চাঁদ দেখল। ফলে নবী করীম (সাঃ) বললেন, যদি চাঁদ

আরো দেরিতে উঠত, তাহলে (তোমাদের সাথে রোযা) আমি আরো বেশি রাখতাম, যেন তারা বিরত হতে না চাওয়ার কারণে তাদের জন্য শাস্তি স্বরূপ হয়।”

(بخاي ج١ ص٢٦٣ باب التنكيل لمن اكثر الوصال)

আল্লামা হাফিয (রহ.) বলেন, নবী করীম (সাঃ) নিষেধাজ্ঞার পরেও সাহাবায়ে কিরামের সাথে বিসাল করেছেন। অতএব, যদি নিষেধাজ্ঞা হারামের জন্য হতো, তবে তাঁদেরকে এ কাজের উপর স্থির রাখতেন না। (فتح الباري ج٤ ص١٧٧)

* "اِنِّيْ اُطْعَمُ وَاُسْقٰى" (নিশ্চয়ই আমাকে পানাহার করানো হয়ে থাকে)-এর মর্মার্থঃ

মুহাদ্দিসীনে কিরাম এ উক্তিটির ব্যাখ্যায় নিম্নোক্ত অভিমতগুলো পেশ করেছেন-

(১) شرح السنة গ্রন্থকার বলেন, রাসূল (সাঃ)-কে আল্লাহ তাআলা রাত্রিকালে অদৃশ্য উপায়ে পানাহার করিয়ে থাকেন, কিন্তু এর স্বরূপ আমাদের অজানা।

(২) আল্লাহ তাআলা তাঁকে স্বপ্নে পানাহার করাতেন, এতেই তিনি শক্তি পেতেন।

(৩) তাঁর পানাহারের দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর ন্যস্ত। কারণ, তাঁদের উভয়ের মাঝে যে নিকটতম সম্পর্ক রয়েছে, তা অন্যের ক্ষেত্রে নেই। তাই এটা রাসূল (সাঃ)-এর জন্য খাস।

(৪) তাঁকে পানাহারের পরিবর্তে এমন আধ্যাত্মিক শক্তি দান করতেন, যাতে তাঁর এ প্রয়োজন সম্পন্ন হয়ে যেত।

(৫) এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহর মহত্ত্বের স্মরণ তাঁকে পানাহার হতে নিবৃত্ত রাখে।

(৬) ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং এর স্বরূপ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। (المغني ج٣ ص١٧١)

(৭) হাফিয ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন, নবী করীম (সাঃ) উক্ত উক্তি দ্বারা বোঝাতে চাচ্ছেন যে, আমার এবং আল্লাহ তাআলার ইশক ও মহব্বত এমন পর্যায়ের যে, তাঁর মহত্ত্ব ও নূরের দর্শন হাসিল হয়। যার ফলে পানাহারের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং এটা আমার রূহানী খাবার।

(৮) বাস্তবেই তাকে জান্নাত থেকে খাবার দেয়া হত, যার ফলে তাঁর ক্ষুধা এবং পিপাসা লাগত না। (درس مشكٰوة ج٢ ص١٩٩)

بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ ص٣٢٢

রোযাদার ব্যক্তির মিসওয়াক করা

... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ– (بخاري ج١ ص٢٥٩ باب السواك الرطب الخ، ترمذي ج١ ص١٥٤ باب السواك للصائم)

অনুবাদঃ ... আবদুল্লাহ ইবন আমের ইবন রাবীআ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে রোযা রাখা অবস্থায় মিসওয়াক করতে দেখেছি।

বিশ্লেষণঃ মিসওয়াক করা সুন্নাত। কিন্তু রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করা জায়েয কিনা, কিংবা কোন্ সময় মিসওয়াক করা উত্তম- এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। এ সম্পর্কে মোট ৭টি মত আছে-

১। ইমাম শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, রোযা রেখে দুপুরের আগে মিসওয়াক করা মুস্তাহাব। কিন্তু দুপুরের পর মিসওয়াক করা মাকরূহ। মিসওয়াক শুকনা হোক অথবা কাঁচা হোক। (عمدة للعيني ج١١ ص١٤)

দলীলঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস-

... لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ– (بخاري ج١ ص٢٥٤ باب فضل الصوم، مسلم ج١ ص٣٦٣ باب فضل الصيام، ترمذي ج١ ص١٥٩ باب فضل الصوم، نسائي ج١ ص٣٠٩ فضل الصيام، ابن ماجة ص١١٩)

অর্থাৎ, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের চেয়ে সুগন্ধময়।

তাঁরা বলেন যে, রোযাদারের পেট খালি হবার কারণে মুখে দুর্গন্ধ আসে। আর ঐ গন্ধ দুপুরের পরে শুরু হয়। মিসওয়াক করলে আল্লাহর প্রিয় ঐ গন্ধ দূর হয়ে যায়। তাই দুপুরের পর মিসওয়াক করা মাকরূহ।

২। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ও কতিপয় আলিম বলেন- আসরের পর মিসওয়াক করা মাকরূহ।

দলীলঃ "রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের চেয়ে বেশি প্রিয়।" এ হাদীস তাঁদেরও দলীল। তাঁর বলেন মুখের গন্ধ আসে আসরের পর।

(عمدة القاري ج١١ ص١٤)

৩। ইমাম মালিক, শাবী, যিয়াদ ও আবু মায়সারা-এর মতে, রোযা রাখা অবস্থায় কাঁচা বস্তু দিয়ে মিসওয়াক করা মাকরূহ। তবে শুকনো বস্তু দ্বারা মিসওয়াক করা যাবে।

দলীলঃ (ক) রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট প্রিয়। কাঁচা বস্তু ঐ গন্ধ দ্রুত দূর করে দেয়।

(খ) কাঁচা বস্তুর রস পেটে যেতে পারে, পেটে গেলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

৪। কতিপয় মনীষী বলেন, ফরয রোযার ক্ষেত্রে দুপুরের পর মিসওয়াক করা মাকরূহ। আর নফলের ক্ষেত্রে মাকরূহ নয়।

দলীলঃ আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর মুখের গন্ধ সংক্রান্ত হাদীস। তারা ঐ হাদীস ফরয রোযার সাথে সীমাবদ্ধ করেন।

৫। ইসহাক বিন রাহওয়াইহ বলেন, রোযার দিনে কাঁচা বস্তু দ্বারা মিসওয়াক করা যাবে না। আর দুপুরের পর শুকনো বস্তু দিয়েও মিসওয়াক করা যাবে না।

দলীলঃ (ক) কাঁচা বস্তুর রস পেটে যেতে পারে।

(খ) দুপুরের পর মুখে গন্ধ হয়। তাই দুপুরের পর মিসওয়াকই করা যাবে না।

৬। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন- পানি দ্বারা সিক্ত কোন বস্তু দিয়ে মিসওয়াক করা যাবে না।

দলীলঃ পানি দ্বারা সিক্ত বস্তু দিয়ে মিসওয়াক করলে অকারণে মুখে পানি প্রবেশ করানো হয়। আর রোযার সময় বিনা কারণে মুখে পানি প্রবেশ করানো নিষেধ।

৭। আলী (রাঃ), ইবন উমর (রাঃ), ইমাম আবু হানিফা, মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইবন সীরীন, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখঈ, ইমাম আওযাঈ (রহ.)-সহ জমহুর উলামাদের মতে, রোযাদারের জন্য মিসওয়াক করা জায়েয। সকালে, দুপুরে বা বিকেলে হোক, সব সময়ই মিসওয়াক করা জায়েয। ভেজা অথবা শুকনা মিসওয়াক হোক, কোন ক্ষতি নেই। (عمدة القاري ج١١ ص١٤)

দলীল (১)ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমের (রাঃ)-এর হাদীস।

... رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلعم يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ

দলীল (২)ঃ আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীস-

... قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْخِلَالِ خِلَالُ الصَّائِمِ بِالسِّوَاكِ–

অর্থাৎ, মিসওয়াক করাই রোযাদারের সর্বোত্তম খিলাল।

উপরোল্লিখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সতর্কতার সাথে রমযানের দিন রোযাদারের মিসওয়াক করা কোন দূষণীয় কাজ নয়, বরং সুন্নত ও সওয়াবের বিষয়।

জবাবঃ উপরোল্লিখিত অধিকাংশ মতেই দেখা যায় যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর মুখের গন্ধ সংক্রান্ত হাদীসকে দলীল সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর কারণ হল, মিসওয়াক করলে দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়, যা হাদীসের উদ্দেশ্যের খেলাফ। এর জবাবে আহনাফগণ বলেন, বাস্তবতা হল, হাদীসের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, এই দুর্গন্ধ বাকি রাখার ও তা সংরক্ষণের চেষ্টা করতে হবে। এখানে মুখের ঐ দুর্গন্ধের কথা বলা হয়েছে, যা পানাহার না করার কারণে আঁত থেকে সৃষ্টি হয়। মিসওয়াক করলেও এই দুর্গন্ধ দূর হবে না। আর স্বাভাবিকভাবে মুখে যে গন্ধ হয় তা দূর করার জন্য মিসওয়াক করতে হয়। (ফাযায়েলে আমল, রোযা অধ্যায়)

২। অথবা, মিসওয়াক করা স্বতন্ত্রভাবে একটি সুন্নাত। এখানে خُلُوْفُ الْفَمِ তথা মুখের গন্ধের সাথে মিসওয়াকের কোন সম্পর্ক নেই। তাই রাসূল (সাঃ) রমযান মাসে মিসওয়াকের অনুমতি দিয়েছেন। আর সূর্য ঢলার পর মিসওয়াক করা মাকরূহ, এ জাতীয় কথা শুধু ব্যক্তিগত অভিমত। সহীহ হাদীস দ্বারা এর কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে আল্লামা নববী (রহ.) বলেন-

"ولم يدل حديث صحيح على كراهته بعد الزوال" (معارف السنن ج٦ ص٧٧)

بَابٌ فِيْ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ ص٣٢٢

রোযাদার ব্যক্তির শিংগা লাগানো

... عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ الخ

(ترمذي ج١ ص١٦٠ باب كراهية الحجامة للصائم، ابن ماجة)

অনুবাদঃ ... সাওবান (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি শিংগা লাগায় এবং যার উপর লাগায় তাদের উভয়ের রোযা ভঙ্গ হয়।

বিশ্লেষণঃ রোযাদার শিংগা লাগালে রোযা ভেঙ্গে যাবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম আহমদ এবং ইসহাক (রহ.)-এর মতে, শিংগা লাগালে রোযা ভেঙ্গে যাবে। তবে এতে কাযা ওয়াজিব হবে, কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

* আতা (রহ.) বলেন, রমযান মাসে শিংগা লাগালে কাযা এবং কাফফারা উভয়টিই ওয়াজিব হবে। (المختصر للمنذري ج٣ ص٢٤٢)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

* ইমাম আওযাঈ, হাসান বসরী, মুহাম্মদ ইবন সীরীন এবং মাসরুক (রহ.)-এর মতে, শিংগা লাগানো মাকরূহ, তবে এতে রোযা ভঙ্গ হয় না।

(المختصر للمنذري ج٣ ص٢٤٢، عمدة القاري ج١١ ص٣٩)

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফিঈ ও জমহুর আলিমগণ বলেন, রমযানে শিংগা লাগানো বৈধ। শিংগা লাগালে রোযা ভঙ্গ হবে না। এ কাজটি মাকরূহও নয়।

(عيني ج١١ ص٣٩)

[তবে ইমাম মালিক, শাফিঈ ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.) থেকে একটি মত উল্লেখ করা হয়েছে যে, রোযা অবস্থায় শিংগা লাগানো মাকরূহ।]

(بداية المجتهد ج١ ص٢١٢، اوجز المسالك ج٣ ص٤٥)

দলীল (১)ঃ ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ– (ابو داود ج١ ص٣٢٣ باب في الرخصة، بخاري ج١ ص٢٦٠ باب الحجامة الخ، ترمذي ج١ ص١٦٢ باب الرخصة في ذلك، ابن ماجة ص١٢٢/٢٢٩)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রোযা থাকা অবস্থায় (স্বীয় দেহে) শিংগা লাগিয়েছেন।

দলীল (২)ঃ ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ–

অর্থাৎ, ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইহরামের মধ্যে রোযা থাকাবস্থায় শিংগা লাগান। (সূত্রঃ ঐ)

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِهٖ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم لاَ يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلاَ مَنِ احْتَلَمَ وَلاَ مَنِ احْتَجَمَ– (ابو داودباب ج١ ص٣٢٣ باب في الصائم يحتمل نهارا في رمضان)

অর্থাৎ, ... নবী করীম (সাঃ)-এর জনৈক সাহাবী* হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি বমি করে (অনিচ্ছাকৃত), যার স্বপ্নদোষ হয় এবং যে শিংগা লাগায়, তার রোযা ভঙ্গ হয় না।

---

* বায়হাকী বলেন, জনৈক সাহাবী দ্বারা উদ্দেশ্য হল, عبد الرحمن بن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عطاء عن ابي سعيد الخدري (আবু দাউদ, পাদটীকা)

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রোযা অবস্থায় শিংগা লাগালে রোযা নষ্ট হবে না।

জবাবঃ "اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ"-এর জবাব দিতে গিয়ে আহনাফগণ বলেন,

(১) اَفْطَرَ-এর অর্থ হচ্ছে "كَادَ أَنْ يُفْطِرَ" অর্থাৎ এই আমল রোযাদারকে রোযা ভঙ্গের নিকটবর্তী করে দেয়। حَاجِم (শিংগা লাগানো ব্যক্তি)-কে এজন্য বলা হয়েছে যে, সে রক্ত চুষার কারণে তার কণ্ঠনালীতে রক্ত ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর مَحْجُوْم (যার উপর শিংগা লাগানো হয়)-কে এজন্য বলা হয়েছে যে, সে শিংগা লাগানোর দরুণ খুব বেশি দুর্বল হয়ে পড়বে।

(عمدة القاري ج١١ ص٣٩، معارف السنن ج٦ ص١٦٤)

যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ اَنَسٌ مَا كُنَّا نَدْعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ اِلاَّ كَرَاهَةَ الْجُهْدِ– (ابو داود ج١ ص٣٢٣ باب في الرخصة، بخاري ج١ ص٢٦٠)

অর্থাৎ, সাবিত (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রাঃ) বলেছেন, রোযাদার ব্যক্তি দুর্বল হয়ে যাবে বিবেচনা করে আমরা তাকে শিংগা লাগাতে দিতাম না।

(২) ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, নবী করীম (সাঃ)-এর বাণী, "اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ" একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। একদা নবী করীম (সাঃ) কোথাও যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে দু'জন রোযাদার ব্যক্তিকে দেখতে পান, যারা শিংগা লাগানো অবস্থায় কারো গীবত করছে। তখন নবী করীম (সাঃ) উক্ত দু'ব্যক্তির ব্যাপারে বললেন যে, তাদের উভয়ের রোযা ভেঙ্গে গেছে। সুতরাং এখানে افطار (রোযা ভঙ্গের) দ্বারা প্রকৃত রোযা ভঙ্গ নয়, বরং গীবতের কারণে রোযার সওয়াব বিলুপ্তি বুঝানো হয়েছে। (طحاوي ج١ ص٢٩٥–٢٩٦)

(৩) ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা সাওবান ও শাদ্দাদের হাদীস মানসূখ হয়ে গেছে। কেননা, সাওবান ও শাদ্দাদ ইবন আওস (রাঃ)-এর হাদীসসমূহ মক্কা বিজয়কালীন। আর ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস মহানবী (সাঃ)-এর বিদায় হজ্জকালীন। (كتاب الأم ج٢ ص١٠٨، أو جز المسالك ج٣ ص٤٦)

(৪) اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ মূলতঃ এটি একটি পরামর্শ। যেন রোযা অবস্থায় শিংগা লাগানো না হয়। কারণ, এর ফলে মানুষের মধ্যে নেহায়েত দুর্বলতা এসে যায়,

রোযাতে স্বতঃস্ফূর্ততা অবশিষ্ট থাকে না। (درس ترمذي ج٢ ص٦١٦) এটা ঠিক তেমনই, যেমন নামায সম্পর্কে বলা হয়েছে-

... عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ ... قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ– (مسلم ج١ ص١٩٧ كتاب الصلٰوة ، باب سترة المصلى الخ)

অর্থাৎ, ... হযরত আবু যর (রাঃ) হতে বর্ণিত। ... নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, মহিলা, গাধা ও কুকুর নামায ভেঙ্গে দেয়।

অথচ এগুলো নামাযের সামনে দিয়ে গেলে নামায ভাঙবে না। তবে এমনটি যেন না হয়, সে পরামর্শই উক্ত হাদীসে দেয়া হয়েছে।

এ ব্যাখ্যার সমর্থন সহীহ্ বুখারীর একটি রেওয়ায়েতেও পাওয়া যায়।

سُئِلَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ كُنْتُمْ تَكْرَهُوْنَ الْحِجَامَةَ قَالَ لاَ اِلاَّ مِنْ اَجَلِ الضَّعْفِ– (بخاري ج١ ص٢٦٠)

অর্থাৎ, হযরত আনাস ইবন মালিক (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনারা কি রোযাদারের জন্য শিঙ্গা লাগানো মাকরূহ মনে করেন? উত্তরে তিনি বলেন, না। শুধুমাত্র দুর্বলতার কারণেই আমরা তা মনে করি।

পরিশেষে বলা যায়, রোযা রেখে শিংগা লাগানো জায়েয। এতে রোযার কোন ক্ষতি হয় না এবং সওয়াবেরও কোন কমতি হবে না। কিন্তু তাকওয়াবশতঃ কেউ যদি শিংগা না লাগায় তাহলে ভিন্ন কথা।

রোযা অবস্থায় ইনজেকশন নেয়ার হুকুমঃ রোযাদার ব্যক্তি ইনজেকশন নিতে পারবে কিনা, এ ব্যাপারে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ইমামদের মধ্যে এক জটিল ও দীর্ঘ এখতেলাফ রয়েছে।

তবে জমহুর উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল-

ফকীহগণ এ ব্যাপারে একটি মূলনীতি বের করেছেন যে, রোযা অবস্থায় পেটে বা মস্তিষ্কে স্বাভাবিক রাস্তা দিয়ে অর্থাৎ কান, নাক, গলা বা পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে ইচ্ছাপূর্বক কোন কিছু প্রবেশ করলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। এটাই শরীয়তের বিধান। ইনজেকশন দ্বারা যেহেতু স্বাভাবিক রাস্তা দিয়ে পেটে বা মস্তিষ্কে কিছু পৌঁছে না। সুতরাং, এর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না। আর শুধু শরীরে কোন কিছু প্রবেশ করলে বা করালেই রোযা ভঙ্গ হয় না। যেমন, অযু বা গোসল করলে, শরীরে তৈল মালিশ করলে, অথবা কুলি করলে পানি ও তৈল শরীরের লোমকূপ দিয়ে কিছু কিছু ভিতরে প্রবেশ করে। যার ফলে গরমের সময় গোসল করলে শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। অনেক সময় ক্ষুধাও নিবারণ হয়ে যায়। এমনকি নবী করীম (সাঃ) নিজেও অধিক গরমের সময় রোযা অবস্থায় শরীর ঠাণ্ডা করার জন্য ভিজা কাপড় মাথায় দিয়ে রেখেছেন।

মাথার শিরার সাথে যেহেতু শরীরের সমস্ত শিরার সম্পর্ক রয়েছে, তাই মাথা ঠাণ্ডা হওয়ার কারণে সমস্ত শরীরও ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কিন্তু এগুলো যেহেতু মস্তিষ্কে বা পেটে স্বাভাবিক রাস্তা দিয়ে পৌঁছে না, তাই এর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না।

(آلات جديدة ص١٥٣–١٥٧، بدائع الصنائع ج٢ ص٩٣، شامي ج٢ ص١٠٣)

بَابُ الصَّائِمِ يَسْتَقِيْ عَامِدًا ص٣٢٤

রোযাদার ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে

... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَرَعَه قَيْئٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَاِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ– (ترمذي ج١ ص١٥٣ باب من استقاء عمدا، ابن ماجة ص١٢٢)

অনুবাদঃ ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি রোযা থাকাবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তার জন্য রোযা আদায় করা জরুরী নয়। অবশ্য যদি কেউ ইছাকৃতভাবে বমি করে তবে সে যেন কাযা করে।

বিশ্লেষণঃ চার ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি এলে রোযা ভঙ্গ হয় না। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তবে রোযা ভঙ্গ হবে।

(معارف السنن ج٦ ص٦٤)

দলীলঃ উপরোল্লিখিত হাদীস।

* তবে হানাফীদের মতে, এখানে ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। আল্লামা ইবন নুজাইম (রহ.) বমির বারটি অবস্থা বর্ণনা করেছেন। যেমনঃ

বমি হয়ত নিজে নিজে আসবে অথবা ইচ্ছাকৃত বমি করা হবে। উভয় অবস্থায় মুখ ভর্তি বমি হবে বা হবে না। অতঃপর এগুলো থেকে প্রত্যেকটির অবস্থায় হয়ত বমি বের হবে, কিংবা নিজে নিজে ভিতরে চলে যাবে, যা ইচ্ছাকৃতভাবে ভিতরে নেয়া হবে। এই মোট বারটি অবস্থা হল। এই অবস্থাগুলোর মধ্যে শুধু দুই অবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে-

১. মুখ ভর্তি বমি হলে এবং রোযাদার বমির অংশ ইচ্ছাকৃত পেটে নিলে।

২. ইচ্ছাকৃত মুখ ভর্তি বমি করলে।

অন্য কোন অবস্থায় রোযা ভাঙ্গবে না। (البحر الرائق ج٢ ص٢٧٤)

بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ص٣٢٤ ঃ রোযাদার ব্যক্তির চুম্বন করা

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُنِيْ وَهُوَ صَائِمٌ وَاَنَا صَائِمَةٌ— (بخاري ج١ ص٢٥٨ باب القبلة للصائم، مسلم ج١ ص٣٥٢ باب بيان ان القبلة في الصوم الخ، ترمذي ج١ ص١٥٤ باب القبلة للصائم، ابن ماجة ص١٢٢)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রোযাবস্থায় আমাকে চুম্বন করতেন এবং আমিও রোযাবস্থায় থাকতাম।

বিশ্লেষণঃ রোযাদার ব্যক্তি স্ত্রীকে চুম্বন করার ক্ষেত্রে ফুকাহাদের পাঁচটি অভিমত পাওয়া যায়ঃ

১। ইমাম মালিক (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ অভিমত হল, রোযাদার ব্যক্তির স্ত্রীকে চুম্বন করা নিঃশর্তে (مُطْلَقًا) মাকরূহ।

২। ইমাম আহমদ, ইসহাক এবং দাউদ যাহেরী (রহ.)-এর মতে নিঃশর্তে জায়েয।

৩। কেউ কেউ বলেন, নফল রোযায় চুম্বন করা জায়েয এবং ফরয রোযায় নিষেধ।

৪। কতক তাবিঈগণের মতে, রোযায় চুম্বন করা নিঃশর্তে নিষেধ।

৫। ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ, সুফিয়ান সাওরী এবং ইমাম আওযাঈ (রহ.)-এর মতে, রোযাদার ব্যক্তি স্ত্রীকে চুম্বন করা দূষণীয় নয়, জায়েয আছে। তবে শর্ত হল, রোযাদার ব্যক্তিকে নিজের নফসের উপর অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকতে হবে, চুম্বন যাতে সঙ্গম পর্যায়ে না পৌঁছে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ইমাম খাত্তাবী (রহ.) বলেন, ইমাম মালিক (রহ.)-এর অভিমতও তাই।

(معارف السنن ج٦ ص٨٠، عمدة القاري ج١١ ص٩)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلٰكِنَّهُ كَانَ اَمْلَكَ لِاَرْبِهٖ— (ابو داود ج١ ص٣٢٤، بخاري ج١ ص٢٥٨ باب المباشرة للصائم، مسلم ج١ ص٣٥٢، ترمذي ج١ ص١٥٤ باب مباشرة الصائم، ابن ماجة ص١٢٢)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রোযা থাকাবস্থায় তাঁকে চুম্বন করতেন এবং তিনি রোযাবস্থায় তাঁর সাথে সহাবস্থান করতেন। তবে তিনি ছিলেন কঠোর সংযমী।

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَه وَاَتَاهُ اٰخَرُ فَنَهَاهُ فَاِذَا الَّذِيْ رَخَّصَ لَهٗ شَيْخٌ وَالَّذِيْ نَهَاهُ شَابٌّ– (ابو داود ج١ ص٣٢٤ باب كراهتة للشاب، ابن ماجة ص١٢٢)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট রোযা থাকাবস্থায় স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহাবস্থান করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি তাকে এর অনুমতি প্রদান করেন। এরপর অপর এক ব্যক্তি এসে অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে নিষেধ করেন। আর ব্যাপার এই ছিল যে, তিনি যাকে অনুমতি প্রদান করেন সে ছিল বৃদ্ধ, আর যাকে নিষেধ করেন সে ছিল যুবক।

দলীল (৪)ঃ ... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وَاَنَا صَائِمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَنَعْتُ الْيَوْمَ اَمْرًا عَظِيْمًا قَبَّلْتُ وَاَنَا صَائِمٌ قَالَ اَرَاَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ وَاَنْتَ صَائِمٌ قَالَ عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ فِيْ حَدِيْثِه قُلْتُ لاَ بَاسَ قَالَ فَمَه– (ابو داود ج١ ص٣٢٤ باب القبلة للصائم)

অর্থাৎ, ... জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, একদা রোযা থাকাবস্থায় আমি আমার স্ত্রীর সাথে আনন্দ-ফূর্তি করাকালে তাকে চুম্বন করি। এরপর আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আমি একটি গুরুতর কাজ করে ফেলেছি, রোযাবস্থায় আমি আমার স্ত্রীকে চুম্বন করেছি। তিনি বলেন, তুমি কি রোযা থাকা অবস্থায় পানি দ্বারা কুলি কর না? ঈসা ইবন হাম্মাদ তার হাদীসে বলেন, আমি বলি এতে তো কোন দোষ নেই।

সুতরাং উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চুম্বন করলে সহবাসে লিপ্ত হবে না, এমন ব্যক্তির জন্য চুম্বন করা জায়েয। তবে যে রোযাকে নিরাপদ রাখতে চায় সে চুম্বন থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে।

مَنْ اَصْبَحَ جُنُبًا فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ ص٣٢٤

রমযান মাসে নাপাক অবস্থায় ভোর হলে

... عَنْ عَائِشَةَ وَاُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُمَا قَالَتَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا قَالَ عَبْدُ اللهِ الاَذْرَمِيُّ فِيْ حَدِيْثِه فِيْ رَمَضَانَ مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ اِحْتِلاَمٍ ثُمَّ يَصُوْمُ– (بخاري ج١ ص٢٥٨ باب الصائم يصح جنبا، مسلم

ج١ ص٣٥٤ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، ترمذي ج١ ص١٦٣ باب الجنب يدركه الفجر الخ)

অনুবাদঃ ... নবী করীম (সাঃ)-এর স্ত্রী আয়িশা ও উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নাপাক অবস্থায় ভোর হয়ে যেত। রাবী আবদুল্লাহ আল-আযরামী তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেন, রমযানের মাসে রাতে স্বপ্নদোষের কারণে নয়, বরং স্ত্রী সহবাসের কারণে তিনি সকালে নাপাক অবস্থায় থেকে রোযা রাখতেন।

বিশ্লেষণঃ রোযার দিনে নাপাকী অবস্থায় ভোর হলে রোযা সহীহ হবে কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। আল্লামা আঈনী (রহ.) এ ব্যাপারে সাতটি অভিমত উল্লেখ করেছেন-

(১) হযরত আবু হুরায়রা, ফযল ইবন আব্বাস ও উসামা ইবন যায়েদ (রাঃ)-এর মতে, "لاَ يَصِحُّ صَوْمُ مَنْ اَصْبَحَ جُنُبًا" অর্থাৎ, "নাপাকী অবস্থায় প্রভাত করলে তার রোযা সহীহ হবে না।" অবশ্য হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) অবশেষে এ মত পরিত্যাগ করেছেন।

(২) তাউস ও উরওয়াহ (রহ.)-এর মতে, যদি ইচ্ছে করে গোসল করতে দেরি করে তাহলে রোযা সহীহ হবে না। আর অজ্ঞতাবশতঃ গোসল করতে বিলম্ব করলে রোযা শুদ্ধ হবে।

(৩) ইবরাহীম নাখঈ (রহ.)-এর মতে, এক্ষেত্রে ফরয রোযা সহীহ হবে না। কিন্তু নফল রোযা সহীহ হবে।

(৪) ইবন হাযম (রহ.) বলেন, নিদ্রা থেকে উঠার পর সূর্যোদয়ের আগে গোসল করে নামায পড়তে পারলে রোযা সহীহ হবে। যদি সূর্যোদয়ের পূর্বে গোসল করে নামায পড়তে না পারে, তবে রোযা বাতিল হয়ে যাবে।

(৫) হাসান ইবন সালেহ (রহ.)-এর মতে, এমতাবস্থায় ফরয রোযা কাযা করা মুস্তাহাব।

(৬) সালিম ইবন আবদুল্লাহ, হাসান বসরী ও আতা ইবন আবী রাবাহ (রহ.)-এর মতে, "عَلَيْهِ اَنْ يَّصُوْمَ وَيَقْضِيَ" অর্থাৎ, রোযা অব্যাহত রাখতে হবে এবং পরে এর কাযা করতে হবে।

দলীলঃ উপরোল্লিখিত ফকীহগণ দলীল হিসেবে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর উক্তি পেশ করেন- (مَنْ اَصْبَحَ جُنُبًا وَيُرِيْدُ الصَّوْمَ لَيْسَ لَهُ صَوْمٌ بَلْ يُفْطِرُ (طحاوي

অর্থাৎ, যে নাপাক ব্যক্তির উপর ফজরের সময় হয়ে যায় অথচ সে রোযা রাখতে চায় সে যেন রোযা না রেখে ইফতার করে।

(৭) জমহুর সাহাবা (রাঃ), ফুকাহা এবং চার ইমাম-এর মতে, এমন ব্যক্তির রোযা বিনা শর্তে জায়েয। ফরয রোযা হোক বা নফল রোযা হোক। ফজর আবির্ভাবের পর তাড়াতাড়ি গোসল করুক অথবা দেরিতে। দেরি ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলক্রমে অথবা ঘুমের কারণে হোক, সর্বাবস্থায় তার রোযা সহীহ হবে। (العمدة للعيني ج١١ ص٦)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوْا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ-

অর্থাৎ, অতঃপর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং যা কিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ দান করেছেন, তা আহরণ কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। (বাকারাঃ ১৮৭)

উক্ত আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নাপাক ব্যক্তি যদি ফজর আর্বিভাবের (طُلُوْع فَجَر) পর গোসল করে তাহলে তার রোযা সহীহ হয়ে যাবে, কেননা উক্ত আয়াতে পানাহার এবং সহবাস করার অনুমতি طُلُوْع فَجَر পর্যন্ত দেয়া হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি একেবারে রাত্রের শেষভাগে স্ত্রী সহবাস করবে, তাকে তো স্বাভাবিকভাবেই সুবেহ সাদিকের পর গোসল করতে হবে। অতএব যদি রোযার কোন ক্ষতি হত তাহলে এর পূর্বেই এ সমস্ত বিষয় থেকে মুক্ত হওয়ার হুকুম দেয়া হত।

দলীল (২)ঃ হযরত আয়িশা ও উম্মে সালামা (রাঃ)-এর হাদীস-

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم يُصْبِحُ جُنُبًا (পূর্ণ হাদীসটি অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে।)

দলীল (৩)ঃ **... عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اُصْبِحُ جُنُبًا وَّاَنَا اُرِيْدُ الصِّيَامَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا اُصْبِحُ جُنُبًا وَّاَنَا اُرِيْدُ الصِّيَامَ فَاَغْتَسِلُ وَاَصُوْمُ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَعْلَمَكُمْ بِمَا اَتَّبِعَ–** (ابو داود ج١ ص٣٢٤– ٣٢٥ باب من اصبح جنبا في شهر رمضان، مسلم ج١ ص٣٥٤)

অর্থাৎ, ... নবী করীম (সাঃ)-এর স্ত্রী আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি দরজায় দণ্ডায়মান অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নাপাক অবস্থায় আমার ভোর হয়ে যায় এবং আমি রোযা রাখার ইচ্ছা করি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আমারও নাপাক অবস্থায় ভোর হয়ে যায় এবং রোযা রাখার ইচ্ছা করি। আর আমি গোসল করি এবং রোযা রাখি। সে ব্যক্তি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো আমাদের মত নন, আল্লাহ তাআলা তো আপনার জীবনের পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মার্জনা করে দিয়েছেন। এতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রাগান্বিত হন এবং বলেন, আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের চাইতে অধিক আল্লাহভীরু ও তাঁর অধিক বন্দেগী করতে সংকল্প রাখি।
সুতরাং উপরোল্লিখিত কুরআনের আয়াত ও হাদীস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নাপাক অবস্থায় ভোর হলে রোযা সহীহ হবে।

জবাবঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা যে দলীল পেশ করা হয়েছে, এর জবাবে চার ইমাম বলেন যে, ইহা ঐ যুগে ছিল, যখন রাত্রে শোয়ার পর পানাহার এবং সহবাস করা নিষেধ ছিল। অতঃপর পবিত্র কুরআনের كُلُوْا وَاشْرَبُوْا অর্থাৎ "তোমারা খাও এবং পান কর।" আয়াতের দ্বারা এই হুকুম রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং এখন প্রভাতের পর নাপাকী থাকার অনুমতি রয়েছে। তবে একথা সত্য যে, সুবেহ সাদিকের পূর্বেই পবিত্র হয়ে যাওয়া অধিক উত্তম।

* কেউ কেউ জবাব দেন যে, আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীসটি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে ফজর উদয়ের পরেও সহবাসে লিপ্ত থাকে। আর একথা তো সর্বজন স্বীকৃত যে, এমন ব্যক্তির রোযা সহীহ হবে না, যে সুবেহ সাদিকের পরেও সহবাসে লিপ্ত থাকে।

* প্রথম দিকে যদিও এ ব্যাপারে ইখতিলাফ ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে চার মাযহাবের প্রদত্ত মতের উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লামা নববী (রহ.) ও ইমাম দাকীকুল ঈদ তাই বলেন। (شرح نووي على مسلم ج١ ص٣٥٤، معارف السنن ج٦ ص١٧٩–١٨٠)

كَفَّارَةُ مَنْ اَتَى اَهْلَهٗ فِيْ رَمَضَانَ ص٣٢٥

যে ব্যক্তি রমযানের দিনে স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তার কাফফারা

... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلٰى امْرَأَتِيْ فِيْ رَمَضَانَ قَالَ فَهَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لَا

অর্থাৎ, ... উম্মে হানী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি (রাবী) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিনে বিজয়ের পর ফাতিমা (রাঃ) আগমন করেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বামদিকে উপবেশন করেন এবং উম্মে হানী (রাঃ) বসেন ডান দিকে। তিনি (রাবী) বলেন, এ সময় জনৈকা দাসী একটি পাত্রে কিছু পানীয় দ্রব্য এনে পেশ করলে তিনি তা পান করেন। এরপর তিনি এর অবশিষ্ট অংশ উম্মে হানীকে পান করতে দেন। তিনি তা পান করে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো ইফতার করলাম, কিন্তু আমি যে রোযা ছিলাম। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি কোন কাযা রোযা আদায় করছিলে? তিনি বলেন, না। তিনি বলেন, যদি তা নফল রোযা হয়, তবে এতে কোন ক্ষতি হবে না।

* ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর অভিমতও ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মত। তবে তিনি বলেন, নফল রোযার নিয়ত দ্বিপ্রহরের পূর্বে করতে হবে।

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, সুফিয়ান সাওরী এবং ইবরাহীম নাখঈ (রহ.)-এর মতে, রমযানের রোযা নির্দিষ্ট মান্নতের রোযা এবং নফল রোযার নিয়ত দ্বিপ্রহরের পূর্বে করলেই চলবে। সুবহে সাদিকের পূর্বে নিয়ত করা জরুরী নয়। (যদিও রাত্রেই নিয়ত করা উত্তম) হ্যাঁ, রমযানের কাযা রোযা, কাফফারা ও সাধারণ মান্নতের রোযার ক্ষেত্রে ফযরের পূর্বেই নিয়ত করা ওয়াজিব।

(معارف للبنور ج٦ ص ٨٢-٨٣ ، المغني ج ٣ ص٩١)

দলীল (১)ঃ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنْ اَسْلَمَ اَنْ اَذِّنْ فِيْ النَّاسِ اَنَّ مَنْ كَانَ اَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَكَلَ فَلْيَصُمْ فَاِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ (ابو داود ج١ ص٣٣٢ باب في فضل صومه، بخاري ج١ ص٢٦٨-٢٦٩ باب صيام يوم عاشوراء، مسلم ج١ ص٢٥٩ باب صوم عاشوراء، نسائي ج١ ص٣١٩)

অর্থাৎ, সালামা ইবন আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন, তুমি লোকজনের মধ্যে ঘোষণা দাও, যে খানা খেয়েছে সে যেন দিনের অবশিষ্ট অংশে রোযা রাখে। আর যে খায়নি সে যেন রোযা রাখে। কারণ, এ দিনটি হল আশুরা দিবস।

উক্ত হাদীসে ফরয রোযার নিয়ত দিনে করার হুকুম দেয়া হয়েছে।

(উল্লেখ্য যে, এটি ঐ সময়ের ঘটনা যখন আশুরার রোযা ফরয ছিল।)

দলীল (২)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

তাঁরা বলেন, পানাহার সহবাসের মত, এমন কিয়াস করা যাবে না। তাই তাঁরা বলেন-(الهداية ج١ ص٢١٩) –فَتَنْحَصِرُ الْكَفَّارَةُ فِيْهِ وَلاَ يَتَجَاوَزُ اِلَى غَيْرِهِ

অর্থাৎ, কাফফারা সহবাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, অন্য দিকে (পানাহার) অতিক্রম করবে না।

দলীল (২)ঃ যদি কেউ ইচ্ছা করে পানাহার করে, তাহলে এর জন্য সে তওবা করবে। হাদীসে এসেছে- "اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ"

অর্থাৎ, গোনাহ থেকে তওবাকারী এমন, যেন তার কোন গোনাহই না।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক, ইবন মুবারক (রহ.) প্রমুখের মতে, কাফফারা কেবল সহবাসের সাথেই নির্দিষ্ট নয়; বরং ইচ্ছাকৃত পানাহারকারীর উপরেও কাফফারা ওয়াজিব হবে।

(حاشية الكوكب ج١ ص٢٥٣، الأوجز ج٣ ص٣٥)

দলীল (১)ঃ ... جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَفْطَرْتُ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْتِقْ رَقَبَةً الخ

(دارقطني ج٢ ص٢٠٩)

অর্থাৎ, ... এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট এসে বলল, রমযান মাসের কোন একদিন আমি ইচ্ছাকৃত রোযা ভেঙ্গেছি। তা শুনে নবী করীম (সাঃ) বললেন, তুমি একটি গোলাম আযাদ কর।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً اَفْطَرَ فِيْ رَمَضَانَ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً اَوْ يَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ اَوْ يُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا الخ (ابو داود ج١ ص٣٢٥، بخاري ج١ ص١٥٩، مسلم ج١ ص٣٥٥)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রমযানের মধ্যে রোযা ভঙ্গ করলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে দাস-দাসী আযাদ করতে, অথবা ক্রমাগত দুইমাস রোযা রাখতে বা ষাট জন মিসকীনকে খানা খাওয়াতে নির্দেশ দেন।

দলীল (৩)ঃ –عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اِنَّمَا الْكَفَّارَةُ فِيْ الاَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ

অর্থাৎ, হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অবশ্যই কাফফারা আদায় করতে হবে, পানাহার এবং সহবাসের কারণে।

সুতরাং উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সহবাসের কারণে যেমন কাফফারা ওয়াজিব হয়, তদ্রুপ পানাহারের দ্বারাও তা ওয়াজিব হবে।

জবাবঃ ইমাম শাফেঈ ও আহমদের দলীলের জবাবে আহনাফগণ বলেন-

(১) পানাহারের ক্ষেত্রে কাফফারার হুকুম আমরা কিয়াসের দ্বারা প্রমাণ করি না; বরং অনুচ্ছেদের হাদীসের دَلَالَةُ النَّص* দ্বারা প্রমাণ করি। কেননা, অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীসে কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার মূল কারণ হল রোযা ভঙ্গ করা। পানাহারের দ্বারা হোক অথবা সহবাসের কারণে হোক। সুতরাং ইহা কিয়াস নয়; বরং دَلَالَةُ النَّص (فتح القدير ج٢ ص٧١)

(২) কাফফারা কিয়াসের পরিপন্থী নয় বরং কিয়াসের অনুকূল। কেননা, অন্যায়ের দণ্ড বিধান বিবেকসম্মত।

(৩) দ্বিতীয় দলীলের জবাবে বলা যায়, কাফফারা এবং শরঈ সাজা তওবা দ্বারা ক্ষমা হয় না।

সাওমের কাফফারার পরিমাণঃ

রোযার কাফফারার পরিমাণ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে-

* ইমাম শাফেঈ ও মালিকের মতে, প্রত্যেক মিসকীনকে رُبْعُ صَاعٍ তথা এক সা'-এর চারভাগের একভাগ দিতে হবে। এ হিসেবে ৬০ জন মিসকীনকে মোট ১৫ সা' দিতে হবে। যার বর্তমান ওজন এক মণ সাড়ে বার সের গম।

দলীলঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীস-

... فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ قَدْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ... (ابو داود ج١ ص٣٢٥ باب كفارة من اتي اهله في رمضان)

অর্থাৎ, অতঃপর তাকে এমন একটি খুরমা ভর্তি থলে প্রদান করা হয়, যাতে পনের সা' পরিমাণ খেজুর ছিল।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, সাওমের কাফফারার পরিমাণ হল, ظِهَار (মায়ের সাথে স্ত্রীর উপমা)-এর কাফফারার অনুরূপ অর্থাৎ প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধ

---

* দালালাতুন নস (دَلَالَةُ النَّص) বলা হয়- এরূপ শব্দকে যা একথা প্রমাণ করে যে, আলোচিত বিষয়ের হুকুম অনালোচিত বিষয়ের জন্য প্রমাণিত। এই হুকুমটির কারণ শুধু অভিধান সম্পর্কে জ্ঞান থাকার কারণে বোঝা যায়। (تسهيل الوصول الى علم الاصول ص١٠٢)

সা গম দিতে হবে অথবা এক সা' খেজুর। অতএব, এ হিসেবে ৬০ জন মিসকীনকে ৩০ সা' গম দিতে হবে। যার বর্তমান পরিমাণ ২ মণ ২৫ সের গম। (العمدة ج١١ ص٣٧)

দলীলঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস-

... فَأَمَرَهُ أَنْ يَّجْلِسَ فَجَاءَهُ عَرَقَانِ فِيْهِمَا طَعَامٌ فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّتَصَدَّقَ بِهِ– (مسلم ج١ ص٣٥٥)

অর্থাৎ, ... তখন তিনি তাকে বসার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর খাদ্যভর্তি দুটি থলে এল। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) তাকে তা সদকা করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, এক আরাকে* ১৫ সা হলে দুই আরাকে ৩০ সা হবে। আর এগুলো যেহেতু ষাট মিসকীনকে দিবে, তাই প্রত্যেক মিসকীনের ভাগে পড়বে অর্ধ সা। (عمدة القاري ج١١ ص٢٧، اوجز المسالك ج٣ ص٤٢)

জবাবঃ ইমাম মালিক এবং শাফেঈ (রহ.)-এর দলিলের জবাবে আহনাফগণ বলেন যে-

(১) ঐ লোকটি যেহেতু দরিদ্র ছিল, তাই তাকে প্রাথমিকভাবে এক عَرَق সদকা করার জন্য বলা হয়েছিল, পরে যখন সামর্থ্যবান হয়, তখন তাকে দ্বিতীয় عَرَق সদকা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(২) ইমাম যুহরী বলেন, আসলে এই হাদীসটি উক্ত ব্যক্তির জন্য খাস ছিল। সুতরাং ১৫ সা-এর হাদীসটি কাফফারা আদায়ের ব্যাপারে দলীল হিসেবে গ্রহণ করার প্রশ্নই ওঠে না।

(৩) বাস্তব কথা হচ্ছে, ঐ লোকটিকে কাফফারা হিসেবে আদায় করার জন্য তা দেয়া হয়নি। বরং তার পরিবারের খরচের জন্য দেয়া হয়েছে। যেমন, আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হাদীস-

... وَقَالَ فِيْهِ كُلْهُ أَنْتَ وَاَهْلُ بَيْتِكَ وَصُمْ يَوْمًا وَّاسْتَغْفِرِ اللهَ– (ابو داود ج١ ص٣٢٥)

অর্থাৎ, ... রাবী বলেন, এরপর নবী করীম (সাঃ) তাকে বলেন, তুমি তা তোমার পরিবারের লোকদের সাথে ভক্ষণ কর এবং একদিন রোযা রাখ, আল্লাহর নিকট গুনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।

* দারা কুতনীতে বর্ণিত আছে-

---

* আরাক হল এরূপ থলে অথবা টুকরী যা খেজুর পাতা দিয়ে তৈরী করা হয়। তাছাড়া বুননকৃত সবকিছুকেই আরাক বলে। (مجمع بحار الانوار ج٣ ص٥٧٤)

... قَالَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بِالْمَدِيْنَةِ اَهْلَ بَيْتٍ اَحْوَجُ مِنَّا ، قَالَ فَانْطَلِقْ فَكُلْهُ أَنْتَ وَعِيَالُكَ فَقَدْ كَفَرَ اللّٰهُ عَنْكَ (دار قطني ج٢ ص٢٠٨)

অর্থাৎ, ... তিনি বলেন, যে সত্তা আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, মদীনাতে আমাদের চেয়ে অধিক মুখাপেক্ষী কোন পরিবার নেই। তখন প্রিয় নবী (সাঃ) ইরশাদ করলেন, যাও, তুমি ও তোমার পরিবার মিলে খাও। অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তোমার কাফফারা আদায় করে দিয়েছেন।
সুতরাং উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা বলা যায় যে, মালিকী ও শাফিঈদের দলীল হিসেবে ১৫ সা-এর হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়।

দলীল (৪)ঃ সর্বোপরি বলা যায়, উক্ত ব্যক্তির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত হাদীস থেকে যদি সাওমের কাফফারার পরিমাণ নির্ধারণ করতেই হয়, তাহলে এক্ষেত্রে আবু হানিফার অভিমতই অগ্রগণ্য। কেননা, হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বায়হাকীতে বর্ণিত আছে- (ابو داود ج١ ص٣٢٦) فَأُتِيَ بِعَرَقٍ مِنْ تَمَرٍ فِيْهِ عِشْرُوْنَ صَاعًا

অর্থাৎ, ... অতঃপর নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট খেজুরের একটি থলে আনা হল, তাতে ছিল ২০ সা'।
হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে আবু দাউদে বর্ণিত আছে-

... بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا الخ

(উক্ত অনুচ্ছেদে হাদীসটি অর্থসহ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।)
এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে-

مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا إِلٰى عِشْرِيْنَ– (العمدة ج١١ ص٢٧)

অর্থাৎ, ... ১৫ সা' থেকে ২০ সা' পর্যন্ত।

* আর সহীহ মুসলিমে হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে-

... "فَأَمَرَهُ اَنْ يَّجْلِسَ فَجَاءَهُ عَرَقَانِ فِيْهِمَا طَعَامٌ فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَّتَصَدَّقَ بِهِ" (مسلم ج١ ص٣٥٥)

(উক্ত হাদীসটি ইতিপূর্বে অর্থসহ আবু হানিফার দলীল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।)
সুতরাং বলা যায় যে, সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েত অন্যান্য রেওয়ায়েতসমূহ থেকে প্রাধান্য পাবে এটাই স্বাভাবিক।

রোযার কাফফারা আদায়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতাঃ রোযার কাফফারা আদায়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা জরুরী কিনা এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, রোযার কাফফারা আদায়ের ক্ষেত্রে হাদীসে বর্ণিত ধারাবাহিকতা বজায় রাখা জরুরী নয়, বরং তার ইচ্ছাধীন অর্থাৎ হাদীসে বর্ণিত গোলাম আযাদ করা অথবা ক্রমাগত দুই মাস রোযা রাখা অথবা ষাট জন মিসকীন খাওয়ানো, এর যে কোন একটি আদায় করলেই চলবে। ইবন জুরাইজ, ফুলাইহ ইবন সুলায়মান এবং আমর ইবন উসমান আল মাখযুমীও ইমাম মালিক (রহ.)-এর অভিমত পোষণ করেন। (معارف السنن ج٦ ص٧٣، فتح الباري ج٤ ص١٤٥، عمدة القاري ج١١ ص٣٤)

দলীল (১)ঃ তাঁরা রোযার কাফফারাকে শপথের কাফফারার উপর কিয়াস করেন। আর শপথের কাফফারার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন-

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهٗ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوْا اَيْمَانَكُمْ-

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না তোমাদের অনর্থক শপথের জন্য; কিন্তু পাকড়াও করেন ঐ শপথের জন্য যা তোমরা দৃঢ়ভাবে কর। অতএব, এর কাফফারা এই যে, দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে; মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাক। অথবা তাদেরকে বস্ত্র প্রদান করবে, অথবা একজন ক্রীতদাস কিংবা দাসী মুক্ত করে দিবে। যে ব্যক্তি (এসবের) সামর্থ্য রাখে না, সে তিনদিন রোযা রাখবে। এটা তোমাদের শপথের কাফফারা, যখন শপথ করবে। তোমরা শপথসমূহ রক্ষা কর। (সূরা মায়েদাঃ ৮৯)

উক্ত আয়াতে মিসকীনকে খাওয়ানো অথবা তাদেরকে কাপড় দেয়া অথবা গোলাম আযাদ করার ব্যাপারে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। সুতরাং রোযার কাফফারাকে তিনি কসমের কাফফারার উপরই কিয়াস করেন। (المغني ج٣ ص١٢٧)

দলীল (২)ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস-

... اَنَّ رَجُلاً اَفْطَرَ فِيْ رَمَضَانَ فَاَمَرَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّعْتِقَ رَقَبَةً اَوْ يَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ اَوْ يُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا الخ (প্রাগুক্ত)

সুতরাং লক্ষণীয় বিষয় হল, উক্ত হাদীসে اَوْ (অথবা) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে স্বাধীনতার সুযোগ দেয়া হয়েছে।

* ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল, ইমাম যুহরী (রহ.) ও জমহুর উলামাদের মতে, রোযার কাফফারা আদায়ের ক্ষেত্রে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা জরুরী। সুতরাং ক্রমাগত দুই মাস রোযা তখনই

রাখবে, যখন গোলাম আযাদ করার সামর্থ্য না থাকবে এবং ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ানোর অনুমতি তখনই পাবে, যখন ক্রমাগত দুই মাস রোযা রাখার সামর্থ্য না রাখে। (فتح الباري ج ٤ ص١٤٥، عمدة القاري ج١١ ص٣٤)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস, যা نص হিসেবে প্রমাণিত।

দলীল (২)ঃ তাঁরা রোযার কাফফারাকে ظِهَار (যিহার)-এর কাফফারার উপর কিয়াস করেন। ظِهَار-এর কাফফারার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ط ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ط فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ط فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا-

অর্থাৎ, যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাদের কাফফারা এইঃ একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দিবে। এটা তোমাদের জন্য উপদেশ। আল্লাহ খবর রাখেন তোমরা যা কর। যার এ সামর্থ্য নেই, সে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একাধারে দুই মাস রোযা রাখবে। যে এতেও অক্ষম, সে ষাট জন মিসকীনকে আহার করাবে। (মুজাদালাঃ ৩-৪)
উক্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, যিহারের তিন অবস্থায় কোথাও স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। বরং ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে। সুতরাং রোযার কাফফারাতেও ধারাবাহিকতা রক্ষা করা উচিত।

দলীল (৩)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে হাদীসে বর্ণিত আছে-

... فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لاَ الخ

উক্ত ইবারতে فَاء হরফ ব্যবহৃত হয়েছে, যা পিছনে আসা, অনুসরণ করা (تَعْقِيْب) অর্থে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমটি আদায়ে অপারগ হলে পরেরটি অনুসরণ করতে হবে।

দলীল (৪)ঃ আল্লামা আইনী (রহ.) বলেছেন, হাদীসে বর্ণিত ধারাবাহিকতা অগ্রাধিকারের আরেকটি কারণ হল, এতে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

(عمدة القاري ج١١ ص٣٤)

জবাবঃ ইমাম মালিক (রহ.)-এর দলীলের জবাবে উল্লিখিত তিন ইমাম বলেন, প্রথম দলীলের জবাব-

(১) যেখানে এ ব্যাপারে শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস স্পষ্ট হাদীস (نص) রয়েছে, সেক্ষেত্রে কিয়াসের কোন মূল্য নেই। সুতরাং اِشَارَةُ النَّص* কিয়াসের উপর অগ্রগণ্য লাভ করবে।

(২) তাছাড়া কিয়াস যদি করতেই হয়, তাহলে ظِهَار-এর কাফফারার উপর কিয়াস করা উচিত। কেননা উভয় কাফফারার মধ্যে বেশ সামঞ্জস্য রয়েছে। কিন্তু শপথের কাফফারার সাথে (গোলাম আযাদ ব্যতীত) কোন মিল নেই।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ হাদীসে او (অথবা) শব্দ দ্বারা স্বাধীনতা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা শ্রেণীবিন্যাস (تَنْوِيع) বুঝানো উদ্দেশ্য। (اعلاء السنن ج٩ ص١٢٣)

কাফফারা স্বীয় পরিবারবর্গে প্রদানের হুকুমঃ সকল উলামা ও ফুকাহা এ মাসআলায় ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি কাফফারার সম্পদ আপন পরিবার-পরিজনকে খাওয়াতে পারবে না।

এখন প্রশ্ন হলো, যদি কাফফারার বস্তু আপন পরিবারকে খাওয়ানো জায়েয না হয়, তাহলে রাসূল (সাঃ) ঐ লোকটিকে কিভাবে বললেন- اَطْعِمْهُ اَهْلَكَ অর্থাৎ, তোমার পরিবারের লোকদেরকে খেতে দাও। এর জবাবে মুহাদ্দিসীনে কিরাম নিম্নোক্ত মতামত ব্যক্ত করেছেন-

(১) ইমাম শাফেঈ ও যুহরী (রহ.) বলেন,
"اِنَّ هٰذَا الحَدِيْثَ خَاصٌّ بِالرَّجُلِ الْمَذْكُوْرِ" অর্থাৎ, এই হাদীসটি উক্ত ব্যক্তির জন্যই খাস

(২) কেউ কেউ বলেন, এ হুকুমটি পূর্বে কার্যকর ছিল। পরবর্তীতে তা মানসূখ হয়ে গেছে।

(৩) কেউ কেউ বলেন, হাদীসে আহল (اهل) বলতে নিজের পরিবার পরিজন বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, নিজের নিকটতম আত্মীয়-স্বজন।

(৪) আল্লামা তকী ওসমানী বলেন, ইহা মূলত কাফফারার জন্য ছিল না, বরং সদকা স্বরূপ ছিল। পরবর্তীতে ক্ষমতা হলে কাফফারা আদায় করতে হবে।

মোটকথা, আপন পরিবারের লোকদেরকে কাফফারার বস্তু খাওয়ানো জায়েয নয়।

---

* اِشَارَةُ النَّص হল এরূপ শব্দ যা এরূপ কোন অর্থ বুঝায় যার জন্য শব্দটিকে নেয়া হয়নি। কোন রকম চিন্তা-ফিকির ছাড়া প্রথম শ্রবণের সাথেই বাক্য দ্বারা তা বোঝা যায় না। (التسهيل ص١٠١)

অথবা, এর অর্থ এই ছিল যে, তাৎক্ষণিক তা দিয়ে নিজের পরিবারের লোকজনের খোরপোষের কাজ চালাও। কারণ, যখন পরিবারের লোকজন ক্ষুধার্ত থাকবে তখন মানুষের প্রথম ফরয ও প্রথম কাজ হয় তাদের পেটের ক্ষুধা নিবারণ করা। অতএব, এসব খেজুর প্রথমে নিজে ব্যবহার কর। পরবর্তীতে যখন আল্লাহ তাআলা ক্ষমতা দিবেন তখন কাফফারা আদায় করে দিও। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী হাদীসে বিশেষত্ব আরোপ নিষ্প্রয়োজন। এজন্য এ ব্যাখ্যাটিই উত্তম। ইমাম আবু হানিফা ও সুফিয়ান সাওরীর অভিমতও তাই। অর্থাৎ, পরিবারের লোকদেরকে কাফফারার বস্তু খাওয়ানো জায়েয নয়। (درس ترمذي ج۲ ص٥٦٧)

রমযানে সহবাসের ক্ষেত্রে স্ত্রীর উপর কাফফারা ওয়াজিব কিনাঃ

* দাউদ যাহেরীর মতে, রোযা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে, স্ত্রীর ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক কোন অবস্থাতেই স্ত্রীর উপর কাফফারা ওয়াজিব নয়।

* তবে সকল ফুকাহা এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, রোযা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে যেভাবে স্বামীর উপর কাফফারা আদায় করা আবশ্যক, অনুরূপ স্ত্রীর উপরও কাফফারা আবশ্যক হবে, যদি সহবাসে স্ত্রীর ইচ্ছা থাকে। হ্যাঁ, স্ত্রীকে যদি সহবাসে বাধ্য করা হয় এবং ইচ্ছা না থাকে, তাহলে তাকে কাফফারা দিতে হবে না; বরং কাযা আদায় করলেই চলবে। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লামা খাত্তাবী বলেছেন- "وَاِنْ اُكْرِهَتْ فَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ وَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهَا" অর্থাৎ, যদি তাকে সহবাসে বাধ্য করা হয়, তবে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে, কাফফারা ওয়াজিব নয়।

بَابُ فِيْمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ص٣٢٦

যে ব্যক্তি রোযার কাযা বাকি থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ (بخاري ج۱ ص٢٦٢ باب من مات وعليه صوم، مسلم ج۱ ص٣٦٢ باب قضاء الصوم عن الميت)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করছেনঃ যে ব্যক্তি তার উপর কাযা রোযা থাকাবস্থায় মারা যায় তার উত্তরাধিকারীগণ তার পক্ষ হতে তা আদায় করবে।

বিশ্লেষণঃ কোন ব্যক্তি রোযা অনাদায়ী রেখে মারা গেলে ওয়ারিশগণ সে রোযার কাযা আদায় করবে, নাকি ফিদয়া প্রদান করবে এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে-

* ইমাম আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, উত্তরাধিকারীগণ মৃতের পক্ষ হতে রোযা রাখা জায়েয। (معارف ج٥ ص٢٨٧)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ একদা এক মহিলা নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট এসে বলল-

... يَا رَسُوْلَ اللهِ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَ فَأَصُوْمُ عَنْهَا؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُوْمِي عَنْهَا– (مسلم ج١ ص٣٦٢، ترمذي ج١ ص١٤٤ باب المتصدقة يرث صدقة، ابن ماجة ص١٢٧)

অর্থাৎ, ... হে আল্লাহর রাসূল! আমার (মৃত) মায়ের উপর এক মাসের রোযার দায়িত্ব ছিল। আমি কি তার পক্ষ থেকে রোযা রাখব? নবী করীম (সাঃ) বললেন, তুমি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে রোযা রাখ।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.) প্রথমে ভিন্নমত পোষণ করলেও পরবর্তীতে ইমাম আবু হানিফার অভিমতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেন।

* আর ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, কোন প্রকার রোযার ক্ষেত্রে স্থলাভিষিক্ততা (نِيَابَتْ) নেই। অতএব, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা আদায় করা জায়েয নয়। বরং প্রতিটি রোযার বিনিময়ে একজন মিসকীনকে দু'বেলা খাদ্য খাওয়াবে। (شرح مسلم ج١ ص٣٦٢)

দলীল (১)ঃ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِيْ رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصِحَّ اَطْعَمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ (ابو داود ج١ ص٣٢٦ باب فيمن مات وعليه صيام)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি রমযান মাসে রোগাক্রান্ত হয় এবং সে ঐ অসুখ হতে সুস্থ না হয়ে মৃত্যুবরণ করে তবে তার পক্ষ হতে (ফিদ্য়া প্রদান করত) মিসকীনদের খাওয়াতে হবে। এবং তার উপর এর কাযা থাকবে না।

দলীল (২)ঃ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اِنَّ اُمِّيْ تُوَفِّيَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ رَمَضَانَ اَ يَصْلُحُ اَنْ اَقْضٰى عَنْهَا قَالَتْ لاَ وَلٰكِنْ تُصَدَّقِيْ عَنْهَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ عَلٰى مِسْكِيْنٍ خَيْرٌ مِّنْ صِيَامِكِ– (عمدة القاري ج١١ ص٦٠)

অর্থাৎ, আমরা বিনত আব্দুর রহমান বলেন, আমি আয়িশা (রাঃ)-কে বললাম, আমার আম্মা ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর উপর রমযানের রোযার দায়িত্ব ছিল। আমি তার

পক্ষ থেকে কাযা করে দিলে তা শুদ্ধ হবে কি? তিনি বললেন, না। তবে তুমি তার পক্ষ থেকে প্রতিদিনের জন্য কোন একজন মিসকীনকে সদকা কর। এটা তোমার রোযা অপেক্ষা উত্তম।

দলীল (৩)ঃ ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত-

لَا يُصَلِّيْ اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ وَلَا يَصُوْمُ اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ (بيهقي ج٤ ص٢٥٧، طحاوي ج٢ ص١٤١)

অর্থাৎ, কেউ কারো পক্ষ থেকে নামায পড়বে না এবং কেউ কারো পক্ষ থেকে রোযা রাখবে না।

দলীল (৪)ঃ হযরত ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত-

لَا يَصُوْمُ اَحَد عَنْ اَحَدٍ وَلَا يُصَلِّيْ اَحَد عَنْ اَحَدٍ– (موطاء امام مالك ص٢٤٥)

অর্থাৎ, কেউ কারো পক্ষ থেকে রোযাও রাখবে না এবং নামাযও পড়বে না।

কোন সাহাবী থেকেও এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তাঁরা একজনের বদলে অন্যজন রোযা রেখেছেন বা নামায আদায় করেছেন। বরং তাঁরা এ ধরনের ইবাদতে প্রত্যেকেই নিজে নিজে আমল করেছেন। (نصب الراية ج٢ ص٤٦٣)

তাছাড়া রোযা হচ্ছে নামাযের ন্যায় একটি শারীরিক ইবাদত। আর নিছক শারীরিক ইবাদতের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব জায়েয নয়।

সুতরাং উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জীবিত হোক অথবা মৃত হোক একজনের রোযা আরেকজন রাখা জায়েয নয়।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ ইমাম আহমদ ও ইসহাকের দলীল দুটোর জবাবে আহনাফগণ বলেন যে-

(১) প্রথম হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আয়িশা (রাঃ) নিজেই তার বিপরীত উক্তি করেছেন। (আমরা যেমন এর পূর্বে বর্ণনা করেছি।) তাই তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অথবা তারা হাদীসের যে উদ্দেশ্য নিয়েছেন, তা ঠিক নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হল, অভিভাবক তার যিম্মা থেকে রোযার যিম্মাদারী হতে নিষ্কৃতি পেল। আর তাহল মিসকীনকে খানা খাওয়ানো।

(২) আল্লামা তিব্বী (রহ.) এর ব্যাখ্যায় বলেন-

مَعْنَاهُ يَفْعَلُ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَا يَقُوْمُ مَقَامَ الصَّوْمِ وَهُوَ الْاِطْعَامُ–

অর্থাৎ, ওলী এমন কাজ করবে যা রোযার স্থলাভিষিক্ত হবে। আর তা হচ্ছে খাদ্য প্রদান। যা অন্য হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়।

যেমন, নবী করীম (সাঃ) তায়াম্মুমকে অযু দ্বারা বিশ্লেষণ করেছেন-

"اَلتُّرَابُ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ" অর্থাৎ, মাটি মুসলমানের ওযু।

মূলত উত্তরাধিকারীগণ মৃত ব্যক্তির যিম্মা থেকে রোযার যিম্মাদারী উঠিয়ে নিবে। এ ব্যাখ্যানুপাতে হযরত আয়িশার হাদীসটি আমাদের (আহনাফদের) দলীল। আপনাদের দলীল নয়।

(৩) অথবা হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে।

(عمدة القاري ج١١ ص٥٧-٦٤)

(৪) হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) বলেন, দ্বিতীয় হাদীসের "صُوْمِي عَنْهَا" (তুমি তার পক্ষে রোযা রাখ) উক্তিতে আদেশ বাধ্যবাধকতা অর্থে নয়। বরং সওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে মুস্তাহাব ও ইহসান হিসেবে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং অধিকাংশ সুদৃঢ় (محكمة) রেওয়ায়েতের মোকাবেলায় সম্ভাব্য (محتمل) রেওয়ায়েতের দ্বারা দলীল সহীহ নয়। মোটকথা, মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে ওলী রোযা না রেখে ফিদিয়া আদায় করবে। (درس مشكوة ج٢ ص٢٠٥)

بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ص ٣٢٦ ঃ সফরে রোযা রাখা

... عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ حَمْزَةَ الاَسْلَمِيُّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اِنِّيْ رَجُلٌ اَسْرُدُ الصَّوْمَ اَ فَاَصُوْمُ فِي السَّفَرِ قَالَ صُمْ اِنْ شِئْتَ وَاَفْطِرْ اِنْ شِئْتَ

(بخاري ج١ ص٢٦٠ باب الصوم في السفر والافطار، مسلم ج١ ص٣٥٧ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر الخ، ترمذي ج١ ص١٥٢ باب الرخصة في الصوم في السفر، نسائي ج١ ص٣٢٤ سرد الصيام، ابن ماجة ص١٢١)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হামযা আল আসলামী (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি প্রায়ই রোযা রাখি। কাজেই আমি কি সফরকালে রোযা (রমযানের) রাখব? তিনি বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে রোযা রাখতে পার, কিংবা ইফতারও করতে পার।

সফর অবস্থায় রোযা রাখার হুকুমঃ সফর অবস্থায় রোযা রাখা বা না রাখার ব্যাপারে ইমামদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছেঃ

* কতিপয় আহলে যাহিরের মতে, সফর অবস্থায় রোযা রাখা জায়েয নয়। বরং রোযা রাখলে তা পুনরায় মুকীম অবস্থায় কাযা করতে হবে। (فتح الباري ج٤ ص١٥٩)

দলীল (১)ঃ আল্লাহর বাণী- فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ

অর্থাৎ, অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে সেই রোযা পূরণ করে নিতে হবে। (বাকারাঃ ১৮৪)
উক্ত আয়াতে বুঝা যায় যে, সফরের কারণে যেহেতু অন্যদিন রোযা রাখার সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সুতরাং রমযানে রাখলে তা অসময়ে পালন করা হবে, যা উচিত নয়। অতএব পুনরায় রোযা রাখতে হবে।

দলীল (২)ঃ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ اِلٰى مَكَّةَ فِيْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيْمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَّاءٍ فَرَفَعَهٗ نَظَرَ النَّاسُ اِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيْلَ لَهٗ بَعْدَ ذٰلِكَ اِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ اُولٰئِكَ الْعُصَاةُ اُولٰئِكَ الْعُصَاةُ (مسلم ج١ ص٣٥٦، ترمذي ج١ ص١٥١ باب كراهية الصوم في السفر)

অর্থাৎ, ... জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর রমযান মাসে সাওমরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কার উদ্দেশ্যে বের হলেন। এরপর যখন তিনি 'কুরাউল গামীম' নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন লোকেরাও সাওমরত ছিল। এরপর তিনি একটি পানির পাত্র চাইলেন। ফলে লোকেরা তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করল। এরপর তিনি পানি পান করলেন। তখন তাঁকে বলা হল, কতিপয় লোক (এখনো) সাওমরত আছে। তিনি বললেন, তারা অবাধ্য, তারা অবাধ্য।
সুতরাং উক্ত হাদীসের আলোকে দেখা যাচ্ছে যে, রোযা রাখাকে সওয়াবের পরিবর্তে রোযাদারদেরকে গোনাহগার বা অবাধ্য বলা হয়েছে। সুতরাং রোযা রাখা কিভাবে শুদ্ধ হবে?

* আল্লামা তাবারী (রহ.) বলেন, সফর অবস্থায় রোযা ভাঙ্গা জায়েয নয়।
দলীলঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ অর্থাৎ, কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। (বাকারাঃ ১৮৫)

* ইমাম আহমদ, ইসহাক ও আওযাঈ (রহ.)-এর মতে, সফর অবস্থায় সাধারণত রোযা না রাখাই উত্তম। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এরও একটি রেওয়ায়েত অনুরূপ।
(فتح الباري ج٤ ص١٦٠)

দলীল (১)ঃ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى رَجُلاً يُّظَلَّلُ عَلَيْهِ وَالزِّحَامُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ. (ابو داود ج١ ص٣٢٧ باب من اختار الفطر، بخاري ج١ ص٢٦١ باب قول النبي صلعم لمن ظلل عليه فاشتد الحر الخ، مسلم ج١ ص٣٥٦،

ترمذي ج١ ص١٥٢، نسائي ج١ ص٣١٤ ما يكره من الصيام في السفر، ابن ماجة ص١٢١)

অর্থাৎ, জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী করীম (সাঃ) দেখলেন, জনৈক ব্যক্তিকে (রোযা থাকার কারণে) ছায়া দেয়া হয়েছে এবং তার নিকট লোকের ভীড় জমেছে। এরপর তিনি বললেনঃ সফরে রোযা রাখাতে কোন পুণ্য নেই।

দলীল (২)ঃ সফরে রোযা না রাখার অনুমতি প্রদান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ সুযোগ এবং নিয়ামত। সুতরাং এ নিয়ামত গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়।

* কতিপয় আলিম বলেন, সফর অবস্থায় রোযা রাখা এবং না রাখা উভয়ের স্বাধীনতা আছে। যার জন্য যেটা সহজ সেটাই উত্তম।

দলীল (১)ঃ আল্লাহর বাণী- يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তিনি তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না। (বাকারাঃ ১৮৫)

দলীল (২)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (৩)ঃ عَنْ اَنَس قَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ رَمَضَانَ فَصَامَ بَعْضُنَا وَاَفْطَرَ بَعْضُنَا فَلَمْ يُعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرَ عَلَى الصَّائِمِ.

(ابو داود ج١ ص٣٢٧ باب الصوم في السفر، بخاري ج١ ص٢٦١ باب لم يعب اصحاب النبي الخ، مسلم ج١ ص٣٥٦، ترمذي ج١ ص١٥٢)

অর্থাৎ, আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রমযান মাসে আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সফর করি। তখন আমাদের কেউ কেউ রোযা রাখে এবং কেউ কেউ ইফতার করে। কিন্তু ঐ সময় কোন রোযাদার ইফতারকারীকে এবং ইফতারকারী রোযাদারকে দোষারোপ করেননি।

* সুফিয়ান সাওরী ও আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (রহ.)-এর মতে, যদি শক্তি পায় আর রোযা রাখে তবে ভাল। এটা উত্তম। আর যদি রোযা না রাখে তাতেও কোন ক্ষতি নেই।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও শাফেঈ (রহ.) সহ জমহুর উলামার মতে, যদি ভীষণ কষ্টের আশঙ্কা না থাকে, তাহলে সফর অবস্থায় রোযা রাখাই উত্তম।

(عمدة القاري ج١١ ص٤٣)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলা অসুস্থ এবং সফর অবস্থায় রোযা না রাখার অনুমতি (رُخْصَة) প্রদানের পর উল্লেখ করেছেন- وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ

অর্থাৎ, "আর যদি তোমরা (সফরে) রোযা রাখ তবে উত্তম।" (বাকারাঃ ১৮৪)

দলীল (২)ঃ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فِي حَرٍّ شَدِيْدٍ حَتَّى اِنَّ اَحَدَنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ اَوْ كَفَّهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ مَا فِيْنَا صَائِمٌ اِلاَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ بْنُ رَوَاحَةَ. (ابو داود ج١ ص٣٢٧ باب في من اختار الصيام، بخاري ج١ ص٢٦١ باب اذا صام ايام من رمضان ثم سافر، مسلم ج١ ص٣٥٧، ابن ماجة ص١٢١)

অর্থাৎ, আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে প্রচণ্ড গরমের দিনে কোন এক যুদ্ধের জন্য বের হই। এ সময় অসহ্য গরমের কারণে আমাদের কেউ কেউ মাথায় হাত রাখছিল অথবা হাতের তালু রেখেছিল। আর এসময় আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রাঃ) ব্যতীত আর কেউই রোযাদার ছিলেন না।

দলীল (৩)ঃ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ الْهُذَلِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَمُوْلَةٌ يَأْوِيْ اِلَى شَبَعٍ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ اَدْرَكَهُ. (ابو داود ج١ ص٣٢٧ باب في من اختار الصيام)

অর্থাৎ, সিনান ইবন সালামা ইবনে মুহাব্বাক আল হুযাল্লী (রহ.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তির আরোহনের জন্য কোন বাহন থাকবে, যা তাকে নিরাপদ গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়ে দেবে, সে ব্যক্তির উচিত রমযানের রোযা (কাযা না করে) আদায় করা, যেখানেই তা পাবে। (অর্থাৎ সফরের মধ্যে যেখানেই রমযান মাস এসে পড়ে সেখানেই সক্ষম ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা উত্তম, যদিও কাযা করা জায়েয।)

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন সমস্যা না থাকলে সক্ষম ব্যক্তির জন্য সফরে রোযা রাখাই উত্তম।

জবাবঃ আহলে যাহিরের প্রথম দলীলের জবাবঃ (১) তাঁরা আয়াতের খণ্ডাংশের ভিত্তিতে রোযা রাখা অবৈধ বলেছেন। অথচ এর পরেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন- وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ (আর যদি তোমরা রোযা রাখ তবে উত্তম)। যেখানে আল্লাহ তাআলা উত্তম বলেছেন, সেক্ষেত্রে অবৈধ বলা মোটেই ঠিক নয়।

(২) তাছাড়া ঐ আয়াতে রোযা না রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে কেবল, রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়নি।

(৩) আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, উক্ত আয়াতে একটি শব্দ উহ্য (مَحْذُوف) রয়েছে। যেমন, আয়াতটি হবে-

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ (فَاَفْطَرَ) فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ.

অর্থাৎ, অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ অথবা সফরে থাকা অবস্থায় "রোযা ভঙ্গ করেছে" তার পক্ষে অন্য সময়ে সেই রোযা পূরণ করে নিতে হবে।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ নবী করীম (সাঃ)-এর اُولٰئِكَ الْعُصَاةُ (তারা অবাধ্য) বলার কারণ হল, যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত অবকাশকে কোন পাত্তা না দিয়েই রোযা রাখা শুরু করে অথবা যে রোযা রাখার দ্বারা তার ক্ষতি হয়, সেক্ষেত্রে নবী করীম (সাঃ) এই উক্তিটি করেছেন। নতুবা স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) রোযা রাখতেন না। তাছাড়া যারা রোযা রাখতেন তাদেরকেও তিনি কোনদিন তিরস্কার করেননি। যেমন-

... عَنْ قَزَعَةَ سَاَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ (اَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِي) خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ رَمَضَانَ عَامَ الْفَتْحِ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ وَنَصُومُ الخ (ابو داود ج۱ ص۳۲۷ باب الصوم في السفر، مسلم ج۱ ص۳٥٦)

অর্থাৎ ... কাযাআ (রহ.) হতে বর্ণিত .... আমি তাঁকে (আবু সাঈদ আল-খুদরী রাঃ-কে) সফরের মধ্যে রমযানের রোযা রাখা সম্পর্কে প্রশ্ন করি। আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের সময় রমযান মাসে আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে বের হই। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) রোযা রাখলে আমরাও রোযা রাখি।

* আল্লামা তাবারী প্রদত্ত দলীলের জবাবে বলা যায় যে, যেখানে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা আয়াতে স্পষ্টভাবে অবকাশ দিয়েছেন, সেক্ষেত্রে এমন কঠোরতা করা আদৌ ঠিক নয়।

ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ অর্থাৎ "সফরে রোযা রাখা পূণ্যের কাজ নয়"। আসলে এ উক্তিটি নবী করীম (সাঃ) কোন্ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন সেদিকে একটু নযর দিলেই ব্যাপারটি স্পষ্ট বুঝে আসে। অর্থাৎ প্রচন্ড গরমের কারণে সে লোকটি যখন অজ্ঞান হয়ে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল, তখন নবী করীম (সাঃ) বলেন- لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ আহনাফরা বলেন যে, সফর অবস্থায় অসহনীয় কষ্টের সময় ইফতার করা যে উত্তম, সে কথা তো আমরাও বলি। (درس ترمذي ج۲ ص٥٥٣)

ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ যদিও সফর অবস্থায় রোযা না রাখার অনুমতি প্রদান একটি বিশেষ সুযোগ ও নেয়ামত। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল- এই সহজ বিষয়টা গ্রহণ করাকে মর্যাদার প্রতীক বলে বর্ণনা করা হয়নি। বরং উত্তম বা মর্যাদার প্রতীক হিসেবে আল্লাহ তাআলা বলেন- وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ

* কতিপয় আলিমের প্রদত্ত অভিমতের জবাবে বলা যায়-
যদিও সফর অবস্থায় রোযা রাখা বা না রাখার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা রয়েছে, তবে এ কথা সত্য যে সফর অবস্থায় রোযা রাখাই উত্তম এবং যুক্তিযুক্ত। কেননা, সফরে রোযা রাখা কষ্টকর। আর যে বেশি কষ্ট করে ইবাদত পালন করে তার সওয়াব বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া রোযা রাখা যে উত্তম তার স্বপক্ষে কুরআনের نص (দলীল) রয়েছে- وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ

بَابُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ ص٣٣٣ ঃ রোযার নিয়ত

... عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ– (ترمذي ج١ ص١٥٤ باب لا صيام لمن لم يعزم من الليل، نسائي ج١ ص٣٢٠ النية في الصيام، ابن ماجة ص١٢٣)

অনুবাদঃ .... নবী করীম (সাঃ)-এর স্ত্রী হাফসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোযার নিয়ত করবে না, তার রোযা হবে না।

বিশ্লেষণঃ নিয়ত বা দৃঢ় সংকল্প করা সকল ফরয কাজের জন্য অপরিহার্য শর্ত। রোযার জন্যও নিয়ত করা ফরয। নিয়ত ব্যতীত রোযা সহীহ হবে না। (المغني ج٣ ص٩١) যেমন, নামাযের নিয়ত ছাড়া নামায শুদ্ধ হয় না। তবে রোযার নিয়তের সময় কখন এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক ও ইবন আবি যিব (রহ.)-এর মতে, সব ধরনের রোযার জন্য সুবহে সাদিকের পূর্বেই নিয়ত করা ফরয। রমযানের ফরয রোযা হোক কিংবা কাফফারার রোযা হোক অথবা মান্নতের রোযা বা নফল রোযা হোক অথবা ওয়াজিব রোযা হোক। সুবহে সাদিকের পর নিয়ত করলে রোযা হবে না।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে কোন রোযাকেই নির্দিষ্ট করা হয়নি।

কিয়াসী দলীলঃ রোযা সুবহে সাদিকের পর থেকে শুরু হয়। যেকোন কাজের নিয়ত তা শুরু হবার আগেই করতে হয়। যেমনঃ নামাযের নিয়ত নামায শুরুর পূর্বেই করতে হয়। সুতরাং রোযার নিয়ত সুবহে সাদিকের পূর্বে হতে হবে। এটাই স্বাভাবিক।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, সুবহে সাদিকের পূর্বে নিয়ত করা ছাড়া ফরয এবং ওয়াজিব রোযা শুদ্ধ হবে না। তবে নফল রোযার ক্ষেত্রে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পরেও নিয়ত করা যাবে।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসটি ফরয ও ওয়াজিবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

ইমাম শাফেঈ ও আহমদ (রহ.) বলেন, যেকোন নফল ইবাদত ভঙ্গ করলে, কাযা ওয়াজিব হয় না। রোযার বেলায়ও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। সুতরাং ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত নফল রোযা ভেঙ্গে ফেললে এর কাযা করা ওয়াজিব নয়।

সুতরাং এক্ষেত্রে রাত থেকেই নিয়ত করা আবশ্যক নয়। (المغني ج٣ ص١٥٢)

.... اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعٰى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَمَا اِنِّيْ كُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَالصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ اَمِيْنُ نَفْسِهِ اِنْ شَاءَ صَامَ وَاِنْ شَاءَ اَفْطَرَ (نسائي ج١ ص٣١٩ النية في الصوم ، ترمذي ج١ ص١٥٥ باب ما جاء في افطار الصائم المتطوع)

অর্থাৎ, ... রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর (উম্মেহানীর) নিকট প্রবেশ করে পানীয় আনালেন। অতঃপর তা পান করলেন। তারপর তা তাকে দান করলেন। ফলে তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো রোযাদার ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, নফল রোযাদার নিজের নফসের আমানতদার। সে ইচ্ছে করলে রোযা রাখতে পারে, আর ইচ্ছে করলে ভাঙতে পারে।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَنْ يَّسَارِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَّمِيْنِهِ قَالَتْ فَجَاءَتِ الْوَلِيْدَةُ بِاِنَاءٍ فِيْهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ اُمَّ هَانِئٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَقَدْ اَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ لَهَا كُنْتِ تَقْضِيْنَ شَيْئًا قَالَتْ لاَ قَالَ فَلاَ يَضُرُّكِ اِنْ كَانَ تَطَوُّعًا (ابو داود ج١ ص٣٣٣ باب الرخصة فيه، ترمذي ج١ ص١٥٥)

قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لاَ قَالَ اجْلِسْ فَاَتَى النَّبِيُّ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهٖ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا اَهْلُ بَيْتٍ اَفْقَرُ مِنَّا قَالَ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدَتْ ثَنَايَاهُ قَالَ فَاَطْعِمْهُ اِيَّاهُمْ وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِيْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ اَنْيَابُهٗ– (بخاري ج١ ص٢٥٩–٢٦٠ باب اذا جامع في رمضان الخ، مسلم ج١ ص٣٥٤ باب تغليظ تحريم الجماع الخ، ترمذي ج١ ص١٥٤ باب كفارة الفطر في رمضان، ابن ماجة ص١٢١)

অনুবাদঃ ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করে, আমি ধ্বংস হয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কি হয়েছে? সে বলে, রোযা অবস্থায় আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আযাদ করার মত কোন দাস-দাসী আছে কি? সে বলে, না। তিনি বলেন, তুমি কি ক্রমাগত দু'মাস রোযা রাখতে সক্ষম? সে বলে, না। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি ষাট জন মিসকীনকে খানা খাওয়াতে সক্ষম? সে বলে, না। তিনি তাকে বলেন, তুমি বস। এ সময়ে নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট এক 'ইরক' (থলে ভর্তি) খেজুর এল। এরপর নবী করীম (সাঃ) তাকে খুরমা ভর্তি একটি থলে প্রদান করে বলেন, তুমি তা দ্বারা সদকা কর। সে ব্যক্তি বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মদীনার উভয় পার্শ্বে আমাদের চাইতে অভাবগ্রস্ত আর কোন পরিবার নেই। রাবী বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এমনভাবে হেসে উঠেন যে, তাঁর সম্মুখের দন্তরাজি প্রকাশ হয়ে পড়ে। তিনি তাকে বলেন, তবে তোমরাই তা ভক্ষণ কর। রাবী মুসাদ্দাদ অন্য বর্ণনায় বলেন, তাঁর দন্তরাজি বের হয়ে পড়ে।

বিশ্লেষণঃ রোযার কাফফারা কেবল সহবাসের সাথেই নির্দিষ্ট, নাকি সহবাস ও পানাহার সবকটির কারণেই কাফফারা দিতে হবে, এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে-

* ইমাম শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, কাফফারা শুধু ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে, যে সহবাসের দরুণ রোযা ভঙ্গ করে অর্থাৎ কাফফারা সহবাসের সাথে নির্দিষ্ট। তাই ইচ্ছা করে কেউ পানাহার করলেও তার কাফফারা ওয়াজিব হবে না। (কেবল কাযা ওয়াজিব হবে।)

দলীল (১)ঃ পানাহারের ক্ষেত্রে কাফফারা আরোপ করা কিয়াসের পরিপন্থী। কেননা পানাহারের দ্বারা কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার কথা কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নেই।

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوْا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ

অর্থাৎ, আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। (বাকারাঃ ১৮৭)

উক্ত আয়াতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সুবহে সাদিক পর্যন্ত পানাহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। অতঃপর রোযার হুকুম শুরু হবে। সুতরাং একথাতো স্পষ্ট যে, রাত্রে নিয়ত করার কোন সুযোগই থাকল না। অতএব নিঃসন্দেহে দিনে নিয়ত করতে হচ্ছে। সুতরাং এতে বুঝা যায় যে, নির্দিষ্ট ফরয রোযার ক্ষেত্রে রাত্রে নিয়ত করা আবশ্যক নয়।

দলীল (৩)ঃ ফরয রোযার ক্ষেত্রে আবু হানিফা (রহ.)-এর দলীল-
যে সব ফরয রোযা নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত, সে রোযার সময়ে অন্য কোন রোযার নিয়ত করলেও তা আদায় হবে না। কারণ ঐ সময়টুকু ঐ রোযার জন্য নির্দিষ্ট। যেমন, রমযান মাস রমযানের ফরয রোযার জন্য নির্দিষ্ট। সুতরাং, এ সময় অন্য কোন রোযা রাখা যাবে না। এই বাধ্যবাধকতা অনেকটা নিয়তের কাছাকাছি। তাই এসব ক্ষেত্রে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত রোযার নিয়ত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

দলীল (৪)ঃ নফল রোযার ক্ষেত্রে আবু হানিফা (রহ.)-এর দলীল-

... عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ عَلَيَّ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَام فَاِذَا قُلْنَا لاَ قَالَ اِنِّيْ صَائِمٌ زَادَ وَكِيعٌ فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ اُهْدِيَ لَنَا حَيْس فَحَبَسْنَاهُ لَكَ فَقَالَ اَدْنِيْهِ فَاَصْبَحَ صَائِمًا فَاَفْطَرَ– (ابو داود ج١ ص٣٣٣ باب الرخصة فيه، ترمذي ج١ ص١٥٥، نسائي ج١ ص٣١٩ النية في الصيام)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) আমার নিকট আগমন করলে জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের নিকট কি খাবার আছে? আমরা না বললে, তিনি (সাঃ) বলতেন, আমি রোযা রাখলাম। রাবী ওয়াকী অতিরিক্ত বর্ণনায় বলেন, এরপর একদিন তিনি আমাদের নিকট আগমন করলে আমরা বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য হায়েস (ঘি ও আটা মিশ্রিত খেজুরের তৈরী এক প্রকার সুস্বাদু খাদ্য) হাদিয়া এসেছে। আর আমরা তা আপনার জন্য রেখে দিয়েছি। তিনি (সাঃ) বলেন, তা আমার কাছে নিয়ে আস। এরপর তিনি (সাঃ) সকাল হতে রাখা রোযা ভেঙ্গে ইফতার করেন।

উক্ত হাদীসে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, নবী করীম (সাঃ) নফল রোযার নিয়ত ফযরের পরেও করেছেন।

দলীল (৫)ঃ রমযানের কাযা, কাফফারা এবং সাধারণ মান্নতের রোযার ক্ষেত্রে যেহেতু বিশেষ কোন দিন নির্দিষ্ট নেই, সেহেতু পুরো দিন ঐ রোযার সাথে নির্দিষ্ট করার জন্য রাত্র থেকেই নিয়ত করা আবশ্যক। সুতরাং হাফসা (রাঃ)-এর হাদীসটি উল্লিখিত তিন ইমামের দলীল নয়, বরং হানাফীদের দলীল। কেননা হাদীসটি নির্দিষ্ট কোন রোযার সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং ব্যাপক।
তাই আহনাফগণ বলেন, হাফসা (রাঃ)-এর হাদীসটি মূলতঃ রমযানের কাযা, কাফফারা ও সাধারণ মান্নতের রোযার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কেননা ফরয, ওয়াজিবের ক্ষেত্রে ফজরের পরে যে নিয়ত করা যাবে তা ইতিপূর্বে দলীলসহ প্রমাণিত হয়েছে।

জবাবঃ তিন ইমামের প্রদত্ত দলীলের জবাবে হানাফীগণ বলেন-
(১) হাফসা (রাঃ)-এর হাদীসটি মারফূ নাকি মাওকূফ, এ নিয়ে এখতিলাফ রয়েছে। যেমন, হাদীসটির ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে- هُوَ خَطَاءٌ فِيْهِ اِضْطِرَابٌ
সুতরাং উক্ত হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।
(২) কেউ কেউ বলেন, হাফসা (রাঃ)-এর হাদীসটি খবরে ওয়াহেদ যার মোকাবেলায় কুরআনের আয়াত كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ الخ এসেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে কুরআনের আয়াতই প্রাধান্য পাবে।
(৩) হাফসা (রাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ দ্বারা সেহেরী খাওয়াকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে সেহেরী খায়নি। فَلَا صِيَامَ لَهٗ (তার রোযা আদায় হবে না) দ্বারা نَفْيِ كَمَال তথা রোযা পরিপূর্ণ না হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সেহেরী গ্রহণ না করলে রোযার পরিপূর্ণ সাওয়াব পাওয়া যাবে না।
(৪) অথবা হাফসা (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা মুস্তাহাব সময়ের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ রাতে নিয়ত করা মুস্তাহাব, তবে দিনেও নিয়ত করা জায়েয আছে।
(৫) সর্বোপরি বলা যায়, হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসের দ্বারা হযরত হাফসা (রাঃ)-এর হাদীস মানসূখ (রহিত) হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (রহ.)-এর অভিমত, "নফল রোযার (ও নামাযের) কাযা ওয়াজিব নয়"-এর জবাবঃ

যদিও ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এর মতে, নফল রোযা ভাঙ্গার দরুণ কাযা ওয়াজিব নয়, কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, নফল রোযা ভাঙ্গার দরুণ কাযা করা ওয়াজিব। (المغني ج٣ ص١٥٣، معارف السنن ج٦ ص٨٥، المدونة ج١ ص١٨٣)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না। (মুহাম্মাদঃ ৩৩)

নফল রোযাও (এবং নফল নামায) একটি আমল। সুতরাং তা ভেঙ্গে ফেললে অবশ্যই কাযা করতে হবে।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُهْدِيَ لِيْ وَلِحَفْصَةَ طَعَامٌ وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَاَفْطَرْنَا ثُمَّ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّا اُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ فَاشْتَهَيْنٰهَا فَاَفْطَرْنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْكُمَا صُوْمَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ (ابو داود ج١ ص٣٣٣ باب من رأى عليه القضاء، ترمذي ج١ ص١٥٥ باب ايجاب القضاء عليه، نسائي ج١ ص٣٢٠)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমার ও হাফসার (রাঃ) জন্য কিছু খাবার হাদিয়া স্বরূপ আসে। এ সময় আমরা উভয়ে রোযাদার ছিলাম। (কিন্তু খাবার পাওয়াতে) আমরা রোযা ভেঙ্গে তা খেয়ে ফেলি। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাজির হলে, আমরা তাঁকে বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য কিছু খাবার হাদিয়া স্বরূপ আসে, আর আমাদের তা খেতে ইচ্ছা হওয়াতে আমরা রোযা ভেঙ্গে খেয়ে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ক্ষতি নেই। তোমাদের উভয়ের জন্য অন্য কোনদিন রোযা কাযা করতে হবে।

উপরোল্লিখিত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, এটি ছিল নফল রোযা। নতুবা ফরয রোযা তাঁরা এভাবে ভেঙ্গে ফেলতেন না। আর নফল রোযা ভাঙ্গার দরুন অন্যদিন কাযা করার কথা বলা হয়েছে।

জবাব (১)ঃ উপরোল্লিখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সাধারণ ওযরের কারণেও নফল রোযা ভাঙ্গা জায়েয আছে। আর তাই তো বলা হয়েছে- اِنْ شَاءَ صَامَ وَاِنْ شَاءَ اَفْطَرَ। কিন্তু অপর হাদীসে কাযা করার হুকুমও দেয়া হয়েছে।

(২) তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, শাফেঈ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (সাঃ) রোযার কাযার হুকুম দিয়েছিলেন, কিন্তু বর্ণনাকারী তা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেননি। আর কোন বিষয় উল্লেখ না করা, তা আবশ্যক হওয়াকে নিষেধ করে না।

(৩) অথবা, প্রাথমিক অবস্থায় নফল রোযা রাখা বা না রাখার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ছিল। কেউ রাখতেও পারে, নাও রাখতে পারে। কিন্তু রেখে ভেঙ্গে দিলে কাযা করতে হবে। কিন্তু, শাফেঈ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা এ উদ্দেশ্য নয় যে, রোযা রাখার পর ভেঙ্গে ফেললে তা কাযা করতে হবে না।

* উম্মে হানী (রাঃ)-এর হাদীসের জবাবে বলা যায়-

(১) উম্মে হানীর হাদীসটি আল্লামা আইনী ও তিরমিযীর (রহ.) মতে অসঙ্গতিপূর্ণ আর অসঙ্গতিপূর্ণ হাদীস দলীলযোগ্য নয়।

(২) উক্ত হাদীসে লক্ষণীয় যে, ঘটনাটি ঘটেছিল মক্কা বিজয়ের দিন। আর মক্কা বিজয় হয়েছিল রমযান মাসে, আর রমযান মাসে যে নফল রোযা রাখা জায়েয নয়, একথা তো সর্বজনবিদিত। অথচ হাদীসে নফল রোযার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং হাদীসটি কোনক্রমেই দলীলযোগ্য নয়।

ইতিকাফ : بَابُ الْاِعْتِكَافِ ص٣٣٤

... عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَّمَضَانَ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ ثُمَّ اِعْتَكَفَ اَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهٖ (بخاري ج١ ص٢٧١ باب الاعتكاف في العشر الاواخر، مسلم ج١ ص٣٧١ كتاب الاعتكاف، ترمذي ج١ ص١٦٥ باب الاعتكاف اذا خرج مله، ابن ماجة ص١٢٧)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) রমযানের শেষ দশক ইতিকাফ করতেন, যতদিন না আল্লাহ তাআলা তাঁকে উঠিয়ে নেন। এরপর তাঁর স্ত্রীগণও (স্ব-স্ব গৃহে) ইতিকাফ করেন।

ইতিকাফের আভিধানিক অর্থঃ اِعْتِكَاف শব্দটি বাবে اِفْتِعَال-এর মাসদার। এর মূল ধাতু হচ্ছে عكف এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-

১। اَلْاِقَامَةُ عَلَى الشَّيْئِ وَلُزُوْمِهٖ - কোন জিনিসের নিকট অবস্থান করা এবং সেটাকে আঁকড়ে ধরা। যেমন কুরআনে এসেছে-

وَجَاوَزْنَا بِبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰى اَصْنَامٍ لَّهُمْ

অর্থাৎ, বস্তুত আমি সাগর পার করে দিয়েছি বনী ইসরাইলদেরকে। তারা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে পৌঁছালো, যারা তাদের মূর্তি পূজাকে আঁকড়ে ধরেছিল। (আরাফঃ ১৩৮)

২। حَبْسُ النَّفْسِ عَلَيْهِ - কোন জিনিসের উপর নিজেকে আটকিয়ে রাখা।

(درس ترمذي ج٢ ص٦٣٠)

যেমন কুরআনে এসেছে- مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ

অর্থাৎ, এই মূর্তিগুলো কী, যাদের সাথে তোমরা নিজেদেরকে আটকিয়ে রেখেছ? [অর্থাৎ এদের পূজারী হয়েছ] (আম্বিয়াঃ ৫২)

৩। নিজেকে বন্দী করা।

৪। নির্দিষ্ট পরিগণ্ডিতে বাস করা।

৫। মসজিদে অবস্থান করা।

ইতিকাফের পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

هُوَ الْاِقَامَةُ فِيْ الْمَسْجِدِ وَاللَّبْثُ فِيْهِ مَعَ الصَّوْمِ وَالنِّيَّةِ (تبيين الحقائق ج١ ص٣٤٧)

অর্থাৎ, ইতিকাফ হল, রোযা ও নিয়ত সহকারে মসজিদে অবস্থান করা।

(২) আল্লামা ইমাম কুদুরী (রহ.) বলেন- هُوَ اللَّبْثُ فِيْ الْمَسْجِدِ مَعَ الصَّوْمِ وَنِيَّةِ الْاِعْتِكَافِ

অর্থাৎ ইতিকাফের নিয়তে রোযা সহকারে মসজিদে অবস্থান করার নামই ইতিকাফ।

(৩) আল্লামা জুরজানী বলেন, هُوَ لَبْثُ الصَّائِمِ فِيْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ بِنِيَّةٍ

অর্থাৎ, নিয়ত সহকারে রোযাদারের জামে মসজিদে অবস্থানকে ইতিকাফ বলা হয়।

(৪) কেউ কেউ বলেন,

هُوَ الْاِقَامَةُ فِيْ الْمَسْجِدِ بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ اِلَى اللهِ تَعَالٰى سَاعَةً فَمَا فَوْقَهَا–

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের নিয়তে অল্প বা বেশি সময় মসজিদে অবস্থান করার নামই হল ইতিকাফ।

(৫) কেউ কেউ বলেন, اَلْاِعْتِكَافُ اللَّبْثُ فِيْ الْمَسْجِدِ مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوْصٍ بِنِيَّةٍ مَخْصُوْصَةٍ عَلٰى صِفَةٍ مَخْصُوْصَةٍ

অর্থাৎ, ইতিকাফ হল বিশেষ নিয়তে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ব্যক্তির মসজিদে অবস্থান।

ইতিকাফের প্রকারভেদঃ ইসলামী শরীয়াতে ইতিকাফ তিন প্রকার। যথা-

(১) সুন্নত ইতিকাফঃ সুন্নত ইতিকাফ হল- যে ইতিকাফ শুধু পবিত্র রমযানের শেষ দশকে একুশ তারিখের রাত (তথা বিশ তারিখের সূর্যাস্তের পূর্ব) থেকে নিয়ে ঈদের চাঁদ দেখা পর্যন্ত ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে থাকা হয়।

(معارف السنن ج٦ ص١٩٤ ، المغني ج٣ ص٢١٠)

যেহেতু নবী করীম (সাঃ) প্রত্যেক বছর এই দিনসমূহে ইতিকাফ করতেন, এজন্য একে সুন্নত ইতিকাফ বলা হয়। [যদিও বিশেষ কারণে নবী করীম (সাঃ) থেকে রমযানে দুইবার ইতিকাফ ছুটে গিয়েছিল।]

আল্লামা চলপী (রহ.) লিখেন- لَانَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَيْهِ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيْرِ مِنْ رَمَضَانَ (حاشية جلبي على التبيين ج١ ص٣٤٧)

অর্থাৎ, কারণ নবী করীম (সাঃ) রমযানের শেষ দশকে সর্বদা এই ইতিকাফ করতেন।

ইহা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ কিফায়া। অর্থাৎ একটি মহল্লা বা জনপদে কোন একজনও যদি ইতিকাফ করে তাহলে পুরো মহল্লাবাসীর পক্ষ থেকে এর সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু পুরো মহল্লা থেকে যদি একজনও ইতিকাফ না করে, তাহলে সমস্ত মহল্লাবাসীর উপর সুন্নত ছাড়ার গুনাহ হবে। (احكام اعتكاف ص٣٠-٣١)

উল্লেখ্য যে, রমযানে যে ইতিকাফ মাসনূন তা দশদিনের কম হলে সুন্নত আদায় হবে না। (التبيين الحقائق ج١ ص٣٤٨)

(২) ওয়াজিব ইতিকাফঃ ওয়াজিব ইতিকাফ হল, যা মান্নতের দ্বারা ওয়াজিব হয়ে থাকে অথবা কোন সুন্নত ইতিকাফ বিনষ্ট করার ফলে এর কাযা ওয়াজিব হয়ে থাকে।

(৩) নফল ইতিকাফঃ ইহা হচ্ছে উপরোল্লিখিত দু'প্রকার ইতিকাফ ছাড়া অন্যান্য ইতিকাফ। আর নফল ইতিকাফ যে কোন সময় আদায় করা যায়।

(التبيين الحقائق ج١ ص٣٤٨، معارف السلن ج٦ ص١٩١-١٩٢)

উল্লেখ্য যে, মহিলারাও স্বীয় গৃহে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা নির্ধারণ করে তথায় ইতিকাফ করতে পারবে, তবে এক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতি নেয়া আবশ্যক। তাছাড়া ইহাও অত্যাবশ্যক যে, তাকে হায়েয ও নেফাস থেকে পবিত্র হতে হবে।

(بدائع الصنائع ج٢ ص١٠٨-١٠٩ ، احكام اعتكاف ص٢٩)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ ওয়াজিব এবং সুন্নত ইতিকাফে সর্বসম্মতিক্রমে রোযা রাখা শর্ত। কিন্তু নফল ইতিকাফে রোযা রাখতে হবে কিনা এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ, আবু ইউসুফ (রহ.) প্রমুখের মতে, নফল ইতিকাফে রোযা রাখা আবশ্যক নয়। কেননা, ইমাম শাফেঈ, মুহাম্মদ ও আহমদ (রহ.)-এর নিকট নফল ইতিকাফের সর্বনিম্ন সময় হচ্ছে- এক মুহূর্ত। তথা নফল ইতিকাফের জন্য সময়ের কোন পরিমাণ নির্ধারিত নেই। আর আবু ইউসুফ (রহ.)-এর নিকট দিনের অধিকাংশ সময়। (عمدة القاري ج١١ ص١٤٠)

দলীল (১)ঃ ... عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ جَعَلَ عَلَيْهِ اَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَيْلَةً اَوْ يَوْمًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَسَاَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْتَكِفْ وَصُمْ– (ابو داود ج١ ص٣٣٥ باب المعتكف بعود المريض، بخاري ج١ ص٢٧٤ باب من لم يرٰى على المعتكف صوما/٢٧٢، ابن ماجة ص١٢٨)

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রাঃ) জাহেলিয়াতে একদিন অথবা একরাত মাসজিদুল হারামে ইতিকাফের মান্নত করেন। তিনি এ সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তুমি ইতিকাফ কর এবং রোযা রাখ।

এবং অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে- "اِعْتَكِفْ لَيْلَةً" অর্থাৎ, "তুমি রাত্রে ইতিকাফ কর।"

এখানে একরাত ইতিকাফের কথাও উল্লেখ রয়েছে। আর একথা স্পষ্ট যে, রাতে রোযা রাখার উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়। এবং নবী করীম (সাঃ) তাঁকে ইতিকাফ পূর্ণ করারও হুকুম দিয়েছেন। এতে নিশ্চিত বুঝা যাচ্ছে যে, রোযা ব্যতীত (নফল) ইতিকাফ বিশুদ্ধ হবে।

দলীল (২)ঃ হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত- لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صَوْمٌ
অর্থাৎ, ইতিকাফকারীর রোযা প্রয়োজন নেই।

* ইমাম আবু হানিফা ও মালিক (রহ.)-এর মতে, নফল ইতিকাফের জন্য রোযা রাখা আবশ্যক। কেননা, তাঁদের নিকট নফল ইতিকাফের সর্বনিম্ন সময় হচ্ছে একদিন। (عمدة القاري ج١١ ص ١٤٠)

দলীল (১)ঃ ... عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ جَعَلَ عَلَيْهِ اَنْ يَّعْتَكِفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَيْلَةً اَوْ يَوْمًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْتَكِفْ وَصُمْ (ابو داود ج١ ص٣٣٥، بخاري ج١ ص١٧٢، ابن ماجة ص١٢٨)

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রাঃ) জাহেলিয়াতে একদিন অথবা একরাত মাসজিদুল হারামে ইতিকাফের মানত করেন। তিনি এ সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তুমি ইতিকাফ কর এবং রোযা রাখ।

দলীল (২)ঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে-
لَا اِعْتِكَافَ اِلاَّ بِصَوْمٍ (ابو داود ج١ ص٣٣٥) অর্থাৎ, রোযা ব্যতীত ইতিকাফ নেই।

দলীল (৩)ঃ ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তাঁরা বলেন- اَلْمُعْتَكِفُ يَصُوْمُ (بيهقي) অর্থাৎ, ইতিকাফকারী রোযা রাখবে।

উপরোল্লিখিত হাদীস সমূহে ইতিকাফকারীকে রোযা রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে। আর রোযা একদিনের কম হয় না। আর হাদীসে রোযাকে সাধারণ (مطلق) রাখা হয়েছে। ফরয কিংবা ওয়াজিবের সাথে শর্তযুক্ত (مقيد) করা হয়নি। সুতরাং নফরের ক্ষেত্রেও রোযা রাখতে হবে।

দলীল (৪)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ – ولاَ تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ–

অর্থাৎ, অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। আর যতক্ষণ তোমরা ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিশো না। (বাকারাঃ ১৮৭)
উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ইতিকাফের জন্য রোযা জরুরী। কেননা আয়াতে রোযার সাথে ইতিকাফের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

আহনাফদের পক্ষ থেকে জবাবঃ উমর (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রদত্ত দলীলের জবাব হল এই- সহীহ মুসলিমে উক্ত হাদীস বর্ণিত আছে, তথায় لَيْلَةً (রাত)-এর জায়গায় يَوْمًا (দিন)-এর কথা উল্লেখ রয়েছে। এবং আবু দাউদ ও নাসায়ীতে يَوْمًا وَلَيْلَةً (দিন এবং রাত) উভয়ই উল্লেখ আছে। এ থেকে বুঝা যায় যে সকল রেওয়ায়েতে শুধু রাত্রের কথা উল্লেখ রয়েছে, এর দ্বারা لَيْلَةً مَعَ يَوْمِهَا (সেই দিনসহ রাত) বুঝানো উদ্দেশ্য। আর দিন হল রোযার আধার (ظَرْف)। সুতরাং রোযা রাখা আবশ্যক। (درس مشكوة ج٢ ص٢١١)

দলীল (২)ঃ অথবা বলা যায় যে, নবী করীম (সাঃ)-এর এই হুকুম ছিল হযরত উমর (রাঃ)-এর জাহেলিয়াতের যুগে মান্নতকৃত ইতিকাফ আদায় প্রসঙ্গে। আর এই হুকুম ছিল, হযরত উমর (রাঃ)-কে মানসিক প্রশান্তি দান প্রসঙ্গে। এটা আদায় করা বা না করা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এতে রোযারও প্রয়োজন নেই। কেননা, হানাফী মাযহাবে জাহেলিয়াতের যুগে মান্নতই সহীহ নয়। আর অন্যদের মতে যেহেতু জাহেলিয়াতের যুগে মান্নতকৃত ইতিকাফ আদায় করা ওয়াজিব, সুতরাং নফলের ক্ষেত্রে উক্ত হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করা আদৌ ঠিক নয়। (درس مشكوة ج٢ ص٢١٠–٢١١)

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ স্বয়ং ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকেই এর বিপরীত রেওয়ায়েত পাওয়া যায়- اَلْمُعْتَكِفُ يَصُوْمُ (بيهقي) অর্থাৎ, ইতিকাফকারী রোযা রাখবে।

সুতরাং নিয়ম হল- وَاِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا অর্থাৎ, যখন দুটি বিষয় পরস্পরবিরোধী হয়, তখন উভয়টি অকার্যকর হয়ে পড়ে।

উক্ত আলোচনায় যদিও হানাফী মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তথাপি নির্ভরযোগ্য মত এই যে, নফল ইতিকাফের জন্য বিশেষ কোন সময় নির্ধারিত নেই; বরং যতটুকু সময়ই ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করবে, তাই নফল ইতিকাফ হিসেবে গণ্য হবে। আর এর জন্য রোযা রাখাও শর্ত নয়। (التبيين ج١ ص٣٤٨)

بَابُ اَيْنَ يَكُوْنُ الْاِعْتِكَافُ ص٣٣٤

ইতিকাফ কোথায় করতে হয়?

... عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَا لْاَوَاخِرَ مِنْ رَّمَضَانَ قَالَ نَافِعٌ وَّقَدْ اَرَانِيْ عَبْدُ اللّٰهِ الْمَكَانَ الَّذِيْ كَانَ يَعْتَكِفُ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَسْجِدِ– (مسلم ج١ ص٣٧١ كتاب الاعتكاف، ابن ماجة ص١٢٨)

অনুবাদঃ ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) রমযান মাসের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। নাফে বলেন, আমাকে আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) মসজিদের ঐ স্থানটি দেখান, যেখানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইতিকাফ করতেন।

বিশ্লেষণঃ জামে মসজিদ ব্যতীত ইতিকাফ শুদ্ধ হবে কিনা, এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* হযরত ইবন মাসউদ, আলী (রাঃ), আতা হাসান বসরী, ইমাম যুহরী এবং ইমাম মালিক (রহ.)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইতিকাফ সহীহ হওয়ার জন্য জামে মসজিদ আবশ্যক। সুতরাং জামে মসজিদ ছাড়া ইতিকাফ শুদ্ধ হবে না।

দলীল (১)ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত-

... لَا اِعْتِكَافَ اِلاَّ فِيْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ– (ابو داود ج١ ص٣٣٥ باب المعتكف يعود المريض، ترمذي ج١ ص١٦٦ باب المعتكف يخرج لحاجت ام لا)

অর্থাৎ, জামে মসজিদ ব্যতীত ইতিকাফ শুদ্ধ নয়।

দলীল (২)ঃ তাঁরা দলীল হিসেবে কিয়াস উপস্থাপন করে বলেন যে, জুমুআর নামায আদায় করা ফরয। আর এজন্য ইতিকাফকারীকে জুমআর জন্য বের হওয়া আবশ্যক। সুতরাং জামে মসজিদে ইতিকাফ করলে বের হওয়া লাগবে না।

* ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ, আহমদ, ইসহাক, শাবী, আবু সালমা, নাখঈ এবং ইমাম বুখারী (রহ.)-সহ জমহুর উলামার মতে, ইতিকাফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য জামে মসজিদ হওয়া আবশ্যক নয়; বরং প্রত্যেক মজজিদেই ইতিকাফ সহীহ হবে, যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতে আদায় করা হয়।

দলীলঃ পবিত্র কুরআনের আয়াত- وَلاَ تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِي الْمَسٰجِدِ

অর্থাৎ, আর যতক্ষণ তোমরা ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিশো না। (বাকারাঃ ১৮৭)

উক্ত আয়াতে ইতিকাফের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে মসজিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, জামে মসজিদকে শর্তযুক্ত করা হয়নি। সুতরাং যেকোন মসজিদে ইতিকাফ করলে তা আদায় হয়ে যাবে।

প্রত্যুত্তরঃ ইমাম মালিক (রহ.)-এর প্রথম দলীলের জবাবঃ আবু দাউদ (রহ.) হাদীসটি বর্ণনা করার পর নিজেই বলেন-

... غَيْرُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحٰقَ لاَ يَقُوْلُ فِيْهِ قَالَتِ السُّنَّةُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ جَعَلَهُ قَوْلَ عَائِشَةَ–

অর্থাৎ, ... আব্দুর রহমান ইবন ইসহাক ব্যতীত কেউ বলেন না যে তা সুন্নত। আবু দাউদ (রহ.) বলেন, এ হলো আয়িশা (রাঃ)-এর বক্তব্য।

সুতরাং তা কুরআনের মোকাবেলায় দলীলযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ কুরআনের আয়াতের মোকাবেলায় কিয়াস করে জামে মসজিদকে শর্তযুক্ত করা কোনক্রমেই বৈধ নয়।

উল্লেখ্য যে, সর্বোত্তম ইতিকাফ হল যা মসজিদে হারামে (কাবা শরীফে) আদায় করা হয়, অতঃপর মসজিদে ননবী (সাঃ), অতঃপর বায়তুল মুকাদ্দাসে, অতঃপর জামে মসজিদে, অতঃপর ঐ সব মসজিদে যেখানে মুসল্লী সংখ্যা বেশি হয়।

(العمدة للعيني ج١١ ص١٤١–١٤٢)

بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَدْخُلُ الْبَيْتَ لِحَاجَتِهِ ص٣٣٤

প্রয়োজনে ইতিকাফকারী মসজিদ হতে বের হয়ে ঘরে প্রবেশ

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي اِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ اِلاَّ لِحَاجَةِ الاِنْسَانِ– (بخاري ج١ ص٢٧٢ باب

المعتكف لا يدخل البيت الا لحاجة، ترمذي ج١ ص١٦٥ باب المعتكف يخرج لحاجة ام لا، ابن ماجة ص١٢٨)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন ইতিকাফ করতেন, তখন তিনি স্বীয় মাথা মুবারক আমার নিকটবর্তী করতেন, আমি তাতে চিরুনী করে দিতাম। আর তিনি মানবিক (প্রস্রাব-পায়খানার) প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনে ঘরে প্রবেশ করতেন না।

বিশ্লেষণঃ ইতিকাফ শব্দের অর্থই হল নিজেকে আটকিয়ে বা বন্দী করে রাখা। কিন্তু একান্ত প্রয়োজনে ইতিকাফকারী মসজিদ হতে বের হতে পারবে কিনা, এ ব্যাপারে নিম্নে আলোচনা উপস্থাপন করা হল-

এ ব্যাপারে আল্লামা নববী (রহ.) লিখেন-

لاَ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مِنْ مَعْتَكَفِهِ اِلاَّ لِحَاجَةٍ شَرْعِيَّةٍ اَوْ طَبْعِيَّةٍ (معارف ج٦ ص٢١٧)

অর্থাৎ, ইতিকাফকারী ইতিকাফের অবস্থান হতে শরঈ অথবা স্বভাবগত প্রয়োজন ব্যতীত বের হতে পারবে না।

حَاجَت طَبْعِيَّة বা স্বভাবগত প্রয়োজনের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দুররে মুখতার-এর গ্রন্থকার বলেন, "তাহল প্রস্রাব-পায়খানা এবং স্বপ্নদোষের কারণে ফরয গোসল। এবং حَاجَت شَرْعِيَّة বা শরঈ প্রয়োজন হল- ঈদ বা জুমুআর নামায এবং আযান দেয়া, অজু করা ইত্যাদি। (در مختار ج٢ ص١٤٤)

হানাফীরা হাদীসে বর্ণিত "اِلاَّ لِحَاجَةِ الْاِنْسَانِ" এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন-

"اَلطَّهَارَةُ وَمُقَدَّمَاتُهَا" অর্থাৎ, পবিত্রতা ও এর পূর্বের কাজগুলো।

অতএব, এতে ইস্তিঞ্জা, অযু ও ফরয গোসলও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর এটাই ব্যাপকতর ব্যাখ্যা। (مجمع ج١ ص٢٥٦، شامي ج٢ ص١٣٢، احكام اعتكاف ص٦٣)

আর তাই অপরিহার্য প্রয়োজন ব্যতীত মসজিদের বাইরে যাওয়া, যেমন জুমআর দিন গোসল করতে বা একটু ঠাণ্ডার জন্য গোসল করতে অথবা এক অজু থাকা সত্ত্বেও নতুন অজু করার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েয নয়। কেননা, এগুলো حَاجَت لاَزِمَة বা অপরিহার্য প্রয়োজন নয়। (احكام اعتكاف ص٦٣)

হাঁ, এমন যদি হয় যে, গোসল না করার কারণে শরীরে খুব বেশি দুর্গন্ধ এসে যায় বা ইবাদতে মন না বসে অথবা ভীষণ অসুখ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা।

তবে শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.), হযরত জাফর আহমদ উসমানী (রহ.) এবং মাখদুম মোহাম্মদ হাশিম (রহ.) জুমুআর গোসলকেও প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর মধ্যে গণ্য করে এজন্য ইতিকাফকারীর বের হওয়াকে জায়েয মনে করেন। (اشعة اللمعات ج٢ ص١٢٠، احكام القران ج١ ص١٩٠، احكام اعتكاف ص٦١–٦٥)

কিন্তু ফকীহগণ কেবল নাপাকীর কারণে গোসলের জন্য বের হওয়ার অনুমতি দিয়ে থাকেন, তাছাড়া জুমআ সহ অন্য কোন গোসলের জন্য বের হওয়ার অনুমতি দেন না। দলীল হিসেবে বলেন, নবী করীম (সাঃ) প্রায় প্রতি বছরই ইতিকাফ করতেন, এবং প্রত্যেক ইতিকাফে অবশ্যই জুমআ অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু কোথাও একথা বর্ণনা নেই যে, নবী করীম (সাঃ) জুমআর গোসলের জন্য বের হতেন। অথচ স্বয়ং আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, "... নবী করীম (সাঃ) স্বীয় মাথা মোবারক আমার নিকটবর্তী করতেন, আমি তাতে চিরুনী করে দিতাম।" কিন্তু জুমআর গোসলের জন্য বের হয়েছেন এমন কোন রেওয়ায়েত পাওয়া যায়নি। যদি তিনি কখনো বের হতেন, তাহলে অবশ্যই উল্লেখ করা হতো। (احكام اعتكاف ص٦١–٦٥)

بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ ص ٣٣٥

ইতিকাফকারীর রোগীর সেবা করা

... عَنْ عَائِشَةَ·قَالَ النُّفَيْلِيُّ قَالَتْ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بِالْمَرِيْضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلاَ يَعْرِجُ يَسْأَلُ عَنْهُ فَقَالَ ابْنُ عِيْسٰى قَالَتْ اِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّىا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ–

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাবী আন-নুফায়েলী বলেনঃ তিনি (আয়িশা) বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) ইতিকাফে থাকা অবস্থায় রোগীর নিকট গমন করতেন। এরপর তিনি যে অবস্থায় থাকতেন, সে অবস্থায় গমন করতেন এবং তার (রোগীর) নিকট দণ্ডায়মান না হয়ে, তার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতেন। ইবন ঈসা বলেন, তিনি (আয়িশা) বলেছেন, যদি নবী করীম (সাঃ) ইতিকাফ অবস্থায় কোন রোগীর পরিচর্যা করে থাকেন (তবে তিনি প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজনে বের হয়েছিলেন)।

বিশ্লেষণঃ একথার উপর সকলেই একমত যে, রোগীর সেবা করা এবং জানাযায় শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে ইতিকাফকারীকে মসজিদ থেকে বের হওয়া নাজায়েয।

(التبيين ج١ ص٣٥١)

কিন্তু قضاء حاجت বা প্রয়োজনীয় কার্যাবলী (যেমন প্রস্রাব-পায়খানা, অজু ইত্যাদি) সারতে যাওয়া বা আসার সময় পথিমধ্যে অন্য কোন কাজ, যেমন রোগীর সেবা করা বা জানাযায় শরীক হওয়া জায়েয আছে। কিন্তু মোল্লা আলী কারী বলেন যে- এমতাবস্থায়ও ইতিকাফকারীকে দণ্ডায়মান না হয়ে চলতে চলতে রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করবে। (مرقاه ج٤ ص٣٣٠)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উল্লেখ্য যে, জানাযার নামাযে যেহেতু দণ্ডায়মান থাকা ব্যতীত শরীক হওয়াই সম্ভব নয়, এজন্য তাতে দণ্ডায়মান হওয়ার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু মূল রাস্তা থেকে সরতে পারবে না এবং নামায শেষ হতেই তৎক্ষণাত মসজিদে ফিরে আসা ওয়াজিব।

(بدائع الصنائع ج٢ ص١١٤، احكام اعتكاف ص٤٢-٤٣)

যদিও সুফিয়ান সাওরী এবং আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (রহ.)-এর মতে, ইতিকাফে বসার সময় যদি কেউ এ শর্ত করে যে, ইতিকাফ চলাকালীন অবস্থায় রোগীর সেবা করব, ইলমের মজলিশে বসব অথবা জানাযার নামাযে চলে যাব, তাহলে তার জন্য বের হওয়া জায়েয হবে। (الدر المختار مع رد المختار ج٢ ص١٤٦، *فتاوي العالمكيري* ج١ ص٢١٢)

কিন্তু বিশুদ্ধ কথা হল এই যে, কেবল মান্নত অথবা নফল ইতিকাফের ক্ষেত্রেই এরকম অনুমতি দেয়া যায়। সুন্নত ইতিকাফের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। সুতরাং সুন্নত ইতিকাফের ক্ষেত্রে যদি কেউ এ ধরনের নিয়ত করে, তাহলে তা সুন্নত ইতিকাফ থাকবে না; বরং তা নফল ইতিকাফে পরিগণিত হবে। অতএব এক্ষেত্রে কাযা ওয়াজিব না হলেও সুন্নত ইতিকাফের ফযিলত হাসিল হবে না। (احكام اعتكاف ص٦٦-٦٧)

প্রণিধানযোগ্য যে, ইবন মাজায় হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে,

... قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُعْتَكِفُ يَتَّبِعُ الْجَنَائِزَ وَيَعُوْدُ الْمَرِيْضَ

(ابن ماجة ص١٢٨ باب في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز، ترمذي ج١ ص١٦٦)

অর্থাৎ, ... রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, ইতিকাফকারী জানাযার পিছনে যাবে এবং রোগীর সেবা করবে।

কিন্তু এ রেওয়ায়েতটি দুর্বল। তাছাড়া ইহা হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর সহীহ রেওয়ায়েতের বিরোধী।

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ اَنْ لاَّ يَعُوْدَ مَرِيْضًا وَلاَ يَشْهَدَ جَنَازَةً وَّلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً وَلاَ يُبَاشِرَهَا وَلاَ يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ اِلاَّ لِمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ وَلاَ اعْتِكَافَ اِلاَّ بِصَوْمٍ وَّلاَ اعْتِكَافَ اِلاَّ فِيْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ (ابو داود ج١ ص٣٣٥ باب المعتكف يعود المريض)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইতিকাফকারীর জন্য সুন্নত এই যে, সে যেন কোন রোগীর পরিচর্যার জন্য গমন না করে, জানাযার নামাযে শরীক না হয়, স্ত্রীকে স্পর্শ না করে এবং তার সাথে সহবাস না করে। আর সে যেন বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত মসজিদ হতে বের না হয়। রোযা ব্যতীত ইতিকাফ নাই এবং জামে মসজিদ ব্যতীত ইতিকাফ শুদ্ধ নয়।

অতএব, এক্ষেত্রে আয়িশার (রাঃ) হাদীসটি গ্রহণযোগ্য। কেননা, অন্যান্য হাদীসের সাথে এর সামঞ্জস্য রয়েছে এবং আনাস (রাঃ)-এর হাদীসের তুলনায় এটি অধিক বিশুদ্ধ।